এই সময়ে শ্বেতপরিচ্ছদধারী শ্বেতশ্মশ্রু বর্ষীয়ান্ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলের প্রধান ছিলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের ন্যায় মন্ত্রবলের অধিকারী হইলেন, ব্রাহ্মণের যজ্ঞ করিতে লাগিলেন, এবং ব্রাহ্মণের তত্ত্বজ্ঞানী ও তপস্যা-পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। এদিকে মিথিলার অধিপতি জনকও একজন প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞানী রাজর্ষি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার আশায় তাঁহার শিষ্য হইতেও সঙ্কুচিত হইলেন না। এইরূপে ক্ষত্রিয়প্রাধান্য চারিদিকে বিস্তৃত হইল। বৈদিক সময়ের শেষে ক্ষত্রিয়ের এই প্রাধান্যলাভ হয়। এই সময়কে বেদের ব্রাহ্মণভাগের পরবর্ত্তী উপনিষদের সময় বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মকাণ্ডে যেমন আড়ম্বর করিয়া আসিতেছিলেন, ক্ষত্রিয়েরা তেমনি পরমার্থজ্ঞানে আপনাদের গভীরতা ও চিন্তার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উপনিষদে ক্ষত্রিয়ের এইরূপ অধিকার দেখিয়া, ব্রাহ্মণের বিস্ময় জন্মিল। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের এই প্রাধান্যের নিকট শেষে মস্তক অবনত করিলেন (১)। এই সময়ে শূদ্রদিগের মন আলোড়িত হইয়া উঠে। শূদ্রগণ দেখিল, ব্রাহ্মণগণ যে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন, স্বয়ং দেবতার অবতার বলিয়া লোকের মনের উপর যে আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা দীর্ঘকাল অবিচলিত থাকিল না। ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা ও প্রাধান্য এখন তাঁহাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সম্প্রদায়ের হস্তগত হইল। ইহা দেখিয়া এই নিম্নশ্রেণীর লোকেও সমাজে আপনাদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সামাজিক বিপ্লবের সময়ে সকলেই পরিশ্রমী ও কার্য্যতৎপর হয়, সকলেই আপনাদের ক্ষমতা বাড়াইতে সচেষ্ট হইয়া উঠে। সমস্ত আর্য্যসমাজ যেন কোন অভিনববলে বলীয়ান্ হইয়া, জীবন্ত ভাব ধারণ করে। এই জীবন্ত সময়ে অনেক প্রকার রচনা, অনেক প্রকার কার্য্যপ্রণালী ও অনেক প্রকার রীতি নীতির প্রচার হয়। জগদ্বিখ্যাত কাব্য রামায়ণে ও তৎপরে মহাভারতে এই সকল বিষয় একত্র গ্রথিত হইয়াছে।

তিন উপায়ে আর্য্যসমাজে অনার্য্য-দিগের এইরূপ উৎকর্ষ হয়। প্রথম অসবর্ণ বিবাহ, দ্বিতীয় আর্য্যসমাজের সহিত সংমিশ্রণ, তৃতীয় আর্য্যদিগের আচারব্যবহার ও রীতি নীতির অনুকরণ। যখন আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া অনার্য্যদিগকে পরাজিত করেন, তখন তাঁহারা সাহসে দৃপ্ত, গৌরবে

(১) ব্রাহ্মণেরা ইহার পরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই প্রাধান্য অব্যাহত থাকে।

উন্নত ও কার্য্যকারিতায় অবিচলিত ছিলেন। তখন তাঁহারা বিজিতদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন। কিন্তু বিজিতগণ সুসময়ের প্রতীক্ষায় থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, বিজেতারা দেশবিজয়, প্রাধান্য স্থাপন ও আত্মমহত্ব প্রচারের পর যখন বিশ্রামের জন্য লালায়িত হন, বিলাসিতা ও সৌখীনতার তরঙ্গ আসিয়া যখন তাঁহাদিগকে আন্দোলিত করে, তখন বিজিতগণ ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে থাকে। হিন্দু আর্য্যসমাজ ঠিক এই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল। এদিকে দীর্ঘকাল একত্র অবস্থানে জেতৃবিজিত সম্বন্ধে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। আর্য্যেরা এখন আর অনার্য্যদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন না। অনার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করা এখন আর তাঁহাদের নিকট পাপ বলিয়া পরিগণিত হইল না। মহাভারতে দেখা যায়, ভীম হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন নাগকন্যা উলূপীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অনার্য্যানারী সত্যবতীর পুত্র। পাণ্ডব ও কৌরবের সম্মানিত বিদুর দাসীপুত্র। এই অসবর্ণ পরিণয়ে অনার্য্যেরা ক্রমে আর্য্যসমাজে উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

ক্রমে অনার্য্যেরা আর্য্যদিগের সহিত মিশিয়া যায়। প্রথমে ইহারা আর্য্যসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিত। শেষে ইহাদিগকে আর্য্যদিগের গৃহে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। ক্রমে অনার্য্যগণ আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া যথানিয়মে যজ্ঞাদি করিবারও ক্ষমতা পায়। আর্য্যদিগের সহিত এই সংমিশ্রণ অনার্য্যদিগের উৎকর্ষ প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায়। আর্য্যসমাজে পরিগৃহীত হইয়া, অনার্য্যেরা অতঃপর আর্য্যদিগের আচারব্যবহার ও রীতি নীতির অনুকরণ করিতে থাকে। রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই, আর্য্যেরা অনার্য্যদিগের সহিত সম্মিলিত হইতেন। অনার্য্যেরাও আর্য্যদের সহিত মিশিয়া আপনাদের প্রাধান্য দেখাইতে চেষ্টা পাইত। রামায়ণের রামচন্দ্র, চণ্ডাল ও দক্ষিণাপথের অনার্য্যদিগের সহিত মিত্রতা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। রামের প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসগণও অনার্য্যজাতি। রামায়ণের রাক্ষসগণ হিংস্র, ভয়ানক ও বেদানুমোদিত ক্রিয়া কলাপের বিরোধী হইলেও রাক্ষসরাজরাবণের পুরী সংস্কৃতভাষী আর্য্যরাজগণের রাজধানীর ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণধর্ম্মানুমোদিত আচার ব্যবহারের এই অনুকরণ অনার্য্যদিগের উৎকর্ষ প্রাপ্তির তৃতীয় ও শেষ উপায়।

আর্য্যেরাও অন্য উপায়ে শূদ্রদিগের উৎকর্ষ প্রাপ্তির উপায় বিধানে উদাসীন থাকেন নাই। হিন্দু আর্য্যসমাজে উদারতা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই উদারতা-

গুণে হিন্দু আর্য্যসমাজ সচ্চরিত্র সদাশয় ও সৎকর্ম্মশীল শূদ্রকে আপনাদের শ্রেণীতে নিবেশিত করিতেন। বস্তুতঃ সাধুতার উপর আর্য্যদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ব্রাহ্মণ সাধুতা হইতে স্খলিত হইলে শূদ্রের শ্রেণীতে স্থান পাইতেন, শূদ্র সাধুতা দেখাইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইত। মনু কহিয়াছেনঃ—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি
ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ
বৈশ্যাত্তথৈবচ॥"

শূদ্র ব্রাহ্মণ পদ প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণও শূদ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের সম্বন্ধেও এই প্রকার জানিবে।

মহাভারতে লিখিত আছেঃ—

"কর্ম্মভিঃ শুচিভি র্দেবি শুদ্ধাত্মা
বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি
ব্রহ্মানুশাসনম্॥
নযোনির্নাপি সংস্কারো
নশ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেবতু
কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণোলোকে
বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তেস্থিতস্তু শূদ্রোঽপি
ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি।"

মহাভারত। অনুশাসনপর্ব্ব।

যে শূদ্রসন্তান জিতেন্দ্রিয় ও শুদ্ধচিত্ত, তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয়। উত্তম কুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ ও উত্তমের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রদ্বারা সকলে ব্রাহ্মণ হয়। অতএব শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব পাইয়া থাকে।

উদারহৃদয় বিশুদ্ধমতি হিন্দু আর্য্যগণ উদারতা ও বিশুদ্ধতার দিকে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে। লোমহর্ষণ সূতজাতীয় হইয়াও প্রাচীন হিন্দু আর্য্যসমাজের ঋষিদিগের সাতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। ঋষিগণ ইঁহার পুত্র সৌতিকে মহাভারত বক্তার পদে নিযুক্ত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। সৎকর্ম্ম, সাধুতা ও সাধনাবলে বিজিত অনার্য্যগণ বিজেতা আর্য্যসমাজে এইরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বিজেতারা সৎকর্ম্মের মহিমায় বিজিতদিগকে আপনাদের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতেনিবেশিত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। আধুনিক বিজেতারা ইহা হইতে গভীর উপদেশ লাভ করিতে পারেন।

শ্রীরঃ——

পুরাতন ভারতবর্ষের বাণিজ্য।

সূচনা।

"বাণিজ্যে বশগা লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজ-সেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ ॥"

এতদ্দেশে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় দিন দিন লোকের যে সকল মানসিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তন্মধ্যে স্বজাতীয় প্রাচীন-তত্ত্বানুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির সমধিক উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বে যে সকল বিষয় সম্বন্ধে দেশের কৃতবিদ্যলোক কিঞ্চিন্মাত্রও মনোনিবেশ করিতেন্ না এবং মনোনিবেশের বিষয় বলিয়াও গ্রাহ্য করিতেন্না, আজ্ কাল্ পাশ্চাত্য বিদ্যালোক-প্রভাবে সেই সকল বিষয় পরিদৃশ্যমান ও সম্যক্ আলোচ্যমান হইতেছে।

যদিও আমাদিগের কামদুঘা সংস্কৃত ভাষা বিদ্যমান থাকিতে ইংরাজী ভাষা হইতে গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প, ও বাণিজ্য শাস্ত্র ব্যতিরেকে শিক্ষিতব্য বিষয় অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি আমরা এই ইংরাজীভাষা শিক্ষা হইতে যে মানসিক উন্নতি লাভ করিয়া থাকি তজ্জন্য আমরা এতদ্ভাষাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি।

এই মানসিক উন্নতি কি? বলা বাহুল্য যে, এস্থলে মানসিক উন্নতি শুটিকতক প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও শুটিকতক প্রসুপ্ত জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ মাত্র। ইহা সাধারণতঃ অনুসন্ধিৎসা, কুসংস্কার পরিবর্জ্জন বা সাধারণ-চিন্তাশীলতা, স্বজাতীয় গৌরব-রক্ষণ, স্বজাতি-প্রিয়তা, সাধারণ একতা, এবং জাতীয় অভাব-মোচনেচ্ছা।

পাশ্চাত্যবিদ্যার সুবিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতেছে, এবং দিন দিন কৃত-বিদ্যলোকের রুচির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। জ্ঞান বা বিজ্ঞানের জন্য যত না হউক; ধর্ম্ম, দয়া ও দাক্ষিণ্যাদির জন্য যত না হউক; স্বজাতির গৌরব রক্ষার জন্য এবং স্বজাতির হীনত্ব মোচন জন্য সুশিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এমন কি, আর্য্যসন্তান স্বীয়প্রমত্ততা বশতঃ আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেও লজ্জা বোধ করেন, তিনিও হিন্দু জাতির গৌরব বর্দ্ধনার্থ সমুৎসুক ও বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চতুর্দ্দিকেই অনুসন্ধিৎসা, চতুর্দ্দিকেই অভাববোধ, এবং চতুর্দ্দিকেই আবার সেই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত প্রযত্ন ও অধ্যবসায়। ইদানীং কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেই স্বজাতীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী হইয়া প্রাচীন শাস্ত্র-

নিচয় ও ইতিহাসাদি হইতে সার সঙ্কলন করত প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহে এবং তদ্দ্বারা জাতীয়গৌরব-রক্ষণে ও জাতীয়গৌরব-পরিবর্দ্ধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

বাস্তবিক, যাবৎ আমাদিগের অন্তঃকরণে প্রাচীন আর্য্যগণের কীর্ত্তিকলাপ, তাঁহাদিগের সামাজিক রীতিনীতির সারবত্ত্ব, তাঁহাদিগের সভ্যতা, মহাপ্রাণতা, বদান্যতা, সহিষ্ণুতা, মহত্ত্ব, দয়া, মায়া, সাহস, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, শৌর্য্য এবং বীর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণের সমালোচনা করিতে থাকিব, তাবৎকালই আমাদিগের অন্তঃকরণে বড় হইবার আশা থাকিবে। স্বকীয় জাতির প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে আত্মাভিমান ও আত্ম-গৌরব বিনষ্ট হয়; আত্ম-জাতীয়াভিমান আছে বলিয়াই আমরা এখনও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হই নাই। ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গটুকু নির্ব্বাণ হইলেই আমরা অসার, অপদার্থ, সুতরাং অসভ্য জাতীয়গণ মধ্যে পরিগণিত হইব। পরন্তু যে কোন ব্যক্তি স্বজাতীয় পুরাতন ইতিবৃত্ত হইতে সত্য সঙ্কলন করিতে গিয়া যাদৃশ পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, তাদৃশ আনন্দ অন্যের ভাগ্যে কদাচিৎ উপভুক্ত ও অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপ আনন্দানুভূতিই প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান প্রবৃত্তির নিদান।

স্বজাতীয় পুরাতন ইতিহাসের এমন একটী মোহিনী শক্তি আছে যে, তৎসম্বন্ধীয় কোন একটী বিষয়ের অবতারণা হইলেই স্বজাতি-প্রিয় সহৃদয় পাঠকের হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বসিত হইয়া তৎসম্বন্ধীয় সবিশেষ বিবরণ পরিজ্ঞাত হইতে উৎসাহিত হইয়া উঠে।

শীর্ষোল্লিখিত বিষয়টী যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি গুরুতর। ইহার উপর প্রাচীন ভারতের সমস্ত হিন্দুসমাজ, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, সভ্যতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানাদি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এবম্বিধ প্রবন্ধের লেখককে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ, প্রাচীন হিন্দুসমাজতত্ত্ব-বিশারদ, বহুদর্শী এবং পুরাতন ও আধুনিক সমগ্র ইতিহাস তত্ত্বজ্ঞ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু যথোচিত ক্ষমতা না থাকিলেও সদ্বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করা সকলেরই উচিত, এই কর্ত্তব্যানুরোধে অথবা "গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ"—পণ্ডিতেরা দোষ না দেখিয়া গুণেরই পক্ষপাতী হইয়া থাকেন এইভরসায় মাদৃশ স্বল্পজ্ঞান ব্যক্তি এতাদৃশ প্রয়োজনীয়, দুরূহ ও গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা ইহা স্পষ্টরূপ দেখিতে পাই যে, যখন যে জাতিই সভ্যতার উচ্চতম শিখরে সমারূঢ় হইয়াছে, তখন সেই জাতিরই সভ্যতা প্রধানতঃ কৃষি বাণিজ্যের উপর দৃঢ় সন্নিবেশিত হইয়াছে। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বাণিজ্যোন্নতি না হইলে প্রকৃত সভ্যতার সম্ভব হয় না।

ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ; একের

অভাবে অপরের বিদ্যমানতাটী অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয়। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ সর্ব্বাগ্রে সভ্যতার উচ্চতম শিখরে সমুত্থিত হইয়া এক সময় পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতির সভ্যতাপথপ্রদর্শক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপদেশক ছিলেন। যাঁহারা দশগুণোত্তর সংখ্যা নিয়মের উদ্ভাবয়িতা হইয়াছিলেন; এবং যাঁহারা জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত, পাটীগণিত, ও চিকিৎসাবিদ্যাদির উৎকর্ষতা সাধন-করত-প্রাচীন আরব ও গ্রীসদেশবাসিগণকে সেই সেই শাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের গম্ভীর মস্তিষ্ক সমুত্থিত বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, দর্শন, বিজ্ঞান, এবং সাহিত্য প্রভৃতি পৃথিবীর প্রত্যেক সুসভ্য জাতির নিকট উপাস্যদেবতা হইয়া রহিয়াছে। যে প্রাচীন গ্রীস্ সমস্ত ইউরোপখণ্ডের জ্ঞানবিজ্ঞানশিক্ষক ও সভ্যতাপ্রবর্ত্তক, সেই পুরাতন গ্রীসই এককালে ভারতের মন্ত্রশিষ্য ছিল। আর্য্যগণ ভূমিকর্ষণ, গৃহ ও রাজপথ নির্ম্মাণ, বস্ত্র-বয়ন ইত্যাদি যে সর্ব্বাগ্রে শিখিয়াছিলেন তাহা ভাষাতত্ত্ব দ্বারাও প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

ফলতঃ, যৎকালে ভারত ভিন্ন সমস্ত ভূভাগ ঘোর অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন, তখন কেবলমাত্র আর্য্যগণই জ্ঞানবিজ্ঞানোন্নত ও সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অঙ্কে লালিত হইয়া সভ্যতার উচ্চতম চূড়া সমারূঢ় হইয়াছিলেন। তৎকালে যে তাঁহারা সভ্যতার ও উন্নতির নিদান কৃষিবাণিজ্যাদির প্রকৃষ্টরূপে উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন না, ইহা কে বিশ্বাস করিবে?

রত্নপ্রসবিত্রী ভারতভূমি সাগরাম্বরা পৃথিবীর অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পৃথিবী। ইতিহাসের আদরের ধন, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভারত পৃথিবীতে স্বর্গ।

যে ভারতে ছয় ঋতু পর্য্যায়ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া নানাবিধ স্থলজ ও জলজ শস্যোৎপাদন করে, যে ভারত প্রাচীন গ্রীসজাতি ও রোমান জাতির নিকট স্বর্ণভূমি বা দেব-ভূমি বলিয়া বিখ্যাত ছিল; সেই ভূস্বর্গ ভারতে যে বাণিজ্য ছিল না ইহা নিতান্ত অগ্রাহ্য কথা।

উত্তরে চিরতুষারমণ্ডিত অভ্রংলিহ হিমালয়, দক্ষিণে সাগরোর্ম্মি-বিধৌত কন্যাকুমারী, পূর্ব্বে প্রশান্ত সমুদ্র ও ব্রহ্মাদিরাজ্য, পশ্চিমে সিন্ধুনদ পারস্থিত প্রদেশ সমূহ এবং হিমালয় শাখা হিন্দু-কুশ পর্ব্বত—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন অতি বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের (এস্থলে কুমারিকা খণ্ডকেই ভারতবর্ষনামে অভিহিত করা গেল) বিচিত্র দেশনিকরের ভূভাগনিচয়ে আবহমানকাল উদ্ভিজ্জ, খনিজ, প্রাণিজ প্রভৃতি প্রভূত দ্রব্যজাত সমুৎপন্ন হয়। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজি পর্য্যন্তও প্রকৃতি দেবী ভারতের প্রতি সুপ্রসন্ন ও মুক্তহস্ত রহিয়াছেন এবং চিরকালই যে এইরূপ থাকিবেন ইহাও বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়।

যদিও কালের পরিবর্ত্তনশীল প্রভাবে

রত্নগর্ভা ভারতভূমি প্রাক্তন সৌভাগ্য-সুখে বঞ্চিত হইয়াছে; যদিও উপর্য্যুপরি বৈদেশিক জাতি-নিচয়ের আক্রমণে হৃত-সর্ব্বস্ব ও শক্তিহীন হইয়াছে; যদিও ভারত নানাবিধ দুরবস্থায় দিনদিন ক্ষীণ এবং অন্তঃসারশূন্য হইতেছে; ঈদৃশী অবস্থাতেও যখন আমরা যাহা চাই তাহাই পাইতেছি, এমন কি বিভিন্ন দেশীয় মানব-গণও ইহার প্রসাদে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেছে, তখন পূর্ব্বকালে বিশেষতঃ পৃথিবীর যৌবনাবস্থায় ভারত যে কত রত্ন, কত জীবিকাদ্রব্য, এবং অমৃতময় ভোজ্যই প্রদান করিত তাহা একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে একবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। এরূপ সর্ব্বশস্যাঢ্য দেশের মানবগণ ঐ সমস্ত সামগ্রীর পরস্পর বিনিময়ার্থ অবশ্য অতি পূর্ব্বকালেই অল্প বা বিস্তৃত রূপ বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল।

যে অপরিজ্ঞাতকালে বর্ণ-বিভাগ সংগঠিত হইয়াছিল, তৎকালেও সামান্যরূপ ব্যবসায়ের আরম্ভ হওয়া নিতান্ত সম্ভব। কারণ, কৃষি বাণিজ্যাবলম্বনই বৈশ্যদিগের প্রধান বৃত্তি ছিল।

প্রাচীনকালে যে, হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও দেশদেশান্তরে গমনাগমন ছিল, তদ্বিষয়ে বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত, এবং অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ, মনু, মিতাক্ষরা, ধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্য, নাটকাদি গ্রন্থে বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা যতই অনু-সন্ধান করিব, ততই, এতদ্বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণপ্রয়োগ প্রাপ্ত হইব।

যখন পৃথিবীমধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতায় সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তখন অতি পূর্ব্বকালেই যে হিন্দুগণ বাণিজ্যার্থ সমুদ্র যাত্রা করিতেন ও দেশ বিদেশে গমন পূর্ব্বক বাণিজ্যাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। বোধ হয়, বেদ বেদান্তাদিশাস্ত্র ব্যতিরিক্ত অপর কোন সংস্কৃত গ্রন্থ মনুসংহিতা ও বাল্মীকি রামায়ণের অপেক্ষা প্রাচীন নহে। যে কালে ঐ গ্রন্থদ্বয় রচিত হয়, তৎকালে হিন্দুদিগের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের যে ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়া-ছিল তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

মনুসংহিতায় হিন্দুদিগের যেরূপ উৎকৃষ্ট অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এবং রামায়ণে নগর ও রাজধানীর যে প্রকার উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা আছে, তাহাতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সকল ব্যবস্থা-বিধান ও বর্ণনার সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ধন, ধর্ম্ম, ও বিদ্যায় পরিপূর্ণ ছিল, সে অবস্থার সুখসম্ভোগোপযোগী সামগ্রী সকল কেবলমাত্র বাণিজ্যযোগেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভাবিত হয়।

নিঃস্ব অরণ্যবাসী লোকদিগের হৃদয়ে এরূপ বৈভবের ভাব উদিতই হইতে পারেনা।

পরন্তু, যদিও বাল্মীকি-রামায়ণ কাব্য

বটে; তথাপি তদুক্ত বর্ণনাগুলি যে, তাৎকালিক ভারতবর্ষীয় লোক-নিকরের অবস্থামূলক তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ—

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

তুইও কি তেমনি?

তুই (ও) কি তেমনি রে?
যবে সে নবীন বালা
গাঁথিত কুসুম মালা,
ছুটিয়া আসিত গলে পরা'তে আমারে,—
দুই বাহু বেষ্টি বুকে
চাহিয়া থাকিত মুখে,—
বলিত কতই কথা কতই আদরে!—

তু'ও কি তেমনি!
বলিত সে সদা—"তোরে
বাসি ভাল চিরতরে,"
বলিত—"আমি ত নই চঞ্চলা দামিনী!
আমি রে প্রদীপ তোর,—
নিশা না হইলে ভোর
না নিবালে নিবিব না!—জীবন সঙ্গিনী!"

সেও যে নিবিল রে!
আঁধারি এ গেহ মোর,
ছিঁড়িয়া প্রাণের ডোর,
গেল মরুভূমি করি হৃদয় আগারে!
সেও যে নিবিয়া গেল—
সেও যে ভুলিয়া গেল—
সেও যে ডুবায়ে গেল আঁধারে আমারে!

তুইও কি তাই হবি?
তেমনি অম্লান মুখে,
সেই বিস্ফারিত চ'খে,
ব'লি—"ভালবাসি তো'রে"পুন ভুলে যাবি?
গাহি প্রণয়ের গান
উজাড়ি এ ক্ষুদ্র প্রাণ
বিস্মৃতি সাগরে পুন সব ডুবাইবি?

সিহরি যে স্মরিতে!—
গাহিত সে কি সুস্বরে,—
শুনিতাম প্রাণ ভরে,
উথলি উঠিত হৃদি সে সঙ্গীত স্রোতে;
রুদ্ধ নেত্রে মুক্ত প্রাণে
ভাবিতাম এই গানে
আমার জীবন যদি পারি মিশাইতে!

সিহরি স্মরিয়া—
পবনে নড়েনা শাখী,
প্রকৃতি জ্যোছনা মাখি
সে'দিন প্রশান্ত হৃদে যেতেছে ভাসিয়া;—
ধরিয়া এ দুই করে
পরাণ প্লাবিত ক'রে—
ভুলিব না বলিল যা হাসিয়া হাসিয়া।—

(তুইও কি তেমনি?)
বলিল প্রণয়মরী,—
"মধুর জ্যোছনা অই"
প্রকৃতি হৃদয় ব্যাপি বিন্যস্ত কেমন?
আমারো এ প্রাণ সখে
তোমারো কি অই বুকে

অমনি আচ্ছন্ন করি রহিবে কখন?
ভুলিবি কি তুই?
দেখি সে মোহিনীবেশে
জানি নাই ভুলিবে সে
ভাবি নাই সে আলোক শুধু উল্কাপাৎ!
সে প্রেম নশ্বর এত
কে জানিত—কে বুঝিত
কে ভাবিত ভুলিবে সে সব অকস্মাৎ!

তুই (ও) কি ভুলিবি রে?
আঁধারি এ গেহ মোর,—
ছিঁড়িয়া প্রাণের ডোর
যাবি মরুভূমি করে হৃদয় আগারে!
তুইও নিবিয়া যাবি—
তুইও ভুলিয়া যাবি—
আবার ডুবায়ে যাবি আঁধারে আমারে!

যোগাঙ্গ সন্ধ্যা।*

(প্রতিবাদের প্রতিবাদ।)

যোগাঙ্গসন্ধ্যা সম্বন্ধে প্রতিবাদকারী যাহা লিখিয়াছেন তাহা সামান্যতঃ যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত বটে কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তিনি যত দোষের কথা বলিয়াছেন, তত দোষ বোধ হয় না। যেহেতু সন্ধ্যা দুই প্রকার বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। ঐ সন্ধ্যাদ্বয় অধিকারী ভেদে আবার দুইরূপ। তন্মধ্যে ভোগীদিগের পক্ষে যে সন্ধ্যা তাহাকে বাহ্যসন্ধ্যা, আর যোগীদিগের পক্ষে যে সন্ধ্যা তাহাকে আধ্যাত্মিকী বা অন্তঃসন্ধ্যা বলে। যেখানে যোগাঙ্গ সন্ধ্যার কথা বলা হইয়াছে সেখানে অন্তঃসন্ধ্যার কথা বলা হইয়াছে। অন্তঃসন্ধ্যাই যোগসন্ধ্যা। এ সন্ধ্যায় বাহ্যাড়ম্বর নাই। অঙ্গভঙ্গের ভয় নাই, প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। গুরূপদেশানুসারে কেবল আধ্যাত্মিক চিন্তাই যোগসন্ধ্যা। প্রমাণ;— "শিব শক্ত্যাঃ সমাযোগো যস্মিন্ কালে প্রবর্ত্ততে সা সন্ধ্যা যোগযুক্তানাং সমাধিস্থৈঃ প্রগীয়তে।" কেহ কেহ "যোগযুক্তানাং" স্থলে "কুলনিষ্ঠানাং" বলিয়া থাকেন। কৌলাবলি তন্ত্র দেখ।

যে সময়ে যোগযুক্ত সাধকদিগের কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারস্থ পরম শিবের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই সময়ে যোগীদিগের সন্ধ্যা করা হয়। অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর সহিত পরমশিবের সংযোগই যোগসন্ধ্যা। এই ব্যাপার বাহ্য কার্য্য নহে, ইহা অন্তর্যাগের অঙ্গ। অন্তর্যাজীরাই এই সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। ইহার আর একটি প্রমাণ এই:—

---

* আর্য্যদর্শন, আষাঢ় ১২৯১, ১৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

"শিবশক্ত্যাঃ সমাযোগঃ সন্ধ্যায়াং কার্য্যমেবহি।"—কুলার্চ্চন চন্দ্রিকা।

শিবশক্তির সমাযোগই যদি সন্ধ্যা-পদবাচ্য হইল, তবে ঐ কার্য্য কেবল চিন্তা ব্যতীত অন্য প্রকারে হইবার উপায় নাই, এই হেতু আর্য্যদর্শন পত্রিকায় যোগাঙ্গসন্ধ্যাকে যে চিন্তাপ্রধান বলা হইয়াছে, তাহাতে লেখককে প্রতিবাদকারী যত অপরাধী জ্ঞান করিয়াছেন তিনি তত দোষী নহেন। তবে 'ধ্যা'ধাতু আর 'কিপ্' প্রত্যয় সমন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অসম্ভব নহে।

ব্যাকরণ অতি খল শাস্ত্র। অনেক ঋষিরাও অনেক স্থলে ব্যাকরণবিরুদ্ধ পদ বিন্যাস করিয়া গিয়াছেন। যোগ-সন্ধ্যায় সে দোষ ঘটে নাই। তবে পদ-সাধনা স্থলে প্রকৃতি প্রত্যয় ঘটিত কথায় যে দোষ দেখা যায় তাহাতে আসলের কোন ব্যত্যয় হয় নাই। সন্ধ্যার অর্থ যে কেবল চিন্তা তাহা যোগীদিগের সম্বন্ধে বলিয়া, প্রবন্ধে যোগাঙ্গসন্ধ্যার কথা বলা হইয়াছে। অযোগীদিগের সন্ধ্যাও কেবল চিন্তাময়। বিনা চিন্তায় কি অন্তর কি বহির্যাগ কোন যাগই হইতে পারে না। অন্তঃসন্ধ্যায় ষটচক্র ভেদ করত কুণ্ডলিনীকে পরমশিবে যোগ করিতে হয়। বাহ্যসন্ধ্যায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সাবিত্রী সূর্য্য প্রভৃতিকেও চিন্তা করিতে হয়। অতএব চিন্তাই সন্ধ্যার জীবন।

প্রতিবাদকারক সন্ধ্যার যে সময় নির্ণয় করিয়াছেন তাহা যোগীদিগের সন্ধ্যার প্রকৃত সময় বলিতে পারা যায় না। দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থলকে অযোগীরাই সন্ধ্যা বলেন। যে সময় সাধকের উভয় নাসারন্ধ্র দিয়া সমভাবে শ্বাস নির্গত হয় তাহাকেই যোগীরা সন্ধ্যাকাল বলেন। অথবা কুম্ভকাবস্থাকে সন্ধ্যাকাল বলিয়া থাকেন। যেহেতু ঐরূপ সময়ে কুণ্ডলিনী চৈতন্য প্রাপ্ত হন। ইহা যোগশাস্ত্র স্বরোদয় গ্রন্থাদিতে প্রকাশ আছে। নতুবা অভিধান ও ধর্ম্মশাস্ত্রে উহার অর্থ যাহা আছে তাহা যোগীদিগের সম্বন্ধে সঙ্গত হয় না। যোগীদিগের ক্রিয়ানিষ্পাদক শাস্ত্র স্বতন্ত্র। সন্ধ্যা শব্দার্থ সম্বন্ধে আপত্তিকারী যে সকল শাস্ত্রের প্রমাণ দর্শাইয়াছেন তৎ-সমুদায় সাধারণ লোকদিগের পক্ষীয় প্রমাণ। যোগক্রিয়া ও যোগব্যবস্থা সকল শাম্ভবী বিদ্যার অন্তর্গত।

কৌলাবলীতন্ত্রে যোগীদিগের পক্ষে সকল সময়ে যে প্রকার ধ্যান করার কথা বলা হইয়াছে তাহাও প্রসঙ্গাধীন এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল;—

'নিরালম্বে পদে শূন্যে যত্তেজ উপজায়তে।
তত্তুর্গমভ্যসেন্নিত্যং ধ্যানমেতদ্ধি
যোগিনাং।"

আর্য্যদর্শনে যোগাঙ্গ সন্ধ্যাস্থলে যোগীদিগের সন্ধ্যা সম্বন্ধে যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে উপর্য্যুক্ত প্রমাণই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য।

শাস্ত্র তত্ত্ব।

পৃথিবীর প্রথম অবস্থা হইতে আর এই বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যাহা কিছু অলৌকিক, নূতন, ভীষণ, ঘৃণিত ও হৃদয়াকর্ষক, তাহার মূলতত্ত্বের কথা না লইয়া সর্ব্বসম্প্রদায়ের, সর্ব্বজাতির ও সর্ব্ব সমাজের উন্নত হইতে অবনত ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত একরূপ দৃঢ়ভাবে মায়াশৃঙ্খলে আবদ্ধ আছেন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইবে, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই আপনাপন জাতীয় সত্ত্বে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া নৈতিক, ধার্ম্মিক, সামাজিক ও পারিবারিক শুভসাধনে কৃতসঙ্কল্প আছেন। কেন মনুষ্যমাত্রেই শুভাশুভ ঘটনার বশবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করেন? কেন অনন্তকাল হইতে এই প্রকারে গভীর উদ্দেশ্যে নিয়ত আস্থাবান্ আছেন? কেন মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের প্রীতিপুষ্পাঞ্জলির পরিমলঘ্রাণে তৃপ্ত এবং মনুষ্যের পশুবদাচরণের ধনুষ্টঙ্কারে ব্যথিত হইয়া অদ্যাপি প্রত্যুপকার ও প্রতিশোধের পদচ্ছায়ায় সুনিষণ্ণ আছেন? কেন রাজদণ্ড ঠিক মস্তকের উপর দোদুল্যমান দেখিয়া তস্করেরা সমাজতরবারির শাণিতধার আলিঙ্গন করিতেছে? কেনইবা মহাত্মাগণ পূর্ব্বপুরুষের মুখোজ্জ্বল করিতে হাঁচী টিকটিকী পর্য্যন্ত বাছিয়া বিদেশে যাত্রা করিয়া থাকেন? কেন পাপে ভয়, পুণ্যে হর্ষ সমুদ্ভূত হইয়া অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিছায়া মুখে লাগিয়া থাকে? অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ইহাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পদার্থ নিহিত আছে।

"প্রয়োজন মনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি
প্রবর্ত্ততে।"

যখন মূর্খকেও বিনা কারণে বা বিনা প্রয়োজনে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না, তখন কেন না স্বীকার করিব যে, কোন কার্য্যে প্রবৃত্তির প্রতি তাহার ইষ্টসাধনতাই মূল? তস্কর যে চৌর্য্য কার্য্যে রত হয়, তাহার প্রবৃত্তি হইবার প্রধান কারণ অবশ্য তাহাতে তাহার ইষ্টসাধন আছে। ইষ্টসাধন আর কিছুই নয়, পরের ধন পাইলে তাহার কিছু দিন সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। এইরূপে প্রত্যেককার্য্যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক প্রবৃত্তির প্রতি তাহাদের ইষ্টসাধন স্বীকার করিতে হইবে। সেই জন্যই বলিতেছি, যাহার সাহায্য লইয়া আমরা ভবসাগরের তরঙ্গপ্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও ভ্রূক্ষেপ করি না, তাহার অবতরনিকা বোধ হয় সাধারণের অরুচিকর বা অসঙ্গত হইবে না। বোধ করুন মনুষ্য মনুষ্য, পশু পশু, জল জল, এই সকল পদার্থের প্রথমে যে নামকরণ করিয়াছে, তাহার আলোচনা যেসর্ব্বতোভাবে বিধেয়, তাহাতে আর সংশয় নাই।

যাহা মনে মনে, যাহা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভূত ও লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার জনক বা আদি গুরু "শাস্ত্র"। স্বর ব্যঞ্জনের সাহায্যে পদ পদার্থের নামকরণে, কি নির্ব্বাচনে অনুপম মাধুরী লহরী অন্তরে আস্বাদিত হইয়া থাকে, তাহার প্রভাবে কে না বশীভূত হইয়াছেন। শুদ্ধ ভারত নহে, মৃণ্ময়ী বসুন্ধরার উৎপত্তি হইতে অদ্যাপি যত মহাদেশ, দেশ, নগর, পল্লী আছে, তাহার প্রত্যেক অংশে প্রত্যেক জাতীয় ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যগণ, স্ব স্ব জাতীয় ও ধর্ম্মাঙ্কিত শাস্ত্রের আচার ব্যবহারে নিয়ত নিয়ন্ত্রিত আছে। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা কেবল পণ্ডিতেরই সাধ্যায়ত্ত, অপরের বিড়ম্বনা মাত্র। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—"শাস্ত্রৈঃ পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ" পণ্ডিতগণ কেবল শাস্ত্র দ্বারাই যথাযথ পদার্থের সূক্ষ্মদর্শন করিয়া থাকেন।

কিন্তু শাস্ত্র বলিলে কাহাকে বুঝিব, তাহার একটিও বিশদ সূত্র নাই। কেহ কেহ চণ্ডীপাঠ করিতে পারিলেই তাঁহাকে শাস্ত্রজ্ঞ নির্দ্দেশ করেন। কেহ বা দশকর্ম্ম ভালরূপে জানিলেই তাঁহাকে মহা সম্মান করেন। অপরে একটি কালিদাসের উদ্ভট শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে পারিলে তাঁহাকে পণ্ডিতদের মধ্যে উচ্চসিংহাসনস্থ করিতে মনন করেন। ক্রমে ক্রমে এখন আবার তাহার পরিবর্ত্তে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় ভাগ কৌমুদীর ধাতুগুলি যাহার কণ্ঠস্থ, তিনিই মহামান্য। ইহার উপর যদি ঋজুপাঠ প্রথম ভাগের "কস্মিংশ্চিদ্‌বনে ভাসুরকো নাম সিংহঃ প্রতিবসতিস্ম" এইরূপ দুটি চারিটি গৎ মুখস্থ থাকে, তাহা হইলে "রত্নং সমাগচ্ছতি কাঞ্চনেন" অর্থাৎ মনিকাঞ্চন-যোগ উপস্থিত হয়।

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন তাঁহারা বাবুর বচনভঙ্গীতে মূর্চ্ছিত। ত্রিভঙ্গ বাবু একজন ভাষালেখক চিত্র-কর। তিনি লেখনী দিয়া আঁকি-লেন যে, পিতৃশ্রাদ্ধের দিবসে মনুর মতে ব্রাহ্মণ নাই, সকলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া গেল। তিনি বলিলেন, মনুর মতের মার্জিন বাধ দিতে হইবে, অনুচরেরা বাধ দিবার স্থানে একেবারে তাহার অর্দ্ধাঙ্গ চ্ছেদ করিল। মনুর যখন হনু দর্শন হইল, তখন ব্যাসের ভারত কেন প্রতারিত হইবে না? যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা কি কারণে অহিতা হইবে না? এই অনুসারে অন্যান্য সম্প্রদায়ের শাস্ত্রানুশীল বুঝিয়া লইতে হইবে।

"শাস্ত্র" এইপদটি শাস্‌ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। শাস্‌ ধাতুর অর্থ শাসন করা। এই জন্যই আভিধানিক পণ্ডিত মহেশ্বর, বিশ্বপ্রকাশে "শাস্ত্রং গ্রন্থনিদে-শয়োঃ" এইরূপ শাস্ত্রশব্দের অর্থ বলিয়া-ছেন। মেদিনীতে "শাস্ত্রং ন দ্বয়োরাগ-মাজ্ঞয়োঃ" ও অমরে "নিদেশগ্রন্থয়োঃ শাস্ত্রম্' এই রূপ আছে। হেমচন্দ্রে ও বিশ্বে একপাঠ। মেদিনীতে একটি

অর্থ 'আগম' বলা হইয়াছে। আগম-শব্দের অর্থ কেবল শাস্ত্র। বিশ্ব, হেমচন্দ্র, মেদিনী ও ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে আগম শব্দের অর্থ শাস্ত্র ও আগমন। 'আগমঃ শাস্ত্র আগতৌ' মেদিনী। 'আগমঃ শাস্ত্র আয়াতে' বিশ্ব। 'আগমস্ত্বাগতৌ শাস্ত্রে' হেমচন্দ্র। 'শাস্ত্রমায়াতমগমঃ' ত্রিকাণ্ড-শেষ।

ধাতুর অর্থ ও আভিধানিকদের মত পর্য্যালোচনা করিলে এই মাত্র স্থিরীকৃত হয় যে, পুরাণ, সংহিতা ভিন্ন অন্যান্য কাব্যাদি গ্রন্থকেও শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। যখন শাসন করা অর্থ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন অবশ্য কাব্যাদি পাঠে অসৎপ্রবৃত্তি সকল প্রশমিত ও দমিত হইয়া সৎপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইবে। বেদ, পুরাণ বা সংহিতাদি পাঠ সামান্য সৌভাগ্যের ফল নহে। সেই কারণে এদেশস্থ অধিকাংশ পণ্ডিতপদবাচ্য মহাশয়েরা মুগ্ধবোধ, ভট্টি, কুমার, রঘু ইত্যাদির কিয়দংশ পাঠ করিয়া মনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। যাঁহার মুখ হইতে মনুর বচন নির্গলিত হইত, তাঁহার প্রশংসার তরঙ্গ বায়বীয় পরমাণুতে মিশাইয়া শেষে ভূয়াদি সত্যান্ত সপ্ত-লোকেরও উপরে চন্দ্রাতপের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

আমি স্বয়ং একদিন এক পণ্ডিত সমিতিতে উপস্থিতহইয়া একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের নৈষধ ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। সভা স্তম্ভিত, পণ্ডিতেরা চিত্রিত, বিষয়ীরা উন্মত্ত প্রায়। "দেবঃ পতি র্বিদুষি! নৈষধরাজগত্যা" এই এক চরণ আমি শুনিয়া তখনই শিখিয়া লইলাম। তখন আমি শকুন্তলা পাঠ করি। আস্তে আস্তে এক পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! ইনি কোথাকার শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন? তিনি উত্তর করিলেন, কেহে তুমি অর্ব্বাচীন! বোঝনা সোঝনা, এমন সময় প্রতিবন্ধক হইতেছে। আমি বলিলাম, মহাশয়! জানিলে জিজ্ঞাসা করিব কেন? তিনি বলিলেন, তুমিত ভারি মূর্খ হে! এ তুমি কি বুঝিবে? পঞ্চনলী শুনিয়াছ? ইনি তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন। আমি বলিলাম পঞ্চনলী শব্দের অর্থ বুঝিলাম, কিন্তু স্পষ্ট সমুদয় বুঝি নাই। তিনি তখন একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, একটি শ্লোকের পাঁচ-প্রকার অর্থ। তখন আমি তাহাই বুঝিলাম। যিনি ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাঁহার মুখের উপর চক্ষু রাখিয়া যত্ন-সহকারে শেষ পর্য্যন্ত শুনিলাম, কিন্তু দুই প্রকার অর্থ ভিন্ন অধিক আর কিছুই পাইলাম না। ব্যাখ্যাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আর তিন প্রকার অর্থ বলিলেন না? তিনি বলিলেন দুই প্রকার ভিন্ন ত অর্থ নাই। আমি সেই পণ্ডিতকে দেখাইয়া দিলাম, তিনি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, যোদো দামড়ার কথায় বুঝি বিশ্বাস করিয়াছ,

ও স্বয়ং বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য। কিন্তু যিনি শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন, তিনি পণ্ডিত সত্য, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিদায়ও পাইলেন।

কবিতাব্যাখ্যার বহুতর উদাহরণ দেখা গিয়াছে। কালিদাস স্বয়ং কেবল কবিত্ব-শক্তির নবপ্রতিভায় অদ্যাপি জীবিত আছেন। যাহাই হউক, কাব্য কখন নিন্দনীয় নহে। শাস্ত্রে আছে—"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুক্ ভবতি।" যদি একটি মাত্র উত্তমরূপে প্রযুক্ত হয়, ও তাহার অর্থ উত্তম রূপে জানা যায়, তবে সেই শব্দটি ইহকাল ও পরকাল অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। অলঙ্কারবেত্তারা বেদাদিশাস্ত্রের নীরসতা দেখিয়া এবং কাব্যাদি শাস্ত্রের মধুরতা ও আশু মনোহরতা দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন, বেদাদি শাস্ত্র কখনই উৎকৃষ্ট নহে। তিক্ত কটু কষায় ঔষধ সেবন করিয়া ব্যাধির শান্তি হওয়া অপেক্ষা শ্বেতশর্করা দ্বারা সেই রোগের উপশম করা সকল রোগীরই বাঞ্ছনীয়। আলঙ্কারিক শিরোমণি দূরদর্শী মম্মট কাব্য প্রকাশে কাব্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে একসূত্র করিয়াছেন, তাহাতে কাব্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় পদার্থ নহে। তিনি বলিয়াছেন "কাব্যেং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তা সম্মিততয়া উপদেশযুজে।"

যশ, অর্থ, ব্যবহারজ্ঞান, অমঙ্গলনাশ, সদ্য পরমসুখ, ও রমণীর তুল্য অতি কোমল উপদেশ দানের জন্য কাব্য বা শাস্ত্রের আবশ্যক। বস্তুতঃ কাব্যে জ্ঞান থাকিলে সভাতে দুই একটি শ্লোকব্যাখ্যা করিলে তাহায় যশোলাভ অযৌক্তিক নহে। ঐরূপে কবিতাব্যাখ্যা করিয়া অনেককেই অর্থোপার্জ্জন করিতে দেখা যায়। সুতরাং কাব্যে যশ ও অর্থলাভ নিত্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। শিশুপাল বধের দ্বিতীয় সর্গ, কিরাতার্জ্জুনীয়ের দ্বিতীয় ও একাদশ সর্গ পাঠ করিলে ও তাহার অর্থ আয়ত্ত থাকিলে ব্যবহারিতত্ত্ব বা রাজনৈতিক বিষয়ে যথার্থ অভিজ্ঞতা জন্মায়। বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহার উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। অমঙ্গলনাশের দৃষ্টান্ত ময়ুর ভট্টের চরিত্রপাঠে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে, ময়ুরভট্ট কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু 'সূর্য্যশতক' নামে সূর্য্যের উপাসনা বিষয়ক একশত কবিতা রচনা করিয়া কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত হন। সূর্য্যশতকের কবিতাগুলি যথার্থ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন। আর কাব্য পাঠে সদ্য যে পরমসুখ হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

"উভৌ রম্ভাস্তম্ভাবুপরি বিপরীতৌ
কমলয়োঃ"

অর্থাৎ দুইটি কমলের উপরে দুইটি কদলীবৃক্ষের স্তম্ভ বিপরীতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। পাঠক! অভিপ্রায় বুঝিলেন? অর্থাৎ চরণ কমলের সহিত উপমিত

হইয়া থাকে। এই কারণে কমলের উপর অর্থাৎ চরণকমলের উপর দুটী কদলীবৃক্ষের স্তম্ভ অর্থাৎ দুটি উরু বিপরীতভাবে অর্থাৎ কদলীবৃক্ষের গোড়া-মোটা আগা সরু এখানে গোড়া সরু, আগা মোটা, কারণ উরু কদলী বৃক্ষের সৌসাদৃশ্যলাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নহে, এইজন্য বিপরীত ভাবে বলা হইয়াছে। এখন ভাবিয়া দেখুন এরূপ কবিতার অর্থবোধ হইলে 'সদ্যঃ পরনির্বৃতি' বা সদ্য পরমসুখ হইতে পারে কি না? পিতা, গুরু, কি অন্যান্য অভিভাবকেরা উপদেশ দিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাহা কর্কশ। কিন্তু কাব্যশাস্ত্রে যে উপদেশ দেওয়া আছে, (রমণী যেমন কোমল) তাহার মত কোমল।

এইত কাব্যের উপযোগিতা ও উপকারিতার ফল নির্দ্দেশিত হইল। এক্ষণে কাব্যের উপর পৌরাণিকদের মত দেখান যাইতেছে।

"চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং
নিরূপ্যতে॥"

যাহারা মূর্খ তাহাদেরও কাব্য হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি সুখে ঘটিয়া থাকে। অতএব কাব্যের স্বরূপ নিরূপণ করা যাইতেছে। এক্ষণে আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন 'শাস্ত্র' পদটি দ্বারা একটি কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু নাই যে, তাহাকেই বুঝাইবে।

মনুষ্য বলিলে যেমন নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত তাহার যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে লইয়া একটি পদার্থকে বুঝায়, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেমন মনুষ্যত্ব থাকে, সেইরূপ "শাস্ত্র" বলিলে বেদ, পুরাণ, দর্শন, উপনিষৎ, সংহিতা, কাব্য, অলঙ্কার, নাটক নাটিকাদি পর্য্যন্ত সমুদায়কে বুঝাইবে। হস্ত মনুষ্যের অংশ বিশেষ, পদও মনুষ্যের অংশ-বিশেষ মাত্র। অথচ হস্তপদাদিতেও মনুষ্যত্ব বিদ্যমান থাকে। ব্যবহারকালেও মনুষ্যের হস্ত, মনুষ্যের পদ, এরূপ পৃথক্ ভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশীয় মনুষ্য যেমন মনুষ্য, তেমনই পাশ্চাত্য মনুষ্যও মনুষ্য পদবাচ্য। এক মনুষ্যে পৃথিবীর মানবকে বুঝিয়া লইতে হইবে। এক শাস্ত্রেও পৃথিবীর শাস্ত্রকে বুঝাইবে। তবে তাহার গুটিকত বিশেষণ বাড়িবে মাত্র। যেমন খঞ্জ মনুষ্য বলিলে মনুষ্যত্ব থাকিলেও তাহার খঞ্জত্ব বিশেষত্বের জ্ঞান পূর্ব্বক মনুষ্যকে বুঝি, অন্য মনুষ্য হইতে তাহার একটী বিশেষ গুণ দ্বারা শব্দবোধ হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, ব্যবহার-শাস্ত্র ইত্যাদি স্থলে ধর্ম্ম, কাব্য ও ব্যবহার ইহাদের শাব্দবোধ হইয়া পশ্চাৎ শাস্ত্রের বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল পদার্থেই শাস্ত্রত্ব আছে। তবে বিশেষণ থাকাতে বিশেষণের বোধ সহ বিশেষ্যের বোধ হইবে মাত্র। "নীল ঘট" বলিলে নীলত্ব-পুরস্কারে ঘটত্বের জ্ঞান হয়, এবং 'নীল' শব্দ থাকাতে সমুদয় ঘট হইতে এক

প্রকার বিশেষ ঘটকে বুঝাইয়া থাকে।

এক্ষণে আলোচ্য এই—শাস্ত্র মানা যাইতে পারে কি না? না মানিলে তাহাতে ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায়, যিনি মানিবেন না, তিনি মুখ দিয়া বলুন যে, "আমি শাস্ত্র মানিব না।" "আমি শাস্ত্র মানিব না" ইহার মধ্যে সকল কথা ছাড়িয়া 'আমি' কথাটিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যে 'আমি' বলিতেছেন, তাহার প্রমাণ কি? 'আমি' কথাটি কি শাস্ত্রসঙ্গত নয়? 'আমি' বলিলে যে 'তুমি' হইতে ভিন্ন পদার্থকে বুঝাইবে, তাহার যুক্তি কি? তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে অস্মদ্ শব্দে এইরূপ লক্ষণ, ও যুস্মদ্ শব্দের এইরূপ লক্ষণ। শাস্ত্রে অস্মদ্ শব্দে যাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, 'আমি' এই পদটি সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অস্মদ্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং 'আমি' চিরকাল আমি এবং 'তুমি' চিরকাল তুমি থাকিবে। যখন 'আমি' এই পদটি শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হইল, তখন যিনি বলিবেন 'আমি শাস্ত্র মানিব না' তাঁহাকে হয় বাতুল বলিতে হইবে, নয় মিথ্যাবাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শাস্ত্রে যে স্থানে সার ভাগ দেখিতে পাইব তাহাই গ্রহণ করিব, অসার ভাগ অগ্রাহ্য বোধ করিব। আমরা জিজ্ঞাসা করি, 'সার ও অসার' এই দুই পদও 'শাস্ত্র দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তুমি একটি বিষয় বুঝিতে পারিলে না, কি একটি বিষয় তোমার রুচির সহিত মিলিল না, কি এখনকার সমাজের সঙ্গে কোন বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক, তাহাকে অসার বলা অত্যন্ত অবিধি।

"কলবিঙ্কং প্লবং হংসং চক্রাঙ্গং
গ্রামকুক্কুটম্।
সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাত্যূহং
শুকসারিকে॥" মনু। ৫। ১২।

এই মনুবচনে বন্য কুক্কুট ভক্ষণ করা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গ্রাম্য কুক্কুট ভক্ষণ করিবার বিধি প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। কিন্তু এ বচন এখন ভাল লাগিবে কেন? এখন অগত্যা এই কুক্কুটকে লাঠী দিয়া তাড়াইয়া একটা বনের মধ্যে গিয়া তাহাকে বধ করিতে বাধা হইতে হইতেছে। বনে বধ করিলে বন্য কুক্কুট হইল, বন্য কুক্কুট ভক্ষণ করিবার প্রথাও মনুতে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, মনুর বচন আর আমাদের ভাল লাগিবে কেন? কাযেই মনুর বচন অসার হইবে বৈকি?

"মাংস ভক্ষয়িতাঽমুত্র যস্য মাংসমিহা-
দ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি
মনীষিণঃ।" মনু। ৫। ৫৫।

ইহলোকে আমি যাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছি, পরকালে 'মাংস' অর্থাৎ আমাকে সে ভোজন করিবে। এইরূপে

মাংস শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়া থাকে। এখন আর মনুর এরূপ মূর্খত্বপূর্ণ বচন কেনইবা অগ্রাহ্য হইবে না? তবে শ্লেষ্মা হইলে একটু মদ্য পান করিবার ব্যবস্থা যাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞান না হইয়া সমাজমন্দিরে চক্ষু মুদিয়া যাহাতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বেদবাক্যে জাতিভেদ উঠিয়া যায়, এরূপ শাস্ত্র দেখিতে পাইলে কি বর্ত্তমান থাকিলে একটু উপকার হইয়া থাকে। কেননা সমাজে সকলেই ভ্রাতা, আর সকলেই ভগিনী, কারণ পরমেশ্বর উভয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা বা উভয়েরই পিতা। কিন্তু চানক্য যে বলিয়াছেন—

"ঘৃতকুম্ভং চ বহ্নিং চ নৈকত্র
স্থাপয়েদ্বুধঃ।"

স্ত্রীপুরুষ কদাচ একস্থানে থাকিবে না। কারণ অগ্নি ও ঘৃত একত্র রাখিলে অবশ্যই পরে গলিত হইবে। এ সামান্য বুদ্ধি তাঁহাদের মনেও স্থান পায় না।

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন
বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি
কর্ষতি॥"
(মনু। ২। ২১৫)

অন্যের কথা দূরে থাকুক, মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিত নির্জ্জন গৃহাদিতে বাস করিবে না। কারণ দুর্দম ইন্দ্রিয়গ্রাম শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকেও পরবশ করিয়া থাকে। যখন পণ্ডিতকে পরবশ করিয়া থাকে, তখন মূর্খকে যে বশ করিতে পারে, তাহা একরূপ স্বীকার্য্য।

মনু না জানিয়া যে মাতার সহিত এক গৃহে শয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা নহে। অনেক দেখিয়া, অনেক শুনিয়া তবে এই বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গুরুপত্নী যুবতী হইলে তাহার পাদস্পর্শ ব্যতীত প্রণাম করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু এখন সেই মনু অবশ্য মূর্খ বা অকর্ম্মণ্য হইয়াছেন। তবে

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ
মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"
মনু। ৫। ৫৬।

মাংসভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনাদি কার্য্যে কাহারও প্রবৃত্তি হইলে তাহাতে দোষ হয় না। টীকাকার কুল্লূক ভট্ট বলিয়াছেন —"যস্মাৎ প্রাণিনাং ভক্ষণপানমৈথুনাদৌ প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকোঽয়ং ধর্ম্মঃ।" ভক্ষণ পান ও মৈথুন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া মনুষ্যগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মনুষ্যের ধর্ম্ম মনুষ্য দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। তবে অবৈধ ও নিষিদ্ধ মদ্যপান ও মৈথুনাদিকার্য্যে নিবৃত্তি হইলে মহাফল হয়। এ স্থলে মনু অনেকটা সুবিধা করিয়াছেন, কিন্তু শেষে একেবারে খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কুল্লূক ভট্ট 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" অর্থাৎ নিবৃত্তি হইলে অত্যন্ত অফল হয়, যদি এরূপ বলিতেন, তবে তাঁহার পাণ্ডিত্য থাকিত। কাযেই কুল্লূক উল্লুকের মতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জাতিভেদ থাকিবে না, সেনের গৃহে আহার করিতে হইবে

ভাবিয়া কেবল "সর্ব্বং খল্বিদং" ব্রহ্ম এই উপনিষদের প্রয়োজন। নতুবা "শান্তো-দান্তস্তিতিক্ষুরুপরতো ভূত্বা আত্মন্যে-বাত্মানং পশ্যেৎ।" শম, দম, তিতিক্ষা ও উপরতি প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত না হইয়া একেবারে ব্রহ্মজ্ঞান হইল, ইহাই আশ্চর্য্য। একেবারে শঙ্করাচার্য্যের গুরু হইয়া অভেদ জ্ঞান হইল, অথচ যে গুণে বেদের অধিকারী হওয়া যায়, তাহার সঙ্গে জীবনে সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু আমি সমাজের একজন প্রধান আচার্য্য।

তবে দেশকাল পাত্রানুসারে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিভিন্নরূপে বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু শাস্ত্র যে মানিতে নাই, তাহা কোন শাস্ত্রে উপপন্ন করিতে পারা যায় না। পিতাকে পিতা বলিবার কথা কেবল শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। পিতার পরিবর্ত্তে যদি আর একটু আদরের ডাকে আহ্বান করিতে প্রতিবাদীকে (যিনি শাস্ত্র মানেন না) অনুরোধ করা হয়, তবে তাঁহার রাগ হয় কেন? কেন তিনি ত শাস্ত্র মানেন না? পত্নীকে অন্য সম্বোধনে সম্ভাষণ করিলে প্রতি-বাদীর মনে সত্য কি কোন দ্বৈধ জন্মায় না? সত্য কি স্ত্রী সকল প্রতিবাদীর চক্ষে ব্রহ্মভাব ধারণ করিয়াছে? নিজের রুচির বিরুদ্ধ অংশ দেখিলেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অগ্রাহ্য বোধ করা হইবে, আর রুচিপূর্ণ স্থান পাইলেই শাস্ত্রের মহিমা উদ্‌ঘোষিত হইবে, এরূপ সভ্যমণ্ডলী নিকটে আমাদের বক্তব্য নাই। তবে যাঁহারা শাস্ত্রের ভাণ করিয়া জগতে পরিচয় দেন, গোপনে শাস্ত্রবিগর্হিত যাবতীয় অবৈধ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাছে বক্তব্য এই—শাস্ত্র না মানিয়া থাকিতে পারা যায় কি না? শাস্ত্র ছাড়া দৃশ্যমান কোন পদার্থ আছে কি না? থাকিলেও তাহার প্রমাণ করা হইতে পারে কি না? এ সম্বন্ধে আর আমরা বাক্য ব্যয় করিব না। কারণ, মনুর মতে আমরা ব্রাহ্মণ, মনুর মতে আমরা মনুষ্য, সে অংশে শাস্ত্র মানিব, প্রতিবাদ করিব না, আর মদ্য-পান নিষিদ্ধ হইলেও তাহা শাস্ত্রীয় বলিয়া বিশ্বাস করিব। যাহাদের এরূপ শঠতা হৃদয়ে জাগরূক আছে, তাহারা নরপশু, সুতরাং তাহারা কখনই শাস্ত্র-সমাজে স্থান পাইতে পারে না।

শাস্ত্র যে মনুষ্য জাতির যথাসর্ব্বস্ব, তাহা "মনুষ্য" শব্দ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যখন আমরা মনুষ্য, তখন আমাদের অবশ্য শাস্ত্র আছে, স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্যত্বনিবন্ধন আর যাহা কিছু মানবের আবশ্যক বা উপ-যোগী, তাহাও শাস্ত্রীয় বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তবে সেই শাস্ত্র কখন একটি নির্দ্দিষ্ট বস্তু হইতে পারে না। কাব্য, অলঙ্কার হইতে বেদ পুরাণ পর্য্যন্ত সমুদয়ই শাস্ত্রপদবাচ্য। যেমন পৃথিবীর যে কোন এক স্থান স্পর্শ করিলে সমুদয় ভূমণ্ডল স্পর্শ করা হয়, সেইরূপ শাস্ত্র

ধুরিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় শাস্ত্র উপলব্ধ হইয়া থাকে। সমুদয় নদনদী যেমন সাগরে পতিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য্য একমাত্র পরব্রহ্মে পরিণত হইয়া থাকে।

যে পরমেশ্বর সর্ব্বজাতির ধর্ম্মপুস্তকে নানা বিগ্রহ ধারণ করিয়া নানা সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন, যিনি কোন শাস্ত্রে সাকার, কোন শাস্ত্রে নিরাকার, কোন শাস্ত্রে পূর্ণ, কোন শাস্ত্রে অংশ, কোন শাস্ত্রে দ্বিভুজ, কোন শাস্ত্রে চতুর্ভুজ ইত্যাদি, যিনি শাস্ত্রান্তরে পরমাণু, অপর শাস্ত্রে প্রকৃতি, কোন মতে অশব্দ, অরূপ, অস্পর্শ, অব্যয়, জ্ঞানময়, সৎ, বা আনন্দস্বরূপ, তিনিও শাস্ত্রে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, শাস্ত্রেই তাঁহার মহিমা, অর্চ্চনা, সাধনার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বর পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায়, তখন শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বা শাস্ত্রের মহিমা কেন গৌরবান্বিত হইবে না? কেনই বা শাস্ত্রের গূঢ়-তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম ব্যাখ্যানে নিরানন্দ প্রকাশ করিবেন বা ক্ষান্ত থাকিবেন? তবে স্বীকার করি, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য শ্রবণে বা শাস্ত্রানুযায়ী হইয়া সংসারাশ্রম নির্ব্বাহনে কখনই হর্ষ প্রকাশ করিতে অগ্রসর নহেন।

"শাস্ত্র যোনিত্বাৎ।" ৩। বেদান্তদর্শন।

মহর্ষি বাদরায়ণ স্বপ্রণীত বেদান্ত-দর্শনে আত্মপদার্থ বা পরব্রহ্ম নির্ব্বাচন করিবার জন্য এই সূত্র প্রণয়ন করেন। শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে 'মহত ঋগ্‌ বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য' মহৎ ঋক্-বেদাদি শাস্ত্রের কারণ বলিয়া পরমাত্মা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা এই প্রমাণ করা হইল, পরমাত্মা প্রথমে বেদশাস্ত্র নির্ম্মাণ করেন। তাহা হইলে বেদশাস্ত্র যে কতকাল রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ বেদ নিত্য, কারণ, বেদস্রষ্টা স্বয়ং পরমাত্মা পরমেশ্বর। যদি বেদ নিত্য হইল, তবে মনু প্রভৃতি বেদার্থনির্ণেতা ঋষিধুরন্ধরেরা সেই বেদার্থের অনুসরণ করিয়া যে সকল স্মৃতি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, অবশ্য তাহারাও নিত্য বা বেদবৎ প্রতীয়মান হইবে। মনু স্বয়ং বলিয়াছেন—

"শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ॥" মনু। ২।১০।

বেদকে শ্রুতি ও ধর্ম্ম শাস্ত্রকে স্মৃতি বলে। এই টীকার অর্থে কুল্লুক ভট্ট বলিয়াছেন—

"শ্রুতিস্মৃত্যোঃ প্রতিকূলতর্কেণ অমীমাংস্যত্ববিধানার্থং স্মৃতেঃ শ্রুতিতুল্যত্ব-বোধনের আচারাদিভ্যো বলবত্বপ্রতিপাদনার্থঞ্চ তেন স্মৃতিবিরুদ্ধাচারো হেয় ইত্যস্য ফলম্॥"

প্রতিকূল তর্ক করিয়া শ্রুতি এবং স্মৃতির কেহই মীমাংসা করিতে পারেন না। বেদের তুল্য স্মৃতির অর্থ, এবং

স্মৃতিশাস্ত্র আচার ও শীল ইত্যাদি হইতে প্রবল। এই কারণে স্মৃতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ আচার পরিত্যাজ্য, ইহাই এস্থানে কবিতার ফল।

তবে স্মৃতিশাস্ত্র বেদানুযায়ী হওয়াতে অবিকল বেদের মত সম্মান পাইয়াছে। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বেদবিরোধী স্মৃতিশাস্ত্র অবশ্যনিন্দনীয়।

জাবাল বলেন—

"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা॥"

যে স্থানে শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হয়, সেই স্থানে বেদই প্রবল, অর্থাৎ বেদের মতই গ্রাহ্য। তবে যাহাতে না পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হয়, যাহাতে বেদের সহিত স্মৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারা যায়, সেইরূপে পণ্ডিতগণ বেদোক্ত কার্য্যের মত স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"শ্রুত্যা সহ বিরোধেতু বাধ্যতে বিষয়ং বিনা।"

বেদের সহিত স্মৃতির বিরোধ ঘটিলে কোন বিষয় না লইয়া অর্থাৎ বিষয় ব্যতীত স্মৃতির বাধা হইবে।

জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে বলিয়াছেন—

"বিরোধেত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্।"

শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতিবাক্য অনপেক্ষ অর্থাৎ অপ্রমাণ বা অনাদরণীয়। তবে বিরোধ যদি না থাকে, তাহা হইলে মূলবেদের অনুমান হইয়া থাকে।

যে স্থানে বেদের দ্বৈধ উপস্থিত হইবে, যে স্থানে মনুর ব্যবস্থাই বলবতী। যথা—

"শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।
উভাবপিহি তৌ ধর্ম্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ॥" মনু।২।১৪।

যে স্থানে বেদবচনের দ্বৈধ উপস্থিত হইবে, তথায় দুই প্রকার ধর্ম্ম। পণ্ডিতগণ তথায় দুই প্রকার ধর্ম্মকেই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। গৌতম বলিয়াছেন—

"তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ।"

যাহাদের পরস্পরের বল তুল্য, অর্থাৎ যাহারা পরস্পর অবিরোধী, তাহাদের যদি বিরোধ হয়, তথায় বাস্তবিক সংশয় ঘটিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

কোন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন "যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার।" গীতায় কিরূপ ধর্ম্মের ভাব প্রচারিত হইয়াছে, তাহা আমরা গত বারেই অনেক দূর প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা ক্রমশঃ দেখাইব, ভগবদ্গীতায় কিরূপ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব বিস্ফারিত হইয়াছে।

ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য যখন কৃষ্ণ উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন তিনি বিচার করেন নাই, তজ্জন্য ধর্ম্মবাক্য বলিব, কি অধর্ম্ম বাক্য বলিব। যে বাক্য তৎপক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাই তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। ধনঞ্জয়ের মনে যুদ্ধে বিরতি অনেক কারণে উদিত হইয়াছিল। সকলগুলিই প্রবল কারণ। সেই সমস্ত কারণজাত অনিচ্ছাও অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। এই অনিচ্ছা দূর করিবার জন্য কৃষ্ণকে অনেক বাক্যজল্পনা রচনা করিতে হইয়াছিল। যে পক্ষ ও কোটি হইতে যেরূপ সাহায্য পাইয়াছিলেন, সেই কোটি হইতে তিনি সেইরূপ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মকথা, কি অধর্ম্মকথা কিছুই বাছেন নাই; তাঁহার উদ্দেশ্যসাধন হইলেই হইল। ইহারও একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

আত্মার অমরত্ব মত যদি ধর্ম্মবাক্য হয়, তদ্বিপরীত মত অবশ্য অধর্ম্ম হইবে। মানুষ মরিয়া গেলেও, আত্মা চিরকাল জীবিত থাকে—এ কথা যদি ধর্ম্মবিশ্বাস হয়, তবে ইহার বিপরীত বিশ্বাস অবশ্য অধর্ম্ম হইবে। ইহার বিপরীত মত এই যে, যদি আত্মা বলিয়া কিছু থাকে তাহার উৎপত্তি ও লয় দেহের সঙ্গে সঙ্গেই সংঘটিত হয়। দেহের উৎপত্তির সহিত আত্মার উৎপত্তি এবং তাহার ধ্বংসের সহিত আত্মারও ধ্বংস হয়। এই মতটী আত্মার অমরত্ব মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত। উভয় মতই কখন ধর্ম্মজ্ঞান অথবা ধর্ম্মবিশ্বাস বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু কৃষ্ণ এই উভয় মত হইতেই আপনার যুক্তি ও প্ররোচনা সংগ্রহ করিতে ক্রটি করেন নাই। আত্মার অমরত্ব মত দ্বারা তিনি অর্জ্জুনকে কেমন উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা গত বারেই দেখাইয়াছি। এই দেখুন, তিনি আবার তদ্বিপরীত মত দ্বারাও ধনঞ্জয়কে কেমন উত্তেজিত করিতেছেন।

"যদ্যপি শরীরের জন্মেতেই আত্মার

জন্ম এবং শরীরের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয় এরূপ স্বীকার কর, হে মহাবাহো, তথাপি তুমি এরূপ শোকাকুল হইতে পার না। কারণ, যে ব্যক্তি জন্মে তাহার মৃত্যু অবধারিত আছে এবং মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্য হয়; অতএব, যে জন্ম মরণের পরিহার নাই, তুমি জ্ঞানবান হইয়া এমত বিষয়ে শোক করণের যোগ্য নহ। শরীর সকল জন্মের পুর্ব্বে অব্যক্ত (—অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন থাকে) তৎপরে কারণ বশতঃ জন্মিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়; পুনশ্চ মরিয়া সেই অব্যক্ত কারণে লয় পায়; অতএব এমন দেহের নাশ নিমিত্ত বিলাপ করা বৃথা।"(১)

কৃষ্ণের এই কথাগুলির মর্ম্ম এই যে, দেহ প্রকৃতি হইতে উদয় হইতেছে এবং পুনরায় প্রকৃতিতেই মিশাইয়া যাইতেছে, আবার উদয় হইতেছে আবার মিশাইতেছে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ মানুষ জন্মিতেছে এবং মরিতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও উদয় ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। জন্মিলেই যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তখন সে মৃত্যুর জন্য শোকাভিভূত হওয়া মূঢ়তা মাত্র। এই সান্ত্বনাবাক্য সচরাচর সকল লোকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এই সান্ত্বনা মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতার উপরই নির্ভর করিতেছে। মানুষ যখন অবশ্য মরিবে, তখন সে মৃত্যুর জন্য খেদ কেন? এই টুকু বলাই কৃষ্ণের অভিপ্রায়। আত্মা যখন থাকিতেছে না, দেহই সর্ব্বস্ব, তখন কৃষ্ণ যেমন পুর্ব্বে আত্মার অমরত্ব হেতু মৃত্যু কিছুই নয় বলিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, সে কথা তেমন আর খাটে না বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন এবং এখন যে সান্ত্বনাবাক্য খাটে মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা বশতঃ শোকের নিষ্ফলতার প্রতি জোর দিয়া সেই সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিলেন। এস্থলে কৃষ্ণের মর্ম্ম স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তিনি এস্থলে যে কোটি উত্থাপিত করিয়াছেন, সে কোটিও পণ্ডিতগণের একটি দার্শনিক মত। কৃষ্ণও সেই দার্শনিক মতের উল্লেখ করিয়াছিলেন। আত্মার অমরত্ব এবং আত্মার বিনাশ এই উভয় মত হইতেই ধনঞ্জয়কে উত্তেজনা করা তাহার স্পষ্ট অভিপ্রায়। টীকাকার শ্রীধরস্বামী এ স্থলের যে অর্থ ঘটান সে অর্থ সুতরাং খাটে না। তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া আত্মার সেই অবিনাশিত্ব আনিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেনঃ—

(১) অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি। ২৬।
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ২৭।
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।
ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

"স্বকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ হেতু জীবাত্মা দেহগামী হইয়া থাকে বলিয়া, হে অর্জ্জুন, যদি আত্মাকে জাত ও মৃত বোধ কর, তাহা হইলেও তোমার শোক করা উচিত নয়।"(১)

স্বামীর অর্থ এখানে নিতান্ত অপ্রযুক্ত বোধ হয়। কারণ আত্মার অমরত্ব হইতেই স্বামীর মত প্রতিপাদিত হয়। সুতরাং উহা আত্মার অমরত্ব মতের অঙ্গস্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে কিন্তু ভিন্ন কোটি গ্রহণ করা যখন কৃষ্ণের স্পষ্ট অভিপ্রায়, তখন স্বামীর টীকা এস্থলে নিতান্ত অপ্রযুক্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

স্বামীর অর্থমত যদি কৃষ্ণের বাক্য রচিত হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণের যুক্তি মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতার উপর স্থাপিত না হইয়া আত্মার অমরত্বের উপরেই স্থাপিত হইত। কারণ, স্বামীর অর্থানুসারে আত্মা নিত্যই রহিয়াছে, কেবল তাঁহার দেহরূপ আশ্রয়ের পরিবর্ত্ত হইতেছে। এ যুক্তি কৃষ্ণ পূর্ব্বেই দিয়া গিয়াছেন (২)। যে যুক্তি তিনি ইতিপূর্ব্বেই একবার দিয়াছেন, সে যুক্তির পুনরুল্লেখ করা কখনই কৃষ্ণের অভিপ্রেত নহে। সুতরাং শ্রীধরের ভাষ্য সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন একবার দার্শনিকদিগের আত্মার অমরত্ব মত হইতে আপন যুক্তিবল দেখাইলেন, আবার অপর দার্শনিকগণের দেহাত্মবাদ (৩) হইতেও অর্জ্জুনকে প্রবৃত্তি দিতে চেষ্টা করিলেন। স্বামীর ব্যাখ্যা গ্রহণীয় হইলে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য পুনরুক্তি দোষে দূষিত হয়। শুদ্ধ তাহাই নহে, শ্রীধর স্পষ্ট কথাকে কিছু ঘুরাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষ্ণোক্তির স্পষ্ট অভিপ্রায় যাহা, আমরা তদনুসারেই তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছি।

স্বামীর ব্যাখ্যা যে শুদ্ধ এই স্থলে অসংলগ্ন এমত নহে; আমরা আরও দুই এক স্থলে তাহার ব্যাখ্যার অসঙ্গতি-দোষ দর্শন করিয়াছি।

---

(১) তদেবমাত্মনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তং ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম তদ্বিনাশে চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ অথ চৈনমিত্যাদি। অথ যদ্যপি এনমাত্মানং নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে তথা তত্তদ্দেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে স্বপুণ্যপাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্মগামিত্বাৎ তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি।২৬।

(২) বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।২২॥
—ভ, ২ অধ্যায়।

(৩) মহর্ষি পঞ্চশিখ জনদেবের নিকট এই দেহাত্মবাদের কথঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ মতের বিবরণ দেন নাই এবং বোধ হয় তাহা জানিতেন না। এই মত খণ্ডন করিতে গিয়া তিনি আত্ম-অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।

—মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব ২১৮ অ।

সে যাহা হউক, আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি, মাধব আত্মার অমরত্ব রূপ দার্শনিক মতের অপব্যবহার করিয়া যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডকে কেমন নিষ্পাপ কার্য্যরূপে প্রতীয়মান করিতে চান। আমাদের সৌভাগ্য এই, ভারতবর্ষে হত্যাকাণ্ড কখন নিষ্পাপ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। কৃষ্ণের এই দুর্নীতির শিক্ষা অগ্রাহ্য হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় জনসমাজ বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীর অন্যত্র দুই একটি জনসমাজে এই দুর্নীতি মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। এই দেখুন:—

"Those who consider the dogma of *Personal Continuance* necessary for the preservation of public morality, may be surprised by a notice contained in the *Systeme de la Nature* (vol. I. P. 280 note 78) and taken from the *Argument du Dialogue de Phedon de la Traduction de Dacier.* It runs thus:—'When the dogma concerning the immortality of the soul spread from the school of Plato through Greece, it caused the greatest confusion, and induced a number of individuals dissatisfied with their lot, to commit suicide. Ptolemœus Philadelphus, king of Egypt, on seeing the effects which this theory produced upon his subjects, forbade its teaching on pain of death.' An analogous event occurred in our days. At the beginning of this century a theistical sect arose in Birman, where Buddhism prevails, which assumed an Almighty and Omnipotent spirit which created the world, and which also taught a species of immortality. The king burned fourteen of these heretics at the stake, and exterminated the sect." (1)

যাহা গ্রীশ এবং মিশরে ঘটিয়াছিল, সৌভাগ্য এই, ভারতে তাহা ঘটে নাই, কি কারণে ঘটে নাই তাহা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু কৃষ্ণ "আত্মার অমরত্ব" মতের যেরূপ প্রয়োগ ভগবদ্‌গীতায় স্পষ্টাভিধানে দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু জনসমাজে যে তাঁহার শিক্ষার কুফল ফলে নাই ইহাই আশ্চর্য্য।

কিন্তু তাঁহার আর একটী উপদেশে অত্যন্ত কুফল ফলিয়াছে দেখিতে পাই। যোগীরা মনের একাগ্রতা সাধন করিবার জন্য প্রথমে বিষয়-বৈরাগ্য অভ্যাস করেন, এই বিষয়-বৈরাগ্য অভ্যাসার্থ তাঁহারা ক্রমে কর্ম্মসন্ন্যাস শিক্ষা করিয়া ত্যাগী ও সন্ন্যাসী হয়েন। "তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ে অনাসক্ত থাকে এবং তাঁহারা অভিসন্ধিপূর্ব্বক কার্য্য করেন না, কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম কিছুই করেন না। যদিও তাঁহারা জীবনধারণের

(1) See a treatise on "Force and Matter" by Dr. Louis Buchner, third English Edition, note to page 244.

জন্য কখন কখন উপযুক্ত কোন কোন কর্ম্ম করেন বটে, তথাপি পাছে সেই কর্ম্ম-জনিত চিত্তে সংসারবীজ আহিত হয়, এবং তজ্জন্য কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, সেই জন্য তাঁহারা যোগ-শাস্ত্রের শিক্ষামত সর্ব্বদা কামনাশূন্য থাকেন; এবং কৃত কর্ম্ম সকল ঈশ্বরের উদ্দেশে পরিত্যাগ করেন।" পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্যপাদে ইহা উক্ত হইয়াছে। যথা:—

"তত্র ধ্যানজমনাশয়ম ।৬।
কর্ম্মাশুক্লকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধ-
মিতরেষাম । ৭ ।

কিন্তু পতঞ্জলি এই সপ্তমসূত্রে ভোগী-দিগের কার্য্যপথ স্বতন্ত্ররূপেও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, যোগীরা এই একাগ্রতাকে দৃঢ় করিবার জন্য সমাধিলাভের উপায়স্বরূপ "ঈশ্বর প্রণিধান" অভ্যাস করেন। চিত্ত স্থির করিবার জন্য "ঈশ্বর-প্রণিধান" একটী মহৎ উপায়। পতঞ্জলি উপদেশ দিয়া-ছেন যে, কায়িক, বাচিক, মানসিক, সকল ব্যাপারই ঈশ্বরের অধীন জ্ঞান করিবে। যখন যে কার্য্য করিবে, ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, সুখের অনুসন্ধান না করিয়া, সমস্ত কার্য্যই সেই পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে। যখন কিছু না করিবে—তখন কেবল তাঁহাকেই ধ্যান করিবে। ইহাকে "ঈশ্বরপ্রণিধান" কহে। ইহা সমাধিলাভের উপায়স্বরূপ। ভগবদ্গীতায় বলে—"ঈশ্বরারাধন দ্বারা বন্ধনহেতু কর্ম্ম সকলের মোক্ষসাধনতা-সম্পাদক চাতুর্য্যই যোগ" (১)। পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপাদের ২৩ সূত্রেও ইহা উক্ত হইয়াছে

"ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা। ২৩।"

আত্মকুলক্ষয়জনিত মহাপাতকভয়ে পার্থকে ভীত দেখিয়া কেশব তাহাকে যোগশাস্ত্রের কর্ম্মযোগ এবং ঈশ্বর-প্রণি-ধানের উপদেশ দিলেন। যুদ্ধ যদি কখন বিধেয় হয়, তবে তাহা আত্মরক্ষা, স্বদেশরক্ষা এবং পীড়ন নিবারণ অথবা ধর্ম্মরক্ষার্থই বিধেয় হইতে পারে। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এরূপ কোন কারণে বিধেয় নহে। তাহা জ্ঞাতিবিবাদ ও গৃহবিচ্ছেদ মাত্র। দুর্জ্জন দুর্য্যোধন এবং কর্ণ প্রভৃতির সহায়তাই ইহার কারণ। দুর্য্যোধনকে কোন মতে নিবারণ অথবা সরাইতে পারিলে এ যুদ্ধ কখনই অনুষ্ঠিত হইত না। জরাসন্ধবধের মত কোন উপায় করিলেই এ যুদ্ধ নিবারিত হইত। কৃষ্ণ এ সকলই জানিতেন। কিন্তু তাঁহার পাপমতি কুরুকুলধ্বংসে প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ছিল। তিনি তজ্জন্য অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কোন বিধেয় উত্তেজনা এ স্থলে অপ্রযুক্ত জানিয়া ধনঞ্জয়ের পাপসংশয় নিরাকর-ণার্থ তাঁহাকে যোগশাস্ত্রের সহায়তা লইতে হইয়াছিল। কিন্তু ধনঞ্জয়ও এমত পাত্র নহেন যে সহজে কৃষ্ণের কথায়

(১) তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু-কৌশলং।৫০।ভ ২ অধ্যায়।

সায় দেন। যোগতন্ত্রটি সমগ্র বুঝিতে না পারিলে তদ্দ্বারা কিরূপে পাপ নিবারিত হইতে পারে, ইহা বুঝা যায় না। এজন্য তিনি কৃষ্ণকে বারংবার প্রশ্ন করিয়া সমুদায় যোগতন্ত্র বুঝিতে লাগিলেন। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, যুদ্ধের প্রাক্কাল রূপ মহাসঙ্কট এবং অধীরতার সময়েও কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সমগ্র যোগ শাস্ত্রের জল্পনা করিতেছেন। এরূপ সময়ে ভগবদ্গীতায় জল্পনা কিছু বিস্তৃত বোধ হইলেও, অর্জ্জুনের পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। কিছু বিস্তৃত করিয়া সমগ্র তন্ত্রটি না বলিলে যোগধর্ম্মে কিরূপে পাপপুণ্যের ফলাফল নিবারিত হয় তাহা বুঝা যায় না। কৃষ্ণকে এজন্য সমুদায় যোগতন্ত্র বুঝাইতে হইয়াছিল। কিন্তু যে অল্প কালমধ্যে এবং যে অল্প কথায় কেশব তাহা বলিয়াছিলেন, তত সংক্ষেপে সমগ্র যোগতন্ত্র সম্যক্‌রূপে বিবৃত হইতে পারে না। এই যোগশাস্ত্র বুঝাইবার সময় কেশবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল, কিসে অর্জ্জুন বোঝেন যে এ যুদ্ধে তাঁহার পাপ জন্মিবে না। এজন্য, তাঁহাকে বার বার ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দিতে হইয়াছিল। এই ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং নিস্পৃহতার উপদেশ ভগবদ্গীতাময় হইয়া আছে। ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক নিস্পৃহ হইয়া কার্য্য করিবার কর্ত্তব্যতা ভগবদ্গীতা এত বাহুল্য এবং বিস্তৃত রূপে শিক্ষা দেয়, যেন লোককে কেবল বিষয়বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্যই তাহা প্রস্তুত হইয়াছে এমত বোধ হইতে থাকে। যাঁহারা ভগবদ্গীতাকে একখানি শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মগ্রন্থরূপে গ্রহণ করিতে যাইবেন তাঁহাদিগের মনে এই দোষাশ্রিত বিষয়বৈরাগ্যরূপ সংস্কার অবশ্যই বদ্ধমূল হইবে। ইহার কুফল এই দাঁড়াইয়াছে, অনেক কৃষ্ণভক্তেরা বৈষ্ণবশ্রেণীরূপে একদল ভিক্ষুকের জাতি জগতে সৃষ্ট হইয়াছে। যে পার্থিব দুঃখ নিবারণার্থ যোগধর্ম্মের সৃষ্টি, সেই দুঃখে কৃষ্ণের যোগোপদেশ মানবগণকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। বৈষ্ণবগণের দুঃখ ও দুর্গতি অনেকদূর ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং বিষয়-বৈরাগ্য জন্য, এবং ভগবদ্গীতার উপদেশ সকল এই অযথা বিষয়বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠা অনেক পরিমাণে শিক্ষা দিয়াছে। কৃষ্ণোপদেশ মত চৈতন্য জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যেখানে যোগধর্ম্মের প্রারম্ভ, সেইখানে বৈষ্ণবেরা শেষ করিয়াছেন। তাঁহারা এক পথে যাইবার জন্য যাত্রী মাত্র সাজিয়াছেন, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত। বাঙ্গালায় চিরদুঃখী এবং ভিক্ষুক বৈষ্ণব-জাতির সৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণ সমাজের কি অনিষ্ট সাধনই না করিয়াছেন! ভগবদ্গীতা কি এই অনিষ্টের অনেকদূর কারণ নহে? ভগবদ্গীতা পাঠে যখন এই রূপ কুফল দাঁড়াইয়াছে, তখন সেই গ্রন্থকল্পনাকে আমরা কখনই ভাল বলিতে পারি না। যদি বল বৈষ্ণবজাতি

-যে শুদ্ধ ভগবদ্গীতা পাঠের ফল একথা কিরূপে জানিলে। তদুত্তরে আমরা বলি, শুদ্ধ তাহারই ফল না হইলেও, তাহা উক্ত সামাজিক অনিষ্টের আংশিক কারণ বলিলেও আমাদের কথা সাব্যস্ত হইল। যাঁহারা তাহাও না স্বীকার করিবেন, তাঁহারা যদি একথাও বলেন যে, ভগবদ্গীতার গ্রন্থকল্পনা ও উপদেশ হইতে সেরূপ অনিষ্ট ঘটিবার অনেক সম্ভাবনা বটে, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল।

প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম অথবা নিষ্কাম ধর্ম্ম মানুষীতে অসম্ভব। কোন কর্ম্ম একেবারে নিষ্কাম হইতে পারে না। যোগধর্ম্মে বিষয়-বাসনায় সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দেয় বটে, কিন্তু আর একটি বাসনা তৎস্থলে আনিয়া দেয়। লোককে জ্ঞানযোগী করিবার জন্য যোগধর্ম্মে কর্ম্মযোগ এবং কর্ম্ম-সন্ন্যাসের উপদেশ দেয়। পরম ব্রহ্মপদ লাভার্থে তাহা বিষয়বাসনা ও কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলে। বিষয়বাসনার স্থলে তাহা ব্রহ্মপদের কামনা প্রবলা করিয়া দেয় মাত্র। নহিলে একেবারে নিষ্কামী হইয়া কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না। এই ব্রহ্মপদের কামনা প্রবলা করিবার জন্য যোগীরা বিষয় হইতে দূরে গিয়া আরণ্যবাস অবলম্বন করেন। সুতরাং তাঁহারা সংসারধর্ম্ম ও সংসার কর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করেন। কি জন্য? আত্মঃতত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী হইবার জন্য, এবং ব্রহ্মপদ পাইবার জন্য। সুতরাং তাঁহারা যাহা ক্ষুদ্র কামনা জ্ঞান করেন, তাহা ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া এক উচ্চ কামনায় মনোনিবেশ করেন। একেবারে নিষ্কামী হয়েন না, একেবারে নিষ্কামী হওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। সুতরাং লোকে যাহা নিষ্কাম কর্ম্ম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম বলে, তাহা এক প্রকার সকাম কর্ম্ম, তাহা সকামেরই বিশেষ শ্রেণী মাত্র। কৃষ্ণও বোধ হয় তাহাই জানিতেন। তিনিও বোধ হয় জানিতেন, অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিবেন তাহাও একপ্রকার সকাম ধর্ম্ম। এই জন্য, তিনি প্রথমে তাহাকে অন্য-বিধ সকাম ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি যুদ্ধে নিহত হইলে স্বর্গলাভ করিবে এবং জয়ী হইলে পৃথিবীলাভ করিবে*। এই প্রকার সকাম ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া, তিনি অন্যবিধ যোগনির্দ্দিষ্ট সকাম ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন।

যে নিষ্কাম ধর্ম্ম ভগবদ্গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা জগতের মঙ্গলের সম্ভাবনা, কি যাহা সকাম ধর্ম্ম রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে তদ্দ্বারা অধিক মঙ্গলের সম্ভাবনা, সে এক স্বতন্ত্র কথা। সমাজের ইষ্ট কি অনিষ্ট দেখিবার জন্য যোগ-ধর্ম্মের সৃষ্টি নহে, সুতরাং তাহা সমাজের

* হতো বা প্রাপ্স্যসে স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।৩৭।
ভ, ২, অ।

প্রতি উদাসীন। নিষ্কামধর্ম্মী সমাজের প্রতি দেখিবেন না, তিনি শুদ্ধ আত্ম লইয়াই ব্যস্ত। তিনি আপনার ইষ্ট-সাধনের জন্য সমাজ ত্যাগ করিয়া বনবাসী হয়েন। এই ঘোর স্বার্থপরতাকে আমরা পবিত্র ধর্ম্ম বলিতে প্রস্তুত নহি। যোগী আপনারাই মোক্ষ জন্য ব্যস্ত, তিনি সমাজের মোক্ষ জন্য নয়ন উন্মীলন করেন না। বিশ্বপ্রেমী হাউয়ার্ড যেরূপ সামাজিক মোক্ষার্থ ব্যস্ত হইয়াছিলেন, হিন্দু যোগী সেরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহিবেন না। এই ঘোর স্বার্থ-পরতার উপদেশকে পরম পবিত্র ধর্ম্ম বলা হয়, এবং এই উপধর্ম্মের উপদেষ্টা শ্রীমান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। অথচ, লোকে বলেন "যদি কেহ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-কার।"

কিন্তু এ কথা বলিতে পার যে, যে যোগধর্ম্ম সমাজের ইষ্ট সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই, সে ধর্ম্মকে সে নিকষে পরীক্ষা করা অন্যায়। যোগধর্ম্ম প্রতি জীবাত্মার এক বিশেষ প্রকার অবস্থালাভের উপায় মাত্র। ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের জন্য যোগতন্ত্রের সৃষ্টি। যাহার যাহা উদ্দেশ্য নহে, সে উদ্দেশ্য ধরিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিলে কাজেই তাহা দূষিত বলিয়া প্রতীত হইবে।—একথা আমরা স্বীকার করি, এজন্য আমরা প্রস্তাবান্তরে বিচার করিব—যোগধর্ম্ম ব্যক্তিগত মোক্ষ-লাভের কিরূপ সাধন ও উপায়।

কিন্তু ভোগীদিগের ধর্ম্ম এরূপ সঙ্কীর্ণ নহে। যোগীদিগের লক্ষ্য দুঃখনিবারণ, ভোগীদিগেরও লক্ষ্য দুঃখনিবারণ, কিন্তু ভোগীরা শুদ্ধ দুঃখ নিবারণে তৎপর নহে, তাঁহারা সুখের সম্যক্ বৃদ্ধির জন্যও একান্ত ব্যস্ত। তাঁহারা আপনার সুখ বর্দ্ধনার্থ তৎপর,—দেখেন সেই সুখের সহিত আত্ম পরিবার, প্রতিবেশী, স্বদেশীয় লোকসমাজ, এমত কি, সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলী জড়িত রহিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর সুখের উপর তাঁহার সুখ নির্ভর করিতেছে। এজন্য তাঁহারা মানবজাতির জন্য কাঁদেন এবং সকলেরই জন্য হৃদয় প্রসারিত করেন। যোগী-দিগের ন্যায় তাহাদের হৃদয়-প্রস্রবণ নিরুদ্ধ নহে। সে প্রস্রবণের শান্তিবারি সমস্ত পৃথিবীতে সঞ্চারিত হইতে চায়। কিন্তু যোগীরা দুঃখ নিবারণে ব্রতী হইয়া তিল তিল করিয়া ঘোর দুঃখে নিমজ্জিত হয়েন,—তিল তিল করিয়া আপনাকে মারিতে থাকেন। পতঞ্জলি কহিয়াছেনঃ—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

এই চিত্তনিরোধ অভ্যাস করিবার জন্য যোগীকে হৃদয় ও চিত্তের সমস্ত বৃত্তির বিনাশসাধন করিতে হয়। তাঁহাকে হৃদয়ের সমস্ত উৎস বিশুষ্ক ও নিরুদ্ধ করিতে হয়। তাঁহাকে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তলয় সাধন

করিয়া আনিতে হয়। চিত্তলয় হইলে কেবল চিৎ-মাত্র থাকে। এইরূপ চিৎ-মাত্রে মনকে পরিণত না করিতে পারিলে তাঁহার কৈবল্য লাভ হয় না। যোগী এই-রূপে আপনাকে হত্যা করেন। এই ঘোর আত্মহত্যার নাম যোগধর্ম্ম। এই যোগধর্ম্ম যত শীঘ্র পৃথিবী হইতে একেবারে উঠিয়া যায় ততই পৃথিবীর মঙ্গল। ইহার উপদেশ সকল যত শীঘ্র বিলোপ হয়, ততই মানবজাতির মঙ্গল।

যোগীরা যে কর্ম্মফল পরিত্যাগী হইয়া কর্ম্ম পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ জড়-পিণ্ডবৎ হয়েন, সে কর্ম্মফলের হাত হইতে মুক্ত হওয়া কাহারই সাধ্য নহে। যোগীদিগেরও কর্ম্মফল পৃথিবীতে ফলিয়াছে। পৃথিবীতে যদি কিছু থাকে, তাহা কর্ম্মফল। কর্ম্মফল নিবারণ করা কাহারও সাধ্য নহে। এজন্য ভোগীরা কর্ম্মফলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তাঁহারা এই কর্ম্মফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমাজে স্বর্গসুখ সঞ্চারিত করিতে প্রবৃত্ত হন। নরকযন্ত্রণার প্রতি লোকের দৃষ্টি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাঁহারা সামাজিক পাপের দমন করেন। যোগীরা সমাজ-ত্যাগী ঘোর পাপে লিপ্ত হয়েন, ভোগীরা সমাজের কর্ত্তব্যসাধনে আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। যোগীদিগের ঈশ্বরোপাসনা নিভৃত অরণ্যে, ভোগী-দিগের ঈশ্বরোপাসনা লোকসমাজের ঘোর কর্ম্মক্ষেত্রে। ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে, "যোগী ব্যক্তি একাকী নির্জনে নিরন্তর অবস্থান এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃকরণ ও দেহ বশীভূত করিয়া চিত্তকে সমাধান করিবেন।" (১) যে লোকসমাজে সর্ব্ব লোকেরই কর্ম্মফল ফলিতেছে, সেই লোকসমাজকে শুভ কর্ম্মফল দ্বারা পরি-পূর্ণ করিয়া ভোগীরা সুখী হইতে চাহেন। কর্ম্মফল লইয়াই সংসার ও জগৎ, উন্নতি ও অবনতি, সুখ ও দুঃখ। সেই কর্ম্ম-ফলের প্রতি উদাসীন হওয়া, আর সমস্ত সংসার বিনাশ করিতে যাওয়া সমান কথা। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের কর্ম্মফল আজি আমরা ভোগ করিতেছি। তাঁহারা ভারতকে উৎসন্ন দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মহা-পাতকে আমরা শাস্তি পাইতেছি। পূর্ব্ব কালের কর্ম্মফলে আজি ভারত পতিত। আবার আমাদিগের কর্ম্মফল ভবিষ্য পুরুষে সম্ভোগ করিবে। আমরা যদি কর্ম্মফলের প্রতি উদাসীন হই, তবে আমরা আরও ভারতকে উৎসন্ন দিব। যে ধর্ম্মে বলে, কর্ম্মফলের প্রতি উদাসীন হইয়া কার্য্য কর, সে ধর্ম্ম আজি আমা-দিগের উপযুক্ত নহে। আজি ভগবদ্গীতার উপদেশ এদেশে উপযোগী নহে। কারণ, এক্ষণে আমাদিগকে কর্ম্মফলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে।

(১) যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং
রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীর-
পরিগ্রহঃ ।১০।
—ভ, ৬, অ।

আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি, যে ব্যক্তি ভোগীদিগের ধর্ম্মপথ উপদেশ দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তিনি কিরূপে এক মুখে মানবের সুখবৃদ্ধির জন্য উপদেশ দিয়া বলিলেন, "যদি কেহ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার।" আমরা দেখিতে পাই, তিনি মনুষ্যের যে সম্পূর্ণ উন্নতির উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে উপদেশের সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশের সামঞ্জস্য নাই। ভগবদ্গীতার উপদেশ অনেক কলুষিত মতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণ অনেক ভাল বিষয়কে মন্দ অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিয়া দুর্নীতির শিক্ষা দিয়াছেন। আত্মার অমরত্ব মতের অযথা বিনিয়োগ দ্বারা তিনি কিরূপ দুর্নীতির শিক্ষা দিয়াছেন তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে আর একটী দৃষ্টান্ত দিই।

মহাত্মা পার্থের হৃদয় পাপসংশয়ারূঢ় দেখিয়া কুচক্রী চক্রপাণি, সেই সংশয় নিরসনার্থ তাঁহাকে যোগধর্ম্মের মোক্ষলাভের উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন এই মোক্ষ লাভ করিতে পারিলে তাঁহাকে পাপতাপের ফলভোগী হইতে হইবে না। সেই মোক্ষের উপায় আত্মতত্ত্বজ্ঞানমূলক সোহং জ্ঞান। কর্ম্মসন্ন্যাস অথবা কর্ম্মত্যাগ হইতে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে। কর্ম্ম সন্ন্যাসের উপায় কর্ম্মযোগ। তিনি এক স্থলে সংক্ষেপে তাহা এই রূপে বলিলেন "পণ্ডিতেরা যাঁহা সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই যোগ; অতএব কর্ম্মফল পরিত্যাগ না করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না। যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁহার সহায়, আর যিনি তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন, কর্ম্ম ত্যাগই তাঁহার সহায়।"(১) অন্যত্র "পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না; এবং জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।"(২) আর এক স্থলে বলিতেছেন :—

"কিন্তু কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস দুঃখ প্রাপ্তির কারণ; কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া অচিরাৎ ব্রহ্মলাভ করেন।" (৩)

এক্ষণে বোধ হয় প্রতীত হইতেছে যে,

(১) যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
নহ্যসন্ন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন। ২।
ভ. ৬, অ।

(২) ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
নচ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি। ৪।
ভ, ৩, অ।

(৩) সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি।৬।
ভ, ৫, অ।

যে যোগশাস্ত্রে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগ কাহাকে বলে তাহা ভগবদ্গীতায় বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে। পতঞ্জলি সাধন পাদে কর্ম্মযোগের এইরূপ সূত্র করিয়াছেন :—

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ।১।

তপস্যা, স্বাধ্যায়, ও ঈশ্বর-প্রণিধান, এই তিন প্রকার ক্রিয়ার নাম ক্রিয়াযোগ। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যোগশাস্ত্রোক্ত ব্রত নিয়মাদি অনুষ্ঠান করার নাম তপস্যা, প্রণব প্রভৃতি ঈশ্বরবাচক শব্দের জপ এবং আধ্যাত্ম-তত্ত্বের মর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকার নাম স্বাধ্যায় এবং ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইয়া কার্য্য করার নাম ঈশ্বর-প্রণিধান। ভগবদ্গীতায় কহে:—

"এই কর্ম্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মুমুক্ষু ব্যক্তি আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করে।"(১)

এই আত্মজ্ঞান লাভ করিলে কি হইবে তাহা ভগবদ্গীতায় সর্ব্বপাপহারী মধুসূদন এইরূপ বলিতেছেন :—

"হে পাণ্ডব, আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আর বন্ধুবধ ভাবিয়া মোহিত হইবে না। এবং ঐ জ্ঞান দ্বারা মায়ানির্ম্মিত পুত্র-মিত্রাদিকে এক দেখিয়া পরমাত্মারূপ আমাতে আত্মারে অভিন্ন দেখিবে। যদি তুমি সকল পাপকারী হইতেও অধিক পাপিষ্ঠ হও তথাপি জ্ঞানরূপ নৌকারোহণ করিলে পাপ সমুদ্র হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাইবে।"(২)

সর্ব্বপাপহারী হরি অর্জ্জুনের পাপ-সংশয় এই রূপে নিরসন করিলেন। তাঁহার যুক্তি সংক্ষেপে বিন্যস্ত করিলে এইরূপ হয়।

হে পার্থ, তুমি আত্মজ্ঞানলাভার্থী মুমুক্ষু হও। তজ্জন্য তোমাকে কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের অভ্যাস করিতে হইবে। সেই কর্ম্মযোগ অভ্যাসার্থ তোমাকে এক্ষণে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে হইবে। ব্রহ্মনিষ্ঠার নিদান স্বরূপ কর্ম্মফলত্যাগী হইয়া নিষ্কামী হইতে হইবে। কর্ম্ম-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্পৃহ চিত্তে তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার কোন পাতক থাকিবে না। হরি পাপহরণের এই চমৎকার উপায় দেখাইয়া দিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে যোগাভ্যাসের যে প্রথম সোপান দেখাইয়া দিলেন তজ্জন্যই তাঁহার সর্ব্বপাপহারী নামের এত গৌরব। তাঁহার যুক্তির

(১) নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ।৩৮।

(২) যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ।৩৫।
অপিচেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ-কৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্ত-রিস্যসি ।৩৬।
ভ, ৪, অ

মর্ম্ম এই, হে মহাবাহো, এই যুদ্ধই তোমার যোগাভ্যাসের প্রথম সোপান। তুমি নিষ্কামী হইয়া আত্মীয় স্বজন, পিতৃকুল, মাতৃকুল, গুরু প্রভৃতি সকলকেই হত্যা করিয়া যোগাভ্যাস শিক্ষা কর। তাহা হইলেই তোমার যোগাভ্যাস হইবে অথচ পিতৃহত্যা, গুরুহত্যা প্রভৃতি মহাপাতক তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। পাপ হরণের কি চমৎকার বটিকা! যোগাভ্যাসের কি চূড়ান্ত উপায়! এরূপ উপায় না দেখাইয়া দিলে কৃষ্ণকে লোকে কেন সর্ব্বপাপহারী হরি বলিবে? নিস্পৃহ ও নিষ্কামী হইয়া হাজার হাজার লোক, এবং সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিলেই যোগাভ্যাস আরব্ধ হইবে। যোগাভ্যাসের এই চূড়ান্ত উপায় দেখাইয়া দিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিষ্কাম ও নিষ্পাপ হইতে বলিলেন। কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় এই চমৎকার নিষ্কাম ধর্ম্ম, ও যোগাভ্যাস শিক্ষা দিয়াছেন। যে গ্রন্থে এরূপ ধর্ম্মের উপদেশ আছে, সে গ্রন্থে কি ধর্ম্মের পূর্ণাবয়ব প্রকাশিত করে? যিনি ঘোর অধর্ম্মকে এইরূপে নিষ্পাপ ধর্ম্মরূপে প্রতীয়মান করিতে পারেন, তিনি যথার্থই সর্ব্বপাপহারী হরি নামের যোগ্যপাত্র বটে! যিনি ধর্ম্মোপদেশকে এইরূপ কুশিক্ষায় বিনিয়োগ করিতে পারেন তিনি কেননা মনুষ্যলোকের পাপ হরণ করিতে সমর্থ হইবেন!

এই সর্ব্বপাপহারী হরি অর্জ্জুনকে এইরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্মরণ নাই যে, যে যোগধর্ম্মের আমি উপদেশ দিতেছি, সেই যোগধর্ম্ম যুদ্ধাদি ব্যাপারের প্রতিকূল। কৃষ্ণ যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিবার কালে এক স্থলে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন:—"হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠান করে, যে আমার ভক্ত, ও একান্ত অনুরক্ত, যে পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারের প্রতি আশক্তিরহিত ও নির্ম্মম, যাহার কাহার সহিত বিরোধ নাই, এবং আমিই যাঁহার পরম পুরুষার্থ, সেই ব্যক্তিই আমারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"(১) যোগের উপদেশ এই প্রকার বটে, কিন্তু কৃষ্ণ কেমন কুযুক্তি বলে সেই যোগ ধর্ম্মকেই যুদ্ধের প্রবৃত্তিসাধক করিয়া তুলিলেন, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। পাপমতি দুর্ব্বুদ্ধি এইরূপে ধর্ম্মের শান্তিভাবকেও ঘোর অধর্ম্ম এবং অশান্তি পথে নিয়োগ করিয়া লন।

কুচক্রী চক্রপাণি অর্জ্জুনের কেমন সাত্বিক ভাবকে কলুষিত করিয়া আনিতেছেন দেখুন। যুদ্ধক্ষেত্রসমাগত কুরুপক্ষীয়গণকে অবলোকন করিবামাত্র তাঁহার মন কেমন অলৌকিক সাত্বিকভাবে

---

(১) মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু য সমামেতি পাণ্ডব।৫৫।
ভ, ১১, অ।

উদ্বোধিত হইল! সে ভাব দেবদুর্ল্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সে ভাবের মহত্ত্ব কি অধর্ম্মরত শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারেন? কিরীটী কহিয়াছিলেনঃ—

"হে কেশব, এই সমস্ত আত্মীয়গণকে নিহত করা আমার শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে না। সংগ্রামে ইহাঁদিগকে বিনাশ করিয়া উত্তম ফল কি হইবে, তাহা দেখি না। আমি আর জয়, রাজ্য ও সুখের আকাঙ্ক্ষা করি না। যাহাদিগের নিমিত্ত রাজ্য, ভোগ, ও সুখের কামনা করিতে হয়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, প্রভৃতি সকলেই এই যুদ্ধে জীবন ও ধন পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তবে আমাদিগের আর রাজ্য ধন ও জীবনে প্রয়োজন কি! ইহাঁরা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি ইহাঁদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না; পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রৈলোক্য লাভ হইলেও আমি ইহাঁদিগকে বধ করিতে বাসনা করি না। ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত করিলে আমাদিগের কি প্রীতি হইবে? এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকেই পাপভাগী হইতে হইবে। অতএব আমাদিগের বান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। হে মাধব! আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া আমরা কি সুখী হইব? ইহাঁদিগের চিত্ত লোভ দ্বারা অভিভূত হইয়াছে বলিয়া, ইহাঁরাই যেন কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতক দেখিতেছেন না; কিন্তু আমরা কুলক্ষয়ের দোষ দর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত এই পাপবুদ্ধি হইতে নিবৃত্ত হইব না! কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে সমস্ত কুল অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; কুল অধর্ম্মপূর্ণ হইলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারদোষে দূষিত হয়। কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর সমুৎপন্ন হয়। * * শুনিয়াছি কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে মনুষ্যগণকে চিরকাল নরকে বাস করিতে হয়। হা! কি কষ্ট! আমরা এই মহাপাপের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছি! আমি প্রতিকারপরাঙ্মুখ ও শস্ত্রহীন হইলে যদি রাজ্যসুখলোভে স্বজনবিনাশসমুদ্যত শস্ত্রপাণি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমারে বিনাশ করে, তাহাও আমার কল্যাণকর হইবে। * * *

আমি কি প্রকারে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত শরজাল দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব। মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া, যদি ইহলোকে ভিক্ষান্নভোজন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। কিন্তু ইহাঁদিগকে বধ করিলে ইহকালেই রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে। ফলতঃ এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টির গৌরব অধিক তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না; কেননা, যাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আমরা স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ

করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে সমুপস্থিত!”

অর্জ্জুনের এই দেবোচিত সাত্ত্বিক ভাবকে কৃষ্ণ কিরূপে বিনাশ করিতেছেন, কিরূপ কুযুক্তি প্রভাবে তাহা কলুষিত করিয়া অনর্থসাধন করিতেছেন, তাহা দেখিলে তাঁহাকে একজন ঘোর অধর্ম্মরত ভয়ঙ্কর লোক বলিয়াই প্রতীত হয়। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণের এই ভয়ঙ্কর কার্য্যের পরিচয় আছে। বাস্তবিক দ্বৈপায়ন বাসুদেবকে যেপ্রকার ভয়ঙ্কর কুচক্রী, ধূর্ত্ত কৌশলী, দুর্জ্জনরূপে কাব্য-কল্পনা মধ্যে সাজাইয়াছেন, ভগবদ্গীতা সেই দুর্জ্জনের উপযুক্ত পরিচায়ক গ্রন্থ বটে। মহাভারতের কাব্য কল্পনা পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা প্রতীত হয়। দ্বৈপায়ন মহাভারতে দুই বিপক্ষ পক্ষ সাজাইয়াছেন। একপক্ষে পাপাত্মা দুর্য্যোধন,—শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতির মন্ত্রণায় দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সৎপরামর্শদাতা পরমধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, গান্ধারী প্রভৃতি মহাত্মাগণ। এদিকে দেখা যায়, পাপ ধর্ম্মের পরামর্শ অবজ্ঞা করিয়া কি দুষ্ক্রিয়াই না করিতেছে। পাপ আত্মগণের দুরভিসন্ধি প্রভাবে, শুদ্ধ যে ধর্ম্মের পরামর্শ ভাসিয়া যাইতেছে এমত নহে স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তাহার কুচক্রে পড়িয়া সমস্ত রাজ্য, ধন হারাইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। পৃথিবীতে এই রূপই ঘটে বটে। ধর্ম্ম যদি দুর্য্যোধনের বিপক্ষে বরাবর দাঁড়াইত, তাহা হইলে এইরূপ পরাজয় তাহার বরাবর হইত। অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতি মহাত্মাগণ —যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া কখনই দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিতে পারিতেন না। তাঁহারা হয় ত মূলেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু তাহা হইলে মহাভারতের কাব্য-কল্পনা সফল হয় না—এই মহাকাব্য একটি বৃহৎ কার্য্য বিরচিত হয়। সেই কার্য্য ঘটাইবার জন্য, ধর্ম্মপক্ষে একজন ভয়ঙ্কর লোকের যোজনা করা দ্বৈপায়নের আবশ্যক হইয়াছিল। সেই দুর্জ্জনকে তিনি গোড়া হইতেই একটু একটু দেখাইতেছিলেন। আমরা দেখিতে পাই, শয়তান যেমন ইডেন উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণও তেমনি চৌর্য্য ভাবে জরাসন্ধভবনে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বধ করাইলেন। তিনি সামান্য অপরাধে শিশুপালকে রাগান্ধ হইয়া হত্যা করিলেন। এই কৃষ্ণ, প্রথম হইতেই পাণ্ডব অনুরাগী ছিলেন। কবি যে তাহাকে ক্রমে পাণ্ডব পক্ষে যোজনা করিয়া দিয়া দুই পক্ষকে সমান করিয়া দিবেন, তাহার চিহ্ন পূর্ব্ব হইতেই দেখা যাইতেছিল। কিন্তু প্রথমেই কেশবকে পাণ্ডব পক্ষে যোজনা করিতে পারেন নাই। তিনি একবার দেখাইতে চান, ধর্ম্ম যদি শুদ্ধ একাকী অধর্ম্মের বিপক্ষে দুরভিসন্ধিতে পড়েন, তবে তাঁহার

কতদূর পার্থিব অমঙ্গল ঘটিতে পারে। পঞ্চপাণ্ডব প্রথমে একাকী থাকিয়া ইহা প্রতীয়মান করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মকে এরূপ একাকী রাখিলে মহাকাব্য-সমুচিত যুদ্ধ বিগ্রহ ব্যাপার সংঘটিত হয় না। নির্ম্মল স্বর্ণে কোন অলঙ্কার প্রস্তুত হয় না। এজন্য, এ পক্ষকে পাপাশ্রয় দিয়া বলবান করা আবশ্যক হইল। আগেই, সেই পাপমূর্ত্তিকে গড়িয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পাপ কখন নিজরূপে ধর্ম্মের পক্ষে মিশিতে পারে না। এজন্য দ্বৈপায়ন বাছিয়া বাছিয়া একজন দেবনামধারী দুর্জ্জনকে বাহির করিয়াছিলেন। ঘোর পাপীর ছদ্মবেশ ধর্ম্মের পরিচ্ছদ। সেই ধর্ম্মের পরিচ্ছদে এবং দেবনামে পরিপূত করিয়া কালসর্পকে ধর্ম্মপক্ষে কবি আশ্রিত করিয়া দিলেন। ধর্ম্মের নামে, দেবতার নামে; পাপ ধর্ম্মপক্ষ আশ্রয় করিল। দুর্জ্জন দুর্য্যোধনের পক্ষকে পরাজিত করাইতে হইলে একজন এরূপ লোক চাই, যিনি পাপ পন্থায় তাহাদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন। সেই দুর্জ্জন, কালস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারতের কাব্য-কল্পনায় আমরা দেখিতে পাই, এক দিকে পাপের মন্ত্রী ধর্ম্ম, অন্য দিকে ধর্ম্মের মন্ত্রী পাপ। এক দিকে পাপের অনুষ্ঠান, অন্য দিকে পাপের মন্ত্রণা। এক দিকে পাপ কার্য্য করিতেছে, এবং তাহার কাছে ধর্ম্মের পরামর্শ ভাসিয়া যাইতেছে; অন্য দিকে পাপ, ধর্ম্মকে আস্তে আস্তে নিজ মন্ত্রণা-জালে আবদ্ধ করিয়া কলুষিত করিয়া আনিতেছে। ইহার ফল যুদ্ধ ও সর্ব্বনাশ। মহাভারতে এই কাব্য-কল্পনা বিন্যস্ত হইয়াছে। দ্বৈপায়ন কৃষ্ণকে এইরূপে সাজাইয়াছেন(১)। ভগবদ্গীতায়

(১) এক্ষণে কেহ কেহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ-চরিত্রকে শ্বেতরূপে প্রতীয়মান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। "প্রচারে" তাহার প্রথম প্রয়াস দেখা গিয়াছে। উদ্যোগী ভবিষ্যতে কতদূর সফল হয়েন বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহার প্রথম উদ্যম সফল হয় নাই। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণচরিত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সেরূপ ব্যাখ্যা আমাদিগের মনোনীত হইল না। আমরা কৃষ্ণের ধর্ম্মবুদ্ধি না দেখিতে পাইয়া রাজসভায় সমবেত যে ভূপালগণের ধর্ম্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণ বিবাদ মিটাইয়াছিলেন, আমরা সেই ভূপালগণেরই ধর্ম্মবুদ্ধি দেখিতে পাই। এস্থলে কৃষ্ণের কৌশলেরই পরিচয় হয়। তিনি দেখিলেন ভূপালগণ যেরূপ ক্রোধান্ধ হইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদিগের রাগের কতকদূর প্রশমন না হইলে বিবাদ মিটিবে না। এ জন্য, প্রথমে তিনি ভীমার্জ্জুনের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ হইতে দিলেন। তাঁহারা পরাজিত ও অবমানিত হইয়া যখন কিরূপে সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন, তাহার পন্থা দেখিতেছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে আক্রোশ করিতে ছাড়েন নাই, কৃষ্ণ তখন মীমাংসার উপযুক্ত অবসর বুঝিলেন। বুঝিলেন এ সময়ে একটা কথা বলিলেই রাজগণ মানে মানে নিষ্ক্রান্ত হন। তখন তিনি আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞানুসারে

আমরা দেখিতে পাই, সেই কৃষ্ণ মহাত্মা কিরীটীর সাত্ত্বিক ভাবকে কেমন কুমন্ত্রণা প্রভাবে বিনষ্ট করিতেছেন। ধর্ম্মের পবিত্র উপদেশ সকল কৃষ্ণ কেমন অধর্ম্মের উপযোগী করিয়া আনিতেছেন। তিনি ধর্ম্মের নাম ধরিয়া কেমন অধর্ম্মের দুর্নীতি শিক্ষা দিতেছেন। সেই দাম্ভিকের প্রতিমূর্ত্তি কেমন স্বয়ং নারায়ণ সাজিয়া, দুর্নীতির প্ররোচনা-বাক্যে অর্জ্জুনের মন পাপপথে আকর্ষণ করিতেছেন। আমরা মিল্টনের Paradise Lost নামক মহাকাব্যে দেখিতে পাই, শয়তান বকরূপধারী হইয়া পবিত্র ইডেন উদ্যানস্থ জীবন বৃক্ষে বসিয়া ছিলেন! নারায়ণনামধারী কৃষ্ণ এই রূপে ধর্ম্মপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কি অনর্থই না ঘটাইতেছেন। এইরূপ লোককে পাইয়াই কবি উল্লাসে বলিয়া উঠিয়াছিলেনঃ—

"জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাম যেষাম্ পক্ষে
জনার্দ্দনঃ।"

ভগবদ্গীতা সেই জনার্দ্দনের পরিচায়ক গ্রন্থ। লোকে যাঁহাকে ভগবান বলে, প্রকৃত পক্ষে সেই ভগবান কিরূপ লোক ছিলেন, তাহা মহাজ্ঞানী দ্বৈপায়ন বিলক্ষণ চিনিয়াছিলেন। ভগবদ্গীতা সেই ভগবানেরই পরিচয় দিতেছে। তাঁহার মন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র সকল কিরূপ পাপ-কলুষিত, ভগবদ্গীতা তাহা প্রতিপাদন করিতেছে।

শ্রীপূর্ণ—

সমর-শেখর।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নারায়ণস্বামী গিরিবালার উদ্দেশ পাইয়া তাহার উদ্ধারার্থ লোক পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। গুর্জ্জরোপকূলে পর্ত্তুগিজ রণতরি শৈবী সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে যে সকল পর্ত্তুগিজ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল; তাহাদিগের মধ্যে একজন সুদক্ষ ব্যক্তি উক্ত সঙ্কটময় ব্যাপারে নিযুক্ত হইল। তাহার নাম লোরেঞ্জো। লোরেঞ্জো পর্ত্তুগিজ, সুতরাং মাতৃভাষায় তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। নারায়ণ স্বামী দেখিলেন যে, তাহাকে দেখিলে

ন্যায় মতে দ্রোপদীকে লাভ করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের সহিত শত্রুতা করা অন্যায়। এই কথা বলিবা মাত্র সকলে চলিয়া গেল। কৃষ্ণ জানিতেন, সমবেত রাজগণের ধর্ম্মবুদ্ধি এত প্রবল, যে সেই ধর্ম্মবুদ্ধিকে একবার উদ্বোধিত করিয়া দিলেই সকল বিবাদ মিটিয়া যায়। তিনি কৌশল করিয়া তাহাই করিলেন। এ স্থলে কৃষ্ণের ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় কোথায়?

গোয়া নগরীতে কেহই অবিশ্বাস করিবে না। তিনি তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন; এক্ষণে তাহাকেই সেই অভিজ্ঞান দিয়া গোয়া-দুর্গে প্রেরণ করিলেন। যে প্রদেশে ষটচক্র অবস্থিত, তথা হইতে গোয়া প্রায় একশত ক্রোশ দূর। পথ অতি দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল; প্রায় পদে পদে দস্যু-দিগের হস্তে পতিত হইতে হইত। দ্রুতগামী অশ্বারোহণে গমন করিলেও এক পক্ষের পূর্ব্বে গোয়াতে পৌছিবার উপায় নাই। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথ বরং সুগম। সেই জন্য নারায়ণস্বামী লোরেঞ্জোকে জলপথেই প্রেরণ করি-লেন। একখানি সওদাগরী নৌকা নির্দ্ধারিত হইল। লোরেঞ্জো সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া গোয়া নগরীর অভি-মুখে অগ্রসর হইলেন।

নৌকা এক সপ্তাহের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে গোয়ার উপকূলে উপস্থিত হইল। তরণী হইতে অবতীর্ণ হইয়াই সে দুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহার সর্ব্ব স্থলই পরিচিত; সুতরাং কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। দুর্গ সাগরের উপকূলেই স্থাপিত, কিন্তু তাহার পার্শ্বে নৌকা লাগাইবার হুকুম নাই; সেই জন্য লোরেঞ্জো নগরের সদর ঘাটে তরণী সংলগ্ন করিয়া তীরে অবরোহণ করিল এবং মাজির কাণে কাণে কি বলিয়া দ্রুতপদে নগরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। মাজি নঙ্গর তুলিয়া পাল উঠাইয়া সমুদ্রবক্ষে আবার তরণী ভাসাইয়া দিল।

নগরের প্রকাশ্য রথ্যা দিয়া লোরেঞ্জো ত্বরিত পদে গমন করিতে লাগিল; কেহ তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না; কেবল একজন হাবশি তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল "কি সাহেবের সাদি হইবে নাকি?" "হাঁ, তোমার ফুফুর সঙ্গে" বলিয়া পর্ত্তুগিজ শৈব দ্রুতপদে চলিয়া গেল। হাবশি "হারামজাদ" বলিয়া বিকট ভ্রূকুটি সহকারে ফিরিয়া দেখিল, কিন্তু লোরেঞ্জোকে আর দেখিতে পাইল না। লোরেঞ্জো তখন একটা বক্র পথে প্রবেশ করিয়াছে।

লোরেঞ্জো একটা হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া সেই দিবস অপরাহ্ণ বেলা চারিটার সময় গোয়া-দুর্গে প্রবেশ করিল। পর্ত্তুগিজ দল যে, ষট্‌চক্র আক্রমণ করিতে যাইয়া নির্ম্মূল হইয়াছে, তাহা গোয়াধ্যক্ষ তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি শৈবী সেনাকে কয়েকটা দস্যু মনে করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতেছেন। লোরেঞ্জো দুর্গের প্রথম দ্বারে উপস্থিত হইল; দ্বাররক্ষক একবার মাত্র তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া সদর্পে গম্ভীর বদনে পাদচারণ করিতে লাগিল। লোরেঞ্জো ঈষৎ হাসিয়া নির্ভয়ে দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে ক্রমে তিনটী দ্বার অতিক্রম করিয়া সে আর একটী দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। অমনি তত্রত্য

প্রহরী ভ্রুকুটি করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; লোরেঞ্জো নির্ভয় হৃদয়ে নিজ শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। প্রহরী সেই টুপীর নম্বর দেখিল। তাহার মুখমণ্ডল ঈষৎ ফুল্ল হইয়া উঠিল; সে লোরেঞ্জোকে জিজ্ঞাসা করিল "খিশু মেরিয়া! তুমি এতদিনে ডাকাইতের হাত এড়াইয়া আসিলে? খবর কি?" লোরেঞ্জোর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। সে বলিল "খবর বড় মন্দ; আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে হিন্দুরা গোয়া আক্রমণ করিবে।" প্রহরী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; লোরেঞ্জো দ্রুতপদে অভ্যন্তরস্থ অঙ্গন মধ্যে প্রবেশ করিল।

সেই অঙ্গনের অপর প্রান্তে প্রাসাদ। প্রাসাদের দুইটি দ্বার। এক দ্বারে প্রবেশ করিলে লাট সাহেবের বাড়ী পাওয়া যায়, অপরটী দিয়া রমেশের বাসভবনে যাইতে হয়। লোরেঞ্জো এই শেষোক্ত দ্বারপথে যাইয়া উপস্থিত হইল। দ্বারস্থ প্রহরী তাহাকে বাধা দেওয়াতে সে সেই অঙ্গুরীয়টী দেখাইল। প্রহরী তীব্র নয়নে লোরেঞ্জোর মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল; পরে গম্ভীর বিষাদ সহকারে বলিল "স্বর্গীয় পক্ষী স্বর্গে পলাইয়াছে।"

লোরেঞ্জো বজ্রাহতপ্রায় স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইল। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, সে চারিদিক অন্ধকারময় দেখিল; এবং অল্পকাল মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি বলিলে, ভাই, গিরিবালা মরিয়াছে?—আপনি মরিল, না কেহ হত্যা করিল? হায় হায়—কি শুনিলাম!"

প্রহরী কাঁদিয়া ফেলিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আহা! মা যেন আমার সাক্ষাৎ মেরি; এমন রূপ, এমন গুণ কোথাও কখন দেখি নাই। বনের স্বর্ণলতা আশ্রয়তরু কখনও পাইলেন না; চিরজীবন কেবল বিপদেই গেল! হা দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য!" সে অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

লোরেঞ্জো জিজ্ঞাসা করিল "ভাই! তিনি কি আপনি মরিলেন, না কেউ মারিয়া ফেলিল?"

প্রহ। "কিসে যে তাঁহার মৃত্যু হইল, তাহা স্থির করা যায় না; কেউ বলে তিনি আপনি গলায় ছুরি দিয়াছেন; কেউ বলে তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছে; ফলতঃ ঠিক যে কি হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।"

লোরে। "তবু দেখিলে কি বোধ হয়?"

প্রহ। "দেখিলে বোধ হয় তাঁহাকে কোন ব্যক্তি হত্যা করিয়াছে। কিন্তু খুনী কে, তাহা আজিও কেহ ঠিক করিতে পারে নাই।"

লোরে। "কবে এ ঘটনা হইয়াছে?"

প্রহ। "আজি চারি দিবস হইল।"

লোরে। "লাস কোথায়? একবার কি দেখিতে পাইব না?"

প্রহ। "লাস জ্বালাইয়া ফেলিয়াছে; কাহাকেও দেখিতে দেয় নাই।"

লোরেঞ্জো বিস্মিত হইয়া বলিল "সেকি! খুনের তদন্ত না হইলে লাস জ্বালান হইল কেন?"

প্রহ।"লাট সাহেবের হুকুম? তাঁহার কন্যার অনুরোধে তিনি এরূপ কাজ করিয়াছেন।"

লোরেঞ্জোর নয়ন যুগল হইতে উৎকট আভা নিঃসৃত হইল। অধর দংশন করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "লাট সাহেবের দুহিতা! থেরিসা? পাপিষ্ঠা—"

প্রহরী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল "কি কর! কি কর! অপর কেহ শুনিলে প্রমাদ ঘটিবে; চুপ কর—চুপ কর।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, নীরব, অসাড়। শুক্লা পঞ্চমীর শশিকলা পশ্চিমাকাশে ডুবিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার, অনন্ত নীলিমামণ্ডিত; মধ্যে মধ্যে অগণ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র বিমল কিরণ বিতরণ করিতেছে; কিন্তু সে কিরণ চন্দ্রিকার ন্যায় বিকসিত নহে; তাহাতে জগৎ অস্পষ্ট ভাবে আলোকিত। গোয়াদুর্গ নিঃশব্দ; কেবল মধ্যে মধ্যে অদূরবর্ত্তী সাগর তরঙ্গের গম্ভীর কল্লোল, নৈশ বায়ুর শন্ শন্ শব্দ এবং নিশাচর পক্ষিগণের কর্কশ কণ্ঠরব থাকিয়া থাকিয়া শ্রুত হইয়া রজনীর গভীরতা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে। প্রাকারোপরি প্রহরিগণ নীরবে বিচরণ করিতেছে। এমন সময়ে লাট সাহেব আলবুকার্কের প্রাসাদের একটী প্রকোষ্ঠ-দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। উন্মুক্ত দ্বার পথ দিয়া একটী আলোক নিঃসৃত হইয়া সম্মুখস্থ অঙ্গনে অল্পে অল্পে কম্পিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আলোক বিসারিত হইয়া পড়িল। অবশেষে এক রমণী একটা জ্বলন্ত উল্কাহস্তে সেই গৃহ হইতে অতি সতর্ক ভাবে বহির্গত হইল। ভিতর হইতে অমনি কে সেই দ্বার পুনর্ব্বার বদ্ধ করিল। রমণী ধীরে ধীরে বাটীর গুপ্ত দ্বারে উপস্থিত হইল এবং তাহা সতর্কতা সহকারে উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া বহির্ভাগ হইতে তাহা বদ্ধ করিল; পরে আলোক হস্তে দুর্গাভ্যন্তরস্থ রাজকারাগারের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

কারাগারের দ্বার বহির্দেশ হইতে বদ্ধ। নিশাচরীর হাতে এক গোছা চাবি ছিল; সে তন্মধ্য হইতে একটী বাছিয়া লইয়া তালা খুলিল এবং নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহটী বিস্তৃত, পরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত; দেখিলে হঠাৎ কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির বিশ্রামভবন বলিয়া বোধ হয়। সেই কক্ষের মধ্যে রজতময় বর্ত্তিকাধারে একটী বর্ত্তিকা বিমল আলোক বিতরণ করিতেছিল। প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত হইবা মাত্র গৃহ-

মধ্যে একটী উচ্চ দীর্ঘশ্বাস শ্রুত হইল। গৃহে আলোক দেখিয়া রমণী স্বহস্তস্থ উল্কা দূরে নিক্ষেপ করিল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ এক খানি খট্টায় এক জন পুরুষ শায়িত। তিনি শীর্ণ, ম্লান ও বিবর্ণ। কেশ শ্মশ্রু সমস্তই রুক্ষ। রমণীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং ধীর ও নম্র ভাবে বলিলেন, "সুরসুন্দরি! কেন আবার ছলনা করিতে আসিয়াছ? আমি এতক্ষণ বেশ সুখে ছিলাম। নৈরাশ্যের অন্ধকারে শূন্য হৃদয়ে ভাগ্যের বিড়ম্বনা ভাবিতেছিলাম; আবার তুমি কেন আমার সে সুখশান্তি ভাঙ্গিয়া দিলে?"

রমণীর নয়নযুগল অশ্রুপ্লাবিত হইল। ওষ্ঠাধর ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল; তুষারধবল গণ্ডস্থল ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া যুবক আরও দুঃখিত হইলেন এবং বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "মেরি! মেরি! কেন কাঁদ? কেন কাঁদ? তোমাকে কাঁদিতে দেখিলে আমার বোধ হয় যেন তুমি আমাকে বিদ্রূপ কর।—না, মেরি ক্ষমা কর, আর কাঁদিও না।"

মেরি গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল "কি সতীশ! বিদ্রূপ!—বিদ্রূপ! কিসে বিদ্রূপ করিলাম, সতীশ?"

সতী। "সে জন্য বলিতেছি না। মেরি! তুমি রাজকুমারী, অতুলধনের অধীশ্বরী; সমস্ত গোয়ানগরী তোমার আজ্ঞা বহন করে; কিন্তু 'আমি কে'? আমি অনাথ সহায়হীন,—সম্বলহীন; পরিত্যক্ত—একাকী। আমি তোমার পিতার নিকট বন্দী। শত্রুকন্যাকে আমার দুঃখে কাঁদিতে দেখিলে বিদ্রূপ নয়ত আর কি বলিব?"

মেরি আরও বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "সতীশ—সতীশ! আমি কি তোমার শত্রু। আমি কিসে তোমার শত্রু হইলাম সতীশ? পিতা তোমায় বন্দী করিয়াছেন; কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে আইস, এখনই তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতেছি; তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও; কেউ তোমাকে বাধা দিবে না, কেউ একবার জিজ্ঞাসা করিবে না।"

সতী। "মেরি! তোমার কথায় কেন আমি কারাগার ছাড়িয়া যাইব? তাহা হইলে লোকে যে আমাকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা করিবে? চিরজীবন এইখানে পচিয়া মরি, সেও ভাল, তথাপি কাপুরুষের ন্যায় পলাইয়া যাইব না। মেরি! তুমি গৃহে যাও। তোমাকে দেখিলে আমার নির্ব্বাণ অনল জ্বলিয়া উঠে।"

মেরি। "কেন যাইবে না, সতীশ? আমার কথা কে না শুনিতেছে? আমার আদেশ কে না পালন করিতেছে? পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন; জরাজীর্ণ, অক্ষম। উপযুক্ত মন্ত্রী থাকিলেও তিনি আমার পরামর্শ কখন অগ্রাহ্য করেন না।

সতী। "মেরি! তুমি যাও, আমি

কাহারও অনুরোধে মুক্তি পাইতে চাহি না। এ জীবন কাহারও অনুগ্রহে ধারণ করিবার অভিলাষ নাই।”

মেরি অধিকতর বিষণ্ন হইল। দারুণ মনোদুঃখে তাহার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে হতাশ স্বরে বলিল “যাইবে না?—নিতান্তই যাইবে না? কেন, সতীশ, আমি কি দোষ করিয়াছি?”

“দোষ কি মেরি! তোমার দোষ কিছুই নাই; সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। তোমার মত দয়াময়ী আমি কোথাও দেখি নাই; তোমার ভালবাসা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তুমি না থাকিলে এত দিন এই কারাগারেই আমার জীবন যাইত।”

“তবে, সতীশ, তুমি যাইবে না কেন?

“তোমার পিতা না বলিলে আমি কেমন করিয়া যাইব? আমি কি চোর?”

“আচ্ছা, পিতা যদি স্বয়ং আসিয়া বলেন, তাহা হইলে যাইবে?”

“মেরি! আমার মুক্তির জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন? আমি নিষ্কৃতি পাইলে তোমার কি সুখ হইবে?”

“আমার সুখ;—আমার সুখ তুমি। তোমার মলিন মুখ দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়; চারিদিকে অন্ধকার দেখি; মনে হয় সমস্ত সংসার কাঁদিতেছে। কেন এমন হয়, তাহা আমি জানি না। তুমি আমার কে, তাহা আমি জানি না; তোমাকে দেখিলে আমি জীবন পাই; তুমি স্মৃতি, চিন্তা, ধ্যান, ধারণা; তুমি আমার জীবন, সার সর্ব্বস্ব। তোমা ছাড়া সংসারে নিজের আর কিছুই দেখিতে পাই না। কাহার জন্য এই গভীর রাত্রে গৃহ ছাড়িয়া আসিলাম? কাহার জন্য কুলে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হইলাম? পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজন সকলকে কাহার জন্য ভুলিতে শিখিলাম? গির্জ্জায় যাই; সকলে সুখ, সম্পত্তি, ঐশ্চর্য্য কামনা করে, কিন্তু আমি আর কিছুই চাই না, কেবল তোমাকে। তুমিই আমার সুখ—সম্পত্তি—ঐশর্য্য; তুমিই কামনা। কিন্তু সতীশ, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি; আমার মোহ ঘটিয়াছে। আমি ত তোমায় পাইব না!” মেরিয়ার দুঃখ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; দারুণ শোকবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সতীশের পদতলে পড়িয়া সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল।

সতীশ ধীরে সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন, বলিলেন, “মেরি! কেন কাঁদ? এ হতভাগ্যের জন্য কাঁদিয়া কি হইবে? কাঁদিয়া কি সুখ?”

“সতীশ! কাঁদিয়া কি সুখ, তাহা কি তুমি কখন জানিয়াছ? কখন কি পরের জন্য তোমার হৃদয় কাঁদিয়াছে? কখন কি পরকে আপন ভাবিয়া, তাহার জন্য কাঁদিয়াছ? সতীশ! তুমি আমার কে?

কিন্তু তোমার জন্য কাঁদিয়া যে কি অসীম সুখ পাই, তাহা বলিতে পারি না;—কেন?—তাহাও জানি না! কিন্তু, সতীশ, বৃথা আশা; আমি তোমাকে পাইব না; তুমি হিন্দু, আমি খৃষ্টানী; তুমি আমাকে লইবে না। না, সতীশ, আমি আর কিছুই চাহি না; আমি তোমার চরণে দাসী হইয়া থাকিব, তোমার চরণ সেবা করিব, আর তোমায় দেখিব; দেখিয়াই সুখী হইব। আর অধিক আশা করি না। কিন্তু, সতীশ, এ আশাও কি দুরাশা?”

সতীশ অবনত মস্তকে নীরবে বসিয়া রহিলেন; কি উত্তর দিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া মেরির শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল; তাহার মুখমণ্ডল প্রাবৃটের মেঘবৎ গম্ভীর হইল, নয়ন দিয়া তীব্র জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল; লগুড়তাড়িতা ভুজঙ্গীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া কঠোর স্বরে বলিল “নিষ্ঠুর, এ অনুগ্রহটুকুও করিতে পারিবে না। গিরিবালাই তোমার সর্ব্বস্ব—সর্ব্বময় দেবতা! ভাল দেখিব কেমন তুমি তাহাকে পাইতে পার।” অমনি তাড়িত বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সতীশ স্তম্ভিত ও বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

সেই রাত্রে মেরিয়া থেরিশা গিরিবালাকে হত্যা করিয়াছিল!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দিন গেল, সপ্তাহ গেল, পক্ষ গেল, মাসের পর মাস অতীত হইল, তথাপি পর্ত্তুগিজ সেনা প্রত্যাগত হইল না। আলবুকার্ক চিন্তিত হইলেন; ভাবিলেন “দস্যুদল কি মায়াবী?” কিন্তু তিনি কিছুতেই হতাশ হইবার নহেন। উদ্যমের পর উদ্যম বিফল হইল; অসংখ্য সৈন্য সমস্ত নষ্ট হইল; তথাপি তিনি লোপসোরেজকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। এ দিকে পর্ত্তুগেলেও মহা হুলস্থূল পড়িয়াছে; ইমানুয়েল প্রায়ই লোপসোরেজের কথা জিজ্ঞাসা করেন; প্রায়ই তাঁহার উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিতে আদেশ দেন। সেই আদেশ পালিত হইয়াছে; কিন্তু এত দিনে তাহাতে কিছুই ফলোদয় হইল না। অবশেষে তিনি আলবুকার্কের প্রতি কঠোর আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। আলবুকার্ক সেই নিষ্ঠুর অনুশাসন পাইয়া একবার শেষ ও কঠোর উদ্যম করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পূর্ব্ব রাজ্যে পর্ত্তুগিজগণের যত উপনিবেশ ছিল, সমস্ত স্থানেই ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইল যে, পঞ্চশত করিয়া সৈন্য সংযোজনা করিতে হইবে। ঘোষণাপত্র পাইয়া সকলে তদনুসারে কাজ করিল।

দেখিতে দেখিতে গোয়ানগরে দশসহস্র সৈন্য সমবেত হইল। দাক্ষিণাত্যের নরপতিগণ পর্ত্তুগিজ দলের এই ভয়ানক

সমরোদ্যোগ দেখিয়া বিষম চিন্তিত ও ভীত হইল; প্রত্যেকেই ভাবিল আলবুকার্ক বুঝি তাহার রাজ্য আক্রমণ করিবে। এই ভয়ে সকল হিন্দু ও মুসলমান নরপতিগণ স্ব স্ব সেনাবল দৃঢ় করিতে আরম্ভ করিলেন।

গোয়ানগরে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত। অশিক্ষিত ও অত্যাচারী সৈন্যগণের দুরাচরণে সমস্ত নগর আলোড়িত। সামান্য বণিক ও দোকানদারগণ দোকানঘর বন্ধ করিয়া মূলধন লইয়া দূরে পলায়ন করিল। যাহাদের বিপুল ধন, তাহারা বলিষ্ঠ হাবশি পাহারাদার নিয়োগ করিয়া সতর্কভাবে কাজ চালাইতে লাগিল। তথাপি তাহারা নিস্কৃতি পাইত না; হাবশিদিগের সহিত পর্ত্তুগিজদিগের প্রায়ই বিবাদ বিসম্বাদ হইত। এইরূপে প্রায় একমাস অতীত হইল। লাট সাহেব রাজ্যের বিচক্ষণ মন্ত্রীদিগের সহিত যুদ্ধ বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

একদা আলবুকার্ক ঐ বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রহরী আসিয়া বলিল "কতকগুলি সৈন্য দস্যুদিগের হাত এড়াইয়া পলাইয়া আসিয়াছে।" লাট সাহেব তাহাদিগকে আসিতে অনুমতি দিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই কতকগুলি নিরস্ত্র পর্ত্তুগিজ সৈনিক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি করিলে?"

সেই পরাজিত সৈন্যগণের মধ্যে এক জন বলিল "হুজুর! সকলেই পরাস্ত হইয়াছে; সেনাপতিও বিনষ্ট হইয়াছেন। আমরা ঘোরতর আহত হইয়াছিলাম; অতি কষ্টে বাঁচিয়া আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ আলবুকার্কের নিষ্প্রভ নয়নযুগল হইতে উৎকট জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইল; তাঁহার বদনমণ্ডল গভীর আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি ভীম গম্ভীর স্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "তোরা কি জন্য তবে রাজার মাহিনা ভোগ করিস্?"

ভয়ে সৈন্যগণ কাঁপিতে লাগিল। পুনর্ব্বার সেই ব্যক্তি সাহসে ভর করিয়া বলিল, "প্রভো! আমাদিগের কোন দোষ নাই; আমরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলাম। যখন সেনাপতি পতিত হইলেন, একজন সৈন্যও নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইল না; কেহ এক পাও সরিল না। দ্বিগুণতর সাহসে ভর করিয়া প্রাণপণে সকলে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে বারুদ ও গুলি ফুরাইয়া আসিল; তথাপি কেহই ভয় পাইল না; বন্দুক উদ্যত করিয়াই শত্রুদিগের উপর আপতিত হইল। অনেক শত্রু সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল; কিন্তু তাহারা এক এক জন যেন এক একটা বিয়েলজিবাব; কে তাহাদিগকে সহজে পরাস্ত করিতে পারে? শেষে আমরা সকলে আহত হইয়া পড়িলাম। তাহার পর কি হইল বলিতে পারি না। সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলাম আমরা একটা পর্ব্বতের উপরে

একটী প্রশস্ত গৃহে শায়িত রহিয়াছি; পার্শ্বে কতকগুলি সন্ন্যাসী আমাদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন। প্রভো! সেরূপ অমায়িক ভাব, সেরূপ স্নেহময় আচরণ আমরা জন্মে দেখি নাই। আমাদিগের বোধ হইতে লাগিল যেন চারি পাঁচ জন সেণ্ট জন আসিয়া আমাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। সেই মহাপুরুষগণের সস্নেহ ও সাদর আচরণে আমরা শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিলাম। যখন আমরা সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়া উঠিলাম, তখন তাঁহাদিগের গুরু আসিয়া বলিলেন "পর্ত্তুগিজ সৈন্যগণ! এক্ষণে তোমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিতে চাহ, গোয়া নগরীতে ফিরিয়া যাইবে, না শৈবী সেনাতে যোগ দান করিবে। যদি শৈবী সেনাতে যোগ দাও, তাহা হইলে তোমাদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈব ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। এ ধর্ম্ম তোমাদের খৃষ্ট ধর্ম্ম অপেক্ষা উদার।" আমরা কিছুতেই সম্মত হইলাম না। তখন তিনি আমাদিগকে সস্নেহে বলিলেন "তোমরা আমাদের শত্রু, সুতরাং অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া তোমাদিগকে গোয়া নগরীতে যাইতে হইবে। ভয় নাই, কেহ তোমাদিগের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিবে না। শৈব সৈন্যগণ তোমাদিগের সঙ্গে যাইয়া গোয়ার নিকটে রাখিয়া আসিবে।"

আলবুকার্ক বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সে কি, শত্রুকুলের এত সৌজন্য? আমি এত দেশে গিয়াছি, কিন্তু কোথাও ত শত্রুর এত উদারতা ও ভদ্রতা দেখি নাই। এরূপ ভদ্র বীরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি হইবে?" তিনি কিয়ৎকাল নীরবে কি চিন্তা করিলেন। নানা চিন্তার তরঙ্গ তাঁহার মনোমধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল, তাহারা যুদ্ধবিদ্যায় কিরূপ পারদর্শী?"

সৈনিক সবিনয়ে উত্তর করিল, "ভারতে সেরূপ যোদ্ধা অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহাদের যেমন কৌশল, সেইরূপ নৈপুণ্য এবং তদনুযায়ী বীরত্ব। সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন জগতের পাপতাপ মোচন করিবার জন্য দেবদূতগণ ভারতে আবির্ভূত হইয়াছেন!"

আল। "তাহাদের উদ্দেশ্য কি?"

সৈন্য। "উদ্দেশ্য অতি মহৎ; নতুবা তাঁহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন কেন? তাঁহারা স্বদেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যতগুলি সন্ন্যাসী তাঁহাদিগের দলভুক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে কাহাকেও মূর্খ দেখিলাম না; সকলেই পণ্ডিত, সকলেই বিনয়ী। কিন্তু যুদ্ধের সময় তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব তেজ দেখিতে পাওয়া যায়; তখন বোধ হয় যেন এক এক জন বীর দশজনের বল ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন।"

লাট সাহেব অধিকতর বিস্মিত হইলেন

এবং কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল, আমাদিগের প্রতি তাহাদিগের এত বিদ্বেষ কেন? আমাদের জাহাজ জয় করিল, লোপ-সোরেজকে বন্দী করিল, আমাদিগের সৈন্য সমস্ত নষ্ট করিল! আমরা তাহাদিগের কি করিয়াছি? কেন ভারতে ত আরও বিদেশীয় ও বিজাতীয় রাজা রহিয়াছে। তবে এক মাত্র আমাদিগের উপর তাহাদের এত ক্রোধ কেন?"

সৈন্য। "তাহার কারণ আছে। আমি তাঁহাদিগকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম; তাহাতে তাঁহারা বলিলেন "পর্ত্তুগিজগণ দূর য়ুরোপ হইতে আসিয়াছে; ভারতের ধন রত্ন লইয়া যাইয়া তোমরা পর্ত্তুগেলকেই সজ্জিত করিবে; পর্ত্তুগেলই তোমাদের জন্মভূমি; জন্মভূমি ছাড়িয়া তোমরা কিছু ভারতে বাস করিবে না। যদি আমাদের দেশের ধনরত্ন দেশে না রহিল, তবে তোমাদের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব হইবে কিসে? মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিয়াছে; ভারতবর্ষ ব্যতীত তাহারা আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না; তাহারা এদেশে থাকিলে ভারতের তত বিশেষ ক্ষতি নাই; এক মাত্র জাতি বৈরতা? কালে তাহা নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। ভারত হইতে হিন্দুর মাহাত্ম্য কেহ কিছুতেই লোপ করিতে পারিবে না।"

উপস্থিত সকলে নীরবে নিঃস্পন্দ ভাবে সেই বিবরণ শুনিতে লাগিল। আলবুকার্ক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহারা কি হিন্দু?"

সৈন্য। "আজ্ঞা হাঁ হুজুর। তাহারা শৈব; তাহাদের কোন বিষয়েই কুসংস্কার নাই। তাহারা জাতিভেদ মানে না; সকলে একত্রে ভোজন করে; বিধবার বিবাহ দেয়; স্ত্রীলোককে যুদ্ধ শিখায়। এমন অদ্ভুত সম্প্রদায় আমি কোথাও দেখি নাই। কি মুসলমান, কি য়িহুদী, কি খৃষ্টান, সকলকেই তাহারা দলমধ্যে লইয়া থাকে। অনেক পর্ত্তুগিজকে তাহাদের দল মধ্যে দেখিলাম।"

সভাস্থ সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল "সে কি? সেকি? পর্ত্তুগিজ কোথা হইতে সেখানে গেল?"

সৈন্য। "আর্ম্মেডা তাহাদের হাতে পড়িলে অনেক পর্ত্তুগিজ তাহাদের দলভুক্ত হইয়াছিল।"

আল। "তাহারা এখন কিরূপ অবস্থায় আছে?"

সৈন্য। "ঠিক তাহাদের সকলেরই মত। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানে কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাইলাম না; সকল বিষয়েই একতা—সাম্য—স্বাধীনতা। সেরূপ ভ্রাতৃভাব কোথাও কেহ দেখে নাই। প্রভো! নিশ্চয়ই তাহারা ভারতে এক ভয়ানক বিপ্লব উত্থাপন করিবে।"

আল। "এক্ষণে তাহারা কি চাহে? তাহারা কি আমাদিগের সহিত সন্ধি করিবে না?"

সৈন্য। "করিবে না কেন? প্রস্তাব করিলেই এবং উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইলেই করে। সে কথাও তাহারা আমাদিগকে বলিয়াছে। আমাদের লোপসোরেজ যেমন তাহাদের কাছে, তেমনই তাহাদের রাজকুমার গোয়াতে বন্দী রহিয়াছেন?"

সভামধ্যে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। সকলেই ঘোরতর কৌতূহল সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল,—"কে? কে? তাহাদের কে এখানে বন্দী আছে?"

সৈন্য। "সতীশ!"

আলবুকার্ক মস্তক অবনত করিলেন। তৎকালে স্বীয় দুহিতার অবস্থা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে তিনি লজ্জিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সে গূঢ় বৃত্তান্ত আর কেহই জানিত না; সুতরাং তিনি পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—"শৈবদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিব; অচিরে এক জন দূত এই প্রস্তাব লইয়া তাহাদিগের নিকট যাও।"

তিনি প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিতে বসিলেন। তন্মধ্যে এই কয়েটী প্রতিজ্ঞা ছিলঃ—

১ম। শৈব পর্ত্তূগিজে সন্ধি স্থাপিত হইবে।

২। শৈবগণ সোরেজকে অর্পণ করিলে পর্ত্তূগিজগণ সতীশকে সমর্পণ করিবে।

৩য়। উভয় দলে চিরকালের জন্য সুদৃঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে।

৪র্থ। উপরি-উক্ত তিনটী প্রতিজ্ঞা স্বীকৃত হইলে শৈব ও পর্ত্তূগিজের মধ্যে আর কোন বিষয়েই শত্রুতা হইবে না।

সন্ধি প্রস্তাব প্রেরিত হইল। নারায়ণস্বামী পর্ত্তূগিজ দূতদিগকে সাদরে ও সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সন্ধিপত্রের প্রতিজ্ঞাগুলি অনুশীলন করিতে লাগিলেন। সমস্ত ঠাকুর সেনা তথায় উপস্থিত থাকিয়া নিজ নিজ মতবাদ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সন্ধি করাই স্থির হইল। নারায়ণস্বামী সেই সমস্ত প্রতিজ্ঞায় আর একটী প্রতিজ্ঞা সন্নিবেশিত করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, পর্ত্তূগিজগণ দাক্ষিণাত্যের আর কোন রাজ্য আক্রমণ করিতে পারিবে না।

পর্ত্তূগিজ দূত গোয়ানগরীতে ফিরিয়া গিয়া লাট সাহেবকে সেই সন্ধিপত্র দেখাইল। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। শৈব ও পর্ত্তূগিজে সন্ধি সম্বন্ধ হইল। লোপসোরেজ গোয়া নগরীতে গেলেন, সতীশ বটচক্রে আসিয়া পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণতলে প্রণত হইলেন। হিন্দু খৃষ্টানকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিল।

সেই দিন শৈবগণ ভারতের উর্ব্বর ক্ষেত্রে যে মহা বীজ বপন করিলেন, কালে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। একদা তাহার মূলজালে আরঙ্গজীবের সিংহাসন আচ্ছন্ন হইয়াছিল। শিবজি সেই মহা মহীরুহের অপরিণত ফল।*

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* প্রায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া যথানিয়মে প্রকাশিত হইয়া সমর-শেখর অদ্য সমাপ্ত হইল। ইহা যজ্ঞেশ্বর বাবুর প্রথম ফল; ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি ইহা দুই খণ্ডে শেষ করেন। দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় খণ্ডের কাপী চুরি যাওয়াতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার তাহা লিখিতে হইয়াছে।—সং।

সমাপ্ত।

সমালোচন।

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ।*—বাঙ্গালা ভাষায় কয়েক খানি উত্তম ব্যাকরণ প্রচলিত থাকিলেও যে অন্য একখানির প্রয়োজন নাই, আমরা তাহা বলি না। কেননা, বঙ্গভাষাবিষয়ে লিখিবার অনেক নূতন বিষয় আছে, অথচ তাহা অদ্যাপিও প্রকটিত হয় নাই। সুখের বিষয়, এই ব্যাকরণের গ্রন্থকর্ত্তা এই পুস্তকে কিছু কিছু নূতন বিষয় দিয়া ইহার উপকারিতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি পুস্তকের প্রথমেই যে বঙ্গভাষার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই অপ্রাসঙ্গিক নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে গুণানুসারে বিচার করা হয় নাই দেখিয়া, যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি বিষয়ে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামের পরে রাজা রামমোহন রায়ের নামোল্লেখ করা কোন ক্রমেই পরামর্শ-সিদ্ধ নহে। আর বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয়ের নাম মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর কবিরত্ন ও কালীপ্রসন্ন সিংহের পরে উল্লেখ করাও কি সুসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে? লেখক যে বলিয়াছেন "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকগুলির সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের নীতিগর্ভ রচনাবলী প্রকাশিত হয়," তাহা প্রকৃত নহে। অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতালপঞ্চবিংশতি" মুদ্রিত হয়। এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালা ভাষার কি কম উপকার হইয়াছে! অথচ তাহার কিছুমাত্রও নির্দ্দেশ নাই। বঙ্গদর্শনের সুখ্যাতি করা হইয়াছে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নাম গন্ধ নাই। ইহাভিন্ন আরও অনেক ভুল আছে। যেমন, "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" পুস্তককে "মানব দেহের সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধবিচার" বলা হইয়াছে। ভারতচন্দ্র রায়ের জন্মভূমি হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া না বলিয়া "ভবানীপুর" বলা হইয়াছে! এ সমস্তই অসাবধানতার একশেষ; এবং গ্রন্থকারের পক্ষে গুরুতর দোষের কথা। এই প্রস্তাবে কালীপদ বাবু কবি ও গদ্যরচকদিগের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাও ভ্রমে পরিপূর্ণ।

"বাঙ্গালার সহিত অন্যান্য ভাষার সম্বন্ধ" প্রবন্ধে বঙ্গভাষায় পার্শী, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার যে সকল শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু লেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাকরণ হইতে যে ঐ অংশের অনেক সাহায্য পাইয়াছেন, কোন স্থলেই তাহার নির্দ্দেশ না করা ভাল দেখায় নাই। তবে কৃষ্ণকিশোর বাবুর প্রদত্ত তালিকা অপেক্ষা ইহাতে অনেক অধিক শব্দ আছে। ব্যাকরণে উচ্চারণ-স্থান লিখিবার কিছুমাত্রও প্রয়োজন নাই। তৎপরিবর্ত্তে যে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় এই পুস্তক ও অন্যান্য শব্দশাস্ত্র পুস্তকে লিখিত হয় নাই, তাহাই সন্নিবেশিত হইলে ভাল হইত। জকার ও বকার বিধানগুলি সন্নিবেশ করা অতি উত্তম হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সন্ধির সূত্রগুলি বিশদ না হইলেও, ব্যাখ্যার গুণে সহজ হইয়াছে। আমরা ব্যাখ্যাপ্রণালীর একান্ত

* শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত; মূল্য ৸০ আনা।

অনুযোগী। এই প্রণালীও কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থেই প্রথম পরিদৃষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বনাম প্রকরণে "আমি, তুমি, তুই, আপনি" পদগুলিকে নিরপেক্ষ সর্ব্বনাম বলিয়া, "তিনি, সে, তাহা, তা, ইনি, উহা" প্রভৃতি পদগুলিকে সাপেক্ষ সর্ব্বনাম বলিয়া উল্লেখ করায় কিছুমাত্র ফল দৃষ্ট হয় না বরং তাহা নিতান্ত ভ্রান্ত মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "তিনি" সাপেক্ষ কেন? না,—তিনি কে? এইরূপ জানিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা 'আমি' প্রভৃতি পদেও ত রহিয়াছে। আপত্তিজনক কোন কোন বিষয় থাকিলেও, শব্দরূপ বিষয়টী বালকদের সহজে বিলক্ষণ বোধগম্য হইবে। দ্বিগু সমাসের ব্যাসবাক্য, কর্ম্মধারয়ের ব্যাসবাক্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অতএব তাহা কোনক্রমেই কর্ম্মধারয়ের অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া উচিত নয়। Subordinate sentence ও Compound sentence প্রভৃতি শব্দের অনুবাদ "অধীন বাক্য" ও 'সম্মিশ্র বাক্য' উত্তম হয় নাই। মধ্যে মধ্যে সুসংস্কৃত পদের সহিত অসমপ্রয়োগও ভাল হয় নাই। যেমন, তিনবিধ, চারিবিধ ইত্যাদি। বীভৎসরসের দৃষ্টান্তটী অশ্লীল। উহার পরিবর্ত্তে কুসুমাঞ্জলির 'কবিতা' নামক পদ্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিলে, গ্রন্থকারের পক্ষে কোন দোষ হইত না। বালকগণের পাঠ্যপুস্তকে ওরূপ করা নিতান্ত নিন্দনীয়। আর ব্যাকরণ গ্রন্থে বর্ণাশুদ্ধি না হওয়াই আবশ্যক। শুদ্ধিপত্র দেখিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই হয় নাই। শুদ্ধিপত্রোক্ত ভ্রম ব্যতীত অন্যান্য অনেক অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে।

দ্রুতগতি শশিবদনা, বিধুমালা ও সোমরাজী; ভুজঙ্গাবলী, গজমতি, সমানিকা, ও অনুষ্টুপ, দিগক্ষরা; দ্রুতগতি প্রভৃতি ষড়ক্ষরী, অষ্টাক্ষরী, দশাক্ষরী ছন্দের বিবরণ অনাবশ্যক। বাক্যরচনা, অলঙ্কার, পদপ্রকরণ ভাল হইয়াছে। ফলতঃ ব্যাকরণ খানিকে উৎকৃষ্ট না বলিলেও, মধ্যম বলিতে হইবে; তাহাতে সংশয় নাই।

অনেকগুলি পুস্তক আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে কিন্তু স্থানাভাবে সে গুলির সমালোচনা প্রকাশিত হইল না। তজ্জন্য আমরা পাঠক ও গ্রন্থকার মহাশয়গণের নিকট বিশেষ অপরাধী আছি। আগামী বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিতরূপে সমস্ত পুস্তকগুলির সমালোচনা করিতে যত্ন করিব। তবে এ স্থলে বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে বর্ত্তমান বৎসরে বঙ্গভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকখানির উল্লেখ করিলাম। এই পুস্তকগুলির কিছু বিস্তৃত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা আছে অতএব তাহাতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে পারে।— গ্রীক ও হিন্দু, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; বিলাতযাত্রী বাঙ্গালী—শ্রীশ্যামলাল মিত্র প্রণীত; ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি—শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত; লক্ষণতত্ত্ব—ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রণীত; জীবতত্ত্ব, তৃতীয় ভাগ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত; বিবিধ সন্দর্ভ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত; সোণার কাটি রূপার কাটি—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত; সেনরাজগণের বিবরণ—শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত।

দ্বারা অপর স্থানগুলি ঐ স্থানের কতদূরে অবস্থিত ঠিক করিতে পারিলে কোন এক স্থানের মানচিত্র প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী অথবা কোন বৃহৎ দেশ এই প্রকারে জরিপ করা অসাধ্য। বৃহৎ দেশের কোথাও সমুদ্র, কোথাও বন, কোথাও পাহাড়, কোথাও বা মরুভূমি। এই সকল চেন দিয়া জরিপ করিয়া মানচিত্র প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী ৩৬০ ডিগ্রিতে বিভক্ত। কোন দেশের মানচিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে সে দেশ ৩৬০ ডিগ্রির কতদূর অধিকার করিয়াছে ঠিক করিতে হয়। ১ ডিগ্রির পরিমাণ কত মাইল তাহা এক প্রকার জরিপ দ্বারা ঠিক নির্ণয় করা যায়। এই জরিপকে Trigonometrical Survey কহে। ইহার এইরূপ নাম দিবার তাৎপর্য্য এই যে দেশ জরিপ করিতে হইবে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন ত্রিভুজে বিভক্ত করিতে হয় এবং ঐ সকল ত্রিভুজের বাহুত্রয়ের পরিমাণ যত্ন সহকারে ঠিক করিতে হয়। এইরূপ করিতে হইলে প্রথমে এক খণ্ড সুবিস্তৃত সমতল শক্ত ভূমি পছন্দ করিয়া ৮।১০ মাইল দীর্ঘ একটি সরল রেখা অতি সাবধানে জরিপ করিতে হয়। ইহাকে Base-line বলে। তৎপরে কোন সুদূরস্থ পদার্থ নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। এই নির্দ্দিষ্ট পদার্থের প্রতি নির্দ্দিষ্ট সরল রেখার দুই প্রান্ত হইতে দেখিলে যে কোণ হয় তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। ইহা সম্পাদন করিতে Theodolite যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক। তৎপরে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুসারে কাগজের উপর একটি ত্রিভুজ অঙ্কিত করিতে হয়। ত্রিকোণমিতির সাহায্যে, কোন একটি ত্রিভুজের একটি বাহু ও দুইটি কোণ পাওয়া গেলে, অপর দুইটি বাহুর পরিমাণ গণনা করা যাইতে পারে। এই দুইটি নির্দ্দিষ্ট বাহুকে এক্ষণে নূতন দুইটি ত্রিভুজের আবার Base-line ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গণনা করিলে

forest tracts teeming with moisture; no constitution European or Asiatic could bear up for any length of time against such a complication of hardships as thence arose—eternal watchings by day to the prevention of all regular exercise—tents decomposing into their original elements—servants—cattle—baggage—clothes—bedding—*La cuisine*—all daily dripping with rain—every comfort which the indwellers of cities and leaders of regular lives deem essential to happiness and even to existence, remorselessly sacrificed—and yet strange to say except when under the actual influence of jungle fever which sometimes swept like a destroying angel over us and prostrated the whole camp in one night, we hardly ever knew what it was to have a sorry hour. Surely the G. I. S. of India in those days was the proper school to teach men how to laugh at the calamities and nothingness of life. —Everest's Measurement of the Meridional Arc of India, p. cxx.

তাহার দুইটি বাহু পরিমাণফল ঠিক হয়। এই প্রকারে সমস্ত দেশ জরিপ করা যায় (৫)। প্রথম Base-line ঠিক করা অতি দুরূহ কর্ম্ম।

এই প্রকারে জরিপ শেষ হইলে ১ ডিগ্রির পরিমাণ কত মাইল ঠিক হয়। মনে কর আমরা নক্ষত্র পরিদর্শন করিয়া জানিলাম যে ক নামক স্থান খ নামক স্থানের ঠিক ৬ ডিগ্রি উত্তরে অবস্থিত। একটি ত্রিভুজ অঙ্কিত করিয়া ক হইতে খ পর্য্যন্ত একটি সরল রেখার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ মাপ করা যাইতে পারে। এবং যদি আমরা ঐ দৈর্ঘ্যকে ৬ দিয়া ভাগ দিই তাহা হইলে ১ ডিগ্রির দৈর্ঘ্য ঠিক হইল। এই প্রণালীর জরিপ ফ্রান্স, রুসিয়া, উত্তর আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ল্যাপলাণ্ড, পেরু ও অন্যান্য স্থানে সমাধা হইয়াছে। এক্ষণে নির্ণীত হইয়াছে যে, পৃথিবীর এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্র পর্য্যন্ত যে দৈর্ঘ্য তাহার অপেক্ষা বিষুবরৈখিক দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬½ মাইল অধিক। অথবা প্রত্যেক কেন্দ্র ১৩¼ মাইল সঙ্কুচিত। ভারতবর্ষে ১ ডিগ্রির দৈর্ঘ্য ৩৬২,৯৫৬ ফুট অথবা ৬৮¾ মাইল। সুইডেনে ১ডিগ্রির পরিমাণ ৩৬৫,৭৪৪ ফুট অথবা ৬৯¼ মাইল। সুইডেন ও ভারতবর্ষ জরিপ করিতে দেখা গিয়াছে যে মেরুর নিকটস্থ প্রদেশ সমূহে ১ ডিগ্রির পরিমাণ বিষুবরেখার নিকটস্থ প্রদেশ অপেক্ষা অধিক। ভারতবর্ষীয় ত্রৈকোণমিতিক জরিপ এই শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্ণেল ল্যাম্বটন আরম্ভ করেন। এই সুমহৎ জরিপ (Geodetic undertaking) কুমারিকা অন্তরীপ হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত এবং কলিকাতা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত, যাহা সম্পন্ন করিতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গত হইয়াছে, তাহা হাইদার আলির রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের পতনের পরেই আরম্ভ হয়। কর্ণেল ল্যাম্বটনের

(৫) When maps of a country are wanted on a large scale to express the features of the ground in great detail, another process of measurement called Triangulation is used. First a base line, a few miles in length, is accurately measured with rods or chains as from A to B in the Fig. A B C. Then from A an observation is taken with an instrument called a Theodolite, to the point C, which may be a hill-top or church tower or any distinct object and the angle CAB is carefully noted. A similar observation is taken at B to determine the angle C B A. We can now construct our first triangle, and having found by actual measurement the length of its base we find by simple calculation the length of two sides, and consequently the exact position of C and its distance from A and B respectively. From such a measured base a system of triangles is observed all over the country, and the true positions of all its main landmarks are fixed without the necessity of further measurement. —Geikie's Physical Geography, pages 32-33.

C
A B

(Lambton) প্রস্তাব ডিউক অব ওয়েলিংটন পোষকতা করিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠান। মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড ক্লাইবও এই বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেন। কর্ণেল ল্যাম্বটন যত দিন জীবিত ছিলেন তত কাল অপরের সাহায্য ব্যতীত, বহুবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপ, নিশার শিশির, ও বর্ষার বৃষ্টি সহ্য করিয়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রভৃতির অভাব বিশেষ অনুভব করিয়াও এই সুবিস্তৃত ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন করেন। ভারতে এই সময়ে যুদ্ধ বিপ্লবে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতে-ছিল। তাহাতেও এই কার্য্যের অনেক বাধা জন্মে। নিশান, অপূর্ব্বদৃষ্ট যন্ত্র, ইঙ্গিত, ও যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া অজ্ঞ ভূপতিগণের মনে ঈর্ষা ও সন্দেহ উপস্থিত হইত এবং তাঁহারা আপন আপন রাজ্যের সীমা মধ্যে জরিপ করিতে দিতে বিশেষ কুণ্ঠিত হইতেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে পিণ্ডারি দমনের পর দক্ষিণ ভারতে শান্তি স্থাপন হয় ও অব্যাহত রূপে জরিপ কার্য্য চলে। সেই সময়ে এই জরিপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে অসাধারণ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা, ধীরতা, সচ্চরিত্রতা ও লোকানুরঞ্জিতা, এই সমস্ত গুণ গুলি থাকা জরিপ বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারি-গণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। কর্ণেল ল্যাম্বটন ঐ সমস্ত গুণে ভূষিত ছিলেন।

বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টর এই জরিপ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়া বিজ্ঞানের ভূয়সী উন্নতি করিয়াছেন ও সভ্য জগতে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের দেখা দেখি সভ্য জগতের অন্যান্য ভূপতিগণও আপন আপন রাজ্যমধ্যে ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। (৬)

কর্ণেল ল্যাম্বটন কার্য্য করিতে করিতে ইহলোক হইতে অবসৃত হন। ৭০ বৎসর বয়সে নাগপুর হইতে ৫০ মাইল দূরে হিঙ্গাম্ ঘাটে ২০শে জানুয়ারি ১৮২৩ খৃঃ তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। কর্ণেল ল্যাম্বটন ১৬৫,৩৪২ বর্গ মাইল জরিপ করেন, তাহাতে কোম্পানির ৮,৩৫,৩৭৭ টাকা ব্যয় হয়। তাঁহার

(৬) They have sent out parties in all directions for the purpose of ascertaining the bearings and distances of the places which compose or limit their extensive dominions.

A late Volume of the Asiatic Researches contains an account of the march of an officer at the head of a detachment into one of the most remote and unknown districts of India, for no other purpose but to decide a question interesting only to philosophers, *viz.* Whether the Ganges rises within or without, that is, on the south or the north of the Immaus of the ancients? There are but few of the most enlightened Cabinets in Europe which can boast of an expedition equally disinterested and meritorious.—Edinburgh Rev., Vol XXI, page 313.

বৃদ্ধাবস্থায় ১৮১৮ সালে জরিপের সাহায্যকারী স্বরূপ সুবিখ্যাত গণিত ও বিজ্ঞানবিৎ কর্ণেল এভারেষ্টকে নিযুক্ত করা হয়। এবং কর্ণেল ল্যাম্বটনের মৃত্যুর পর কর্ণেল এভারেষ্ট সারভেয়র-জেনেরল ও Trigonometrical survey এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।(৭) তিনি ৫৬,৯৯৭ বর্গ মাইল জরিপ করেন ও তাহাতে কোম্পানির ৮,৯৮,৩২৬ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৩২ খৃঃ কর্ণেল ওয়া (Waugh) তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন ও ১৮৪৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে কর্ণেল এভারেষ্ট কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি সারভেয়র-জেনেরল হন। কর্ণেল এভারেষ্টের আমলের জরিপ করিতে কর্ণেল ল্যাম্বটনের অপেক্ষা অনেক অধিক পড়ে তাহার অনেক কারণ ছিল। (৮) কর্ণেল ল্যাম্বটনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ৪৭৭,০৪৪ বর্গ মাইল জরিপ করা হয় এবং তাহাতে কোম্পানির ৩৪,১২ ৭৮৭ টাকা ব্যয় হয়। এই সুমহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিতে কত কষ্ট ও কত লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে বলা যায় না।(৯)

(৭) To Col. Everest's mathematical acquirements, practical genius, and undaunted resolution in contending with difficulties, is to be ascribed the high state of efficiency afterwards attained and now existing undiminished in this Hard-working establishment.—Report submitted to the House of Commons.

(৮) "This rate considered *perse* is very moderate, but contrasted with Col. Lambton's it exhibits a ratio of 3 to 1. This is easily accounted for by the great superiority of the work, which is perhaps unsurpassed by any similar undertaking in the world. The instruments were much heavier and more numerous, requiring a larger establishment of porters. The signals being all luminous, necessitated an increased number of attendants; the base-line apparatus infinitely more complicated and ponderous than Col. Lambton's steel chains, demanded an additional number of observers, as well as greater cost of transport. A considerable part of the triangulation likewise passes through the plains of the Ganges, which is the garden of India. In this part of country compensation had to be paid wherever private property was interfered with, and costly masonry towers were erected for stations."

(৯) The hardships and exposure of surveyors working in the field for the greater part of the year, in such a climate as India, and living under canvas, whilst all other servants of Government seek the protection of cool houses, are either little known or little appreciated. We have on several occasions kept the field throughout the year. The duties of the Trigonometrical survey likewise are often unremitting day and night, because the best observations are obtained during the nocturnal hours, when the dust raised by hot winds subsides, and the atmosphere becomes clear and calm. The fatigues and exposure are trying to the most

এই জরিপ দ্বারা দেশের কত উন্নতি হইয়াছে ও হইবে, তাহা কর্ণেল ওয়ার লিখিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার বাক্য পদে পদে ফলিতেছে (১০)

কর্ণেল ওয়ার (Waugh) পর কর্ণেল থুলিয়ার (Thullier) ও তাঁহার পর কর্ণেল ওয়াকার (Walker) সারভেয়ার-জেনেরল হন। কর্ণেল ওয়াকার বর্ত্তমান সারভেয়ার-জেনেরল।

hardy constitutions, and this history will show how few officers have been able to withstand their effects. The loss of trained officers entails a considerable increase of expense, for their places cannot be efficiently taken by newly appointed officers, until they have been thoroughly trained, while the cost of training is always an unproductive item in the account.

(১০) "It will be apparent from the foregoing statements, that the revenue surveys supply the interior filling up of the triangles in the British revenue districts, which are chiefly flat lands to which that system is most applicable. In native states and wild hilly countries, the topographical surveys before described are adapted to the object in view, which is a complete and inexpensive first survey of all India. Considered in this point of view, the work may challenge comparison with any in the world. The Triangulation supplies a permanent and accurate basis for the present, as well as for future internal surveys; for it must be borne in mind that, as the resources of this country become developed under the fostering protection of British rule, the topographical aspect of many districts must, in a moderate number of years, be completely changed. Tracts now covered with the jungle, will be reclaimed, canals will be dug, marshes drained and roads established. New towns and villages will arise, and fresh groves be planted, and rivers will change their course. That these views are not chimerical may be attested by my own experience, during 22 years of wandering throughout the length and breadth of the land; for places where, in my early years, I hunted the Tiger, the bear, and the boar are now covered with smiling fields, yielding a plentiful harvest to the cultivators. The greatest difference is also perceptible in the extension of towns and villages showing the increase of productive wealth which is taking place on all sides. On the other hand, in many native states the jungle is advancing on cultivation, and the people thus become the alternate prey of man and wild beast. These alterations cannot but produce, in the course of time, considerable changes in the topographical features of the country, for which reason revised surveys will be required, and these like the present ones, will be based on the operations of the Great Trigonometrical survey of India, which are intended to form a lasting monument for future generations, and unimperishable record of the landmarks of the present time."—Col. Waugh's Report dated, Dehra Dun, 20th October, 1850.

যোগাঙ্গ-সন্ধ্যা।

প্রতিবাদ।

অধিক দিন জীবিত থাকিলে অনেক দেখিতে হয়। নানা প্রকার সমাজে বসিলে দাঁড়াইলে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কালে কালে কতই নূতন হইতেছে! বাঁচিয়া থাকিলে, কত নূতন দেখিব, কত নূতন শুনিব! ঈশ্বর করুন, তাহাই হউক.—আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকি দেখা শুনার সাধটা মিটিয়া যাক্।

এদেশ হইতে সংস্কৃত ভাষার পঠন পাঠন প্রথা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছিল। হিন্দু-সরস্বতীর উপর প্রায় সকল বাঙ্গালীর বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ইংরাজিকে বুকে করিয়া বসিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষার নাম কেহ কাণে শুনিতেন না। তাই, ঘৃণায়, লজ্জায়, কতকটা মনের অভিমানে, আমাদের বাগ্দেবীর হাতে বীণাটী থাকিত না। কষ্টে তুলিলে, হাত অবশ হইত, ভারী ভারী লাগিত। তার ছিন্ন, লাউ ভাঙ্গা; সুর চড়াইলে মিল হয় না, তাহাতে মধুর রেস্ আসে না,—যন্ত্রখানির এত দুর্গতি! দেবীর এত অনাদর! তবু তৈল বটের লোভে তিনি পাষাণে বুক বাঁধিয়া ভট্টাচার্য্যদের টোলে বাস করিতেছিলেন। জননী আবার যে বাঙ্গালার পদ্মাসনে বসিয়া হাসিতে পাইবেন, তাহা মনে করি নাই, স্বপ্নে ভাবি নাই। কিন্তু দুঃখের নিশি চিরকাল থাকে না,—আমাদের বাগ্দেবীকে অধিক দিন চক্ষের জলে আঁচল ভিজাইতে হয় নাই। সে শ্রাবণের ধারা ফুরাইয়াছে, আবার তাঁহার সুখের দিন আসিয়াছে। এখন স্কুলে স্কুলে সংস্কৃত পড়া চলিতেছে, বালকেরা সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষা দিতেছে, সংস্কৃতশাস্ত্রে সকলেই কৃতবিদ্য হইয়া উঠিতেছে। পৈতৃক কৃতি ঠিক রাখিতে পারিলে হিন্দুনামের পরম গৌরব।

কিন্তু কলঙ্ক-ছাড়া চাঁদ নাই, কীটশূন্য সুগন্ধ ফুল নাই,—আমাদের এত সুখ! এত আহ্লাদ! তাহার ভিতরেও রাশি রাশি দুঃখ। এখন চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্য-মহাশয়রা সংস্কৃত আলোচনায় অনেকটা শৈথিল্য দিয়াছেন। সে জন্য তাঁহারা পঙ্কজ তুলিতে গিয়া প্রায় একরাশি দুর্গন্ধ পাঁক আনিয়া ফেলেন। পূর্ণিমার চন্দ্র আঁকিতে বসিলে তাঁহাদের তুলীর ডগায় কেবল কলঙ্কের কাল দাগটুকু পরিষ্কাররূপে উঠিয়া আসে। উপযুক্ত যত্নের অভাবই ইহার কারণ।

কেন বলি?—আর্য্যদর্শনে সন্ধ্যা শব্দের একপ্রকার আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি দেখিলাম, তাই বলি। আমার এত কথা

বলিবার অন্য কারণ নাই। জনৈক শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি যোগাঙ্গ-সন্ধ্যার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যার মধ্যে কিছু আর বাকি রাখেন নাই,—সন্ধ্যাশব্দের ব্যুৎপত্তিটুকুও বুঝাইয়া দিয়াছেন। লেখক কিরূপ শ্রেণীর লোক, সে পরিচয় জানি না। যদি বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক বালক হন, এখনও পঠদ্দশায় আছেন, মন দিয়া লেখা পড়া করিতেছেন, তবে তেমন সুমতি শিশুকে এত কথা বলা সাজে না। যদি সেয়াথতী লোক হন,তাহা হইলেও আমার অপরাধ হইয়াছে। কিন্তু যদি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হন, তবে আমি বিলক্ষণ দশ কথা বলিতে পারি, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যিনি টোলের অধ্যাপক এবং পাঁচজনের শিক্ষার জন্য আর্য্যদর্শনে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাঁহার প্রস্তাবে ভুল থাকা দোষের কথা।

সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া লেখক সন্ধ্যাশব্দের এইরূপ পরিষ্কার ব্যুৎপত্তিটুকু লিখিয়া দিয়াছেন,—"সন্ধ্যার প্রকৃত অর্থ সম্যকরূপে চিন্তা করা। সং এই উপসর্গের অর্থ সম্যকরূপে, আর ধ্যা ধাতুর অর্থ ধ্যান। এই ধ্যা ধাতুর উত্তর কার্দ্দন্তিক ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া সেই ক্বিপের লোপ করিলে যে ধ্যা সেই ধ্যাই থাকে। ক্বিপ্ প্রত্যয়ের ফল এই হইল যে ঐ ধ্যানটীমাত্র বুঝাইল। ইহাতে সন্ধ্যার অর্থ কেবল ধ্যান করাকে বুঝায়।"

ব্যাখ্যার ভিতরে অনেকটা কৌতুক রহিয়াছে। নূতন কি না?—তাই এত কৌতুকে ভরা। পুরাতন হইলে ইহার মধ্যে এতটা রস থাকিত না। সন্ধ্যার পুরাতন ব্যুৎপত্তি ও পুরাতন ব্যাখ্যা অন্য রকম। পুরাতন মতানুসারে 'সন্ধ্যা' শব্দ ক্বিপ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন করা একেবারে অসাধ্য। শশকের মাথার উপর যিনি দুটী শিং দেখাইতে পারেন, তেমন যোগ্যপাত্র ভিন্ন অন্য কেহ ক্বিপ্ প্রত্যয়ের আনুকূল্যে সন্ধ্যা শব্দ গড়িতে পারিবেন না।

পাণিনির ধাতুপাঠে দেখা যায়—ধ্যৈ চিন্তায়াম্। মূল ধাতু 'ধ্যৈ' ইহার অর্থ চিন্তা করা। তাহার পর—

আদেচ উপদেশেঽশিতি। পা ৬।১।৪৫

অর্থাৎ—ঐকারান্ত ধাতুর পর যদি শকার ইৎ হয় এমন প্রত্যয় না থাকে, তবে সেই ঐকারান্ত ধাতু আকারান্ত হইবে।

পাণিনির এই সূত্রানুসারে 'ধ্যৈ' ধাতু ধ্যা রূপ প্রাপ্ত হইল। মুগ্ধবোধকার বোপদেবও সূত্র করিয়াছেন—বেধ্যাপাং কৌ। এই সূত্রানুসারেও ধী হইতেছে। তৎপরে সন্ধ্যা এপ্রকার রূপ সাধিবার উপায় কি দেখা যাউক।

আতশ্চোপসর্গে। পা। ৩। ৩। ১০৬

কাশিকাবৃত্তি—আকারান্তেভ্য উপসর্গে উপপদে স্ত্রিয়ামঙ্ প্রত্যয়ো ভবতি।

অর্থাৎ—আকারান্ত ধাতুর পূর্ব্বে যদি উপসর্গ থাকে, তবে ঐ ধাতুর উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে অঙ্ প্রত্যয় হয়। অঙ্ প্রত্যয়ের অ থাকে।

এখানে সম্ এই উপসর্গ পাওয়া যাইতেছে; ধ্যা এই আকারান্ত ধাতুও রহিয়াছে, অতএব সন্ধ্যা শব্দ অঙ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইল।

এখন দেখা আবশ্যক ধ্যা ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে কি প্রকার রূপসিদ্ধি হইতে পারে।

অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা। ৩।২

১৭৮। কাশিকাবৃত্তৌ—অন্যেভ্যোপি ধাতুভ্যস্তাচ্ছীলিকেষু ক্বিপ্ প্রত্যয়ো দৃশ্যতে। + + + ধ্যায়তেঃ সম্প্রসারণঞ্চ। ধীঃ।

অর্থাৎ—অন্যান্য ধাতুর উত্তরও তাচ্ছীলাদি অর্থে ক্বিপ্ প্রত্যয় হয়। ধ্যৈ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ করিলে যকারের সম্প্রসারণ হইয়া 'ধী' এই প্রকার রূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অতএব যোগাঙ্গের লেখক মহাশয় যে আকিঞ্চনটী করিয়াছিলেন, দেখিতেছি কোন ক্রমেই তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ধ্যা ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে কিছুতে তাঁহার 'ধ্যাই' রাখা গেল না; রূপ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। 'ধ্যা' ছিল, ধী হইল। এই ধী শব্দের অর্থ—বুদ্ধি ও জ্ঞান।

ব্যুৎপত্তির কথা যেমন জানি, লিখিলাম, তাহার পর অর্থ। এতক্ষণ যে সন্ধ্যার বিষয় বলা হইল, তাহাই কি আমাদের উপাসনার সন্ধ্যা?—না, সেটী সন্ধ্যাকাল? এবং উপাসনার সন্ধ্যা অন্য প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে?—এ একটী সন্দেহের কথা বটে। পুরাতন অভিধানকারেরা এবং প্রাচীন মুনিরা সন্ধ্যাশব্দের কিরূপ অর্থ বুঝিয়াছিলেন, তাহা দেখা আবশ্যক। দেখিলে তবে আমাদের ভ্রম ঘুচিবে। এ দেশে ভরত ও অমরকোষের, শব্দরত্নাবলীর এবং রাজনির্ঘণ্টের আদর আছে। এই কয়েক খানি পুথীর পত্র উল্টাইলে সন্ধ্যাশব্দের এই সকল অর্থ পাওয়া যায়;—সায়াহ্ন, বিকাল, ব্রহ্মভূতি, সায়. পিতৃপ্রসূ, সন্ধ্যা, দ্বিজমৈত্রী, সায়ং, দিনান্ত, নিশাদি, দিবসাত্যয়। কৈ ধ্যান করা অর্থ নাই। কেবল সন্ধ্যাকালকে বুঝাইল। ইহাকে উপাসনার সন্ধ্যা বলিতে হইলে সন্ধ্যাকালাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিতে হইবে।

কিন্তু মুনিরা যে সন্ধ্যাশব্দে উপাসনাদি বুঝিতেন, তাহার আদি কোথা, দেখা চাই।

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১০১ শ্লোকে আছে—পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমার্কদর্শনাৎ। সূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিতে করিতে প্রাতঃসন্ধ্যায় থাকিবে।

এখানে,—পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং—ইহাতে প্রাতঃকালের সন্ধ্যা বুঝাইতেছে। কিন্তু প্রাতঃকালে সন্ধ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিতে পারেন না। অতএব উপাসনার যে সন্ধ্যাশব্দ তাহার আদি নিশ্চিত অন্যপ্রকার। ব্যাসসংহিতায় আছে—

উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ।
তামেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

দিবসের এবং রাত্রির সন্ধিসময়ের যে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াবিহিত পণ্ডিতেরা তাহাকেই সন্ধ্যা বলেন।

ব্যাসসংহিতার বচনানুসারে সন্ধ্যাশব্দের যে অর্থে সন্ধিসময়ের উপাসনা বুঝাইতেছে, তাহার এই প্রকার রূপ সিদ্ধি হইবে;—

সন্ধৌ ভবঃ (সন্ধি+যৎ)=সন্ধ্যঃ। স্ত্রীত্বাৎ সন্ধ্যা।

দক্ষ এবং যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতেও এই প্রকার মত প্রকাশিত আছে।

দক্ষসংহিতায় লিখিত হইয়াছে—

অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সূর্য্যনক্ষত্র-
বর্জ্জিতঃ।
সা চ সন্ধ্যা সমাখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্ব-
বাদিভিঃ॥

যখন সূর্য্যও নাই, নক্ষত্রও নাই, দিবারাত্রের মধ্যে এমন যে সন্ধিকাল, তত্ত্বজ্ঞানী মুনিরা তাহাকেই সন্ধ্যা বলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা—

ত্রয়াণাঞ্চৈব বেদানাং ব্রহ্মাদীনাং
সমাগমঃ।

সন্ধিঃ সর্ব্বসুরাণাঞ্চ তেন সন্ধ্যা প্রকীর্ত্তিতা।

ঋক্ যজু সামবেদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের এবং সমস্ত দেবতাগণের সমাগম হয় বলিয়া সন্ধ্যা নাম হইয়াছে।

উপরের বচনগুলি পাঠ করিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মুনিরা সন্ধ্যাশব্দে ধ্যান করা এমন অর্থ বুঝিতেন না এবং আমাদিগকেও সেরূপ অর্থ বুঝিতে বলেন নাই। কালের সন্ধিস্থলে যে উপাসনাদি দৈবানুষ্ঠান কর্ত্তব্য, তাহারই সন্ধ্যা নাম দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

জীবনী সংগ্রহ।—শ্রীঅমৃত লাল বসু প্রণীত। কুমুদবন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থকার গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় এই রূপ বলিয়াছেন, "যদি ইহা পাঠে এক জনও প্রীতিলাভ করেন, যদি এক জনেরও হৃদয়মুকুরে বর্ণিত মহাত্মাদিগের স্বজাতিস্নেহ ও স্বদেশপ্রিয়তা প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলেই সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব।" যদি একজনেরও মনে প্রীতি সঞ্চারিত হইলে গ্রন্থকার সিদ্ধ হইয়াছেন জ্ঞান করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কারণ যাঁহাদিগের জীবনী লিখিত হইয়াছে, এই গ্রন্থপাঠে তাঁহাদের আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধবগণের মনে নিশ্চয় প্রীতি সঞ্চারিত হইবে। এবং যাঁহারা এ দেশের প্রতিষ্ঠাপন্ন লোকদিগের বিষয় কিছু কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদেরও কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইতে পারে। সুতরাং গ্রন্থকারের সমস্ত শ্রমের অর্দ্ধেক সফলতা লাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু এই অর্দ্ধেক সফলতা ভিন্ন গ্রন্থকার যদি অন্য কিছু প্রত্যাশা করেন তৎপক্ষে আমরা বিলক্ষণ সন্দেহযুক্ত। কারণ, তিনি লিখিয়াছেন এই গ্রন্থখানি ছয়জন Distinguished Patriots এর জীবনী। সেই কয়েকজন প্রসিদ্ধ Patriot "ক্রোরপতি রামদুলাল সরকার, স্বদেশ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, দ্বিতীয় ধন্বন্তরি দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্র, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং ভারত-রত্ন কৃষ্ণদাস পাল।" রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত অন্য পাঁচ জনকে "পেট্রিয়ট" নামে সম্মানিত করিলে "পেট্রিয়ট" নামের গৌরব থাকে না। ভদ্র এবং সল্লোক মাত্রেরই দুই চারিটা সৎকার্য্য (good acts) থাকে। কৃষ্ণদাস সংবাদপত্রের এক জন ভাল সম্পাদক ছিলেন। কেশব সেন ইংরাজীতে বেশ বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরও মাথা ছিলেন। কিন্তু তা বলিয়া সকলকেই Patriot বলিলে ইউরোপীয় এবং এ দেশীয় তন্নামধারী মহাজনগণের অবমাননা করা হয়। Give Cæsar his due. আমরা সিজরের মান সিজরকে দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু তদধিক নহে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং আইনজ্ঞতার জন্য দ্বারিকানাথকে আমরা সম্মান করিতে রাজী আছি। রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে দুর্গাচরণের প্রতিপত্তি বিলক্ষণ ছিল; এবং তজ্জন্য তিনি আমাদের পূজনীয়। দয়ালুস্বভাব বশতঃ

তিনি অনেক দরিদ্র লোককে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন। রামদুলালেরও দয়া ছিল এবং তিনি একজন সরল ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। দয়া, বুদ্ধি এবং সরল প্রকৃতির যে মান, তাহা ইঁহাদিগের প্রাপ্য; কিন্তু তদধিক নহে। ধনের গৌরব রামদুলাল সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন। এখন আমাদের রামদুলালের মত ক্রোরপতি হইতে ইচ্ছা জন্মে বটে, কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁহার জীবনীপাঠে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তাঁহার ক্রোরপতিত্ব কতিপয় বিশেষ ঘটনাচক্রের ফল। সুতরাং অন্য লোকে তাঁহার জীবনী পড়িয়া যে কিছু করিবেন এমত যো নাই। রামদুলালের জীবনীতে গ্রন্থকার দেখাইতে পারেন নাই, কি উপায়ে ক্রোরপতি হওয়া যায়। সুতরাং সে জীবনী পাঠের ফল কি, আমরা বুঝিতে পারি না। জীবনীলেখার উদ্দেশ্য বুঝিয়া জীবনী লিখিতে না পারিলে তাহার সফলতা নাই। দুর্গাচরণ,দ্বারিকানাথ, কেশবচন্দ্র এবং কৃষ্ণদাসের জীবনী সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। রামমোহন রায়ের স্বতন্ত্র জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত আছে। গ্রন্থকারের লিখনভঙ্গি দেখিয়া বোধ হয় তিনি নিজ ব্রত ভাল না বুঝিয়া তাহাতে ব্রতী হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বক্রী অর্দ্ধেক সফলতা লাভ সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ। গ্রন্থকারের মতামত সকল যে পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই,তাহারও পরিচয় গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায়। না বুঝিয়া কোন মতামত দেওয়া অর্ব্বাচীনের কার্য্য।

ভাষা রচনা পক্ষে গ্রন্থকার মন্দ নহেন। তিনি বেশ পরিষ্কার ও শাদা বাঙ্গালায় লিখিতে পারেন। অভ্যাস রাখিলে তাঁহার রচনাপ্রণালী উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা।—

পদ্য-নীতি প্রথম ভাগ। শ্রীসানুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

এই ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থখানি বালক এবং বালিকাগণের শিক্ষার্থই প্রণীত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য দ্বারা তরুণমতি পাঠার্থিগণকে উপদেশ দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য। সেই জন্য গ্রন্থকার ইংরাজী কবি গে এবং ঈসপের কতিপয় পদ্য বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। শিক্ষার্থিগণের জন্য এ প্রকার গ্রন্থের যতই সংখ্যাবৃদ্ধি হয় ততই ভাল। ভাষা আরও সরল হইলে ভাল হইত। প্রথম ভাগের ভাষা খুব সরল করিলে তবে দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগের ভাষা উঠিতে পারে। আমাদের স্বদেশীয় সাহিত্য গল্পের ভাণ্ডার। সেই ভাণ্ডার হইতেও দু চারিটী রত্ন আহরণ করিয়া গ্রন্থে নিবদ্ধ করাও গ্রন্থকারের কর্ত্তব্য ছিল।

সংক্ষিপ্ত জমিদারী।—শ্রীযুক্ত বাবু রামতারক মুখোপাধ্যায় প্রণীত এবং সোমপ্রকাশ ডিপজিটারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ⁄১০ মাত্র।

পুস্তকখানি নামে সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাতে জমিদারী বিষয় শিক্ষা করিবার যথেষ্ট আছে। ইহার ভাষা সরল এবং মূল্য অন্যান্য জমিদারী পুস্তক অপেক্ষা অল্প। পুস্তকখানি প্রাইমারী পাঠশালার ছাত্রগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখানি পাঠ্যপুস্তক করিলে নিশ্চয়ই অন্যায় নির্ব্বাচন হইবে না।

শত বর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ।

গ্রাম্য দৃশ্য।

গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যা হইয়াছিল, সন্ধ্যার পর চুরি ডাকাইতির উৎপাত। তজ্জন্য গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয় নাই। এখন একবার চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া দেখিতে হইবে। অন্যের কথা কি জানি না, নিজের কথা বলি,—গ্রাম্য দৃশ্য আমাদের বড় ভাল লাগে।

বাঙ্গালার কোন কোন গ্রামে গৃহস্থের ঘরগুলি দুই ধারে সারি দিয়া নির্ম্মাণ করা, মধ্যস্থলে পথ। কোথাও এ প্রকার শৃঙ্খলা নাই। এক এক স্থানে এক একটি গৃহস্থের বাটী, বাটীর চতুর্ধারে বন। গৃহস্থেরা তরিতরকারী ও ফলের জন্য নারিকেল, তাল, সুপারি, আতা, পেঁপে, রম্ভা, আনারস, লাউ, কুমুড়া, সসা, কেঁছুলী, পুঁই, পালংশাক, নটে প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষলতা ও শাক-সব্জি বাটীর চারিদিকে রোপণ করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটী মাচা। মাচার উপর লাউ, কুমুড়া, সসা ও পুঁই গাছ উঠিয়াছে। কাহারও বাটীতে মাচা নাই, লাউ ও কুমুড়া গাছ চালের উপর লতিয়া বেড়াইতেছে। বাটীর গৃহিণীরা এক একটী কুমুড়ার বোঁটায় দুই একগাছি তৃণ বাঁধিয়া চিহ্ন করিয়াছেন—এইটী দুর্গাপূজার, এই কুমুড়াটী কালীপূজায় কাটা হইবে, এইটী বীজের জন্য থাকিবে। কোন গৃহস্থের বাটীতে তরিতরকারীর সঙ্গে জবা, দোপাটী, সূর্য্যমুখী, গেঁদা, করবী, প্রভৃতি নানা রকমের ফুলের গাছ। প্রভাতে ব্রাহ্মণেরা তাম্রকুণ্ড কিম্বা সাজি হাতে করিয়া তলায় তলায় ফুল তুলিয়া বেড়ান। বাটীর পাশে ছোট একটী ডোবা। তাহাতে শুশুনী, কলমী ও হিলঞ্চ শাক। পল্লীগ্রামের দরিদ্র-লোকেরা বাটীর নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবায় আজও এক এক ঝাড় কলমী লতা পুতিয়া রাখে। প্রত্যহ রন্ধনের সময়, তাহার ঝাড় হইতে একমুষ্টি শাক তুলিয়া আনে। ইহাই বাঙ্গালার গরিব লোকের ষোড়শোপচার ব্যঞ্জনের আয়োজন।

বাঙ্গালায় বনের অভাব নাই, তবু লোকের কাঠের কষ্ট বিলক্ষণ ছিল। যাহাদের বাটীর চতুর্দ্দিক ঘেরা, সে সকল লোক পালঙ্গের নীচে খড়, কাঠ, নারিকেল পাতা, তাল পাতা প্রভৃতির ভুঁড় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিত। পাঁচিরের গায়ে গোবর নেদী। বাটীর সম্মুখে ছাই, অঙ্গার, জঞ্জাল রাশি হইয়া আছে। ইতর লোকের বালক বালিকারা কক্ষে ঝুড়ী লইয়া পথে পথে তৃণ কাষ্ঠ কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। কেহ কেহ মাঠের মধ্যে পালের গোরুর গোবর কুড়াইয়া আনিতেছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর নিকটে যে সকল

লোকালয় আছে, সেখানকার গৃহগুলি অন্যরকম। ক্ষুদ্র নদীর জল বর্ষাকালে উথলিয়া উঠে, মাঠ ও গ্রাম ডুবিয়া যায়। যে দিকে চাহিবে, সকলি জলময়, চারি ধারে কেবল জলতরঙ্গ খেলিয়া বেড়াইতেছে। উপরে বড় বড় গাছ, জলের মধ্যে জাগিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে গৃহস্থের বাটী। ঐ সকল একবার বন্যাতে ডুবিলে দুই তিন দিন মনুষ্যের গতিবিধি থাকে না। গ্রামবাসীরা ডোঙ্গা ও সাল্‌তী চড়িয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করে। পাছে বন্যার জলে ঘর ডুবিয়া যায়, সেই ভয়ে গৃহস্থেরা মাটীর উপর সাত আট হাত ডিপি করিয়া তাহাতে গৃহ নির্ম্মাণ করে। নিম্নে খালের ভিতর পথ। এরূপ স্থলে পলি পড়িয়া ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা হয়। কিন্তু বর্ষাকালে গ্রামবাসীদের কষ্টের সীমা থাকে না।

তাহার পর বৈরাগীদের আকড়ার কথা শুনিতে পাই, বৈরাগীরা নাকি গৃহী নয়; কিন্তু চক্ষে দেখি, তাহাদের ক্রিয়াকাণ্ড গৃহস্থের চেয়ে চতুর্গুণ-বেশী। আকড়াঘরগুলি প্রায় আটচালার মত। আটচালার চতুর্দ্দিকে দোচালা। উঠানে, বাটীর চারিদিকে নানাজাতি ফুলের গাছ; ঘরের উপর মাধবীলতার বন,—শাখা পাতা মেলিয়া রবিরশ্মী ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উঠান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এক বিন্দু সিন্দুর পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। উঠানে, দাওয়ায়, ঘরের ভিতর এক একটী সমাজ। প্রভুরা সেই সমাজে দেহ রাখিয়া বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন। সমাজের উপর ফুল ও গোছা গোছা ফুলের মালা। মালায় চন্দন লেপন। আক্‌ড়ার ঘরে দ্বারে যেখানে সেখানে বড় বড় বাবাজী, দলে দলে সেবাদাসী। কোন বাবাজীর মাথায় কেশনাই, গলায় মোটা মালা, সর্ব্বাঙ্গে—'নিত্যানন্দ', 'রাধাকৃষ্ণ' এই সকল নামের ছাপ। পেট মোটা, শরীর গোলান গালান। কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরা। ব্রাহ্মণের কাছে মাথা হেট করেন না, জ্বর হইলে বিল্বপত্রের রস খান্ না; সর্দ্দি করিলে কাসেন না; বৃন্দাবন যাইবার সময় কালীর কাছে চক্ষু মুদিয়া থাকেন। বাবাজীর মত কৃষ্ণভক্ত আর নাই, অষ্ট প্রহর কেবল কৃষ্ণরসেই মজিয়া আছেন। বেশ্যা দেখিলে বৃন্দাবনের নিধুবনের কথা মনে পড়ে, গাড়ীর চাকা দেখিলে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র স্মরণ হয়, আর ভাবে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠেন।

কোন প্রভুর মস্তক মুণ্ডিত নয়, মাথায় চূড়া করা চুল বাঁধা। মুখে দাড়ী গোঁপ। গায়ে খিল্‌কা। খিল্‌কাখানি যেন কলুর ঘানি হইতে তুলিয়া আনা হইয়াছে,—ব্রহ্মাণ্ডে এত মলিন ও তেলচিটা আর কিছুই নাই। সেবাদাসীরা কেহ ভিক্ষা করিতে গিয়াছেন; কেহ রন্ধন করিতেছেন; কেহ গোরুর সেবা করিতেছেন; কেহ বাবাজীদিগকে তৈল মাখাইতেছেন; কেহ বাবাজীর পাদপদ্ম টিপিতেছেন, কেহ পেয়াজ দিয়া পান্তভাত খাইতেছেন।

সন্ধ্যার পর ত্রৈলোক্যের আমোদ এক আক্‌ড়ার ভিতরে। কোথাও ডুব্‌কী বাজাইয়া নেড়ীরা বাউলের সুরে গান ধরিয়াছে; কোনখানে একতারা ও গুপীযন্ত্র বাজিতেছে; কোনখানে খোল ও করতাল,—বাবাজী হাঁটু পাতিয়া মুদ্রিত চক্ষে লোফা ধরিয়াছেন,—'বঁধুর প্রতি অঙ্গ লাগি আমার প্রতি অঙ্গ কাঁদে, এ নয়ন ত কাঁদে না।' এইরূপ করুণরসে কীর্ত্তন জমিয়াছে; ভক্তেরা ভাবে ঢল ঢল হইয়া এক এক বার মৃত্তিকায় হাত বুলাইতেছেন আর ধূলা খাইতেছেন।

এখন বর্দ্ধিষ্ঠ গ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সাধারণকার্য্যোপযোগী ঘরগুলি পৃথক্‌ করা হইতেছে, গৃহস্থের বাটীর সঙ্গে তাহাদের কোন সংস্রব থাকিতেছে না। পূর্ব্বে এ প্রথা ছিল না। অধ্যাপকমহাশয়ের সদরেই টোল। সদরে স্থানাভাব হইলে অন্যত্র চতুষ্পাঠী গৃহ নির্ম্মাণ করা হইত। বোধ করি এখনকার অনেক লোক সে কালের টোল ঘর দেখেন নাই। কথায় বলিলে হয় ত ভাল বুঝিতেও পারিবেন না। তখনকার বড় বড় চৌবাড়ীগুলি প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দীর্ঘ এবং সাত আট হাত প্রশস্ত ছিল। ঘর দোচালা। ভিতরে দশ পনরটী লম্বা চতুষ্কোণ বেদী। এক একটী বেদীর পাশে ন্যূনাধিক দুই হাত প্রশস্ত নিম্নমেজে। বেদীর উপর ছাত্রদের শয়ন করিবার শয্যা ও পাঠের পুঁথী। রাত্রিতে সেইখানে তাহারা শয়ন করিত। নিম্নখালের ভিতর রন্ধনের স্থান,—উনান, হাঁড়ী, কলসী ইত্যাদি। বাহিরে দীর্ঘ চালা। অধ্যাপকমহাশয় সেইখানে কম্বলে কিম্বা কুশাসনে বসিয়া শিষ্যদিগকে বিদ্যা দান করেন। ছাত্রদের আসন পৃথক্‌। তাহারা তালের চটীতে বসিয়া পাঠ লইত। অষ্টমী ও প্রতিপদ ভিন্ন অন্য দিন সহজ মানুষ টোলের কাছে দাঁড়াইলে বন্ধকালা হইয়া যাইত। কোথাও ছাত্ররা চীৎকারশব্দে অমরকোষ মুখস্থ করিয়া রাখিতেছে; কেহ কেহ ব্যাকরণের সূত্রগুলি অভ্যাস করিয়া যাইতেছে; কোন ছাত্র ভট্টি পড়িতেছে, কেহ রঘুবংশ, কেহ নৈষধচরিত। অধ্যাপকমহাশয় এক একবার বিরক্ত হইয়া মাথা নাড়িতেছেন—না, ও হইল না। তাহার পর অষ্টধাতুর অঙ্গুরিশোভিত আঙ্গুল নাড়িতে নাড়িতে সুরলালিত্যের ভাব করিয়া স্বয়ং একবার শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া দিতেছেন। ছাত্রেরা গুরুলঘু বিচার করিয়া পুনরাবৃত্তি করিতেছে। কোন কোন স্থলে দুইজন অধ্যাপক ন্যায়ের তর্কে মহা বাক্‌ কলহ লাগাইয়াছেন। শিখা খুলিয়া পৃষ্ঠের উপর দুলিতেছে, চপেটাঘাতে মাটীর সাতপুরু ধূলা উঠিয়া পড়িতেছে। কোথাও গৃহস্থের দুর্দ্দৈব, সে চান্দ্রায়ণের বিধান লইতে আসিয়াছিল; ভট্টাচার্য্যমহাশয় তুলটকাগজ উল্টাইতেছেন আর ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যাপককে গালি দিতেছেন।

জগতে তিনিই অদ্বিতীয় লোকটী জন্মিয়াছেন, যতদিন জীবিত থাকেন, সে সৌভাগ্যের কথা,—মরিলে তেমন গুণবান্ ব্যক্তি আর পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু বাঙ্গালার আর সে দিন নাই। টোলের জাঁক ফুরাইয়া গিয়াছে। অধ্যাপকদের মস্তকে আর চুলের শিখা ছুলিয়া বেড়ায় না। এখন কলেজের অধ্যাপকদের কেশের উপর ক্যাপ্ বসিয়াছে। আর কণাদ অক্ষপাদের আদর নাই, এখন মিল ব্যেনের আদর বড়।

সে কালে শিশিসজ্জিত ডিস্‌পেন্সরী ছিল না। তখনকার বৈদ্যের বাটীই চিকিৎসালয়। সেখানেও টোলের মত ধুম। এক এক জন বৈদ্যের বাটীতে দশ পনর জন, কোন কোন স্থলে ত্রিশ চল্লিশ জন ছাত্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিত। কবিরাজমহাশয় তাহাদিগকে খাইতে দিতেন। টোলের চেয়ে বৈদ্যবাড়ীর ঘটা আরও অধিক। ছাত্রদের কোলাহল তাহার উপর ঔষধ প্রস্তুত করিবার শব্দ,—যেন সাগরে জলকল্লোল উঠিতেছে। কেহ হামাম দিস্তায় দুপ্‌দাপ্ করিয়া কল্কদ্রব্য কুটিতেছে, কেহ খলে জারিত ধাতুদ্রব্য মাড়িতেছে, কেহ ঢেঁকীতে মুর্চ্ছাদ্রব্য কুটিতেছে, কেহ শিলায় মসলা বাটিতেছে; কোন খানে খোলার উপর তৈল ও ঘৃত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে; কোথাও গজপুটে ধাতুপাক হইতেছে; অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকেরা লাল কাল বড়ী পাকাইতেছে। বাহিরে কবিরাজমহাশয়, সম্মুখে ঔষধের বাক্স ও পুথীপত্র। নিকটে জগতের রোগী ঘিরিয়া বসিয়াছে। কেহ হাত দেখাইতেছে, কোন রোগী নাকিস্বরে আপনার পীড়ার কথনিকা দিতেছে। কবিরাজমহাশয় হাত দেখিয়া কাহাকেও মুষ্টিযোগ বলিতেছেন, কাহাকেও বড়ী দিতেছেন, কোন রোগীকে দেড়মণ মশার দুগ্ধ আনিবার জন্য বরাত করিতেছেন। কত লোক তৈল, ঘৃত প্রভৃতি নানা প্রকার ঔষধ ক্রয় করিতে আসিয়াছে। অবকাশ বুঝিয়া সকলে আপন আপন প্রয়োজন বলিতেছে। কবিরাজমহাশয়ের একটী কলসীর মধ্যে সকল প্রকার তৈল থাকে। চাকরেরা সঙ্কেত মত সেই কলসী হইতে অঙ্গারক, বিষ্ণু, চন্দনাদি প্রভৃতি অনেক রকম তৈল বাহির করিয়া ক্রেতাদিগকে দিতেছে।

সে কালে অধ্যাপক এবং কবিরাজেরা ছাত্রদিগকে অকাতরে অন্ন ও বিদ্যাদান করিতেন, বিদ্যার্থীদের কোন ব্যয় ছিল না। তবে কষ্টের মধ্যে, গুরুগৃহে তাহাদিগকে সকল কর্ম্ম করিতে হইত। তাহারা রন্ধনের কাট কাটিয়া দিত, দোকান হইতে তৈল লবণ আনিত, অধ্যাপকের গোরুবাছুরের সেবা করিত, কিন্তু এত কাজেও বিদ্যাভ্যাসের ব্যাঘাত ঘটিত না। প্রত্যেক টোলে ছাত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; ক্ষুদ্র টোলে দশ পনর জন, বড় টোলে ত্রিশ চল্লিশ

জন। সুতরাং পাঁচ জনে পাঁচ কাজের ভার লইলে কাহার সময় নষ্ট হইত না।

সে কালের অধ্যাপক এবং কবিরাজদের অনেক গুণ ছিল। কিন্তু দোষশূন্য মানুষ নাই, অধ্যাপক এবং কবিরাজেরা সর্ব্বতোভাবে দোষশূন্য ছিলেন না। উত্তম তৈলবটের আয়োজন হইলে বড় বড় অধ্যাপকেরা সকল রকম ব্যবস্থা দিতে পারিতেন। তখন তাঁহাদের দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না। কবিরাজদের দোষ ঔষধে। প্রায় বণিকের সঙ্গে তাঁহাদের একটা ঘরাও বন্দোবস্ত থাকিত। ধনাঢ্য রোগী পাইলে পুথীপত্র দৃষ্টে--'অঘোরসিন্ধু-' 'ষেকমাণিক্যের'—বরাত করিতেন। এই অপূর্ব্ব দ্রব্যের নাম কেহ শুনে নাই, চক্ষে দেখিবে কি ? কবিরাজ বলিতেন—সন্তোষ বণিকের গৃহে এই দুর্লভ পদার্থ থাকিতে পারে। সন্তোষ বণিক কবিরাজের দক্ষিণ হাত, সে দশ হাজার টাকায় এক তোলা চিতা মূল কাগজে মুড়িয়া দিল। কবিরাজদের আর এক দোষ জুয়াচুরী। তাঁহাদের এক ত্রিফলার বড়ী হইতে সকল ঔষধ জন্মে। হাতে তুলিয়া দিলেই সেই এক ঔষধ জ্বরাঙ্কুশ, তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, তাহাই সোমনাথ রস। অভ্যাস একবার জন্মিয়া গেলে শীঘ্র ছাড়িতে চায় না। বৈদ্যদের ঘরে এতাবৎকাল কত পুরুষ জন্মিল; কত পুরুষ জন্মিয়া রোগী চালাইলেন এবং আপনারাও চলিয়া গেলেন, কিন্তু অভ্যাস আজও ঘুচিল না। এখনও অনেক স্থলে ঔষধে সেইরূপ ফাঁকি চলিতেছে।

অধ্যাপক ও বৈদ্যের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে, তাই এ দুইটীকে ঠিক পরে পরে বর্ণনা করিলাম। তাহার পর গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ও জমিদারী কাছারীর কথা। এই দুটীতেও ঠিক সেই রকম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সে জন্য এ দুটীকেও ঠিক পরে পরে বর্ণন করিব। সে কালে পাঠশালার স্বতন্ত্র বাড়ী ছিল না। গ্রামের বর্দ্ধিষ্ঠ লোকের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসিত। এক চণ্ডীমণ্ডপের উপর অনেক কাজের ভার। দোল দুর্গোৎসব চণ্ডীমণ্ডপে; বিবাহ যজ্ঞোপবীত চণ্ডীমণ্ডপে; ব্রাহ্মণ-ভোজন চণ্ডীমণ্ডপে। এই সকল কাজের পর যখন চণ্ডীমণ্ডপ খালি হইত তখন সেখানে পাঠশালা বসিত। তখনকার বিদ্যালয়ে দীর্ঘাকার মানচিত্র ঝুলিত না, চেয়ার টেবেল বেঞ্চ ছিল না। বালকেরা বসিবার জন্য আপন আপন বাটী হইতে তালের চটী, গুণ ও মাদুর আনিত। গুরুমহাশয় নিজে একটী ছোট মাদুরে বসিতেন।

পাঠশালা দিনের মধ্যে দুই বেলা বসে—একবার প্রাতঃকালে একবার বৈকালে। কিন্তু দুই বেলার মধ্যে এক বেলাতেও পাঠশালা বসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় নাই,—৬টা নাই, ৮ আট্‌টা নাই, ১০ দশটা নাই; অথচ বালকদের অগ্রপশ্চাৎ আসা দেখিয়া শাস্তি হইত।

যে বালক সর্ব্বাগ্রে আসিত, সেই অন্যান্য বালকের হাজিরা লিখিত। যে প্রথমে আসিত সে শূন্যের (০); যে তাহার পর আসিত, সে (১) একের; তাহার পর (২) দুয়ের; এইরূপে যথাক্রমে তিন, চারি ইত্যাদি সংখ্যা লেখা থাকিত। যে যাহার পর আসিত, সে বালকের তদ্রূপ সংখ্যা হইত। যদ্যপি পাঁচ ছয় জন বালক এক সঙ্গে আসিত, তবে পাঠশালার নিকটবর্ত্তী হইলে অগ্রে পৌঁছিবার জন্য মহা মল্লযুদ্ধ পড়িয়া যাইত। দৈবাৎ কেহ এক সঙ্গে পৌঁছিলে তাহারা এক প্রকার সংখ্যা পাইত। গুরুমহাশয় এই সকল সংখ্যা দেখিয়া বালকদিগকে হাতছড়ী মারিতেন। যে সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছে সে শূন্যের। বিজ্ঞ গুরুমহাশয় জানেন,—এ বালক সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছে, প্রত্যুষে মুখ না ধুইয়া পাঠশালায় আসিয়াছে, অতএব তাহার অপরাধ কম, সুতরাং শাস্তিও কম হওয়া চাই, তজ্জন্য তিনি বেতের অগ্রভাগ দিয়া তাহার হাতে ধীরে একটী খোঁচা মারিলেন। এই ধীর খোঁচাটী হিসাবপণ্ডিত গুরুর শূন্য। শূন্যের বালক খোঁচা খাইয়া চীৎকার শব্দে যথাক্রমে অন্যান্য বালকের নাম হাঁকিতে লাগিল,—'রামশরণ 'একের'। রামশরণ আসিয়া হাত পাতিল। গুরু মহাশয় তাহার হাতে ধীরে একটী বেত্রাঘাত করিলেন। সে একের কিনা, তাই সে আঘাত তত মারাত্মক নয়। 'ফুলুই দুয়ের'। ফুলই হাত পাতিয়া দিল। দুয়ের আঘাত কোমল, তবে একের চেয়ে চড়া দরের। এইরূপে তিন চারি পাঁচ পর্য্যন্ত নিতান্ত বালক না হইলে সহ্য করিলেও সহ্য করিতে পারে। তাহার পর অগ্নিবৃষ্টি। কাহারও হাতে ফোস্কা পড়িতেছে; কাহারও সাতপুরু চর্ম্ম উঠিয়া গিয়াছে; কেহ হাত ছড়ী খাইয়া হাত ঝাড়িতেছে; কেহ হাতে তৈল দিতেছে; কাহারও তিন চারি দিন কলমধরা বন্ধ থাকিতেছে। এই গেল গুরুমহাশয়ের হাজিরীগ্রহণ। অন্যান্য অপরাধের শাস্তি আরও অদ্ভুত। গুরুমহাশয় এবং নায়েব ভিন্ন নরলোকে তেমন সকল শাস্তির ব্যবস্থা আর কেহ করেন না।

শ্যামা বড় দুষ্ট বালক। পাঠশালা তাহার বাঘ বোধ হয়। পিতামাতার ভয়ে যে দিন আসে, মন দিয়া লেখা পড়া করে না। গুরুমহাশয়ের আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার মাদুরের নীচে কাঁটা পুতিয়া রাখে। তিনি মুদ্রিত নয়নে যখন ঢুলিতে থাকেন, তাঁহার মুখের কাছে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়। আজি শ্যামা গরহাজির। একপাল ছেলে তাহাকে ধরিতে গেল। শ্যামা ঘরে নাই। তাহার বাপ মা বলিল সে প্রত্যুষে উঠিয়া পাতভাড়ী লইয়া লিখিতে গিয়াছে। শ্যামা লিখিতে যায় নাই, তবে কোথা গেল? গুঁয়েদের পুষ্করিণীতে বড় বড় পুঁটীমাছ থায়, শ্যামা সেখানে নাই। পাইনদের গাছে জাম

পাকিয়াছে, শ্যামা সেখানে যায় নাই,—গাছে কেবল কাক কোকিল টীয়া। মাধবগিরি গোঁসাই কালীতলায় অষ্ট-প্রহর গাঁজা টানে, সেখানেও শ্যামা নাই, তবে সে কোথা? মণ্ডলদের ধানের পালুইয়ের নীচে খুঁজিল, তাঁতীদের তাঁতগড় দেখিল,—শ্যামার দেখা কোথা পাইবে?—সে কানাই যুগীর বাড়ীতে। কানাই যুগীর কালীয় দমনের যাত্রার দল আছে,' শ্যামা সেইখানে গিয়া বালক নাচ শিখিতেছে। সে আর লেখা পড়া করিবে না, যাত্রার দলে কৃষ্ণ সাজিবে। পাঠশালার ছেলেগুলা গোবাঘার মত শ্যামার উপর পড়িল। কেহ হাত ধরিল, কেহ কেহ পা ধরিল, শ্যামা নীচে ঝুলিতেছে। কোন কোন বালক গাছের শাখা ভাঙ্গিয়া শ্যামার উপর ছত্র ধরিয়াছে। তাহার পর উর্দ্ধস্বরে চীৎকার—'গুরুমহাশয়! গুরুমহাশয়! তোমার প'ড়ো হাজির, এক দণ্ড ছেড়ে দাও জল খেয়ে আসি।' শ্যামা বালকদের হাতে ঝুলিতে ঝুলিতে যাইতেছে, মাথার উপর শাখা, তাহার উপর এই চীৎকার,—পথের দুই ধারে রথযাত্রার লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প'ড়ো পাঠশালায় হাজির। গুরু-মহাশয় রাগে অগ্নিকুণ্ড। মাথার শিখা ফর্ ফর্ করিয়া উঠিল, গলার মালা দুলিতে লাগিল, চক্ষু রক্তবর্ণ। প্রথমে শ্যামার নাড়ুগোপালের ব্যবস্থা হইল। নন্দের গোপাল নীলমণি হামা টানিতে টানিতে যে ভাবে নাড়ু চুরি করিয়া খাইয়াছিলেন, গুরুমহাশয়ের এই শাস্তি তাহার নকল। বালকের দুই পা এবং বাম হাত মাটীতে পতিত থাকে, দক্ষিণ হস্ত উঁচ; তাহাতে এক খানি বড় পাথর কিম্বা থান ইট চাপান। ইহাই নাড়ুগোপাল। শ্যামা নাড়ুগোপাল হইল। এক দণ্ড, দুই দণ্ড—শ্যামা আর থাকিতে পারে না। হাত পা ভারী হইয়াছে, ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তখন ভীমবিক্রম গুরু মহাশয় অঙ্গাস্ফালন করিয়া শ্যামার উপর বেত মারিতে লাগিলেন। হাজার বেত হইয়া গেল, মাথা ও পিঠ ফুটিয়া রক্ত ছুটিতেছে। তখন পাঠশালার বড় বড় সর্দ্দার প'ড়োরা গুরুমহাশয়কে ধরিলেন, তাঁহাকে ক্ষান্ত করিলেন। আর এক দিন শ্যামার কদমগাছ হইল, আর এক দিন কপীকল। দুর্ম্মতির চরিত্র যেমন ঠিক তদ্রূপ থাকিল। কদমগাছের শাস্তি কপীকল অপেক্ষা কোমল। চণ্ডীমণ্ডপের খুঁটীর নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত বিচুটী ও আলকুষীতে জড়িত করা হইত। গুরুমহাশয় দুষ্ট বালককে সেই কদমগাছে উঠিতে বলিতেন। কপীকলের ব্যবস্থা অন্য রকম। একটী থলের ভিতর বিচুটী রাখিয়া বালককে সেই থলের মধ্যে বন্ধ করা হইত। তৎপরে গুরু-মহাশয় দড়া দিয়া সেই থলে আড়ার উপর ঝুলাইয়া রাখিতেন। প্রবাদ আছে, এইরূপ শাস্তিতে অনেক বালক প্রাণ

হারাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, একঠেঙ্গো, নাকেখত, কানমলা এ প্রকার লঘুদণ্ড কথায় কথায় ছিল।

এতক্ষণের পর পাঠশালার লেখাপড়ার কথা আসিল। ছোট ছোট বালকদের জন্য গুরুগুরুমহাশয় মাটীতে ক খ দাগিয়া দিয়াছেন, তাহারা খড়ী দ্বারা সেই দাগে দাগ বুলাইতেছে। তাহার চেয়ে বড় বড় বালকেরা পালান-পীঠে ঞ লেখ, তেপুঁটুলে শ লেখ, হল্‌হলে হ লেখ,—এই প্রকারে অক্ষরের রূপ ব্যাখ্যা করিতে করিতে তালপাতার উপর কখ, ককা সিদ্ধি প্রভৃতি লিখিয়া যাইতেছে। বড় বড় বালকেরা নামতা পড়িতেছে। নামতার পর সকলে কলায়পাতে অঙ্ক কসিতেছে। ছুটীর পূর্ব্বে বড় জাঁক। সমস্ত বালক এক দিকে সারি দিয়া দাঁড়ায়, অন্যদিকে কেবল একটী কি ছুইটী বালক। ইহারা শতকীয়া, দশকীয়া ইত্যাদি কড়াগণ্ডা পড়িতে থাকে, অন্য সারির বালকেরা তাহা শুনিয়া উচ্চস্বরে সেই সকল কথা আবৃত্তি করে। পাঠশালায় তখন একসঙ্গে যেন সপ্তসাগরের কল্লোল উথলিয়া উঠে।

গুরুমহাশয়রা এতদূর উগ্রচণ্ড ছিলেন বটে, কিন্তু ছুই এক ছিলিম তামাকু, মধ্যে মধ্যে ছুই একটা মনের মত সিধা দিতে পারিলে তাহার উপর বড় সন্তুষ্ট থাকিতেন। যে বালক এই সকল দিত, তাহাকে হাতছড়ী খাইতে হইত না, তাহার কোন শাস্তিও ছিল না। গুরুমহাশয়রা প্রায় সকলেই কায়স্থ,—চিত্রগুপ্তের জাতি। তাই বালকদের প্রতি যমদণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। সে কালে তাঁহাদের মাসিক উপার্জ্জন নিতান্ত অল্প ছিল। বালকেরা অর্দ্ধ আনা হইতে এক আনা, কচিৎ কেহ কেহ ছুই আনা বেতন দিত। ইহাতে মাসিক তিন চারি টাকা পাওনা হইত। তদ্ভিন্ন সিধা ছিল। বালকেরা পর্য্যায়ক্রমে এক একটী সিধা দিত,—চাউল, ডাউল, তৈল, লবণ, অল্প তরি-তরকারী। হাতেখড়ীর সময়, সাধারণ লোকে একটী ছুই আনী গুরুদক্ষিণা দিত। কলাপাত ও কাগজ ধরিবার সময়েও সেই বরাদ্দ। সম্পন্ন লোকে যখন আপনার পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর হাতে খড়ী দিতেন, সে দিন ঘটা কিছু বেশী বেশী হইত। বালকের মাতা সন্তানকে সকাল সকাল তেল হলুদ মাখাইয়া স্নান করাইতেন। আহ্লাদের ছেলের বড় বিদ্যা হইবে, জননী তাহার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন,—হাতে বালা; বাহুতে তাড়; গলায় মাহুলী; কোমরে বোর, পাটা ও নিমফল; পায়ে বেঁকী, ঘুঙুর ও মল; পরিধান চেলীর কাপড়। চণ্ডীমণ্ডপ পরিষ্কার করা হইয়াছে। পুরোহিত স্বরস্বতীর পূজা করিতেছেন। দীপ ধূপ ধূনা পুড়িতেছে; ঠং ঠং করিয়া কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। ঘটার সীমা নাই।

সরস্বতীর সম্মুখে একটী পিঁড়ার উপর ইন্দুরের মৃত্তিকা ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইন্দুর-মৃত্তিকা দিবার তাৎপর্য্য এই, মূষিক জাতির যেমন সকল সামগ্রীতে দন্তস্ফুট হয়, ছেলেরও তদ্রূপ এমনি বিদ্যা হইবে যে তিনি সকল শাস্ত্রে অক্লেশে দন্তস্ফুট করিতে পারিবেন।

পূজা সাঙ্গ হইল। গুরুমহাশয় বালকের পশ্চাতে বসিয়া তাহার হস্তে একখণ্ড লম্বা ফুল পাথর দিলেম। তৎপরে তাহার হাত ধরিয়া সেই ইন্দুর-মৃত্তিকার উপর ক খ লেখাইলেন। বালক সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া উঠিল। যখন এত সরঞ্জম, বয়স পাকিলে ছেলের অবশ্যই অগাধ বিদ্যা হইবে। বাটীর কর্ত্তা গুরুমহাশয়কে এক জোড়া কাপড় এবং নগদ এক টাকা দক্ষিণা দিলেন। বলিয়া রাখিলেন,—'তুমি ছেলেকে কাগজ ধরাও, তোমাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিব।' অর্থাৎ তখনও আর এক জোড়া কাপড় এবং এক টাকা নগদ পাইবেন।

এই বার জমীদারী কাছারীর সমারোহ ব্যাপার। কাছারীঘর কোন গৃহস্থের বাটী নয়, এটী জমীদারের নিজস্ব ধন। বাহিরে দরজা; ভিতরে চারিদিকে চালা; মধ্যস্থলে বড় বড় ঘর; ঘরের পাশে ছোট বড় কুঠারী। পাক, মণ্ডল, তহশিলদার, খালসানা, পেয়াদা, জমাদার, গোমস্তা, নায়েব,—যেন দ্বিতীয় পুলিশ দরবার। উঠানে প্রজার পাল, সকলেই চক্ষের জলে ভাসিতেছে। সুন্দর মণ্ডল চড়কের সময় নায়েবকে হিসাবানা পার্ব্বণী দেয় নাই। খুঁটিতে তাহার হাত বাঁধা, পিঠের উপর নাগরা জুতা পড়িতেছে। হারা গাইন্ জমিদারের জুতা খারাপ করিয়া দিয়াছিল, তাহার পিট ফুটিয়া রক্ত ছুটিতেছে। গোবর্দ্ধন বেশী খাজনা কবুল করে নাই, সে চুনের ঘরে কয়েদ আছে। সখীরায় জমিদারের এক কঠিন মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষী দিতে সম্মত হয় নাই, সে বে-আপদান কয়েদ আছে। হরার বিধবা ভগিনীর গর্ভ হইয়াছিল, সে নায়েব গোমস্তাকে কিছুই দেয় নাই, আজ তিন দিন কাছারীতে উপবাস করিয়া শুধু কমারি খাইতেছে। শঙ্করা ১০ দশ টাকা খাজনা দিয়া চারিটাকার বৈ রসিদ পায় নাই, তাহার জন্য আবার আপত্তি করে! তাহার বুকে জগদ্দল পাথর চাপান আছে। জমিদারের জ্যেষ্ঠকন্যার বিবাহ; গ্রামের প্রায় সিকিপ্রজা দস্তুর মত ভিক্ষা দিতেছে না। রাম সিং দুই বেলা তাহাদিগকে কাছারীতে আনিয়া প্রহার করিতেছে। নায়েব মহাশয় মনিবের আদেশমত কত প্রজাকে গুম করিলেন, কত প্রজার ঘর দ্বার লুঠ করিলেন, দুর্বুদ্ধিরা পৈতৃক বাস ত্যাগ করিয়া পলাইল, তবু তঙ্কাপ্রতি চারি আনা ভিক্ষা দিল না। জমিদারের চাকরের প্রয়োজন, রামা দশমাস বেগার খাটিতেছে, আর তাহারে রাখা ভাল দেখায় না। তাহার ঘর

গৃহস্থালী আছে, বাটীতে স্ত্রীপুত্র পরিবার রহিয়াছে, রামা বারমাস বেগার খাটিলে তাহারা খায় কি? আর এক জন নূতন লোক পাঠাইতে হইবে, কিন্তু কেহই যাইতে চায় না। প্রজার জাতি বড় দুর্ম্মতি, সহজে নরম হইবার নয়! জমিদারের ঘরে সচ্ছন্দে খাইতে পরিতে পাইবে; চিরকাল নয়,—পাঁচ সাত মাসের জন্য, তবু একটা বেগার মিলে না। নায়েবমহাশয় প্রজাদের ধরিয়া বাঁধিলেন, পিটিলেন, তবু কেহ রাজী নয়। অধঃপেতেদের ঘরে অন্ন নাই, তবু ভ্রুকুটীটুকু বিলক্ষণ আছে।

আজি কালি অবিবেচক জমিদারদের যে প্রকার অত্যাচার দেখা যায়, পূর্ব্বে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ছিল। তাহার বিস্তারিত বিবরণ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইবে। সংসারে অবস্থার বৈষম্যই যত অনর্থের কারণ। অর্থ নিয়মিত পরিমাণে সকলের হাতে যায় না, তাই এত অত্যাচার। দেহের বলেই অধিকার ও আধিপত্য। আধিপত্য হইতেই জুলুম দৌরাত্ম্যের সৃষ্টি। রামার আর কোন অপরাধ নাই; অপরাধ—সে জমিদারের অধিকারে বাস করে। রামা গরিব মানুষ, সে জমিদারের অসম্মতিতে কোন কাজ করিতে পারে না। করিলে, জমিদার তাহাকে ফেরেবে ফেলিবেন, তাই রামা প্রাণের ভয়ে বেগার খাটিতেছে। কতকটা পেটের দায়ে জমিদারের মন রাখিতেছে। না রাখিলে, তাহার বাস্তু বাজেয়াপ্ত হইবে। তাই রামা সর্ব্বদাই শঙ্কিত। ঐ দেখ গোকুল বাবু সকাল সকাল ষোড়শোপচারে ভোজন করিয়া পালঙ্কে শয়ন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণে ও বামভাগে বালিশ, মস্তকে তাকিয়া; সম্মুখে টেপাইয়ের উপর সুগন্ধি ফুলের গুচ্ছ। রামা খানসামা অম্বরী তামাকু সাজিয়া দিয়াছে, বাবু ধীরে ধীরে টানিতেছেন। নিদ্রাবল্যে এক একবার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, সে সময়ে নলে টান দিতে ভুলিয়া যাইতেছেন, নাসিকা অল্প অল্প ডাকিয়া উঠিতেছে। আবার চটকা ভাঙ্গা হইয়া নল মুখে দিতেছেন। বড় টানাপাখা খানা মাথার উপর দুলিয়া বেড়াইতেছে, বাবু থাকিয়া থাকিয়া তবু বাতাস বাতাস করিতেছেন।

রামা তামাকু দিয়া বাবুর পা টিপিতেছে, এখনও ভোজন হয় নাই, পেটের পিত্ত পুড়িয়া যাইতেছে। কাজ সাঙ্গ হইবে, তবে রামা খাইতে পাইবে। রন্ধনশালায় তাহার জন্য অন্নব্যঞ্জন সাজান আছে, মৌচাকের মত ঝাঁকে ঝাঁকে মাছী বসিতেছে, এক এক বার উড়িয়া বন্‌বন্‌ করিতেছে; আমিষের গন্ধ পাইয়া বিড়ালে ব্যঞ্জন খাইয়া ফেলিয়াছে; ইন্দুরে সুযোগ বুঝিয়া দুই এক খণ্ড তরকারী চুরি করিয়াছে। এই সকল লুঠের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, কাজ সারিয়া রামা তাহাই খাইতে পাইবে। রামার জঠরজ্বালায় আগুন লাগিয়া যাউক্।

রামা জমিদারের প্রজা, সেই অপরাধে তাহার এত যন্ত্রণাভোগ। সে এক বিঘা চাকরান্ ভূমি খায়, সরকারে দশ বিঘা জমি রাখে, রামার তাই এত কষ্ট। বাবুর পীড়া হইলে সে বিষ্ঠা পরিষ্কার করে, জল পিপাসা লাগিলে মুখে জল দেয়, সারা রাত্রি জাগিয়া গায় হাত বুলায় ও বাতাস করে। রামার পীড়া হইলে কে দেখে?—যম। রামা গাত্রদাহে এ পাশ ও পাশ করে, কাছে জন প্রাণী নাই। রামা জল পিপাসায় ছট্‌-ফট্ করে, মুখে একগণ্ডূষ জল দিতে কেহই নাই। রামার অসময়ে বাবু যদি ফিরিয়া না দেখিবেন, বাবুর পীড়ার সময় রামা কেন দেখিবে? বাবু কাছে আসিয়া বসুন, বাতাস করুন, সারারাত্রি জাগিয়া থাকুন্। রামা জাগিয়াছিল, বাবুকে জাগিতে হইবে। রামার পীড়িত হস্তপদ টিপিয়া দিতে হইবে। তুমি বড় মানুষ, তাই যদি তোমার লজ্জা করে; এমন অবস্থার বৈষম্যে আগুন লাগুক্, জগৎ দহে ডুবুক্; আমি উৎসন্ন যাই, জন্মের মত রামা অধঃপাতে যাউক।

রামার এক তিল স্বস্তি নাই। রাত্রি দুই প্রহর, কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিতেছে, ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া জল পড়িতেছে, বাবু আজ্ঞা করিলেন, রামা দশ ক্রোশ পথ ছুটিল। রামা জলপাত্র লইয়া ভোজন করিতে যাইতেছে, বাবু হুকুম করিলেন, রামা অমনি জলপাত্র ফেলিয়া কাজ সারিতে গেল। কৈ, রামার কাজ পড়িলে বাবু ত দেখেন না? রামা সময়ে ঘুমাইতে পায় না, সময়ে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, কেন সে এত কষ্ট সহিবে? রামার কাজের সময় আমি যদি রামার না হই, আমার কাজের সময় সে কেন আমার হইবে? রামার এত কিসের গরজ? রামাও যেমন, আমিও তেমন; আমি রামার, রামা আমার। আমি রামাকে ভালবাসিব, রামা আমাকে ভালবাসিবে। লোকের সঙ্গে ব্যবহার—আরসীতে মুখদেখা। অবস্থার বৈষম্যে তাহার যদি বিপরীত হয়; ধনগরিমায় তাহা যদি না ঘটিতে দেয়; ছার ধন উড়িয়া যাউক্, পোড়া সংসার আরও পুড়ুক্, জগৎময় আগুন জ্বলিতে থাকুক্।

বলিয়াছি, জগতে এত ক্লেশ অবস্থার বৈষম্যের জন্য। ধনরাশি ঠিক ছড়ান হয় না, তাই লোকের এত কষ্ট। ধনী লোকেরা প্রবল, তাহারা তস্করের জাতি। দরিদ্র লোকেরা নির্জীব, তাহারা মেষের পাল। রামার বল নাই, সে বাবুর মুখ হইতে পাঁচসেরের দুগ্ধের বাটী কাড়িয়া লইতে পারে না, তাই তাহার ভাগ্যে আড়াই সের দুগ্ধ জুটে না। সে একটা বার্ত্তাকুদগ্ধ দিয়া অন্ন ভোজন করে। রামা বাবুর গা হইতে হাজার টাকার সালের জোড়া কাড়িয়া লইতে পারে না, তাই তাহার ভাগ্যে একখানা বনাত হয় না। সে বুকে হাঁটু দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে শীত কাটায়। রামার এত কষ্ট

কিসে, দেখাই। রামা নিজের ধন নিজে ভোগ করিতে পায় না; তাহার পনর আনা উপস্বত্ব অন্যে লুটিয়া খায়। রামা যাহা পায়, তাহাতে রামার দিন চলে না, তাই সে এত কষ্ট ভোগ করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

হোরি।

(প্রথম বৎসর।)

আয় সখি! ত্বরা করি
প্রভাতিল বিভাবরী
খেলিবারে হোরি আজ বনমালী সাজিছে!
উছলে যমুনাজল,
গুঞ্জরিছে অলিদল,
পুলকে পাপীয়া দেখ আকাশেতে ছুটিছে!
ফুলকুল প্রেমভরে,
শ্যামচাঁদে তুষিবারে,
হৃদয় খুলিয়া দিয়ে অই দেখ হাসিছে!
আলো সখি! ত্বরা কর,
ও হাসি সহেনা আর,
ও খোলা হৃদয় বড় প্রাণে মম বাজিছে!
সাজাইয়া দে আমারে,
যেখানে যা শোভা করে,
দেহ তনু সাজাইয়ে মনোমত রতনে,
মনোমত সাজা আলি,
বিকাশি রূপের ডালি,
মোহিত করিতে যেন পারি রাধামোহনে!
আজি অই নিধুবনে
খেলিব শ্যামের সনে,
হারিয়াছি চিরদিন আজি তারে হারাব!
আকুল করিব প্রাণ,
বরষি নয়নবাণ,
নারীর অক্ষয় তূণ আজি শ্যামে দেখাব!
আবির, কুঙ্কুম, মালা,
সাজাইয়া আন ডালা,
রণসাজে সাজি চল শ্যামচাঁদে ভেটিব।
আকাঙ্ক্ষা বিমান পরে,
অনঙ্গে সারথী করে,
মলয় সমীরে আজ সেনাপতি করিব।
রণবাদ্য বাজাবারে,
লও ভৃঙ্গে পিকবরে,
সাজ সখি! ত্বরা করি বিলম্ব না সয়রে!
কবি বলে গোপবালা!
ত্বরা কর এই বেলা,
কি জানি বিলম্ব হলে কালেতে কি হয়রে।

(পর বৎসর।)

প্রাণ কাঁদে নিরখিয়ে
নিশায় বিদায় দিয়ে
দেখ সখি! ঊষা দূতী অরুণেরে আনিছে!
খেলিবারে হোরি আজ,
ধরিয়ে মোহন সাজ,

হায় সখি! ব্রজধামে শ্যাম মম আসিছে!
আসি শ্যাম কি দেখিবে,
হায় কারে সুধাইবে,
রাধার জীবনদীপ এখনি তো নিবিবে!
রাধায় তুষিবে বলে,
আসি শ্যাম কুতূহলে,
যমুনার নীলাতটে ভস্মরাশি পাইবে!
"এস রাধে! রাধে!" বলি,
ডাকিবে যবে মুরলী,
প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করি "এস রাধে বলিবে।"
আজি এ সুখের দিনে,
রাধিকার অদর্শনে,
বেদনা কোমল প্রাণে শ্যাম কত পাইবে!
একটী মিনতি সখি!
রাধিকায় নাহি দেখি,
সে কমল-আঁখি যবে অশ্রুজলে পূরিবে,
অশ্রুবিন্দু যেন পড়ে,
চিতানল ভস্ম'পরে,
ভস্মশেষ রাধিকার দগ্ধ তনু জুড়াবে!
আছে কিরে সখি, মনে,
আজি এ হোরির দিনে,
বিগত বরষে সখি! কত সাধে খেলেছি!
হায়! অই নিধু বনে,
প্রাণের শ্যামের সনে,
কতই সাঁতার সখি! সুখসরে দিয়েছি!
কবি কহে ব্রজেশ্বরি!
কি হবে সে কথা স্মরি,
ধাতার নিষ্ঠুর বিধি প্রতিদিন ঘটিছে!
কেবল তোমার নয়,
এ ধরা বিষাদময়,
হাসির সঙ্গেতে হায়! হাহাকার মিশিছে!

পরিব্রাজক।

জন কালভিনের জীবনচরিত।

খৃষ্টীয় ১৫০৯ অব্দের জুলাই মাসের দশম দিবসে এই মহাত্মা ফ্রান্সের অন্তর্গত পিকার্ডি প্রদেশস্থিত নোয়ন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সামান্য দরিদ্র লোক ছিলেন, পীপা-নির্ম্মাণকারের ব্যবসায় দ্বারা জীবনাতিপাত করিতেন। কালভিনেরা চারি সহোদর, ও দুই সহোদরা। এতন্মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।

কালভিন বাল্যাবধিই বিশেষ ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন, এই নিমিত্ত, ও তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সংকুলানোপযোগী পিতার তাদৃশী সঙ্গতি না থাকাতে, গ্রামস্থ একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া কিছুদিন স্বীয় আশ্রয়ে রাখিয়া পারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মাধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। তথায় তিনি কর্ডিয়ার নামক একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ডিলা মার্চ্চি কালেজে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সুবিখ্যাত অধ্যাপকের নিকট হইতেই তিনি প্রথম লাটিন ভাষা

শিক্ষা করেন, পরিশেষে ইহাতে অসাধারণ কৃতবিদ্য হইয়া উঠেন। কালভিন তাঁহার সুতীক্ষ্ণ মানসিক বৃত্তি ও সৎস্বভাব গুণে আশৈশব বিলক্ষণ খ্যাত ছিলেন।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি তথাকার ধর্ম্মযাজকের নিকট হইতে একটী বৃত্তি লাভ করেন, এবং আর পাঁচ বৎসরকালমধ্যে মণ্টিভিল নামক ধর্ম্মমন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হন; কিন্তু তিনি দুই বৎসর পরে পণ্টিলিভিকের এই পদের সহিত উহার বিনিময় করিলেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় অধ্যয়নেই নিযুক্ত থাকিতেন, পুরোহিতসম্প্রদায়ভুক্ত হইবারও আদেশ প্রাপ্ত হন নাই।

এই সময় কালভিনের পিতা, "রাজনীতি পর্য্যালোচনাই অর্থ ও সম্মান লাভের স্থির পন্থা," এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তানের ভাবী জীবনাতিবাহন বিষয়ে স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করিলেন। এ পথ কালভিনের পক্ষেও অযুক্তিসিদ্ধ বোধ হইল না; কারণ ইতিপূর্ব্বে রবার্ট ওলেভিটন নামক তাঁহার জনৈক সহপাঠী তাঁহাকে একখানি বাইবেল পুস্তক উপহার দেন, তিনি তৎপাঠে রোমক ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেকগুলি ভ্রম অবগত হইয়া এই ধর্ম্মে কথঞ্চিৎ আস্থাশূন্য হন। এই সময় মার্টিন লুথর রোমকধর্ম্মবিরুদ্ধীয় আন্দোলন লইয়া জর্ম্মানসাম্রাজ্যে এক ঘোরতর আন্দোলন উত্থিত করেন, এবং স্বীয় ধর্ম্মমত ইউরোপখণ্ডের চতুর্দ্দিক প্রচারিত করিতে আরম্ভ করেন। কালভিনের নিকটও তাহা শ্রুতিপরম্পরাক্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়াছিল, এবং কতক পরিমাণে তাহা অধিকারও করিয়াছিল, কিন্তু তিনি এই ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বয়ং কোন মত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কিংবা এতদ্বিষয়ে তিনি একেবারেই কোন মিমাংসা না করিয়া ইহা সহসা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইত্যাদি বিষয় প্রগাঢ় সন্দেহস্থল। এক্ষণে তিনি পারিস ত্যাগ করিয়া ওরলিন্স নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় কিছুকাল প্টিয়র ষ্টেলার নিকট অতিশয় পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এবম্বিধ অতিরিক্ত পরিশ্রম অবশেষে তাঁহার শেষ জীবনের অস্বাস্থ্যতার একটি কারণ বলিয়া উপলব্ধি হয়।

ক্রমে লুথর-প্রচারিত ধর্ম্মমত ফ্রান্সে প্রবেশ লাভ করিল; এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ফ্রান্স এ বিষয়ে নিস্তব্ধ ছিল, রোমক ধর্ম্মমন্দিরের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহই উপস্থিত করে নাই, যদিও পোপপ্রচারিত মুক্তিপত্রের বিরুদ্ধে লুথরের লেখনী ধারণের দিবস হইতে আজ দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া জর্ম্মানসাম্রাজ্য ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ ঘোর আন্দোলন ও ভীষণ তর্কবিতর্কে কম্পিত ছিল। ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্স যে একেবারেই এ ঘোর আন্দোলনের কিছুমাত্র অবগত ছিল

না এরূপ নহে, অধিকাংশ লোকই লুথরের প্রচারকগণের কথায় বন্ধুভাবে কর্ণপাত করিতেন, এবং কেহ কেহ গুপ্তভাবে তাঁহাদিগের ধর্ম্মমত সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া অপরিমেয় আনন্দে অবগাহন করিতেন। কালভিনও, অর্লিন্সে অবস্থানকালে এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হন।

কালভিন তদনন্তর ব্রুজেস যাত্রা করিলেন, এখানে আণ্ড্ অলসিএট রাজনীতির শিক্ষক ছিলেন, এবং মিলচিওর ওয়ালমর নামক এক জন ধর্ম্ম-সংস্কারক কালভিন্‌কে গ্রীকভাষায় শিক্ষা দান করিতেন। এখানে কালভিন লুথর-প্রচারিত উন্নত ধর্ম্মমতে বিশেষরূপ আসক্ত ও পরিজ্ঞাত হইয়া গ্রামে গ্রামে তৎপ্রচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। এ বিষয়ে তিনি ঈদৃশ সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, অবশেষে তাঁহাকে তন্নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত পর্য্যন্ত হইয়া উঠিতে হইয়াছিল।

জনসাধারণকে স্বপ্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষা বিষয়ে কালভিন্ এরূপ বিবরণ দেন, যে—"নূতন ও অল্পদর্শী হইলেও বৎসরেককাল অতীত হইবারও পূর্ব্বে অনেকে এই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম আমার নিকট শিক্ষা করিতে আসিত।" ইতিহাসবেত্তা বেজার বিবরণপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি অনেকানেক সম্ভ্রান্ত পরিবারকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, তন্মধ্যে লিগানিবরিসের লর্ড পরিবার একটী।

এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করাতে কালভিন এক উচ্ছলিত কর্ত্তব্যজ্ঞানের ধ্বংস করিয়া বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত একটী কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—"আমি স্বভাবতঃ নির্জ্জন ও নিভৃত আবাসে থাকিতে ভালবাসি, কিন্তু তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না, কারণ আমার নিভৃত স্থান মাত্রই অবশেষে সাধারণ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।" কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মসংক্রান্ত বক্তৃতাতেও যুবকস্বভাবসুলভ চপলতা ও আগ্রহাতিশয্য দৃষ্ট হইত না। তিনি বাগ্মিতার বাহ্য আড়ম্বরের সহিত সত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন না, কিন্তু এরূপ জ্ঞানের গভীরতা ও ভাষার গাম্ভীর্য্যের সহিত শিক্ষা দিতেন যে, কেহই তাহার চমৎকারিত্বাতে একেবারে আনন্দে উন্মত্ত না হইয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতে পারিত না।

এই সময় কালভিনের পিতা কালগ্রাসে পতিত হইলেন, সুতরাং তাঁহাকে নোয়নে প্রত্যাগমন করিতে হইল, কিন্তু তিনি তথায় অধিক দিন অবস্থান করিলেন না, অবিলম্বে প্যারিস যাত্রা করিলেন। প্যারিস নগর এই সময় প্রথম ফ্রান্সিসের ভগিনী নেভারের রাজ্ঞীর প্রযত্নে লিফিবর ও ফরেলের ব্যাখ্যাগুণে নবাভ্যুত্থিত ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিচারালয়ে এবং এমন কি ধর্ম্মযাজকদিগের (Bishops) মধ্যেও এই বিষয় লইয়া একটী ঘোর আন্দোলন ও উদ্দীপনা

উত্থিত হইল, কেবল উত্থিত নহে, প্রতিদিন তাহা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহা বড় অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। রাজা এই বর্দ্ধিতায়মান অনলকে নির্ব্বাপিত করিবার নিমিত্ত অবার্থ সন্ধান করিতে মনঃস্থ করিলেন।

নবধর্ম্মাক্রান্ত লোকদিগের উপর ঘোর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, অনেকেই অকালে কালশয্যার শায়িত হইলেন, ভীতি ও নানাবিধ বিপদগুলীর মধ্যে গোপনে সভা ও চক্রান্ত হইতে লাগিল। কালভিন বিশেষ অনুরাগ ও আগ্রহাতিশয্য সহকারে এই সকল সমিতিতে বক্তৃতা দান করিতে লাগিলেন, এবং প্রচলিত ধর্ম্ম ও মিথ্যা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নূতন প্রকার ধর্ম্মমত এবং উপাসনার উপায় প্রচলন করিবার নিমিত্ত তিনি ১৫৩২ খৃঃ অব্দে সেনেকা নামক বিধর্ম্মী দার্শনিকের ডি ক্লেমেন্সিয়া গ্রন্থ টীকা সমেত প্রকাশিত করিলেন। যে অভিপ্রায়ে তিনি এই গ্রন্থ পুনঃপ্রচারিত করিলেন, তাহার কোন ফলই হইল না, তাঁহার পুস্তক অতি অল্প লোকেই পাঠ করিল; এইরূপে সাহিত্যবিষয়ক তাঁহার এই প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হইল।

পরবৎসর আল সেণ্টস্ ডে (all saints' day)নামক উৎসব বিশেষের দিন পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মাধ্যক্ষ (Rector) কপ্ সাহেব একটি সাধারণ বক্তৃতা করেন; এই উপলক্ষে কালভিন তাঁহাকে নবাভ্যুত্থিত ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। অবশেষে এই ঘটনাতে তাঁহারা উভয়েই পার্লিয়ামেণ্ট ও সবরবন মহাসভার কোপানলে পতিত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। এই প্রকার একটী গল্প আছে যে,—কালভিন তাঁহার এক জন মদ্যবিক্রেতা বন্ধুর সহিত স্বীয় পরিচ্ছদের বিনিময় করিয়া গবাক্ষ-পথ দিয়া পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপি তাঁহার আরামবাটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষিত হইল, কিন্তু তাঁহাকে না পাওয়াতে তাঁহার পুস্তক কাগজাদি সমস্তই নীত হইল; এই সকল কাগজাদির মধ্যে তাঁহার কতকগুলি বন্ধুর পত্রাদি থাকাতে তাঁহাদিগেরও আসন্ন বিপদ উপস্থিত হইল।

কালভিন পলাতকবেশে নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া অবশেষে অনগোলিমে (Angouleme) উপনীত হইলেন, তথায় কিছুকাল লুই ডিউটালেটের (Luis du Tallet) আশ্রমে থাকিয়া গ্রীক ভাষায় শিক্ষা দান করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। এই স্থানেই তিনি তাঁহার (Institutes) নামক গ্রন্থের অধিকাংশ ভাগ প্রণয়ন করেন,এবং আর দুই বৎসর পরে তাহা প্রচারিত করিলেন।

প্রথম ফ্রান্সিসের ভগিনী নেভারের রাজ্ঞী তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা ও অসাধারণ ক্ষমতাতে প্রীত হইয়া,বিশেষতঃ তাঁহার অশেষ যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া, অনুগ্রহ

করিয়া স্বীয় অধীনে রাখিয়া তাঁহাকে ১৫৩৪ খৃঃ অব্দে পারিস লইয়া আসিলেন।

মাইকেল সর্‌ভেটস্ (Michael Servatus) নামক একজন স্পেনদেশীয় চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ মানসেই তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিলেন, কারণ এই ব্যক্তি তৎকালে তথায় নানা নূতন মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং বস্তুতঃ কালভিনকে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সরভেটস্ কতকগুলি অজ্ঞাত কারণবশতঃ এ অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পারিলেন না, এবং ইহার বহুকাল পরে ভিন্ন এতদুভয়ের ইতিমধ্যে আর সাক্ষাৎ হইল না।

ফ্রান্সে উৎপীড়ন পুনর্ব্বার আরম্ভ হইল, কালভিন এই সময় আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ফ্রান্স হইতে প্রয়াণ করিলেন। তিনি এই পুস্তকে, "মৃত্যু ও সমাধি হইতে উত্থানকালের মধ্যবর্ত্তী সময় আত্মা এক প্রকার সুপ্ত অবস্থায় থাকে"* এই প্রচলিত বিশ্বাসটী বাইবেল হইতে নানা প্রমাণ দর্শাইয়া খণ্ডন করেন।

ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি কিয়ৎকাল পইটিয়র্সে (Poictiers) অবস্থান করেন। তথায় অসংখ্য ধর্ম্মোপদেশলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করিল।

এই সময় হইতে তাঁহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল। এই নবাভ্যুত্থিত ধর্ম্মাস্বাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্রেই এক্ষণ হইতে তাঁহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা গুণে মুগ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টিত করিতে লাগিল। তাহারা তাঁহার আর একটি গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল, তিনি একজন প্রকৃত ও অতি পরিপক্ক ইভেঞ্জলিক্যাল সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টান ছিলেন।

অতঃপর তিনি সুইজর্লেণ্ডের অন্তঃপাতী বেসল্ নগর যাত্রা করিলেন। তথায় তিনি তাঁহার (Institutes) সংহিতা গ্রন্থ প্রথম ফ্রান্সিসকে উৎসর্গীকৃত করিয়া প্রকাশিত করিলেন। এই নবাভ্যুত্থিত ধর্ম্মের সমস্ত মতগুলি সবিস্তার বর্ণন করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। লুথারপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিপ্লবের প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন গ্রন্থই প্রকাশিত না হওয়াতে এবং ইহা দ্বারা রোমক ধর্ম্ম ভীষণ আক্রোশের সহিত আক্রান্ত হওয়াতে, ইহা অতি অল্প কাল মধ্যে জনসাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহার

* এই সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টানদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, এক দিন তাহাদিগের মৃতদেহ সমাধি হইতে বিচারার্থ উত্থিত হইবে, এবং মৃত্যুর দিন হইতে যে পর্য্যন্ত না সেই দিন আসে, ততদিন তাহাদের আত্মা এক প্রকার সুপ্ত অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য ও নিস্তেজ অবস্থায় থাকিবে। কালভিন এই মতটী, "মৃত্যুর পরেও যে আত্মার বিলক্ষণ জাগরুক জ্ঞানশক্তি থাকে," এই মতের স্বপক্ষে বাইবেল হইতে নানা প্রমাণ সঙ্কলন করিয়া, খণ্ডন করিলেন।

অনেকগুলি সংস্করণ হইল। এতদ্ব্যতীত ইউরোপের প্রায় সমস্ত আধুনিক ভাষাতে ইহা অনুবাদিত হইল। খ্রীষ্ট জগতে ইহা এমনি এক অপূর্ব্ব ফল প্রসব করিয়াছিল যে অবশেষে ইহা সমাজসংস্কারক সমস্ত পুস্তকমণ্ডলীর মধ্যে একখানি প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

এই পুস্তক প্রথমে লাটিন কি ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ ইহা প্রথমে ফরাসি ভাষাতেই প্রকাশিত হয়, কারণ আমরা তাহার উৎসর্গপত্র পাঠে অবগত হই যে, ঐ পত্র ১৫৩৫ অব্দের ১লা আগষ্ট লিখিত হয়, এবং লাটিন ভাষায় প্রথম সংস্করণ ১৫৩৬ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। কিন্তু ১৫৩৫ অব্দের সংস্করণের একখানি পুস্তকও নাই, এবং ১৫৪০ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ফরাসি সংস্করণ অনেকগুলি লাটিন সংস্করণের পর প্রকাশিত হয়।

(Institutes) প্রথমতঃ ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, এবং তাহাতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। তাঁহার পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রথম সংস্করণে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ মত দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে ইহার কোন পর সংস্করণে অথবা তাঁহার অন্য কোন গ্রন্থে বিশেষ কোন স্থলে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তাঁহার কিছু মাত্র মতবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। যেরূপ অবস্থাতেই হউক না কেন, এত অল্প বয়সে এরূপ একটা মতস্থৈর্য্য ও পরিপক্কতা বিলক্ষণ প্রশংসা ও আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, বিশেষতঃ কালভিনের পক্ষে; কারণ ধর্ম্ম সংক্রান্ত অধ্যয়নে তিনি অতি অল্প কালই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে ও জীবদ্দশায় এইরূপ অল্প বয়সে লিখিত এরূপ অসামান্য-প্রভাবসম্পন্ন আর একখানি পুস্তক কখন ছিল কি না সন্দেহ।

ফ্রান্সের অধীশ্বরকে সম্ভাষণ করিয়া ইহার জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞাপন লিখিত হয়। ইহা যে একটি অসামান্য সম্পাদন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত খ্রীষ্টপ্রভাবের অভাব দৃষ্ট হয়, ইহা দ্বারা অধীশ্বরকে এ ধর্ম্মে দীক্ষিত করার কথা দূরে থাক্, ইহা তাঁহার প্রজ্বলিত হুতাশনে কেবল আহুতিই দান করিয়াছিল।

এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রচার করিয়া তিনি ইটালিতে তথাকার ধর্ম্মসংস্কারকদিগের সহিত সাক্ষাৎ মানসে যাত্রা করিলেন। তথায় দ্বাদশ লুইর দুহিতা ফেরারার বিদুষী ডিউকপত্নী তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন।

এই ডিউকপত্নী ধর্ম্মসংস্কারকসম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এক জন বিশেষ উৎসাহ ও উদ্যমশীলা ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ লুথর-প্রচারিত মতানু-বর্ত্তিনী ছিলেন, কিন্তু এই সময়,

যখন সেই নামের সহিত কালভিনের নাম সম্মিলিত হইল, তখন কালভিন-প্রচারিত ধর্ম্মমতই সাদরে আলিঙ্গন করিলেন।

অল্প কাল ব্যবধানের পর ডিউকের সহিত রোমীয় সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ পোপের একটি সন্ধি স্থাপনা হয়, তাহাতে ধর্ম্মমতের নিমিত্ত যাহারা ফেরারাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে সে স্থান ত্যাগ করিবার আজ্ঞা হয়। এই সময় কালভিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। তিনি এক্ষণে ঐ সম্পত্তির একটি বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত এই শেষ বার নোয়না-ভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পিতা মাতার সমাধির উপর বালকের ন্যায় সকরুণ রোদন করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তিপরায়ণতার পরিচয় দিয়া গেলেন।

এক্ষণে কালভিন সুইজর্লণ্ডের অন্তঃপাতী বেস্‌ল্ নগরে অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু লরেলের মধ্য দিয়া তথাকার সমানপথ যুদ্ধ বিদ্রোহে বন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাঁহাকে জেনিভার মধ্য দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হইল। এই ঘটনার সহিত তাঁহার পরজীবনের সমস্ত ইতিবৃত্তকেও ঘুরিতে হইল।

জেনিভার এই বিপ্লবের বিষয় আমরা এস্থলে কিছু কিছু বলিব। কয়েক শতাব্দী এখানকার যথার্থ রাজগণ এক দল ধর্ম্মযাজকশ্রেণী (Bishop) ভুক্ত থাকিয়া জেনিভার কৌণ্টকে তাঁহাদের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতেন। ১৪০১ অব্দে ঐ কৌণ্টদিগের স্বত্ব সেভয়ের (Savoy) ডিউকপরিবারের হস্তে অন্তরিত হয়, তাহারাও এই ধর্ম্মযাজকশ্রেণীর কর্ত্তৃত্ব কিছুকাল স্বীয় অধীনে রাখিতে প্রয়াস পায়, এবং কালে তাহাদের প্রয়াস সফলও হইয়াছিল। এই নিমিত্ত প্রধান প্রধান নগরবাসিগণ আপনাদিগকে বিদেশীয় শাসনভার মুক্ত করিবার মানসে এই ধর্ম্মবিপ্লব সাদরে আলিঙ্গন করেন।

উইলিয়ম ফরেল (Farel) নামক একজন ডফিনি প্রদেশীয় ব্যক্তি জেনিভাতে প্রথম ধর্ম্মসংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইনি খৃষ্টীয় ১৪৮৫ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে এই নবাভ্যুত্থিত ধর্ম্মমত সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া শীঘ্র জেনিভাতে প্রবেশ লাভ করিল। তত্রত্য ধর্ম্ম-যাজককে কর্ম্মচ্যুত, ধর্ম্মমন্দির সমস্ত ভূতলশায়ী ও দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি যাবতীয় সামগ্রী সমস্ত চূর্ণীকৃত করা হইল। এবং ১৫১৬ অব্দের আগষ্ট মাসে এই উন্নত ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সাধারণ তন্ত্র শাসনপ্রণালী রীত্যনুযায়ী স্থাপিত হইল।

১৫৩৬ অব্দের নিদাঘকালে কাল-ভিনের এস্থলে উপনীত হইবার পূর্ব্বে

এখানকার কর্ম্মক্ষেত্র এই পর্য্যন্ত কর্ষিত হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কালভিন প্রথমতঃ বেসল্ (Basle) অবস্থান করিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। এবং মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি তথায় অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। ফরেল তাঁহার অর্দ্ধকর্ষিত ক্ষেত্র সম্পূর্ণ করিবার উপযুক্ত পাত্র পাইলেন, তিনি কালভিনকে জেনিভাতে অবস্থান ও এই উন্নত ধর্ম্ম প্রচার করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কালভিন অস্বীকৃত হইলেন; উত্তর করিলেন—"যাজকত্ব কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে আমি স্বীয় উন্নতি সাধন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইব না, কিন্তু ইহা আমি অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনা করিতেছি।"

কিন্তু ফরেলের নিকট এ যুক্তি খাটিল না, তিনি ইহা আলস্যের একটি ছল বলিয়া জ্ঞান করিলেন, প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"অধ্যয়ন বিষয়ে তুমি যে ছল দর্শাইলে, তৎসম্বন্ধে আমি, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের দোহাই দিয়া বলিতেছি যে, তুমি তাঁহার কার্য্যে আপনাকে আমাদিগের সহিত উৎসর্গ না করিলে, খৃষ্টকে তুমি আপনার সমান খুঁজিলে না, এই অপরাধে তিনি তোমাকে অভিশাপ দান করিবেন।"

কালভিন এবম্বিধ স্পষ্ট বচন শ্রবণ করিয়া, ও ফরেলকে দিয়া ঈশ্বর তাঁহাকে এখানে অপেক্ষা করাইতেছেন এইরূপ বিবেচনা করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং এখানে অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন।

এক্ষণে ফরেল ও কালভিনের পরস্পর সমতুল্য বিদ্যা, ধর্ম্মপরতা ও আগ্রহ জেনিভার সম্পূর্ণ ধর্ম্মসংস্কার ও ইউরোপময় ইহার মত প্রচারার্থ একত্রে সম্মিলিত হইল। ফরেল এই সময়কার জেনিভার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ লোক। তিনি কালভিন অপেক্ষা বিংশতি বর্ষ অধিক বড় ছিলেন। কালভিন এখন সপ্তবিংশতি বর্ষ মাত্র।

ফরেল ও কালভিনের পরস্পর সম্বন্ধ বড় চমৎকার। এইকাল পর্য্যন্ত জেনিভার ধর্ম্ম সংস্কার ফরেলের কার্য্য। কিন্তু তিনি তাঁহার নবীন সহযোগীর প্রধানত্ব শীঘ্রই অনুভব করিলেন, ও কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে উচ্চতর আসনে স্থান দিলেন, এবং বরাবর তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অন্যপক্ষে, কালভিন ও তাঁহার সহযোগীর আগ্রহাতিশয্য, অক্লান্ত পরিশ্রম, নির্ভীক সাহসিকতা ও বাগ্মিতার অসামান্য ক্ষমতাতে মুগ্ধ হইতেন। তিনি অবশ্যই ফরেলের দোষের দিকে অন্ধ ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাঁহার মূল্য অনুভব করিয়াছিলেন।

কালভিন এক্ষণে ধর্ম্মবিষয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু পর বৎসর, ১৫৩৭ অব্দে তিনি যাজকত্ব পদ গ্রহণ

করিলেন। প্রথমে এই রূপ বোধ হইয়াছিল যে কালভিন জেনিভাতে বিনা বেতনে কার্য্য করিতেন, কিন্তু ১৫৩৭ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের নগরীয় রেজেষ্টারী বহিতে এই মর্ম্মের একখানি তালিকা দৃষ্ট হয়, যে তিনি ছয় ক্রাউন মূল্যের বেতন পাইবেন।

বেজার বিবরণপাঠে অবগত হওয়া যায় যে কালভিনই এই খানির লেখক, কিন্তু অপরে অধিকতর সঙ্গত কারণের সহিত ফরেলকে ইহার লেখক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৫৩৫ অব্দের জুলাই মাসে ঐ পত্র সাধারণের সাব্যস্ত ও সম্মত বলিয়া প্রচারিত হয় কিন্তু এতদ্বিষয়ে কালভিন সাহায্য করিয়াছিলেন কি না, অথবা ঐ পত্ররচনা বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গৃহীত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। ঐ বৎসরই জেনিভার মন্ত্রিসভা তাঁহাদের সম্মান ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ফরেলকে নগরের স্বাধীন অধিবাসীর উচ্চপদে অভিষিক্ত করেন।

এক্ষণে নগরবাসীদিগকে দশ জন করিয়া এক এক দলবদ্ধ করিয়া এই সংস্কৃত ধর্ম্মমত তাহাদের স্বীয় ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবার নিমিত্ত আহ্বান করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্মস্থাপনার নিমিত্ত এরূপ একটি পন্থা গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু কালভিন বলেন "বিশেষ সন্তোষের সহিত" এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

তৎকালে জেনিভাতে কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পরিচালক হওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে নগরবাসীগণ রোমের প্রভুত্ব অতিক্রম করিয়াছিল কিন্তু তাহারা এখনও পর্য্যন্ত অতি অসম্পূর্ণ ভাবেই দৈবজ্ঞানের জ্যোঃতি প্রাপ্ত ছিল, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহারা কদাচ রোমক ধর্ম্মের জঞ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

সেদিন পর্য্যন্ত তাহারা নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচার দোষে উন্মত্ত ছিল। সম্পূর্ণ অনাবৃত মাঠে তাহারা নাচ গান করিয়া আমোদিত হইত। অসংখ্য মদ্যাপণের দ্বার মুক্ত ছিল। বর্ষাকালে, অথবা এরূপকালে, যখন নাচগান লালসা পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তখন তাহারা মদ্যপানাসক্তির উপর দ্যূতক্রীড়া করিয়া আনন্দসাগরে অবগাহন করিত। ব্যবসায়ীগণও অবসর খুঁজিত, ছুটী হইলেই অভিমতানুরূপ আমোদে পরিতৃপ্ত হইবে।

এক্ষণে এই সকল আমোদ প্রমোদ প্রচণ্ড কঠোরতার সহিত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পুরোহিতগণ একটি নৈতিক সংস্কারাবর্ত্তনে কৃতসংকল্প হইয়া আগ্রহাতিশয্যের বশীভূত হইয়া কোন প্রভেদ বিবেচনা না করিয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষীকে ও ভয়ানক পাপাচারীকে এক দণ্ডেই দণ্ডিত করিতে লাগিলেন। তাসখেলা, নৃত্যগীত, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি যাবতীয় নীচ প্রকৃতির আমোদ একবারে নিষিদ্ধ হইল। রবিবাসরীয় অবসর দিন ব্যতিরেকে অন্য

সমস্ত অবসর দিবস একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং তাহাও আবার য়িহুদীদিগের ন্যায় কঠিন নিয়মের সহিত রক্ষিত হইতে লাগিল। বিবাহোৎসব যথাসম্ভব অল্প সমারোহের সহিত সমাধা হইতে লাগিল। পূর্ব্বমত আনন্দোৎসবের পরিবর্ত্তে ইহাকে এক্ষণে একটি সম্পূর্ণ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎসবে পরিণত করা হইল। কন্যা অথবা কন্যাযাত্রীর কেহ ধর্ম্মোপদিষ্ট পরিচ্ছদের বিপরীত কোন পরিচ্ছদে ভূষিত হইলে তাহাকে কারারুদ্ধ করা হইতে লাগিল। ইত্যাদি

কিন্তু নগরবাসিগণ সকলে ধর্ম্মসংস্কারকদিগের এববিধ কঠিন নিয়ম প্রণালীর বশীভূত থাকিতে প্রস্তুত ছিল না; অতি অল্পকাল মধ্যে তাহারা কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রচারিত হইবামাত্র তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, এবং একটি রাজদ্রোহী চক্রান্তের ব্যপদেশে তাহারা একটি সাধারণ দলবদ্ধ হইয়া একত্রে মিলিত হইল এবং ফরেল ও কালভিনকে জেনিভা হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিল।

কালভিন বার্ন নগর যাত্রা করিলেন, এবং তথা হইতে ষ্ট্রস্‌বর্গে উপনীত হইলেন। এখানে তিনি ধর্ম্মশিক্ষার অধ্যাপক (Professor of Divinity) এবং একটি ফরাসী ধর্ম্মমন্দিরের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন। এবং এই মন্দিরে তিনি এক্ষণে স্বপ্রচারিত ধর্ম্মশাসন ও নিয়মপ্রণালী প্রচারিত করিলেন। ষ্ট্রসবর্গ (Strasburg) অবস্থানকালীন কালভিন যীশুরভোজন (Lord's Supper) সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। এই গ্রন্থে তিনি লুথর ও রোমক ধর্ম্ম সম্প্রদায় দুই দলের বিভিন্ন মতের বাদানুবাদ ও এতদ্বিষয়ে স্বীয়মত প্রচার করেন। আর এই খানেই তিনি (Commentary on the Epistle to the Romans) নামক গ্রন্থ প্রচারিত করেন।

কিন্তু এদিকে যেমন তাঁহার খ্যাতি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সেইরূপ তিনি দুরবস্থায় পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার আয় অতি অল্প ছিল, এবং ইহায় বৃদ্ধির মানসে তিনি একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ব র্থ হয়। এক্ষণে তাঁহার এরূপ অপ্রতুল হয় যে তিনি আপন পুস্তকালয় বিক্রয় করিতে বাধ্য হন।

ষ্ট্রসবর্গ অবস্থানকালে কালভিন কাসটিলিওর (Castellio) সহিত পরিচিত হন। তিনি ইঁহার নিমিত্ত জেনিভার প্রতিনিধি পদ উপার করিয়া দেন। আর এইখানেই অবস্থানকালে তিনি তাঁহার অনেক বন্ধু বুসরের (Bucer) পরামর্শে একজন সদাযুত ধর্ম্মপ্রচারকের বিধবাপত্নী ইডলেটের (Idellet) পাণিগ্রহণ করেন।

কোন বিষয়ে, প্রণয়েও, মুগ্ধ হওয়া কালভিনের স্বভাব নহে। তবে অন্য যে যে কারণে তিনি এই নারীর পাণি-

গ্রহণ করেন, তাহা এই, তিনি বলেন, "এক এবং অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্য যাহা হইতে আমি এই অবলার প্রতি আকৃষ্ট হই, তাহা কেবল এই, যে ইনি সতী, প্রিয়কারী, সহিষ্ণু এবং আমার স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষ সযত্ন।" ইডলেট কালভিনের জীবনের একটি অতি রমণীয় সঙ্গী, এবং তাঁহার নানাবিধ শ্রম ও সদাসুস্থতার একটি অমূল্য সহায় ছিলেন। এই রমণী ১৫৪৯ অব্দে জীবন-লীলা সম্বরণ করেন, বলা বাহুল্য কালভিন ইহাতে গভীর ব্যথায় ব্যথিত হন, এবং জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু জনিত শোক কখন সম্বরণে সমর্থ হন নাই। বোধ হয় এই পরিণয়ে কালভিন কিছু সম্পত্তির অধিকারী হন, কারণ ইহার পর আমরা আর কখন তাঁহার দুরবস্থার কথা শুনিতে পাই নাই।

ইতিমধ্যে জেনিভাতে কারপেনট্রসের (Carpentros) ধর্ম্মযাজক সডোলেট (Sadolet) রোমক ধর্ম্ম পুনঃস্থাপনার উদ্যম করেন; কিন্তু কালভিন তাঁহার অভিমত সম্পূর্ণ নিষ্ফল করিলেন। কালভিন জেনিভার অধিবাসীদিগকে সডোলেট লিখিত পত্রের এমনি এক প্রত্যুত্তর প্রদান করেন যে সডোলেট পুনরুদ্যমে বিরত হইতে বাধ্য হন।

কালভিন, তাঁহার জেনিভাস্থিত বিশ্বস্ত অনুচরদিগের সহিত সন্তোষদায়ক পত্রের দ্বারা কথাবার্ত্তা চালাইতেন, ইহারাও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত ভক্তি করিতেন। কালভিনের ষ্ট্রাসবর্গ অবস্থানকালে জেনিভাতে একখানি ফরাসিভাষায় অনুবাদিত বাইবেল পাওয়া যায়, উক্ত পুস্তকে তাঁহার নাম স্বাক্ষরিত ছিল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ পুস্তক ক্লিভেটনের (Cliveton) লিখিত, তিনি তাহা সংশোধিত করিয়া পুনর্মুদ্রিত করেন।

ইতিপূর্ব্বে কালভিনের স্বীয় পদে প্রত্যাগমনের দ্বার পুনরুদ্ঘাটিত হইয়াছিল। সেই বৎসরেই নভেম্বর মাসে তিনি ও ফরেল জেনিভার মন্ত্রিসভার দ্বারা তাঁহাদের স্ব স্ব পদে পুনঃপ্রবেশ করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হন; ১৫৪১ অব্দের মে মাসে তাঁহাদের নির্ব্বাসনকাল উত্তীর্ণ হয়, এবং সেপ্টেম্বর মাসে কালভিন তাঁহার অনুচরদিগের বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া নগরে অভ্যর্থিত হন। ফরেল নিউফ্চাটেলে (Neufchatel) বিশেষ ভক্তি ও সমাদরের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন।

কালভিনের অবস্থানের নিমিত্ত রাজ-ব্যয় হইতে একখানি উদ্যান সমন্বিত অট্টালিকা প্রদত্ত হইল। এই স্থানটি হইতে লেমান হ্রদ ও তৎপশ্চাৎস্থিত পর্ব্বতশ্রেণীর রমণীয় ও পরিতৃপ্তিকর দৃশ্য দেখা যাইত, কিন্তু এবম্বিধ সৌন্দর্য্যে কালভিন অন্ধ ছিলেন। তাঁহার বেতন এক্ষণে ৫০ পঞ্চাশটি ডলার, দ্বাদশ ষ্ট্রাইক শস্য ও দুই পীপা মদ্য নির্দ্ধারিত হইল। জনসাধারণ ইহাকে অতি সামান্য আয়

বলিয়া গণ্য করিতেন, কিন্তু কালভিন অপব্যয়ী বা সুখপ্রয়াসী না থাকাতে ইহাকে তাঁহার স্ত্রীর আয় সমেত যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন।

কালভিন ষ্ট্রসবর্গে অবস্থানকালে যে প্রকার ধর্ম্মশাসনপদ্ধতি বিশেষ পর্য্যালোচনার দ্বারা তদীয় মনোমতানুরূপ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, সেই প্রকার ধর্ম্মশাসনপদ্ধতি ও অন্যান্য নানা পরিবর্ত্তন ও সংস্কার জেনিভাতে এক্ষণে প্রচলিত করিবার নিমিত্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া তথাকার কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। এই সময় তিনি ঐ স্থানের ধর্ম্মমন্দির সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের এক ও অদ্বিতীয় পরিচালক বলিয়া গণ্য হন; সুতরাং এক্ষণে অভীষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত সময় উপস্থিত। এতকাল ধরিয়া যে ধর্ম্ম-মন্দিরব্যবস্থা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, এবং বস্তুতঃ যাহা তিনি তাঁহার (Institute) গ্রন্থে স্থির করিয়া গিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইল। তিনি ধর্ম্মমন্দির (Church) শব্দটীর এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন, "যে স্থলে ঈশ্বর-বাক্য অকপটে ও সর্ব্বান্তঃকরণে বর্ণিত ও শ্রুত হয়, ও যে স্থলে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাব-তীয় ক্রিয়াকলাপ খ্রীষ্টের ব্যবস্থানুযায়ী সম্পন্ন হয় তাহাকে (চর্চ্চ) ধর্ম্মমন্দির বলে।" তাঁহার মতে কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ের উপরই ধর্ম্মমন্দিরের আধিপত্য থাকে। কিন্তু তিনি ধর্ম্মপুস্তকের অনুমোদিত একটি মীমাংসিত মত বলিয়া ইহাও উল্লেখ করেন যে, সকল লোকেই স্থাপিত রাজশাসনের কর্ত্তৃত্বাধীন, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা রাজনৈতিক অধীনতার সহিত একত্রে ভোগ করা যাইতে পারে। ক্রমশঃ—

প্রিয়ম্বদা, ইমিলিয়া ও সুনন্দা।

ঐ যে প্রমোদবনে বনলতা প্রীতি-ভরে নবমালিকাকে আলিঙ্গন করিতেছে, ঐ যে মানসসরোবরে কনকমৃণাল সরোজিনীকে হৃদয়ে লইয়া তরঙ্গ-হিল্লোলে দুলিতেছে, ঐ যে কুসুম-কাননে অরুণ কিশলয় ছিন্নবৃন্ত প্রসূনকে বক্ষে তুলিয়া অবনীর। অঙ্কে খসিয়া পড়িতেছে, পাঠক কাব্য-জগতে ঠিক ঐরূপ একটী বনতোষিণী লতা, ঐরূপ একটী কনক মৃণাল, ঐরূপ আর একটী সুন্দর কিশলয় দেখিয়াছেন। যদি পাঠকের স্মরণ না থাকে, আমরা বলিয়া দিই অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রিয়ম্বদা, ওথেলোর (Othelo) ইমিলিয়া (Emelia) এবং মাইকেল মধুসূদনপ্রণীত মায়া-কাননের সুনন্দা।

এই চরিত্রত্রয়ের প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্য একই প্রকার, একই উপাদানে নির্ম্মিত! বোধ হয় যদি ভারতের কবি গুথেলো লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আলেখ্য-পটে প্রিয়ম্বদার স্থানে ইমিলিয়াকে পাইতাম। যদি শ্বেতদ্বীপের কবি তপোবনের চিত্র আঁকিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গাউনউইগস্-শোভিতা ইমিলিয়া বল্কলধারিণী তাপস-বালার বেশ ধারণ করিত। আর যদি বঙ্গদেশের অকাল কোকিল বিভিন্ন তানে গাইতেন, তবে আমরা সুনন্দার স্থানে প্রিয়ম্বদা অথবা ইমিলিয়াকে দেখিতাম। এই চরিত্রত্রয়ের বিশ্লেষণে আমরা দেখিতে পাই যে, মানবহৃদয় সকল কালে সকল স্থানে একরূপ। শত বৎসর পূর্ব্বে, সহস্র ক্রোশ দূরে, তুষারশুভ্র সাগরপার্শ্বে বসিয়া, আম-মাংসাহারী চিত্রকর যে ছবি আঁকিয়াছেন, ঠিক সেই চিত্র কাননপ্রদেশবাসী তণ্ডুলভোজী চিত্রকরের তূলিকা সম্মুখে দেখিয়া বিস্মিত হই! উভয় চিত্রের প্রভেদ অন্বেষণ করিয়া হয়ত আমরা দেখিতে পাই যে, কাননবাসী কবির ছবি অপেক্ষা তুষারময় দেশের কবির ছবির রং কিছু উজ্জ্বল, কেশ কিছু অধিক কুঞ্চিত, চাহনি কিছু অধিক চঞ্চল! হয়ত দেখি, এক জনের রঙ্গস্থল তরঙ্গ-হিল্লোলময় সাগরতট, আর এক জনের ক্রীড়াভূমি মান্দারপুষ্পশোভিত প্রমোদ-উদ্যান; কিন্তু উভয়েই একপ্রকারেই দাঁড়াইয়াছে, একরূপেই কথা কহিতেছে, উভয়েরই মুখমণ্ডলে একই প্রকার চিত্ত-বৃত্তি উচ্ছ্বসিত হইতেছে। হয়ত দেখিতে পাই, যেন ইংরাজরমণী ভারতে আসিয়া একটু অধিক লজ্জাশীলা হইয়াছে, স্বামীর করস্পর্শ করিতে ভুলিয়া গিয়া ঘোমটা টানিতে শিখিয়াছে! কিন্তু সেই হৃদয় ঠিক সেই রমণীর হৃদয় রহিয়াছে, সেই ভাষা, সেই অঙ্গভঙ্গী, সেই হাবভাব, ঠিক সেই রমণীর মত রহিয়াছে। হয়ত দেখি বসোরার গোলাপ বাঙ্গালা দেশের ভূমিতে জন্মিয়াছে বলিয়া, একটু ছোট হইয়াছে, একটু লোহিত বর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সেই পাপড়ি, সেই সৌরভ, সেই উজ্জ্বলবর্ণ, ঠিক সেই গোলাপের মত রহিয়াছে।

প্রিয়ম্বদা, ইমিলিয়া ও সুনন্দা নারী-হৃদয়ের পূর্ণ সহানুভূতির সুন্দর চিত্র। এ বৈষম্যপূর্ণ জগতে মনুষ্যহৃদয়ের সুখ কামনাশূন্য নিঃস্বার্থ প্রেম! সেই নিঃস্বার্থ প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তি এই চরিত্র-ত্রয়ে চিত্রিত হইয়াছে। অভিজ্ঞান শকুন্তলের দুষ্মন্তের প্রেমে আত্মাভিমান আছে, স্বার্থপরতা আছে, মতিভ্রম আছে, কিন্তু প্রিয়ম্বদার প্রীতিপূর্ণ, সহানুভূতিময় প্রেমে আত্মাভিমানের লেশমাত্র নাই, স্বার্থপরতার সংস্পর্শ নাই, মতিভ্রমের সম্ভাবনা নাই! ওথেলোর ভালবাসা সন্দেহে পরিপূর্ণ, ঈর্ষ্যানলে সন্তপ্ত, কিন্তু ইমিলিয়ার ভালবাসা পবিত্র, স্নিগ্ধ, কলঙ্কশূন্য। ওথেলো পাপাত্মা ইয়াগোর

দুরভিসন্ধিচক্রে পতিত হইবার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন—

"My soul hath her content so absolute,
That not another comfort like to this
Succeeds in unknown fate."

আর ইমিলিয়া আপন প্রাণসখার জন্য শপথ করিয়া বলে—

"If she be not honest, chaste and true
There's no man happy; the purest of their wives
Is foul as slander."

মায়াকাননের নায়ক অজয়ের প্রেমের ভিতর অন্ধকার আছে, আত্মগরিমা আছে, লোকাপবাদের আশঙ্কা আছে, কিন্তু সুনন্দার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ইন্দুমতী, সুনন্দার কেবল মাত্র আকাঙ্ক্ষা ইন্দুমতীর সুখ!

আমরা ভারতীয় কবির রঙ্গভূমিতে দেখিলাম, শকুন্তলা সেচনঘট হস্তে বালপাদপমূলে বারিসিঞ্চন করিবার জন্য ধাবমানা, আর প্রিয়ম্বদা প্রীতিভরে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে! প্রিয়ম্বদা কুসুমলতাকে ভালবাসে, শকুন্তলা ভালবাসে বলিয়া। প্রিয়ম্বদা কুসুমকাননে বারিসিঞ্চনে সুখী হয়, শকুন্তলার সুখের জন্য। প্রিয়ম্বদা নবমালিকাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, কেননা শকুন্তলা তাহাকে ভগিনী সম্বোধন করে। শকুন্তলার চাহনি দেখিয়া প্রিয়ম্বদা তাহার মনের কথা বলিয়া দেয়। শকুন্তলা কথা কহিবার পূর্ব্বে সে কি কথা বলিতে ইচ্ছা করে প্রিয়ম্বদা জানিতে পারে। শকুন্তলা মাধবীলতাকে অসময়ে আমূল মুকুলফুলে শোভিত দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে "অসময়ে খলু এষা আমূলানুমুকুলিতা মাধবীলতা? * * * সত্যং কিং ন প্রেক্ষেথে?" প্রিয়ম্বদা যেন তাহার হর্ষফুল্ল মুখমণ্ডলে হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বলিয়া দেয় "আসন্নপাণিগ্রহণাসি ত্বম্!" প্রিয়ম্বদার প্রাণ যেন শকুন্তলার প্রাণমধ্যে মিশিয়া রহিয়াছে! প্রেমিকের প্রথম সন্দর্শনে প্রেমমুগ্ধা শকুন্তলা যে কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছে না, লজ্জায় বিষাদে মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু প্রিয়ম্বদার নিকটে গোপন করিবার সাধ্য নাই! প্রিয়ম্বদা ঠিক সেই সময়ে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছে। তাই শকুন্তলা সবিস্ময়ে সহর্ষে বলিতেছে "হি অম্ম! মা উত্তম্ম, এসা তুএ চিন্তিদং প্রিয়ম্বদা মন্তেদি।"

জগতের কবিগুরু সেক্ষপিয়রের আলেখ্যপটে দেখিতে পাইলাম, ওথেলোর পবিত্র প্রেমের উজ্জ্বল আলোক সহসা প্রচণ্ড অনলে পরিণত হইয়াছে! সহসা বালিকা দেসদিমনার কোমল, ক্ষুদ্র প্রাণ অকূল সাগরে, ঘটনাতরঙ্গে পাপাত্মা ইয়াগোর (Iago) দুরভিসন্ধি-স্রোতে নিমজ্জিত হইতেছে! সেই

ঘোর তরঙ্গে. বালিকার একমাত্র আশ্রয় এক জন মমতাময়ী প্রাণসখী। বালিকা যাঁহার জন্য পিতার স্নেহে বঞ্চিতা,আত্মীয়-গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, তিনিই আজি তাহার প্রাণবিনাশে কৃতসংকল্প! কেবল মাত্র সেই স্নেহময়ী সখী ইমিলিয়া এ বিপৎসাগরে একমাত্র অবলম্বন। ইমিলিয়া দেসদিমনার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত, ইয়াগোর ভ্রুভঙ্গী গ্রাহ্য করে না, ওথেলোর উত্তোলিত তরবারিকে ভয় করে না। অম্লান মুখে ইয়াগোর তরবারি প্রহার বক্ষে ধারণ করিয়া ওথেলোকে বলে

"Nay, lay thee down and roar
For thou hast killed the sweetest innocent
That e'er did lift eye."

মায়াকাননের রঙ্গভূমে দেখি,এক জন রাজেন্দ্রনন্দনী আজি ঘটনাবশে দূরদেশে বণিকরমণীবেশে অবস্থান করিতেছেন! কিন্তু এক জনের নিকট এখনও তিনি পূর্ব্বের মত রাজরাজেন্দ্রনন্দিনী! সুনন্দা ইন্দুমতীর সম্পৎকালের সখী, কিন্তু বিপৎকালের দাসী। ইন্দুমতীর মুখে বিষাদের ছায়া দেখিলে সুনন্দার নয়নযুগল আপনা আপনি অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়? ইন্দুমতীর সুখের কথা শুনিলে সুনন্দার হৃদয় আপনা আপনি আনন্দে নৃত্য করে। সুনন্দা অমেঘ আকাশে বজ্রধ্বনি শুনিয়া ইন্দুমতীর ভাবী অমঙ্গলের ভাবনায় কম্পিত হয়। ইন্দুমতী যখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে "তুই কি তবে আমার সঙ্গে যমালয়ে যাবি?" সুনন্দা হাস্য করিয়া উত্তর দেয় "চক্ষের জ্যোতি গেলে সে চক্ষু দিয়ে লোকে কি আর কিছু দেখ্‌তে পায়।"

শকুন্তলা অপ্সরীপ্রসূতা, কুলপতি কণ্বের পালিত কন্যা, আর প্রিয়ম্বদা একজন অজ্ঞাতকুলশীলা তপস্বিকন্যা! উভয়ের অনেক প্রভেদ! শকুন্তলার ন্যায় প্রিয়ম্বদার মুখমণ্ডল সে ভুবনমোহন রূপের আলোকে বিভাসিত নহে, ভারতের অধীশ্বর শকুন্তলার দর্শনলালসায় লালায়িত, প্রিয়ম্বদা তাহার একজন সামান্যা সখী মাত্র! দেসদিমনা বীর-কেশরী উদারহৃদয় ওথেলোর প্রণয়িনী, আর ইমিলিয়া ক্ষুদ্রহৃদয় পাপমতি ইয়াগোর সহধর্ম্মিণী! ইমিলিয়া দেসদিমনার মত রূপবতী নহে। দেস-দিমনার মত ইমিলিয়ার হৃদয়ে সে সরলতা নাই, সে পবিত্রতা নাই। দেসদিমনা ইমিলিয়ার মুখে শুনিয়া বিস্মিত হয়—

"Who would not make her husband
A cuckold to make him a monarch?
I should venture purgatory for it."

সুনন্দা রাজেন্দ্রাণী ইন্দুমতীর এক জন দাসী মাত্র। এ অপূর্ব্ব সহানুভূতি, এ আশ্চর্য্য প্রাণের মিলন কবির কি সুন্দর সৃষ্টি! যে অনুপম সৌন্দর্য্যের চরণতলে বীর ওথেলো লুণ্ঠিত হয়, যে ভুবনমোহন রূপ দুষ্মন্তকে উন্মত্ত করিয়াছে, যে অতুল

লাবণ্য অজয়ের হৃদয়মধ্যে প্রচণ্ড অনল প্রজ্বলিত করিয়াছে, ইমিলিয়া, প্রিয়ম্বদা ও সুনন্দার হৃদয়মধ্যে সেই সৌন্দর্য্য, সেই সরলতা, সেই লাবণ্য পূর্ণ গৌরবে প্রতিবিম্বিত। যে সৌন্দর্য্য একবার দেখিলে হৃদয় মুগ্ধ হয়, ইহাদের হৃদয় দিবানিশি সেই সৌন্দর্য্যালোকে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে! ক্ষুদ্র বিশালে বিলীন হইয়াছে! সান্ধ্য তারার আলোক পূর্ণেন্দুকিরণে পরিণত হইয়াছে। যেন এ অতুল সৌন্দর্য্য না থাকিলে ইহাদের নিকট জগৎ অন্ধকারময়, শ্মশান সমান। যেন এ সৌন্দর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া আর দেহ হইতে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হওয়া এ উভয়ই সমান। জীবলোকের সঙ্গে বায়ুর যে সম্বন্ধ, শকুন্তলা, দেসদিমনা ও ইন্দুমতীর প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে প্রিয়ম্বদা, ইমিলিয়া ও সুনন্দার জীবনের সেই সম্বন্ধ। তাই শকুন্তলার ভর্ত্তৃভবনে যাইবার সময় প্রিয়ম্বদা আনন্দ ও বিষাদে জিজ্ঞাসা করে "অঅং অণোন্নাণিং কস্স হত্থে সমপ্পিদো!"

তাই ইমিলিয়া অম্লান বদনে দেসদিমনার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া তাহার মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া বলে

"Hark, canst thou hear me? I
will play the swan,
And die in music."

তাই সুনন্দা ইন্দুমতীর প্রাণশূন্য দেহলতা ভূতলে পতিত দেখিয়া আত্মপ্রাণে জলাঞ্জলি দিয়া অসীম সাহসে, অতুল উৎসাহে বলে "আলোকময় রাজভবন, কি রশ্মিশূন্য যমালয়, যেখানে তুমি, সেখানে আমি।"

পরিব্রাজক।

আগুন খেতে পার?

আগুন খেতে পার?—ওগো তোমরা আগুন খেতে পার? কে তোমাদের আগুন খেতে পারে, বল? কতবার জিজ্ঞাসা করিলাম, কতবার কান্দিয়া কান্দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল, কেহই উত্তর দিলেন না! নীরব! নিস্তব্ধ! সাড়াশব্দ নাই—কোথাও মাছিটি উড়িল না, ভারত নিশীথ নিদ্রায় নিদ্রিত; শূন্যাকাশ উত্তর দিল, "এখন যাও কেহ বাড়ী নাই!"

ওমা! কেহ বাড়ী নাই! সে কি! এই যে শুনিলাম ভারতবাসী লেখাপড়া শিখিলেন, সভ্যতায় উন্নত হইলেন, ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, সমাজসংস্কারক হইলেন, স্বদেশানুরাগী হইলেন;—তবে তাঁরা কোথায় গেলেন? আমি

শূন্যাকাশে একটি হুতাশের প্রতিমূর্ত্তি উদয় হইয়া উত্তর করিল "হতভাগিনি, তুই স্বপ্ন দেখিতেছিস ?"

অমনি আমি নীরব হইলাম ; তখন সন্দেহ হইল, তাইত, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? না পাগল হইলাম ? কা'কে কি বলি ? কেহ কোথাও কথা বলে না। আমি কা'কে কি বলি ? ভাবিয়া ভাবিয়া আর ভাবিতে পারি না ! ভাবিলাম আর একটি বার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি। দেখি কেহ উত্তর দান করেন কি না ? সত্য সত্যই কি ভারতের এখনও নিশীথ-নিদ্রা ? দেশের লোক কেহই কি জাগেন নাই ? দেখি, ভাই বন্ধু কেহই কি আমায় একটি উত্তর দিবেন না ?

এই ভাবিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, ওগো তোমরা আগুন খেতে পার ? কে আগুন খেতে পার, বল। তা না পারিলে যে হ'বে না। দেখ, কেমন আগুন খেয়েছিলেন চৈতন্য ! আহা, ওমনি করে আগুন না খেলে কি কায হয় ? প্রাণটার মায়া না ছাড়্‌লে কি কাযের মত কায করা যায় ? এক হাতে স্বদেশের চরণ, আর এক হাতে লুকিয়ে লুকিয়ে স্বার্থের চরণ সেবা করিলে কি হ'বে বল ? সকলেই যে তাই ! দেখ, দেশের এক একটি কায, ধর্ম্মের এক একটি কায, সাপের মাথার এক একটি মণি ! প্রাণের ভয়টা না ছাড়িলে কি তা পাওয়া যায় ? কখনই না। দেখ ধনী মানী পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা এই হতভাগিনী হিন্দু বিধবার জন্য কতই না অর্থ ব্যয় করিলেন, কতই না পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেন, কতই না যত্ন, পরিশ্রম, কষ্ট স্বীকার করিলেন ? কিন্তু কি হইল ? কিছুই হইল না ! আগুন খেতে পারেন কৈ ? একটি, ধন নাই, মান নাই, পাণ্ডিত্য নাই,—কাঙ্গাল,—গরিব—দুঃখী ঠিক যেন নিরীহ নদীয়ার পাগল,—ঐ রকমের একটি চাই। অমন একটি কোথায় পাই, বল, যে আগুন খেতে পারে ; যে দাঁড়িয়ে থেকে বুকের উপর একটা বজ্রের আঘাত সহ্য করিতে পারে ; যে একটা আঙ্গুলে একটা পাহাড় ধরিতে পারে, এমন একটি লোক চাই ! ওরে, পোড়া দেশের লোক, তোরা বিশ কোটির মধ্যে একটা লোকও কি বা'র হ'তে পারিস্ না ? একটা লোকও কি সংসারের মায়া, প্রাণের মায়াটা ছাড়িতে পারিস্ না ? একটা লোকও কি এই হতভাগিনীর কথাটার উত্তর দিতে পারিস্ না ? ভাব একটা মানুষ ত কেশব হয়েছিল, একটা মানুষ ত চৈতন্য হয়েছিল, একটা মানুষ ত বুদ্ধ হয়েছিল, একটা মানুষ ত গুরু নানক হয়েছিল, এই দেশেই ত এতটা হয়েছিল, এখন কি আর একটা চৈতন্য হয় না, এত হিন্দুর মধ্যে কি এখন একটা তেমন হয় না ? তা না হলেও কিছু হবে না ! দেখ, এমনি সময় এসেছে যে একটা লোক এখন দেশের জন্য, সকলের জন্য,

একটা প্রাণ না দিলে, একটা প্রাণ উৎসর্গ না করিলে আর চলে না, আর কিছুই হয় না! এত টাকার কায নয়, পাণ্ডিত্যেরও কায নয়; এতে আগুন খেতে হবে, তবে হবে;—ঠিক একটি চৈতন্য চাই, সেই পাগল চাই! সেই উন্মাদ, সেই হরিবোল, সেই করতালি, সেই নৃত্য, সেই হাসি, সেই কান্না,—তেমনি উচ্ছ্বাস, তেমনি আবেশ, তেমনি মূর্চ্ছা, তেমনি দেশমাতান, তেমনি প্রাণ কান্দান গান, তেমনি দলবল, তেমনি কোলাহল, তেমনি চলাচলি, তেমনি কোলাকুলি চাই; তেমনি আগুন জ্বালা, তেমনি আগুন খাওয়া, তেমনি আগুন হজম করা চাই; তা না হ'লে কি জগন্নাথক্ষেত্র স্থাপন হয়? তবে, তেমন ত একটিও দেখি না; একটিরও সাড়া শব্দ তেমন নাই! চুপে চুপে কৌশলে কৌশলে কি শ্রীক্ষেত্রের কাণ্ড হয়? ঢাক ঢোল কাড়া চাই! নৃত্য চাই, মত্ততা চাই, কান্নাকাটির ছড়াছড়ি চাই, ধূলায় গড়াগড়ি চাই;—চাই না টাকা, চাই না পাণ্ডিত্য, চাই না সহায়, আগুন খাওয়া চাই! তা কৈ? তার ত কিছুই নাই! তার দিকেও ত কেহ নাই! কে কোথায় শুনিয়াছে টাকাতে একটা দেশ উন্নত হইয়াছে? কে কোথায় শুনিয়াছে পাণ্ডিত্যপ্রকাশে একটা দেশ উদ্ধার হইয়াছে? ইহার জন্য প্রাণের বিনিময় চাই,—চৈতন্য চাই, বুদ্ধ চাই, নানক চাই!

ওরে দেশের লোক! এত লোকের মধ্যে কি একটা লোকেও প্রাণের মায়াটা ছাড়িতে পার না? প্রাণটাকে পরের জন্য পাগল করে দিতে পার না? সংসার-মায়া ভুলিতে পার না? তুচ্ছ সুখের আস্বাদন ছাড়িয়া থাকিতে পার না? যদি না পার, এই দেখ; আমার এই পাষাণ হৃদয় দেখ, দেখ, এই হতভাগিনী বিধবার হৃদয় দেখ, এই বীর নারীর লৌহপঞ্জরগুলি গণিয়া দেখ, আমার এই অভেদ্য হৃদয়কঙ্কাল দেখ; দেখ তোমাদের কত নির্য্যাতন, কত শেল, কত বজ্রাঘাত আমার বক্ষাস্থিতে বাজিয়াছে দেখ;—আমি দশম বর্ষে পতিত হইয়াই বিধবা হইয়া ব্রহ্মবরে লৌহ শরীর ধারণ করিয়াছি, আর এই দশ বৎসর কাল ধরিয়া না সহিলাম কি? নীচমতি, ভীরু, তুমি যে সংসার সুখে এক দণ্ড বঞ্চিত হইলে থাকিতে পার না, তুমি যে স্ত্রীপুত্র পরিবারের মুখ এক দণ্ড না দেখিলে তিষ্ঠিতে পার না, আমি বালিকা বয়সে সেই সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি; তুমি নিত্য নিত্য দণ্ডে দণ্ডে যে সমস্ত সুখভোগ, আমোদ প্রমোদে মত্ত হইতেছ, আমি চক্ষু মেলিয়া দশ বৎসর কাল তাহা দেখিতেছি, আর অশ্রুধারে মনোমালিন্য ধৌত করিতেছি! কতই না স্বজন পরজনের গঞ্জনা সহ্য করিলাম? কতই না দুর্জ্জয় রিপুর আক্রমণে মর্ম্মপীড়িত হইলাম? বুদ্ধদেবেরও কামের সহিত যুদ্ধ করিতে

হইয়াছিল! আমি যে কামিনী? বৈধব্য-ধর্ম্ম অবলম্বনের ভাণ করিয়া তোমাদের সংসর্গনরকে বাস করিয়া, তোমাদের চরিত্র দেখিয়া কতই না পাপচিন্তায় কলঙ্কিত হইলাম? আমার এক এক খানি অস্থি ধরিয়া দেখ, এক শতটী করিয়া হৃদয়ভেদী দাগ পড়িয়াছে, গণিয়া দেখ; কান্দিতে কান্দিতে হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া আসিল, এখনও জীবন আছে দেখ! নারীর হৃদয় পাষাণ, আর তোমাদের হৃদয় সদ্যোজাত নবনী? এত লোকের মধ্যে এক জনও কি প্রাণের মায়া—সংসারের মায়াটা ছাড়িতে পারিলে না? তবে আমরা এই ২৷৩ কোটী বিধবা কেমন করিয়া হৃদয়কে পাষাণ করিয়া রাখিব, বলিয়া দাও, শিখাইয়া দেও! রমণীহৃদয় যে ভালবাসায় গঠিত! প্রাণ মন যে তা'র ভালবাসামাখা, তাকি তোমরা জান না? পুরুষ, তোমরা ভাল না বাসিয়াও থাকিতে পার, তোমরা স্বার্থসাধনের প্রবল চিন্তায় অনেক সময় ভুলিয়া থাক, কিন্তু রমণীহৃদয় ত স্বার্থচিন্তা তোমাদের মত জানে না! সে যে আপনার প্রাণ মন দেহ বিক্রয় করিতে পারিলেই বাঁচে! সে কেবল চায় ভালবাসা। বলিতে কি ভালবাসা ব্যতীত রমণীহৃদয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া উঠে। ভালবাসার বিনিময়ে নারীকুল যে হৃদয় মন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করে, পিতা মাতা ভ্রাতা ভুলিয়া যায়।

সেদিন, না জানি কোন্ অজ্ঞান বালক লিখিয়াছে,—নলডাঙ্গাধিপতি বিধবার দুঃখ যতদূর বর্ণনা করিয়াছেন, বাস্তবিক তত নয়। নির্ব্বোধ, তুমি শৃঙ্খলবদ্ধা, পূর্ণযৌবনা হিন্দু বিধবার দুঃখ জানিবে কি, বুঝিবে কি? এক কথায়, বুঝিয়া দেখ "উর্ব্বরা উদ্যানভূমিতে ভাল গাছ না লাগাইয়া ফেলিয়া রাখিলে সতেজ আগাছা আপনিই উৎপন্ন হয়," এবং তাহা হইবেই হইবে। "আমার ভগ্নী বড় ভাল" আহ্লাদমাখা ছেলের মত এরূপ বলিলে কি হইবে? তুমি তার খবর রাখ কি? আগে স্ফটিকের ন্যায় হৃদয়টী নিরপেক্ষ, পবিত্র কর, তৎপরে একটু বুঝিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে, "তোমার যৌবনপ্রাপ্তা প্রিয় ভগ্নী বা প্রাণসমা কন্যার অন্তর রাজ্যে রাত্রি দিন কেমন ব্রহ্মচর্য্য হইতেছে!" বাহবা! বাহবা!

এ হেন অনাথিনী নারীকুলের মস্তকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অর্পণ করিয়া পুরুষপুঙ্গবেরা সুখে থাকিবে? তা থাক! স্ত্রীজাতিকে রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি করিয়া, তোমরা উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা হইবে? তা হও! তা, তোমরা সুখী হও, প্রার্থনা করি; কিন্তু দেখ, আমাদিগকে কঠোর বৈধব্যব্রতের আবরণ পরাইয়া যে কি লাভ হইতেছে, তাত আর এখন তোমাদের অবিদিত নাই? এখন আর অধিক বলিতে হইবে না, সকলেই সকল জানিতেছ, তা নিশ্চয়; তবে আর

কেন? তবে যদি বল হাত নাই, কি করি? হইবার নয়! ত, তোমরা ত এখন উত্তম সাহেবি শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছে, এই সকল অকর্ম্মণ্য বিধবাগণকে কেন গুলি করিয়া মার না? তাদের সকল দুঃখের অবসান হোক! না, তাও হ'বে না; তাহ'লে তোমাদের সংসারের দাসীবৃত্তি করিবে কে?

দেখ, আদর্শব্রহ্মচারী পুরুষ যাবৎ হিন্দুর গৃহে গৃহে প্রস্তুত না হইবেন, তাবৎ হিন্দু বালবিধবাগণের ব্যভিচার বা পাপচিন্তা ভিন্ন, বাস্তবিক ধর্ম্মকর্ম্ম একতিলও হইবে না, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু সেই দিন সহস্র চেষ্টা করিলেও আসিতে যে কত বিলম্ব হইবে, তাহা কি তোমরা জগতের ইতিহাস জানিয়া বুঝিতে পার নাই? আর ঠিক সেই দিন, সেই ধর্ম্ম, সেই কর্ম্ম, ঠিক সেইরূপে ফিরিয়া আসাও যে কতদূর সম্ভব তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখ। যদি জগতে ধর্ম্ম থাকে আর একটা পিপীলিকাকেও যন্ত্রণা দিলে যদি পাপ হয়, তবে এই কোটী কোটী বিধবার মর্ম্মবেদনা ও পাপাচরণের জন্য একণে দায়ী হইবে কে? নিশ্চয় জানিও, যিনি অনাদি, অনন্ত, মহান্, তাঁহার সর্ব্বদর্শী চক্ষুর সমক্ষে এই মহাপাপ কখনই মার্জ্জনীয় নহে। ইহা কি জান না, যে এক জনকে যদি দশজনে মারিতে যায়, তৎক্ষণাৎ আর দশ জন বলে, মারিতে দিব না; কেন মারিবে? পৃথিবীতে, এই ন্যায়প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাও না? পশু, পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাও? জঙ্গলে যাও। মনুষ্যত্ব যেখানে আছে, সেখানে নয়; এ যে ব্রহ্মাণ্ডপতির রাজ্য, পরব্রহ্মের ধর্ম্মাধিকরণ; এখানে নিকৃতির ওজনে, ন্যায়ের বিচারে সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। এক্ষণকার বিধবাগণের পক্ষে এই কথাটী স্মরণ রাখিও। বর্ত্তমান পশুসমাজের "চণ্ডাল স্কন্ধ" ন্যায়দণ্ডে অবনত হইবে।

ভাল, তোমরা কি মানুষ? তোমাদের চক্ষু যে কিছুতেই পরদুঃখ দেখে না! সাঁড়াশি দিয়া চক্ষু উৎপাটন করিলেও যে ও-চক্ষু দেখে না! ইহার উপায় কি? না দেখ, ভাল চুপ করিয়া বসিয়া থাক, বনে যাও; যে ব্যক্তি দেশের কোন মহৎ কার্য্যে ব্রতী হয়, তাহাকে তাহার ন্যায়ানুগত কার্য্য করিতে দেও। তোমাদের এমনই দুর্ম্মতি, না নিজে কিছু করিবে, না অন্যকে কিছু করিতে দিবে? ভাল তোমাদের হৃদয়ে কি একটুও দুঃখ নাই? যদি তোমার একটী বিধবা ভগ্নী, নিরম্বু উপবাস করিয়া পার্শ্বে বসিয়া থাকে, তুমি কোন মুখে উপাদেয় আহারের দ্বারা উদর পূরণ কর? যদি বল, ধর্ম্ম? তা ধর্ম্ম কি কেবল সেই কোমলমতি বালিকার? আর তোমার বেলায় মণ্ডা মেঠাই দরকার? আর সে বালিকার কিসের ধর্ম্ম? সে যে তার কিছুই বুঝে না? কই কিসে আর কিছুই বুঝিতে পারে না, তা কি

তুমি স্বচক্ষে দেখিতেছ না? তুমি যে দিন ব্রহ্মচারী হইবে, সেই দিন জানিও তোমার ভগ্নীর কথঞ্চিৎ ধর্ম্মপালন করিবার সম্ভব। অতএব বলিতেছি, তুমি এই মুহূর্ত্তে ব্রহ্মচারীর ব্রত অবলম্বন কর, আর যদি না পার, তবে আপন নামটী স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষর করিয়া দিয়া, সাধারণের সমীপে, সংবাদপত্রে বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন কর; এই দুয়ের এক করিতেই হইবে, তা যদি না কর, নিশ্চয় বলিলাম, তোমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। তোমরা যে কোন দিকেই যত্ন পরিশ্রম উদ্যম দেখাইবে না, সুখের সংসার পাইয়াছ, চুপটি করিয়া কোণে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে ভোগ দখল করিবে, তাহা আর হইবার নহে, নিশ্চয় জানিও, তোমাদের সে আশায় ছাই পড়িয়াছে! আর সেই মেয়েগুলিকে যে লাথি ঝাঁটা মারিয়া নিজেরা মদ খাবে, মাংস খাবে, হাসি তামাসায় দিন কাটাবে, অথবা বসিয়া বসিয়া ব্রহ্মত্তর ভোগ করিবে, সেই সুখের সংসারে একাধিপত্যের দিন অবসান হইয়াছে! সেই সুখের নিশি প্রভাত হইয়াছে, এখনও স্বপন ভাঙ্গিতেছে না? স্ত্রী-শিক্ষার নবীন ভানু দেখা দিয়াছে! বলিতে কি, কি ইতর, কি ভদ্র, কি বেশ্যা, কি ভদ্রমহিলা, চণ্ডালিনী হইতে ব্রহ্মচারিণী পর্য্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুরমণীই, পুরুষচণ্ডাল তোমাদের ব্যবহার বুঝিতে পারিয়াছে! এ মিথ্যা নয়, কল্পনা নয়! এখনও যদি তোমরা স্ত্রীদুঃখ দেখিয়া সেইরূপ নীরব থাকিতে চাও, আর নির্ব্বিঘ্নে সুখভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে এখন হইতে দেখিও, নিশ্চয় বলিতেছি, এক্ষণে আমাদের এই সকল হস্তে তোমাদের অনেক শিক্ষালাভ করিতে হইবে!

আর যদি বিধবার মুকুটমণি নন্দডাঙ্গা-ভূষণের ন্যায় কোন মহাত্মা অনাথিনী হিন্দুবিধবার দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাক, যদি কেহ সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার ন্যায় বিধবার মলিন মুখ দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া থাক, যদি সেই জ্বলন্তপ্রাণ যুবকের ন্যায় প্রাণের আগুণ জ্বালিতে পারিয়া থাক, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হও। "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ং" এই মহামন্ত্র হৃদয় কঙ্কালে অঙ্কিত কর; আর "যতক্ষণ বাঁচিব অন্নজল পাইবই পাইব" "ভয় নাই, ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন" এই মহা-বাক্যগুলি তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্থ করিয়া লও, একবার অনাদি-অনন্ত আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, সকল ফেলিয়া একবস্ত্র হও, বাতাসের মুষ্টি হস্তে লইয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াও দেখি, আমরা একবার মাল্য চন্দন পরাইয়া দেই! আর আশীর্ব্বাদ করি, জগতের লোক তোমার গলায় অমূল্য মাল্য পরাইয়া দিবে!

আর যদি না পার, ভয় হয়, অর্দ্ধা-ঙ্গিনীর মায়া ছাড়িতে না পার, থাক। দেখ, বিধবার হাড়ে কি না সয়?

বিধবার অস্থি অনন্ত পরীক্ষায় পরীক্ষিত! ঐ 'যে চৈতন্য, চৈতন্য কর, বিধবার অস্থি ! সেই উন্মাদ সন্ন্যাসীর অস্থি অপেক্ষা কোমল নয় !

যদি তোমরা একেবারেই কিছু না পার, কিছুকাল বদ্‌খেয়াল চালাও, যে স্বার্থপরতা দেখিলে মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে, ঐ স্বার্থপরতা আর কিছুকাল দেখাও, কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখিও এই প্রাণে পাথর বান্ধিব, নয়ন উদাস করিয়া, এই বেণী বিচ্ছিন্ন করিয়া, এই বাহু ঊর্দ্ধ করিয়া "হরি, হরি, প্রাণবল্লভ!" বলিয়া পাগলিনীর ন্যায় বাহির হইব, শত শত উন্মাদিনী সঙ্গিনীর সঙ্গে নৃত্য করিব,—এই চুল ছাড়িয়া দিয়া এমন নাচিব, যে সেই মত্ততা, সেই জড়তা, সেই হরিবোল, সেই করতালি, সেই নৃত্য, সেই হাসি, সেই কান্না, তেমনি উচ্ছ্বাস, তেমনি আবেশ, তেমনি মূর্চ্ছা, তেমনি দেশমাতান, প্রাণকাদান ভাব, তেমনি দলবল, তেমনি কোলাহল, তেমনি ঢলাঢলি, তেমনি কোলাকুলি, ঠিক তাই আবার করিব! ধূলিমুষ্টি ধরিব ত স্বর্ণরেণু হইবে; বাতাস ধরিব ত পাহাড় হইবে! চৈতন্য নদীর মুখ দর্শন করিতেন না; আমরা আর পুরুষের মুখ দর্শন করিব না; পুরুষ-চণ্ডালের পাপ নাম বিস্মৃতির জলে মন হইতে শতবার ধৌত করিব; এই নববিধান প্রচার করিব; আর সময়ে সময়ে সুদূর প্রান্তরে গিয়া বসিব, আবার স্বাধীন বাতাসে গা ঢালিয়া দিয়া, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে গাইব—স্বাধীনতা,—স্বাধীনতা,—স্বাধীনতা !

শ্রীকুমারনাথ দেবশর্ম্মা।

ত্রিদিব চ্যুতি।

কি দুঃখ জানাতে আজি ধরিনু লেখনী
বালক! বুঝ কি তুমি? তুমি ত বুঝনি।
যে অনলে দগ্ধ হৃদি, জানেন কেবল বিধি,
জানে সেই যারে ইহা দহেছে কখন
বুঝিবে না তুমি, ইহা জাননি এখনি।

সরল তোমার মন, সুখে ভাসে অনুক্ষণ,
সুখ ভিন্ন দুঃখ নাহি জানে এ জগতে
বিভিন্নতা নাহি দেখে স্বরগে মরতে।

আশীর্ব্বাদি শিশুতোরে, যেনরে এমনিভোরে,
জীবন যামিনী তোর সদাসুখে ভাসি
থাকে যেন' মিয়া মুখ চির হাসি হাসি।

যেমন গড়িছ মনে, এক মনে সঙ্গী সনে,
'বিবাহ করিব আমি সুন্দরী দেখিয়া
অলঙ্কার দিব তারে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া।

দিব্য অট্টালিকা 'পরে সুন্দর সজ্জিত ঘরে,
রাখিব তাহারে করি অতীব যতন
নিত্য সুখে দুই জনে কাটাব জীবন।'
তেমতি যেন হে তব, মনের বাসনা সব,

অক্ষয়ে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত হয়
শারদ চাঁদিমা চির দেখ শোভাময় ।

আমিওত তব প্রায় কত ভাবিয়াছি
অমরার পারিজাত বনে রাখিয়াছি ।

অনিত্যে নিত্যতা ভাব,না বুঝে ভবের হাব
সুখময়ী এ পৃথিবী হৃদে আঁকিয়াছি
মনে মনে কত উচ্চ আশা গড়িয়াছি ।

হায়রে অবোধ মনে,কেন সেই আশা বনে
হৃদয় মাঝারে আগে দিনুরে আশ্রয়
কেন ভাবিলাম ভব বড় সুখময় ?

আগে যদি ভাবিতাম, মনে যদি বুঝিতাম
সুখ নাই হেথা, নাহি কার সুখ আশা
থাকিতনা এত তবে সুখের পিপাসা।

অনায়াসে সহিতাম, দুঃখ হৃদে বহিতাম
বারেক না ফেলিতাম নয়নের জল
দুঃখ ভারে হৃদি নাহি হইত বিকল ।

হেথা কেহ কার নয়, মিছা আপনার কয়
জানিতাম যদি আগে, তবে কি তাহায়
আপনার ভেবে প্রাণ সপিতাম হায় !

সমুদ্র মন্থন কালে শুনেছি পুরাণে
অমৃত তুলিতে উঠে গরল সেখানে

কথা মাত্র শুনেছিনু, অর্থ নাহি বুঝিছিনু
গূঢ় তত্ত্ব কিছুমাত্র বুঝি নাই তার
বুঝিনি তখন হায় ! বুঝিনু এবার ।

এমন শীতল জল, তবুরে বাড়বানল
কেন উৎপাদিত হয় আগে বুঝি নাই ।
এমনি সকল হেথা কে জানিত ভাই

মণি ভ্রমে ফণি গ্রাস, বিচ্ছেদ প্রণয় পাশ
বাল্য আশা নিত্য সুখ দুঃখে পরিণত
হইবে জানিলে আগে হ'তাম বিরত

কোথায় অমরা আর, সংসার অমরা সার
না বুঝে মানবে বৃথা গর্ব্বে এরে সবে,
প্রণয়ি নন্দন আমি ভেবেছিনু ভবে

হেথা যে চাঁদের আলো,হৃদয় করেরে আলো
শারদ চাঁদিমা কোথা তার সমতুল
অকলঙ্ক শশী হেথা করে হিয়াকুল

ফুল দল ঋতুরাজ, ধরে যে মোহন সাজ
সে সাজ কোথায় পাবে ফুল ঋতুরাজ
সকলি বিজলি হায় ! জলদের মাঝ

হৃদয়ে রাখিতে যারে না পেতাম স্থান
যার যোগ্য স্থান হৃদে নাহি ভাবিতাম
কত বার কত স্থানে, ধরিতাম যে বয়ানে,
আদরে চাপিয়া তবু না পূরিত সাধ
ঘুচিত না মন সনে হৃদয় বিবাদ

নয়নে নয়নে যায়, রাখিয়াও সদা ভয় !
না ঘুচিত নয়নের ভ্রম পরমাদ
ক্ষণকাল না হেরিলে গণেছি বিষাদ

সুধাহাসি মুখে যার, দেখিয়াছি কত বার
আপনা ভুলিয়া ভুলি এ বিশ্ব সংসার
নয়ন পল্লব নাহি ফেলি একবার

কঠিন হৃদয় করি, কালিরে স্বহস্তে ধরি
দিয়াছি আগুণ তার সে সুধা আননে
ভস্মময় দেখিয়াছি সে দেহ রতনে ।

অবিচার বিধাতার, কে লইল বস্তু কার
আমার হৃদয় নিধি ভস্মিলি অনল
ফিরাইয়া দাও যদি চাহরে মঙ্গল

আমি যে যতন করে, পুষিলাম হৃদে ধরে
অবিশ্রান্ত দিবা নিশি প্রাণ দিয়ে তারে
সে যত্ন কি দিতে তোরে ভস্ম করিবারে?

উন্মত্ত হয়েছে চিত ব্যাকুল জীবন
নারি যে লেখনী আর করিতে ধারণ
দর দর দুনয়ন, কেন বহ অকারণ
কেন বৃথা বক্ষঃ বহে পড় অশ্রুজল?
কাগজ ভিজিল, থাম, হওনা বিকল!
বহ তবু অশ্রুজল, ফাট হৃদি শত দল

এত করি মানা তবু না মান বারণ
অস্থির হ'য়েছি আমি কি লিখি এখন ;—

* * *

শুনিলে ভবের খেলা, বুঝে লহ এই বেলা
বুঝাও মনেরে শিশু বুঝাও এখন
দুঃখের সংসার নহে সুখের ভুবন।

হিন্দু দেবতত্ত্ব।

কিরূপে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে দেবদেবতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আজি স্থির করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এই ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া সেই দেবদেবতার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। আধুনিক ইয়োরোপীয় প্রণালী ক্রমে ইতিহাস রচনা করা হিন্দুশাস্ত্রকারগণের রীতি ছিল না, সুতরাং ধর্ম্মেরও ইতিহাস নাই। তবে ধর্ম্মশাস্ত্রসকল বিদ্যমান আছে। সেই ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া যতদূর নির্ণয় হইতে পারে, আমাদের দেবদেবতার উৎপত্তি সম্বন্ধে, পণ্ডিতগণ তাহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এত প্রাচীন কালের শাস্ত্র দিলইয়া যে বিবিধ মতভেদ ঘটিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। এই মতভেদের দুইটি প্রধান মূর্ত্তি আমরা বলিতেছি।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল নানাবিধ কল্পনায় পরিপূর্ণ। কবিগণ অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও কল্পনার সৃষ্টি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। উপন্যাস ও গল্পচ্ছলে সকল শাস্ত্রই গ্রথিত হইয়াছে। গল্পের স্রোত ধারাবাহিক হইয়া গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্তরে প্রবাহিত হইয়াছে। কোথায় এই গল্পের আরম্ভ, কোথায় শেষ, কোথায় মধ্য তাহা ঠিক করা কঠিন। হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস লইয়াই সকল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। যাহা সমুদায় কল্পনাসম্ভূত ও হৃদয়ের উন্মত্ততায় উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, তাহা হইতে সত্য নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ভারতে কেন, প্রাচীন গ্রীশ, রোম ও মিশরেও দেবতত্ত্ব প্রতিপাদ্য ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় এইরূপ কল্পনা ও হৃদয়োচ্ছ্বাসে জড়িত এবং মিশ্রিত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক দেবতত্ত্ব আলোচনা করিয়া তন্মধ্য হইতে ঐতিহাসিক

সত্য নির্ণয় করিতে গিয়া গ্রোট (Grote) মহা বিপত্তিতে পড়িয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে গ্রীশ দেশীয় প্রাচীন দেবদেবতাগণ কেবল মানুষী কল্পনা এবং হৃদয়াবেগ-সম্ভূত উপন্যাস মাত্র। তাহাতে দার্শনিক তত্ত্ব এবং ইতিহাসের উপাদান কথঞ্চিৎ মাত্রায় থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু তাহা নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং সেরূপ উপাদান থাকা না থাকা এখন সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন্‌টি বাস্তবিক সত্য, এবং তাহার কতটুকু সত্য, কতটুকু মিথ্যা, তাহা নির্ণয় করিবার যখন যো নাই, তখন সে সমুদায়ই মানসিক সৃষ্টির ইতিহাস যোগ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা ব্যাপারের ইতিহাস রূপে কখনই গৃহীত হইতে পারে না। তিনি গ্রীশদেশীয় প্রাচীন দেবতত্ত্ব (Mythology) সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহা "Matter appropriate only for Subjecitve History" অর্থাৎ তাহা মানসিক ব্যাপারের ইতিহাসযোগ্য, কিন্তু (Objective) প্রকৃত ঘটনামূলক ইতিহাসের পক্ষে কোন কাজেরই নহে। গ্রোট (Grote) প্রাচীন গ্রীক দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে স্থির করিয়াছেন যে তাহা কেবল কল্পনা এবং মানুষী হৃদয়ভাবের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ; তাহা প্রকৃত ইতিহাস এবং দর্শনতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। গ্রীক দেবতত্ত্ব কল্পনা এবং হৃদয়ভাবে পরিপূর্ণ। তাহাতে ঐ দুইটী মাত্র উপাদান আছে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে আরও একটি উপাদানের প্রাধান্য আছে—সে উপাদান, দার্শনিক তত্ত্ব। এই দার্শনিক তত্ত্ব আমাদের আধুনিক ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এজন্য তিনটি প্রধান উপাদানে সৃষ্ট হইয়াছে, কল্পনা, মানুষী হৃদয়ভাব, এবং দার্শনিক তত্ত্ব (Philosophy)। তন্মধ্যে প্রকৃত ঘটনা কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু এক্ষণকার কালে আমরা এই ধর্ম্মশাস্ত্রকে যেরূপে প্রাপ্ত হই, সেরূপ শাস্ত্রে প্রকৃত সত্যাংশ নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক, যেখানে কল্পনা এবং হৃদয়ভাবের অত্যন্ত প্রাধান্য, সেখানে প্রকৃত ঘটনা কিছুই নাই বলিয়া যদি কেহ সিদ্ধান্ত করেন, সে সিদ্ধান্তের খণ্ডন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিপোষক যুক্তি অনেক আছে। নিজে ধর্ম্মশাস্ত্রই তাহার সাক্ষ্য। ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এই সাক্ষ্য অবলম্বন করিয়া দেবদেবতাগণ যে কেবল রূপকমাত্র, কেবল কল্পনামাত্র, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদান করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড এবং জার্ম্মাণদেশীয় অনেক ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত গ্রোটের কথাই সমর্থন করিয়া থাকেন। আমাদের বৈদিক প্রাচীন দেবতাগণ যে কেবল প্রাকৃতিক শক্তিরই রূপকমাত্র তাহা

মোক্ষমূলার (Max Muller) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। Hibbert Lectures on the Origin and Growth of Religion (ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি নামক বাঙ্গালা অনুবাদ দেখ) নামক গ্রন্থে তিনি বৈদিক দেবতাগণের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তাহাতে অগ্নি, বরুণ, পবন, ইন্দ্র প্রভৃতি উক্ত বৈদিক দেবতাগণ প্রাকৃতিক শক্তিরই রূপক মাত্র প্রতীত হইয়াছে। তিনি এই কথা এক স্থলে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন:—

"If we want to know whether the human mind, though endowed with the natural consciousness of a divine power, is driven necessarily and inevitably by the irresistible force of language as applied to supernatural and abstract ideas, we must read the Veda; *and if we want to tell the Hindus what they are worshipping—mere names of Natural Phenomena, gradually obscured, personified and deified*—we must make them read the Veda. It was a mistake of the early Fathers to treat the heathen Gods as demons or evil spirits, and we must take care not to commit the same error with regard to the Hindu Gods. *Their gods have no more right to any substantive existence than Eos or Hemera, than Nyx or Apate. They are masks without an actor—the creation of man, not his creator's;—They are Nomina not Numina—names without being, not beings without names.*"(ক)

মোক্ষমূলারের এই সিদ্ধান্ত অনেক পণ্ডিত গ্রহণ করিতেছেন। বক্ল (Buckle) মোক্ষমূলারের মতাবলম্বী। কোল্‌ব্রুকের শাস্ত্রীয় মতামত পড়িয়াও প্রতিপন্ন হয় তিনিও ঐ মতাবলম্বী। সে দিন "প্রচারে" দেখিলাম "ইন্দ্রের" দেবত্ব আলোচনা স্থলে এই মতেরই সমর্থন করা হইয়াছে। ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন "ইন্দ্র" প্রাকৃতিক শক্তিরই রূপক মাত্র। লেখক বোধ হয় কোমতের শিষ্য। কোমৎ দেবার্চ্চনার আবির্ভাব সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে সব দেবতাগণ প্রাকৃতিক ঘটনা এবং শক্তিরই অনুরূপ কল্পনা মাত্র।

এই মত শুদ্ধ যে বেদ দেবতাগণ সম্বন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে এমত নহে। এই ভাষাবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভাষার প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মেরও ভিত্তি শিথিল করিতেছেন। শব্দের অর্থানুসারে বরনুফ (Younger Burnouf) খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে অগ্নিপূজামাত্রে পর্য্যবসিত করিতে চান (খ)। ইহুদের

(ক) "Chips from a German workshop"—article Comparative Mythology.

(খ) Explaining, christos as "He who is fed with oil" is fire.

(Strauss) ব্যাখ্যাও এইরূপ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিকূল।

ধর্ম্মশাস্ত্র রূপকময়—এই মত এখন চারিদিকে অবলম্বিত হইতেছে। আমাদের শিক্ষিত দলের অনেকে একণে এই মতেরই পক্ষপাতী। "নবজীবন" এবং "প্রচারে"যে সকল মত ব্যক্তির হইতেছে, তাহা এই মতেরই প্রতিপোষক। আজ একজন বলিলেন রাধাকৃষ্ণের লাম্পট্যলীলা ঈশ্বর-প্রেমের রূপকমাত্র। কাল আর একজন কৃষ্ণের রাসলীলায় রূপক ভ ঙ্গিয়া দিলেন। "হরপার্ব্বতী" এবং "রাধাকৃষ্ণ" পুরুষ প্রকৃতিরই রূপক মাত্র। সমুদায় শ্রীমদ্ভাগবৎ একটী বৃহৎ রূপক—পুরুষ প্রকৃতিই যাহার আলম্বন ও বিষয়।

এই ভাষাবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া আমাদেরও শাস্ত্রকারগণ অনেক দেবদেবতাকে কল্পনা মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মোক্ষমূলার যে বলেন হিন্দুদিগের দেবদেবতারা "নাম"মাত্র, তাঁহারা বাস্তবিক শরীর ধারণ করেন নাই, মহাভারতকার দ্বৈপায়ন যেন তাহা বিস্তারিতরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ভাষার প্রমাণ অবলম্বন করিয়া একটি দেবতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

"সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ, মহাত্মা বাসুদেব অপ্রমেয়; তথাপি আমি তাঁহার মহিমার বিষয় যাহা অবগত আছি, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

"তিনি সর্ব্বভূতের আবাসস্থান ও দেবযোনিসম্ভব বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব; তিনি বৃহৎ বলিয়া বিষ্ণু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন; মা শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি, তিনি মৌন, ধ্যান, ও যোগ দ্বারা আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃত্তি দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মাধব; তিনি সর্ব্বতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান লাভ ও মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া মধুসূদন নামে প্রথিত হইয়াছেন। হে মহাত্মন্! কৃষিশব্দের অর্থ সত্তা ও ন শব্দের অর্থ আনন্দ; মহাত্মা মধুসূদন সৎ ও আনন্দস্বরূপ বলিয়া কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ পরম স্থান এবং অক্ষ শব্দের অর্থ অব্যয়, বাসুদেব পরম স্থানে বাস করেন এবং তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া তাঁহার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ হইয়াছে। তিনি দস্যুগণকে বিত্রাসিত করেন বলিয়া তাঁহার নাম জনার্দ্দন হইয়াছে। ঐ সত্ত্বশালী পুরুষ কদাপি সত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হন না বলিয়া তাঁহার নাম সাত্বত; বৃষভ শব্দের অর্থ বেদ ও ঈক্ষণ শব্দের অর্থ জ্ঞাপক, বেদ তাঁহার জ্ঞাপক বলিয়া তাঁহার নাম বৃষভেক্ষণ। তিনি কাহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন না বলিয়া তাঁহার নাম অজ; তিনি সাতিশয় দান্ত এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে স্বপ্রকাশ বলিয়া তাঁহার নাম দামোদর। তিনি অতিশয় হৃষ্ট, সুখী, ও ঐশ্বর্য্যবান বলিয়া হৃষীকেশ নাম ধারণ করিয়াছেন। তিনি বাহুদ্বয় দ্বারা রোদসী ধারণ করিয়াছেন

বলিয়া মহাবাহু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ও অধঃপ্রদেশে তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া তাঁহার নাম অধোক্ষজ। তিনি নরগণের আশ্রয় বলিয়া তাঁহার নাম নারায়ণ। তিনি সর্ব্বভূতের পূরণকর্ত্তা ও সর্ব্বভূত তাঁহাতেই অবসন্ন হয় বলিয়া তাঁহার নাম পুরুষোত্তম, তিনি সমুদায় কার্য্যকারণের মূলীভূত ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার নাম সর্ব্ব; এবং তিনি সত্যে ও সত্য তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া তাঁহার নাম সত্য। তিনি চরণ দ্বারা আকাশ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণু, জয়শীল বলিয়া জিষ্ণু, নিত্য বলিয়া অনন্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া গোবিন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।" (ক)

শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যাখ্যা একজন পণ্ডিতের ব্যাখ্যা। দ্বৈপায়ন একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি আপন কাব্যসৃষ্টি মধ্যে দেবষড়যন্ত্র দিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে তন্মধ্যে আনিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা পড়িলে ভগবান যে নরদেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এরূপ অনুমান হয় না। যেহেতু এখানে দেখা যায় তাঁহার সকল নামই ভগবানের প্রতিশব্দ মাত্র—সকলই সার্থক নাম। তিনি জন্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার অবশ্য জন্মনাম অথবা ডাকনাম থাকিত। কিন্তু কই শ্রীকৃষ্ণের ডাকনাম ত কিছুই ছিল না। শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের নয়, মহাভারতীয় প্রধান প্রধান পাত্র ও পাত্রীগণের মধ্যে কাহারও ডাকনাম এবং জন্মনাম দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেরই নাম সার্থক। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, বৃকোদর, অর্জ্জুন, ধনঞ্জয়, দ্রৌপদী, যাজ্ঞসেনী, পাঞ্চালী, পাণ্ডু, সঞ্জয়, প্রভৃতি সকল নামই সার্থক। কল্পিত নাম নহিলে এরূপ ঘটে না।

আমরা যে মতের আলোচনা করিতেছি সেই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ সমগ্র মহাভারতকে একখানি বৃহৎকাব্য বলিয়াই বিবেচনা করেন। তন্মধ্যে যে কিছু প্রকৃত ঘটনার বিবরণ আছে এমত অনুমান হয় না। যদি থাকে তাহা এত সামান্য যে সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ তুল্য হইয়া দাঁড়ায়। এবং সেই সত্যটুকু কি তাহাও নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা আবার মহাভারতকে ধর্ম্মশাস্ত্র রূপে দেখেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে অনুমান করেন, ভারত শুদ্ধ উপদেশার্থেই প্রণীত হইয়াছে, উহার যুদ্ধ বিবরণ সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাহার যৎকথঞ্চিৎ সত্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া যত না থাকুক, ধর্ম্মোপদেশ দেওয়াই তদপেক্ষা অধিক লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তিনি প্রকৃত বিবরণের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই, তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ ও মহাপুরাণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি মহাভারতকে বেদের সমতুল্য করিয়া গিয়াছেন।

(ক) মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্বান্তর্গত যানসন্ধি পর্ব্বাধ্যায়, একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

বাস্তবিক, মহাভারতকে কাব্যকল্পনা রূপে দেখিতে গেলে "রামায়ণের" সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেন বাল্মীকির যশোরাশি ম্লান করিয়া দিবার জন্যই ভারতের সৃষ্টি করিয়াছেন। রামায়ণে রাজসভা ও রাজৈশ্বর্য্য বর্ণিত আছে, তিনি সে ছবিকে ম্লান করিবার জন্যই যেন উজ্জ্বলতর রাজসভা ও রাজৈশ্বর্য্য বর্ণনা করিলেন। রামায়ণে আরণ্যকাণ্ড আছে, ভারতেও বনপর্ব্ব আছে। রামায়ণে প্রতিজ্ঞা ও সত্যপালন আছে, মহাভারতেও তাই। রামায়ণের রামলক্ষ্মণের ভ্রাতৃভাব পঞ্চপাণ্ডবের ভ্রাতৃভাবের নিকট ক্ষীণপ্রভ হইয়া দাঁড়ায়। সেই ভ্রাতৃভাবকে উজ্জ্বলতর করিবার জন্যই যেন কবি পঞ্চস্বামীর এক ভার্য্যা ও দ্রৌপদীর কল্পনা করিয়াছেন। যাহাতে সুন্দ উপসুন্দের বিচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহা এই পঞ্চস্বামীর ভ্রাতৃভাব বিনষ্ট করিতে পারে নাই। রাম লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন এবং সীতার জন্ম যেরূপ অদ্ভুত ও রহস্যপূর্ণ, পঞ্চপাণ্ডব এবং যাজ্ঞসেনীর জন্মবৃত্তান্ত তদ্রূপ অদ্ভুত ও রহস্যপূর্ণ। উঁহারা সকলেই দেবাংশসম্ভূত। রামায়ণের যুদ্ধ ও সীতার উদ্ধার, মহাভারতের যুদ্ধ, রাজ্যোদ্ধার এবং পাঞ্চালীর অপমানের প্রতিশোধের সাদৃশ্য প্রতীয়মান করে। এ সমস্তই কল্পনা। এ সমস্ত রামায়ণের ছায়ামাত্র, প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা নহে। যাঁহারা রামায়ণের যাথার্থ্য প্রমাণার্থ সাগর বন্ধনের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের উত্তরে রূপকবাদীরা বলেন, উহা হনুমানের সেতু বন্ধন নহে—লঙ্কা ও মহাদ্বীপের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডের নৈসর্গিক গঠন ঐরূপ ছিল বলিয়া কবি তাহার উপর আপন কল্পনাজাল বিস্তার করিয়াছেন। তদ্রূপ, পূর্ব্বে হস্তিনাপুর একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল বলিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহার উপর মহাভারতের কল্পনা স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা যে মতের ব্যাখ্যা করিতেছি সেই মতকে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য এত জল্পনা করিলাম। মহাভারতের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইলাম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীমদ্ভাগবতকে অনেক পণ্ডিত রূপকরূপে ব্যাখ্যা করেন। যে রূপকের অস্থি দার্শনিক তত্ত্ব (Philosophy) এবং যাহার কায়া কল্পনা (Imagination) এবং হৃদয়ভাব (Feeling)। বেদের প্রকৃতিপূজা রূপকে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমে পুরাণে নরপূজায় বিস্তৃত হইয়াছে।

রূপকবাদীদিগের মতানুসারে বিচার করিতে গেলে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রীয় দেবকুল দাঁড়াইবার স্থল পান না। কারণ, সকলই যদি রূপক হইল, তবে সমুদায়ই কল্পনা মাত্র, কিছুই প্রকৃত ঘটনা নহে। ইঁহারা কিছুই বাস্তবিক পদার্থ বলিতে চান না, সকলই কল্পনা ও মনের সৃষ্টি রূপে পরিণত করিতে চাহেন। এই মতের প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি মত আছে।

যে মতে বলে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র একেবারে অমূলক নহে, তাহার মূল বাস্তবিক ঘটনা। সেই বাস্তবিক ঘটনা নানাবিধ কল্পনা জালে আচ্ছন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই কল্পনাজাল পরিষ্কার করিয়া দিয়া প্রকৃত পদার্থকে বাহির করা পণ্ডিতগণের কর্ত্তব্য। আমরা এই মত গ্রোটেরই কথায় বলিতেছি :—

"To suppose that these religious legends are mere exaggerations of some basis of actual fact—that the gods of polytheism were merely divinized men with qualities distorted or feigned—would be to embrace in substance the theory of Eumerus." (ক)

সাধারণ লোকের অনেকেই ইউমিরসের এই মতের পক্ষপাতী। সাধারণ লোকে সকলই মিথ্যা ভাবিতে পারে না। সমুদয় দেব দেবতাগণকে কল্পনা বলিলে তাহারা কি লইয়া থাকিবে। পণ্ডিতগণ দেব দেবতার স্থানে দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমুদায়কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সুতরাং তাঁহারা কল্পনাকে কল্পনা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। কিন্তু যে প্রাকৃত জনগণের মনে দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল স্থান প্রাপ্ত হয় না, তাঁহারা কল্পনাকে ছাড়িয়া দিয়া কি লইয়া থাকিবেন? সুতরাং তাঁহারা কিছু স্থূল পদার্থকে আপনাদের বিশ্বাসভূমি করিতে চাহেন। যাঁহারা পণ্ডিতের মত সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল অবলম্বন করিতে পারেন না, তাঁহাদের মনোমন্দিরে সুতরাং স্থূল পদার্থ সকল সহজেই জন্মিয়া উঠে। ভূমি কখন খালি পড়িয়া থাকিতে পারে না। তাহাতে এক প্রকার না এক প্রকার তৃণলতা অবশ্যই জন্মাইবে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। পণ্ডিতগণ যে স্থলে সূক্ষ্মতত্ত্বের পুষ্পোদ্যান স্থাপন করিয়াছেন, প্রাকৃতগণের সে ভূমি কি নগ্নাবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারে?

পণ্ডিতগণ আপনাদের বুদ্ধিবলে যাহা পরিষ্কৃত করেন, প্রাকৃত জনগণ আপনাদের ইচ্ছা প্রভাবে তাহা পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন। ইহাঁদিগের ইচ্ছা নয়—কিছু মিথ্যা হউক, সুতরাং কিছুই মিথ্যা নহে। ইহাদিগের ইচ্ছাই মহা কল্পনা শক্তি—সেই কল্পনাশক্তিবলে সকল দেশ পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন। পণ্ডিতগণ যে পরিমাণে সত্য বলিতে রাজি আছেন, প্রাকৃত জনগণ ততটুকুতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা সেই বাস্তবিকতার অংশ বাড়াইতে চাহেন, কিছুতেই তাঁহাদের মন পূরে না, অবশেষে সকলই সত্য, ও বাস্তবিক বলিয়া বিশ্বাস না করিতে পারিলে তাঁহাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হয় না। এ মতের দোষ এই—রূপকবাদী পণ্ডিতগণ একেবারে সত্যাংশ উড়াইয়া দিতে ইচ্ছুক না থাকিলেও যেমন তাঁহারা সকলই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া ফেলেন, ইউমিরসের মতাবলম্বিগণ তেমনি সত্যাংশ বাহির করিতে গিয়া

(ক) Grote's History of Greece, note to page 304.

সকলই মাজ্য বলিয়া ফেলেন। রূপকবাদীরা যেমন এক সীমার প্রান্তে গিয়া দাঁড়ান, ইউমিরসের মতাবলম্বিগণও তেমনি আর এক প্রান্তে উপস্থিত হন। উভয়েই দোষ। কিন্তু এ দোষ পরিহার করা বড় সহজ নহে। কারণ, কোথায় সত্যভাগ প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা স্থির নিশ্চয় করা কখনই সহজ কাজ নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিলেও ঘটিতে পারে; কিন্তু রূপকবাদীরা যখন দেখাইতে যান, যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই যুদ্ধবিবরণ যেরূপ দেন, তাহাতে অলীক বর্ণনারই সম্ভাবনা বিস্তর। সত্যাংশটুকু বাহির করিতে না পারিয়া ক্রমে তাঁহারা সমুদায় অলীক প্রমাণ করিয়া ফেলেন। ইউমিরসের মতাবলম্বিগণ বলেন, ইহাতে অসত্যের কল্পনা থাকিলেও অনেক প্রকৃত বিবরণ আছে। তাঁহারা সেই প্রকৃত বিবরণকে ঠিক করিতে না পারিয়া সকলকেই প্রকৃত বলিতে চান। কারণ, কোন্ অংশকে প্রকৃত বলিবেন, কোন্ অংশকে কল্পনা বলিবেন, তাহার কিছুই ঠিকানা হয় না; সুতরাং অবশেষে মহাভারতের কোন অংশকেই অলীক বলিতে চাহেন না এবং পারেন না।

যাহা মহাভারত সম্বন্ধে বলা হইল, দেবদেবতা সম্বন্ধেও তাহা খাটে। একজন প্রতিপন্ন ইংরাজী লেখকের (A. C. Lyall) কথায় আমরা তাহা বলিতেছি:—

"The view maintained in the Mythology of Aryan nations as to the origin and course of divine myths, stated briefly, appears to be that primitive Aryans began with personifying the great processes of Nature, went on to deify in the image of men the impersonated phenomena and to distribute their attributes; then made the gods actors in legends which accepted in real earnest and converted into early incidents such metaphors as of light striving with darkness, and the like; and finally settled their full-blown gods and demi-gods down upon earth with local habitations, names, and human biographies. Now, Eumeristic theory would, speaking roughly, invert this order of development end begin at the other end, tracing the local hero through different stages of real life up to the great Deity who wields the forces of nature." (ক)

কিরূপে আদি রূপক সকল ক্রমে ক্রমে দেব দেবতায় পরিণত হইল, তাহা এ স্থলে সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল যেরূপে সজ্জিত হইয়াছে রূপকবাদীরা তাহা দেখাইয়া দেন। তাঁহাদিগের পথ যথার্থ বলিলে সকলই অলীক হইয়া পড়ে, এই জন্য,

(ক) A. C. Lyall on the Origin and Growth of Divine Myths in India—Fortnightly Review, September, 1875.

ইউহিমিরসের মতাবলম্বিগণ সে পথ দিয়াই চলেন না। তাঁহারা সম্পূর্ণ বিপরীত পথে যাইয়া সকলই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া প্রমাণ করিতে চান। শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন।

রূপকবাদীরা বলিবেন আমাদের পুরাণে যে রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা আছে তাহা পুরুষ প্রকৃতির রূপক মাত্র,—মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সৃষ্টি। এ মতে সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পার্থিব জন্ম, ও জীবন উড়িয়া যাইতেছে। ইউহিমিরসের মতাবলম্বিগণ তাহা বলিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কোন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, এলেকজাণ্ডার অথবা নেপোলিয়ানের মত কোন বীরপুরুষ বাস্তবিক ছিলেন। লোকে তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মের অবতার বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যিনি একবার ব্রহ্মের অবতার বলিয়া উক্ত হইলেন, মানুষের কল্পনা তাঁহাকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিতে লাগিল। অনেক অমানুষিক ঘটনাও কল্পিত হইয়া তাঁহার জীবনের সঙ্গে মিশ্রিত করা হইল। অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক ব্যাপারে তাঁহার জীবন পরিপূর্ণ করা হইল। অবশেষে নরলোক হইতে স্বর্গের ব্রহ্মলোকে তিনি উন্নীত হইলেন। এই শ্রীকৃষ্ণ এখন এত কল্পনা জালে ভূষিত হইয়া রহিয়াছেন যে প্রকৃত মানুষী শ্রীকৃষ্ণকে চিনে উঠা ভার।

রূপকবাদীদের মতে আর্য্যদেবদেবতাগণ প্রাকৃতিক ঘটনাবলির নাম মাত্র। এই সকল নাম ক্রমে দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। ইন্দ্র তাহার প্রমাণ। আদিতে ইন্দ্র আকাশের শক্তি-প্রকাশক নাম মাত্র ছিলেন। অনন্ত আকাশ যে ইন্দ্রের সার্থক ছিল, সেই আকাশ-শক্তি কালক্রমে হাত-পা-বিশিষ্ট মনুষ্যাকারে ইন্দ্ররূপে পরিণত হইলেন। তাঁহার শচী হইল, বরুণাদি দেবতাগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। তাঁহার দাসদাসী বাগান বাড়ী সকলই হইল। ইন্দ্রভবনের ঐশ্বর্য্য, নন্দনকাননের শোভা, পারিজাতের পরিমল কবির বর্ণনীয় এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় হইল। এখানে দেখা যায়, প্রাকৃতিক শক্তি কালক্রমে দেবতারূপে মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইলেন। এইরূপে সাধারণ জনগণের মন যখন অলৌকিক দেবদেবতাগণে পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন লোকে ক্রমে অলৌকিক পুরুষের সত্তায় আস্থাবান হইল। তখন মানুষকে দেব পদে উন্নীত করাও সহজ হইয়া দাঁড়াইল। মানুষকে দেবপদে উন্নীত করিবার সময়ে দার্শনিকদিগের অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। এই মতের আনুকূল্যে মানুষ অনায়াসে দেবতা হইতে লাগিলেন। অদ্বৈতবাদ দ্বারা পৃথিবীর আর কোন উপকার হউক আর না হউক, অনেক মানুষ দেবতা হইয়া গিয়াছেন।

এই দ্বিবিধ প্রণালীক্রমে আর্য্যদিগের

দেবমন্দির ও স্বর্গধাম দেবদেবতায় পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ঠিক কোন্ কোন্ দেবতা স্বর্গ হইতে অবরোহণ করিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ মানুষই বা স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন, তাহা আজি নির্ণয় করা সুকঠিন। স্বর্গ হইতে মর্ত্তধাম পর্য্যন্ত যথার্থই একটি সিঁড়ি আছে। জেকবের এই সিঁড়ির স্বপ্ন (Jacob's Ladder) মিথ্যা নয়। মানুষের কল্পনা এই যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। এই সিঁড়ি দিয়া রাত্রিদিন দেবদেবতাগণ ও নরলোক উঠা নাবা করিতেছে। এ কথা যদি কেহ মিথ্যা বলেন, তিনি হিন্দুদিগের দেবতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন এ কথা মিথ্যা নয়।

জলস্তম্ভের দৃষ্টান্ত দ্বারাও এই স্বর্গের যোগাযোগ সুন্দররূপে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। জলস্তম্ভের দৃশ্যে দেখা যায় আকাশের মেঘ সমুদ্র দিকে নামিতেছে এবং সমুদ্রের জলও সেই স্তম্ভাকারে আকাশে উঠিতেছে। এক সময়েই দুই কার্য্যই সাধিত হইতেছে। অথচ ঠিক বুঝা যায় না, কত জল উঠিল এবং জল নামিল—কোথায় জল উঠিতেছে, কোথায় নামিতেছে। আর্য্য দেবতত্ত্বেও এইরূপ গোলযোগ।

যে দেশে ঈশ্বরবাদ, অবতারবাদ, আত্মার যোনিভ্রমণ এবং অভিসম্পাতের মতাদি প্রচলিত আছে, সে দেশে দেবতাগণের মানুষ হইবার এবং মানুষের দেবতা হইবার বিচিত্রতা কি। পূর্ব্বে শাপভ্রষ্ট দেবতাগণ প্রায়ই মানুষী লোকে বিচরণ করিতেন। কিন্তু তখনকার কালে আর একটিও সুবিধা ছিল। সেই দেবতাগণের শীঘ্র শীঘ্র শাপমোচনও হইত। যখন লোককে ভূতে পাইত, তখন অনেক রোজাও ছিল। কিন্তু এখন এমনি শক্ত কাল পড়িয়াছে, লোককে ভূতেও পায় না, রোজাও নাই। সে যাহা হউক, তখনকার কালে শাপভ্রষ্ট মনুষ্যগণ যে প্রায়ই স্বর্গের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেন, রামায়ণ ও মহাভারতে এ কথার অনেক প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

এক্ষণে প্রতীত হইতেছে, আমরা যে মতদ্বয় বিবৃত করিলাম, হিন্দু দেবতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে সেই উভয়মতই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রূপকবাদীদের মত প্রাচীন ও আদিম দেব দেবতা সম্বন্ধে বিলক্ষণ প্রযুক্ত হইতে পারে। আধুনিক দেবদেবতা সম্বন্ধেও তাহা খাটাইলে খাটিতে পারে। শিব, কৃষ্ণ, রাধা, কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীগণকে রূপক রূপে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া ইউমিরসের মতও একেবারে অমূলক নহে।

রূপকবাদীরা ভাষা এবং শাস্ত্রের আভ্যন্তরিক প্রমাণে আপনাদের পক্ষ সমর্থন করেন, অপর পক্ষীয়গণের প্রমাণ—প্রত্যক্ষ। ইঁহারা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেন, আজিও সাধু

লোক কালক্রমে দেবসিংহাসনে আরো-হণ করিতেছেন। ইহাঁরা দেখাইয়া দেন, শাক্যমুনি বৌদ্ধদেব হইয়াছেন, চৈতন্যও শীঘ্র দেবাসন প্রাপ্ত হইবেন। কত সাধু মুসলমানও পীর হইয়াছেন। যাহা এক্ষণকার কালে ঘটিতেছে, তাহা পূর্ব্বকালেও ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বকালে কৃষ্ণ, মহাদেব প্রভৃতি দেবতাগণ এই রূপে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমরা যে মতদ্বয় পর্য্যালোচনা করিতেছি, সেই মতাবলম্বিগণের দোষ এ—প্রত্যেকেই নিজ মত দ্বারা সমগ্র আর্য্যদেবতত্ত্ব বুঝাইতে চান। এক প্রণালী ক্রমে কতকগুলি দেবতার সৃষ্টি এবং অন্যতর প্রণালী দ্বারা অপর কতক-গুলির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। সমুদায়ই যে এক প্রণালীক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ ঘটিবার অল্পই সম্ভাবনা। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, রূপক-বাদীদের মত দ্বারা আমাদের দেবতত্ত্বের অনেক দূর বুঝান যাইতে পারে। এই জন্যই গ্রোট বলিয়াছেন যে, দেব-দেবতাগণের উপন্যাস মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সেই সত্য-পরিমাণ এত অল্প ও সামান্য এবং তাহা এত প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার থাকা না থাকাতে এখন কোন ফল দর্শিতেছে না। সেই সত্যটুকু বাহির করা একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই দেবমণ্ডলী ফলতঃ এক্ষণে যেমন রূপকরূপে প্রতীয়-মান হইতেছেন, তাঁহাদিগকে সেই রূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যরূপে গ্রহণ করা একপ্রকার অসম্ভব। গ্রহণ করিতে গেলে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইবে এবং কিছুই স্থির হইবে না।

পূর্ণচন্দ্র বসু।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে অনার্য্যগণ (১)।

পুরাতত্ত্বজ্ঞদিগের মতে হিন্দু আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন। তাঁহারা মধ্য এসিয়ার ভূখণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। প্রথমে প্রসন্নসলিলা সিন্ধু-সরস্বতী-বিধৌত পবিত্র পঞ্চনদে তাঁহাদের বাসস্থান নিরূপিত হয়। আর্য্য-দিগের প্রতিদ্বন্দ্বী অনার্য্যগণ ভারত-বর্ষের আদিম নিবাসী। বেদে ইহারা দস্যু বা দাস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। আর্য্যদিগের সহিত দস্যু-দিগের অনেক বিষয়ে বৈষম্য ছিল।

(১) Vicissitudes of Aryan civilization in India. ঐতিহাসিক পাঠ ও ভারতকাহিনী।

আর্য্যেরা সকলে একত্র সম্মিলিত হইয়া আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির ভাল প্রণালী অবধারণ করিতে পারিতেন, দস্যুরা এরূপ এক উদ্দেশ্যে একত্র সম্বদ্ধ হইতে জানিত না। কোন বিষয়ে একবার অকৃতকার্য্য হইলে আর্য্যেরা আপনাদের বুদ্ধিবলে কৃতকার্য্য হইবার ভাল উপায় অবধারণ করিতেন, এবং অধ্যবসায়ের সহিত সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধকাম হইতেন; দস্যুদিগের এরূপ বুদ্ধিবল ছিল না, সুতরাং তাহারা সকল সময়ে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। আর্য্যেরা যুদ্ধে জয়লাভের জন্য দেবতাদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিতেন এবং জয়লাভ হইলে দেবতাদের প্রসাদে বিজয়শ্রী অধিকৃত হইয়াছে ভাবিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাদের আরাধনায় নিবিষ্ট হইতেন; দস্যুদিগের এরূপ ঈশ্বরনিষ্ঠা ছিল না। আর্য্যেরা সুগঠিত, সুশ্রী, সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। দস্যুরা খর্ব্বকায়, কদাকার ও নয়নের অপ্রীতিকর ছিল। সংক্ষেপে, সভ্যতার অনতিস্ফুট আলোক আর্য্যদিগকে ক্রমে উদ্ভাসিত করিতেছিল, অসভ্যতার ঘোর অন্ধকার দস্যুদিগকে একবারে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

আর্য্যেরা যখন দুর্গম গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া আফগানিস্থান হইতে ভারতবর্ষে সমাগত হইলেন, বিরাটমূর্ত্তি হিমালয়ের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের সহিত শস্যসম্পত্তিশোভিত পঞ্চনদের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য যখন তাঁহাদের নেত্রপথবর্ত্তী হইল, তখন ভারতের এই আদিম নিবাসী দস্যুগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সম্মুখীন হইতে লাগিল। ইহারা অভিনব আক্রমণকারীদের নিকটে সহজে মস্তক অবনত করিল না; সকলেই আপনাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। আর্য্যেরা এই অসভ্যদিগের সাহস ও স্বদেশ-ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা আপনাদের বাসস্থান নিরাপদ রাখিবার জন্য ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে বিমুখ হইলেন না। এইরূপে আর্য্য অনার্য্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ক্রমে বিজয়লক্ষ্মী আর্য্যদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ক্রমে দস্যুদিগের অনেক জনপদ আর্য্যদিগের অধিকৃত হইল। এই যুদ্ধ এক দিনে শেষ হয় নাই। এক দিনে আর্য্যেরা সমরে সমরলক্ষ্মীর প্রসাদলাভ করেন নাই। এক দিনে সমস্ত দস্যুজনপদ আর্য্যদিগের পদানত হয় নাই। এ যুদ্ধ বহুবৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। বহুবৎসর ধরিয়া ভারতের এই আদিম অসভ্যজাতি, প্রবলপরাক্রান্ত, সহায়সম্পন্ন বিদেশীয় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। শেষে যখন ইহাদের জয়লাভের আশা নির্ম্মূল হইল, তখনও সকলে আর্য্যদিগের পদানত হইল না। কেহ আত্মীয়গণের সহিত দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া আপনাদের স্বাধীনতা

রক্ষা করিল, কেহ বা বিজন অরণ্যে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। হিন্দু আর্য্যদিগের ইতিহাসের কোনও সময়ে এই জাতি একবারে পরাজিত হয় নাই। এখন ভারতবর্ষে খস, গারো, পুলিন্দ, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতি দেখা যায়, সেই সকল জাতির লোক এই আদিম দস্যুদিগের সন্তান। এই দস্যুসন্তানগণ সাহসী, যুদ্ধকুশল, ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। ইহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে ইহারা সদ্ব্যবহারকারীর বিশেষ অনুরক্ত হইয়া থাকে। লর্ড ক্লাইব প্রধানতঃ ইহাদের সাহস ও ইহাদের পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়াই দক্ষিণাপথের যুদ্ধে জয়ী হন, এবং দক্ষিণাপথের যুদ্ধে জয়লাভ পূর্ব্বক বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির পদানত করেন।

অনার্য্যদিগের অনেকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক আর্য্যদের পদানত হইয়াছিল। ইহারা আপনাদের দল ছাড়িয়া আর্য্যদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে ত্রুটি করে নাই। এই সকল পরাজিত অনার্য্য আর্য্যসমাজে পরিগৃহীত হইয়া, শূদ্র নামে পরিচিত হয়। প্রথমে শূদ্রদিগকে বিজেতাদের হস্তে কখন কখন নিগৃহীত হইতে হইত। ইহারা কৃষিক্ষেত্রে অস্থিভেদী পরিশ্রম করিত। বাড়ীর অপরিষ্কার কাজও ইহাদিগকে করিতে হইত। কিন্তু শেষে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। শূদ্রেরা আর্য্যসমাজে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে থাকে। হেলট্ বা নিগ্রো ক্রীতদাসেরা যেমন নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছে, বিজেতার সমাজে যেমন তাহারা অবনত হইয়া থাকিয়াছে, বিজিত শূদ্রগণ বিজেতা আর্য্য সমাজে তেমন অবনত থাকে নাই। ইহারা ক্রমে উন্নতি-সোপানে অধিরোহণ করিয়াছে। শেষে এক জন শূদ্র ভূপতি ভারতে বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া সম্পূজিত হইয়াছেন।

জাতিবিভাগ সময়ে ব্রাহ্মণেরা সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। আত্মপ্রাধান্য লাভের জন্য ক্ষত্রিয়গণ শেষে ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। এত দিন তাঁহারা ব্রাহ্মণের নিকট অবনতমস্তক ছিলেন। কিন্তু সময়ে তাঁহাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সময়ে তাঁহারা ব্রাহ্মণের ক্ষমতাস্পর্দ্ধী হইতে সঙ্কুচিত হইলেন না। শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রচিন্তা ও তপস্যায় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবার জন্য যত্নশীল হইলেন। তাঁহারা সাধনায় অটল, অধ্যবসায়ে অনলস ও সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের কৃতকার্য্যতাও অধিক দূরে ছিল না। সুসময় নিকটে আসিল। সুসময়ে ক্ষত্রিয় বিপুল উৎসাহের সহিত পবিত্র মন্ত্রবল লাভের জন্য ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইলেন।

ক্ষত্রিয়ের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল না।

শতবর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ।

৭

পুলিশের তদারক।

হালদারদের বাটীতে ডাকাইতি হইয়াছে, গ্রামের চৌকীদার গোমস্তার কাছে এতলা লেখাইয়া থানায় গেল। তাহার অর্দ্ধেক প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছে। প্রথম আলাপে তাহাকেই চোরের অধিক শাস্তি পাইতে হইবে। সে কালে জমিদারের কর্ম্মচারীরাই থানার কর্ত্তা ছিল। তাহারা গোপনে গয়েন্দাগিরি করিত। গ্রামের মধ্যে কোন হঙ্গমা উপস্থিত হইলে নায়েব, পাকমণ্ডল দ্বারা থানায় সংবাদ পাঠাইতেন। অন্য লোকে এ সকল সংবাদের গন্ধবাষ্প জানিতে পারিত না। চৌকীদার এতলা লইয়া গেল, কিন্তু নায়েবের লোক পৃথক্ গিয়াছে। সে দারগার অন্তরের ব্যক্তি,—তাহার চক্ষু দিয়া দারগামহাশয় অখিল-সংসার দেখিতে পাইতেন।

প্রাতঃকাল, থানা লোকে পরিপূর্ণ। বাহিরে লোক, ভিতরে লোক; ঘরে দ্বারে দাওয়ায় লোক,—শুধুই লোক-স্রোতে থানা ডুবিয়া যাইতেছে। আসামী, ফরিয়াদি, সাক্ষী, চৌকীদার, ফাঁড়ীদার,—মানুষে মানুষে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। দারগামহাশয় তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসিয়া আছেন; পেটটী নাদুস্ নুদুস্; দোহারা থলথলে পুষ্টকায়; মাথায় ঝাউরীকাটা বড় বড় চুল, মুখে চোগোঁপ্পা; দক্ষিণহস্তে সোণার ইষ্টকবচ, অঙ্গুলীতে সোণার আংটী, গলায় পদক। বামভাগে পিকদানী। তখনকার লোক প্রভাতে হস্তমুখ ধৌত করিয়াই দোক্তা দিয়া পান খাইতেন। সম্মুখে ঝাড়লতাকাটা রূপার বিদ্রুকী; তাহাতে চৌদ্দ হাত লম্বা সট্‌কা নল লাগান। বিচিত্র কলিকায় তাওয়া ঢাকা অম্বরী তামাকু গুমে গুমে পুড়িতেছে। কলিকার উপর রূপার সর্পস; সর্পসের ঝিঞ্জিরে রূপার মৎস্য দুলিয়া বেড়াইতেছে, দারগা-মহাশয় এক এক বার রৌপ্য নলে সুখসাধ্য টান দিতেছেন আর লোকের আরজ শুনিতেছেন। সভাতে বক্‌সী মুন্সী বরকন্দাজ জমাদার। কেহ রিপোর্ট লিখিতেছে; কেহ দারগার ঢেরাসহি লইতেছে; কেহ মোহর ছেব্দ করিতেছে; কেহ এতলা পড়িতেছে; কেহ রোজনামচা লিখিতেছে; কেহ রোজ-নামচা পরিবর্ত্তন করিতেছে; কেহ রোজনামচার তারিখ বদলাইতেছে; কেহ রিপোর্ট কাটিয়া দুই একটা নূতন শব্দ বসাইতেছে;—সভার জাঁকের সীমা নাই। নানা স্থান হইতে দধি দুগ্ধ ঘৃত

নবনীত ছানা চিনি, তরিতরকারী, বড় বড় রুই কাতলা মাছ, মধর মধর কাল পাঠা এবং পুরাতন মিহি চাউল আসিতেছে। ভাণ্ডারীরা ঘর পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে।

নীচে এক উঠান চৌকীদার। মাথা রুক্ষ; সর্ব্বাঙ্গে খড়ী উড়িতেছে; মলিন ছিন্নবস্ত্রপরা, কোমরে তক্‌মা। কাহারও হাতে লাঠী, কাহারও হাতে হুকা, কাহারও হাতে টাঙ্গী। চৌকীদারেরা ইতরলোক—হাড়ী ডোম চণ্ডাল। তাহারা অবকাশ পাইলে আপন আপন জাতীয় বৃত্তি রাখে। কিন্তু সরকারী কর্ত্তব্যকর্ম্ম অনেক। সে সকল কাজ সারিয়া অবসর ঘটিয়া উঠা কঠিন। থানার পায়খানা পরিষ্কার হইতে চণ্ডীপাঠের ভার পর্য্যন্ত চৌকীদারের হাতে। পুলিশে পদার্পণ করিলে কাহারও তিলার্দ্ধ নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না। কেহ দারগার ঘর পরিষ্কার করিতেছে; কেহ গাই দুহিতেছে; কেহ ছেলে কোলে করিয়া আছে; কেহ ঘোড়ার ঘাস কাটিতেছে; কেহ পোষা পাখীর ফড়িং ধরিতেছে; কেহ কেহ কাঁধে ভার করিয়া জল তুলিতেছে; কেহ রন্ধনের কাট কাটিতেছে; কেহ ঘোড়া মলিতেছে; কেহ ঘোড়ার দানা ভিজাইতেছে। রাত্রিতে কর্ত্তার উপপত্নী অভিমান করিয়া গিয়াছে, কেহ তাহার তত্ত্ব করিতে ছুটিয়াছে; কেহ ভিন্ন গ্রামের মণ্ডলের উপর সরাঙী পত্র লইয়া যাইতেছে। বাটীতে আসিলে, সেখানেও তদ্রূপ ঝঞ্ঝাট। পুলিশ আমলার তল্পী বহিতে হয়, বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিতে হয়। কার্য্যে একটু ত্রুটি হইলে তাহারা উত্তম মধ্যম গালি ও মারি খায় এবং দারগামহাশয়ের পাদপদ্মে যথাশক্তি জরিমানা হাজির করিয়া দেয়। এত কাজের ভার চৌকীদারের উপর।

এ সব সরকারী কর্ম্ম। বেসরকারী কর্ম্মও অনেক আছে। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের গৃহে পূজাপার্ব্বণ হইলে, চৌকীদারকে তথায় উপস্থিত থাকিতে হয়। ব্রাহ্মণ ভোজনের স্থান পরিষ্কার করিতে—চৌকীদার। ব্রাহ্মণ ভোজনের পাত কাটিবে—চৌকীদার। ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিবে—চৌকীদার। কোন কাজে ত্রুটি হইলে মার খাইবে—চৌকীদার; আর লুচী সন্দেশ খাইবে—গৃহস্থের কুটুম্ব স্বজন। এত কর্ম্মভোগের পর চৌকীদার পায় কি? কোন গ্রামে তাহার চাকরান্ ভূমি আছে। কোথাও চাক্‌রান্ ভূমি নাই,—প্রজাগণ নিজে বেতন দেয়। কিন্তু অনেক স্থলে চাক্‌রান্ ভূমির উপস্বত্ব জমিদারের গোমস্তার হাত দিয়া লইতে হয়। গোমস্তামহাশয় সরকারী কাজ লইয়া অষ্ট প্রহর ব্যস্ত, সুতরাং চৌকীদারকে বেতন গণিয়া দিবার অবসর করিয়া উঠিতে পারেন না। কোন কোন স্থলে তাহারা চাক্‌রান্ ভূমিতে নিজে বাস

করে। যেখানে চাক্‌রান্ ভূমি নাই, তথায় প্রজাগণ চৌকীদারের বেতন দেয়। কিন্তু সে কালে প্রজার নিকট হইতে বেতন আদায় করা দুর্ঘট হইত। চৌকীদারকে মাসে মাসে বেতন গণিয়া দেওয়া চাই, তখনকার লোকের এ অভ্যাস ছিল না। কোন গৃহস্থে বার্ষিক ৵ দুই আনা, কোথাও বার্ষিক ।০ চারি আনা, এই রূপ বেতন কথায় নির্দ্দিষ্ট ছিল; কাজের সময় তাহাও আদায় হইত না। পৌষ পার্ব্বণে একটা নারিকেল, লক্ষ্মীপূজা মনসাপূজায় এক পাথর ভাত, ষষ্ঠী পূজায় আট তাজা—ইহাই আদায় হইত। চৌকীদারদের রাত্রির কাজ গ্রামে চৌকী দেওয়া। কিন্তু তাহারা চোরকে চৌকী দিত না, সাধুকে চৌকী দিয়া বেড়াইত। গৃহস্থলোক একটু গা ঢাকা হইলে নিজে চুরী করিত এবং চোরকে চুরী করিতে বলিত। তাহাতেই চৌকীদারের বিলক্ষণ লাভ ছিল।

দারগা মহাশয় কখন কি অনুমতি করিবেন, এক পাল চৌকীদার সেই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। যখন বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইতেছে, এক এক বার উঠিয়া আপোষে তামাকু টানিয়া আসিতেছে। অপরাধীরা পিট পাতিয়া কোড়া খাইতেছে; যাহাদের কোড়া খাওয়া হইয়াছে, তাহারা ভুরঙে পা পুরিয়া পিঠে হাত বুলাইতেছে; যাহাদের খাওয়া হয় নাই, সে সকল লোক অষ্টমীর পাঁঠার মত দুরে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে; যাহারা কোড়া খাইবার জন্য আসিতেছে, তাহাদের অর্দ্ধেক প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে; গলায় কাপড় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে— 'খোদাবন্দ! আমি কিছুই জানি না।' কিন্তু পুলিশ বড় শক্ত স্থান। এখানে "জানি না" বলা সাজে না। চক্ষের জলে পুলিশের মন ভিজে না। হয়, ব্যবস্থা মত পূজা রাখ; না পার ত দারগা মহাশয় যাহা শিখাইয়া ছেন, অম্লানমুখে তাহাই কবুল কর।

থানায় এই প্রকার মহা ধুম লাগিয়াছে ইতি মধ্যে ডাকাইতির এতলা আসিয়া পৌঁছিল। দারগার খাস মুন্সী সুরের ছটা করিয়া তাহা পড়িতে লাগিলেন। তিনি নিজে পড়েন না, কলম ধরেন না। বাল্যাবস্থা হইতে সে সকল ভার মুন্সীর উপর দেওয়া আছে। পূর্ব্বে তিনি থানার বরকন্দাজ ছিলেন। দুই তিন বার ডাকাইত ধরিয়া এবং মধ্যে মধ্যে জেলার সাহেবকে সেলাম করিয়া সুখ্যাতি পান। তাহার পর সাহেব বিলাত যাইবার সময় তাঁহাকে দারগাগিরী পদ দিয়া গিয়াছেন। সে জন্য দারগা মহাশয়ের পেটে কালির অক্ষর নাই। তখন প্রায় সকল দারগাই এক এক জন দিগ্‌গজ ভুঁড়ে মূর্খ মানুষ ছিল। হাকিমরা জানিতেন, দারগাগিরী করিতে বিদ্যা চাই না, নিরেট

গোঁয়ার হইলেই দারগার কাজ চালাইতে পারে। এখনও এই শ্রেণীর অনেক যোগ্য ব্যক্তি দুই হাতে টাকা লুটিতেছেন আর থানায় বসিয়া পুলিশের সর্ব্বাঙ্গে কালি মাখাইতেছেন।

এতলা পড়া হইল। দারগা মহাশয় সাগরের ন্যায় গম্ভীর, মুদ্রিত চক্ষে কাণ পাতিয়া সকল শুনিলেন। চৌকীদার হাত যোড় করিয়া কাঁপিতেছে। গরিব পরবরিস্ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"তুই বেটা চোর। আগে গ্রামে চল্, তার পর বুঝিব।" তখনি থানায় মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল; আন্ রে, বাঁধ্ রে, তোল্ রে,—এই রূপ চীৎকারে কাণ পাতিতে পারা যায় না। আসবাব সরঞ্জম প্রস্তুত হইল। চৌকীদারেরা ভারে ভারে দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে লাগিল। বরকন্দাজ, জমাদার, বক্সী মুন্সী পদব্রজে অগ্রসর হইল। স্বয়ং দারগা ঘোড়ায় চলিলেন।

এখানে গ্রামের মধ্যে বিবাহ বাটীর মত ঘটা লাগিয়াছে। দত্তদের সদর মহলে অনেক গুলি বসিবার দাঁড়াইবার ঘর। গ্রীষ্মকালে বেশ বাতাস খেলে, সেই খানে দারগার বাসা হইবে। বাটীর কুমারীরা সদরে পুণ্যপুকুর কাটিয়াছিল, তাহা ভরাট করিয়া ফেলিল। সন্ধ্যার সময় বালিকারা পূজার চণ্ডীমণ্ডপে কুলকুলতী ও সেঁজতীর ব্রত করিত, তাহারা অন্তঃপুরে পলাইল। সদর মহলে কাঁক ধরে না। জমিদারের নায়েব মহাশয় অধ্যক্ষ থাকিয়া সকল আয়োজন করাইতেছেন। ডাক্ রে, হাঁক রে, আয় রে, দে রে—এইরূপ কোলাহলে আকাশ পাতাল কাঁপিয়া উঠিতেছে। চৌকীদারদের কেহ ঘর ঝাড়িতেছে; কেহ উঠান পরিষ্কার করিতেছে; কেহ সপ সতরঞ্চ গালিচা তুলিচা বিছাইয়া রাখিতেছে। পাক এবং মণ্ডলেরা দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য, পাঁঠা, সরু চাউল, তরিতরকারী আনিয়া বাটী বোঝাই করিতেছে। গ্রাম নিস্তব্ধ। গৃহস্থের সদর খিড়্কী বন্ধ হইয়াছে; পথে জনপ্রাণী নাই,—যেন প্রত্যেক গৃহ ঘুমাইয়া আছে; পথগুলি যেন নিদ্রিত রহিয়াছে। গ্রামস্থ কত লোক কুটুম্ববাড়ী পলাইয়াছে, কতলোক কুটুম্ব বাড়ী পলাইয়া পথে ধরা পড়িতেছে। মিত্রদের বাটীতে পুরাণ পাঠ হইতেছিল, তাহা স্থগিত থাকিল। বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাটীতে আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল না। গোরু বাছুর গৃহস্থের বাটীতে শুকাইতে লাগিল। দোকানে দোকানী নাই, মাঠে কৃষক নাই, পাঠশালায় গুরু মহাশয় নাই। সে কালের পুলিশের এত দব্দবা! এত জুলুম্!

দারগা মহাশয় উপস্থিত হইলেন,—একে বারে বাসাতেই উপস্থিত হইলেন। ঘটনাস্থলে গেলেন না। গিয়া কি করিবেন?—ঈশ্বরেচ্ছায় যাহা ঘটিয়াছে, সে ত আর ফিরিবার নয়? এক্ষণে যাহাতে চোরেরা ধৃত হয়, সেই ব্যবস্থা

করাই শ্রেয়ঃ। সে জন্য, সর্ব্বাগ্রে চৌকীদারদিগকে বাঁধা হইল। গরুদাকে বাঁধিলে চোর ধরা পড়ে। সে কালে চৌকীদারকে লুকাইয়া কোন চুরী হইত না। তাই চৌকিদারকে বাঁধিলে চুরীর অর্দ্ধেক কিনারা হইত। জমাদার এবং বরকন্দাজ সাত গ্রামের চৌকিদারকে মোটা দড়ায় বাঁধিয়া ফেলিলেন, হাত ফুটিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল, চোর আর কোথা যায়? সকলেই বলিল—হুজুর! ডাকইত ধরিয়া দিতেছি, কিন্তু কেবল মুখের কথায় পরিত্রাণ নাই। তাহাদের আত্মীয় স্বজন আসিয়া দারগার সঙ্গে একটা মোটা চুক্তি করিলে তবে সকলে নিস্তার পাইল।

এইবার নায়েব আসিলেন। দরবারে মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। নায়েব মহাশয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর,—আজও বাওয়াত্তর হয় নাই। দাঁত পড়িবে বলিয়া নড়িতেছে, চুল পাকিবে বলিয়া শাদা হইয়া আসিতেছে। তাঁহার পায়ে চটী জুতা, ত্রিকচ্চা করিয়া শাদা ধুতি পরা; কাঁধে দোজা, দক্ষিণ হস্তে তাগা, গলায় কাটির মালা, মালার একটি সোণার মাহুলী; বেড়ী করিয়া মাথা কামান, ধারে এক হালি ছোট ছোট চুল। তাহার পর দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, পৃষ্ঠের উপর বাঁধা রহিয়াছে। কেশগ্রন্থিতে একটী ফুল লাগান, পূজার সময় সচন্দন পুষ্পটী গুঁজিয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিয়াছিলেন। নাকে বাহুতে এবং বক্ষঃস্থলে গোপীমৃত্তিকার তিলক। তিনি পরম বৈষ্ণব;—পরের হুঁকায় তামাকু খান না, চক্ষে পাঁঠা কাটা দেখেন না,—জীবহিংসায় বড় ভয়। কেবল না করিলে নয়, তাই পোড়া পেটের দায়ে দুই হাতে প্রজা বধ করেন। তিনি এবং থানার দারগা একই মানুষ,—দুয়ে এক, একে দুই,—সাক্ষাৎ হরিহর আত্মা। দারগা যাহা পান নায়েবের তাহাতে অর্দ্ধেক অংশ; নায়েব যাহা পান, দারগার তাহাতে অর্দ্ধেক অংশ। দারগা থানায় বসিয়া যে সকল ক ম করেন, নায়েব মহাশয়কে তাহা সামলাইয়া লইতে হয়। নায়েব গ্রামে বসিয়া যে সকল কাষ করেন, দারগা মহাশয়কে তাহা সামলাইতে হয়। জগতের কর্ম্মচক্র নায়েব দারগার হাতে।

উভয়ে দরবারে বসিলেন, পরস্পরের আলাপে উভয়ে আপ্যায়িত হইলেন। তাহার পর চোর ধরিবার ব্যবস্থা। ডাকাইতের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। সম্মুখে যে পড়িল সেই গ্রেপ্তার হইল। নিকটবর্ত্তী গ্রামের ইতর লোক আর বাকি থাকিল না, চুরীর দায়ে সকলকেই আসিতে হইল। কেনা বাগ্দীর চক্ষু দুটা বড় বড়, সন্ধ্যা নাই, প্রাতঃকাল নাই, সর্ব্বদাই রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, সে নিশ্চিত চোর। বিন্দে হাড়ী দ্বিতীয় ভীম বিশেষ। কাল রঙ, মাথা গোল, কাণ ছোট, এক মুখ গালপাট্টা;

ডাকাইত না হইলে তাহার এমন অসুরের মত আকৃতি কেন? হয়া কামার রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত শান আলিয়া রাখে। চোরের অস্ত্র শস্ত্র না গড়িলে তাহার এত কাজ কিসের? ফলতঃ যে একমুষ্টি অন্ন করিয়া খাইত, চুরীর দায়ে সেই ধরা পড়িল। ভীম সর্দ্দার দারগার সঙ্গে নিজেই সাক্ষাৎ করিতে আসিল, সে গ্রেপ্তার হইল না। দারগা মহাশয়ের সঙ্গে তাহার বিশেষ পরিচয় আছে। ভীম মাসের মধ্যে দুই তিনবার থানার যায়, সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে; তাহার প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কোন কারণ নাই। নায়েব মহাশয়ও বলিলেন,—'ভীম তেমন লোক নয়।' কাযেই সে নিষ্কৃতি পাইল। এখন আসামীদের দোষ স্বীকার করান চাই। সে জন্য চৌকিদার, জমাদার এবং বরকন্দাজেরা কোতঘরে যথা রীতি তসিল আরম্ভ করিয়া দিল। কেহ আসামীদের বুকে বাঁস দিয়া ডলিতেছে; কেহ নাভীর উপর ঘুরঘুরে পোকা ছাড়িয়া দিয়া মালা ঢাক্না দিতেছে; কেহ নখের আগায় কাঁটা বিঁধিতেছে; তসিল থানায় ঘটায় সীমা নাই। চোরের প্রাণ বড় কঠিন, কিছুতে কবুল করিল না।

আসামীরা সকলেই উপবাসী। চারিপ্রহর দিন গেল, এখনও কেহ জলস্পর্শ করে নাই। তাহাদের স্ত্রীপুত্র কন্যারা সদর দুয়ারে দাঁড়াইয়া চক্ষের ধারায় ভাসিতেছে। সকলের হাতে পাথরভরা অন্ন, অঞ্চলে পয়সা কাতর বাক্যে বরকন্দাজ জমাদারকে সাধিতেছে। যাহার বড় দয়া হইতেছে সে হয় ত একবার অঙ্গুলি দেখাইয়া যাইতেছে; নয় ত মাথা নাড়িতেছে না, উহাতে হইবে না। অনেক সাধনার পর হয় ত কোন আসামীর ভাগ্যে অন্ন ঘটিল, নয় সকলেই দন্তের রস খাইয়া দিন কাটাইল।

রাত্রি উপস্থিত। চৌকিদারেরা পুর্ব্বাপর ব্যবস্থামত কোত ঘরে তুষ ঘুঁটে জালিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। এক প্রহর দেড় প্রহর পরে যাহারা জীবিত থাকিল, সে কেবল পিতৃপুরুষের পুণ্যবলে। যাহারা মরিল, সে সকল দুষ্টলোক কবুল করিলে ত মরিত না? নির্ব্বোধেরা নিজ নিজ দুর্বুদ্ধির জন্য সাধে সাধে প্রাণ হারাইবে, তাহাতে দারগা মহাশয়ের সাধ্য কি? চৌকিদারেরা নিমকের চাকর; তাহারা রাতা রাতি লাশ সামলাইয়া ফেলিল।

অধিক রাত্রি হইল, দারগা মহাশয় ভোজনান্তে শয়ন করিলেন। পুলিশ আমলার একাকী নিদ্রা আসেনা,—অঙ্গ টিপিয়া দিবার লোক চাই। তাহাতে হাত দু-খানি বেশ কোমল হইলেই ভাল হয়। দত্তদের মধ্যমবধূ বয়ঃক্রম আঠার বৎসর, কোলে এক বৎসরের একটী শিশু সন্তান, সন্ধ্যাকালে তিনি ছেলেটীর সম্মুখে প্রদীপ নাড়িতে

নাড়িতে বলিতেছিলেন,—'সাঁজের বাতী নড়ে চড়ে, যে আমার যাদুমণিকে খোঁড়ে তাহার মুখ খানা পোড়ে'। দারগা মহাশয় জানালা দিয়া চাঁপার কলির মত সেই আঙ্গুল গুলি দেখিতে পাইয়া ছিলেন,—যেন রূপসাগরে মন-ভুলান ঢেউ উঠিতেছে, সেই মধু মাখান সুরে শুধুই যেন সোহাগ উথলিয়া পড়িতেছে। তাই, ইচ্ছা—দত্তদের মধ্যম বধূই তাঁহার সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু বহু যত্নে ও ঘটিল না। কথিত আছে, সেই পর্য্যন্ত দত্ত বাড়ীর উপর দারগার মহা আক্রোশ জন্মিয়া গেল। কোথাও চুরী ডাকাইতি হইলে দত্তদের কর্ত্তা আগে ধরা পড়িতেন; এবং প্রথমেই তাঁহার বাটীতে খানা তল্লাসী হইত। মধ্যমবধূ ঘটিল না, অন্য লোক কে? রত্নেশ্বরী রামু ঠাকুরের কন্যা। কুলমর্য্যাদাটা বিলক্ষণ আছে। তাই, বিবাহের পর হইতে পতির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই। সংবাদ পাইলে তিনি আসিলেও আসিতে পারেন। এই দারগাটী জাতিতে কায়স্থ। কিন্তু কায়স্থ হইলে কি হয়? তিনি থানার দরগা মহাশয়! ব্রাহ্মণ কন্যা স্বচ্ছন্দে তাঁহার সেবায় থাকিতে পারেন, কোন বাধা নাই। চৌকীদারেরা তাই বুঝিয়া সংবাদ দিল; রত্নেশ্বরী আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। জনরব, সেই দিন হইতে রামুঠাকুরের সাতখুন মাপের হুকুম হইয়া থাকিল।

দারগার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না। তাহার পর অন্যান্য আমলা আছে। মালতী বৈষ্ণবী একা ঘরে পড়িয়া মশা তাড়ায়, জনপ্রাণী কথার দোসর নাই। শিব সিং জমাদার সেইখানে বাসা করিল। সেতু মণ্ডলানী বড় ভাল মানুষ, লোকজন গেলে গুরুপুত্রের মত আদর করে। গত বৎসর মণ্ডলের মৃত্যু হইয়াছে, কোলে কেবল একটি মেয়ে। মুন্সী সেইখানে আপনার বোচকা বুচ্‌কী রাখিলেন। সাতু বেণে বাটীতে বসিয়া কেনা বেচা করে, তাহার মসলার দোকান। গৃহে অন্য অভিভাবক নাই, কেবল এক যুবতী ভার্য্যা। বক্সীর ইচ্ছা, সেই বণিকালয়ে বাসা করেন। কিন্তু সাতু থাকিতে ঘটে কৈ? সে জন্য বক্সী মহাশয় একটা বিশ্বাসী কার্য্যে সাতকড়ী দাদাকে গ্রামান্তরে পাঠাইলেন,—ঘর খোলসা হইল। এইরূপে যে বাটীতে পুরুষ ছিল না, সেখানে পুরুষ উঠিতে লাগিল। যেখানে পুরাতন লোক ছিল, পুলিশের অনুগ্রহ বলে তথায় নূতন মানুষ আসিয়া ঘর আলো করিল।

দেবদ্বিজের আশীর্ব্বাদে যে সকল ব্যক্তি বাঙ্গালার মৃত্তিকায় দীর্ঘজীবী হইয়া আছেন, আমার বর্ণনাটা কিছু বেশী বেশী হইল, এ আশঙ্কা তাঁহাদের কাছে করিতে হইবে না। বরং প্রাচীন লোকেরা এই মূলের উপর আরও দুই চারি ছত্র টীকা করিয়া দিতে পারিবেন। তন্ন ত কত কথা জানি না

বলিয়া লিখিতে পারিলাম না। কত কথা জানি, হয় ত লিখিবার সময় ভুলিয়া গিয়াছি। যাহা ভুলি নাই, হয় ত বাঙ্গালা ভাষায় তেমন উপযুক্ত শব্দ পাই নাই বলিয়া সে সকল অত্যাচার মনের মত করিয়া ঠিক প্রকাশ করা হইল না। যে যে স্থান অঙ্গহীন হইয়াছে, প্রাচীন লোকেরা পড়িলেই বুঝিবেন। কিন্তু ভয় আমার নব্য দলের কাছে; সহরের বালকের নিকট আরও অধিক ভয়। পল্লীগ্রামের নবীন যুবকেরা তবু পিতা ও পিতামহের মুখে পুলিশের পুরাতন গল্প শুনিয়া থাকেন, এখনও কোথাও কোথাও সর্ব্বগ্রাসের পর ক্ষয়া চাঁদ দেখিতে পান্। কিন্তু সহুরে বালকের এদুটীর মধ্যে একটী সুবিধাও নাই। তাঁহারা ভাবিবেন, আমার বর্ণনায় কিছু ঘন করিয়া রঙ্ দেওয়া হইয়াছে।

ইতর লোকদের তসিল হইতে লাগিল। নীচ জাতির মধ্যে চোরও আছে, সাধুও আছে। সুতরাং তাহাদের লইয়া পীড়া পীড়ি করিলে চুরীর কিনারা হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কেবল চুরীর কিনারা হইলে পুলিশ থাকিতে পারে কৈ? উচিত কথা বলিতে গেলে, দারগা মহাশয়ের ত ঘরগৃহস্থালী আছে, বাটীতে দোল দুর্গোৎসব রহিয়াছে, বিদেশেও তাঁহাকে মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়,—তাহার ব্যবস্থা কি? কাজেই এবার ভদ্রলোকের প্রতি চক্ষু দিতে হইল। রামশরণ মুখুর্য্যে গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ঠ লোক। তাঁহার বাটীতে অনেকগুলি লাঠীয়াল থাকে। পূর্ব্বে তিনি একবার নীলকুঠীর সাহেবের সঙ্গে দাঙ্গা করিয়াছিলেন। একবার কুঠীতে লুঠও করাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি হুকুম জারী হইল—'কল্য তোমার বাটীতে থানা তল্লাসী হইবে।' কাজেই রামশরণ, দারগা মহাশয়কে ক্ষান্ত করিলেন। সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোর দোতলা পাকা অট্টালিকা। বাগান পুষ্করিণী জমি জমা বিস্তর। তিনি চোরের জাসু না হইলে এত সুখসম্পত্তি কোথা হইতে? দারগামহাশয়ের সন্দেহ হইল। তিনি সর্ব্বানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আজি নয়—কালি; প্রাতে নয়—সন্ধ্যা বেলায়। এইরূপ ওজরে চারি পাঁচ দিন গেল। কিন্তু অব্যাহতি নাই। শেষ সাক্ষাৎ করিতে হইল। দারগা মহাশয় মহারুষ্ট হইয়াছেন। কিছুতে কথা কহিবেন না। মুখভার করিয়া থাকিলেন। সর্ব্বানন্দ সুবিধা বুঝিয়া পাশের পিক্‌দানীতে হাত দিলেন। হাত দিতেই, ধাতুর দ্রব্য ধাতুর পাত্রে পড়িলে যেমন শব্দ হয়, তদ্রূপ শব্দ হইল। আবার হাত দিলেন, আবার শব্দ হইল। দারগা মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কথা কহিব কেন? আপনার গ্রামে আসিয়াছি, একবার তল্লাসও ত করিতে হয়। থানার দারগা বলিয়া কি ভদ্রলোকের সঙ্গে আত্মীয়তা নাই?' অমনি হা হা শব্দে একটা উচ্চ হাসি

পড়িয়া গেল। বক্সী হাসিলেন, মুন্সী হাসিলেন, দরবারে যে যে আপনার লোক ছিলেন সকলেই পাল্টা পাল্টী করিয়া এক এক বার হাসি মুখ দেখাইলেন। পৃথিবী শীতল হইল। সর্ব্বানন্দ অঙ্গুলির সঙ্কেত করিয়া গৃহে গেলেন। এইরূপে হেম সরকার, চতুর্ভুজ চাটুয্যে, অনন্তরাম দে প্রভৃতি সকলকেই এক একবার থানায় আসিয়া দারগা মহাশয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইয়াছিল। পুলিশদরবার কলিকাতার দ্বিতীয় টেক্‌শাল হইয়া পড়িল।

এখন বাকি হালদারদের বাড়ীর কর্ত্তা। কর্ত্তা আর ঘটনাস্থল,—স্বচক্ষে এই দুটীকে দেখিলেই এবারকার মত গ্রাম হইতে পুলিশ উঠিয়া যায়। গ্রামে দারগা মহাশয়ের শুভাগমন হইলে কর্ত্তা তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন। বলিয়া দিয়াছিলেন,—'আমি অত্যন্ত পীড়িত। পায়ে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে, শয্যা হইতে উঠিতে পারি না; চলৎশক্তি নাই। মধ্যে মধ্যে ভ্রম হইতেছে।' তাহার পর যথাকালে প্রতিদিন তিনি দারগার বাসায় দুগ্ধ ঘৃত ময়দা মিষ্টান্ন প্রভৃতি নানা দ্রব্য পাঠাইয়া দিতেন। সুতরাং কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন ত্রুটি হইতেছে না দেখিয়া দারগাও কর্ত্তার উপর বিরক্ত হন নাই। প্রস্থানকালে যথাবিহিত পার্ব্বণী হইলেই চলিবে। দারগামহাশয় হালদারদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সদর-দরজা ভাঙ্গা। চোরেরা কুঠারাঘাতে দ্বার কাটিয়াছে। বাটীর দরজা কোন্ দ্বারী; কি কাঠের দরজা; তক্তা কত স্থূল; তাহাতে গ্রীন্ রঙ্ দেওয়া কিম্বা আল্‌কাতরা মাথান; চোরেরা মাটীতে দাঁড়াইয়া কত উচ্চে কুঠারাঘাত করিয়াছে, এই গুলি বিশেষ করিয়া লেখা হইল। দারগার খাস মুন্সী চক্ষের উপর চস্‌মা লট্‌কাইয়া সমস্ত বাটীর একটী নক্‌সা তুলিয়া লইলেন। পুলিশ-তদারকের এই গুলিই প্রধান অঙ্গ—চোর গ্রেপ্তার ততটা নয়। চোর ধরিতে না পারিলেও চলে, তাহাতে দুর্নাম নাই; কিন্তু নক্‌সা প্রভৃতির কোন স্থানে একটু অঙ্গহীনতা হইলে দারগার কর্ম্ম থাকা দায়। এখন ফারমপূরণ করা পুলিশের একটা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে। আর কিছু না হউক, যথারীতি ফারমপূরণ করিতে পারিলে পুলিশ ইন্সপেক্টরের সুখ্যাতির পরিসীমা থাকে না, বৎসর বৎসর পদোন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু এই কাযে যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে সে অপদার্থ ইন্সপেক্টর কন্সটেবেলের পদ পাইবারও যোগ্যপাত্র হন না। কোন গ্রামে ডাকাইতি কিম্বা খুন হইলে, পুলিশ সর্ব্বাগ্রেই নানাছকের ফারমপূরণ করিতে বসিয়া যান্। তিন চারি দিনে মাল ও লাস গাপ করা হইলে তখন উপযুক্ত আমলামহাশয়েরা তদারক

আরম্ভ করিয়া দেন। এটী উন্নত পুলিশের পরিমার্জ্জিত ব্যবস্থা।

দারগা বাটীর ভিতরে গেলেন। তিল রাখিবার স্থান নাই। ভাঙ্গা পেট্‌রা, ইস্‌কাতর সিন্দুক ছড়াছড়ি যাইতেছে। পোড়া মসাল, ভাঙ্গা তলওয়ার, কাটা লাঠী পড়িয়া আছে। উঠান রক্তগঙ্গায় ভাসিয়া গিয়াছিল, এখন কালিমূর্ত্তি হইয়া আছে। ডাকাইতি সত্য, খুন মিথ্যা। চোরেদের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া কেহই মরে নাই। ডাকাইতরাও গৃহস্থের প্রাণনষ্ট করে নাই। কেবল সারদা দাসীর মুখে জলন্ত মসাল পুরিয়া দিয়াছিল; মুখখানা পুড়িয়া বানরের মত কাল হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে ফোস্‌কা পড়িয়াছে। হলা খানসামাকে বাঁধিয়া ঠেঙ্গাইয়াছিল, সে শয্যাগত। গৃহের পাচিকার একটা হাত কাটিয়া লইয়াছে। সকলেই এখন প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছে, বোধ হয় কাহারও মৃত্যু হইবে না। অতএব আদালতে পাঠাইয়া প্রয়োজন কি? উঠানে রক্তের চিহ্ন আছে, কিন্তু মৃতদেহ নাই। লোকে বলে, দারগার অখ্যাতি হইবে বলিয়া চৌকীদারেরা মৃতদেহ গোপন করিয়াছে। কিন্তু দারগামহাশয় তদন্ত দ্বারা জানিলেন, দরওয়ানেরা কর্ত্তার কাছে পুরস্কার পাইবে বলিয়া ছাগরক্ত ছড়াইয়া থাকিবে।

পরিশেষে কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি নিতান্ত ভাল মানুষ, কাহাকেও সন্দেহ করিলেন না। ভীম সর্দ্দারের প্রতিও তাঁহার সন্দেহ হইল না। কত ভাগ্যে বাটীতে পুলিশ আসিয়াছে, সেজন্য তিনি আমলাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া বিদায় দিলেন। গ্রেপ্তারী আসামীর মধ্যে যাহারা দারগাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল, তাহারা চালান গেল না। বাকি সকলকেই হুজুরে যাইতে হইল।

সেকালে এত চুরি ডাকাইতি হইত, সে কেবল চোরের দোষে নয়, ইতর লোকের স্বভাবদোষে নয়। তখনকার ভদ্রলোকের দোষে, পুলিশের এবং আদালতের কর্ম্মচারীদের দোষে। দস্যুরা অনেক স্থানেই প্রশ্রয় পাইত, দুষ্কর্ম্ম করিয়া কি প্রকার প্রমাণ দিতে পারিলে তাহারা দণ্ড পাইবে না, জেলদারগা এবং আদালতের সেরেস্তাদার ও পেস্কার তদুপযুক্ত সৎপরামর্শ বলিয়া দিতেন *। তখনকার নীলকুঠীর

* They (dacoits) lie concealed, come about the court, intrigue with the lower officers or with the jailor, ascertain the probability of detection, conviction, and punishment, what sort of evidence may be requisite to disprove facts, and so on. In short, the country is infested with robbers and villains who know how to elude the law. (Judge and Magistrate of Midnapur, H. Strachey. Esqr., 30 January 1802)

ও রেশমের কুঠীর সাহেবরা, এ দেশীয় জমিদার এবং আদালতের প্রধানতম ও নিম্নতম কর্ম্মচারিগণ * ডাকাইত পুষিতেন। চোরেরা লুটপাট করিয়া যে সমস্ত ধনসম্পত্তি পাইত, তাহার কিয়দংশ আদালতের পেস্কার ও সেরেস্তাদারকে, কিয়দংশ জমিদারকে, কতক থানার দারগাকে দিত; যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, ডাকাইতরা তাহাই নিজে লইত। যাঁহারা দুষ্টের দমন করিবেন, তাঁহারাই রক্ষাকর্ত্তা, সে স্থলে চিন্তা কি? দারগারা যথার্থ অপরাধীকে কখন গ্রেপ্তার করিতেন না। কচিৎ দৈব-বিপাকে তাহারা আসামী শ্রেণীভুক্ত হইলে মুরুব্বিরা টাকা লইয়া সকলকে নিষ্কৃতি দিতেন।

তখন এক একটী বিপান্তর মাঠে জঙ্গলের মধ্যে কালীদেবীর পাষাণমূর্ত্তি থাকিত। সেই পিঠস্থানে অনেক মঠধারী গোঁসাই অধ্যক্ষ থাকিয়া নিত্য দেবীর পূজা করিতেন। পরিচারকেরও অভাব ছিল না। অষ্ট প্রহর একশত দেড়শত লোক নানা প্রকার কার্য্যে ব্যস্ত

* The principal persons who have lands or farms in the northern parts of this district, where there are most dacoits, are the Fouzdary Seristadar Anoopender Narain, and the Peshkar Ruheemoodeen, Kishen Sandial, a dewany moharir, and Domun Geer Goseya, and Anoop Moonshee, who hold no offices under Government.

* * * Most of the Police Darogahs seem to be under the influence of Ruheemudeen. Anoop Moonshee and Domun Geer accuse each other of harbouring dacoits; and there is every reason to believe they are both guilty, for a great many notorious dacoits and harbourers of dacoits, live on their estates, as well on Ruheemoodeen's, and Anoopender Narain's, and Kishen Sundial's, although it is easy to apprehend them, or, if they are apprehended, to convict them.

(Magistrate of Rajshahye, 13th. June 1808.)

† The Fouzdary Serishtadar, with his Rs. 60 a month, and the Peshkar, with his Rs. 40, have contrived to possess themselves of great landed property in this district; from their connections with Zemindars and their official situations, they have acquired a degree of power and influence which they turn to the worst purposes. I am persuaded that they derive a revenue from the dacoits, and give them protection; and that they suppress complaints which are brought against themselves or their dependants.

(Magistrate of Rajshahye, 13th. June 1808.)

হইয়া বেড়াইত। এই সকল মঠধারী গোঁসাই তখনকার ডাকাইতের প্রধান সর্দ্দার। তাঁহার পরিচারকগণ দেশ-বিদেশে ডাকাইতি করিয়া কালীর দেবমন্দির ধনে পরিপূর্ণ করিয়া দিত।

এইবার সকলেই বুঝিতে পারিলেন, সে কালের লোক কিরূপে রাতারাতি বড় মানুষ হইতেন। ফৌজদারী সেরেস্তাদারের বেতন ৬০ টাকা এবং পেস্কারের বেতন ৪০ টাকা মাত্র ছিল। এই সামান্য বেতনেই তখনকার আমলারা সম্বৎসরের মধ্যে জমিদারী কিনিয়া ফেলিতেন। এখন যেমন আদালতে পদার্পণ করিলেই লোকে অবাক হয়—এ বেশ্যার দরজা? —না, লুঠখানা?—যে দিকে যাইবে, কানখুস্কীদারের মত পাগড়ীবাঁধা আমলারা হাত পাতিয়া আছে। সে কালে ইহার চেয়েও অধিক লুঠের বাজার ছিল। এখনকার সেরেস্তাদার পেস্কার ও দারগারা গোপনে গোপনে ডুবে জল খান, মাথা তুলিতে ভরসা করেন না। অনেকে বিশুদ্ধচরিত্রও হইয়াছেন। হাকিমরাও হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া বড়মানুষের কাছে টাকা কর্জ্জ লইবার অভ্যাস ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছেন, তাই আদালতে সুবিচার হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। স্বদেশের লোক আসামী না হইলে এখন বিলাতী হাকিমরা প্রায় আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন। অকর্ম্মণ্য মূর্খ ডেপুটী মেজেষ্ট্রেটের সংখ্যাও দিন দিন কমিয়া আসিতেছে, সুপারিসের বাজার নরম পড়িয়াছে, এখন কৃতবিদ্য ব্যক্তি হাকিম হইতেছেন। বড়মানুষের খোষামোদ ডালী লইয়া তাঁহারা কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকেন না। এখন বর্ষাকালে কেহ দারগগিরি পদ পাইয়া, এক খুনী মামলার বলে শরৎকালে মার পাদপদ্মে বিল্বপত্র দিতে সক্ষম হন না। সুপ্রভাত বঙ্গের, সৌভাগ্য বাঙ্গালীর—এই মাটীতে শীঘ্র শান্তি বিরাজ করিবে।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

ফিরিঙ্গি।

ইউরোপ ও এসিয়াবাসীর শোণিত-সংস্রবে এদেশে ফিরিঙ্গি নামক একটি জাতি হইয়া উঠিয়াছে; ইহাদিগের প্রকৃত নাম অদ্যাপি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; ইংরেজেরা কখনও এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান, ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান বা ইউরেসিয়ান বলেন; আমরা ফিরিঙ্গি বলিয়া থাকি। কিছু দিন পূর্ব্বে ইহাদিগের অস্তিত্ব ছিল না, সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আপনি একটী ফিরিঙ্গিও পাইতেন না, কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহারা জন্ম লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সংখ্যায় প্রায় এক লক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় জাতিদিগের মধ্যে

ফিরিঙ্গিরা যেমন ভ্রান্ত তেমন আর কাহাকেও দেখিতে পাই না, কারণ শিখ বলুন, মহারাষ্ট্রী বলুন, রোহিলা বলুন, বাঙ্গালী বলুন, সকলেই বিজিত হইলেও আপনাদিগের মাতৃভূমি সম্বন্ধে ভ্রান্ত নহে এবং তাহারা স্বাধীন কি পরাধীন তদ্বিষয়েও তাহাদিগের সন্দেহ নাই; ফিরিঙ্গিরা তদ্বিষয়ে অদ্যাপি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। তাহাদিগের অধিকাংশের বিশ্বাস যে ইংলণ্ড তাহাদিগের মাতৃভূমি কিন্তু কেন এ বিশ্বাস তাহা আমরা বুঝি না। ইউরোপবাসীদিগের মধ্যে কেবল ইংরাজ এদেশে আসে নাই, পোর্ত্তুগিজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী সকলেই এদেশে সময় সময় আসিয়াছে এবং সামান্য সামান্য পরিমাণে রাজত্বও করিয়াছে, তাহাদিগের অংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগের ইংলণ্ডকে হোম বলিবার অধিকার কি? বিশেষতঃ ইউরোপীয় পুরুষই যে প্রত্যেক ফিরিঙ্গির পিতা তাহা কে বলিতে পারে? অনেক স্থলে ইউরোপীয় নারীর গর্ভে ভারতবর্ষীয় পুরুষ কর্তৃক ফিরিঙ্গি সকল উৎপাদিত হইয়াছে। অবশ্য পিতা মাতা দুই দূরদেশীয় হইলে পুত্র আপনাকে কোন্ দেশীয় বলিয়া পরিচয় দিবে ইহা একটী কঠিন প্রশ্নের বিষয় হইলেও প্রত্যেক স্থিরবুদ্ধি লোকে এই মত দিবেন যে, হয় পিতার নয় মাতার দেশীয় বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে। ফিরিঙ্গিগণ সেরূপ কোন বিচারের বশবর্ত্তী হয় নাই। ইউরোপীয় মাতাই হউক আর ইউরোপীয় পিতাই হউক, তাহারা আপনাদিগকে ইউরোপীয় বলিয়া পরিচয় দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। কিন্তু কেবল ইউরোপীয় বলিয়া পরিচয় দিলে পর্ত্তুগিজ প্রভৃতি অন্য পিতৃকুলেরা ফিরিঙ্গিদিগের প্রতি বিরক্ত হইতেন না; তাঁহারা বলেন আমাদিগের ভারতবর্ষীয় সন্তানেরা ইংলণ্ডের পিতৃত্ব স্বীকার করে ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ও আক্ষেপের কথা।

ফিরিঙ্গিরা সমস্বরে বলে "আমরা ইংরেজদিগের সন্তান"। কিন্তু ইংরাজেরা উহাদিগকে স্বজাতীয় বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষের "নেটিভগণ" যে শ্রেণী ভুক্ত, উহারাও সেই জাতীয়। এজন্য ১৮৭২ সালে যে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন হয় তাহাতে ইংরেজেরা ইহাদিগকে সাধারণ ভারতবর্ষীয়দিগের অপেক্ষা কোন অধিক স্বত্ব দেন না। ইংরেজের এই ব্যবহারে ফিরিঙ্গিদলে তখন হাহাকার পড়িয়া যায়। প্রত্যাখান বশতঃ শকুন্তলা দুষ্মন্তগৃহে যে মনস্তাপ পাইয়াছিলেন, সেদিন ফিরিঙ্গিরাও সেই খেদ অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে এত খেদ কেন বুঝি না।

চিরদিন কাহারও সমান যায় না; নিরাশাবিদগ্ধ ফিরিঙ্গির প্রাণ চিরদিন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিবে কেন? দশ বৎসর যাইতে না যাইতে আবার ফিরিঙ্গির

কপাল ফিরিতে বসিয়াছে। শুনিতেছি বাবা বলিয়া ডাকিলে ইংরাজ উত্তর দিতে সম্মত হইবেন। ইংরেজের এক ফোঁটা রক্তও যাহার শরীরে আছে সে যদি দেবলোকের পরিধেয় হ্যাট্‌কোট না পরিত্যাগ করিয়া থাকে, চুরট খাইবার অভ্যাস রাখে, তাহা হইলে সে ইউরো-পীয়ান ব্রিটিশ সব্‌জেক্টের মধ্যে গণনীয় হইবে এবং তদীয় আইনগত অসাধারণ সুবিধাসকলের অধিকার পাইবে। সুতরাং আজকাল আর ফিরিঙ্গি ভায়া-দিগের আনন্দের অবধি নাই; সিমলার কৈলাসশিখরে যে দেবাদিদেব অবস্থিতি করেন, যাহার ভ্রূকুটিভঙ্গিতে আমা-দিগের ২৫ কোটি মেষশাবকের জন্মমৃত্যু হয়, তাহারা তাঁহার স্বশ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে।

ফিরিঙ্গিদিগের এইরূপ মত্ততার কোন কারণ অনুমান করা যাইতে পারে না এমত নহে; অবশ্য এক দেশের লোকের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এক দেশের অন্নজলে পুষ্টি লাভ করিয়া, ৬।৭ হাজার মাইল দূরস্থ কোন একটী ক্ষুদ্রদ্বীপের অধিবাসীদিগকে পিতা বলিবার জন্য বহুসংখ্যক ফিরিঙ্গি সামান্য কারণে কখনই এরূপ ব্যগ্র হয় নাই; কিন্তু সে মহৎ কারণ কি তাহা তাহারা ভিন্ন অভ্রান্তরূপে কে বলিতে পারে? আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমা-দিগকে কতদূর লইয়া যায় তাহা একবার দেখা যাউক। সম্ভব এইগুলি:—

(ক) যদি ইংরেজের দলে মেশা যায়, তাহা হইলে, এদেশে বিশেষ সুখ ও প্রতিপত্তি লাভ হইবে।

(খ) সঙ্গতি হইলে ইংলণ্ডের স্বাধীন ভূমিতে যাইয়া, স্বাধীন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাবে বাস করা যাইবে। কিংবা ইংরেজের সাহায্যে কোথাও কলনি স্থাপিত করিবে।

(গ) ইংলণ্ডীয় গোলযোগে ইংরেজ হঠাৎ প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিলে, ভ্রাতৃসম্বন্ধে এ সাম্রাজ্য পাইবে।

কিন্তু ইংরেজের দলে সম্পূর্ণমেশা ফিরিঙ্গির পক্ষে সম্ভব কি? অমিশ্র বংশ এবং মিশ্র বংশ বলিয়া যে একটা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা মনুষ্যের আছে, তাহা কি ইংরেজহৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতে পারে? তবে সম্পূর্ণ মেশা না গেলেও কতকটা মিশিতে পারিলেও সুবিধার আশা হইতে পারে। আজ এক্ষণ ফিরিঙ্গিগণ সেই সকল সুবিধা ভোগও করিতেছে কিন্তু চিরকাল যে তাহা ভোগ করিতে পাইবে তাহার প্রমাণ কি? জগতে সকলই অস্থায়ী; ঐ যে অভ্রভেদী শুভ্রশৃঙ্গ হিমালয় দেখিতেছ উহাও ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং যদি (ক) আশায় তাহারা ইংরেজের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছে। (খ) অভিলাষ কাপুরুষ-দিগের পক্ষেই শোভা পায়; শৃগাল গায়ে রং মাখিয়া সিংহ সাজিয়াছিল, কিন্তু শৃগাল তাই তেমন নীচ কাজে

তাহার মতি হইয়াছিল। অন্য দেশের লোক সাহসী; অতএব তাহাদিগের সহিত মিলিয়া সাহসী হইব, ইহাকে মনুষ্যত্ব বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। পরকীয় সাহায্যে কি বীর্য্যগৌরব লাভ হইতে পারে? পরে তোমাকে নূতন দেশে অবস্থাপিত করিলেও তুমি তথায় থাকিতে পারিবে কেন, তথাকার স্বাভাবিক জাতি তোমায় গ্রাস করিবে। (গ) যদি উহাদিগকে পাইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাদিগের গ্রহ। যে শিক, গুরখা, রাজপুত, রোহিলা, আফগান সৈন্যের ত্রাসে জনবুলের কাঁপুনি ঘুচে না, ইংরেজ পলাইলে সেই কেশরীগণ দুর্ব্বল ফিরিঙ্গিদিগের বশবর্ত্তী থাকিতে পারে না।

ইংরেজেরা ফিরিঙ্গিদিগকে প্রথমতঃ প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করিয়া ১০ বৎসর পরে আবার কেন ভাই ভাই বলিয়া ডাকিতেছেন ইহার কি কোন অর্থ নাই? তখন ইংরেজ ভাবিয়াছিলেন এই বিমিশ্র জাতীয়দিগকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিব না; স্বীকার করিলে পৃথিবীর নিকট উপহাসাস্পদ হইব; ভারতবাসীরা তাহা হইলে আর আমাদিগকে গ্রাহ্য করিবে না; কিন্তু সুধু ইহা নহে, তাঁহারা তীক্ষবুদ্ধিবলে আরও দেখিতে পাইলেন যে ফিরিঙ্গিগণ কিয়ৎ পরিমাণে ইউরোপীয় রক্তবান হইলেও ধরিতে গেলে তাহারা ভারতবাসী; সুতরাং কালে তাহারা ইংরেজের হিত চিন্তা না করিয়া ভারতবর্ষের হিতই ভাবিবে; যদি ঘরের কথা সব জানিয়া পাছে বিপক্ষতা করে প্রথমতঃ ইংরেজ এ ভয়েও ফিরিঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু তৎপরে যে ১০ বৎসর গিয়াছে এই দীর্ঘ সময়ে ফিরিঙ্গিরা অনেক কাঁদিয়াছে; দাদা দাদা বলিয়া ডাকিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে অথচ ভারতবাসীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছে, এজন্য ইংরেজের বিশ্বাস হয় যে ইহারা কখনও আমাদিগের পক্ষ ছাড়িবে না; ভারতবর্ষীয় লোক যখন আমাদিগের বিরুদ্ধাচারী হইবে তখন উহারা কাজে লাগিবে, এজন্য ফিরিঙ্গি জাতির মাথায় আজ ইংরেজ একমনে একচিত্তে চুমকুড়ি দিতেছেন।

কিন্তু ভ্রান্ত ফিরিঙ্গি মৃগতৃষ্ণিকার মোহে বিপথে যাইতেছে; সুচতুর ইংরেজ রাক্ষসী মায়া বিস্তারিত করিয়া ফিরিঙ্গিদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা লইয়া কেন মাথা ঘামাইতে আসিলাম। আমরা ভারতবাসী, আমরা বঙ্গবাসী, আমাদিগের উহাতে কি ইষ্টানিষ্ট? আছে, বেশি না হউক; কিছু আছে, এই জন্য এ ভোগ ভুগিতেছি। ফিরিঙ্গিদিগের চক্ষে যে ধূলিরাশি পড়িয়াছে, তাহার কিয়দংশ উড়াইয়া দিব এই আমাদিগের ইচ্ছা।

শুন ফিরিঙ্গিগণ! তোমরা মাতৃভূমি কাহাকে বল? যে দেশের রক্তে জন্ম হয়, এবং যে দেশের রুটি মাংসে শরীর

পরিপুষ্ট হয়; যে দেশে শিশুকাল হইতে বৃদ্ধি পাইয়া আজ যুবা হইয়াছ এবং ইহাও আশা করিতেছ যে বার্দ্ধক্যও সেইখানে পাইবে, তথাপি সে দেশ কি তোমার জন্মভূমি নয়, তথাপি ভারত-বাসী তোমার পিতৃপুরুষ নয়? তুমি যে ইংলণ্ডকে "হোম" বল, সে দেশ তুমি কখনও দেখ নাই; তথায় যাইতে ও বাস করিতে যে ব্যয়ের আবশ্যক তাহাও তুমি যুটাইতে পারিবে বলিয়া আশা করিতে পার না, সুতরাং সে হোম যে কখনও দৃষ্টিগোচর করিতে পারিবে এরূপ আশাও করিতে পার না, তথাপি তাহাকে নিজ মাতৃভূমি বলিয়া কেন হাস্যাস্পদ হও। আরও দেখ ইংরেজ তোমাকে কেবল ভারতবাসীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার বেলা ভাই বলিয়া ডাকে, অন্য সময়ে তোমাকে শ্রদ্ধা করে না। ইংলণ্ড ও ইংরেজের গুণ গাইয়া তোমার কোন ইষ্ট নাই। ভারতবর্ষে ধান যব জন্মিলে খাইয়া বাঁচিবে, ইংলণ্ডের যব গমে কি তোমার কুলাইবে? তোমরা কি দেখিতেছ না যে ইংরেজ শাসনের কঠোরতায় তোমাদিগের শতকরা ২৫ জন উপবাস করিতেছে, তবে আবার কেন সেই স্বার্থলোলুপ ইংরেজের উপাসনা? তুমিও ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু ও মুসল-মানের শরণাপন্ন হও; তাহাদিগের আশ্রয় লইলে তোমাদিগের কোন কষ্ট থাকিবে না; ভাই ভাই বলিয়া তাহারা মহোৎসবে তোমাদিগকে বাহুমধ্যে স্থান দিবে এবং আজ যদিও তুমি তাহাদিগকে নিষ্প্রাণ, নির্ব্বীর্য্য, ধূলি-ধূসরিত দেখিতেছ, কাল তাহারা পুনরায় অভ্যুত্থিত হইয়া জগতে আপন গৌরব বিস্তার করিবে না একথা কে বলিতে পারে?

শ্রীগণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

রুগ্নগৃহে প্রবেশ করিয়া চিকিৎসকের প্রথমে কি করা কর্ত্তব্য? কোন্ বিষয়ে তাহার বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে হয়ত অনেকে বলিবেন রোগীর অবস্থা সম্যকরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার ব্যাধি নির্ণয় ও চিকিৎসা বিধানই বিশেষ কর্ত্তব্য। এই দুইটি বিষয় চিকিৎসকের প্রধানতম কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও একটি বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। সে বিষয়,—তাঁহার নিজের আচরণ। যাহাতে তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর উপর রোগীর ও তাঁহার আত্মীয়বর্গের আস্থা হয়, যাহাতে তাঁহার উপদেশ ও

চিকিৎসার উপর তাহাদের শ্রদ্ধা জন্মে এবং যাহাতে সেই উপদেশ ও ব্যবস্থা অনুসারে তাহারা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে অনেক স্থলে তাঁহার সময়, শ্রম ও যত্ন বৃথা নষ্ট হইবে; এবং রোগীর উপকার হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহার অপকার হইবে। অতএব রুগ্নগৃহে চিকিৎসকের প্রথম কর্ত্তব্য কি? কি উপায় অবলম্বন করিলে তিনি অল্প সময়, শ্রম ও যত্নে অধিক কার্য্য করিতে পারিবেন; এবং তাঁহার চিকিৎসা সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইবে? এ সমস্যার মীমাংসা করা একজন সুদক্ষ ও পারদর্শী চিকিৎসকের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার নহে। কি উপায়ে চিকিৎসা সুচারুরূপে বিহিত হয়, রোগীর অবস্থার উন্নতি সাধিত হয় এবং তাহার আত্মীয় স্বজনবর্গের শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করা যায়, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু সময়ে সময়ে এরূপ বিচক্ষণ ব্যক্তিরও ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য চিকিৎসক মাত্রেরই সতর্ক ভাবে সাবধানে রুগ্নশয্যাপার্শ্বে কার্য্য করিতে হয়।

রুগ্নগৃহে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে চিকিৎসককে নিজের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সেখানে কিরূপ ভাবে চলিবেন, তাঁহার মুখের ভাব কিরূপ হইবে, এবং রোগী ও আত্মীয়বর্গের প্রতি কিরূপ ভাবে আচরণ করিবেন, তদ্বিষয়ে অগ্রে মনোযোগী হওয়া তাঁহার বিশেষ কর্ত্তব্য। তিনি যে প্রকৃতির লোক হউন না কেন রোগীর গৃহে, রুগ্নশয্যার পার্শ্বে, তদীয় আচরণ সেই স্থানের সম্পূর্ণ উপযোগী হওয়া অতীব আবশ্যক। কি রোগী, কি তাহার আত্মীয়বর্গ সকলেই চিকিৎসকের নিকট শিষ্টাচার ও সদ্ব্যবহার প্রত্যাশা করিয়া থাকে; যদি তাহাদের সে আশা সফল না হয়, তাহা হইলে তাহারা ক্ষুব্ধ ও হতাশ হইয়া পড়ে। সকল চিকিৎসককেই এইরূপ আচরণ করিতে হইবে যাহাতে সকলের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর নিক্ষিপ্ত না হইয়া তাঁহাদের উপদেশের উপর পতিত হয়। চিকিৎসকের এরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য যাহাতে তাঁহার প্রতি রোগীর বিশ্বাস জন্মে। এরূপ হইলে তিনি যে উপদেশ দিবেন, যেরূপ চিকিৎসা করিবেন তৎপ্রতি রোগীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইবে, এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিবে। নবীন চিকিৎসকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে রুগ্নশয্যার পার্শ্বে তাঁহার প্রত্যেক আচরণ সকলেই তন্ন তন্ন রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। তজ্জন্য তাঁহার সতত সতর্ক থাকা উচিত। সে সময়ে যদি তাঁহার আত্মনির্ভর থাকে, তাহা হইলে সাধারণের তীক্ষ্ণ পরীক্ষা ও তীব্র দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া তিনি ধীর ও শান্তভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন। এবিষয়ের সারবত্তা সম্বন্ধে অধ্যাপক অষ্টিন্ ফ্লিন্ট্ স্বপ্রণীত ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ নামক গ্রন্থে যে মত প্রকাশ

করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এস্থলে কিয়ৎ পরিমাণে সন্নিবেশিত হইল।

চিকিৎসকের প্রফুল্লভাব রোগীর রোগ অপনয়নের একটি প্রধান ও আবশ্যকীয় উপকরণ। শুদ্ধ নীতি ও শিষ্টাচারের অনুরোধে এরূপ ভাবের যে আবশ্যকতা তাহা নহে, ইহা তাঁহার ব্যবসায়িক কর্ত্তব্য। ইহার প্রভাবে রোগীর অবস্থার যেরূপ উন্নতি হয়, তাহাতে ইহাকে চিকিৎসার একটি প্রধান অঙ্গ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিতে গিয়া, যেন আমোদ ও লঘুচিত্ততা প্রকাশ না করেন। রোগীর নিকট চিকিৎসকের এরূপ ভাব নিতান্ত অযৌক্তিক ও অবিধেয়।

রোগীর প্রতি উপযুক্ত যত্ন ও সহানুভূতি প্রকাশ করা চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেবল তাহার কষ্টে সমবেদনা প্রকাশ করিলেই হইবে না; এরূপভাবে যত্ন ও সহানুভূতি দেখাইতে হইবে যাহাতে তিনি রোগীর ভক্তির ও শ্রদ্ধার ভাজন হইয়া উঠেন। তাহা হইলে রোগীর উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করা হয় যে, তাঁহার উপদেশ ও চিকিৎসা ফলদায়ক হইয়া থাকে। রোগীবিশেষে যত্ন ও সহানুভূতির তারতম্য প্রকাশ করা চিকিৎসক মাত্রেরই নিতান্ত অকর্ত্তব্য; তাহাদের পদ ও সাংসারিক অবস্থা ভেদে এবং চিকিৎসা কার্য্যের জন্য পুরস্কার দানের ক্ষমতা অনুসারে যেন এ প্রভেদ না করেন। এরূপ করিলে যে তিনি কেবল নিন্দনীয় হয়েন এমন নহে, চিকিৎসা ব্যবসায়ের নির্ম্মল চরিত্র দূষিত ও কলঙ্কিত হইয়া পড়ে।

দুর্ভাগ্যের কঠোর অঙ্কুশাঘাতে তাড়িত হইয়া যাহারা চিকিৎসার নিমিত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য বা কঠোরভাব প্রকাশ করা যে কতদূর জঘন্য ও নিন্দনীয়, তাহা বিবেকবান্ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন, সেরূপ হেয় আচরণকে পাশব ব্যবহার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা বিধান চিকিৎসকের প্রধানতম কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহারা চিকিৎসকের অনুগ্রহের প্রার্থী হইয়া রোগ হইতে শান্তি লাভার্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হয়, যাহাদের এমন ক্ষমতা নাই যে, মনোমত চিকিৎসককে বাটীতে আনয়ন করিয়া আবশ্যকমত অর্থসাহায্যে ঔষধাদি ক্রয় করে, যথোচিত যত্ন ও সদ্ব্যবহারের সহিত তাহাদিগের রোগের উপযুক্ত তত্ত্বাবধারণ করা অধিকতর কর্ত্তব্য;—এ কর্ত্তব্য মানুষী ধর্ম্মের অনুমোদিত। সেই জন্য চিকিৎসকের স্মরণ রাখা উচিত যে, যে সকল দীন দরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসালাভার্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে; ভিষকের নিকট সদ্ব্যবহার ও যত্ন পাইবার তাহাদিগের দুইটী অধিকার আছে;

প্রথম,—পীড়া; দ্বিতীয়, দারিদ্র্য। সেই দরিদ্র রোগিগণের এমন ক্ষমতা নাই যে, তাহারা মনোমত চিকিৎসক বাছিয়া লয়; যে ভিষকের উপর তাহাদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, যাঁহার নিকট চিকিৎসা লাভ করিতে পারিলে তাহারা রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে বলিয়া ভরসা করিয়া থাকে, হয়ত তিনি তাহাদের অধিগম্য নহেন; তাহারা দীনহীন, তাহারা নিঃসম্বল; তাহাদের এমন উপায় নাই যে সেই মনোনীত চিকিৎসককে লাভ করে; নিরুপায় ও নিরবলম্ব বলিয়াই রোগ শান্তির অন্য উপায় না দেখিয়াই তাহারা অগত্যা দাতব্য চিকিৎসালয়ের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করা যে নিতান্ত হেয়, জঘন্য ও নৃশংস আচরণ, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বরং যাহারা ক্ষমতাবান্, মনোমত চিকিৎসককে আনিতে অথবা আবশ্যকমত পথ্য ও ঔষধাদি ক্রয় করিতে যাহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, যাহারা ইচ্ছা করিলে যখন তখন যে কোন চিকিৎসকের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিতে সক্ষম, তাহাদিগের প্রতি উক্তরূপ নির্দ্দয় আচরণ ততদূর হানিকর ও অনিষ্টোৎপাদক নহে।

সত্যের অপলাপ না করিয়া অথচ বিবেকের সম্মান রাখিয়া রোগীদিগকে সাধ্যমত উৎসাহ দেওয়া চিকিৎসক মাত্রেরই উচিত। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকের ব্যবহারের মধ্যে ঘোর বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্য বশতঃ যে সকল চিকিৎসক রোগীর কেবল অশুভ লক্ষণের দিকেই দৃষ্টি রাখেন, অতি ঘোর অনিষ্ট ব্যাপার যতদূর ঘটিতে পারে, তাঁহারা আপনাদের অশুভশংসী ভাবী দর্শনের বলে, তাহার ঘটন আশঙ্কা করেন এবং সেই আশঙ্কা ও বিষাদময় ভাবী জ্ঞান বাক্য অথবা ভাবভঙ্গি দ্বারা রোগীর নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন। রোগের যন্ত্রণা হইতে রোগীদিগের মন প্রায়ই বিষণ্ণ ও হতাশ হইয়া থাকে, তাহার উপর আবার চিকিৎসক যদি গভীরতর নৈরাশ্য ঢালিয়া দেন, তাহা হইলে ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। পীড়া যেরূপ গুরুতর হউক না কেন, রোগীকে উৎসাহ দানে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য; যে স্থলে অনাগত বিপদের ঘটন ও অঘটন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, সে স্থলে অনিষ্টাপাতকেই সম্ভাব্য বলিয়া ধরিয়া রোগীকে নিরুৎসাহ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু স্থলবিশেষে কতকগুলি রোগে সম্ভবনীয় অনিষ্টনিচয়ের নিবারণকল্পে রোগীকে ভয় দেখান আবশ্যক হইয়া উঠে। যেমন, থাইসিস পীড়ায় আক্রান্ত হইলে অনেক রোগী ঔষধ সেবনে উপকার হইবে না ভাবিয়া চিকিৎসাধীন হইতে চাহে না, এরূপ অবস্থায় তাহার ভাবী বিপৎপাতের ভয় দেখাইয়া তাহাকে ঔষধ সেবন করান উচিত।

পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিলে এবং জীবননাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা লক্ষিত হইলে রোগীর আসন্ন বিপদ কি স্বেচ্ছাক্রমে তাহার নিকট প্রকাশ করা উচিত? হয়ত তিনি সময় পাইলে সাংসারিক বিষয়াদি সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিতেন; এজন্য সময় থাকিতে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য—এ প্রশ্নের মীমাংসা বিষয়ে চিকিৎসক প্রায়ই বিষম সমস্যায় পতিত হইয়া থাকেন। যাঁহাদের গভীর মনীষা ও অদম্য সাহস, এমন কি পীড়ার আতিশয্যেও যাঁহাদের এই সমস্ত সদ্‌গুণ সম্পূর্ণ অক্ষত থাকে, তাঁহারাও কচিৎ আপনাদের আসন্ন বিপদের বিষয় স্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন; ভাল, যদিই করেন, তাহা হইলে চিকিৎসক অকপট ভাবে উত্তর দানে বাধ্য; কিন্তু সে স্থলেও এরূপ উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে রোগী জীবন রক্ষার বিষয়ে একবারে হতাশ হইয়া না পড়েন। যদি রোগী জিজ্ঞাসা না করে, তাহা হইলে তাহার কোন বন্ধুকে এরূপ ইঙ্গিত করা উচিত, যাহাতে সে ব্যক্তি চিকিৎসকের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আসন্ন বিপদের বিষয় রোগীকে জ্ঞাপিত করে। অনেক রোগী এইরূপে অনাগত বিপৎপাতের বিষয় জানিতে পারিয়া এবং ইহলোক হইতে বিদায় লইবার উপযোগী সাংসারিক ও পারলৌকিক সমস্ত ব্যাপারের আয়োজন করিয়া অনেক সময় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শান্তি সম্ভোগ করিয়া থাকে এবং সুখে জীবন ত্যাগ করিতে পারে। মৃত্যুকে নিকটস্থ দেখিয়া লোকে প্রায়ই ঐহিক বাসনা ত্যাগ করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণে সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হয়। অনেকে আবার মায়াপাশ ছিন্ন করিতে না পারিয়া অসীম ভয়ে ব্যাকুল হইয়া থাকে। সেই আসন্ন বিপৎকালে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে আশ্বাস দেওয়া যাইতে পারে না; কিন্তু আশ্বাস দিলে তাহার উপকার ভিন্ন অপকার করা হয় না। সংক্ষেপতঃ রোগীর চরিত্র ও ভিন্ন ভিন্ন পীড়ায় তাহার সমস্ত অবস্থার বিষয় জানিতে পারিলে চিকিৎসক স্বীয় বিচারশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা রোগের সংঘাতিক চরম সীমায় কিরূপ কার্য্য করিবেন, তাহা স্থির করিতে সক্ষম হয়েন।

শ্রী রঃ—

ভগবদ্গীতা।

প্রথম প্রস্তাব।

আমাদিগের শিক্ষিত দলের মধ্যে আজি কালি মহাভারতীয় "ভগবদ্গীতার" বিলক্ষণ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গীতার উপদেশ সকল আমাদের কতদূর গ্রহণীয় হইতে পারে তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা এ প্রস্তাবে ভগবদ্গীতার কথঞ্চিৎ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

মহাভারত পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, এক বিশেষ সময়ে এবং এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্য ভগবদ্গীতার সৃষ্টি। সুতরাং ইহার উপদেশ ও অভিপ্রায় সকল সেই উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী করিয়াই প্রণীত হইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায়, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যখন পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সমাগত হইয়াছেন, ধনঞ্জয় তখন উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে অবস্থিত হইয়া একবার বিপক্ষীয় সেনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সম্মুখে তাঁহার পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, ও মিত্রগণ অবস্থান করিতেছেন দেখিবামাত্র স্বভাবতঃই তাঁহার মন বিচলিত হইল; তিনি মহাত্মার ন্যায় ভাবিলেন শত্রুগণ বিদ্বেষপরায়ণ হইয়াছে বলিয়া আমার তদ্রূপ হওয়া উচিত নহে। অমনি তিনি ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন তিনি বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে কার্য্যে আত্মকুলক্ষয় জন্য মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয় এমত কার্য্যে আমি প্রবৃত্ত হইতে পারি না, পৃথিবীর কথা দূরে থাক, ত্রৈলোক্য লাভ হইলেও আমি আত্মীয়স্বজনগণকে বধ করিতে বাসনা করি না। বাসুদেব দেখিলেন, সর্ব্বনাশ, অর্জ্জুন পরাঙ্মুখ হইলে ত সকলই ব্যর্থ হয়। অর্জ্জুনকে সেই ঘোর সময়ে সেই আত্মীয়স্বজনবধকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য কৃষ্ণ যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছিলেন তাহাই ভগবদ্গীতা নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। এস্থলে অর্জ্জুনের মহদ্বাক্য সকল শ্রীকৃষ্ণের নীচাশয়তাকে কেমন জাজ্জ্বল্যরূপে প্রতীয়মান করিয়া দিতেছে।

অর্জ্জুনকে তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণের ঘোর হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য ভগবদ্গীতার সৃষ্টি। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, হত্যাকারীকে হত্যাকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য যে সকল প্ররোচন বাক্যের প্রয়োজন হয় ভগবদ্গীতায় তাহা বিন্যস্ত আছে। এই সমস্ত কথার উপদেষ্টা কে? সেই কুচক্রী শ্রীকৃষ্ণ, যিনি কুরুকুলের যমদূতরূপে পাণ্ডবগণমধ্যে

অবস্থান করিতেছিলেন; যিনি চাতুরীর ভাণ্ডার, পক্ষপাতের প্রতিমা, বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিরূপ, ঘর ভাঙ্গিবার চূড়ামণি, শঠের শিরোমণি, যাহার উপর কাল, ভিতর কাল, যিনি ছেলেবেলায় ননিচোরা ছিলেন, যিনি যৌবনে কত লম্পটশিরোমণি ছিলেন, এবং বয়সে যিনি কেবল লুটপাট করিয়া বেড়াইয়াছিলেন*। তিনি যখন পাণ্ডবগণের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন, তখনই আমরা জানি, একটা মহাযুদ্ধ না হইয়া যায় না। তাঁহার প্রতি পাণ্ডবগণের এতদূর ভক্তি ছিল, যে তিনি মনে করিলে এ যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিতেন, কুরু-পাণ্ডবমধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে পারিতেন।† কিন্তু সেই ত্রিভঙ্গমুরারি, যাহার মন বাঁকা, হৃদয় বাঁকা, অঙ্গভঙ্গি সকলই বাঁকা, সেই বাঁকা ঠাকুরটী এমত পাত্র নন, যে কোন সাধুকার্য্যে লিপ্ত হন। তিনি চাতুরীবলে একাই একশ। তিনি আত্মাভিমানে এত পূর্ণ, যে আপনাকে ভগবান বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এই ধূর্ত্তশিরোমণি ঘোর পক্ষপাতী, কুরুকুলের যমদূত শ্রীকৃষ্ণ, এই লেডি ম্যাক্‌বেথের প্রেতাত্মা সম্পন্ন

* শিশুপালের গালিবর্ষণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য এবং যৌবন দোষের কথার উল্লেখ নাই বটে কিন্তু মহাভারত ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বগ্রন্থেই উল্লেখ আছে। এক স্থলে একটি কথার উল্লেখ না থাকিলে কোন প্রামাণ্য কথা মিথ্যা হয় না। বিশেষতঃ আমাদের বুঝা উচিত যে শিশুপালের গালি ভক্ত দ্বৈপায়নের গালি। ভক্তের গালি যেরূপ হয় তাহাই হইয়াছে। আর মহাভারতে যখন শ্রীকৃষ্ণের অবতারণা হইয়াছে তখন শ্রীকৃষ্ণ এত পরিণত বয়সে উপস্থিত যে তাঁহার বাল্য ও যৌবন লীলা উল্লেখযোগ্যই হয় না। বার্দ্ধক্যে যৌবনলীলা লোকে তত ধর্ত্তব্য জ্ঞান করে না। আর যদি বাল্য ও যৌবন কালে চৌর্য্য এবং লাম্পট্য দোষে কলঙ্কিত না হইয়া থাকেন তবে তাঁহার বাল্য ও যৌবন কাল কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল আমরা জানিতে চাই।

† শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপন জন্য যে কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা লোক দেখান মাত্র। যেহেতু, তাহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা নহে। বিদুর শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতা ও ঐশী বলের প্রভাব বুঝিয়া বলিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের যাহা আন্তরিক ইচ্ছা, তাহা স্বতঃই সংঘটিত হইয়া আইসে। সন্ধি স্থাপন করা যদি তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা হইত তাহা হইলে তিনি নিজ ঐশী বলে মানুষী উপায়েই তাহা স্থাপন করিতে পারিতেন। যখন তিনি পরে অর্জ্জুনকে বলিলেন যে আমি ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কুরুকুলগণকে পূর্ব্বেই মারিয়া রাখিয়াছি তুমি যুদ্ধে কেন অগ্রসর হইবে না. তখন অবশ্য বলিতে হইবে সন্ধি স্থাপন করা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা নহে। কিন্তু শুদ্ধ সংহার করিতে না আসিয়া যদি তিনি সন্ধি স্থাপন করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য যথার্থই দেবোপম হইত। গৃহবিবাদ মিটাইয়া দেওয়াই ভাল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কেবল আর্য্য বীরকুল নষ্ট হইয়া ভারত বীরহীন হইয়াছিল। সুতরাং কৃষ্ণের পক্ষে এ বিবাদ মিটাইয়া দেওয়াই উচিত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে ঘোর হত্যাকাণ্ডে উত্তেজনা করিতেছেন। যে কোন প্রকারে হউক, যে কোন উপদেশবাক্যে হউক, যে কোন কূটযুক্তিতে হউক, অর্জ্জুনের মন ফিরান ইহাঁর উদ্দেশ্য। তাঁহাকে ঘোর হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত করান ইহাঁর অভিপ্রায়। সেই কালরূপী শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে, হত্যা করাইবার জন্য, যে সকল প্ররোচন বাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল তাহা কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি সদুপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিবেন? অথচ দেখিতে পাই তাহাই কোন কোন লোক সদুপদেশ বলিয়া গ্রহণ করেন।

কেটো (Cato) যে বিখ্যাত মতে দীক্ষিত হইয়া আত্মঘাতী হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে সেই মতের অবতারণা করিলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন,— জীবাত্মা অবিনাশী। কেন অবিনাশী, তাহার একটি মাত্র যুক্তি দিলেন। সে যুক্তি এই "যাহা কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না; এবং যাহা বিদ্যমান আছে, তাহারও কখন অভাব হয় না; তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ভাব ও অভাবের এই রূপ নির্ণয় করিয়াছেন।"* যাহা কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না এবং যাহা বিদ্যমান আছে তাহা চিরকালই ছিল, এই সাধারণ নিয়ম গ্রহণীয় হইলে আত্মার অবিনশ্বরত্ব মত প্রমাণিত না হউক এই জগৎই অনাদি, এইরূপ প্রমাণিত হয়। যাহা হউক, যুক্তি দেখান শ্রীকৃষ্ণের মত অভিপ্রায় ছিল না। অর্জ্জুন শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, সেই অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন, যে তিনি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণের মুখে যে শুনিয়াছিলেন যে শরীরী জীবাত্মা নিত্য, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তিনি যুদ্ধ করিতে কেন পরাঙ্মুখ হন। তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে সমরক্ষেত্রে হত্যা করিলে তাঁহাদের জীবাত্মাকে ত বধ করিলেন না। সুতরাং তাঁহার আত্মীয় স্বজন সমরক্ষেত্রে পতিত হইয়াও চিরকাল জীবিত রহিলেন। যেহেতু, তাঁহাদের আত্মা চিরজীবী। এই যুক্তি অনুসারে কেটো আত্মঘাতী হইয়াছিলেন, এবং সকল হত্যাকাণ্ডই পাপশূন্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব মতের এতদপেক্ষা অধিকতর অপব্যবহার আর কি হইতে পারে; তত্ত্বদর্শিগণ যে সদুদ্দেশে এই মতের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় এখানে ঘটিল। তত্ত্বদর্শিগণের এই মত বাসুদেব অবলম্বন করিয়া হত্যাকাণ্ডের প্ররোচনবাক্যরূপে উপদেশ দিলেন। তিনি এই মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করেন নাই, তিনি নিজে এই মত উদ্ভাবন করেন নাই, তিনি ইহার সম্যক প্রমাণও প্রদান করেন নাই। পণ্ডিতগণের এই মতকে যতদূর অসৎ কার্য্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে শ্রীকৃষ্ণ

---

* নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো-
বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।

তাহা করিয়া চূড়ান্ত নীতিজ্ঞতার পরিচয় দিলেন।

বাসুদেব এই যুক্তি দ্বারা দেখাইতে চান যে অর্জ্জুন যে কুলক্ষয়ের ভয় করিতেছিলেন, বাস্তবিক তাহার কুলক্ষয় হইবে না। অর্জ্জুন এক অর্থে কুলক্ষয় শব্দ ব্যবহার করিলেন বাসুদেব অন্য অর্থে তাহার বিপর্য্যয় ঘটাইলেন। আবার এই বাসুদেবই ভগবদ্গীতার অন্যত্র যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার সহিত উল্লিখিত যুক্তির কেমন সঙ্গতি দেখুন।

অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিলে তাঁহাকে কর্ম্মে উত্তেজিত করিবার জন্য বাসুদেব বলিলেন,—

"যাহাতে ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদন হইয়া থাকে, সেই যজ্ঞই—কর্ম্ম।"*

ভগবদ্গীতা—অষ্টম অধ্যায়।

"তুমি নিয়ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।"†

—ভগবদ্গীতা তৃতীয় অধ্যায়।

এখানে দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণ একজন ঘোর হিতবাদী (Utilitarian), যাহাতে জীবের বৃদ্ধি সম্পাদন হয় তাহাই কর্ম্ম এবং তাহাই করণীয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ব্যাপারে যে অসংখ্য জীবের বিনাশ হইয়াছিল তাহা সম্পাদন করা অবশ্য উক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে করণীয় কর্ম্ম নহে; সুতরাং যদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত না হয় তবে অকর্ম্ম পরিত্যাগ করা অবশ্য উচিত। যুদ্ধরূপ বিনাশ ব্যাপার কি কর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে? যদি না হয়, তবে অবশ্য পরিত্যাজ্য। বিনাশ দ্বারা কিছু জীবের বৃদ্ধি সম্পাদন হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী উপদেশের সহিত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপদেশের সমন্বয় নাই।

অর্জ্জুনের কুলক্ষয়ভয় অপনয়ন করিবার উদ্দেশে উত্তেজন বাক্য প্রয়োগ করা হইলে, তাঁহার হৃদয়কে এবং তাঁহার প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে উদ্যত হইয়া বাসুদেব কহিলেন;—

"যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম (ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম) ও কীর্ত্তি হইতে পরিভ্রষ্ট ও পাপভাগী হইবে। লোকে চিরকাল তোমার অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে। সম্ভাবিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিকতর দুঃসহ। যে সকল মহারথী তোমার বহুমান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট তোমার গৌরব থাকিবে না। তাঁহারা মনে করিবেন তুমি ভয় প্রযুক্ত সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়াছ। তাঁহারা তোমারে কত অবক্তব্য কথা কহিবেন এবং তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবেন। ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি আছে? সমরে বিনষ্ট হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ

* ভূতভাবোদ্ভবকরোবিসর্গঃ কর্ম্মসজ্ঞিতঃ।
† নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্য কর্ম্মণঃ।

করিবে। অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত কৃত-নিশ্চয় হইয়া উত্থান কর।"* এস্থলে দৃষ্ট হইতেছে যে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যশোলাভের প্রলোভন দেখাইলেন। তাঁহার অভিমান, অহঙ্কার ও আত্মাদরকে উত্তেজিত করিলেন। তাঁহাকে স্বর্গের প্রতি তাকাইতে বলিলেন এবং রাজ্যভোগের লোভ দেখাইয়া তাঁহার স্বার্থপরতা ও বিষয় সুখের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে উত্তেজিত করিলেন। এক জন সামান্য লোককে যে সকল সামান্য কথায় লোভ দেখাইতে হয় তাহা দেখাইলেন, কিন্তু ধর্ম্মভীত অর্জ্জুনকে এরূপ লোভ দেখান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নীচাশয়তারই পরিচয় দেয়। তিনি অর্জ্জুনকে যতদূর কর্ম্মফল প্রত্যাশায় আসক্তি দিতে হয় তাহাও দিলেন। কিন্তু তৎপরেই যখন যোগশাস্ত্রের উপদেশ অবলম্বন করিয়া তাহাকে উত্তেজনা করিতেছেন তখন আবার সেই স্বর্গ সেই কর্ম্মফল সেই বিষয়বাসনা সকলই অধঃপাতে দিলেন। তখন বলিতেছেন :—

"যাহারা আপাতঃ-মনোহর শ্রবণ-রমণীয় বাক্যে অনুরক্ত, বহুবিধ ফল-প্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদিগের প্রীতিকর; যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না; যাহারা কামনাপরায়ণ; স্বর্গই যাহা-দিগের পরম পুরুষার্থ, জন্ম কর্ম্ম ও ফলপ্রদ, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যলাভের সাধন-ভূত, নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদিগের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত সংসক্ত; সেই বিবেকহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শূন্য হয় না।"†

এই উদ্ধৃত স্থলদ্বয় পরস্পরবিরোধী নয়

* স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ
ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে। ৩১।
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে
যুদ্ধমীদৃশং। ৩২।
অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং
ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা
পাপমবাপ্স্যসি। ৩৩।
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি
কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়ং।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতি-
রিচ্যতে। ৩৪।
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা
যাস্যসি লাঘবং। ৩৫।
অবাচ্য বাদাংশ্চ বহূন
বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ। দা
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো
দুঃখতরং নু কিং। ৩৬।
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায়
কৃতনিশ্চয়ঃ। ৩৭।

† ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তথাপহৃত-
চেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥
গীতা ২ অধ্যায় ৪৪ শ্লোক।

আমরা জানি। আমরা জানি মানুষ যশ, রাজ্য ও স্বর্গের দিকে দৃষ্টি রাখিবে বটে, কিন্তু তাহাই যেন তাহার সর্ব্বস্ব না হয়, তাহাতেই যেন তিনি একান্ত আসক্ত না হন এই কথা বলাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়। অভিপ্রায় হইলেও অর্জ্জুনের মনকে স্বর্গ, যশ ও রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বলাতে বাসুদেবের পূর্ব্ব উত্তেজন বাক্যের ফল যে একেবারে বিনষ্ট হইল তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না, কিসে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে। তিনি একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। অর্জ্জুনকে একবার এদিকে আনয়ন করেন, একবার ওদিকে লইয়া যান। হা বাসুদেব! তোমার দুর্ব্বলতা ও অসামর্থ্য দেখিয়া বড়ই দুঃখবোধ হয়।

এক্ষণে আমরা বাসুদেবের আর একটী যুক্তি দেখাইতে চাই। তিনি এই ভগবদ্গীতার শেষ অধ্যায়ে বলিয়াছেন :—

(১) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণের যে ব্যবসায় কার্য্য তাহাই স্বাভাবিক কার্য্য। "এই স্বাভাবিক কার্য্য দোষ-যুক্ত হইলেও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না।" (২) কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া নিজ নিজ স্বাভাবিক কার্য্য সম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য। ফল, মোক্ষ লাভ। এই মর্ম্মের কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন:—

(৩) "তুমি মোহ বশতঃ এক্ষণে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না, তোমাকে ক্ষত্রিয়-সুলভ শূরতার বশীভূত হইয়া তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যেমন সূত্রধার দারু যন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূত সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে; তদ্রূপ ঈশ্বর ভূত সকলের হৃদয়ে

---

(১) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং
শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপঃ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি
স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ। ৪১।
শমোদমস্তপঃ শৌচং
ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং
ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজং। ৪২।
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং
যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজং। ৪৪।

(২) সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়
সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ
ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। ৪৮।
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা
বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং
সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি। ৪৯।
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি
নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠাজ্ঞানস্য
যা পরা। ৫০।

(৩) স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ
স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ
করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ। ৬০।

অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। এক্ষণে তুমি সকল বিষয়েই তাঁহারই শরণাপন্ন হও। তাঁহার অনুকম্পায় পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।”—

ভগবদ্গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়।

কি ঘোর কলুষিত মত। এ মত অবলম্বী হইলে পৃথিবীতে পাপ পুণ্য বলিয়া কিছু আছে, এমত স্বীকার্য্য হইতে পারে না। যেহেতু মনুষ্য কিছুই নয়, কেবল ঈশ্বরের যন্ত্র স্বরূপ, ঈশ্বরই সকল করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে কর্ম্মফল সমর্পণ করিলেই শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। চোর, জুয়াচোর, প্রতারক, ডাকাইত, কসাই, ব্যাধ প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরায়ণ হইয়া যাহা যাহা করিতেছে,সে সমুদায়ই ঈশ্বরপ্রবর্ত্তিত কার্য্য; সুতরাং পাপশূন্য ও মোক্ষ-সাধক। এই স্বাভাবিক কার্য্য দোষযুক্ত হইলেও পরিত্যাজ্য নহে। দোষ কিছুতেই নাই। শ্রীকৃষ্ণের কথার মর্ম্ম এই যে, এই যুদ্ধকে অর্জ্জুন অন্যায় ও পাপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন দোষ সত্ত্বেও ইহা কর্ত্তব্য। যেহেতু, যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, সে যুদ্ধ অন্যায় ও পাপযুক্ত হইলেও করা কর্ত্তব্য, যদি তাহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া থাকে। কি চমৎকার যুক্তি! কোন্ কার্য্য না প্রবৃত্তিজাত? প্রবৃত্তিজাত হইলে যদি ঈশ্বর কার্য্য-হেতু পাপ ও দোষশূন্য হয়, তবে ত কোন ব্যবসায়ীর কোন অন্যায় কার্য্যেই দোষ নাই। এইরূপ কুযুক্তি দেখাইতে শ্রীকৃষ্ণ যে একটু সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হয়েন নাই ইহাই আশ্চর্য্য। এরূপ যুক্তি না দেখাইতে পারিলে কি কাহাকে পাপপূর্ণ হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত করা যায়! ধন্য শ্রীকৃষ্ণ তোমার চাতুরী, ধন্য তোমার ধর্ম্মনীতি, ও উপদেশ!

শ্রীকৃষ্ণের আর একটি যুক্তিও চমৎকার! সে যুক্তিটি এই:—

(৪) “হে অর্জ্জুন! আমি লোকক্ষয়কারী ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎ কালরূপী হইয়া লোক সকলকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে কেবল তোমা ব্যতিরেকে প্রতিপক্ষীয় বীর পুরুষ সকলেই বিনষ্ট হইবেন; অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইয়া শত্রুগণকে পরাজয় করত যশোলাভ

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি
মায়য়া। ৬১।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং
প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং॥ ৬২।
শ্রীভগবানুবাচ।

(৪) কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ। ৩২।
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্
ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং
ভব সব্যসাচিন্। ৩৩।

ও অতি সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। আমিই পূর্ব্বেই ইহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি; এক্ষণে তুমি এই বিনাশের নিমিত্ত মাত্র হও।”—

ভগবদ্গীতা, একাদশ অধ্যায়।

এই যুক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই অদৃষ্টবাদের উপদেশ দিতেছেন। অদৃষ্টবাদ কিরূপ লোকসমাজের অনিষ্টকর, তাহা অনেকেই জানেন। আর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণই যে কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন, এই অদৃষ্টবাদ সেই কর্ম্মযোগেরও কেমন বিরোধী তাহাও বোধ হয় অনেকেই বুঝিতে পারিবেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ যখন সকলকেই মারিয়া রাখিয়াছেন তখন তাঁহার সন্ধিস্থাপন করিতে যাওয়া প্রহসনের অভিনয় মাত্র। তিনি আরও বলিলেন ‘আমি সমস্ত বীরকুল সংহার করিতে আসিয়াছি।’ বীরকুলবিহীন হইয়া ভারত পতিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকেই ভারতপতনের কারণ বলিতে হইবে। ভারত পতিত হইয়া ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ধর্ম্মপতনেরও কারণ। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ কি এই সমস্ত ভবিষ্যৎ ফলাফল জানিয়াও ভারতকে বীরহীন করিতে আসিয়াছিলেন? যদি তাহাই হয়, তবে বলিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতের পরম শত্রু ছিলেন। একা দুর্য্যোধনের স্বাভাবিক লোভে এই গৃহ যুদ্ধ বাধিয়াছিল। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি পরম ধর্ম্মভীত মহাত্মাগণ কোন দোষের দোষী নহেন। কোন রকমে দুর্য্যোধনকে সরাইতে পারিলেই ত চুকিয়া যাইত। শ্রীকৃষ্ণ ত সে চেষ্টা করেন নাই। তিনি যাহাতে যুদ্ধ ঘটে তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ হইয়া ভবিষ্যৎ ফলাফল জানিয়া শুনিয়াও সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারই অধিক দোষ। তিনি অকারণ ভারতকে নির্বীর্য্য করিয়াছিলেন, এবং পক্ষপাতী হইয়া অন্যায় যুদ্ধের কারণ হইয়াছিলেন। কেন এরূপ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রবৃত্তি এবং স্বভাবের প্রতিই দোষারোপ করিতে হয়।

কিন্তু এখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রধান যুক্তির বিষয় বলা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন অর্জ্জুনের সমরে অপ্রবৃত্তির কারণ—

১। আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ, মমতা।

২। আত্মকুলক্ষয়জনিত পাপভয়।

তিনি পূর্ব্বে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে, অর্জ্জুনকে এক রকম দেখাইয়াছেন যে তিনি যুদ্ধে যে কুলক্ষয়ভয় করিতেছেন, বাস্তবিক সে কুলক্ষয় ঘটিতেছে না, এবং তাঁহাকে যে পাপভাগী হইতে হইবে না, তাহাও নিশ্চয়। এক্ষণে যাহাতে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ মমতা যায়, এরূপ কঠোর উপদেশ বাক্যের প্রয়োজন। সে কঠোর উপদেশ বাক্য তিনি কোথায় পান? তিনি জানেন সংসারের স্নেহ

মমতা ছিন্ন করিবার এক মাত্র পথ—যোগ ধর্ম্ম। সুতরাং সেই বৈরাগ্য-উৎপাদক যোগের নৃশংস উপদেশ সকল তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। যোগের উপদেশ এক্ষণে অর্জ্জুনের পক্ষে প্রকৃষ্ট রূপেই উপযোগী হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তজ্জন্য সেই কঠোর যোগ-তত্ত্বের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভোগ ও যোগ-পথ সম্পূর্ণ বিপরীত পথ। সংসারীর পক্ষে যোগের উপদেশ কখনই শ্রেয়স্কর নহে। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে সাংখ্যযোগের বিষয় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা সংসার-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। যোগের তত্ত্বসকল সংসারীর জীবনের কোন্ সময়ে খাটে, ভগবদ্গীতার উপদেশ যেন তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। তাহা কালোচিত বলিয়া অর্জ্জুনের পক্ষে খাটিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বকালে সর্ব্ব-লোকের প্রতি খাটিতে পারে না। বৈরাগ্যমূলক যোগধর্ম্ম সন্ন্যাসী ও যোগীর অবলম্বনীয়, সংসারীর নহে। যিনি যোগী হইতে চাহেন তাঁহাকে সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ সংসারের স্নেহ-মমতা ও কলরব যোগ-পথের বিরোধী।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় যে সকল উপ-দেশ দিয়াছেন, তাহা সাংখ্যের উপদেশ। কাপিল ও পাতঞ্জল দর্শনের মত অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ যোগতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। এই জন্য দ্বৈপায়ন বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়া গিয়াছেন যে মহাভারতের এই অংশকে উপনিষৎরূপে বিবেচনা করিতে হইবে। যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপনিষদের প্রতিপাদ্য তাহা প্রাচীন কালের বানপ্রস্থ-ধর্ম্মীর আলোচ্য বিষয়। বানপ্রস্থীর আরণ্য জীবনের যাহা উপযোগী, সাধারণ জনগণের তাহা উপযোগী নহে। উপনিষদুক্ত ধর্ম্ম আরণ্য জীবনের ধর্ম্ম। মোক্ষমূলার সেই তৃতীয় আশ্রমীর বিষয় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"মানব তৃতীয়াশ্রম প্রবেশ করিবামাত্র এই সমস্ত বন্ধন (সংসার) হইতে মুক্ত হইতেন। তিনি এই আশ্রমে থাকিয়া কিছু দিন বাহ্যক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান এবং স্তোত্র পাঠ ও বেদোচ্চারণ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু উপনিষদুক্ত অনন্ত আত্মাতে মনোনিবেশ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি এই আত্মানুসন্ধানে যতই মনোনিবেশ করিতেন, অহঙ্কারে মত্ত থাকিয়া যে সকল বস্তু আপনার বলিয়া ভাবিতেন, তৎসমুদায় যতই পরিহার করিতে পারিতেন, এবং স্বীয় অচিরস্থায়ী বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া যতই অনন্ত আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন লাভে সমর্থ হইতেন, ততই নিয়ম, আচার, জাতি, ও বাহ্য ধর্ম্মের বন্ধন সকল তাঁহার নিকট বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিত। বেদজ্ঞান এখন তাঁহার নিকট সামান্য জ্ঞান বলিয়া বোধ হয়। যাগ যজ্ঞ সকল

বাধা স্বরূপ বলিয়া মনে হয় এবং প্রাচীন দেবতা (অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি) কেবল নাম মাত্র বলিয়া প্রতীত থাকে। তখন আত্মা ও ব্রাহ্মণ (অন্তরাত্মা ও বাহ্যাত্মা) কেবল এই দুইটী মাত্র থাকে। তখন সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ স্বপ্নের ন্যায় তিরোহিত হয়। তখন তোমার প্রকৃত আত্মা জীবাত্মায় মিশিয়া যায়।"

মোক্ষমূলারের এই উদ্ধৃত কথাগুলিতে ভগবদ্গীতার সারাংশ যেন প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে উপনিষৎ-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বানপ্রস্থের উপযোগী, তাহা কখন সাধারণ লোকের প্রতি উপযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং তাহা সাধারণ লোকের গ্রহণীয় হইতে পারে না। যতির পক্ষে যাহা অবলম্বনীয়, তাহা সংসারীর পক্ষে অবলম্বনীয় নহে। যদি হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে গিয়া আবার এই আর্য্যসমাজের চারি আশ্রমে বিভক্ত হওয়া সম্ভব হয়, তবে ভগবদ্গীতার উপদেশ গ্রহণীয় হইবার সম্ভাবনা আছে। নহিলে, তাহা কেবল দর্শনের ইতিহাস মাত্র হইয়া থাকিবে।

শ্রীপূর্ণ—

সমর শেখর।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শৈবী সেনা "জয় হর হর শঙ্কর!" রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই বিকট রণরব শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্ত আকাশে বিলীন হইবা মাত্র নারায়ণস্বামী উপত্যকার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, শত্রুসেনা অটল অচলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! তিনি বিস্মিত ও চমকিত হইলেন; তবে কি তিনটী কামান বৃথা গর্জ্জন করিল? পরক্ষণেই তিনি চক্রের উচ্চতম প্রাচীরের উপরিভাগে উত্থিত হইয়া স্থির দৃষ্টিতে উপত্যকার অভ্যন্তরে চাহিয়া দেখিলেন; তখনি তাঁহার বিশাল বিস্ফুরিত হইল, নিবিড় গুম্ফসমাচ্ছাদিত অধরে হাস্যবিভা বিকশিত হইল। "জয় হর শঙ্কর!" রবে তিনি উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন; তাঁহার শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ সেই প্রচণ্ড রণনাদ প্রতিধ্বনিত করিল এবং গুরুর সঙ্কেতানুসারে তখনই আর তিনটী কামান সজ্জিত করিয়া অনল সংযোগ করিল। শ্রবণ-ভৈরব রবে কামানত্রয় আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। নিবিড় ধূমপটলে পর্ব্বতপ্রদেশ সমাচ্ছন্ন হইল। নারায়ণস্বামী যে এইমাত্র উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন যে, অসংখ্য মৃত শত্রুসেনার পুরোভাগে অগণ্য সৈন্য সশস্ত্রভাবে দণ্ডায়মান। তিনি বুঝিতে

পারিলেন যে; ইহারা ইতিপূর্ব্বে পর্ব্বত-পার্শ্বে লুক্কায়িত ছিল; পুরোগত সহচর-দিগের অনেককে ভূপতিত দেখিয়া আপনারা তাহাদিগের স্থল অধিকার করিয়াছে।

নিবিড় ধূমরাশি অন্তর্হিত হইবা-মাত্র নারায়ণস্বামী দেখিলেন চারিজন ঠাকুরসৈন্য হত এবং পঞ্চজন আহত হইয়া প্রাকারতলে পতিত রহিয়াছে। মৃতদিগের অন্ত্যেষ্টিসৎকার এবং আহত-দিগকে চক্রমধ্যে অন্তরিত করিতে আদেশ প্রদান করিয়া তিনি কয়েকটী নির্ব্বাচিত সৈন্যের সহিত দুর্গদ্বার উন্মো-চন পূর্ব্বক পলায়মান শত্রু সৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। দ্বিতীয়-বারের শস্ত্রত্যাগে অধিকাংশ পর্ত্তুগিজ সৈন্য পতিত হওয়াতে তাহারা যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পূর্ব্বাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল। নারায়ণস্বামী স্বীয় সেনাদলকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একদলকে পশ্চাতে রাখিয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎ হইতে শত্রুসেনাকে আক্রমণ করিতে কহিলেন, অবশিষ্ট সেনাদল সমভিব্যাহারে একটী নিবিড় পর্ব্বতরন্ধ্র দিয়া অগ্রসর হইলেন; অভিপ্রায় যে, শত্রুদিগের সম্মুখে যাইয়া একবারে তাহাদের পথ অবরোধ করিবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। রন্ধ্রপথ হইতে বহির্গত হইয়াই একটী ক্ষীণা তটিনী উত্তরণ পূর্ব্বক তিনি একটী বিস্তৃত উপত্যকা মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন শত্রুগণ প্রাণপণে তদভিমুখে পলাইয়া আসিতেছে। অমনি তিনি স্বীয় সমভিব্যাহারী কতিপয় সৈনিককে লইয়া একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার ব্যূহ রচনা করিলেন এবং বন্দুক সজ্জিত করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে পলায়মান পর্ত্তুগিজগণ তাঁহাদের শস্ত্রসন্ধানের অধিগত হইয়া আসিল; তখন শৈবী সেনা অব্যর্থ সন্ধানে গুলি নিক্ষেপ করিল। অনেক শত্রু সৈন্য পতিত হইল; অনেকে বিভ্রান্ত হইয়া আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু হতভাগেরা কোথায় পলাইবে? পশ্চাৎ হইতে ঠাকুরগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন সেই অবশিষ্ট পর্ত্তুগিজসেনা চরম সাহসে নির্ভর করিয়া একবার প্রাণপণে আপনাদের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিতে কৃত-প্রতিজ্ঞ হইল। তাহাদিগের মধ্যে প্রায় আশীজন সৈন্য ছিল। সেই মুষ্টিমেয় যোধগণকে লইয়া পুর্ত্তুগিজ সেনাপতি একটী চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র ব্যূহ বিন্যাস পূর্ব্বক ঠাকুরদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিল। দেখিতে দেখিতে উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পর্ত্তুগিজগণ প্রকৃত বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত অনলগুলি প্রহারে অনেক শৈব বীর নিপতিত হইল; কিন্তু তাহাদের বারুদ ও গুলি অবশেষে ফুরাইয়া আসিল। তখন তাহারা ব্যূহ ভাঙ্গিয়া বন্দুক উদ্যত করিয়া বিকট

চীৎকার সহকারে ঠাকুর সেনার উপর আপতিত হইল। গুলিনিক্ষেপ নিষ্ফল হইবে বুঝিয়া শৈব বীরগণ নিকটাগত শত্রুদিগকে তরবারের সাহায্যে নিপাতিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইল। উন্মত্ত কয়েকটী পর্ত্তুগিজ বিকট সাহসের সহিত প্রাণত্যাগ করিল।

নারায়ণস্বামী মনে করিয়াছিলেন যে, বিনা শোণিতপাতেই সেই পলায়মান শত্রু সৈন্যদিগকে বন্দী করিবেন, কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য বিফল হইল। তাহারা প্রাণ থাকিতে তাঁহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল না। তখন তিনি, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা আহত, তাহাদিগকে মঠাভ্যন্তরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার আদেশ পালিত হইল।

নারায়ণস্বামী স্বয়ং হত ও আহত শত্রুদিগকে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি চমকিত ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন এবং একজন আহত যোধকে স্বহস্তে সযত্নে ধীরে ধীরে ক্রোড়ে তুলিয়া ত্বরিত হস্তে তাহার বর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া দিলেন। তাঁহার সেইরূপ উদ্বিগ্ন ভাব দর্শনে ঠাকুরগণ বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সকলেরই ইচ্ছা যে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কাহারও সাহস হইল না।

বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্রাদি উন্মোচিত হইলে নারায়ণস্বামী স্বহস্তে সেই যুবকের কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ তাহার বদনমণ্ডল হইতে অন্তরিত করিয়া সোদ্বেগে তাহার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ;—দেখিলেন তখনও সেই ব্যক্তি অচেতিত রহিয়াছে। তখন তিনি তাহাকে অতি সন্তর্পণে সুপ্ত শিশুবৎ স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিয়া সদলে মঠের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঠাকুরগণ আহত সমস্ত শত্রু সৈন্যকে যথাবিধানে বাহিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে গমন করিল।

কিয়ৎকাল মধ্যে নারায়ণস্বামী চক্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। যুদ্ধে জয়ী হইলেও তিনি ঠাকুরদিগকে জয়নাদ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সুতরাং নিরবে সকলে মঠে প্রবিষ্ট হইল।

শত্রুপক্ষীয় সেই আহত যোধের জন্য নারায়ণস্বামীর উদ্বেগ দেখিয়া শৈব বীরগণ বিস্মিত হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এ যুবক কে? কেনই বা নারায়ণ স্বামী ইহাকে এত যত্ন সহকারে লইয়া গেলেন? ইহার আকৃতিতে ইহাকে পর্ত্তুগিজ বলিয়া বোধ হইতেছে না। হিন্দু বলিয়াই কি হিন্দুমিত্র নারায়ণস্বামী ইহাকে এত যত্ন করিলেন? ঠাকুর সৈন্যগণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহারা সবিস্ময়ে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

নারায়ণস্বামী সেই আহত ও মূর্চ্ছিত হিন্দু যুবককে ক্রোড়ে লইয়া সদলে মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক অট্টালিকার অপর প্রান্তে গমন করিলেন। তথায় একটী নির্জ্জন গৃহমধ্যে একখানি সুখসেব্য পর্য্যঙ্কে তাহাকে শায়িত করিয়া কালোচিত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। প্রায় দণ্ডকাল পরে সেই আহত হিন্দু-যুবক উৎকট আর্ত্তনাদ সহকারে নয়ন উন্মীলন করিল এবং অন্যমনস্ক ভাবে গৃহের চতুর্দ্দিক একবার অবলোকন করিয়া "গি—রি—বা—লা!" এই নামটী অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করিলেন। নারায়ণস্বামী ইহাতে অণুমাত্র বিস্মিত হইলেন না; যেন তিনি পূর্ব্বে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সেই যুবক এই নাম উচ্চারণ করিবে। তিনি যুবকের চৈতন্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার চেষ্টা সফল হইল। যুবক বারত্রয় সেইরূপে নয়ন উন্মীলন ও অস্পষ্ট নাম উচ্চারণ করিয়া চতুর্থ বারে নারায়ণস্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "আপনি কে? কেন এ হতভাগ্যকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছেন?—ওহ! আমি বাঁচিব না!" আবার সেই বিকট মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ।

নারায়ণস্বামী সস্নেহে ধীরে ধীরে বলিলেন "কেন, বৎস! বাঁচিবে না কেন? বাঁচিবে বৈ কি। আঘাত সাংঘাতিক নহে।"

যুবক বিভ্রান্তভাবে বিস্ফারিত নয়নে একবার নারায়ণস্বামীর মুখপ্রতি চাহিল। যেন একবার তাঁহাকে চিনিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। পরক্ষণেই তাহার নয়নদ্বয় অর্দ্ধ-নিমীলিত হইয়া আসিল; তারকা ঊর্দ্ধগত হইল; সে দুই চারিটা অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিয়া আবার ক্ষীণস্বরে বলিল "গিরিবালা বাঁচিলাম না। তোমার স্বর্গীয় রূপরাশি—ক্ষমা করিও।"

নারায়ণস্বামী স্নেহসিক্ত স্বরে আবার ধীরে ধীরে বলিলেন "বৎস! অধীর হইও না; তুমি কি গিরিবালাকে দেখিতে চাও?—গিরিবালা কোথায় তুমি বল, আমি এখনই তাহাকে আনাইয়া তোমাকে দেখাইতেছি।"

যুবক আর্ত্তনাদ করিল "গিরিবালা কোথায়?—আমি পাষণ্ড, তাহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি।—সে এখন বন্দিনী।"

নারায়ণস্বামী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরিবালা বন্দিনী?—কোথায় বন্দিনী?"

যুবক একটী অস্পষ্ট হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া বলিল, "গিরিবালা গোয়ানগরে পর্ত্তুগিজ কারাগারে বন্দিনী। আমি তাহার দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। আমার কুচক্রে পড়িয়াই সরলা গিরিবালা বন্দিনী হইয়াছে।"

নারায়ণস্বামীর কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল; তিনি তখনি ধীরে ধীরে

জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেমন করিয়া গিরিবালাকে বন্দিনী করিলে?"

যুবক আর্ত্তস্বরে পুনর্ব্বার বলিল "সে বিস্তর কথা; সমস্ত বলিতে পারিব না, পারিলে সুখে মরিতে পারিতাম। আমি তাহার কাল;—উহ! না—না, সে আমার কাল;—আমি পতঙ্গ, তাহার রূপের অনলে পুড়িয়া মরিলাম; তাহার জন্যই আজি আমার এই দুর্দ্দশা তাহাকে পাইব ভাবিয়া আমি স্বদেশ ত্যাগ করিলাম; স্বজাতিকে ছাড়িলাম;—শেষে যবনের জন্য জন্মভূমির কোপানলে দগ্ধ হইলাম। হায়! আমি কুসন্তান; আমি ভারতমাতার অযোগ্য পুত্র। আমার মুখ তোমরা কেহই দেখিও না। ছাড়িয়া দাও—দাও—এখান হইতে চলিয়া যাও। আমি একাকী মরি। এ নারকীর মৃত্যুযন্ত্রণা কেহই দেখিওনা।—কৈ গিরিবালা! আমার নৈরাশ্যের আশা!—আমার পিপাসার বারি! আমার নয়নের জ্যোতি—অঙ্গের অমৃত! কৈ?—কোথা?—আমার জীবনদীপের প্রবল ঝটিকা! আমার নিদাঘের বিদ্যুৎ! একবার তোমার সেই মনোমোহিনী স্বর্গীয় মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে দাঁড়াও—নয়নে অমৃত ঢালিয়া দিয়া একবার দাঁড়াও!—উঃ! প্রাণ যায়।"

নারায়ণস্বামী দেখিলেন, তাহার মুখমণ্ডলের বর্ণ ক্রমে গভীরতর বিকৃত হইয়া আসিতেছে, নয়নদ্বয় কোটরলগ্ন হইয়া পড়িতেছে; নাসিকা ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। তিনি বুঝিলেন যুবকের প্রাণরক্ষার আর আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিয়া তিনি তাহাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! গিরিবালার কি উদ্ধার হইতে পারে না?"

"উদ্ধার!" যুবক আর্ত্তনাদ ত্যাগ করিয়া উন্মত্তবৎ হুঙ্কার সহকারে বলিল "উদ্ধার, আমার প্রেত আত্মা তাহার উদ্ধার সাধন করিবে।" পরক্ষণেই তাহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। যেন প্রবল ঝটিকা থামিয়া গেল;—যেন প্রকৃতি প্রলয়ের পর নবজীবনে জীবিত হইয়া উঠিল। যুবক যেন অতীত বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল "গিরিবালার উদ্ধার বলে হইবে না; কৌশলে হইবে। এখন তাহার প্রকৃত পরিচয় কেহই জানে না; সে যে কোথায় আছে; তাহাও কেহই জানে না। আমি তাহার কাল;—আমি পাষণ্ড তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি। তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এই অঙ্গুরীয়ক লও;—ছদ্মবেশে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া এই অঙ্গুরীয়ক যাহাকে দেখাইবে যদি সে ব্যক্তি তোমাকে যত্ন ও আদর করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে যাইবে। সে সমস্ত বলিয়া দিবে;—তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করিবে। সেই ব্যক্তির নিকট এইরূপ আর একটী অঙ্গুরীয়ক আছে। সে

তোমাকে তাহা দেখাইবে। তাহা হইলেই সব হইবে।—গিরিবালা—গিরিবালাকে উদ্ধার করিয়া সতীশ—উঃ! সতীশকে প্রদান করিও।” এই বলিয়া সেই যুবক একবার স্থির নয়নে নারায়ণস্বামীর মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল;—চিনিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু চিনিতে পারিল না; তখন ধীর বচনে জিজ্ঞাসা করিল—“আপনি কে? অন্তিমকালে একবার আপনার পরিচয় জানিয়া মরিতে পারিলে ভাল হয়।”

নারায়ণস্বামীর নয়ন হইতে দুইটী অশ্রুবিন্দু অলক্ষিতভাবে সেই যুবকের বদনমণ্ডলে পতিত হইল; সে চমকিত হইয়া সবিস্ময়ে নারায়ণস্বামীর মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিল—নারায়ণস্বামী রোদন করিতেছেন।

যুবক বিস্মিত হইল,—একবার কাঁদিল—কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল,—“আপনি কে? কাঁদিতেছেন কেন?”

নারায়ণস্বামী আর থাকিতে পারিলেন না; সেই যুবকের হৃদয়ে শোকোন্মত্তবৎ মুখ রাখিয়া রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন “রমেশরে আমি তোর জ্যেষ্ঠতাত!”

রমেশ বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল! অমনি তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

রাধানাথ শিকদার।

তৃতীয় প্রস্তাব।

যে পথে রাধানাথের প্রতিভা দেদীপ্যমান হইয়াছিল কালেজ ত্যাগ করিয়া তিনি সেই পথের পথিক হইলেন। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে ২০ ডিসেম্বর তিনি Great Trigonometrical Survey বিভাগের গণনা (Computing) আফিসে প্রবিষ্ট হন। ডাক্তার টিটলার সাহেবের নিকট কর্ণেল এভারেষ্ট গণিতজ্ঞ ও সুচতুর জনৈক যুবক চাহিয়া পাঠান, টিটলার সাহেব তদনুসারে রাধানাথকে কর্ণেল সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কর্ণেল এভারেষ্ট ৩০ টাকা বেতনে তাঁহাকে আফিসে শিক্ষানবিশের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সে আমলে কোম্পানির কর্ম্মচারীরা অধিক বেতন পাইতেন না; এখনকার অপেক্ষা তখন জিনিষ পত্র অনেক শস্তা ছিল; অল্প বেতনে সম্মানের সহিত কাল কাটিত। তখনকার সাহেবরা এদেশীয়দিগের সহিত মিশিতেন ও এদেশীয় আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন। তখন সহজে বিলাত যাওয়া যাইত না, ছয় মাস ধরিয়া জাহাজে থাকিতে হইত ও যাইবার ও আসিবার বড় কষ্ট ছিল। এক্ষণে পূজার ছুটীতে

আদালতের কর্ম্মচারীরা বিলাত বেড়াইয়া আসেন। এক্ষণে সকল প্রকার কর্ম্মেই অধিক বেতনের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, তাহাদের আয় এদেশীয়দিগের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। সে কালে কলেজের অধ্যক্ষেরা অতি অল্প বেতন পাইতেন, তাঁহাদিগকে সেই অনুসারে চলিতে হইত। ছাত্রদিগের সহিত তাঁহারা আমোদ আহ্লাদে কাল কাটাইতেন, কলেজে ও কলেজের বাহিরে দেশীয় ছাত্রগণ তাঁহাদের সহচর ও পরম বন্ধুর ন্যায় বেড়াইতেন। সময়ের গুণে সে দিন লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে কলেজের অধ্যাপকগণ শ্রেণীর বাহিরে, ছাত্রগণকে আর চিনিতে পারেন না। বিদ্যালয়েই এইরূপ, কার্য্যক্ষেত্রে যে কি হয় তাহা বলিবার আবশ্যক নাই।

গ্রেট ট্রিগনমেট্রিকেল সারভে দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল। (১) জরিপ বিভাগ; (২) গণনা বিভাগ। জরিপ-বিভাগের কর্ম্মচারীরা অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থান পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক জরিপ করিয়া গণনা বিভাগে পাঠাইতেন, তাহার কর্ম্মচারিগণ গণনা ঠিক হইয়াছে কি না দেখিতেন। এই বিভাগের সকল কর্ম্মচারীর গণিতে পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। সারবেয়ার জেনারল, ডেপুটী সারবেয়ার জেনারল, প্রিন্সিপাল এসিষ্টাণ্ট, চিফ কম্পিউটর প্রভৃতি উপাধিধারী কর্ম্মচারিগণ ইহার প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই সৈনিক কার্য্যে এ দেশে আসিয়া পরে গণিতশাস্ত্রে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে এই বিভাগে প্রবিষ্ট হইতে পারিতেন। এ দেশীয় ব্যক্তিগণের অঙ্কশাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়া এই বিভাগে প্রবিষ্ট হইবার কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। অল্পসংখ্যক ফিরিঙ্গি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে এদেশবাসিগণের এ বিভাগে প্রবেশ নিষেধ। লর্ড রিপনমহোদয় ভারতত্যাগের কয়েক দিবস পূর্ব্বে এদেশীয় লোকদিগকে সর্ব্বে বিভাগে প্রবিষ্ট হইবার অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কি করিবেন বলা যায় না। দেশীয়গণ যে সর্ব্বে বিভাগে কর্ম্ম পাইবেন না এতকাল কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। (১) ১৮০২ খৃঃ হইতে ১৮৮৪ খৃঃ পর্য্যন্ত কেবল দুইটি ভারতবাসী এই বিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একজন সৈয়দ মোসিন, অপর জনের নাম

(১) In certain very exceptional circumstances educated natives have been appointed to some of the grades of Subordinate officers just specified; and they have subsequently risen to higher positions; but of late years their employment in the field operation and observation has been discontinued. But they have been largely employed in the computing office at the head-quarters of the Survey.—The Survey establishment, G. T. S. of India Vol II.

রাধানাথ। যে বিভাগে চুইজন ভারতবাসী এত যোগ্যতা ও সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছেন, সেই বিভাগের দ্বার ভারতবাসিগণের পক্ষে রুদ্ধ কেন? তাঁহারা সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া শরীর পাত করিয়া কোম্পানীর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই পাপেই কি তাঁহাদের দেশস্থ ব্যক্তিগণকে আর উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হয় না? রাধানাথের সমকালে দুই চারিজন এদেশীয় লোক এই বিভাগে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র পর্য্যন্ত না যাইয়াই কর্ম্মত্যাগ করেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অঙ্গের শিথিলতা জন্মিত ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জলবায়ু সকলের শরীরে সহ্য হইত না। এমন কি অনেক ইয়ুরোপীয়ের লোহার শরীরও ভগ্ন হইয়া তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

এস্থলে সৈয়দ মোসিনের উল্লেখ না করিলে এ প্রস্তাব অসম্পূর্ণ থাকে। তিনি ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে সর্ভে বিভাগে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৪০ খৃঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বৈজ্ঞানিক যন্ত্রনির্ম্মাতার পদে নিযুক্ত হন। ইহাঁর ন্যায় শিল্পকৌশলসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি অল্প লেখা পড়া জানিতেন। পারস্য ভাষা জানিতেন ও সহজ সহজ ইংরাজি কথা বুঝিতে পারিতেন। কর্ণেল এভারেষ্ট ইহাঁরও পদোন্নতি বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কর্ণেল সাহেব জগতে যে সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের স্রষ্টা বলিয়া খ্যাত, তাহার সকল গুলিই সৈয়দ মোসিনের অসাধারণ ধীশক্তির ফল (২)। সায়দ মোসিন

(২) And I must do that artist the justice to say that for excellence of workmanship, accuracy of division, steadiness, regularity, and glibness of motion, and the general neatness, elegance and nice fitting of all its parts, not only were my expectations exceeded, but I really think it is as a whole as unrivalled in the world as it is unique.

When the Azimuth circle came to hand there were many defects about it which required to be remedied, and which but for my having at my elbow Syed Mohsin I should have been very much at a loss to rectify.—Introduction to Everest's measurement of the Meridional Arc of India, page XXXIX.

All these arrangements which I have just mentioned, whether as regards the large Theodolite, Sight Vanes, or lamps, were made whilst the measurement of the base-line was in progress; and it is to my native artist Syed Mohsin, that I am chiefly indebted for the felicitous issue of my plans. I consulted all books in the libraries of myself or my friends and sought for information in all likely quarters to which I had access, but in vain; for I could nowhere obtain data to guide me regarding friction rollers or Argand's lamps, so that I was left entirely to my own resources and unless I had a person like Syed Mohsin at hand as able to enter into my ideas, as

আর্কেটবাসী। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে কর্ণেল এভারেষ্ট কলিকাতায় আসার পর তাঁহার সহিত ইহাঁর আলাপ হয় এবং কর্ণেল সাহেব ইহাঁকে সাহায্য করিয়া উন্নতি-সোপানে আরোহণ করান (৩)। কর্ণেল সাহেব দুইটি অসাধারণ লোকের শিক্ষক ও উপদেষ্টা। তাঁহার উপদেশ ব্যতীত রাধানাথ ও সৈয়দ মোসিন কখন এতদূর উন্নত হইতেন না। আর এক্ষণকার কয়টি সাহেবকে কর্ণেল এভারেষ্টের ন্যায় উদার দেখা যায়! কয়জন ইংরাজ নেটিভের নিকট সাহায্য পাইয়া স্বীকার করেন?

রাধানাথই প্রথম বাঙ্গালি যিনি সর্ভে বিভাগে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার পেন্সন্ গ্রহণের পর আর কোন দেশীয় লোক ইহার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন নাই। ত্রিকোণমিতি সূত্রানুযায়ী জরীপ সম্পন্ন করিতে কোম্পানীর প্রভূত অর্থব্যয় হয়। একটি সরভে পার্টির সহিত আনুষঙ্গিক লোক, তাম্বু, সিপাহী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রভৃতি অনেক থাকিত। তাহাদের এক এক দল যথায় ছাউনি করিত, সেই স্থান একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বলিয়া অনুমিত হইত। যখন রাধানাথ এই বিভাগে প্রবিষ্ট হন তখন জরিপ করিবার অনেক প্রথা অনাবিষ্কৃত ছিল। দেশের অবস্থাও অতি অল্পই জানা ছিল। যে যে কারণে গণনা ভুল হইত সে সকলও অজ্ঞাত ছিল। সে আমলে জরিপ করিতে যে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইত তাহা কর্ণেল এভারেষ্টের সুবৃহৎ গ্রন্থে বিশেষ করিয়া লেখা আছে (৪)। বরফ, হিম, জল, কাদা, বৃষ্টি ভোগ করিয়া ও রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে কয়জন লোক কাজ করিতে পারে!

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে ত্রিকোণমিতি সূত্রানুযায়ী জরীপ (Trigonometrical Survey) কি? একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান ঠিক করিয়া যেন

willing to co-operate with me and give efficiency to my schemes, it is hardly to be expected that amidst so many calls on my time to distract me I should ever have been able to give them a fair trial.—Ibid Page cxvi.

(৩) Syed Mohsin is a native of Arcot. I found him on my arrival in Calcutta in 1830, and perceiving that he was a person of great original talent I took him by the hand and did all in my power to develope his natural genius. He was appointed to succeed Mr. Barrow, and is now Mathematical Instrumentmaker to the Hon. East India Company in India.—Ibid Page cxxii.

(৪) The rainy season being the only period of the year at which the atmosphere in India (generally speaking) admits of steady intersection of distant opaque objects, the standing order of the late Lieutenant-Colonel Lambton to me, his chief assistant, and his other subordinates was to wait till the first heavy fall of rain and then take the field. It is easy to conceive, what a reckless waste of life and health was caused by this exposure to the pitiless pelting of the tropical rains, in

কুসুম।

১

কুসুম! তোমারে যখনি নিরখি
তখনিরে তুমি মাধুরীময়ী।
অধরে তোমার রাখি আঁখি দুটি
সুধার সাগরে মগন হই॥
শূন্য ধরি বুকে, ভাস যেন সুখে
জগত তোমার নয়নে ছায়।
এত শোভা পর এত সুধা ধর
এতই বিভোর প্রণয়ে কার॥
বুকে খোল বাস মুখে তোল হাস
সুবাসে হাসিটি জড়ায়ে যায়।
মুকুলে মাধুরী মাধুরী ফুটনে
ফুটনে মাধুরী উথলে তায়॥
কার নহ যদি, দেহ অনুমতি
চিরদিন তরে তোমারি হই।
না চাহি ছুঁইতে না চাহি পরিতে
দূরে হ'তে প্রাণ মিশায়ে রই॥

২

আশার কাননে ছিল রে আমার
একটি কুসুম তোমারি মত।
অঙ্কুরে উঠিয়া মুকুলে ফাটিয়া
ফুটিয়া পড়িল পাপড়ি যত॥
দুটি আঁখি ভরি, তাহার মাধুরী
ঝরিয়া পড়িত আমার বুকে।
জগত ফেলিয়ে সেই ফুল ল'য়ে
রহিতাম আমি সদাই সুখে॥
মিটাইত ক্ষুধা পাড়াইত ঘুম
সকলি আমার ছিল সে ফুলে।
ম্লান হয় পাছে যেতাম না কাছে
পরশ আঘ্রাণ ছিলাম ভুলে॥
হেরি সে মাধুরী নিঠুর জনেক
আমার সে ফুল লইল লুটি।
তদবধি যেন সবি শূন্যময়
দিশেহারা এই নয়ন দুটি॥

৩

সে মাধুরী আজো আছে চোখে আঁকা
সুধা তার আজো মাখান বুকে।
ছায়াটি তাহার জড়ায়ে হৃদয়ে
ভ্রমিয়া বেড়াই এখনো সুখে॥
তারি মত বেশ কুসুম! তোমার
সেই হাসি টুকু অধরে পর।
তেমতি অকূল সুধার সাগরে
কুসুম! তুমিও হৃদয়ে ধর॥
খুলে বল দেখি তুমি সেই নাকি
সে বিনে এ শোভা কাহারো নাই।
জগত ভ্রমিয়ে দেখে'ছি খুঁজিয়ে
কোথাও না এত মাধুরী পাই॥
বল ত্বরা করি ধরিতে না পারি
উথলে পরাণ হৃদয় তুড়ে।
চাহি না ছুঁইতে চাহি না পড়িতে
ঢেলে দিব প্রাণ দাঁড়া'য়ে দূরে॥

৪

কহিল কুসুম "একি তব ভ্রম!
সরম না হয় কা'রে কি কও।
আর কোথা যাও যদি দেখা পাও
আমি ছিনু যার তুমি সে নও॥
প্রাণ দিনু যায় হারায়েছি তায়
সে আমার আর আপন নয়।
পেয়েছে সে ব্যথা, সে কি আসে হেথা
অভিমান তার হৃদয়ময়॥

বুক করি খালি দিনু সুধা ঢালি
হৃদয়ের মম পাঁজর খুলে।
মম ভাগ্যদোষে পর হ'য়ে শেষে
সে আমারে আজ রহিল ভুলে॥
ছায়াটি ফেলিয়ে সে গেল চলিয়ে
হৃদয়ে সে ছবি রহিল আঁকা।
সে ছায়া মুছিতে হৃদি পরশিতে
দলে দলে ছবি হইল মাখা॥"

৫

"তাহারি হইয়ে জনমিনু আমি
তাহারি হইয়ে অঙ্কুর ধরি।
তাহারি হইয়ে মুকুল হইনু
তাহারি হইয়ে ফুটিয়া পড়ি॥
দিবস যামিনী করি তারি ধ্যান
রেখেছি এ প্রাণ তাহারি তরে।
কভু যদি তার দেখা পাই পুন
তাহারি সমুখে পড়িব ঝোরে॥
দেখিতে না পাই নাইবা দেখিনু
দেখিলে কি তার অধিক সুখ।
জগত ভরিয়ে আছে সে আমার
আছে সে আমার ভরিয়ে বুক॥
প্রখর নিদাঘ দারুণ বরিষা
হৃদয়ে আমার লুটিয়া পড়ে।
তথাপি এ প্রাণ কোমল করিয়ে
রাখিয়া দিয়াছি তাহারি তরে॥"

৬

"তুমি কোন ছার তুলনায় তার
লাজ নাহি হয় প্রণয় চাও।
চরণের তলে জগত ঢালিলে
এ প্রাণ আমার তবু না পাও॥
তুমি সেই যদি কোথা সে প্রকৃতি
কোথা সে বদন—সে আঁখি কই।
কোথা সে বরণ কোথা সে গঠন
কোথা সে মূরতি ভুবনজই॥
সে নহ রে তুমি সেও নহি আমি
প্রেম আলাপন আমারে কেন।
চিনিতে না পার কে ছিল তোমার
নাহি কোন জ্ঞান পাগল যেন॥"
"পাগলি করিয়ে কুসুম আমারে
নিঠুর তোমায় এনেছে তুলি।
চিনেছিরে আমি সেই বটে তুমি
আপনি গিয়াছ আমারে ভুলি॥"

৭

নিকটে সরিয়ে হৃদয় চিরিয়ে
দাঁড়াইল যুবা "নেহার" বলি।
হেরি সে হৃদয় কুসুম অমনি
যুবার হৃদয়ে পড়িল ঢলি॥

ঈশান।

পাণ্ডবগণের সময় ও সংক্ষিপ্ত জীবনী।

এক্ষণে আমরা পাণ্ডব-গণের জীবনী সম্বন্ধে কেবলমাত্র স্থূল স্থূল ঘটনাগুলিরই উল্লেখ করিব। কারণ, মহাভারতে তাঁহাদিগের জীবনগত আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই অতি বিশদ ও বিস্তৃত রূপে বিবৃত রহিয়াছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমাদিগের লিখিতব্য বিষয় অতি অল্পই আছে।

কৌরব ও পাণ্ডব বংশের আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনে মহাভারতই একমাত্র প্রমাণক গ্রন্থ। বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমসাময়িক ছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগের সমুদায় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াই মহাভারতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কথিত আছে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বৎসরে এই সুবিস্তৃত লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারতখানি রচনা করেন।* পরে, মহর্ষির সুমন্ত, জৈমিনী, পৈল, শুক ও বৈশম্পায়ন নামক শিষ্যগণের মধ্যে সুবক্তা বৈশম্পায়ন, গুরুর আদেশানুসারে পরীক্ষিৎতনয় রাজা জনমেজয়কে এই মহাভারত গ্রন্থ শ্রবণ করান।

কোন সময় মহারাজ পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী মহিষীদ্বয় সমভিব্যাহারে হিমালয়ের প্রত্যন্তপর্ব্বতস্থ কোন রমণীয় অরণ্যে মুনিগণ-সমাবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন। ঐকালে জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তী গর্ভবতী হন। পরে কার্ত্তিক মাসের ১৬ই তারিখ, সোমবার, ধনুরাশি, শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়, মহিষী কুন্তী প্রতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠিরকে প্রসব করেন।† (কল্যব্দ ৬৫৩, ২৫২৬ শকাব্দ পূঃ, ২৩৯১ সংবৎ পূঃ, ২৪৪৮ খৃঃ পূঃ) ক্রমে কুন্তীর গর্ভে ভীম, তৎপরে অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব যুগপৎ জন্মগ্রহণ করেন।

ইহাঁরা সকলেই প্রায় এক এক বৎসর পরে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন।* কথিত আছে, যে দিবস মহাবল ভীমসেন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন সেই দিবসেই গান্ধারী দুর্য্যোধনকে প্রসব করেন।† এইরূপে মহারাজ পাণ্ডু কিছুকাল সেই সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন দেবোপম পুত্রগণের লালনপালনজনিত পরমানন্দসন্দোহ উপভোগ করিয়া অবশেষে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ করাল কালকবলে নিপতিত হইলেন। মাদ্রী যমজ পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া ভর্ত্তৃচিতা আরোহণ পূর্ব্বক, পরলোকে স্বামীসহ সঙ্গতা হন।

অনন্তর সমাতৃক পাণ্ডবগণ মুনিগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরীতে সমাগত হইলেন। অন্ধ নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন কিন্তু যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, সপ্তদশ দিবস হইল

---

*ত্রিভির্ব্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমদ্ভুতম্॥
—৫০ শ্লোক, ৬২ অ, আদিপর্ব্ব।

† ৬ শ্লোঃ, ১২৩ অঃ, আদিপর্ব্ব।

* অনুসম্বৎসরং জাতা অপি তে কুরুসত্তমাঃ।
পাণ্ডুপুত্রা ব্যরাজন্ত পঞ্চসম্বৎসরা ইব॥
—২১,১২৪, আদিপঃ।

† যস্মিন্নহনি দুর্দ্ধর্ষো জজ্ঞে দুর্য্যোধনস্তদা।
তস্মিন্নেব মহাবাহুর্জজ্ঞে ভীমোপি বীর্য্যবান্॥

পাণ্ডুনৃপতি পরলোক গমন করিয়াছেন তখন তাঁহার আর শোকের ইয়ত্তা থাকিল না, ভ্রাতৃবিয়োগে তিনি একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। পৌরগণ দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত অতীব শোকসন্তাপে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

তদনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্বাদশাহান্তে ভ্রাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ মহা সমারোহে সমাধান করিয়া স্বীয় তনয়গণ ও পাণ্ডুনন্দনগণকে বিদ্যাধ্যয়নার্থ গুরুসমীপে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা অচিরকাল মধ্যেই বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, অর্থশাস্ত্র, ও নীতিশাস্ত্রাদিতে সুপারগ হইয়া উঠিলেন। ধনুর্ব্বেদে দ্রোণাচার্য্যই কৌরব ও পাণ্ডবগণের শিক্ষাগুরু ছিলেন। ধনুর্ব্বেদে সকলেই সুপারগ হইলেও ভীম এবং দুর্যোধন গদাযুদ্ধে, অশ্বত্থামা রহস্যভেদে, নকুলসহদেব খড়্গযুদ্ধে, যুধিষ্ঠির রথে এবং অর্জ্জুন সমুদায় বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিলেন।

ভীমের উপর দুর্য্যোধনের জাতক্রোধ ছিল, সে শৈশবকাল হইতেই ভীমকে হিংসা করিত, এমন কি সে কতবার তাঁহার প্রাণও বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এক্ষণে আবার পাণ্ডবগণের গুণগ্রাম অবলোকনে, বিশেষতঃ অস্ত্রশিক্ষাপ্রদর্শনী সভায় তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রতাপ ও প্রভাব দর্শনে, প্রমুগ্ধ ও নিতান্ত আসক্ত পৌর ও জানপদবর্গের মুখে পাণ্ডবগণের ধন্যবাদ ও প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া ঈর্ষ্যা-কলুষিত-হৃদয় দুর্য্যোধনের চিন্তা ও মনস্তাপের আর সীমা থাকিল না। তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি পিতার বিদ্বেষভাব জন্মাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের প্ররোচনাবাক্যে বিমোহিত হন নাই। কিন্তু শেষে তাঁহাকে পুত্রের নানাবিধ-বাক্যজালে জড়িত ও একান্ত বিমোহিত-চিত্ত হইয়া অগত্যা কিয়ৎকালের জন্য বারণাবত নগরে পাণ্ডবগণের বাসার্থ অনুমতি প্রদান করিতে হইয়াছিল। পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠতাতের আদেশানুসারে মাতৃসমভিব্যাহারে বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের প্রস্থানের কিয়ৎদিবস পূর্ব্বেই দুষ্টমতি দুর্যোধন পুরোচন নামক জনৈক যবন (গ্রীস্‌-দেশীয়) মন্ত্রীকে বারণাবত নগরে পাণ্ডবগণের বিনাশসাধনার্থ জতুময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুরোচনও প্রভুর আদেশানুরূপ গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় পাণ্ডবগণের অপেক্ষা করিতেছিল। যৎকালে পাণ্ডবেরা বারণাবত নগরে যাত্রা করেন সেই সময় মহামতি বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে দুর্য্যোধনের দুষ্টাভিসন্ধি সকল বলিয়া দেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা ফাল্গুন মাসের ৮ই তারিখে বারণাবত নগরে উপস্থিত হইয়া নাগরিকগণের সহিত আলাপ সম্ভাষণাদি করিতে লাগিলেন। নগরবাসিগণ দশ দিবস পর্য্যন্ত নানাবিধ ভবনে পাণ্ডবগণের যথোচিত সম্মান ও পরিচর্য্যাদি

করিলে পর পুরোচন তাঁহাদিগকে বিবিধভোগবিলাসসম্পন্ন সেই জতুনির্ম্মিত গৃহে বাসার্থ লইয়া গেল। বিদুরোপদিষ্ট পাণ্ডবগণ বিশ্বস্তের ন্যায় পুরোচনের আহ্লাদ সংবর্দ্ধন পূর্ব্বক সাবহিতচিত্তে একবৎসরকাল সেই ভবনে বাস করিলেন। পরে একদা সমাতৃক পাণ্ডবগণ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী নিশায় অগ্রে পুরোচনগৃহদ্বারে এবং পশ্চাৎ সমস্ত ভবনে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক বিদুর-প্রেষিত-খনক-নির্ম্মিত সুরঙ্গপথে প্রস্থান করত তৎপ্রেরিত যন্ত্রচালিত নৌকায় (বাষ্পীয় নৌকা) গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন।

এক্ষণে আমরা একটী বিষয় না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। বারণাবত নগর হইতে পলায়নকালে ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক যে একটী লোমহর্ষণ ব্যাপার সম্পাদিত হয়, যত দিন এই জগতে সত্যের সমাদর থাকিবে, যত দিন ধর্ম্ম বলিয়া কোন বস্তু লোকে বিশ্বাস করিবে, যত দিন লোকে আর্য্যধর্ম্মের উচ্চ ধর্ম্মনীতি বিষয়ক উপদেশনিচয় উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, তত দিন তাঁহার এই নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা-জনিত দুরপনেয় কলঙ্ক মানব-হৃদয়ে বজ্রলেপের ন্যায় অঙ্কিত থাকিবে। যে রাত্রিতে পাণ্ডবগণ জতুময় গৃহ হইতে প্রস্থান করেন ঐ দিবস পাণ্ডব-জননী কুন্তী একটী ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণাদিভোজনের পর এক নিষাদ-পত্নী অন্নার্থিনী হইয়া তাহার পঞ্চ পুত্র সমভিব্যাহারে ঐ ভবনে সমাগত হয়। যুধিষ্ঠির স্বীয় দুরভিসন্ধিসাধনের উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত দেখিয়া সেই নিষাদ-পত্নী ও তাহার পুত্রগণকে প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করান। অনন্তর তাহারা মদিরাপানে হত-চেতন হইয়া গৃহমধ্যে ধরাশায়ী হইলে সেই গৃহে অগ্নি প্রদান করাইয়াছিলেন !!!

এই লোমহর্ষণ ব্যাপারটী যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাতসারে ঘটে নাই। কারণ, একদা তিনি মাতৃ-সমীপে পাণ্ডবগণের সমক্ষে বলিয়াছিলেন যে, "আমরা অস্ত্রাগার ও পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া এবং এই ভবনে (ভস্মাবশিষ্ট) ছয়টী প্রাণীর দেহ রাখিয়া অন্যের অলক্ষিতভাবে পলায়ন করিব"।*

ধন্য যুধিষ্ঠির! তোমার কূটরাজনীতি (Policy) ম্লেচ্ছের রাজনীতিকে পরাজয় করিয়াছে। সত্য বটে, তুমি এই ভীষণ কার্য্যের দ্বারা কৌরবগণের বিশেষতঃ তোমার চিরশত্রু দুর্য্যোধনের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে; ইহা সত্য যে, ভস্মাবশেষিত সেই ছয়টী নরদেহদর্শনে ভস্মীভূত সমাতৃক পাণ্ডবগণের দেহ বিবেচনায়

---

* আয়ুধাগারমাদীপ্য দগ্ধ্বা চৈব পুরোচনং।
ষট্ প্রাণিনো নিধায়েহ দ্রবামোঽনভিলক্ষিতাঃ॥
—৪।১৪৯। আদিপঃ।

পৌর জানপদবর্গ দুর্য্যোধনের প্রতি একেবারে বীতানুরাগ হইয়াছিল; তুমিও আবার অনুপক্রুত ও অননুসৃতভাবে স্বচ্ছন্দে বিচরণ পূর্ব্বক স্বাভীষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার সেই "হত ইতি গজঃ" কলঙ্ক হইতেও সহস্রগুণে বৃহত্তর কালিমাময় দুরপনেয় এই কলঙ্ক কখনই জনচিত্ত হইতে অপনীত হইবে না। তোমার পক্ষপাতী বেদব্যাস মহাশয়ের লিখাই তোমার এই দুষ্কর্ম্মের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে।

অতঃপর পাণ্ডব-গণ এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় মহাবল ভীমসেন হিড়িম্ব নামক এক নর-শোণিত-লোলুপ অসভ্যজনাধিপকে বধ করতঃ তৎ-সহোদরা হিড়িম্বার প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়া কিছুকাল তাহার সহিত বিহার করিয়া ভ্রাতৃ-গণসমীপে সমাগত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা জটাবল্কলধারী হইয়া তপস্বি-বেশে এক-চক্রা (এইক্ষণ রাঢ়দেশে 'এক চাকা') নগরে গমন পূর্ব্বক তথায় এক ব্রাহ্মণ-ভবনে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ঐ নগরে মহাবল ভীম সেই ব্রাহ্মণের উপকারার্থ নর-শোণিত-লোলুপ বক নামক এক অসভ্য নরপতিকে বধ করেন। পরে পাণ্ডবগণ পঞ্চালদেশে দ্রুপদরাজ-তনয়া দৌপদীর স্বয়ম্বর-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দ্রুপদরাজধানী কাম্পিল্য নগরে গমন করিয়াছিলেন। স্বয়ম্বর-সভায় অর্জুন মৎস্যচক্র ভেদ করিয়া যুদ্ধে রাজন্যবর্গকে পরাজয় পূর্ব্বক অলোক-সামান্যা রূপলাবণ্যবতী দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে জননীর আদেশানুসারে পঞ্চ ভ্রাতাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান-কালীয় সমাজিক রীতি, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি হইতে মহাভারতোক্তকালীন রীত্যাদি সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল, সুতরাং তৎকালে ইচ্ছা করিলে পঞ্চ ভ্রাতা মিলিয়া এক স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিত; তাহাতে কোন দোষ হইত না। শুনিতে পাই ইদানীন্তন কালেও তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে এরূপ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে।

স্বয়ম্বর পর্ব্বের এক স্থানে দ্রৌপদী অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার রূপাদির যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সময়ে পাণ্ডবগণ সম্পূর্ণ যৌবন দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।*

অনন্তর পাণ্ডবগণ এক বৎসর দ্রুপদ-ভবনে মহাসুখে বাস করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে আতৃসমভি-ব্যাহারে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।† তাঁহারা বৃদ্ধ নরপতি

* অয়ং শ্যামো মহাবাহুঃ সিংহস্কন্ধো মহাদ্যুতিঃ।
কম্বুগ্রীবঃ পুষ্করাক্ষো ভর্ত্তাযুক্তো ভবেন্মম॥
—১৮। ১৪৩। আদিপঃ।

† তে তত্র দ্রৌপদীং লব্ধা পরিসংবৎ-সরোষিতাঃ।
বিদিতা হাস্তিনপুরং প্রত্যাজগ্মুররিন্দমাঃ॥
—৩০।৬১, আদিপঃ।

ধৃতরাষ্ট্রের অধীনে থাকিয়া বাহুবল দ্বারা অন্যান্য নৃপতিবর্গকে বশীভূত করিয়া বহুকাল যাবৎ তথায় বাস করেন।* পরে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ দুর্য্যোধন-মায়া-মোহিত জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে ইন্দ্রপ্রস্থে (পুরাতন দিল্লি) রাজধানী স্থাপন করত তাঁহার বয়সের ৭৪ বৎসর পর্য্যন্ত খাণ্ডবপ্রস্থাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিয়া পরিশেষে রাজসূয়নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।† তাহা হইলে কলির ৭২৭ বৎসর গতে, ২৪৫২ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩১৭ সংবৎ পূর্ব্বে, এবং ২৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে এই মহাযজ্ঞটী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির আহূত হইয়া হস্তীনায় সপরিবারে আগমন পূর্ব্বক দুষ্টমতি দুর্য্যোধনের সহিত অক্ষ-ক্রীড়ায় পণে পরাজিত হইয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সহ দ্বাদশবর্ষ বনবাসে এবং এক বৎসর বিরাট-নগরে অজ্ঞাতবাসে কাল যাপন করিয়াছিলেন। পরে, চতুর্দ্দশ বর্ষে রাজ্যাংশ পাইবার প্রার্থনা করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির চেষ্টা বিফলিত হওয়ায় যুদ্ধের উদ্যোগাদি করিতেও প্রায় এক বৎসর কাল গত হয়, পরে কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে (এক্ষণে ত্রাণেশ্বর বা স্থানেশ্বর এবং তৎপ্রদেশীয় মরুদেশ) কুরুপাণ্ডবীয় মহাযুদ্ধ হইয়াছিল।‡

এই মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষস্থ হিন্দুরাজগণ এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় যবন ও ম্লেচ্ছ রাজগণ যুদ্ধের সাহায্যার্থ সসৈন্যে সমাগত হইয়া স্বীয় স্বীয় সুহৃৎপক্ষাবলম্বন করিলে পাণ্ডবদলে সপ্ত অক্ষৌহিণী এবং কৌরবদলে একাদশ অক্ষৌহিণী সমুদায়ে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী § সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল।

* তত্র তে ন্যবসন্ পার্থাঃ সংবৎসরগণান্ বহূন্।
বশে শস্ত্রপ্রতাপেন কুর্ব্বন্তোঽন্যা মহীভৃতঃ ॥
—৩৪।৬১। আদিপঃ।

† শুবন বৃত্তান্ত ৪৮ পৃ।

‡ ততোঽক্ষৈর্বঞ্চয়িত্বাচ সৌবলেন যুধিষ্ঠিরং ।
বনং প্রস্থাপয়ামাস সপ্ত বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥
অজ্ঞাতমেকং রাষ্ট্রে চ ততো বর্ষং ত্রয়োদশং ॥
—৪৯,৬১ আদিপঃ।

ততশ্চতুর্দ্দশে বর্ষে যাচমানাঃ স্বকং বসু।
নালভন্ত মহারাজ! ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥
—৫৪,৬১। আদিপঃ।

§ একেভৈকরথাত্র্যশ্বাপত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা।
পত্ত্যঙ্গৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরং।
সেনামুখং গুল্মগণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী দশানীকিন্যক্ষৌহিণ্যথ সম্পদি ॥—ইত্যমরঃ।

এই মহাযুদ্ধটি অগ্রহাণে মাসে প্রথম দিবস হইতে নিরবচ্ছিন্ন অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত চলিয়া ভারতের গৌরব, শৌর্য্য, বীর্য্য, মান ও ধনের সহিত নিঃশেষিত হইয়া যায়। যুদ্ধে পাণ্ডবগণ জয়লাভ করেন। উভয় পক্ষের সমুদায় সেনানী ও সৈন্য নিহত হইলে পাণ্ডবদলে সাত (পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি) এবং কৌরবদলে তিন জন মাত্র (কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা) জীবিত ছিলেন। ফলতঃ এই মহাসমরের পর ভারতে প্রকৃত ক্ষত্রধর্ম্মবিশিষ্ট কোন রাজাই ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

রাজা যুধিষ্ঠির লোকপ্রিয় ও অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া তাঁহার জন্মাবধিই যুধিষ্ঠিরের রাজ্য বলিয়া কথিত হইত, কিন্তু বাস্তবিক তিনি কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পর হস্তিনায় কেবল মাত্র ৩৬ বৎসর সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।*

মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া লব্ধ সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান করিতে প্রায় এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

পূর্ব্বে দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের শতানীক, এবং সহদেবের শ্রুতসেন নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সুভদ্রার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে অভিমন্যু নামে একটী পুত্র জন্মেন। নাগকন্যার ও মণিপুররাজ-তনয়ার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে যে সকল পুত্র জন্মেন তাঁহারা মাতামহকুলেই চিরবাস করিতেন, সুতরাং ভারতযুদ্ধে তাঁহারা নিহত হন নাই। হিড়িম্বাগর্ভজাত ভীমতনয় ভীমপরাক্রম ঘটোৎকচ এবং সুভদ্রানন্দন মহাবলপরাক্রম আর্জ্জুনি অভিমন্যুই কেবল মাত্র উক্ত যুদ্ধে নিহত

সেনার নাম	রথ	হস্তী	অশ্ব	পদাতি	সমষ্টি
এক অক্ষৌহিণী	২১,৮৭০,	২১৮৭০,	৬৫৬১০,	১০৯৩৫০,	২১,৮৭০০
পাণ্ডব দলে সপ্ত অক্ষৌহিণী	১৫৩০৯০,	১৫৩০৯০,	৪৫৯২৭০,	৭৬৫৪৫০,	১৫,৩০৯০০
কৌরব দলে একাদশ অক্ষৌহিণী	২৪০৫৭০,	২৪০৫৭০,	৭২১৭১০,	১২০২৮৫০,	২৪,০৫৭০০
উভয়দলে সমবেত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী	৩৯৩৬৬০,	৩৯৩৬৬০,	১১৮০৯৮০,	১৯৬৮৩০০,	৩৯,৩৬৬০০

এই সংখ্যাটীও আবার যথেষ্ট নহে। কারণ, প্রত্যেক রথে ও প্রত্যেক হস্তীতে যে কতজন যোদ্ধ পুরুষ সমারূঢ় ছিল তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না।

* রাজাবলি গ্রন্থ।

হইয়াছিলেন। নিশীথসময়ে শিবিরমধ্যে পঞ্চপাণ্ডবভ্রমে দ্রৌপদীর গর্ভজাত সন্তানগণ মহাপাপ দ্রৌণি কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। তাহাদিগের ছিন্ন মুণ্ড পরীক্ষা করিয়া পাপমতি তমোন্ধ দুর্যোধন সেই গৃধ্রশিবাদিসঙ্কুল ভীষণ মহাশ্মশান যুদ্ধক্ষেত্রেই হর্ষ-বিষাদে পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

অনন্তর কালক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর প্রভৃতি গুরুজন এবং প্রিয়-সুহৃৎ কৃষ্ণ,বলরাম প্রভৃতি বন্ধুগণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে দায়াদ-বন্ধু-বান্ধব-বধ-জনিত-শোক-সন্তপ্তচিত্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিঃসার নির্বীর ধরাতল ভোগ করিতে বীতস্পৃহ হইয়া মহাবীর অর্জ্জুনের পৌত্র অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া ১২৬ বৎসর বয়সে হিমালয় প্রদেশে দারানুজগণ সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কলির ৭৭৯ বৎসর গতে, ২৪০০ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২২৬৫ সংবৎ পূর্ব্বে, এবং ২৩২২ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে এই "মহাপ্রস্থান"টী সংঘটিত হয়।

এক্ষণে আমরা এই প্রবন্ধটি শেষ করিবার পূর্ব্বে একটী কথা না লিখিয়া থাকিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, যীশুখৃষ্ট জন্মের চারি হাজার আট বা চারি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহা হইলে ঐ ৪০০৮ বা ৪০০৪ বৎসরের সহিত বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দ ১৮৮৪ যোগ করিলে ৫৮৯২ বা ৫৮৮৮ বৎসর পৃথিবীর বয়ঃক্রম পাওয়া যায়। তবে ঐ ৫৮৯২ বা ৫৮৮৮ বৎসর হইতে বর্ত্তমান কলিযুগাব্দ ৪৯৮৪ বৎসরটী অন্তর করিলে কলি যুগারম্ভের ৯০৮ বা ৯০৪ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

পরন্তু পৃথিবীর এরূপ সৃষ্টি অসম্ভাবিতও নহে। কারণ, পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রত্যেক যুগের আদিতে ও অন্তে পৃথিবীতে খণ্ডপ্রলয় বা জলপ্লাবন হইয়া থাকে। খণ্ডপ্রলয় প্রভৃতিতে পৃথিবীর কিয়দংশ জলপ্লাবিত হয়। সুতরাং বোধ হয়, কলির ৯০৮ অথবা ৯০৪ বৎসর পূর্ব্বে জলপ্লাবন হইয়া পাশ্চাত্যভাগে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। সর্ব্ব বিষয়েই আধুনিক জাতির আধুনিকতা এবং প্রাচীন জাতির প্রাচীনতা বোধটী অস্বাভাবিকও নহে।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, এইক্ষণ পরদেশীয় ইতিহাস সকলের বিশেষ আলোচনা অপেক্ষা আমাদিগের স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় ইতিহাস-আলোচনারই অধিক আবশ্যকতা উপলক্ষিত হয়। যদি কোন আর্য্যসন্তান জাতীয় জীবনের জাড্যভাব অপনয়ন এবং জাতীয় তেজঃ পুনরুদ্দীপন করিতে সমুৎসুক হয়েন; যদি তিনি অত্যাচার-প্রপীড়িত অন্তঃসার-শূন্য জন্মভূমির শোক-শঙ্কু উৎপাটন করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হয়েন; যদি তিনি জাতীয়-সাধারণ পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ

আলোচনা করত জাতীয় দুঃখ জাতীয় দুর্ব্বলতাজনিত সমবেদনানিবন্ধন সকলকে একতাসূত্রে অনুস্যূত করিতে ইচ্ছা করেন; যদি তিনি স্বীয় জীবনের নশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে তৃণজ্ঞান করত দুঃখময়ী জননী জন্মভূমির উদ্ধারার্থ হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রাণত্যাগজনিত যশোলাভ দ্বারা স্বীয় জীবনকে চিরস্মরণীয় করিতে ইচ্ছা করেন; তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার স্বদেশের এবং বিশেষতঃ স্বজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

বাস্তবিক যাবৎ আমাদিগের অন্তঃকরণে আমাদিগের জাত্যভিমান ও আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ, তাঁহাদিগের সমাজিক রীতি ও নীতির সারবত্তা, তাঁহাদিগের সভ্যতা, সহিষ্ণুতা, মহত্ব, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, সাহস, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সদাচার, দয়া, মায়া, বদান্যতা, শৌর্য্য, ও বীর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় সদ্গুণ সমূহের সমালোচনা করিতে থাকিব তাবৎকালই আমাদিগের বড় হইবার আশা থাকিবে। সভ্যতম জাতিনিকরের অন্যতম জর্ম্মাণ জাতি কেবল মাত্র স্বজাতীয় পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিহাস পাঠ করিয়াই বর্ত্তমান উন্নতাবস্থায় উন্নীত হইয়াছে।

স্বজাতির ও নিজের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে আত্মাভিমান ও আত্মগৌরব বিনষ্ট হয়। আত্মাভিমান আছে বলিয়াই আমরা এখনও বিলুপ্ত হই নাই। ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গটুকু নির্ব্বাণ হইলেই আমরা অসার, অপদার্থ সুতরাং অনার্য্য জাতির মধ্যে গণ্য হইব। ইতি

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

হিন্দুসমাজ-সংস্কার।

জাতীয় চরিত্র।

কোন সমাজসংস্কার করিতে গেলে আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য জাতীয় চরিত্রসংগঠন। চরিত্রই সর্ব্বসংস্কারের ভিত্তিভূমি। আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের জাতীয় চরিত্রবিহীনতাই সেই মূল কারণ। জাতীয় চরিত্র সংগঠিত না হইলে আমাদের অভ্যুত্থানের আর কোন আশা নাই। যে কারণে আমাদের অধঃপতন হইয়াছে সে কারণ থাকিতে আমাদের উঠিবার আশা কোথায়? আত্মোৎসর্গ, সৎসাহস ও অধ্যবসায়, সত্যপ্রিয়তা, বিশ্বাসানুবর্ত্তিতা, পরস্পর মমতা, পরস্পর বিশ্বাস—জাতীয় চরিত্রের এই কয়েকটীই প্রধান উপকরণসামগ্রী। আমি যখন আত্ম ভুলিয়া

স্বজাতির জন্য ও স্বদেশের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে শিখিব, তখনই আমার জাতি—আমার দেশ—জগতের শ্রদ্ধাভাজন হইবে। তখনই আমার জাতি ও আমার দেশ পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সমরে অবতীর্ণ হইতে পারিবে। যখন নিরন্তর বাধাবিপত্তিতেও আমার অধ্যবসায় বিচলিত হইবে না, তখনই আমি মহীয়ান্ হইব, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি—সমষ্টি-জড়িত আমার জাতি ও আমার দেশও মহীয়ান্ হইয়া উঠিবে। যখন আমি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিব, প্রাণাত্যয়েও তাহা হইতে বিচলিত হইব না, তখনই আমার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার দেশের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইবে। যদি আমি নির্য্যাতন-ভয়ে আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে বিচলিত হই, তাহা হইলে আমার নৈতিক বল চলিয়া যাইবে। আমি ক্রমশঃ ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া যাইব। আর আমি,তুমি,সকলেই যদি ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া যাই তাহা হইলে আমি-তুমি-সংগঠিত সমাজও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভীরু ও কাপুরুষ হইতে থাকিবে। যে জাতির অধিকাংশ লোক ভীরু ও কাপুরুষ সে জাতি কখন দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যে সামান্য নির্য্যাতন-ভয়ে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের অনুবর্ত্তন হইতে বিমুখ হয়, সে যে গুরুতর নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারিবে, তাহার আশা কোথায়? স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বা অপহৃত স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে যে পরিমাণ আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন, যাহারা ক্ষুদ্র সামাজিক নির্য্যাতনে ভীত হয়, সেই কাপুরুষগণের পক্ষে সে আত্মোৎসর্গ আকাশকুসুমবৎ প্রতীত হইবে। যাহারা প্রতিবাসীর অরুণ নয়ন একবার দেখিলে ভয়ে অভিভূত হয়, তাহারা যে স্বদেশের জন্য—স্বজাতির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইবে তাহা দুরাশা মাত্র। এইজন্য বলিতেছি যদি জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে অগ্রে চরিত্র গঠন করিতে হইবে।

জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ যদি চরিত্র-সংগঠন হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে আমাদের জাতীয় চরিত্রে কি কি অভাব আছে। যাঁহারা বলেন যে আমাদের জাতীয় চরিত্রে কোন অভাব নাই, তাঁহারা চরিত্রবিশ্লেষণে নিতান্ত অসমর্থ। লক্ষ্যের অবিচলিততা ও একতা, দুর্দ্দমনীয় সাহস, অবিচলিত অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ—জাতীয় চরিত্রের এই কয়টী প্রধান উপাদান আমাদের চরিত্রে অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান আছে। বৎসর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনেক উপাধিধারী সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জনের চরিত্রে এইসকল উপাদান-সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়? অনেককেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের জীবনের কোনই লক্ষ্য নাই—অথবা

যদি লক্ষ্য থাকে তাহা সতত পরিবর্ত্তন-শীল। তাঁহারা বায়ুতাড়িত তুলার ন্যায় এক লক্ষ্য হইতে আর এক লক্ষ্যে সতত বিক্ষিপ্যমান। তাঁহারা লক্ষ্যের অনুসরণ করেন না, লক্ষ্য তাঁহাদিগের অনুসরণ করে। তাঁহারা সর্ব্বথা চলৎ-লক্ষ্য একথা বলিতে পারি না। তাঁহাদিগের একটী লক্ষ্যের স্থিরতা আছে—যে কোনরকমে অর্থসংগ্রহ করা। নিজের হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া,দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনের দুঃখে কর্ণপাত না করিয়া কেবল অর্থসংগ্রহ করা—এ লক্ষ্যের অবিচলিততা অনেক স্থলেই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে জাতীয় উন্নতি কিরূপে হইবে? নিজের স্বার্থসাধনেও জাতীয় উন্নতি প্রকারান্তরে হয় বটে, কিন্তু তাহাতে মানসিক তেজ জন্মে না। ব্যক্তিগত মানসিক তেজের সামবায়ই সামাজিক বা জাতীয় তেজ। সেই ব্যক্তিগত তেজের অভাবই আমাদের জাতীয় নির্ব্বীর্য্যতার কারণ।

এক্ষণে কিরূপে সেই ব্যক্তিগত তেজের উৎপত্তি হইতে পারে আমরা তাহার আলোচনা করিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, (১) লক্ষ্যের অবিচলিততা ও একতা, (২) দুর্দ্দমনীয় সাহস, (৩) অবিচলিত অধ্যবসায়, ও (৪) আত্মত্যাগ, মহৎ-চরিত্রের এই কয়টী প্রধান লক্ষণ। যদি আমরা একটী লক্ষ্য ধরিয়া আজীবন অবিচলিতভাবে এক-পথে চলিতে পারি, তাহা হইলে প্রতি-পদে আমাদের মনের তেজোবৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যেমন মাধ্যাকর্ষণশক্তিবলে ক্ষুদ্রতর জড়ের বৃহত্তর জড়াভিমুখে গতির পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতে থাকে, সেইরূপে অনবরত এক লক্ষ্যাভিমুখে ধাবিত হইলে আমাদের মনের তেজ ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে। প্রতি মন এক-লক্ষ্য-নিষ্ঠ হইলে জাতীয় শক্তি ক্রমশঃই উপচীয়মান হইতে থাকিবে। যাহা জাতীয় মঙ্গলের নিদান, তৎসাধনে যদি আমরা অবিচলিত অধ্যবসায়, দুর্দ্দমনীয় সাহস ও আত্মত্যাগ করিতে শিখি, তাহা হইলে ব্যক্তিগত মানসিক বলোপচয়ের সহিতই জাতীয় বলোপচয় আপনিই ঘটিতে থাকিবে।

কিন্তু আমরা তাহার কি করিতেছি? যাহাতে সেই ব্যক্তিগত তেজ উৎপন্ন হয়, তাহার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতেছি? অভ্যাস ব্যতীত কোন গুণ স্বতঃই উৎপন্ন বা পরিপুষ্ট হয় না। আমরা সেই ব্যক্তিগত গুণের উৎপত্তি বা পরিপুষ্টি সাধনের জন্য কি অভ্যাস বা সাধনা আরম্ভ করিয়াছি? আমরা শুদ্ধ কলিকাতার আন্দোলন দেখিয়া মুগ্ধ হইব না। কলিকাতায় এক্ষণে অনেক বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে বটে, কিন্তু আজও কোন বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যারম্ভ হয় নাই। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে মৌখিক ও লিখিত আন্দোলন একান্ত প্রয়োজনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা চিরদিনই আন্দোলন করিয়া বেড়ায়,কখন কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে

সাহস করে না, তাহাদের চরিত্র কখন স্ফূর্ত্তি পায় না। নিরন্তর অপরকে যে কার্য্য করিতে উপদেশ দিতেছি, যদি নিজে কখন সে কার্য্য না করি, তাহা হইলে আমার উপদেশ লোকে শুনিবে কেন? সুতরাং লোককে যে কার্য্যে উত্তেজিত করিতে হইবে, অগ্রে স্বয়ং দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইতে হইবে। ৺ কেশবচন্দ্র সেনের মাহাত্ম্য বোধ হয় অতি অল্প লোকেই অস্বীকার করেন। যাঁহারা তাঁহার মাহাত্ম্য স্বীকার করেন, তাঁহারাও যে তাঁহার কন্যার বিবাহে চটিয়াছিলেন—তাহার কারণ তাঁহারা কেশব বাবুকে এ বিষয়ে কপটী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উক্তির সঙ্গে কার্য্যের সামঞ্জস্য না দেখিলে লোকের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয় না। পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রের বিধবাবিবাহ হওয়ার পূর্ব্বে লোকে তাঁহাকেও কপটী বলিয়া সন্দেহ করিত। এমন কি আমার সম্মুখে কোন বড় লোক বলিয়াছিলেন যে তিনি আপনার ঘর ঠিক রাখিয়া পরের ঘর মজাইতেছেন। কিন্তু এখন আর তাঁহাকে সে কথা কেহ বলে না—বলিতেও পারে না।

কিন্তু আমাদের নব্য সম্প্রদায়ে আমরা কি দেখিতে পাই? অধিকাংশই কেবল মুখসর্ব্বস্ব—আজ্ঞা দানে উদ্যত, আজ্ঞা পালনে পরাঙ্‌মুখ। বাক্য ও কার্য্যের সামঞ্জস্য অতি অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। কি সমাজসংস্কার, কি রাজনৈতিক আন্দোলন—সকল বিষয়েই মুখে যতদূর সম্ভব, তাহাতে কেহই পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু কার্য্য উপস্থিত হইলেই বিষম বিপৎ। যাঁহারা সভাস্থলে, দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতায় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, গৃহে আসিলে তাঁহাদিগের আর সে মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। তখন এক এক জন দলপতি। সভায় যাঁহারা সংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা ও সবিশেষ উপযোগিতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া বলিতে আরম্ভ করেন যে "সময় আসিলে আপনিই হইবে"—"রোম এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই (Rome was not biult in a day)," "বলপূর্ব্বক সংস্কার করিতে গেলে উন্নতির স্রোত প্রতিহত হইবে।" সত্য রোম এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই, কিন্তু প্রতিদিনই রোমের কার্য্য না চলিলে, কালের গতিতে রোম কিছু একদিনই একেবারে অনন্তসৌর্য্য-শালিনী হইত না। যাহারা ভাবে যে রোমের অল্প অল্প কার্য্য আরম্ভ না হইয়াই রোম এক দিনে গগনস্পর্শিনী সৌধমালায় সুশোভিত হইয়াছিল, তাহারা মূর্খ, তাহাদিগের সহিত আমাদের কোন কথা নাই। রোমের ন্যায় সমাজসৌধও প্রতিদিনের একটু একটু কার্য্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার প্রতিদিনের একটু একটু কার্য্যে সেই সমাজসৌধের জীর্ণ-সংস্কার হইয়া থাকে। যে অলস ব্যক্তিরা জীর্ণসংস্কার করিতে না চান, তাহাদিগের

অট্টালিকা অচিরকালমধ্যে নিশ্চয় ভূমিসাৎ হইবে।

যেখানকার লোকে এতদূর স্থিতিশীল যে যাহা আছে তাহাতেই পরিতৃপ্ত, কোন প্রকার জীর্ণসংস্কার করিতে চাহে না, সেখানে বিপ্লব অনিবার্য্য। হিন্দু সমাজের ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। একদিন যখন ব্রাহ্মণেরা অতিশয় স্থিতিশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন বৌদ্ধবিপ্লব উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু উদারমতি শঙ্করাচার্য্যের বুদ্ধিবলে ও অদ্বৈতবাদের মোহিনীশক্তিতে সে প্রকাণ্ড বিপ্লবও প্রতিহত হইল। গুরুগোবিন্দ ও চৈতন্য আর দুই বার এই অচল সাগরে তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন কিন্তু সে তরঙ্গ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করি। সমাজ-সংস্কার বা সমাজ-বিপ্লব এই দুইএরই ভিত্তিভূমি চরিত্র। জাতীয় চরিত্র সুদৃঢ় না হইলে সংস্কারে বা বিপ্লবে প্রবৃত্তিই জন্মিতে পারে না। শুদ্ধ নেতার মনে সে প্রবৃত্তি জন্মিলে সংস্কার বা বিপ্লব সাধিত হইতে পারে না। জাতীয় মন সংস্কার বা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত না হইলে, শুদ্ধ নেতা একাকী কি করিতে পারেন? সমস্ত জাতি যখন গমনোদ্যত হইবে, নেতা তখন পথপ্রদর্শক হইয়া তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন। সেই জাতীয় প্রবৃত্তি জাতীয় চরিত্রের ফলমাত্র।

যখন জাতিসাধারণ সৎ ও অসৎ বুঝিতে শিখিবে, এবং বুঝিয়া সতের অনুসরণ করিতে শিখিবে, তখনই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি আরম্ভ হইবে। যে ব্যক্তি জগতে আসিয়া কিছুই করিতে চাহে না—পশুদিগের ন্যায় ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিয়াই পরিতৃপ্ত, তাহার ভাল মন্দ বিচারে শক্তি থাকুক বা না থাকুক তাহাতে জগতের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যাহার সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি নাই, তাহার কোন্‌টী সৎকার্য্য জানিয়া বিশেষ লাভ কি? সেইরূপ যে জাতি বা যে সমাজ জড়বৎ থাকিতে চাহে, সে সমাজের বা জাতির সদসৎজ্ঞানে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যে অবিরাম চক্ষু বুজিয়া থাকিতে চাহে, তাহার চক্ষুষ্মত্তা বিড়ম্বনা মাত্র। সেইরূপ যে সমাজ বা জাতি চক্ষু থাকিতেও দেখিতে চাহে না, তাহার চক্ষু থাকা বিড়ম্বনা মাত্র।

হিন্দুসমাজের অবস্থা ঠিক এইরূপ। হিন্দুসমাজ চক্ষু থাকিতে অন্ধ। সদসৎবিবেক-বিহীন না হইয়াও সতের অনুসরণে প্রবৃত্তি-বিহীন। যে সকল সুশিক্ষিত লোক সংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করেন, তাঁহারা সেই সংস্কারকার্য্যে শুদ্ধ যে প্রবৃত্তিবিহীন এরূপ নহে, কেহ প্রবৃত্তিমান্ হইলে তাহাকে সবিশেষ নির্য্যাতন করিয়া থাকেন। আপনারা যে সকল কার্য্য করিতে ইচ্ছুক কিন্তু অক্ষম, অন্যে যদি তাহা করে তাহাকে সমাজবহিষ্কৃত

করিয়া দিবেন, তাহাকে কুক্কুরের ন্যায় ঘৃণা করিবেন। আমরা এক একটী করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠকগণকে বুঝাইয়া দিব। প্রথমতঃ সুশিক্ষিত যুবকমাত্রেই স্বীকার করেন যে সাহেবেরা যে সকল অধিকার একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, যদি বিলাতী পরীক্ষাদি উত্তীর্ণ হইয়া ভারতযুবক সেই সকল অধিকার সাহেবদিগের মুখ হইতে ক্রমে ক্রমে কাড়িয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা হইবে। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু যে হিন্দু যুবক এই অসাধ্য-সাধন করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইবেন, শিক্ষিতম্মন্য নব্যসম্প্রদায় তাঁহাকে সমাজগণ্ডীবহিঃকৃত করিয়া দিবেন। তাঁহারা একজন সাহেবকেও যে ভাবে গ্রহণ করিবেন, একজন বিলাত প্রত্যাগত যুবককেও প্রায় সেই ভাবে গ্রহণ করিবেন। ইহার পরিণাম অন্তর্বিপ্লব ও অন্তর্জাতীয় বিদ্বেষ। তুমি যখন একজনকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, তখন তোমার সমাজের উপর তাঁহার পূর্ণ মমতা হওয়ার সম্ভাবনা কি? তোমার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান করার যখন তাঁহার অধিকার রহিল না, তখন তাঁহার পক্ষে সামাজিক সম্বন্ধে তুমিও যাহা, একজন বৈদেশিকও তাহা। তুমি বলিয়া থাক যে হিন্দুসমাজ দুই দশ হাজার লোককে সমাজ বহিষ্কৃত করিতে ভীত হয় না। কারণ অনন্ত সাগর হইতে কতিপয়-কুম্ভ-পরিমিত জল লইলে যেমন সাগরের কোন ক্ষতি হয় না, সেইরূপ পঞ্চদশকোটী হিন্দুসমাজ হইতে দুই দশ হাজার হিন্দুকে সমাজবহিষ্কৃত করিলে হিন্দুসমাজের কোনও ক্ষতি হইবে না। এরূপ ভ্রমাত্মক কথা—অনেক সুশিক্ষিত লোকের মুখেই শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত—যে যাহা সসীম, সীমা কমিলেই, তাহা সঙ্কীর্ণতর ও দুর্ব্বলতর হইবে। বিশেষতঃ বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান ও পদে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে—হিন্দুসমাজ মস্তক হীন হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয়তঃ বহুদিন হইতে শিক্ষিতমণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র ও যুক্তির অনুমোদিত। এ বিষয়ে বক্তৃতা বা রচনা করিতেও তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই এবং করিতেছেনও না। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত আছেন? কার্য্যে পরিণত করা দূরে থাকুক, যাঁহারা ইহার ঐকান্তিক আবশ্যকতা স্বীকার করেন, যিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিবেন—তাঁহারা তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানপূর্ব্বক সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। তাঁহারা বিধবা ভগিনী বা বিধবা কন্যার ভ্রূণহত্যা বিষয়ে সহায়তা করিবেন, তথাপি তাহাদিগের বিবাহ দিবেন না। বেণী চাপিয়া ধরিলে উত্তর দিবেন—

'সময় আসিলে আপনিই হইবে, চেষ্টা করিয়া সময় আনা যায় না ইত্যাদি।' অলস বা কপটীর ইহা অপেক্ষা সুখকর ও সুবিধাজনক উত্তর আর নাই।

তৃতীয়তঃ, সাম্যবাদীরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে অকারণ বিবাক্ত শ্রেণীবিভাগ জগতের সমূহ ক্ষতি-কারক। এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেইরূপ রণ-বিষয়িণী প্রতিভায় ক্ষত্রিয়েরা, বাণিজ্য-বিষয়িণী প্রতিভায় বৈশ্যগণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং নিম্নতর শ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীর প্রাধান্য বিনা আপত্তিতে স্বীকৃত হইত। কিন্তু এক্ষণে কালবশে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রেণীগত উৎকর্ষ বিলুপ্তপ্রায়, অথচ শ্রেণীবিভাগ পূর্ব্বের ন্যায়ই কঠোর রহিয়াছে। সুশিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়া এই শ্রেণী-বৈষম্যের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি করিতেছেন। অনেকেই বলিয়া থাকেন যতদিন ভিন্ন শ্রেণীর উপযুক্তগণের মধ্যে অন্তর্জাতীয় বিবাহাদি প্রচলিত না হইবে, ততদিন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির আশা নাই। অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি গুপ্তভাবে বিভিন্ন বর্ণের সঙ্গে একত্র আহারাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন প্রকাশ্যরূপে তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন? অধিক কি কয় জন এক বর্ণের ভিতর সমভাবে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন? যিনি কুলীন-বংশ-জাত, তিনি নবগুণযুত বংশজকে কন্যাদানে কিছুতেই সম্মত হইবেন না। রাঢ়ী, বারেন্দ্রও বৈদিক প্রভৃতি যেন এক একটী স্বতন্ত্র বর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন পার্থক্য নাই—কোন উৎকর্ষভেদ নাই, অথচ যেন পরস্পর পরস্পরের অস্পৃশ্য। পরস্পর পরস্পর হইতে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দ্বারা পৃথক-কৃত। আমরা চতুর্দ্দিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধ্বজা উড়াইতেছি; বৈদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের যশোগানে গগণ প্রতিধ্বনিত করিতেছি, কিন্তু ভারতের একতার মূলীভূত অন্তরায়নিচয়ের দিকে একবারও তাকাইতেছি না। বক্তৃতার সময় বলিতেছি ভারতের একতা চাই, কিন্তু কার্য্যের সময় ঘোরতর বৈষম্যবাদী।

এইরূপ প্রতি বিষয়েই আমরা কপটাচারী। বাক্যের সহিত আমাদের কার্য্যের কোন সামঞ্জস্য নাই। সামঞ্জস্য রাখিবার আমরা চেষ্টাও করি না। যাহা ভাল বলিয়া বিশ্বাস করি ও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করি তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সৎসাহস আমাদের নাই। সামান্য নির্যাতনভয়ে আমরা গুরুতর কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হই। আমরা যাহা পারি না, অপরে যদি তাহা করিতে সাহস করে, আমরা তাহাকে নির্যাতন করিতেও লজ্জা বোধ করি না। কপটাচার যে চরিত্রের ঘোর কলঙ্ক

তাহা জানিয়াও আমরা তাহাকে সযত্নে পোষিত করি। যে যে পরিমাণে কপটাচারী,সমাজে সে সেই পরিমাণে আদৃত। যে সত্যের অনুরোধে কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বীকৃত মত কার্য্যে পরিণত করিবে, সমাজ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। যে সমাজে সত্যের এরূপ অনাদর—চরিত্রের উচ্চ আদর্শের এরূপ অবমাননা —সে সমাজের প্রকৃত উন্নতি এখনও অনেক দূরে রহিয়াছে। যাঁহারা স্বার্থসাধনোদ্দেশে সমাজের কেবল তোষামোদ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সমাজের প্রকৃত বন্ধু নহেন। যাঁহারা সমাজের ক্ষতস্থান দেখাইয়া দেন, এবং সেই ক্ষতের শোষক ঔষধি বলিয়া দেন, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত বন্ধু। ঔষধের ন্যায় তাঁহাদিগের বাক্য আপাততঃ তিক্ত লাগিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা পরিণামে নিশ্চয়ই মিষ্ট লাগিবে; এই জন্য বলিতেছি যে যদি জাতীয় উন্নতি চাহ, তাহা হইলে অগ্রে জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে চেষ্টা কর। চরিত্রগত কপটতা, ও নীচতা থাকিতে, জাতীয় উন্নতি হইবে না। অন্তঃসারশূন্য বাহ্য আড়ম্বরে কখন কোন জাতির উন্নতি হয় নাই —হইবেও না।

সংস্কার-রহস্য।

অন্নপ্রাশন।

নামকরণের পর নিষ্ক্রমণ, নিষ্ক্রমণের পর অন্নপ্রাশন, কেহ কেহ বলেন "উপবেশন নামক অন্য একটী স্বল্প সংস্কারও আছে।" সংস্কারময়ূখ নামক সংগ্রহ গ্রন্থে "উপবেশন" সংস্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান দৃষ্ট হয়। যথা—

"অষ্টমে চ তথা মাসি
ভূমৌ তমুপবেশয়েৎ।
তত্র সর্ব্বে গ্রহাঃ শস্তা
ভৌমারাম বিশেষতঃ॥
বরাহং পূজয়েদ্দেবং
পৃথিবীঞ্চ তথা দ্বিজঃ।
পূজনং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা
গুরুদেব দ্বিজন্মনাম্॥
ভূভাগমুপলিপ্যাথ
কৃত্বা তত্র তু মণ্ডলম্।
শঙ্খ পুন্যাহ শব্দেন
ভূমৌ তমুপবেশয়েৎ॥"

অষ্টম মাসে শিশুকে ভূমির উপরি উপবেশন করাইবে। এই কার্য্যে বরাহ দেবের ও পৃথিবীর পূজা করিতে হয়। গুরু, দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিতে হয়।

এক পবিত্র ভূভাগে গোময়োপলিপ্ত করিয়া তদুপরি পিষ্টজলাদির দ্বারা মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া শঙ্খশব্দ ও পুণ্য নিনাদ করণ পূর্ব্বক তদুপরি শিশুকে উপবেশন করাইতে হয়। উপবেশন

করাইবার একটা পৌরাণিক মন্ত্র আছে, যথা—

"রক্ষৈনং বসুধে দেবি!
সদা সর্ব্বগতং শিশুম্।
আয়ুঃ প্রমাণং নিখিলং
নিক্ষিপস্ব হরিপ্রিয়ে॥
অচিরাদ'য়ুধস্তত্র যে
কেচিৎ পরপন্থিনঃ।
জীবিতারোগ্য বিত্তেষু
নিদহস্বাচিরেণ তান্॥
ধারিণ্য শেষ ভূতানাং
মাতস্ত্বমধিকা হ্যসি।
কুমারং পাহি মাতস্তং
ব্রহ্মা তদনুমন্যতাম্॥"

অন্নপ্রাশনের দিন সকলেই জ্ঞাত আছেন, বালককে গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া পথ ভ্রমণ করিয়া আনা হয়। এই প্রথাটী অন্নপ্রাশন সংস্কারের অঙ্গ নহে; ইহা পূর্ব্বোক্ত নিষ্ক্রমণ নামক সংস্কারের প্রতিনিধি। নিষ্ক্রমণ সংস্কারটী যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হওয়ায়, অন্নপ্রাশনের দিন তাহা ঐরূপে সমাধা করা হয়।

"আদায় গেহান্নিষ্ক্রম্য
গচ্ছেয়ুর্দেবতালয়ম্।
অভ্যর্চ্চ্য দেবতাং সম্যক্
আশিষো বা চয়েদথ॥
কৃত্বা প্রদক্ষিণং গেহং
আনয়ন্তি ততঃ স্বকম্।
মাতৃস্বসৃগৃহং বাপি
মাতুলাদেগৃর্হং নয়েৎ॥"

[সংস্কার ময়ূখ।

শিশুকে গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইবেক। প্রথমতঃ কোন দেবালয়ে যাইবেক। তথায় দেবতা দর্শন ও দেবতার্চ্চন করিয়া ব্রাহ্মণাদির দ্বারা আশীর্ব্বাদ বাক্য উচ্চারণ করাইবেক। পরে গৃহ প্রদক্ষিণকরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিজালয়ে আনয়ন করিবেক কিম্বা মাসীর বাড়ী অথবা মাতুলের বাড়ী লইয়া গিয়া তথা হইতে স্বগৃহে প্রত্যানীত করিবেক। এইরূপ কার্য্য অদ্যাপি করা হয় বটে, কিন্তু তাহা শাস্ত্র-বিহিত কালে ও শাস্ত্র-বিহিত নিয়মে করা হয় না।

অন্নপ্রাশন দিবসে শিশুকে যে ভ্রমণ করান হয়, তাহা ঐ শাস্ত্রীয় নিষ্ক্রমণ সংস্কারের ছায়া ভিন্ন অন্য কিছু নহে। নিষ্ক্রমণ সংস্কারের পর ষষ্ঠ মাস পূর্ণ হইলে শিশুর অন্নাশন করা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত।

"ততোহন্নপ্রাশনং মাসি
ষষ্ঠে কার্য্যং যথাবিধি।
অষ্টমে বাহথ কর্ত্তব্যং
যদ্বোবং মঙ্গলং গৃহে॥"

[যমস্মৃতি।

ষষ্ঠ মাসে কিম্বা অষ্টম মাসে শিশুকে শাস্ত্রানুমোদিত অন্নাশন সংস্কারে সংস্কৃত করিবেক। (যে কুলে ষষ্ঠ মাসে অন্নাশনে মঙ্গল হয় নাই, সে কুলের শিশুকে অষ্টম মাসে অন্নাশন দেওয়াই বিধি। ষষ্ঠ মাসে মঙ্গল হইলে ষষ্ঠ মাসেই দিবেক, অষ্টম মাসে মঙ্গল হইলে অষ্টম মাসেই দিবেক, অন্যথা সম্বৎসরে অন্নাশন সংস্কার করিতেও পারিবেক।) যথা—

"ষষ্ঠমাসেঽন্নপ্রাশনং
জাতে তু বা পূর্ণে সংবৎসরে।"

অন্নপ্রাশন সংস্কারের ইতিকর্ত্তব্যতা এইরূপঃ—

"দেবতা পুরত স্তস্য
ধাত্র্যুৎসঙ্গ গতস্যচ।
অলঙ্কৃতস্য দাতব্য-
মন্নপাত্রেঽথ কাঞ্চনে॥"

[সংস্কার ময়ূখ।

দেবপূজা ও পিতৃপূজা সমাপ্ত করিয়া ধাত্রী ক্রোড়স্থিত অলঙ্কৃত কুমারকে কাঞ্চনময় অন্নপাত্রে অন্ন প্রদান করিবেক।

"মধ্বাজ্য কনকোপেতং
প্রাশয়েৎ পায়সন্তু তম্।"

[ঐ।

সেই অলঙ্কৃত শিশুকে প্রথমতঃ মধু ঘৃত ও সুবর্ণস্পৃষ্ট পরমান্ন ভোজন করাইবেক। আজ হইতে শিশু এই অন্নমূল দেহের উপযুক্ত অন্ন পাইল ও ভক্ষণে অধিকারী হইল, আজ হইতে শিশু দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, অন্নের দ্বারা দেহের, ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির যথাযথ পরিপোষণ করিবে। পাছে শিশুর অনায়োষ্য হয়, পাছে শিশুর বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তির অভাব হয়, ভয়ে ভয়ে তাহার পিতা মাতা ও শাস্ত্রকারগণ শিশুর মঙ্গল বিধানার্থ দেবার্চ্চনা, পিতৃলোকের আরাধনা, অগ্নির পূজা ও হোম করিবার নিয়ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে, এই অন্নপ্রাশন সংস্কারের দ্বারা শিশু পবিত্র হয়, সে যে এ পর্য্যন্ত মলমূত্র ভক্ষণ করিয়াছে, সে দোষ তাহার বিদূরিত হয় এবং সে দীর্ঘায়ু লাভের অধিকারী হয়।

"মল প্রাশনাচ্ছুদ্ধ্যৈ
প্রাশয়েচ্চায়ুষেঽপিবা।"

[আশ্বলায়ন।

এতদ্ভিন্ন আশ্বলায়ন গৃহ্যে আমরা আরও কএকটী বিধান দেখিতে পাই। যথা—

"ষষ্ঠে মাস্যন্নপ্রাশনমাজ্যমন্নাদ্যকামঃ তৈত্তিরং ব্রহ্মবর্চ্চস কামো ঘৃতৌদনং তেজস্কামো দধ্যোদনমিন্দ্রিয় কামো ভবতি॥"

[আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র।

ষষ্ঠ মাসে শিশুর অন্নাশন সংস্কার করা কর্ত্তব্য। শিশুকে বহু ভোক্তা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তদ্দিনে তাহাকে প্রথমতঃ ছাগমাংসযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করাইবেক। যদি তাহাকে ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্ করিবার কামনা হয়, তবে তাহাকে তিত্তির মাংস প্রদান করিবেক। যদি তাহাকে বলিষ্ঠ করিবার ইচ্ছা থাকে ত ঘৃতান্ন প্রদান করিবেক। এবং দৃঢ়েন্দ্রিয় করিবার ইচ্ছা থাকিলে দধি মিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করাইবেক। পারস্কর ঋষিও এইরূপ বিধান করিয়াছেন। যথা—

"ভারদ্বাজ্যামাংসেন বাক্প্রকারকামস্য কপিঞ্জলমাংসেনান্নাদ্যকামস্য মৎস্যৈর্জবনকামস্য কৃকষায়া আয়ুষ্কামস্য

আদ্যাব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য সর্ব্বৈঃ সর্ব্বকামস্য।”

[পারস্কর গৃহ্যসূত্রম্।

অত্র ভাষ্যম্।

অয়মর্থঃ—যদি কুমারঃ অয়ং বাগ্মী স্যাদিতি কাময়েৎ তদা ভারদ্বাজ্যা মাংসং প্রাশয়েৎ। যদি কুমারেঽন্নাদঃ স্যাদিতি কাময়েৎ তদা কপিঞ্জল মাংসং প্রাশয়েৎ। যদি কুমারোঽয়ং জবনঃ শীঘ্রগঃ স্যাদিতি কাময়েত্তদা যথাসম্ভবং মৎস্যান্ প্রাশয়েৎ। স যদি কুমারো দীর্ঘায়ুঃ স্যাদিতি কাময়েত্তদা কৃকষায়া মাংসং প্রাশয়েৎ। স যদি কুমারোব্রহ্মবর্চ্চসী স্যাদিতি কাময়েৎ তদা আদ্যা মাংসং প্রাশয়েৎ। যদি বাক্ প্রকারাদীনি ব্রহ্মবর্চ্চসান্তানি সর্ব্বানি কুমারস্য ভবন্তু ইতি কাময়েৎ পিতা তদা ভারদ্বাজ্যাদীনামাদ্যন্তানাং সর্ব্বানি মাংসানি ক্রমেণ প্রাশয়েৎ।”

[হরিহরভাষ্যম্।

এইরূপ কৃতসংস্কার হিন্দুশিশু কালে যথাবিধ শ্রদ্ধা জ্ঞানাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহাই পুরাতন শাস্ত্রকারদিগের বিশ্বাস। এই সকল সংস্কার এখন যথা বিধি নির্ব্বাহিত হয় না, অমনি এক প্রকারে লোকদেখান গোছের হইয়া থাকে।

জীবিকা-পরীক্ষা।

অন্নপ্রাশন দিবসে, অন্নাশনের পরেই জীবিকা পরীক্ষা নামক অন্য একটী বিধানের উপদেশ আছে। অন্নাশন সংস্কৃত শিশুকে ভ্রমণ করাইয়া গৃহে আনিয়া সম্মুখে শয্যোপরি নানাপ্রকার জীবিকা দ্রব্য প্রদান করা হয়। পুস্তক, লেখনী, মস্যাধার, ধান্য, যব ও অন্যান্য শস্য, স্বর্ণাদি রত্ন—ইত্যাদিবিধ দ্রব্য শিশুসম্মুখে প্রদত্ত হয়। চঞ্চলস্বভাব শিশু ক্রীড়া করিতে করিতে যে দ্রব্য স্পর্শ করে, সেই দ্রব্য অনুসারে দ্রষ্টৃগণ তাহার ভবিষ্যৎ জীবিকা অনুমান করিয়া দেয়। ধান্যাদি স্পর্শ করিলে কৃষিজীবী, পুস্তকাদি স্পর্শ করিলে বিদ্যাজীবী এবং রত্নাদি স্পর্শ করিলে বাণিজ্য ব্যবসায়ী হইবে, এইরূপ অনুমান করতঃ আনন্দরস অনুভব করিতে থাকে। এই প্রথাটী এদেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। আমরা মনে করিতাম, উক্ত প্রথাটী কোন শাস্ত্রে নাই; পরন্তু এখন দেখিতেছি, উহাও শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান। যথা—

“দেবাগ্রতোঽথ বিন্যস্য
শিল্পভাণ্ডানি সর্ব্বশঃ।
শাস্ত্রানি চৈব শস্ত্রাণি
ততঃ পশ্যেত্তু লক্ষণম্॥”
“প্রথম স্পৃশেৎ বাল
স্ততোভাণ্ডং স্বয়ংতদা।
জীবিকা তস্য বালস্য
তেনৈব তু ভবিষ্যতি॥”

[মার্কণ্ডেয়।

শিশুকে দেবতা সম্মুখে বসাইয়া তৎসম্মুখে শিল্পদ্রব্য, যুদ্ধদ্রব্য ও বিদ্যাদ্রব্য সকল যথাক্রমে বিন্যস্ত করিবেক।

অনন্তর তদ্দ্বারা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবিকা অনুমান করিবেক।

বালক সেই সকল বিন্যস্ত দ্রব্যের মধ্যে যেটী প্রথম স্পর্শ করিবেক, তাহার দ্বারাই তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবেক, ইহা ঋষি জুষ্ট আদেশ করিয়াছেন।

একথা কতদূর সত্য তাহা আমরা জানি না। খাটে কি না তাহা কেহ কখন পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই, সুতরাং উক্ত পদ্ধতির সত্যাসত্য নির্ণয় পক্ষে আমরা বিমূঢ়। ফল উক্তরূপ বিশ্বাস এদেশের কৌতুকাবহ, এঅংশে সন্দেহ নাই।

চূড়াকরণ-সংস্কার।

চূড়া অর্থাৎ মস্তক। কেশচ্ছেদনরূপ মস্তক সংস্কার কর্ম্মের নাম "চূড়াকরণ"। গর্ভকালীন অর্থাৎ মস্তককেশ ৩ বৎসরের অধিক রাখা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই চূড়াসংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য। মধ্যে মধ্যে যে মস্তকমুণ্ডন করিতে হইবেক, কেশচ্ছেদন করিতে হইবেক, এই চূড়াসংস্কারই তাহার আদিম বা প্রথম আরম্ভ। এই দিন হইতেই বালক ক্ষৌরক্রিয়ার অধিকারী। এ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন;—

"চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং
সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ।
প্রথমেঽব্দে তৃতীয়ে বা
কর্ত্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ধর্ম্মানুসারে সকলকেই চূড়াকর্ম্ম করিতে হয় এবং শ্রুতির আদেশ অনুসারে তাহা হয় প্রথম বৎসরে না হয় তৃতীয় বৎসরে কর্ত্তব্য। এই বিধানে আশ্বলায়ন মুনিও সম্মত। যথা—

"তৃতীয়ে বর্ষে চৌলং
যথা কুলধর্ম্মং বা।"

তৃতীয়ে বর্ষে চৌলকর্ম্ম করিবেক অথবা নিজ নিজ কুলধর্ম্ম অনুসারে ফল গ্রহণ করিবেক। (যে কুলে যত বর্ষে চূড়া দেওয়া প্রথিতি হইয়াছে, সে কুলের বালককে তত বর্ষেই দিবেক, তাহাতে দোষ হইবেক না)।

কেশচ্ছেদ করাই ইহার প্রধান অঙ্গ। তদুদ্দেশে দেবপূজা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনেকগুলি কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই সেই অনুষ্ঠানের পর সংস্কৃত বালকের মস্তকস্থ কেশ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক কর্ত্তিত করা হয়। এই কেশকর্ত্তন সম্বন্ধে নানা প্রথা ও নানা বিধান দৃষ্ট হয়। কোন কোন বংশে কম্বুজ চূড়া, কোন কোন বংশে সর্ব্বমুণ্ডন, কোন কোন বংশে এক শিখা, কোন কোন বংশে পঞ্চ শিখা, কোন কোন বংশে আলি শিখা করিবার বিধি আছে। যথা—

"দক্ষিণতঃ কম্বুজাঃ বশিষ্ঠানা-মুভয়তোত্রিকশ্যপানাং মুণ্ডা ভৃগবঃ পঞ্চ-চূড়া অঙ্গিরসো বালিমেকে মঙ্গলার্থে শিখিনোঽন্যে যথা কুলধর্ম্মম্॥" *

[লৌগাক্ষি।

* কর্ম্মপ্রদীপ গ্রন্থে লিখিত আছে—
দক্ষিণ কপর্দা বাশিষ্ঠা
আত্রেয়াস্ত্রিকপর্দিনঃ।

দক্ষিনাত্যেরা বা বশিষ্ঠগোত্রোৎপন্নেরা কম্বুজাকার চূড়া রাখে, কশ্যপ গোত্রীয়েরা উভয় পার্শ্বে শিখা রাখে, ভার্গবেরা মুণ্ডিত-মুণ্ড হয়, অঙ্গিরাগোত্রীয়গণ পাঁচটী শিখা রাখে, কেহ কেহ পঙ্ক্ত্যাকারে কেশ রক্ষা করে, কেহবা প্রাপ্তপ্রদেশ সময়ে ধার মুণ্ডন করিয়া মধ্যের সমুদায় কেশ রক্ষা করে। (এইরূপ কেশ রাখাকে এদেশে "বেড়ি" বলিত। পূর্ব্ব কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রায়শঃই বেড়ি রাখিতেন, এক্ষণে কেবল উড়েদের মধ্যে এইরূপ বালি অর্থাৎ বেড়ি শিখা দেখা যায়)।

বিদ্যারম্ভ।

এইরূপ চূড়াসংস্কারের পর, পঞ্চবর্ষ আগত হইলে শিশুকে বিদ্যারম্ভ করান হইত। এ বিদ্যারম্ভ প্রকৃত বিদ্যারম্ভ নহে; ইহা কেবল অক্ষরগ্রহণ করান মাত্র। সেই জন্যই এদেশের লোকেরা বিদ্যারম্ভ কার্য্যকে "হাতেখড়ী" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ উপনয়নকেই প্রকৃত বিদ্যারম্ভ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—

"প্রাপ্তেঽথ পঞ্চমেবর্ষে
বিদ্যারম্ভন্তুকারয়েৎ।"

[বিদ্যারম্ভশ্চাত্র অক্ষর পরিচিতিঃ]
[সংস্কার ময়ুখ।

বালকের বয়স পঞ্চম বর্ষ হইলে তাহাকে বিদ্যারম্ভ অর্থাৎ অক্ষর পরিচয় করাইবেক।

বিদ্যারম্ভ হইলে বালক অক্ষর শিখিবেক, অক্ষরযোজনা শিখিবেক, ক্রমে পংক্তি পাঠ অভ্যাস করিবেক। যতদিন না উপনয়ন হয় ততদিন লৌকিক পাঠ করিবেক, বৈদিকপাঠ কি কোন শাস্ত্র শিক্ষা করিবেক না। শাস্ত্রশিক্ষার প্রারম্ভ কাল পৃথক, তাহাতে উপনয়ন ব্যতীত অধিকারিত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত বালকের কোন ধর্ম্মাধিকার আছে কি না তাহাও বিবেচ্য বটে; পরন্তু তাহা পৃথক্ প্রবন্ধে বিবেচিত হইবে।

শাস্ত্রকারদিগের মতে, হিন্দুদিগের মতে, উপনয়ন পুনর্জন্ম তুল্য বলিয়া প্রসিদ্ধ; কেন না ঐ কাল হইতেই তাহার অভিনব জীবন প্রারব্ধ হয়। অনুপনীত অবস্থায় বিদ্যা, বুদ্ধি, পাপ, পুণ্য, দণ্ড, বিনয় কিছুই থাকে না, উপনয়নের পর হইতে ঐ সকলের সূত্রপাত হয় সুতরাং উহাকে দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

শ্রীরামদাস সেন।

অঙ্গিরসঃ পঞ্চচূড়া মুণ্ডা
ভৃগবঃ শিখিনোঽন্যে॥

সমর-শেখর।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নারায়ণস্বামী অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন; তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডলে ক্ষণে ক্ষণে নানা ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"গুরুদেব! হিন্দুর উদ্ধার-সাধন যদি সুদূর পরাহত, তবে কয়েকটী ঠাকুর সৈন্য পর্ত্তুগিজদিগকে আক্রমণ করিয়া কি করিবে? বিশাল মহাসাগরের গণ্ডূষ মাত্র জল সেচন করিয়া লাভ কি? সমস্ত ভারত যখন যবনের পদানত, তখন বণিকবেশী সামান্য পর্ত্তুগিজের গতিরোধে কি ফল? ইহাদিগকে নির্ম্মূল করিলে ত ভারত উদ্ধার করিতে পারিব না।" নারায়ণস্বামী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "বৎস! তোমার বুঝিবার ভুল হইয়াছে। পর্ত্তুগিজদিগকে তুমি সামান্য বণিক সম্প্রদায় মনে করিতেছ; কিন্তু উহারা কবে বণিকের মত ব্যবহার করিয়াছে? ভারতোপকূলে কেব্‌রেলের অত্যাচারের কাহিনী কি মনে নাই? যদি বাণিজ্যই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে ভারতে ম্যানুয়েলের রাজ্য স্থাপনার্থ উহারা এত ব্যস্ত কেন? তবে সৈন্য সামন্ত, অস্ত্র শস্ত্র, দুর্গোপদুর্গই বা কিসের জন্য? তবে ভারতের জন্য শাসনকর্ত্তাই বা কেন নির্ব্বাচিত হইবে?—এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে পর্ত্তুগিজদিগের প্রধানতম উদ্দেশ্য কি? সত্য এখন উহারা দুই চারি জন মাত্র রহিয়াছে; সত্য দুই চারিটী নগর বা জনপদ অধিকার করিয়া উহারা বাণিজ্য করিতেছে, কিন্তু এখন যদি উহাদের গতিরোধ না করা যায়, তাহা হইলে কি ভারতের আর কিছু থাকিবে? উহাদের অধীনতা অপেক্ষা মুসলমানের অধীনতা শতগুণে ভাল। উহাদের অধীনতায় এক বৎসরে ভারতের যে ক্ষতি হইবে, মুসলমানের অধীনতায় শত বৎসরেও সে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ মুসলমানগণ এখন ভারতেরই অধিবাসী,—ভারতই ইহাদের মাতৃভূমি। ইহারা ভারতের ধন লইয়া ভারতকেই সজ্জিত করিতেছে; ভারতবাসীর হৃদয়-শোণিত লইয়া ভারতেরই পুষ্টিসাধন করিতেছে, জাতিবৈরতা ও হিন্দুধর্ম্ম-নাশই ইহাদের নিকট আশঙ্কা করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহাদের হাতে ত আপাততঃ ভারতের ধনরত্ন নাশের আশঙ্কা নাই। পর্ত্তুগিজগণ ভারতে যাহা পাইবে, তাহাই লইয়া সাগরপারে স্বদেশে যাইবে। ভারতের প্রতি উহাদের মমতা নাই, কখনও মমতা হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। এখন উহাদের

গতিরোধ করিতে না পারিলে ভারতের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সমূহ সম্ভাবনা। উহাদের আদর্শে পাশ্চাত্য জগৎ হইতে আরও অনেক জাতি আসিবে এবং তাহারা যদি সকলেই ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়, তবে আর দেশে কি থাকিবে? এখনও সময় আছে, এই বেলা সতর্ক হওয়া উচিত। শৈবী সেনা মুষ্টিমেয়; কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে যে জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগবহ্নি প্রজ্বলিত তাহার কাছে সহস্র পর্ত্তুগিজ তৃণবৎ দগ্ধ হইয়া মরিবে। যদি আমাদের উদ্যম ব্যর্থ হয়; সেও ভাল; তবু আমরা জানিব যে স্বদেশের জন্য রণস্থলে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি।"

সন্ন্যাসী বিনয় নম্র বচনে কহিলেন "ভগবন! আপনি যা বলিলেন সমস্তই সত্য; কিন্তু আমার মনোমধ্যে আর একটী প্রশ্ন উঠিয়াছে। যে ঘোরতর কুসংস্কারজালে সমস্ত ভারত আচ্ছন্ন, অগ্রে তাহার অপনয়ন করিতে চেষ্টা না করিয়া পর্ত্তুগিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কি হইবে? সামাজিক ও রাজনৈতিক কুসংস্কার যতদিন না দূরীকৃত হইতেছে, ততদিন ভারতবাসীর মধ্যে একতা ও সহানুভূতি স্থাপনের আশা নাই এবং যতদিন সমগ্র হিন্দু জাতি একতা সূত্রে আবদ্ধ না হইতেছে, ততদিন ভারতের উদ্ধার সাধন হইবে না। অতএব পর্ত্তুগিজ জয় না সমাজ-সংস্কার সাধন প্রথম প্রয়োজনীয়?"

"বৎস! সমাজ-সংস্করণ অগ্রে প্রয়োজনীয় বটে; কিন্তু এস্থলে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজ-সংস্করণ না পর্ত্তুগিজদিগের দূরীকরণ প্রথম প্রয়োজনীয়। ভারতের বিশাল সমাজ-ক্ষেত্রে কুসংস্কাররূপ যে সকল কণ্টকতরু জন্মিয়াছে, তৎসমুদায়ের উন্মূলন দুই এক বৎসরে একজন ব্যক্তি দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। শাক্যসিংহের ন্যায় দুই চারি জন সন্ন্যাসী আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া যদি শত বৎসর ধরিয়া লোককে অবিরত শিক্ষা দিতে পারেন, তবে সমাজের বর্ত্তমান কুসংস্কাররাশি দূরীকৃত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতেও নিশ্চয়তা নাই। আমাদের পক্ষে সে সাধনা কতদূর সাধ্যায়ত্ত, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। তবে যদি দেবাদিদেব তোমাকে ও সমরকে দীর্ঘজীবন দান করেন, তাহা হইলে উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল হইতে পারে। পাণ্ডোর ও কালিকুট ছাড়িয়া এই দূর পর্ব্বতপ্রদেশে যে নূতন কাণ্ডের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা কেবল সমরের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া। সমর আমার যেমন রণবিশারদ, তেমনই শাস্ত্রপারদর্শী। ভারতে যত ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার সমস্তেই তাহার অভিজ্ঞতা। তা ছাড়া সমর পর্ত্তুগিজ ও আরবি ভাষাও শিখিয়াছে। পর্ত্তুগিজ ভাষায় সে এমন সুন্দর কথাবার্ত্তা কহিতে পারে যে, সহসা কেহই তাহাকে

হিন্দু বলিয়া জানিতে পারে না। এত গুণ থাকিতেও বিশেষতঃ তোমার সাহায্য পাইয়াও যদি সমর মন্ত্রের সাধনায় সফল না হয়, তবে আমাদের আশা কোথায়?—কিন্তু কি বলিতে ছিলাম, ভুলিয়া গেলাম—বৎস! এত গুণ থাকিতেও তোমরা কি দুই এক বৎসরে সমগ্র ভারতভূমে সমাজ-সংস্কার সাধন করিতে পারিবে? আর পঞ্চাশৎ বৎসর জীবিত থাকিয়া অদম্য অধ্যবসায়, কঠোর উদ্যম ও আত্মত্যাগের সাহায্যে যদি লোকের অজ্ঞানান্ধ নয়ন উন্মীলন করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে ভারতের একটী প্রদেশে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু পর্ত্তুগিজদিগকে তাড়াইতে তোমাদিগের এত সময়, উদ্যম, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন হইবে না। যে শৈবী সেনা আপাততঃ ষট্‌চক্রের ভিতরে সমবেত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে ক্রমে ক্রমে পর্ত্তুগিজদিগকে তাড়িত করিলে দুই বৎসরের মধ্যে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে। এখন যদি এ বিষয়ে অবহেলা কর, তাহা হইলে এই দুইবৎসরের মধ্যেই হয়ত অসংখ্য পর্ত্তুগিজ আসিয়া ভারতে ম্যানুয়েলের রাজ্য দৃঢ়তর করিতে পারে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, এই সামান্য দুইবৎসরের মধ্যে বিপদ কত ঘোরতর হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। আমার মতে প্রথমে পর্ত্তুগিজদিগকে আক্রমণ করাই কর্ত্তব্য।"

"যথা আজ্ঞা" সন্ন্যাসী সবিনয়ে উত্তর করিলেন "যথা আজ্ঞা; তবে এক্ষণে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করা যায়?"

"আমার মতে, শত্রুকুলের যে দুই একটী আড্ডা অঞ্জাচলের নিকটে আছে, অগ্রে সেই গুলি জয় করিয়া পরে গোয়া-দুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া উচিত। কেননা, ঈশ্বর না করুন, যদি আমাদের পরাস্ত হইতে হয়, তাহা হইলে অঞ্জাদ্রিতে আশ্রয় পাইবার, আর আমাদের উপায় থাকিবে না। শত্রুকুল অগ্রপশ্চাতে পথরোধ করিয়া দুই দিক হইতে আমাদিগকে চাপিয়া ধরিবে। তা ছাড়াও গৃহের নিকট শত্রু রাখিয়া দূরস্থ বৈরীকে দমন করিতে যাইতে নাই।

এই সময়ে জনৈক ঠাকুর ত্রস্তভাবে প্রবেশ করিয়া বলিল "মহারাজ! কতকগুলি গোরা সৈন্য এইদিকে আসিতেছে। ভাবে বোধ হইল তাহারা পর্ত্তগিজ।"

নারায়ণস্বামী ও সন্ন্যাসী বাণবিদ্ধ সিংহের ন্যায় আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং উভয়েই এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন "পর্ত্তুগিজ সেনা?—কতদূর আসিয়াছে?"

"উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।"

নারায়ণস্বামীর গম্ভীর বদনমণ্ডল গম্ভীরতর হইল। তিনি অধর দংশন করিয়া বলিলেন "কেন, ধীরেন্দ্র সিংহ কি নিদ্রিত ছিলেন?"

"আজ্ঞা, না। পর্ত্তুগিজগণ ছদ্মবেশে

আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে বন্দী হইয়াছেন। শত্রুগণ] অস্ত্রাগড় হস্তগত করিয়া চক্রের দিকে আসিতেছে। শুনিলাম একজন হিন্দু তাহাদের অধিনায়ক।"

নারায়ণস্বামী আর কিছু না বলিয়া একটী রণতূর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে চক্রের উচ্চ সৌধশিরে আরোহণ করিলেন এবং তথা হইতে চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে কতিপয় পর্ব্বতিজসেনা উপত্যকার অপ্রশস্ত পথমধ্যে তাঁহার নয়নগোচর হইল। অমনি তিনি প্রচণ্ড নাদে রণতূর্য্য নাদিত করিয়া শৈবী সেনাকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শৈবী সেনাকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে আদেশ দিয়াই নারায়ণস্বামী ছাদ হইতে নিম্নদেশে নামিয়া আসিলেন এবং স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবার নিমিত্ত সজ্জাগারে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই ঠাকুরগণ সজ্জিত হইয়া চক্রের প্রশস্ত প্রাঙ্গণতলে সমবেত হইল। সকলের হৃদয়ে কঠোর প্রতিজ্ঞা, এবং নয়নে অনন্ত তেজঃ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সকলেই যুদ্ধের জন্য সমুৎসুক। ইতিমধ্যে নারায়ণস্বামী ও সন্ন্যাসী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবা মাত্র শৈবীসেনা "হর, হর, শঙ্কর" রবে ঘোর উৎসাহ নাদ করিয়া উঠিল। সেই প্রচণ্ড রণরব অভ্রাদ্রির শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া শত্রুকুলের কর্ণগোচর হইল। পর্ব্বতিজগণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, ঠাকুর সেনা নিদ্রিত নহে। ঠাকুগণের উৎসাহ নাদ শ্রবণে পরম পুলকিত হইয়া নারায়ণস্বামী হৃদয়োত্তেজক স্বরে বলিতে লাগিলেন "বন্ধুগণ! আজি তোমাদের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। পাপিষ্ঠ যবনগণ ভবিষ্যৎ ব্রতসাধনে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত আজি আমাদিগের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। আজি উহাদিগের রক্তে কপালমালী মহাকালের শোণিততৃষ্ণা নিবারণ করিব। জয়, হর, হর, শঙ্কর!"

"জয়, হর, হর, শঙ্কর!" শৈবীসেনা চীৎকার করিয়া উঠিল "জয়, হর, হর, শঙ্কর!" অমনি প্রচণ্ড রবে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, সেই রণবাদ্যের হৃদয়োন্মাদক রবে উত্তেজিত হইয়া ঠাকুরাণীগণও অন্তঃপুরচ্ছায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলের সম্মুখে আসিলেন! নারায়ণ স্বামী প্রাকারশীর্ষে আরোহণ করিয়া একবার উপত্যকার দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন,—দেখিলেন শত্রুসেনা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। তখন তিনি তিনটী কামান প্রাচীরোপরি উত্থাপিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

অচিরে তাঁহার আদেশ পালিত হইল। অঙ্গনতলে তখনই একটী কপিকল স্থাপিত হইল। ঠাকুরগণ সেই কপিতে এক একটী করিয়া কামান বাঁধিয়া প্রাচীরোপরি উঠাইয়া দিলেন। দণ্ডকাল মধ্যে তিনটী কামান উপত্যকার ঠিক সম্মুখে প্রাচীরশিরে উঠাইয়া দিলেন। দণ্ডকাল মধ্যে তিনটী কামান উপত্যকার ঠিক সম্মুখে প্রাচীরশিরে একত্র সজ্জিত হইল। অমনি তিনটী সৈনিক বারুদ, গোলা ও মশাল লইয়া তদুপরি আরোহণ করিল এবং বারুদ ও গোলা ঠাসিয়া কামানে আগুণ লাগাইল। শ্রবণভৈরব রবে ঠাকুরসেনা গর্জ্জিয়া উঠিল;—সেই গর্জ্জনকে অতিক্রম করিয়া কামানত্রয় ভীষণতর রবে গোলা বর্ষণ করিল! আবার শৈবীসেনা গর্জ্জিয়া উঠিল "জয়, হর, হর, শঙ্কর!"

ইন্দ্র।

("প্রচারের" ইন্দ্র নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদ।)

যখন 'প্রচার' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দিন দিন ইহাতে যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তিপূর্ণ অদ্ভুত অদ্ভুত মত প্রচারিত হইতেছে তাহাতে আমাদের সে আশা ক্রমশঃ নৈরাশ্যে পরিণত হইতেছে। এই পত্রিকার বিগত কয়েক সংখ্যায় এমন কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে যাহা পড়িয়া চুপ করিয়া থাকা অনুচিত বিবেচনা করি। অনুচিত বিবেচনা করি বলিয়াই এই প্রতিবাদটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নচেলে এই অপ্রীতিকর কার্য্যে কখনই হস্তক্ষেপ করিতাম না।*

পাঠক বোধ হয় গতবারের প্রচারে ইন্দ্র নামক প্রবন্ধটি পড়িয়াছেন। ইন্দ্র কিরূপ দেবতা ইহা বুঝাইবার জন্য বিজ্ঞ লেখক দেখাইয়াছেন যে এই নামে দুইটি দেবতা আছেন—একটি বৈদিক ও অপরটি পৌরাণিক। শেষোক্ত ইন্দ্রের দেবত্ব অস্বীকার করিয়া বৈদিক ইন্দ্রের প্রকৃতি কি তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি বিশেষ শ্রমস্বীকার করিয়াছেন, এবং অবশেষে এই স্থির করিয়াছেন যে বেদে ইন্দ্র বর্ষণকারী আকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ কথা কতদূর সত্য তাহা এই প্রতিবাদে বিবেচনা করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না, সুতরাং এস্থলে

* প্রচারের আর একটী প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে। কিন্তু প্রবন্ধটী অসমাপ্ত বলিয়া এক্ষণে তাহার প্রতিবাদ হইতে পারে না।

আমরাও স্বীকার করিতেছি যে বৈদিক ইন্দ্র বর্ষণকারী আকাশ মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞ লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাঁহার প্রবন্ধের শেষ ভাগে যাহা বলিয়াছেন তাহা বড়ই চমৎকার। আমরা তাঁহার নিজের কথা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি;—"এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ইন্দ্রকে পূজা না করিব কেন? ইনি অচেতন, বর্ষণকারী আকাশ মাত্র, কিন্তু ইহাতে কি জগদীশ্বরের শক্তি, মহিমা, দয়ার আশ্চর্য্য পরিচয় পাই না? যদি আমি আকাশ সচেতন, স্বয়ং সুখ দুঃখের বিধানকর্ত্তা বলিয়া, তাঁহার উপাসনা করি, যদি তাই ভাবিয়া, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করি যে, হে ইন্দ্র!—ধন দাও, গোরু দাও, ভার্য্যা দাও, শত্রু সংহার কর, তবে আমার উপাসনা, দুষ্ট, অলীক, উপধর্ম্ম মাত্র। কিন্তু যদি আমার মনে থাকে যে, এই আকাশ নিজে অচেতন বটে, কিন্তু জগদীশ্বরের বর্ষণশক্তির বিকাশস্থল * * * তবে তাহাকে ভক্তি করিলে, পূজা করিলে, ঈশ্বরের পূজা করা হইল।" আমরা ভাবিতাম যে এরূপ তর্কের দিন বহুকাল ফুরাইয়া গিয়াছে। যাহা হউক এত দিনের পর যে আমাদের সে ভ্রমটা দূর হইল ইহাও একটা পরম লাভ বলিতে হইবে।

পাঠক এখন অবশ্য বুঝিয়াছেন ইন্দ্রের দেবত্ব ব্যাপারটা কি। ইনি অচেতন বটেন, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? জগদীশ্বরের বর্ষণশক্তির ইনি বিকাশস্থল, অতএব ইনি দেবতা, ইহাঁকে পূজা করা উচিত। কিন্তু প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে অচেতন দেবতা শব্দটা কি কেমন কেমন শুনায় না? মানুষ যাহাকে চৈতন্যবিহীন বলিয়া জানিয়াছে তাহাকে কি কখন দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত এই বোধ হয় যে যিনি দেবতা তিনি অবশ্যই সচেতন হইবেন। লোকে অবশ্য বৃক্ষ, লোষ্ট্র, নদ নদী প্রভৃতি অচেতন পদার্থের পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু এই সকল অচেতন পদার্থ কি চৈতন্যযুক্ত দেবতা বিশেষের রূপান্তর বলিয়া পূজিত হয় না? এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় যে, আকাশ কি জগদীশ্বরের রূপান্তর মাত্র যে লোকে তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবে? আর একটি কথা এই স্থলে বলিবার আছে। লোকে কাহার পূজা করিয়া থাকে? যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পূজ্য। আমার অপেক্ষা যাহাকে নিকৃষ্ট বলিয়া জানি তাহাকে আমার কখনই পূজা করিবার প্রবৃত্তি হইবে না। যাহা চৈতন্যবিহীন, যাহাকে জগদীশ্বর স্বতঃ কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা দেন নাই, তাহা যত সুন্দর হউক, যত প্রকাণ্ড হউক, যত অসীম বলব্যঞ্জক হউক, সে সৌন্দর্য্য, সে প্রকাণ্ডত্ব, সে অসীম বলব্যঞ্জকত্ব সত্ত্বেও সচেতন মানুষ তাহাকে নিকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। মানব-

হৃদয় হইতে এই ভাব উৎপাটিত করা অসম্ভব। তুমি যতই বুঝাও না কেন, এক বার যদি আমার ধারণা হয় যে, কোন পদার্থ অচেতন—অচেতন বই আর কিছু নহে—তাহা হইলে কখনই তাহাকে পূজা করিতে আমার আর প্রবৃত্তি হইবে না। আকাশ মহৎ, আকাশ শক্তিমান্; কিন্তু চৈতন্যাভাবে সে মহত্ত্ব সে শক্তিমত্তা সত্বেও মানুষ তাহাকে নিকৃষ্ট বলিয়া স্থির করিবে। যাহা নিকৃষ্ট তাহার পূজা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না।

ইন্দ্র অর্থাৎ আকাশ কিজন্য দেবতা হইলেন পাঠক তাহা বুঝিয়াছেন। ইনি জগদীশ্বরের বর্ষণশক্তির বিকাশস্থল, অতএব ইনি দেবতা না হইবেন কেন? কিন্তু কোন পদার্থ জগদীশ্বরের শক্তি-বিশেষের বিকাশস্থল হইলেই যে তাহা দেবতা হইল এ কথার ভাব কি আমরাত বুঝিতে পারি নাই। ঐশিক শক্তির বিকাশস্থল বলিয়া আকাশ যদি দেবতা হইতে পারে তাহা হইলে পাঁচু একটি দেবতা, ক্ষিমু একটি দেবতা, কুকুর একটি দেবতা, বিড়াল একটি দেবতা; কারণ ইহাদের মধ্যেও কি জগদীশ্বরের শক্তি, মহিমা, দয়ার আশ্চর্য্য পরিচয় পাই না? যাহা হউক ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে এবার দেবতার বাজারটা বড়ই শস্তা হইয়া যাইবে। তেত্রিশ কোটির উপর আরও কয় কোটি চড়িবে। যখন এত দেবতা তখন আর ভাবনা কি? এস্থলে পাঠককে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। যাহা শক্তির বিকাশস্থল তাহাই যদি পূজ্য হয় তাহা হইলে তিনি কি গলবস্ত্র হইয়া যোড়হাতে হুগলির পুলের উপাসনা করিতে প্রস্তুত আছেন? কারণ ইহাতে কি মেঃ লেস্‌লির শক্তির আশ্চর্য্য পরিচয় পাই না *? যদি ইহা ঐশিক শক্তির পরিচায়ক নহে বলিয়া আপত্তি করা হয় তাহা হইলে ইহার পূজা হইতে কিঞ্চিৎ বাদ দিলেও ত চলিতে পারে। ইন্দ্রের পূজা খুব ধুম ধাম করিয়া করা যাইবে, আর পুলরূপী দেবতার পূজা না হয় তিলকাঞ্চন ব্যবস্থায় অল্প স্বল্পের ভিতরে সারিয়া ফেলিলেও চলিতে পারিবে। ইহাতে আর আপত্তি কি?

বিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন যে, "যেখানে সে (ঐশিক) শক্তি দেখিব, সে পরিচয় পাইব, সেই খানে তাঁহার উপাসনা করিব, নহিলে তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইবে না।" একথা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু আকাশ দেখিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-মান্ হওয়া, আর আকাশের প্রতি ভক্তিমান্ হওয়া, এ দুইটা কি স্বতন্ত্র কথা নহে? যদি আকাশে ঐশিক শক্তির পরিচয় পাইয়া জগদীশ্বরের উপাসনা

* শক্তির বিকাশস্থল বলিয়া আকাশ পূজ্য। হুগলির পুলও শক্তির বিকাশ-স্থল। অতএব হুগলির পুল পূজ্য।

করি তাহা হইলে লেখক যে ইন্দ্রের উপাসনা প্রচার করিতেছেন তাহা হইল কৈ?

জগতে যাহা সুন্দর, মহৎ ও শক্তিমান্ তাহার উপাসনা না করিলে বিজ্ঞ-লেখকের মতে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি উপাসনার প্রয়োজন কি? সেই সৌন্দর্য্য, শক্তি ও মহত্ত্ব সম্যক্ অনুভব করিতে পারিলে, এবং জগদীশ্বর তাহাদের কারণ এই গভীর বিশ্বাসটি অবিচ্ছিন্ন ভাবে হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিলে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। ইহার জন্য অচেতন পদার্থের পৃথক্ উপাসনার কোন প্রয়োজনই দেখিতে পাই না।

আচ্ছা বেদে ত আকাশ এই জন্য দেবত্ব পাইয়াছেন যে তিনি বারিবর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে শীতল ও শস্যশালিনী করেন। কিন্তু আমরাত আকাশের এরূপ কোন গুণ দেখিনা। বৃষ্টির সহিত আকাশের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যদি আমরা বিশ্বাস না করি তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে কি বলিয়া পূজা করিব? আমাদের আকাশ তবে বেদের দেবতাও নহেন পুরাণের দেবতাও নহেন। তবে কি ইঁহাকে কলির দেবতা বলিব*?

চৈতন্যবিহীন পদার্থকে সচেতন ও সুখ দুঃখের বিধানকর্ত্তা ভাবিয়া পূজা-করাকে বিজ্ঞলেখক "দুষ্ট, অলীক, উপধর্ম্ম" বলিয়া ঘৃণা করেন। কিন্তু তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, তিনি যে উপাসনার পরামর্শ দিতেছেন তাহা হইতে সেই দুষ্ট, অলীক, উপ-ধর্ম্মের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে পুরাণের ইন্দ্র বেদের ইন্দ্রের অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। লেখকের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আকাশকে জগদীশ্বরের বর্ষণশক্তির বিকাশস্থল ভাবিয়া পূজা করিতে পারেন, কিন্তু একবার তাহার পূজার আরম্ভ হইলে সামান্য লোকে তাহাকে অবশ্যই সচেতন ও সুখ দুঃখের বিধানকর্ত্তা ভাবিয়া পূজা করিবে, এবং কালক্রমে এই অলীক উপাসনাই সাধারণ উপাসনা হইবে।

আমরা অনধিকার চর্চ্চা করিতে চাহি না, নহিলে এস্থলে একটা কথা বলিতে পারা যাইত। আকাশকে সচেতন ভাবিয়া যদি তাহার কাছে ধন, গোরু, ভার্য্যা, ইত্যাদি প্রার্থনা করা হয় তাহা

* জল এবং উত্তাপ ও শৈত্য বৃষ্টির কারণ (Antecedents) সুতরাং ইন্দ্র অর্থাৎ বর্ষণকারী শক্তির কল্পনা করিতে হইলে এমন একটি শক্তির কল্পনা করা আবশ্যক যাহার প্রভাবে এই তিনটি কারণ (Antecedent) হইতে কার্য্য (Consequent) বৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। এই শক্তি হয় ঈশ্বর, না হয় ঈশ্বর হইতে পৃথক এক শক্তি। ঈশ্বর হইলে ত গোল চুকিয়া গেল। আর এই শক্তি যদি ঈশ্বর হইতে পৃথক্ এক শক্তি হয় তাহা হইলে ইহার উপাসনা—"দুষ্ট অলীক উপধর্ম্ম"

হইলে সে উপাসনা "দুষ্ট, অলীক, উপধর্ম্ম" কিন্তু আমাদের স্বল্প বুদ্ধিতে এক এক বার বোধ হয় যে বেদে ইন্দ্রের যে উপাসনা আছে তাহা এই লক্ষণাক্রান্ত। আমরা ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের কয়েক স্থানের তাৎপর্য্য এখানে দিতেছি 'হে ইন্দ্র! যুদ্ধে তোমার ভক্তদিগকে তুমি রক্ষা করিয়া থাক (১)'। 'হে ইন্দ্র! মনুষ্যেরা আমাদের শরীরের প্রতি দ্রোহকারী না হউক (২)'। 'প্রাণীগণ নিরন্তর এই জগৎ দর্শন করিবে বলিয়া ইন্দ্র দ্যুলোকে সূর্য্যকে স্থাপিত করিয়াছেন (৩)'। 'হে সু-নাসিকা-যুক্ত ইন্দ্র (৪)'। 'ইন্দ্র যজমানের প্রয়োজন জানেন, এবং মরুদগণের সহিত যজ্ঞস্থানে আগমন করিবার জন্য উদ্যুক্ত হন (৫)'। 'হে সত্যবাদী ইন্দ্র (৬)'। 'হে শত্রুবিমর্দ্দক, মনোবিশিষ্ট ইন্দ্র (৭)'। 'হে ইন্দ্র! তুমি অতি বিস্তৃত স্বর্গলোকের পালয়িতা (৮)'। 'ইন্দ্রের বুদ্ধির সমান আর বুদ্ধি নাই (৯)'। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই প্রকার স্তুতি পড়িলে পাঠক বুঝিবেন কি? এই বুঝিবেন না কি যে, ঋষিগণ কেবল ঐশিক শক্তির বিকাশ-স্থল বিশেষের উপাসনা না করিয়া বরং সচেতন স্বয়ং সুখ দুঃখের বিধানকর্ত্তা কোন দেবতার উপাসনা করিতেছেন? পাঠক যেরূপ বুঝিতে চাহেন বুঝুন। আমরা ইহার কোন উত্তর দিবনা, কারণ তাহা হইলে অনধিকার চর্চ্চা করা হইবে। সত্য কথা বলিতে কি, আমরা বেদ পুরাণের বড় একটা ধার ধারিনা। আমরা আদার ব্যাপারী। কিন্তু লেখকের মত যাঁহাদিগকে চিনি সোরা প্রভৃতি পাকা মালের কারবার করিতে হয় তাঁহারা জাহাজের খবর রাখুন। অতএব আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রতিবাদ এই স্থলেই সমাপ্ত হউক।

শ্রীশ্যামলধন মিত্র।

(১) দ্বিতীয়ানুবাক, প্রথম সূক্ত।
(২) দ্বিতীয়ানুবাক, ২য় সূক্ত।
(৩) দ্বিতীয়ানুবাক, ৪র্থ সূক্ত।
(৪) তৃতীয়ানুবাক, ২য় সূক্ত।
(৫) তৃতীয়ানুবাক, ৩য় সূক্ত।
(৬) ষষ্ঠানুবাক, ষষ্ঠ সূক্ত।
(৭) দশমানুবাক, ২য় সূক্ত।
(৮) ঐ
(৯) দশমানুবাক, ৪র্থ সূক্ত।

স্ত্রী-স্বাধীনতা ও শিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে হইবে যে শিক্ষার দুইটী ভাব। একটী সুপ্রবৃত্তি প্রস্ফুরণ করে, অপরটী কুপ্রবৃত্তি দমন করে। একটী শরীর মন ও অনুভূতির উন্নতি, প্রস্ফুরণ ও পরিণতি সাধন করে, অপরটী শরীর মন ও অনুভূতির অযথাবৃদ্ধির দমন ও সঙ্কোচন করে। অর্থাৎ একটীর উদ্দেশ্য সৎবৃত্তিগুলির প্রস্ফুরণ(development) অপরটীর উদ্দেশ্য অসৎ প্রবৃত্তিগুলির দমন (check)। ইহাতে বুঝা যায় যে, শিক্ষা যে কেবল শাসন মাত্র, এমন নয়। শুদ্ধ, শরীরের শাসন, মনের শাসন, অনুভূতির শাসন এমন নয়, কুপ্রবৃত্তির দমন করাই শিক্ষার শাসন। আর সুপ্রবৃত্তির পরিস্ফুরণই শিক্ষার স্বাবলম্বন ভাব। অসৎবৃত্তির শাসন ও সৎবৃত্তির পরিস্ফুরণের সমবায়ে ও সামঞ্জস্যে প্রকৃত শিক্ষার অভ্যুদয়।

স্বাধীনতারও দুইটী মূর্ত্তি। একমূর্ত্তি অধীনতা বঞ্জক। অপরটী স্বেচ্ছাচার প্রকাশক। এই দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের সমবায়ে ও সামঞ্জস্যে স্বাধীনতার জন্ম। এই মিশ্র স্বাধীনতার আরও দুইটী ভাব আছে। একটী সাম্য ভাব, অপরটী স্বানুবর্ত্তি ভাব।

এখানে দেখুন, শিক্ষার দমনকারক ভাবের সঙ্গে স্বাধীনতার অধীনতা ভাবের সাদৃশ্য আছে। আর, শিক্ষার প্রস্ফুরণ ভাবের সঙ্গে, স্বাধীনতার,স্বেচ্ছাচারিতার ভাব মিলে। শিক্ষাতে যেমন সদ্বৃত্তি প্রস্ফুরণের ভাব প্রবল, স্বাধীনতায় তেমনি স্বাবলম্বনের ভাব প্রবল। শিক্ষা যেমন প্রধানতঃ উন্নতির দিকে ধাবমান হয়—উর্দ্ধগামী হয়, স্বাধীনতাও তেমনি উর্দ্ধগামী হয়—উন্নতির দিকে গমন করে। একের উন্নতি ও অপরের সানুবর্ত্তিতা ভাবের আধিক্য দেখা যায়। অতএব দেখুন, শিক্ষা ও স্বাধীনতা উভয়েরই এক দিকে গতি—উর্দ্ধগতি—উন্নতির দিকে সম্প্রসারণ। তবে যে কদাচ নীচুদিকে নেত্রপাত করে না, এমন নয়। শিক্ষা কুপ্রবৃত্তি দমনের জন্য নিম্নতলস্থ নিকৃষ্ট বৃত্তির প্রতি কটাক্ষপাত করে, স্বাধীনতাও নিকৃষ্ট পরাধীনতা উচ্ছেদের জন্য নিম্নাভিমুখে দেখে। দুইটী পরস্পর এত মিলে যে, বোধ হয় যেন শিক্ষা ও স্বাধীনতা পরস্পরের সহোদরা সম্বন্ধ। ভগিনীদ্বয় বাঙ্গালির লক্ষ্মী স্বরস্বতীর ন্যায় পরস্পর বিদ্বেষী নয়—যেখানে এক ভগিনী থাকেন, সেখানে অপর ভগিনী গমন করেন না—প্রণয় ত দূরের কথা। বরং অনেকটা গঙ্গা যমুনার ন্যায় মিল—পৃথক হইয়াও একত্রে মিলিয়াছে। যাহা হউক, শিক্ষা

ও স্বাধীনতার পরস্পর সৌহৃদ্য, প্রণয় ও প্রীতিতে পরস্পর আকৃষ্ট। যেখানে শিক্ষা সেখানে স্বাধীনতা। যেখানে স্বাধীনতা সেখানে শিক্ষা। আমাদের এই ধারণা যে, শিক্ষার চরম ফল স্বাধীনতা। অগ্রে মানসিক স্বাধীনতা পরে কার্য্যে স্বাধীনতা। শিক্ষা দ্বারা যাহার চিত্তশুদ্ধি, আত্মস্ফূর্ত্তি ও মানসিক ও কার্য্যে স্বাধীনতা হয় নাই, তাহার প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই বলিতে হইবে। শুদ্ধ কঠোর ফল লাভ করাই প্রকৃত শিক্ষা নয়।

শিক্ষা দেখাইয়া দেয় মানবের কতদূর অধিকার আছে। রাজার কতদূর অধিকার, প্রজার কতদূর অধিকার; প্রবল পুরুষের কতদূর অধিকার, দুর্ব্বল স্ত্রীরই বা কতদূর অধিকার। ঐ অধিকার জানাইয়া, পরস্পরের উপর পরস্পরের অনিষ্টাচার বা অত্যাচার করিতে দেয় না। স্বাধীনতা ও রাজা প্রজা সম্বন্ধ, সবল দুর্ব্বল সম্বন্ধ, স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ নির্ণয় করে ও পরস্পরের অধিকার বিধিবদ্ধ করে। অতএব এখানেও শিক্ষা ও স্বাধীনতা পরস্পর পরস্পরের প্রণয়ের পরিচয় দেয়।

বুদ্ধিমার্জ্জন, জ্ঞানার্জ্জন, নীতিবোধ প্রভৃতি যাহাতে মানবের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায় তাহাও শিক্ষা সমুদ্ভূত। স্বাধীনতা ঐ সকল গুণ গুলিকে পরিপোষণ করে। সে কি রূপে? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান ভাল। স্বাধীনতা যদৃচ্ছা ভ্রমণ ও দেশ পর্য্যটনে অধিকার দেয়। নানা স্থানে ভ্রমণে, নানা শিক্ষা হয়—নানা কৌতুক, নানা আনন্দ, নানা জ্ঞান জন্মে। বহুদর্শন জনিত জ্ঞান সঞ্চয় হইতে হৃদয়ের উন্নত ভাব সকল বিকশিত হয়, তেজস্বিতা, সাহস, প্রতিভা প্রভৃতি সৎবৃত্তির পরিস্ফোটন হয়। অতএব স্বাধীনতা শিক্ষা পরিপোষণ করে, একথা বলিব না কেন?

দেখা গেল যে, শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি ঊর্দ্ধাভিমুখে—উন্নতির দিকে, সৎবৃত্তির অনুশীলনের দিকে। বস্তুতঃ শিক্ষা ও স্বাধীনতা সকল প্রকার মঙ্গল সাধনের উপায়—সকল প্রকার উন্নতির মূল।

এক্ষণে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা অনুসারে প্রকৃত শিক্ষা দিলে স্বাধীনতা দিতেই হইবে কি না এ বিষয় ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা যাইতেছে:—

শিক্ষা পাইলে মানব মনে স্বাধীনতার ভাব উদয় হয় কি না এই বিষয়টি জানিতে হইলে, মানবের পূর্ব্বাপর ইতিবৃত্ত সমালোচনা আবশ্যক। সমাজ বন্ধনের প্রাক্ কালে মানব বন্য পশুবৎ যদৃচ্ছাক্রমে আহার, বিহার, গমনাগমন প্রভৃতি কার্য্য করিত—স্বেচ্ছাচারী ছিল। স্বেচ্ছাচারিতা এই আদিম অবস্থার ধর্ম্ম। তাহার পর সমাবেশ আবশ্যক হওয়াতে তাহারা একত্রিত হইয়া বাস করিল এবং এই একত্র বাসই সমাজ সংস্থাপনার অভ্যুদয়। মানব সমাজ-ভুক্ত হওয়ায়

দেখিল যে, আপন সুখ ও উন্নতির জন্য পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই নির্ভরতায় পরস্পর বাধ্য বাধকতা জন্মিল। বাধ্য বাধকতা থাকিলে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিতে হয় এবং পরস্পর ঐ নিয়মের বশীভূত হইয়া থাকিতে হয়। নিয়মের অধীনতা স্বীকার না করিলে স্থাপিত সমাজ বিশৃঙ্খল হয়। এই নিয়মই সমাজের ভিত্তি-গ্রন্থি স্বরূপ। আবশ্যকতা এই অধীনতা স্বীকারের কারণ। প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অধীন থাকা সামাজিকের অবশ্যম্ভাবী। নিয়মাধীন না হইলে সামাজিক সুখ থাকে না, আত্মরক্ষা ও বিষয় রক্ষা হয় না। ঐ সকল সামাজিক নিয়ম গুলি কে নির্দ্দেশ করিল? মানবই আত্মরক্ষা ও আত্মসুখ বর্দ্ধনের জন্য স্বয়ংই ঐ নিয়ম স্থাপন করিল এবং সংস্থাপিত নিয়মের অধীনতা স্বীকার করিল। আপনার অধীন আপনি হইল—স্বাধীন হইল। মানবীয় সভ্যতার এই ইতিহাস হইতে বুঝা গেল যে, স্বেচ্ছাচারিতা মানবের স্বাভাবিক ভাব। সেই স্বেচ্ছাচারিতা নিয়মাধীন করাতে মানব স্বাধীন। যখন তাহাদের এই জ্ঞান হইল যে কোন নিয়ম না করিলে তাহাদের আত্মরক্ষা বিষয়রক্ষা এবং তজ্জনিত সুখ হয় না—সমাজ সংস্থিতি হয় না, তখনই তাহারা নিজেই নিয়ম করিল ও তাহার অধীন হইল। বহুদর্শন হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞান ভূয়োদর্শন বা বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা বা শিক্ষার ফল মাত্র। অতএব জ্ঞান লাভ করিলেই মানব তাহাদের মঙ্গলকর নিয়ম স্থাপন করিবে ও তাহার অধীন হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে প্রকৃত শিক্ষা পাইলে মঙ্গলকর স্বাধীনতা প্রাপ্তির ভাব মনে উদয় হইবে না কেন? শিক্ষা বা জ্ঞান যখন মঙ্গল-জ্ঞাপক, আর স্বাধীনতা যখন মঙ্গল-সাধক, তখন শিক্ষা দ্বারা মন অবশ্যই স্বাধীনতার দিকে ধাবমান হইবে—স্বাধীনতার ভাব মনে স্বতঃই উদয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আরও দেখুন, মানব স্বভাবতঃ স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়। আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করে তাহাই করিতে চাহে। মানব আপনাকে যত ভালবাসে তত আর কাহাকেও নয়। অগ্রে আপনার প্রতি যত্ন, পরে অপরের প্রতি যত্ন, এজন্য "আপন রাখিয়া ধর্ম্ম" এ প্রবাদটী প্রায় সকলের মুখে শুনা যায়। আমি বড় হইব, আমার অধীন সকলে থাকিবে। আমি যাহা করিব তাহাই হইবে—আমি কাহারও অধীন থাকিব না, এই ভাব সভ্য ও অসভ্য উভয় সমাজেই লক্ষিত হয়। তবে সভ্য সমাজে জ্ঞান-বল বা শিক্ষা-বল দ্বারা ঐ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে; অসভ্যাবস্থায় আসুরিক-বল দ্বারা ঐ স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা যথেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়। কিন্তু জ্ঞানবল বা শিক্ষাবল দ্বারা স্বাতন্ত্র্য

প্রিয়তা স্বাধীনতায় পরিণত হয়। মানব শিক্ষা দ্বারা বুঝিবে স্বেচ্ছাচারিতা সমাজে কুফল প্রসব করে—সমাজ বিশৃঙ্খল হয়—এজন্য তাহাকে সীমাবদ্ধ করা উচিত। এই ঔচিত্য বিবেচনায় মানব তখন নিয়মপরতন্ত্র হইল—স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, শিক্ষাই স্বাধীনতা লাভের মূল—শিক্ষা দিলে স্বাধীনতার ভাব মনে উদয় হইবেই হইবে।

এতদ্ব্যতীত আরও দেখা যায় যে, শিক্ষা কালীন মানব গ্রন্থ পাঠ দ্বারা অপরের চিন্তা ও বিবেচনার ফল লাভ করে। পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি যে যে ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন আমরা তাঁহাদের চিন্তা, তর্ক, গবেষণা প্রভৃতি সকলই জানিতে পারিতেছি। এমন কি, বোধ হইতেছে যেন তাঁহারা স্বয়ং অদ্য শিক্ষা দিতেছেন; শুদ্ধ তাহা নয়, পৃথিবীস্থ যাবতীয় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, নৈতিক প্রভৃতি তীব্র মনীষিগণের সমস্ত চিন্তা আমরা এক স্থানে বসিয়া প্রাপ্ত হইতেছি। অধিক কি, বোধ হয় যেন তাঁহারা আমার সমক্ষে ঐ সকল চিন্তাপূর্ণ গবেষণা করিতেছেন, আমি যেন স্থির অন্তঃকরণে শিক্ষা করিতেছি। বাল্মীকী ও ব্যাস, বশিষ্ঠ ও বৃহস্পতি প্রভৃতি মহর্ষিগণ কোথায়? কিন্তু তাঁহাদের চিন্তাপূর্ণ মস্তিষ্ক অদ্যাবধিও আমাদের মনকে জ্ঞান পূর্ণ করিতেছে। কপিল ও কণাদ, জৈমিনি ও গৌতম প্রভৃতি দার্শনিকগণ কোথায়? কিন্তু তাঁহাদের তর্ক অদ্যাপিও মনকে চিন্তাপূর্ণ করিতেছে। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি সাম্যবাদী মহাপুরুষগণ কোথায়? কিন্তু অদ্যাপিও তাঁহারা মানব হৃদয় সাম্য রসে উৎসাহিত করিতেছেন। শুদ্ধ ভারতে কেন সমস্ত জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আরিষ্টটল, সেক্রেটিস্, প্লেটো; ঈষা, কনর্ফুস্, লুথর; ভলটেয়ার, রূশো, কোমত; টমাস পেন, মিল প্রভৃতি সাম্যবাদী মহাপুরুষগণ তাঁহাদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ও অগ্নি-উদ্দীপক লেখনী দ্বারা মানব মনকে উত্তেজিত করিতেছেন। এদিকে ম্যাট্সিনি, গারিবল্ডি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত কতদূর স্বাধীনতা উদ্দীপক! এই সকল দেবতুল্য মহাপুরুষগণের জীবনী বা লেখনী শিক্ষিত মানব হৃদয়কে উদ্বেলিত কি করে না? এক অনির্ব্বচনীয় উচ্ছ্বাসে কি হৃদয়ঘাত প্রতিঘাত হয় না? প্রকৃত শিক্ষা দিলে পৃথিবীস্থ নানা মহামতিগণের চিন্তা, বিবেচনা, উপদেশ, তর্ক ও দৃষ্টান্ত অবশ্যই পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং হৃদয়ঙ্গম হইলে তৎ প্রবর্ত্তিত স্বাধীনতার ভাব অবশ্যই মনকে উত্তেজিত করিবে। আবার দেখুন, ইতিহাস স্বাধীনতা শিক্ষা দেয় ও তদ্ভাবের উদ্দীপনা করে। কিরূপে এক জাতি পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়া সুখ-সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে, কি রূপেই বা আর এক জাতি অপর এক

জাতি কর্ত্তৃক অপহৃত স্বাধীনতা হইয়া জীবন্মৃত প্রায় হইয়া রহিয়াছে, এ সকল ইতিহাস শিক্ষা দেয়। এ শিক্ষার ফল কি? এই সকল ব্যাপার পাঠকের মনে কি স্বাধীনতার ভাব উদ্দীপন করে না? আমাদের বিবেচনায় জাতীয় ইতিবৃত্ত ও মহাপুরুষগণের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে মনব হৃদয়ে অবশ্যই স্বাধীনতার ভাব উদয় ও উদ্দীপনা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৪। যদি স্বাধীনতার ভাব মনে উদয় হয়, তাহা হইলে মন স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা করিবে কি না? এইটী আমাদের চতুর্থ প্রশ্ন। কিন্তু ইহার উত্তর অতি সহজ—সামান্য চিন্তা করিলেই ইহার উত্তর পাওয়া যায়। দেখুন, বীজ বপন করিলে তাহাতে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর হইতে সুবৃহৎ বৃক্ষ জন্মে। তুষ-নিহিত বহ্নির মধ্যস্থ অগ্নিকণা ক্রমে আপনিই জ্বলিয়া উঠে। ভস্মাবৃত বহ্নি কয় দিবস আচ্ছাদিত থাকে? উপযুক্ত সময় ও অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে-বীজ ও অগ্নি আপন কার্য্য করে—বীজ বৃক্ষ হয়, অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। প্রকৃতির এই নিয়ম। যাঁহার মনে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হইয়াছে, যাঁহার মনে স্বাতন্ত্র্য স্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করিয়াছে, তিনি কখন নিশ্চিন্ত ও নিচেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি যতদূর পারেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা করিবেন—উপ্ত বীজ ও অভ্যন্তরস্থ বহ্নির ন্যায় অবশ্য কার্য্য করিবেন। বিশেষতঃ স্বাধীনতা যখন মঙ্গল দায়ক ও চিত্তস্ফূর্ত্তিকর, তখন উহা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা মন সহজেই করিবে। কাম্য বস্তু প্রাপ্তির চেষ্টা কে না করে? আরও, কাম্য বস্তু অর্জ্জনের জন্য যদি কেহ মনকে উদ্দীপন করে, তাহা হইলে তৎপ্রাপ্তির চেষ্টা মানব অবশ্য করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অগ্নিশিখা যেমন স্বতঃই উর্দ্ধগামী হয়, স্বাধীনতার ভাব মনে প্রবৃষ্ট হইলে মন স্বতঃই উর্দ্ধগামী হইবে, স্বাধীনতা তাহার লক্ষ্য স্থল হইবে, লক্ষ্য স্থল স্বরূপ স্বাধীনতা প্রাপ্তির অবশ্য চেষ্টা করিবে। স্বাধীনতা স্পৃহনীয়, স্পৃহনীয় বস্তু প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে কার্য্য হয়, মানসিক নিয়ম এই। অতএব স্বাধীনতার ভাব মনে প্রবেশ করিলে তৎপ্রাপ্তির জন্য মানব চেষ্টা করিবে তাহার বিচিত্রতা কি? মন তাপমান যন্ত্রস্থিত পারদের ন্যায়। পারদ যেমন উত্তাপ পাইলে কার্য্য করে—উর্দ্ধগামী হয়, মনও তেমনি স্বাধীনতা স্ফুলিঙ্গে উত্তপ্ত হইলে আপন ঈপ্সিত কার্য্য করিবে—স্বাধীনতাসুখ ভোগের চেষ্টা করিবে।

৫। যদি শিক্ষা দিলে পুরুষ জাতি স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা করিবে স্বীকার কর, তবে স্ত্রী-জাতি শিক্ষা পাইলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা করিবে কি না? মানব প্রকৃতি এক। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব

সময়ে মানবের একই প্রকৃতি লক্ষিত হয়। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানবের যেরূপ চিন্তা-শক্তি ও কার্য্য-শক্তি ছিল, অদ্যাপিও তাহাই আছে। তবে প্রকৃতির উন্নতি স্রোতে চিন্তা-স্রোত ও কার্য্য-প্রণালী কিঞ্চিৎ প্রভেদ হয় মাত্র। সাময়িক উন্নতি বা অবনতি হয় বলিয়া মানব প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না। মানব মানবই থাকে। পূর্ব্বতন মানবের যে সকল বৃত্তি ছিল, অদ্যও সেই সকল আছে। পুরুষের যে যে মনোবৃত্তি গুলি ছিল স্ত্রীলোকেরও তাহাই ছিল। অতএব প্রকৃতির প্রভেদ কোথায়? মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ একই। পুরুষের যেরূপ বুদ্ধি, অনুভূতি ও ইচ্ছা আছে, স্ত্রীজাতিরও তাহা সমস্ত আছে। তবে শিক্ষা ও সময়ের গুণে তাহার তারতম্য দেখা যায় মাত্র। যখন পুরুষ জাতি শিক্ষা পাইলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অবশ্য চেষ্টা করিবে স্বীকার করা যায়, তখন স্ত্রী-জাতি শিক্ষা পাইলে তৎ-প্রাপ্তির চেষ্টা করিবে না কেন? স্ত্রী-জাতির বুদ্ধি, অনুভূতি ও ইচ্ছা কি পুরুষ-জাতির মত নয়? তাহাদের প্রকৃতি কি সম্পূর্ণ ভিন্ন? তাহাদের বিধাতা কি ভিন্ন পুরুষ? অবয়বে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন বলিয়া তাহাদের প্রকৃতি কি একেবারে বিভিন্ন? পুরুষের মানব প্রকৃতি আছে বলিবেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির কি মানব প্রকৃতি একেবারেই নাই? তাহাদের শরীর-যন্ত্র কি মানবীয় যন্ত্র নয়? পুরুষের ন্যায় তাহাদের কি মন নাই, মস্তক নাই, অন্তঃকরণ নাই, হৃদয় নাই? গুণে তারতম্য হউক, কিন্তু এ সকল কি কিছুই নাই? যদি এ সকল থাকে, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির ন্যায় মানব গুণ সম্পন্ন। পুরুষের ন্যায় বুদ্ধিশক্তি, অনুভূতি-শক্তি ও ইচ্ছা-শক্তি আছে। শক্তির তারতম্য হউক, কিন্তু ঐ সকল শক্তি স্ত্রীজাতিতে নিহিত আছে। যদি ঐ সকল শক্তি নিহিত থাকে, তাহা হইলে পুরুষের ন্যায় তাহারা অবশ্য শিক্ষা করিতে পারিবে। যদি শিক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্যই পুরুষের ন্যায় চেষ্টা ও কার্য্য করিতে পারিবে। ঊর্দ্ধ সংখ্যা এই মাত্র বলিতে পার যে, স্ত্রীজাতি পুরুষের ন্যায় সমান শিক্ষা করিতে পারিবে না, ও সমান কার্য্যও করিতে পারিবে না কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা—পরে বিচার্য্য। এক্ষণে আমরা এই বলিতে চাহি যে, পুরুষজাতি যদি শিক্ষা পাইলে শিক্ষানুমত কার্য্য করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে স্ত্রীজাতিও শিক্ষা পাইলে শিক্ষামত কার্য্য করিতে অবশ্য চেষ্টা করিবে। যে শিক্ষা পুরুষজাতিকে উন্নতমন করিয়া স্বাধীনতা প্রয়াসু করিয়াছে, সে শিক্ষা স্ত্রীজাতিকে উন্নতমনা করিতে পারিবে না কোন যুক্তিতে? লিঙ্গভেদে কি শিক্ষার বিভিন্ন ফল হয়? শিক্ষা যদি স্ত্রীজাতিকে উন্নতমনা করিতে পারে, তবে কি জন্যই

না তাহারা স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইচ্ছা ও চেষ্টা করিবে না?

আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, কুলকামিনী শিক্ষা পাইয়া প্রায় পুরুষের ন্যায় শিক্ষিতা হইয়াছে। এমন স্ত্রীলোক দেখা যায় যে তাঁহারা বিদ্যায় অনেক পুরুষের সমান, এবং কেহ কেহ অনেক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। পূর্ব্বকালে খনা লীলাবতী প্রভৃতি এবং বর্ত্তমান কালে রমা বাই, অন্নদা বাই, স্বর্ণলতা চন্দ্রমুখী, কাদম্বিনী প্রভৃতি কি অনেক পুরুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্টা নন? মাদাম্ ব্লাভাস্কি, মিসেস্ এনিবেসেণ্ট, মিস্ মার্টিনিও, মিস্ ফ্লোরেন্স্ প্রভৃতি কি অনেক পুরুষ অপেক্ষা বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা নন? তবে এমন বলিতে পার যে, সমগ্র স্ত্রীজাতি তুলনায় সমগ্র পুরুষজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। একথা স্বীকার করি। কিন্তু স্ত্রীজাতি পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে নাই, তাহার নানা কারণ আছে। স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির ন্যায় কোন দেশে কখন সমান শিক্ষা পায় নাই। যে স্থলে সমান শিক্ষা পায় নাই, সে স্থলে পুরুষের সমান হয় নাই, তাহার বিচিত্রতা কি? এক্ষণে আমরা এই মাত্র দেখিব যে, যাহারা প্রকৃত বা উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছে তাহারা স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছে কি না। বর্ত্তমান কালের রমাবাই প্রভৃতি উল্লিখিত রমণীগণের দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্তির সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেছেন এবং অনেক পরিমাণে অশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছেন। এইরূপ স্বাধীনতা প্রাপ্তি বা তৎপ্রাপ্তির চেষ্টা কি শিক্ষার ফল নয়? যদি না হয়, তবে তাঁহাদের ঐ স্বাধীনতা প্রাপ্তি কিসের ফল?

কেহ কেহ বলেন, স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিব কিন্তু স্বাধীনতা দিব না। আমরা বলি, এটী নিতান্ত অযৌক্তিক কথা। শিক্ষা যেরূপ প্রকারই দেন না কেন, শিক্ষা দান কালেই কিয়ৎপরিমাণে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা দিতে হইবে। শিক্ষার পর ক্রমে ক্রমে পুরুষের ন্যায় তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে হইবে, নতুবা তাহারা স্বয়ংই ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে। মনে কর, স্ত্রীজাতির কোন শিক্ষা নাই। তুমি তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে সঙ্কল্প করিলে। তুমি কিরূপে শিক্ষা দিবে? তুমি একটী মাত্র স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিতেছ না—সমগ্র স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিতেছ। যখন সমগ্র স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিতেছ, শিক্ষার্থ বিদ্যালয় আবশ্যক, নতুবা সমগ্রের শিক্ষা অসম্ভব। বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে হইবে, কিন্তু কে শিক্ষা দেয়? স্ত্রীজাতি শিক্ষা-বিহীনা স্বীকার করিয়াছ। তবে শিক্ষা দিতে হইলে অবশ্য পুরুষের সাহায্য লইতে হইবে—পুরুষের সংসর্গে রাখিতে হইবে। অন্তঃপুরে রাখিলে চলিবে না—প্রকাশ্য স্থানে পাঠাইতে হইবে। যখন স্ত্রীজাতিকে

জ্ঞান-বিকাশের সময় হইতে পূর্ণযৌবনাবধি শিক্ষার্থে পুরুষের সংসর্গে সতত থাকিতে হইল, তখন স্বাধীনতার কিয়দংশ দিতেই হইল। অপর পুরুষ সংসর্গকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সূত্রপাত স্বীকার কর কি না? যখন পুরুষ সংসর্গে রহিল, তখন তাহারা পুরুষের দৃষ্টান্তে পুরুষের ন্যায় স্বাধীনতা উপভোগ করিবার চেষ্টা করিবে না কেন? পুরুষ-কৃত গ্রন্থ পাঠ করিবে, পুরুষের নিকট শিক্ষা করিবে, পুরুষের সংসর্গে থাকিবে, পুরুষের স্বাধীন চিন্তা হৃদয়ঙ্গম করিবে, অথচ স্ত্রীজাতি স্বাধীন চিন্তা করিতে শিখিবে না, স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা করিবে না, সে কেমন যুক্তি? সংসর্গ-দোষে মন্দ, ও সংসর্গ গুণে ভাল হয়, এ সত্যটি সকলেই স্বীকার করেন। তবে পুরুষের উন্নত ও স্বাধীন সংসর্গে স্ত্রীজাতি উন্নতা ও স্বাধীনা হইবার চেষ্টা করিবে না কেন? সাধারণ বিদ্যালয়ে পুরুষাধীন হইয়া স্ত্রীজাতির শিক্ষা করণই স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথমসূত্রপাত। ঐ স্বাধীনতার সূত্রপাত হইতে ছাত্রীর বয়োবৃদ্ধি ও বিদ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইবে; এবং অবশেষে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, পূর্ণ শিক্ষা পাইবার প্রয়াস করিবে—পুরুষের সহিত সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিবে—সমান স্বত্ব ও অধিকার আকাঙ্ক্ষা করিবে। এরূপ অবস্থায় তাহারা যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা করিবে, ইহাতে আমরা সন্দিহান নহি।

উচ্চ আদর্শ জীবনের লক্ষ্য—কার্য্যের কেন্দ্র স্বরূপ। উন্নত দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া মানব উন্নত হইয়াছে। উন্নত বুদ্ধি, উন্নত অনুভূতি ও উন্নত কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া জীব মহৎ হইয়াছে। পবিত্র জ্ঞান, পবিত্র ধর্ম্ম ও পবিত্র নীতি জীবনের লক্ষ্য মনে করিয়া জীব সাধু হইয়াছে। বুদ্ধের করুণ হৃদয়ের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া অনেক বৌদ্ধ কারুণিক হইয়াছে। চৈতন্যের প্রেম-পূর্ণ হৃদয়ের দৃষ্টান্তে অনেক বৈষ্ণব প্রেমিক হইয়াছে। খৃষ্টের সমদর্শিতার দৃষ্টান্তে অনেক খৃষ্টান্ সাম্যাচরণ করিতে শিখিয়াছে। এইত গেল মানব জীবনের দৃষ্টান্ত। মানবজীবনের দৃষ্টান্ত সংকীর্ণ। মন সংকীর্ণতায় থাকিতে চাহে না। সঙ্কীর্ণতা ভেদ করিয়া মন উত্তুঙ্গমার্গে উঠিল—কল্পনা অনন্ত ও অসীম আকাশ মার্গে উড্ডীন হইল—ঈশ্বর-রূপ একটী অসীম জ্ঞান, অসীম দয়া, ও অসীম শক্তি সম্পন্নের উদ্ভাবনা করিল। জ্ঞান, করুণা ও শক্তির উৎকর্ষ কল্পনা করিল। এই উৎকর্ষ কল্পনা মানব জীবনের লক্ষ্য। দিক-ভ্রান্ত নাবিকের পক্ষে দূরস্থ আলোক যেরূপ, মরুভূমিস্থ পথিকের পক্ষে দূরস্থ মরীচিকা যেরূপ, পরিত্যক্ত প্রেমিকের পক্ষে প্রেম-পত্রিকা যেরূপ, মানব জীবনের পক্ষে কল্পনার উৎকর্ষ সৃষ্টি, ঈশ্বর তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে জীবনের

লক্ষ্য স্থল—আদর্শ স্থল। আমি সেই ঈশ্বর, অথবা আমি সেই ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞানী, দয়ালু ও শক্তিসম্পন্ন হইব, দেবত্ব প্রাপ্ত হইব—অথবা তাহাতে মিশাইয়া যাইব, মানবের এই ইচ্ছা। বস্তুতঃ অসীম গুণ, কল্পনা মাত্র, মানব কদাচ তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না, তত্রাচ আদর্শের কি বিচিত্র শক্তি! মন যে স্বতঃই সেই দিকে যায়! মানব ঈশ্বরের ন্যায় পবিত্র ও সম্পূর্ণ হইতে চায়! সেই রূপ স্ত্রীজাতি পুরুষের উন্নত দৃষ্টান্ত দেখিল—এবার শুদ্ধ চর্ম্মচক্ষুতে দেখিল না, জ্ঞানচক্ষুতে দেখিল। শিক্ষা পাইয়া স্ত্রীজাতির জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। স্ত্রীপুরুষ এবার উভয়েই জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা দেখিল। কি দেখিল? পুরুষ অভ্যন্তরস্থ স্বাধীন ভাব দেখিল—স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কার্য্য দেখিল—অনুভব করিল। ইহাকে উৎকৃষ্ট আদর্শ মনে করিল—পুরুষের মনের তেজ ও দৃঢ়তা, হৃদয়ের দয়া ও কোমলতা প্রভৃতির অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ শিক্ষিতা রমণীর মন আকর্ষণ করিল—বামা মুগ্ধা হইল। শৈশবে গৃহে, বাল্যে বিদ্যালয়ে সুকুমারমতি বালক পিতামাতা ও শিক্ষকের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে। যৌবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে, এখানে উন্নত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের উন্নত আদর্শ মনকে আকর্ষণ করে। শুদ্ধ অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, এমন নয়। গ্রন্থবর্ণিত প্রাতঃস্মরণীয় মহামতি মহাপুরুষগণের দৃষ্টান্ত হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ঐ অঙ্কুর সকল জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। প্রৌঢ়ে ঐ অঙ্কুর হইতে সুদীর্ঘ বৃক্ষরূপ উচ্চ প্রকৃতিতে পরিণত হয়। প্রকৃতির নিয়ম এই। যখন শিক্ষার্থী পুরুষের এইরূপ উন্নতি হয়—স্বাধীন চিন্তায় মন পরিপূর্ণ হয়, তখন স্ত্রীজাতির মন স্বাধীন চিন্তায় পরিপূর্ণ না হইবে কেন? মহৎ দৃষ্টান্ত মহত্ত্বের কারণ। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্ত্রীজাতি উন্নত ও স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিবে না কেন? প্রত্যুত শিক্ষিতা রমণী স্বাধীনতা প্রাপ্তির অবশ্য চেষ্টা করিবে। নতুবা তাহার প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই বলিতে হইবে।

৬। যদি শিক্ষিত পুরুষ স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা করায়, তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত হয়, তাহা হইলে শিক্ষিতা স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব যে, এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। আমরা প্রকৃতিতে দেখিতে পাই যে, ইচ্ছা-শক্তি প্রবলা হইলে ঈপ্সিত কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইচ্ছা চেষ্টার মূল, চেষ্টা কার্য্যের মূল। চেষ্টা থাকিলে কার্য্য অবশ্যই হইবে। তবে কোন কোন কারণে কার্য্যের ব্যাঘাত ও ব্যতিক্রম ও ঘটে, এজন্য কখন কখন কার্য্যসিদ্ধি হয় না। ফলে, চেষ্টা থাকিলে কার্য্য হয়, অবশ্য স্বীকার

করিতে হইবে। যে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করে, তাহার স্বাধীনতা প্রাপ্তিরই সম্ভাবনা; এবং যদি অনুকূল অবস্থা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বাধীনতা অমূল্য রত্ন, জীবনের লক্ষ্যস্থল, এই যদি আমি মনে করি তাহা হইলে তৎপ্রাপ্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। তোমার পক্ষেও ইহা স্পৃহণীয়। তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী—কোন কারণ বশতঃ আমি তোমার অধীন রহিয়াছি। আমি যেমন স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছি, তুমিও স্বার্থের জন্য তৎপ্রতিরোধ করিতেছ, আমাকে অধীন রাখিবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করিতেছ। ইহার পরিণাম এই যে উভয়ের মধ্যে একটী মহৎ সংক্রামক দ্বন্দ্ব—এক পক্ষ নিষ্কৃতির জন্য, অপর পক্ষ অধীনে রাখিবার জন্য। সুতরাং সংসারে শান্তি থাকে না—সংসার বিষময় হয়। ইতিহাস এই দ্বন্দ্বের বিশেষ পরিচয় দেয়। আর্য্যে অনার্য্যে দ্বন্দ্ব, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির দ্বন্দ্ব, এই স্বাধীনতা লইয়া। পূর্ব্বতন রোমে পেট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদিগের দ্বন্দ্ব, গ্রিসে স্পার্টান ও হেলটের দ্বন্দ্ব এই স্বাধীনতা লইয়া। অধুনাতন ইতালি ও তুরস্কের দ্বন্দ্ব, ইংলণ্ডীয় লর্ড ও সার্ফের দ্বন্দ্ব এই স্বাধীনতা লইয়া। আবার, এই স্বাধীনতার জন্য আমেরিকায় রাষ্ট্রবিপ্লব ও ফ্রান্সে রাজবিপ্লব। সংক্ষেপতঃ, যাবতীয় রাজ্যবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, ও সমাজবিপ্লব, সকলই ঐ স্বাধীনতা লইয়া। এই সকল দ্বন্দ্বের পরিণাম কি? যাহারা একাগ্রচিত্তে স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা অবশেষে অনেক দুর্ঘটনার পর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই বাঞ্ছিত স্বাধীনতা তাহাদের দিতেই হইল, কেবল লাভের মধ্যে বৃথা দ্বন্দ্ব, কলহ, যুদ্ধ, শোনিতপাত, অর্থব্যয়, শান্তিভঙ্গ প্রভৃতি নানা অমঙ্গলকর কার্য্য করিতে হইল। বারিপূর্ণ কলসের মুখবন্ধ করিয়া তন্নিম্নে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে অন্তঃস্থ বাষ্পরাশির তেজে সেটী যেমন ফাটিয়া যায়, তেমনি যাহার মনে স্বাধীনতার ভাব অতি প্রবল হইয়াছে তাহাকে স্বাধীনতা না দিলে সে বিপ্লব উপস্থিত করিবে। কয় দিবস তাহার প্রচণ্ড বৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিবে? সময় ও অবসর পাইলে ঐ ইচ্ছারূপ বাষ্প সংসার ফাটাইয়া ফেলিবে।

তুমি ব্যাঘ্রশিশুকে লালন পালন কর, আপনার আধিপত্যে রাখ, রাখিতে পারিবে। কিন্তু কতক্ষণ অবধি রাখিতে পারিবে? যতক্ষণ তাহার স্বভাব উপায়ান্তর দ্বারা বিকৃত বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে। যতক্ষণ তাহাকে সিদ্ধ মাংস বা দুগ্ধান্ন দিবে, অর্থাৎ তোমার অধীনতা স্বীকারের উপযোগী তদ্বিবৎ করিবে। কিন্তু সে যদি আম মাংস ভক্ষণ করে, সদ্য রক্তের আস্বাদন পায় তখন কি তুমি তাহাকে স্বাধীনভাবে

বিচরণ করিতে না দিয়া রাখিতে পার? ছাড়িয়া দিয়া তোমার জীবনের অনিষ্ট আশঙ্কা না করিয়া তৎসহবাস করিতে পার? না করা উচিত? তাহার স্বাধীনতা বৃত্তি প্রবল হওয়াতে, নিজের কল্যাণের জন্য তাহাকে তাহা দান করা কর্ত্তব্য, নতুবা জীবনের মায়া ছাড়িয়া দিতে হয়। তদ্রূপ ইপ্সিতকামা শিক্ষিতা স্ত্রীজাতিকে সংসারের শান্তি রক্ষার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইংরাজী শিক্ষার গুণে ভারতবাসী আজি স্বাধীনতা কি মহার্ঘ বস্তু তাহা জানিতে পারিয়াছে। ইংরাজ সংবাসে স্বাধীনতার ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিষয় বলিতেছি না, সামাজিক ও ধর্ম্ম স্বাধীনতার বিষয় বলিতেছি। হিন্দু আর সমাজের কঠোর বন্ধনের মধ্যে থাকিতে চাহে না। স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, স্বতন্ত্র সমাজ সংস্থাপন করিতেছে। ধর্ম্ম স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। কেন করিতেছে? শিক্ষাই ইহার মূল। মনে স্বাধীনতা ভাবের প্রবেশই এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ। ধর্ম্ম ও সামাজিক স্বাধীনতা না দিলেও তাহারা যথাশক্তি অর্জ্জন করিয়াছে—এই ত গেল পুরুষ সম্বন্ধে কথা। কিন্তু স্ত্রী সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে—তাহাদিগকে স্বাধীনতা না দিলে তাহারা স্বয়ং অর্জ্জন করিবে। এজন্য বলি, স্বাধীনতা যদি বাস্তবিক মঙ্গলকর হয়, তাহা হইলে তদাকাঙ্ক্ষীকে দেওয়া কি উচিত নয়? যদি বল স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপযুক্ত হয় নাই—স্বাধীনতা দিলে তাহার অপব্যবহার করিবে; অতএব দেওয়া উচিত নয়। এ কথা ভাল। কিন্তু আমরা স্ত্রীজাতি অনুপযুক্তা থাকিতে স্বাধীনতা দিতে বলিতেছি না। শিক্ষা দ্বারা উপযুক্তা কর এবং উপযুক্তা হইলে স্বাধীনতা দেও। শিক্ষা দ্বারা উপযুক্তা না হয়, দিও না। কিন্তু যদি উপযুক্তা হয়, তাহা হইলে না দিবে কেন? স্ত্রীপুরুষকে সমান শিক্ষা দেও, সমান উপযুক্ত হউক, তৎপরে সমান স্বাধীনতা দিও। কালে শিক্ষা দ্বারা উপযুক্ত হইলে দিতেই হইবে। আমাদের বিবেচনায় স্ত্রীজাতি শিক্ষা দ্বারা উপযুক্ত হইয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা করিলে বিনা দ্বন্দে তাহাদিগকে তদ্ দান করা উচিত। নতুবা তাহারা নানা অনিষ্টপাতের কারণ হইবে।

"Women who read, much more women who write, are, in the existing constitution of things, a contradiction and a disturbing element: and it was wrong to bring women up with any acquirements but those of an odalisque, or of a domestic servant."

JOHN STUART MILL.

কেহ কেহ বলেন, শিক্ষা পাইলে

স্ত্রীজাতি বুঝিতে পারিবে যে তাহারা পুরুষ অপেক্ষা শারীরিক দুর্ব্বলা। অতএব পুরুষের অধীন হইয়া থাকিবে—পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য দ্বন্দ্ব করিবে না। অবশ্য, শিক্ষা দ্বারা আত্মজ্ঞ ও সুখী হওয়া যায়। স্ত্রীজাতি যে শারীরিক দুর্ব্বলা, শিক্ষিতা স্ত্রী জানিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইলে যে পুরুষের অধীনা হইবে তাহার নিদর্শন কি? বাঙ্গালি পুরুষ যে পাঞ্জাবি, সিক ও ইংরাজ জাতি অপেক্ষা শারীরিক দুর্ব্বল, তবে কেন বাঙ্গালী সিক বা ইংরাজের সহিত সমান অধিকার চায়; স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইচ্ছা ও চেষ্টা করে? দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালী পুরুষ অপেক্ষা মহারাষ্ট্রীয়, পাঠান ও সিক জাতীয় স্ত্রীলোক শারীরিক বলে উৎকৃষ্টা, তবে কেন শিক্ষিত বাঙ্গালী ঐ দেশীয়া স্ত্রীজাতির অধীন হইতে ইচ্ছা করে না? এতদ্দেশে ঝান্সির মহারাণী ও ইউরোপে জোয়ান-অর্ক-আর্ক প্রভৃতির শারীরিক বল বা বুদ্ধি কৌশল কি তোমাদের অপেক্ষা অধিক নয়? তোমরা শিক্ষিত হইয়া যখন অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠা ও বুদ্ধিমতি স্ত্রীর অধীনত্ব স্বীকার করিতে চাহ না, তখন দুর্ব্বলা রমণী বলিষ্ঠ পুরুষের অধীনত্বে থাকিতে ইচ্ছা করিবে কেন? কেননা সে স্বাধীনতা পাইতে চেষ্টা করিবে? শিক্ষাতে মানসিক বল বৃদ্ধি করে। মানসিক বল বৃদ্ধি হইলে কি শিক্ষিত পুরুষ বা শিক্ষিতা স্ত্রী স্বীয় শারীরিক দুর্ব্বলতায় সংকোচিত হয়? না অপরের সবলতায় ভীত হয়? জ্ঞান বল মহাবল। তবে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানবল আসুরিক বলকে ভয় করিবে কেন? যাহা হউক, আমরা স্বীকার করি যে স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতিতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে স্ত্রীজাতি পরাস্ত হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি দ্বন্দ্ব করা উচিত? যাহারা প্রণয়ের সামগ্রী তাহাদের সহিত দ্বন্দ্ব! কখনই উচিত নয় বলিতে হইবে। অতএব দ্বন্দ্বের পূর্ব্বে শিক্ষিতা রমণীকে ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

নবজীবন ও প্রচার এবং নব হিন্দুধর্ম্ম।

আজকাল হিন্দুধর্ম্ম লইয়া যে বিপরীত আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে একেবারে স্থির থাকা অসম্ভব। 'নবজীবন' পাইয়া সমস্ত বঙ্গদেশ যেন নিদ্রোত্থিত হইয়াছে। 'প্রচারের' উদ্দীপনায় মৃত হিন্দুসমাজের অস্থিরাশিতে যেন নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে। সকলেরই মুখে এখন 'নবজীবন' ও 'প্রচার' বই আর

কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। সকলে ঘটিবাটী বেচিয়াও যেন 'নবজীবন' ও 'প্রচারের' মূল্যপ্রাপ্তির স্তম্ভ পূরণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। এ নবজীবনের নূতন উৎসাহে বঙ্গসমাজ আজ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। হারাণ ধন পুনঃপ্রাপ্ত হইলে কাঙ্গালের মন যেরূপ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, লুপ্তপ্রায় ও পদদলিত হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রচারে হিন্দুসমাজের আজ সেই আনন্দোচ্ছ্বাস!

'নবজীবন' ও 'প্রচার' যে সত্য সত্যই কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, বা হিন্দুধর্ম্মের কোন নূতন ব্যাখ্যা দিতেছে, তাহা নহে। থিয়োসফি বা তত্ত্ববিদ্যা লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের যে জীবনসঞ্চার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে,'নবজীবন' ও'প্রচার' তাহার সহায়তা করিতেছে মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের অভ্যন্তরে—রূপকজালের ভিতরে—যে রত্নরাজি নিহিত আছে, সেই সকল তুলিয়া 'নবজীবন'ও 'প্রচার' হিন্দুসমাজকে উপহার দিতেছে। এই জন্য উক্ত পত্রিকাদ্বয় সমস্ত হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতা-পাত্র সন্দেহ নাই।

ইংরাজগণের রাজত্বকালের প্রারম্ভ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কেবল খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের স্বাপক্ষ্যে বলিবার তখন কেহ ছিল না, এই জন্য খ্রীষ্টীয় মিসনরিগণ অবাধে হিন্দু-ধর্ম্মের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া বেড়াইতেন। তরলমতি হিন্দু-যুবকগণ সেই কুহকে পড়িয়া দলে দলে খ্রীষ্টান্ হইতে লাগিলেন। জননীর ক্রন্দনে, জায়ার আর্ত্তনাদে কিছুকাল ভারতগগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এই সময় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব। এই জন্য তিনি হিন্দুধর্ম্মের নিরাকারবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে একটী অবতার—হিন্দুধর্ম্মে তেত্রিশ কোটি অবতার। সুতরাং খ্রীষ্টান্ প্রচারকেরা হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা খৃষ্টান্ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই জন্যই অনেক যুবক খৃষ্টান্‌ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় নিরাকার একেশ্বর-বাদ প্রচার করিয়া এই স্রোত রোধ করিলেন, 'ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই অদ্বৈতবাদের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে খৃষ্টান্ ইউনিটেরিয়ান্ ধর্ম্মের সমান করিলেন। 'ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্'—ইহার অদ্বৈত-বাদীয় অর্থ এই যে এই জগতে এক সত্তা আছে—সেই সত্তা ঈশ্বর। কিন্তু রামমোহন রায় ব্যাখ্যা করিলেন যে ঈশ্বর এক বই দ্বিতীয় নাই। রামমোহন রায়ের এই ব্যাখ্যায় মোহিত হইয়া হিন্দু-যুবকগণ দলে দলে ব্রাহ্ম হইতে লাগিলেন।

তৎকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে

স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইত না। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সারসংগ্রহ বলিয়া সকলেই বিবেচনা করিতেন। ব্রাহ্মেরাও তৎকালে 'আমরা হিন্দু নহি' এই জয়পতাকা মাথায় বাঁধেন নাই। সুতরাং প্রবীণ হিন্দুরাও ব্রাহ্মসমাজে গিয়া ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রামমোহনরায়-প্রতিষ্ঠাপিত ব্রাহ্মসমাজ এখন আদি-ব্রহ্মসমাজ নামে খ্যাত। এই আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত হিন্দুসমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কারণ আদিব্রাহ্মসমাজ বেদাদি হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করায় হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন না। প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় হিন্দু অদ্বৈতবাদের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া, ব্রাহ্মসমাজকে নূতন আকার দিলেন বটে, কিন্তু উভয় সমাজকে সূক্ষ্মসূত্রে আবদ্ধ রাখিলেন। দিন দিন ব্রাহ্মসমাজের সহিত হিন্দুসমাজের ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছিল—এমন সময় সেই মহাপুরুষের অকালে মৃত্যু হইল। ভারতগগনে সহসা যেন অকাল মেঘ উদিত হইল। কিছু দিন সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

এমন সময় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। হিন্দুসমাজকে তুলিব, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের নব নব ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে সময়োপযোগী বেশভূষায় বিভূষিত করিব, কেশব বাবুর মনে তখন এ ইচ্ছা হইল না। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং শেষে সমস্ত পৃথিবীকে একধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সংস্কৃত তত জানিতেন না বলিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের মূল্য বুঝিতেন না। সুতরাং আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা বাইবেল তখন তাঁহার অধিকতর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি ইউনিটেরিয়ান্ খৃষ্টানধর্ম্মকে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া ভারতে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় আচার ব্যবহার, এবং বিবাহ ও উপাসনা পদ্ধতি পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মসমাজে চালাইবার চেষ্টা করিলেন এবং তদ্বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। এইরূপে ব্রহ্মসমাজ ক্রমে ক্রমে অতর্কিতভাবে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। অবশেষে তিন আইন * এই দুই সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া ফেলিল। কেশববাবু সমস্ত ভারতবর্ষকে এক ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিতে গিয়া হিন্দুসমাজ হইতে মৌলিকদল † পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজ উভয়েরই সমূহ ক্ষতি হইল। স্থিতিশীলজনবহুল হিন্দুসমাজকে যাঁহারা সর্ব্বদা সংস্কারের জন্য উত্তেজিত করিতেন, তাঁহারা বাহিরে

---

* Act III. or Indian civil marriage Act. ইহাতে আমরা হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি নহি বলিতে হয়।

† Radical party—যাহারা সমাজ ও ধর্ম্মের আমূল সংস্কারের আবশ্যকতা স্বীকার করেন।

গিয়া পড়ায় হিন্দুসমাজ আবার নিমীলিতনেত্র হইলেন। যে কিছু আবশ্যকীয় সংস্কার তাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজের স্কন্ধে চাপাইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। অলসের যে সান্ত্বনা তাঁহাদিগেরও সেই সান্ত্বনা। অলসেরা যেমন পাছে নড়িতে হয় বলিয়া যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ কাজ করিবার ভয়ে যাহা আছে তাহাই ভাল বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন।

এ দিকে ব্রহ্ম সমাজ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনিয়ন্ত্রিত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাহা পরিত্যাগ করা যায়, তাহার সৌন্দর্য্য দেখায় মানুষের আর প্রবৃত্তি হয় না। ভাল জিনিস্ ছাড়িয়া আসিয়াছি ভাবিতেও মনে কষ্ট হয় বলিয়া, লোকে অবশেষে পরিত্যক্ত দ্রব্যের কেবল দোষাংশ ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করে। ব্রাহ্মসমাজও তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিত্যক্ত হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্ম্মের কেবল দোষাংশ দেখাই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ম্ম হইয়া উঠিল। যে সকল সমাজসংস্কার তাঁহাদিগের হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু, হিন্দুমতে সে সকল সংস্কারকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহারা যোগ দিতে অসম্মত হইতে লাগিলেন। আমার একটী প্রিয় ব্রাহ্মবন্ধু যে মতে হউক বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর তাঁহার আর সে মতি গতি রহিল না। একবার হিন্দুমতে অনুষ্ঠানীয় একটী বিধবাবিবাহে আহূত হইয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে বিবাহস্থলে শালগ্রাম উপস্থিত থাকিলে তিনি তথায় যাইতে পারিবেন না। হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুসমাজে তাঁহারা আর কিছুই ভাল দেখিতে পাইলেন না। হিন্দু নাম তাঁহাদিগের নিকট অপবিত্র বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তাঁহারা সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে খৃষ্টীয় সমাজ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আদর্শে গঠিত করিয়া লইতেছেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ অধিকতর দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। ইহা উভয় সমাজের পক্ষেই একটী শোচনীয় রাজনৈতিক দুর্ঘটনা। কোথায় শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ বিদ্বেষভাব ভুলিয়া পরস্পরের সহিত অধিকতর ঘনীভূত হইবে—না ক্রমশঃ আরও বিচ্ছিন্ন হইতে চলিল। কেশব বাবু শেষকালে এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সংশোধন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালবশে অকালে প্রাণ হারাইলেন। সুতরাং তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ স্থিতিশীল হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিলে পরস্পর সংঘর্ষে পরস্পরই উপকৃত ও উন্নীত

হইতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত হইতে চলিল। উভয় সমাজের ভিতর অতর্কিত ভাবে কি-যেন-এক শত্রুতা-ভাব দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবিশিষ্ট—পরস্পর পরস্পরের প্রতি মমতাশূন্য। যাহা কিছু হিন্দু ব্রাহ্মের চক্ষে তাহাই যেন অপবিত্র বলিয়া প্রতীত হয়। আজ কাল দেখিতেছি হিন্দুসমাজের ভিতরও ব্রাহ্মগণের বিরুদ্ধে সেইরূপ কি যেন এক ভাব উঠিতেছে। এই ভাব-তরঙ্গ যে শুদ্ধ প্রাচীন সম্প্রদায়ে আবদ্ধ তাহা নহে, নব্য সম্প্রদায়ের ভিতরও ইহার প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা যাইতেছে। এই ভাব বহুদিন ধরিয়া ধূমায়মান হইতেছিল, এক্ষণে তাহার স্ফুলিঙ্গ 'নবজীবন' ও 'প্রচার' রূপে আবির্ভূত হইয়াছে। উক্ত পত্রিকাদ্বয় আর্য্যধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন উপলক্ষে ব্রাহ্মবিদ্বেষও প্রচার করিতেছে।

এ আন্দোলনের আগমনী থিয়োসফি পূর্ব্বেই গাইয়াছে। থিয়োসফিকাল্ বা তত্ত্ববিদ্যাসমাজ পূর্ব্বেই ধূয়া ধরিয়াছে, যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির গ্রন্থনিচয়ে যে সমুদায় অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, পাশ্চাত্য রত্নরাজি তাহার সহিত তুলনায় কিছুই নহে। থিয়োসফি স্পষ্টাক্ষরে ও মুক্তকণ্ঠে জগতে উদ্ঘোষিত করিয়াছে, যে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ভারত কখনই উঠিবে না, কখনই বড় হইবে না; আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ যে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তুলনায় পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক উন্নতি অতি সামান্য। উক্ত সমাজ শুদ্ধ এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই—থিয়োসফি মাসিকপত্রে প্রতিনিয়ত উহার প্রমাণ দিতেছেন। আর্য্যশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া তাহা হইতে রত্নরাজি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে সে সমস্ত, ঔজ্জ্বল্যে ও প্রতিভায় পাশ্চাত্য রত্নরাজি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।

তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব ও ভারতী প্রভৃতি সাময়িক-পত্রিকাও সেই কার্য্যের অনেক সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু 'নবজীবন' ও 'প্রচার' প্রধানতঃ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে 'নবজীবন' ও 'প্রচার' হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাব গ্রহণ না করিয়া শুদ্ধ পৌত্তলিকতার উপর বিশেষ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে আস্তিক, নাস্তিক, অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদী; সাকারবাদী, নিরাকার-বাদী, শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম, সকলেই অপরিত্যাজ্য, সকলেই আদরণীয়। হিন্দু ধর্ম্ম বলে না যে সকলকেই ঈশ্বরের রূপকল্পনা করিয়া পূজা করিতে হইবে। আবার রূপ কল্পনা করিলেই যে উপাসনা অসিদ্ধ হইবে এ কথাও ইহা বলে না। সাধকের বিকাশভেদে উপাসনাভেদ—হিন্দু ধর্ম্মের চরম উৎ-কর্ষের লক্ষণ। হিন্দুধর্ম্ম ব্যক্তিভেদে জড়োপাসনা হইতে অনন্তের উপাসনা

ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে। ব্যক্তিভেদে ইষ্টদেবতা স্বতন্ত্র করিয়া গিয়াছে। যে শালগ্রাম শিলার উপাসক সেও হিন্দু, এবং যে অনন্ত অজ্ঞাত অজ্ঞেয় ও অবাঙ্মনসোগোচর ব্রহ্মের উপাসক সেও হিন্দু। যে ভক্তিবাদী সেও হিন্দু, যে জ্ঞানং-ব্রহ্ম-বাদী সেও হিন্দু। যে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ববাদী সেও হিন্দু, যে ঈশ্বরের বিশ্বরূপত্ববাদী সেও হিন্দু। যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে, তাহার নিকট কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি থাকিতে পারে না। প্রকৃত অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই চণ্ডালের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। প্রকৃত অদ্বৈতবাদীর নিকট সকলই বিশ্বরূপ ভগবানের প্রতিকৃতি বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে-সুতরাং জাতিগত,ধর্ম্মগত, বর্ণগত ভেদ তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। জাত্যভিমান, বংশমর্য্যাদার অভিমান, যে কোন প্রকার অভিমান তাঁহার থাকিতে পারে না। তাঁহার নিকট হিন্দু যবন, ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম শ্বেত, কৃষ্ণ ভেদ কিছুই রহিতে পারে না। এই প্রকাণ্ড বিশ্বজনীন ভাবে শঙ্করাচার্য্য বিশাল বৌদ্ধ ধর্ম্মকেও হিন্দু ধর্ম্মের কুক্ষিগত করিতে পারিয়াছিলেন। যে যেখানে হিন্দু হইতে চাহিয়াছিল,তাহাকেই তিনি হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন। ভারতে আবার হিন্দু ধর্ম্মের সেই বিশাল ভাবের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছে। সঙ্কীর্ণভাবে ভারতের আর মঙ্গল নাই।

যে ধর্ম্ম সমস্ত ভারতকে অন্ততঃ ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীকে এক ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারে, সেই ধর্ম্মই আমাদের আরাধ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এক সময়ে আমরা এই আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণভাব ধারণ করায় সে আশা গিয়াছে। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাবে যে মহাপুরুষ আবার ভারতকে অনুপ্রাণিত ও ঘনীভূত করিতে পারিবেন তিনিই আমাদের পূজার পাত্র সন্দেহ নাই। যিনি হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাবে ও বিশাল প্রেমোচ্ছ্বাসে ব্রাহ্মসমাজ, এবং দেশীয় খ্রীষ্টান ও মুষলমানসমাজকে হিন্দুসমাজের কুক্ষিগত করিতে পারিবেন —তিনি ভারতবাসিমাত্রেরই উপাস্য দেবতা। সে মহাপুরুষের চরণে আমরা উদ্দেশে নমস্কার করি। কিন্তু যিনি তাহা না করিয়া ধর্ম্মের নামে—ঈশ্বরের নামে—সহস্রধা বিদীর্ণ ভারতবক্ষের আর একটীও ক্ষত বাড়াইবেন, তিনি ভারতের প্রকৃত শত্রু। যে ধর্ম্ম ভারতে আরও দলাদলি বাড়াইতে চাহে, যে ধর্ম্মধ্বজ দগ্ধপ্রায় ভারতে আরও ধর্ম্মবিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিতে চাহেন,আমরা তাদৃশ ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম, প্রচারককে দূর হইতে নমস্কার করি। যে ভাবে বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, গুরুগোবিন্দ ও চৈতন্য ভারতের একীকরণকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই ভাবে আবার ভারতের একীকরণ আরম্ভ করিতে হইবে। ইহা সম্প্রদায় বা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ দ্বারা হইবে না। সর্ব্বগ্রাসিপ্রেম ব্যতীত পূর্ণ অভেদজ্ঞান ব্যতীত, গভীর আত্ম-বিস্মৃতি ব্যতীত, এ সাধনায় কেহ সিদ্ধ হইতে পারিবেন না! যেমন সাধ্য তেমনই সাধনা চাই। যেমন সাধনা তেমনই সাধকের প্রয়োজন!

—

পাণ্ডবগণের কাল ও সংক্ষিপ্ত জীবনী।

হিন্দুদিগের প্রাচীন ইতিহাস নাই—এই প্রবাদ বাক্যটী আজ কাল কৃতবিদ্য সুসভ্য হিন্দুসন্তানগণের নিকট নিতান্ত অশ্রাব্য ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিয়াছে। যদিও হিন্দুগণের কাশ্মীর-ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীগ্রন্থ ব্যতিরিক্ত সম্পূর্ণাঙ্গ-বিশিষ্ট কোন একখানি ইতিহাস স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁহাদিগের বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সাহিত্য ও নৈতিক শাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্র যাহা যাহা বর্ত্তমান আছে, ঐ সকল গ্রন্থ হইতে কবিকল্পনাদি ভাগ পরিত্যাগ করিয়া যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত ইতিহাসযোগ্য যে যে উপকরণের সদ্ভাব আবশ্যক, ঐ গুলিতে সেই সেই উপকরণের প্রচুর সদ্ভাব উপলক্ষিত হইয়া থাকে। কেবল নাইবুর বা গ্রোটের ন্যায় সংগ্রহকার এবং ইতিহাসবেত্তার অভাবই পূর্ব্বোক্ত অসার ও জাতীয় অবমাননাসূচক প্রবাদ-বাক্যের একমাত্র কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যাঁহারা দিগ্বিজয়ী মহাবীর সেকন্দর সাহের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বসাময়িক ভারতীয় ইতিহাসের কথা উল্লেখেই অবিশ্বাস নিবন্ধন উপহাস করিয়া থাকেন; যাঁহারা আর্য্যভাষানভিজ্ঞ হইয়া কেবল মাত্র বৈদেশিকজাতি-সংগৃহীত বিকৃত স্বদেশীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য ইতিবৃত্তবিদ্‌গণের ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ক মীমাংসাগুলি অখণ্ডনীয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এই বিনীত প্রার্থনা যে, তাঁহারাত এক প্রকার মানসিক সংস্কার লইয়া জীবন যাপন করিলেন, তাঁহারা যেন তদীয় সন্তান-গণকে ও উন্নতিপ্রিয় আত্মীয় বান্ধব-গণকে এবং ভারতের আশা-স্থলীয় স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে তাঁহাদিগের তাদৃশ সংস্কার-পাশে পাতিত করিয়া জাতীয় উন্নতির, জাতীয় জীবনের ব্যাঘাতক হইয়া না উঠেন। আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ আর্য্য-গণ সভ্যতার উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ় হইয়া এক সময়ে পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতির সভ্যতা-পথ-প্রদর্শক ও জ্ঞানোপদেশক ছিলেন; যাঁহারা জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজ-গণিত, পাটীগণিত ও চিকিৎসাদি বিদ্যার উন্নতিসাধন করত প্রাচীন আরব ও গ্রীসদেশবাসি-গণকে তত্তৎ-শাস্ত্রে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন; যাঁহাদিগের গভীর মস্তিষ্কসমুত্থিত বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, দর্শন, স্মৃতি, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ এবং সাহিত্য প্রভৃতি পৃথিবীর প্রত্যেক সুসভ্য জাতির নিকট উপাস্য দেবতা হইয়া রহিয়াছে। যে প্রাচীন গ্রীস সমস্ত ইয়োরোপ খণ্ডের জ্ঞান বিজ্ঞান

ও সভ্যতা-প্রবর্ত্তক, সেই পুরাতন গ্রীসই একালে ভারতের মন্ত্র-শিষ্য ছিল। ফলতঃ যে আর্য্যজাতি অপরিজ্ঞাত সময়াবধি সিন্ধুদেশীয় রাজা ডাহিরের পরাজয় বা দাসানুদাস কুতবুদ্দীনের ভারতাধিকার পর্য্যন্ত পরাধীনতার ভাব লেশমাত্র অনুভব করিতে পারিতেন না; যে আর্য্য-গণ "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অহর্নিশ ভারতমাতার প্রিয়কার্য্য সাধনে, ভারতমাতার স্বাধীনতা-রক্ষণে জীবন পরিত্যাগ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইতেন; যাঁহাদিগের নির্ব্বাপিত তেজোবহ্নির একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ কালাগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া পৃথ্বী-জিগীষু মহাবীর সেকন্দরের অন্তরাত্মাকে প্রকম্পিত ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল; সেই অমিততেজস্বী আর্য্য-মনস্বিগণের জাতীয়জীবনাবধায়ক, জাতীয়-তেজঃ-উত্তেজক ইতিহাস ছিল না, একথা কোন্ কৃতবিদ্য ভারত-সন্তান গ্রাহ্য করিবে?

যখন আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন আর্য্যসন্তান-গণ পবিত্র আসনে সমাসীন হইয়া মহর্ষি-গণের নিকট তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ-গণের ইতিহাস শ্রবণ করিতেছেন; যখন আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যগণ পূর্ব্বপুরুষ-গণের জ্ঞানবত্তা, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, শৌর্য্য এবং বীর্য্য শ্রবণ করিয়া অধ্যবসায় দ্বারা তত্তদ্‌গুণ-নিকর অনুসরণ করিতেছেন —অধিক কি, যাঁহাদিগের নাম, গোত্র, প্রবর, শাখা, তর্পণবিধি, এবং সন্ধ্যা বন্দনাদি যাবতীয় নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়া-কলাপ একমাত্র ইতিহাস-মূলক—তখন আর কে একথা বিশ্বাস করিবে যে, প্রাচীন আর্য্যগণ ইতিহাস-প্রিয় ছিলেন না এবং তাঁহারা ঐতিহাসিক বলিয়া বিখ্যাত হন নাই?

অতীতসাক্ষী বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সাহিত্যাদি গ্রন্থ-নিচয়ও পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিবে।

অপিচ, সম্রাট্ আকবর সাহের সুপ্রসিদ্ধ অমাত্য আবুল্ ফজল্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, বিখ্যাত চাঁদকবির "পৃথ্বীরায় রাসৌ" নামক হিন্দুকুল-গৌরব দিল্লিপতি পৃথ্বীরায়ের জীবনী এবং চীনদেশীয় প্রথিত বৌদ্ধ পরিব্রাজক হোয়েন্থসাঙ্গ বর্ণিত নীলপীঠ নামক ভারতের এক খানি দৈনন্দিন ঘটনা-পূর্ণ বিবরণ, এই সকল গ্রন্থ স্পষ্টরূপে ইহা সপ্রমাণ করিতেছে যে, পূর্ব্বকালে ভারতে ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি প্রকৃষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। উপর্য্যুপরি বৈদেশিক-জাতিসমূহের ভারতাক্রমণ-জনিত রাষ্ট্রবিপব ও রাষ্ট্রপরিবর্ত্তনের সহিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে লিখিত ভারতীয় ইতিহাসগুলি বিলুপ্ত হইলেও আর্য্যজাতীয় গ্রন্থনিচয়ে যে সকল সমাজ-চিত্র ও লোক-চরিত্র দেদীপ্যমান

রহিয়াছে, ঐ সকল বিষয় হইতে প্রকৃত ইতিহাস-যোগ্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিলে অতি সহজেই নষ্টোদ্ধার সংসাধিত হইয়া উঠিতে পারে।

যাঁহারা কেবল মাত্র বংশপরম্পরা, যুদ্ধ-ঘটনা বা ঘটনা বিশেষকে ইতিহাসের প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত ইতিহাস-তত্ত্বের মর্ম্ম-গ্রহ করিতে অতি অল্পই সক্ষম হইয়াছেন।

বাস্তবিক, পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি প্রকৃত ইতিহাসের অঙ্গমাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, প্রকৃত ইতিহাসের প্রতিপাদ্য—লোকচরিত এবং তৎ-সম্ভূত সমাজচিত্র অথবা বাক্যান্তরে বলিতে হইলে জাতীয় মানসিক উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা এবং তজ্জনিত জাতীয় উন্নতি বা অবনতি। এই পরোক্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনাই জাতীয় উন্নতির নিদান, এবং ইহাই অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের অধ্যয়ন-লভ্য ফল। যাহা হউক, সাধারণতঃ ইতিহাস আখ্যানময় ও বিজ্ঞানময় রূপে ভাগ-দ্বয়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। যাহাতে বংশ-পরম্পরা, জীবন কাল, যুদ্ধ-ঘটনা বা ঘটনা-বিশেষ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত থাকে, তাহাকে আখ্যানময় ইতিহাস বলে, এবং যাহাতে লোকচরিত এবং তৎ-সম্ভূত সমাজ-চরিত্র অতি বিশদরূপে বর্ণিত থাকে, তাহাকে বিজ্ঞানময় ইতিহাস বলে। কিন্তু কোন্‌টি প্রকৃত ইতিহাস-পদ-বাচ্য তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে।

প্রাচীন আর্য্যগণের গ্রন্থে বিজ্ঞানময় জাতীয় ইতিহাস অতি বিশদরূপে বিবৃত রহিয়াছে এবং আখ্যানময় ইতিহাস-স্থানীয় বিষয়গুলিও অপরিস্ফুটভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তবে অতি পুরাতন কালের আখ্যানময় ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গীনভাবে হইতে পারে না। কারণ, মানবজাতি-সৃষ্টির বহুকাল পরে, প্রত্যেক মানবসমাজ সংগঠিত হইলে, জ্ঞান-চর্চ্চার আরম্ভ হয়। সুতরাং তৎকাল হইতেই ইতিহাসের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন মানব-সমাজ সংগঠিত হইলেও তাৎকালিক ইতিহাসে প্রকৃত ও কল্পিত এই উভয়বিধ বিষয়ই সংমিশ্রিত থাকে, পরে জাতীয় জ্ঞানোন্নতির সহিত কল্পিত বিষয় পরিত্যক্ত ও প্রকৃত বিষয় পরিগৃহীত হইয়া যথার্থ ইতিহাস লিপি বদ্ধ হইয়া থাকে।

যখন ভারত সৌভাগ্য-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, সভ্যতার উচ্চতম শিখরে সমারূঢ়, তখন মিশর (মিশ্রদেশ) সদ্যোজাত বৎসতরীর ন্যায় ভারত-কামধেনুর সৌভাগ্য-পয়ঃ-পানলালসায় লোলুপ ও তদুদ্দেশ্যে প্রধাবিত। মিশরের তৎ-সাময়িক ইতিবৃত্ত উপন্যাসময় এবং অতি সামান্য অবস্থায় অবস্থিত। প্রাচীন গ্রীসের ঐতিহাসিক বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ৭৭৬ খৃষ্টাব্দ

পূর্ব্বের ইতিহাস সমস্তই উপন্যাসে পরিপূর্ণ এবং কাল অনির্দ্দিষ্ট।

তদনন্তর ৭৭৬ খৃঃ পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পিসিষ্ট্রেটসের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস দুই একটী সামান্য গল্পমাত্রে নিঃশেষিত হইয়াছে।

রোমের প্রাচীনতম কালের ইতিহাস পাঠ করিলেও কবি-কল্পনা ও দৈবী ঘটনা ব্যতিরিক্ত প্রকৃত ইতিহাস-যোগ্য বিষয় কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং পৃথিবীর সভ্য আর্য্যজাতি-উপনিবেশিত প্রাচীন ভারতের অতি পুরাতনবিষয়ক আখ্যানময় ইতিহাস যে দুর্লভ হইবে ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অধিক কি, কয়েক শতাব্দ পূর্ব্বে বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী ও বিদ্যাভিমানী ইউরোপের ঐতিহাসিক অবস্থা কিরূপ ছিল? সমস্ত ইউরোপীয় জাতি বিখ্যাত ফরাসী-বিপ্লব-জনিত মানসিক উন্নতি প্রভাবে কেবল-মাত্র গত শতাব্দ হইতেই প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বের সম্যকরূপে মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য জাতীয় প্রাচীন ইতিহাসগুলি উত্তরোত্তরকালে পরিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকৃত ইতিহাসরূপে সংগঠিত এবং সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুদিগের প্রাচীন ইতিহাসগুলির তাদৃশ সংস্কার হয় নাই বলিয়া আমরা জাতীয় ঐতিহাসিক বিষয়ে এত অভাব দেখিতে পাই। সুতরাং প্রথমতঃ, পাশ্চাত্য ইতিবৃত্ত-বিদ্গণের কল্পনায় বিশ্বাস করি, পরে জ্ঞানোদয় হইলে তাহাও আবার বিশ্বাস না করিয়া উদাসীনভাব অবলম্বন করিয়া থাকি।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীর উপদেষ্টা ছিলেন। যাঁহারা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতায় অভিমানী হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত দেশবাসী জাতি-নিচয়কে পশুজাতির মধ্যে গণ্য করিয়া ম্লেচ্ছ, যবন, শক, দরদ, পহ্লব, বর্ব্বর ইত্যাদি অসভ্যজাতীয় আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা সেই আর্য্যসন্তান, আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভিক্ষু হইয়া পরের (ম্লেচ্ছের) দ্বারে উপস্থিত, কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে পর-মস্তিষ্ক-অপেক্ষী হই।

যে ভারত স্মৃতি-বহির্ভূত কাল হইতে বিদ্যাধনের জন্য বিখ্যাত, সেই ভারত হইতে স্বাধীনতা, শৌর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদির সহিত বিদ্যাধনও কি সম্যক্ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে?

সুসভ্য ইউরোপীয়গণ স্বজাতীয় ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইয়া আমাদিগের আর্য্যভাষা অধ্যয়ন করতঃ আমাদিগকেই শিক্ষা দিতেছে—আমরা নিজের ভাষাই জানি না ও নিজের বিদ্যাই চিনি না, আমাদিগের কালা মুখ!

আর্য্যভাষাধ্যয়নে দেশীয় লোকের যাদৃশী রুচি, তাহাতে এদেশে সাধারণের উৎসাহের সময় আসিতে এখনও অনেক দিন বাকি রহিয়াছে।

পাঠক মহোদয়গণ! আমরা প্রকৃত

প্রস্তাব লিখিবার পূর্ব্বে একটী প্রয়োজনীয় কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। মহাত্মা যীশুখৃষ্টের জন্মের চারি হাজার আট বা চারি বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ২৩৫২ খৃঃ পূঃ বৎসরে পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইয়াছিল, ইহা যেন প্রত্যক্ষ করিয়াই পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ্‌গণ খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বসাময়িক প্রত্যেক ঘটনা-বিশেষের কাল নির্ণয় করিয়াছেন! তাঁহারা হিন্দুদিগের বেদ, মনু, পুরাণাদি নির্ম্মাণের ও সুপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ-ঘটনার কাল নির্দ্দেশ করিতেও উপেক্ষা করেন নাই! কোন মহাত্মা আবার প্রাচীন হিন্দুগণের সামাজিক রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহারের সাময়িক পরিবর্ত্তন প্রদর্শন দ্বারা যুগাদি নির্ণয় করিতে গিয়া একেবারে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পর ত্রেতাযুগ পাড়িয়া অযোধ্যাধিপ রামচন্দ্রের সীতা-উদ্ধারার্থ লঙ্কাপতি রাবণ বধের উল্লেখ করিয়াছেন!!

যাহাহউক, এইক্ষণ আমরা শীর্ষকে উল্লিখিত মহাত্মাগণের সময় নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, দেখা যাউক ইহা কিরূপ প্রতিপাদিত হইয়া উঠে।

আমরা দেখিতে পাই যে, কোন বিশেষ ঘটনা বা সামাজিক উপপ্লব হইতে যুগাব্দ এবং সুবিখ্যাত মানব-বিশেষের জন্মকাল হইতে অথবা তাঁহার জীবনকালের কোন অংশ হইতে কোন প্রকার অব্দ পরিগণিত হইয়াছে। মূলে একটী ঘটনাবিশেষ দ্বারা প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কোন প্রকার অব্দগণনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই বোধ হয়, প্রতীচ্য ইতিবৃত্তবেত্তৃগণ খ্রীষ্টজন্মের চারি হাজার আট বা চারি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি কল্পনা করিয়া তৎপরকাল-বর্ত্তী সমুদায় বিখ্যাত ঘটনার কাল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া থাকিবেন।

আর্য্যগণ কোন ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করিতে সচরাচর 'যুগাব্দ' ব্যবহার করিতেন।

এই যুগাব্দ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, কোন খণ্ডপ্রলয় বা পৃথিবীর আংশিক জলপ্লাবনকাল হইতে এই যুগাব্দ পরিগণিত হয়, আবার কেহ কেহ বলেন যে, রাজ্যবিপ্লব দ্বারা এবং সামাজিক রীতি, নীতি, আচার, ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দ্বারা যুগাব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

আমরা পরোক্ত মতের পক্ষপাতী। বাস্তবিক, যাঁহারা মহাভারতাদি পাঠ করিয়া তৎকালের সামাজিক রীতি, নীতি, আচার, ও ব্যবহারের সহিত তদুত্তরোত্তর কালের সামাজিক পরি-বর্ত্তনাদি সমন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, উত্তর কালে মহাভারতীয় কালের শৌর্য্য, বীর্য্য, ও সামাজিক

রীতি, নীতি, আচার, ও ব্যবহারে এবং ধর্ম্মাদির পরিবর্ত্তনবিষয়ে যুগান্তর হইয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-বাহুল্য ভয়ে তত্তৎপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিছুই লিখিত হইল না, চিন্তাশীল কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রেই তত্তাবৎ পরিজ্ঞাত আছেন।

এই পরিবর্ত্তনটি বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৯৮৫ বৎসর পূর্ব্বে সমাহিত হইয়া যুগান্তরে পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং ঐ কাল হইতেই কলিযুগাব্দ নামটি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

যেমন পাশ্চাত্য সৃষ্টাব্দ বা যুগাব্দটি খৃষ্টাব্দ দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে তেমনি কলিযুগাব্দ বা কল্যব্দ এক সময়ে যুধিষ্ঠিরাব্দ দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

এই প্রকারে যুধিষ্ঠিরাব্দও বিক্রমাদিত্যের সংবৎ ও শালিবাহনের শকাব্দ দ্বারা বিলোপিত হইয়া গিয়াছে। যদি প্রতীচ্য-বিদ্বদগণ-মানিত যুগাব্দটি খৃষ্টাব্দ দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন না হইত তাহা হইলে এইক্ষণ খৃষ্টাব্দ ১৮৮৪ না লিখিয়া সৃষ্টাব্দ বা যুগাব্দ ৫৮৯২ অথবা ৫৮৮৮ লিখিতাম।

পূর্ব্বকালে সংস্কৃত সাহিত-ক্ষেত্রে যতগুলি আখ্যানময় ইতিহাস ছিল, তৎসমুদায়ই বিনাশশীল কালের পরিবর্ত্তনের সহিত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ কেবল মাত্র কাশ্মীরদেশের রাজতরঙ্গিণী নামক একখানি ইতিহাস বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই কাশ্মীর ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীই সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে অদ্বিতীয় প্রমাপক হিন্দু-ইতিহাস।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে কাশ্মীর-রাজের মহামাত্য চম্পক প্রভুর পুত্র কহ্লণ-পণ্ডিত এই ইতিহাস খানি লিখিতে আরম্ভ করেন, পরে অন্যান্য লেখকগণ উহার পরিসমাপ্তি সাধন করেন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে :—

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ
ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষানামভবন্ কুরু
পাণ্ডবাঃ॥"

কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরু-পাণ্ডবেরা ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং উক্ত গ্রন্থে জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিশারদ মহর্ষি গর্গাচার্য্যের একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে যথা—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ
শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিক পঞ্চ দ্বিযুতঃ
শককালস্তস্য রাজ্যস্য॥"

এই বচনটির প্রথম পাদদ্বয়ের ব্যাখ্যা এই যে,—মহর্ষি গর্গ জ্যোতিঃশাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য-শাসন করিলে পর শকটাকৃতি সপ্তর্ষি-মণ্ডল অর্থাৎ অগস্ত্যাদিমুনি-নামধেয় সপ্ত নক্ষত্র মঘাদি নক্ষত্রে ছিল—অর্থাৎ মঘাগণের প্রত্যেক নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর ও পূর্ব্ব-

ফল্গুনী হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত একাদশটি নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর ভোগ করিতে ২৪০০ বৎসর গত হয়। অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালের বা জীবনকালের পরে এবং শকাব্দারম্ভ হইবার পূর্ব্বে ২৪০০ বৎসর গত হইয়া যায়।

আমরা রাত্রিকালে নভোমণ্ডলে কাল-পুরুষ-সংজ্ঞক অধোংধঃ অবস্থিত যে তিনটি দেদীপ্যমান নক্ষত্র দেখিতে পাই, ঐ গুলিতে ক্ষুদ্রাকারে ত্রয়োদশটি নক্ষত্র আছে, তাহাদিগকেই মঘাগণ বলিয়া থাকে। ঐ মঘানক্ষত্র-পুঞ্জের অনতি-দূরেই শকটাকৃতি সপ্তর্ষি-মণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত বচনটির অপর পাদ-দ্বয়ের ব্যাখ্যা এইরূপ যে, যুধি-ষ্ঠিরের রাজ্যনাম প্রকাশের পর (যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতেই যুধিষ্ঠিরের রাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে) ২৫২৬ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল। গর্গ মুনি এই শ্লোকটি দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-কাল বা জীবন-কাল এব শকাব্দারম্ভের কাল এতদুভয়ই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্মের পূর্ব্বগত ৬৫৩ বৎসরের সহিত তাঁহার জন্মের পরবর্ত্তী ২৫২৬ বৎসর যোগ করিলে কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল, ইহা জানা যায়। বর্ত্তমান শকাব্দ ১৮০৬ বৎসরের সহিত উক্ত ৩১৭৯ বৎসর যোগ করিয়া দেখিলে ৪৯৮৫ বৎসর কলির গতাব্দ পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বা জীবন-কালের পরে ২৪০০ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল, এবং তাঁহার জন্মকাল হইতে ২৫২৬ বৎসর অতীত হইলে, ঐ শকাব্দারম্ভ হয়, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের জীবনকাল কত বৎসর তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। কারণ, উক্ত ২৫২৬ বৎসর হইতে ২৪০০ বৎসর বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট যে ১২৬ বৎসর থাকে তাহাই তাঁহার জীবন-কাল।

যাঁহারা মানব-জীবন পাঠ করিয়া-ছেন, তাঁহারা অবশ্য জ্ঞাত আছেন যে, বর্ত্তমানকালের অপেক্ষা অতি পূর্ব্ব-কালের মানবগণ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন। ইদানীন্তন সময়েও শতাধিক বর্ষ জীবিত মনুষ্য দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়া থাকে। পরন্তু ইহাও বক্তব্য যে, বর্ত্তমানকালীন মানব-জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সহিত দীর্ঘকালজীবী মানবগণের জীবনগত বিভাগের সমানু-পাত সমান নহে। পাণ্ডবগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিবার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ বিষয়ে আমাদিগের কিঞ্চিৎ লিখা আবশ্যক হইতেছে। এই মহাযুদ্ধের সময়নির্ণয় বিষয়ে অনেক প্রকার মত পরিদৃষ্ট হয়। কোন মহাত্মা* বলিয়াছেন যে, এই মহাযুদ্ধ খৃষ্ট-

* Marshman.

জন্মের চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এবং কোন মহাত্মা * আবার লিখিয়াছেন যে,এই বৃদ্ধ মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট-জন্মের ১৪২৪ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, উক্ত মত-গুলি নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। ভারতীয় ইতিহাসলেখক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রায়ই কোন প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়া কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করত ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে যে কত প্রকার অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত ও দুঃখিত হইতে হয়।

কোন সময়ে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল তন্নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। কারণ, পরে প্রদর্শিত হইবে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের ৭৪ বৎসর বয়সের পর ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহা হইলে, তাঁহার দ্যূত-ক্রীড়াদি ব্যাপার, বনবাস, অজ্ঞাতবাস, এবং যুদ্ধোদ্যোগাদিতে যে পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত হয়, তাহা ঐ ৭৪ বৎসরের সহিত যোগ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রমের পরেই ঐ কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই বিষয়টি অতি সহজেই উপলব্ধ হয়; কারণ, ঐ যুদ্ধের ৩৭ বৎসর পরেই অর্থাৎ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ১২৬ বৎসর বয়সের পরেই তাঁহার মহাপ্রস্থানটি পরে প্রদর্শিত হইবে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। পরে ইহা সপ্রমাণ করা হইবে যে, কলির ৬৫৩ বৎসর গতেই রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। তাহা হইলে কলির ৬৫৩ বৎসরের সহিত উক্ত ৮৯ বৎসর যোগ করিয়া দেখিলে অতি সহজে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সময় নির্ণীত হইয়া উঠে। অতএব ঐ মহাযুদ্ধ কলির ৭৪২ বৎসর গতে, ২৪৩৭ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩০২ সম্বৎ পূর্ব্বে, এবং ২৩৫৯ খৃঃ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

এইক্ষণ আমরা একটি অবান্তর বিষয় এই প্রবন্ধ মধ্যে উপনিবদ্ধ করিতেছি। ইহাদ্বারা পাণ্ডবগণের জীবন কালাদি সম্বন্ধে অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সুবিখ্যাত রাজা গোনর্দ্দ কাশ্মীর দেশাধিপ রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন। তিনি কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে রাজ্যশাসন করেন, সুতরাং তিনি

* The birth of Parikshita 1115 years before the accession of Chuudra Gupta in 315 B. C; that is, in 1430 B. C. By this account the birth of Parikshita, the grandson of Arjuna, took place just six years before the great war in B. C. 1424.

—Cunningham.

শৌর্য্যশালী পাণ্ডুপুত্রগণের সমকালজাত ছিলেন। *

এই স্থলে বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজগণের জন্মকাল হইতেই তাঁহাদিগের রাজ্যশাসন বলিয়া বর্ণিত হইত, যদিও তাঁহাদিগের জন্মের বহুকাল পরে সচরাচর তাঁহাদিগের প্রকৃতরূপে রাজ্যশাসন আরম্ভ হইত। যেমন রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্মকাল হইতে তাঁহার রাজ্যকাল বলিয়া অভিহিত ছিল, কিন্তু তিনি বহুকাল পরে হস্তিনার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া কেবলমাত্র ৩৬ বৎসর প্রকৃতরূপে রাজ্যশাসন করেন।

এই রাজা আদিগোনর্দ্দ ৩৬ বৎসর ৬ মাস রাজ্যশাসন করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গের তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ঐ রাজা আদিগোনর্দ্দ যুদ্ধের সাহায্যার্থ স্বীয় সুহৃৎ মগধদেশাধিপ জরাসন্ধ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া উভয়েই সসৈন্যে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী যুগপৎ আক্রমণ করেন। তাঁহারা যমুনাতীরে সেনাসন্নিবেশ করতঃ উক্ত নগর অবরোধ করিয়া থাকিলে, একদা বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক সৈন্যগণ আক্রান্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রাজা গোনর্দ্দ সৈন্যগণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখিয়া তাহাদিগের সাহায্যার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইলে, মহাবল বলরামের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। উভয়েই তুল্যবল, সুতরাং বিজয়লক্ষ্মী কাহাকে বরণ করিবেন, তদ্বিষয়ে তিনি কিছুকাল সন্দেহ-দোলায়মানা হইয়া রহিলেন। পরে রাজা গোনর্দ্দ বলরামপ্রযুক্তশস্ত্রে নিহত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে ধরাশায়ী হইয়া মহানিদ্রাভিভূত হইলে মহাবীর হলী বিজয়-লক্ষ্মী আহরণ করতঃ প্রস্থান করিলেন। পিতার মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যুবরাজ দামোদর বিবিধ ভোগসমৃদ্ধিসম্পন্ন কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি পিতার তাদৃশ বধজনিত শোকসন্তাপে অহর্নিশ অনুতপ্তহৃদয় হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল গত হইলে, একদা তিনি শুনিতে পাইলেন যে, গান্ধারদেশীয় ভূপবর্গ কর্ত্তৃক কন্যাস্বয়ম্বরসভায় যাদবগণ সমাহূত হইয়াছেন। তখন তিনি আর ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া বহুতর সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক বৈর-নির্যাতন মানসে গান্ধারদেশে উপস্থিত হইলেন। উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরে রাজা দামোদর কৃষ্ণের সুদর্শনচক্র-ধারাপথে পরলোক গমন করিলেন।

---

* ষট্‌সু বর্ষশতেষ্বেব ত্রিপঞ্চাশদ্‌ যুতেষুচ।
প্রয়াতেষ্বাদিগোনর্দ্দঃ শশাস পৃথিবী- মিমাম্‌॥
কাশ্মীরেষ্বাদিগোনর্দ্দঃ খ্যাতঃ সর্ব্বধরাভুজাম্‌।
সমকালভবঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং শৌর্য্য- শালিনাম্‌॥
—রাজতরঙ্গিণী।

এই রাজা ৩৫ বৎসর ৬ মাস কাল রাজত্ব করিয়া যুদ্ধে নিহত হন। যৎকালে রাজা দামোদর রণভূমি-শায়ী হন, তৎকালে রাজমহিষী যশোবতী গর্ভবতী ছিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়া যদুপতি কৃষ্ণ ঐ সম্ভ্রান্ত কাশ্মীররাজবংশের স্থিতি রক্ষার্থ উক্ত রাজমহিষীকেই ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। কিছুকাল পরে রাজ-মহিষী একটি সুলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলেন। ইনিই পিতামহের নামে অভিহিত হইয়া দ্বিতীয় গোনর্দ্দ বলিয়া পরে বিখ্যাত হন। প্রাচীন অমাত্য-বর্গ গোনর্দ্দকে অতি শৈশবকালেই পিতৃসিংহাসনে স্থাপন করিয়া কাশ্মীর রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। সুতরাং এই শিশু ভূপতি তাঁহার শিশুত্ব-নিবন্ধন তৎকালসম্ভূত কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধে সাহায্যার্থ নীত হইয়াছিলেন।* এই রাজা ৩০ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া কাল-কবলে নিপতিত হয়েন।

আমরা এই রাজতরঙ্গিণী-লিখিত কয়েকটি কথা দ্বারা পশ্চাল্লিখিত বিষয়গুলি জানাতে পারিলাম যে, যে সময়ে পাণ্ডবেরা পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করেন, সেই সময়ে কাশ্মীর রাজবংশের আদিপুরুষ রাজা গোনর্দ্দও ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সুতরাং তিনি কুরুপাণ্ডবগণের ও মগধাধিপ জরাসন্ধ এবং যাদবপ্রধান কৃষ্ণবলরামদিগের সমসাময়িক ছিলেন। এইক্ষণ কৃষ্ণ মথুরাতেই বাস করিতে ছিলেন, জরাসন্ধের উপদ্রবে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই। রাজা গোনর্দ্দ ৩৫ বৎসর ৬ মাস কাল রাজ্যশাসন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র রাজা দামোদর কাশ্মীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রায় ৩৫ বৎসর ৬ মাস কাল পর্য্যন্ত রাজ্যোপভোগ করিয়া রণাঙ্গনে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

যে সময়ে কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধারম্ভ হয় তৎকালে রাজা দামোদরের পুত্র দ্বিতীয় গোনর্দ্দ অতি শৈশবদশায় অবস্থিত ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে তাঁহার শৈশব-কাল সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের ঘটনার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চ বৎসরেরও ন্যূন ছিল।† এমন কি

---

* ইতি কাশ্মীরিকো রাজা
বর্ত্তমানঃ স শৈশবে।
সাহায়কায় সমরে ন নিন্যে
কুরুপাণ্ডবৈঃ॥
—রাজতরঙ্গিণী, ১ম তরঙ্গ, ৪ পৃষ্ঠা।

† তস্য রাজ্যাভিষেকাদিবিধিভিঃ
সহ সম্ভৃতাঃ।
দ্বিজেন্দ্রৈর্নিরবর্ত্তন্ত জাতকর্ম্মাদিকাঃ
ক্রিয়াঃ॥
স নরেন্দ্রশ্রিয়া সার্দ্ধং লব্ধবান্ কলভূপতিঃ
নাম গোনর্দ্দ ইত্যেবং নপ্তা পৈতামহং
ক্রমাৎ॥
তস্যাবদ্ধ্যপ্রসাদত্বং রক্ষন্তঃ পিতৃমন্ত্রিণঃ।
পার্শ্বগেভ্যোদদুর্ব্বিত্তমণিমিত্তস্মিতেষ্বপি॥

তৎকালে তিনি এরূপ শৈশবদশায় অবস্থিত ছিলেন যে,তখন তাঁহার বাক্যই পরিস্ফুট হয় নাই। সুতরাং যদি তাঁহার বয়স সে সময়ে অন্ততঃ তিন বৎসরও ধরা যায় তাহা হইলে তদীয় পিতৃপিতামহের রাজ্যকাল এবং তাঁহার জননান্তর বয়ঃকাল এই সমুদায় কালগুলি সঙ্কলিত করিলে প্রায় পঞ্চসপ্ততি বর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এই পঞ্চসপ্ততি বর্ষ রাজা আদিগোনর্দ্দের রাজ্য শাসনারম্ভের পরে এবং কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অতীত হইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজা আদিগোনর্দ্দ পাণ্ডবদিগের সমকালজাত। তাহা হইলে তিনি কত বৎসর পরে প্রকৃতরূপে রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। কারণ, রাজা যুধিষ্ঠিরের ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রমাশে যুদ্ধের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ ৮৯ বৎসর হইতে কিঞ্চিদূন ৭৫ বৎসর অন্তর করিলেই অবশিষ্ট কিঞ্চিদধিক চতুর্দ্দশ বর্ষই রাজা আদিগোনর্দ্দের প্রকৃত রাজ্যশাসন কালারম্ভের পূর্ব্বে গত হইয়াছিল।

কথিত আছে—বৎসরের প্রথম মাস মার্গশীর্ষের প্রথমদিবস হইতে অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত কুরুপাণ্ডবীয় মহাযুদ্ধ হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ মার্গশীর্ষ মাসকে বৎসরের আদ্যমাস বলিয়া বর্ষের গণনা করিতেন। এবং ইদানীন্তনকালেও হিন্দুগণ বৈধকর্ম্মে অগ্রহায়ণ মাস উল্লেখ না করিয়া মার্গশীর্ষ মাস উল্লেখ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, দ্বাদশ মাস দ্বাদশ নক্ষত্রনামের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং মৃগশিরা নক্ষত্রাভিহিত মার্গশীর্ষ মাসের অতিরিক্ত অগ্রহায়ণ নামটি কেবল এককালে আর্য্য-গণ কর্তৃক বৎসরার্থ মাস বলিয়া ব্যবহৃত মার্গশীর্ষ মাসের পরিচায়ক মাত্র হইয়া রহিয়াছে। অগ্রহায়ণ শব্দের অর্থ এই যে—হায়নের (বৎসরের) অগ্র (প্রথম) অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মাস।

যে প্রকার রাজা বিক্রমাদিত্যের জন্মকালাবধি তাঁহার রাজ্য সংবৎ আরব্ধ হয়, সেই প্রকার রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্মকাল হইতেই যুধিষ্ঠিরাব্দটী প্রচলিত হইয়া কলির ৩০৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরে রাজা বিক্রমাদিত্যের

অবুদ্ধা নম্ব ইচ্ছন্তস্তস্যাব্যক্তং শিশোর্ব্বচঃ।
কৃতাগসমিবাত্মানমমন্যন্তাধিকারিণঃ॥
পিতুঃ সিংহাসনং তেন ক্রমতা বাল-ভুভুজা।
নোৎকণ্ঠা পাদপীঠস্য লম্বমানা-ঙ্ঘ্রিণা কৃতা॥
কক্ষামর-মরুল্লোলকাকপক্ষং নৃপাসনে।
বিধায় মন্ত্রিণোঽশৃণ্বন্ প্রজানাং ধর্ম্ম-সংশয়ং॥
ইতি কাশ্মীরিকো রাজা বর্ত্তমানঃ স শৈশবে।
সাহায়কায় সমরে ন নিন্যে কুরু-পাণ্ডবৈঃ॥
—রাজতরঙ্গিণী, ১ম তরঙ্গ, ৪র্থ পৃষ্ঠা।

সংবৎ ও শকাদিত্য বা শালিবাহনের শকাব্দ প্রচলিত হইলে যুধিষ্ঠিরাব্দটি বিলোপিত হইয়া যায়। রাজাবলিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, কলির ৩০৪৪ বৎসর গত হইলে যুধিষ্ঠিরাব্দ বিলুপ্ত হয়। এই কথা অনায়াসেই সপ্রমাণ করা যাইতে পারে; কারণ, রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্মের পূর্ব্বে কলির ৬৫৩ গতাব্দের সহিত তাঁহার জন্মের পরবর্ত্তী ২৫২৬ বৎসর যোগ করিলে শকাব্দারম্ভের পূর্ব্বে কলির ৩১৭৯ গতাব্দ পাওয়া যায়; এবং শকাব্দারম্ভ হইবার ১৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সংবৎ আরব্ধ হইয়াছিল; সুতরাং এই ১৩৫ বৎসর কলির ৩১৭৯ গতাব্দ হইতে অন্তর করিলে ৩০৪৪ বৎসর অবশিষ্ট থাকে, অতএব কলির ৩০৪৪ বৎসর গত হইলে সংবৎ আরব্ধ হওয়ায় যুধিষ্ঠিরাব্দটি বিলুপ্ত হইয়াছিল, ইহা সপ্রমাণ হইল।

এতদ্দ্বারা অপর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিরূপিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্মকাল হইতেই তাঁহার অব্দটি প্রচলিত হইয়াছিল। যদি তাহা না হইয়া অন্য কোন সময় হইতে গণনা হইত তাহা হইলে কলির ঠিক ৩০৪৪ বৎসর গতে ঐ অব্দটি বিলুপ্ত না হইয়া অপর কোন পরবর্ত্তীকালে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল; সুতরাং তাহা প্রামাণিক রাজাবলিগ্রন্থোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধ হওয়ায় গ্রাহ্য হইতে পারে না।

পরন্তু কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলেই যে রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইয়াছিল এতদ্দ্বারা তাহাও সুনিরূপিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী। *

(মাইকেল্ মধুসূদনদত্ত-বিরচিত)

আর কতদিন, সৌরি, জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে?
না পশে এ দেশে, নাথ, রবিকররাশি;
না শোভেন সুধানিধি সুধাংশু বিতরি;

---

* মাইকেল মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য সহৃদয় সমাজে সবিশেষ পরিচিত। তদীয় স্বহস্তলিখিত আদর্শ দেখিয়া জানিতে পারা যাইতেছে যে, তিনি বীরাঙ্গনার দ্বিতীয়ভাগ সঙ্কলন করিতেছিলেন। কিন্তু, তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। সেই অসম্পূর্ণ ভাগের অন্তর্গত "নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মীর পত্রিকা" এ বারে প্রকাশিত হইল। শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

স্থিরপ্রভাভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী
বিভা, জন্মি রত্নজালে,—উজলয়ে পুরী;
তবুও উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা দুঃখিনী!
বাম, দামোদর! তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার—পাদপদ্ম তব!
ধরি এ দাসীর কর ও করকমলে
কহিলে দাসীরে যবে, হে মধুরভাষ,
"যাও, প্রিয়ে; বৈনতেয় কৃতাঞ্জলিপুটে
দেখ দাঁড়াইয়া ওই! বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিন্ধুতীরে আজি।" হায়, না জানিনু
হইনু বৈকুণ্ঠচ্যুত দুর্ব্বাসার রোষে!

সত্যযুগের আবির্ভাব।

কলিকালের কালরাত্রি বুঝি পোহাইল। পুরাণের ভবিষ্যৎবাণী বুঝি সত্য হয়। শুনিয়াছি কলির অবসানে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। তাই বা ঠিক হইতে চলিল। সত্যের পর ত্রেতা, ত্রেতার পর দ্বাপর, দ্বাপরের পর কলি। কিন্তু ইহার বিপরীত পর্য্যায়ক্রমে ত সত্যের আবির্ভাব হইবে না। কলির পর আবার দ্বাপর আসিবে না, দ্বাপরের পর আবার ত্রেতা আসিবে না, ত্রেতার পর সত্য আসিবে না। সত্য একেবারে কলির পর আসিবে,—এই ভবিষ্যৎ বাণী। তাহাই ত ঘটিয়া আসিতেছে। সত্য যুগের আলোক, সত্যযুগের আভাস ত অনেক দেখা দিয়াছে। সত্যের পর ত্রেতায় অনেক পাপাচার ঘটিয়াছিল। ত্রেতার পর দ্বাপরে পৃথিবীতে আরও পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং আমরা ত্রেতা ও দ্বাপরের গ্রন্থাদিতে যে সকল আচার ব্যবহারের কথা পড়িয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই পাপাচার। আবার কলিতে সেই সকল পাপাচার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং হিন্দুসমাজে যে সকল আচার ব্যবহার কলির প্রারম্ভ কাল হইতে চলিত আছে, তাহা যুগ-ধর্ম্মানুসারে সমুদায় পাপাচার। সে সমস্তকে পাপাচার না বলিলে তবে আর কলিযুগমাহাত্ম্য কোথায় রহিল? সুতরাং বর্ত্তমান কালের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহা হিন্দুধর্ম্মানুসারেই পাপাচার। সে সকল যদি পাপাচার হয়, তবে তাহার

বিপরীত আচারাদি অবশ্য সদাচার ও ধর্ম্মাচার হইবে। বর্ত্তমান কালে আমাদের সমাজে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বকালের আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন অনেকটা একাকার হইবার উপক্রম হইতেছে। শ্বেতাঙ্গ অবতার কল্কিরূপে ভারতের পূর্ব্বদিক হইতে উদয় হইয়া ক্রমে ভারতময় আপন প্রভুত্ব বিস্তারিত করিয়াছেন। ইনিই বোধ হয় বিষ্ণুর দশম অবতার। এখন জলে শীলা ও লৌহ ভাসিতেছে। ছয় মাসের পথ ছয় দিনে যাওয়া যাইতেছে। এক বৎসরে যে সম্বাদ পাওয়া দুষ্কর, তাহা এক মুহূর্ত্তে জানা যাইতেছে। এখন আর শুঁড়ি, হাঁড়ি, ব্রাহ্মণ ভেদ নাই। ব্রাহ্মণ নির্ব্বিঘ্নে শুঁড়ির জল খাইতেছে। জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণে যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিতেছে। অভক্ষ্য ভক্ষণে ব্রাহ্মণেরও আর বিঘ্ন নাই। আমাদের স্ত্রীজাতির সাহস বাড়িয়াছে। তাহারা পুরুষের ঘাড়ের উপর চড়িতেছে। পৃথিবীর অনেক স্থলে এখন আর রাজা প্রজা ভেদ নাই। রাজতন্ত্র উঠিয়া যাইতেছে। লোকের অন্তর্জগতের এক কোণে কি এক আলোক দেখা দিয়াছে, সে দিক ফরসা হইতেছে। ইহা কি সত্যযুগের আভাস নয়? কলিকাল কি অবসান-প্রায় নয়? তবে কেন টিকিকাটা টুলো ব্রাহ্মণেরা এক্ষণকার ছেলেদের বেল্লিক, বেয়াড়া কলির চেলা বলে? তাহারাও কি কল্কির ব্রাহ্মণ নহে? তাহারাও কি সত্যযুগ আনিবার জন্য অনেকটা উদ্যোগী হয় নাই? বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে এখন সত্যযুগের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কালের লোকেরা সত্যযুগের মশালজি,—ভবিষ্য পুণ্যযুগের Pioneer। আমি এই কথা অনেক রকমে সাব্যস্ত করিতে পারি।

১ দফা। ঐ দেখ, "এখন চারি দিকে ধর্ম্মের ঢোল বাজিয়া উঠিয়াছে। সকল কাগজেই এখন ধর্ম্মের ডাক ডাকিয়া উঠিয়াছে। এখন লোকে ধর্ম্ম বই আর কিছুই জানে না। এখনকার লোকে ধর্ম্মের বিশাল ও মহতী মূর্ত্তি, কত স্তরের ভিতর স্তর ভেদ করিয়া বাহির করিয়াছে। বাহির করিয়া আনন্দে ডাকিয়া উঠিয়াছে "এখন যুগান্তর উপস্থিত।" এ যুগান্তর কি?—ধর্ম্মের যুগ—যে যুগ কলির পর উদয় হইবে। অনেক কষ্টে তাঁহারা এই ধর্ম্মালোক বাহির করিয়াছেন। বাহির করিয়াছেন "বাঙ্গালীর সামান্য তাসের খেলায়, (সামান্য গ্রাবুতে) নব-মনুসংহিতায় বর্ণাশ্রম ও গৃহাশ্রম তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে।" এখন লোকের অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়া গিয়াছে। তাহারা ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল বাহির করিতে পারিতেছে। অনেক স্তরের নীচে আগে যে ধর্ম্মদেবী অধিষ্ঠিতা ছিলেন, এখন সেই স্তর ভেদ করিয়া সেই চোরা ধর্ম্মকে বাহির করা হইয়াছে,

এবং কলির ভগ্নাবশেষের উপর তাঁহার সিংহাসন এক জাঁকাল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। পলাণ্ডুর কোষের মধ্যে যেমন শাঁস থাকে, ধর্ম্ম সেই রূপ ছিলেন। লোকে এখন সেই কোষ ছাড়াইয়া ধর্ম্মকে বাহির করিয়াছে। "জাপানের বাক্সর মত, পলাণ্ডু কোষের মত" আধ্যাত্মিক জগতের স্তরের মধ্যে অনেক স্তর ভেদ করিয়া তবে ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে।* আর ভাবনা কি। এত কাল যে ধর্ম্ম ছিল সে ধর্ম্ম নহে, এইবারে খাঁটি ধর্ম্ম বাহির হইয়াছে, এই বারে সকল পাপ তাপ দূরে গিয়া সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে।

২ দফা। এখন লোকের দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। প্রাচীন কালে লোক পাপী ছিল কি না, তাই তাহাদিগকে অনেক যোগ সাধনা করিয়া যে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইত, এখন সত্য-যুগের নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত পুণ্যবান প্রাণীগণের সেই ধর্ম্মজ্ঞান অনেকটা সহজে লব্ধ হইতেছে। লোকে এখন সহজেই বুঝিয়াছে, এই জগৎই ঈশ্বর। জগৎ হইতে পৃথক্ যে ঈশ্বর, এবং এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বরূপ এক জন পৃথক্ পুরুষ যে ঈশ্বর, সে ঈশ্বরভাব ইউরোপীয় শ্বেত জাতিদের ভ্রান্তি মাত্র। আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের যে ঈশ্বর তাই ঠিক। কারণ, এদেশে ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলির—এই তিন যুগেরই লিখিত পড়িত শাস্ত্র আছে। এই শাস্ত্র মধ্যে সত্যযুগে মনুষ্যের যেরূপ ঈশ্বরজ্ঞান ছিল, তাহা বরাবর রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের ঈশ্বরজ্ঞানকেই প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান বলিতে হইবে। তাহা প্রকৃত সত্য-যুগের ভাব। তাহা বরাবর যুগে যুগে চলিয়া আসিয়া এখনকার কালে, যখন সত্যযুগ অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন একেবারে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যখন এই ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে তখন অবশ্য বলিতে হইবে সত্যযুগ আগত-প্রায়। এই ঈশ্বরজ্ঞান কি?—না এই এই জগৎই ঈশ্বর*। আমাদের ধর্ম্মের চূড়ামণি মহাশয় তাঁহার "দুর্গোৎসব" নামক বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা গত ৫ই শ্রাবণ তারিখের "বঙ্গবাসী" হইতে উদ্ধৃত হইল।

"যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভক্ত, সেই জগৎ-প্রসূতিকে আপন হইতে বিভিন্ন দেখে, আপনার এবং ঈশ্বরের অভেদ উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হয়, যতক্ষণ উপাসক আপনাকেই ঈশ্বরস্বরূপ না দেখে, ততক্ষণ সে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন—সে পশু।"

যখন মনুষ্যের এই ঈশ্বর ও আত্মতত্ত্ব জ্ঞান সহজে জন্মিয়াছে, এই তন্ময়জ্ঞান জন্মিয়াছে তখন আর ভাবনা কি? কারণ, এই জগৎ যদি ঈশ্বর হয়, তবে

* "নবজীবন" ১ সংখ্যা—সূচনা।

* আমার কথায় যাঁহারা অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ৪র্থ সংখ্যক "নবজীবনের" "পৌত্তলিকতা" প্রস্তাব পড়ুন।

আর পাপ, তাপ, কিছুই থাকে না, তবে সকলই ঈশ্বরময়। তবে আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, যাদব ঈশ্বর, মাধব ঈশ্বর, পণ্ডিত ঈশ্বর, মূর্খ ঈশ্বর, সেয়ানা ঈশ্বর, আহাম্মুখ ঈশ্বর, সাধু ঈশ্বর, চোর ঈশ্বর, রাজা ঈশ্বর, প্রজা ঈশ্বর, চাষা, হাড়ি, ডোম সকলই ঈশ্বর। গাছ, পালা, পোকা মাকড়, গরু বাছুর, বাঁদর হনুমান, গুণবান সকলই ঈশ্বর। ধান, চাউল, কাঠ, লাঠি, আসন, বসন, ঘটি, বাটি, মল মূত্র সকলই ঈশ্বর। আমি যাহা লিখিতেছি, এসমস্ত ঈশ্বরবাক্য এজন্য সত্য। তুমি যাহা প্রতিবাদে লিখিয়াছ তাহাও ঈশ্বরবাক্য, সুতরাং সত্য। অতএব মিথ্যা সত্য সব এক হইয়া গেল। তবে আর সত্যযুগের কসুর কি? আবার দেখ, ঐ যে তস্কর লাঠি দিয়া আমাকে মারিলেন, আমাকে জ্ঞান করিতে হইবে, এক জন ঈশ্বর,—ঈশ্বর দিয়া আমাকে ঈশ্বরত্ব পাওয়াইয়া দিলেন, সুতরাং হত্যাকাণ্ডে দোষ নাই। যখন লাঠি ঘাড়ে পড়িতেছে, তখন জ্ঞান করিতে হইবে ঈশ্বর ঘাড়ে পড়িতেছেন। সুতরাং পৃথিবীতে পাপ তাপ, আর কিছু থাকে না। জুয়াচুরি আবার কি? তাহা ত এক জন ঈশ্বরের কার্য্য মাত্র। কাজে কাজেই, আইন আদালত সব উঠিয়া যাইতেছে। আহা! সত্যযুগ সোণার কাল ছিল। তখন 'বিষ্ঠা চন্দনে সমান জ্ঞান ছিল। তাই ত আবার হবে! লোকের ত সেই রূপ দিব্যজ্ঞান জন্মিয়া আসিতেছে। এখন যে লোকে গরু ছাগল বলে তাহা কেবল ঈশ্বরকে চিনিবার জন্য। নহিলে আমি যদি বলি, পথ দিয়া ঈশ্বর চলিয়া যাইতেছে, তুমি কি বুঝিবে? তুমি কি বুঝিবে একটা ছাগল চলিয়া যাইতেছে? নবজীবনের লেখকের মত তোমার যখন দিব্যজ্ঞান জন্মিবে, যখন প্রকৃষ্টরূপে সত্যযুগ আসিয়া পড়িবে, তখন তুমি সেই ছাগলই বুঝিতে পারিবে। ক্রমে যখন এই মত লোকে খুব হজম করিবে, তখন লোকের তত্ত্বজ্ঞান জাগিয়া উঠিবে। তখন জ্ঞানচক্ষুতে চাহিয়াই দেখিতে পাইবে জগন্ময় ঈশ্বর। এককালে জগৎ যে ঈশ্বরে ছাইয়া যাইবে, তাহার এই সূত্রপাত হইয়াছে। পাপী, তাপী, সবে আশ্বাসিত হও। সত্যযুগের আলো ঝিকি ঝিকি আসিতেছে। ঐ দেখ "নবজীবন" উদয় হইতেছে।

৩ দফা। লোকের যখন এমন দিব্যজ্ঞান জন্মিতেছে, তখন আর কৃত্রিম দেব দেবতা কি টাঁকে? জীয়ন্ত ঈশ্বর সকল যখন বেড়াইতে লাগিল, তখন কি আর সে কালের কুমারটুলির খড়ের দেবতারা কল্কে পান। এই জীয়ন্ত ঈশ্বরেরা সব ক্রোষ খুলিয়া দেখিতে পাইলেন,—ওরে দেব দেবতাগুলা কবির কল্পনা বই আর কিছুই নয়! এই কবির কল্পনা গুলা এত দিন জুয়াচুরি করিয়া আমাদের ঠকিয়া খাইয়াছে বটে! তবে ইহাদের ভুর ভাঙ্গা

যাক্। এই ভাবিয়া জীয়ন্ত ঈশ্বরেরা বলিলেন যে "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর * * * বৈজ্ঞানিক তিনটী জড়শক্তির ভাব" মাত্র। অনেক স্তর ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে যে, হর পার্ব্বতী বাস্তবিক ঠাকুর নহে, তাহা "অনন্ত জগতের অনন্ত কালের পুরুষ প্রকৃতি" মাত্র।* রাধাশ্যাম যে ব্রজে লীলা করিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিক কিছু নহে। তাহা কবির কল্পনা মাত্র। সেই কল্পনায় কবি ঈশ্বর প্রেমের "মধুর" ভাব দেখাইয়াছেন।† কৃষ্ণরাধাও প্রকৃতি পুরুষের কল্পনামাত্র। তাঁহারা বাস্তবিক ঠাকুর নন। বাঁচা গেল, জন্মাষ্টমীর উপবাসের দায় হইতে মুক্ত হওয়া গেল। ধর্ম্মের চূড়ামণি মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে শাক্তদের বড় আদরের কালীমূর্ত্তি এবং দুর্গামূর্ত্তিও কবির কল্পনা মাত্র। তিনি সেই মূর্ত্তির রূপক ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। যাক্, আর মেয়ে গুলা কালীঘাট যাইতে দৌড়াদৌড়ি করিবে না। শম্ভু, নিশম্ভু এবং মহিষাসুর বধের পালাটা বুঝাইতে পারিলে আমরাও রেহাই পাই। আর কালীঘাট যাবার খরচ যোগাইতে পারি না! দশ মহাবিদ্যার রূপকও বাহির হইয়া গিয়াছে। দুর্গোৎসবের কার্ত্তিকেয়, গণেশ প্রভৃতির রূপকও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দেব দেবতা গুলার হাত হতে রক্ষা পাওয়া গেল, না অল্প রোজকারী কেরাণিরা বেঁচে গেল। নিত্য নিত্য ঠাকুরের মানসিক ও পূজা দিবার খরচাটা ক্রমে উঠিয়া যাইবার সুত্রপাত হইতেছে। কবে এই সকল মত আমাদের মেয়ে মহলে ও গলায়পৈতা বামুনদের মনে সেঁদোবে, এখন তাহারই জন্য ব্যস্ত হওয়া গিয়াছে। আমিত যাকে পাই তাকেই এক্ষণকার কোষ-বিনির্গত ধর্ম্ম আলোচনায় মাতিতে বলি। এই দেব দেবতা গুলা উঠে গেলে বাঁচা যায়। আর ব্রত নেমও একেবারে উঠিয়া যাইত, কিন্তু "ব্রততত্ত্ব" টা বড় কঠিন; বুঝে কাহার সাধ্য! সামান্য লোকে তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে পারে না। যাহা হউক, যখন দেব দেবতা সকল উঠিয়া যাইতেছে, যখন প্রমাণ হইয়া যাইতেছে সে সমস্ত কবির কল্পনা বই আর কিছুই নয়, তখন আর সত্যযুগ আসিবার বিলম্ব কি!

৪ দফা। শুধু দেব দেবতা উঠিয়া যাইতেছে না, শাস্ত্রশাসনও উঠিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছে। এত কাল এত শাস্ত্রবেত্তা বাহির হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা কেহই শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মকথা ভাজিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা অনেকেই শাস্ত্রের উপর বরং শাস্ত্র চালাইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের

* "নবজীবন" ১ম সংখ্যা—সূচনা।

† "নবজীবন" ২ সংখ্যা—"বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্ম"।

করিয়া আসিয়াছে। দেশে রক্তপাত না হয়, এজন্য হিন্দুরা পড়িয়া ক্লাইব ও সেরাজুদ্দৌলার যুদ্ধবিগ্রহ কেমন কলে কৌশলে মিটাইয়া দিলেন। লেড়েরা বড় রক্তপাত করিত এজন্য, রাজ্যটা ইংরাজ হস্তে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া হিন্দুরা ক্লাইবকেই জিতাইয়া দিলেন। শ্বেতাঙ্গদের মুষ্ট্যাঘাতেও প্রাণিবধ হয়, সুতরাং প্রাণিবধ ভয়ে, হিন্দুরা একটি মুষ্ট্যাঘাতও করিতে জানে না। এত অহিংসা আর কি কোন জাতিতে আছে? শুনিয়াছি বুদ্ধদেব না কি অহিংসা ধর্ম্মের উপদেশ দেন। কিন্তু কই, চীনেরা ত আহারের জন্য তেলাপোকাটা পর্য্যন্ত বাছে না। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ নিশ্চয় অপাত্রে পড়েছে। চীনেদের সত্যযুগ আসিতে ঢের দেরি আছে। আমাদের শীঘ্রই আসিবে।

অহিংসা ধর্ম্মটা সে দিন ইলবার্ট বিলের সময় একটু টলমল করিয়াছিল। যত অর্ব্বাচীন দলেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। তাই দেখিয়া আমাদের সমাজের ধুরন্ধরগণ আবার সেই ধর্ম্মটা না হাত ছাড়া হয় এজন্য তাহার নবজীবন দান করিলেন। ধর্ম্মটাকে একটু চুম্‌রে লইলেন। শ্যেনকপোতের পালক উল্টাইয়া পাওয়া গিয়াছে যে সহিষ্ণু না হইলে হিন্দুরা মহৎ হইবে না *।

প্রাচীন ভারত যে এত বড় হইয়াছিল, তাহার সিঁড়ি সহ্যগুণ। অতএব মহত্ত্বের সিঁড়ি সহ্যগুণ। শ্বেতাঙ্গদের জুতা লাথি যত সহ্য করিতে পারিব, ততই আমাদের সহ্যগুণ ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে। অপমান জ্ঞান করা অভিমানীর কর্ম্ম—দাম্ভিকের কার্য্য। দম্ভ ও অভিমান না ত্যাগ করিতে পারিলে বড় হওয়া যায় না। আত্মাদরটা দম্ভেরই অংশ। আত্মাদর প্রাকাটা কিছু নয়। সত্যযুগে যাইতে হইলে ছয় রিপু বশ করিতে হইবে। রাগটা যতই দমন হয়, ততই ভাল। দেশটা উৎসন্ন যাউক না কেন, তাহাতে আমার রাগটা জাগরিত হওয়া বড় দোষের কথা। রাগটা উদ্দীপ্ত হইলেই ত অহিংসা ধর্ম্ম নষ্ট হয়; দেশে মারামারি বাঁধে। অতএব রাগটার একেবারে দমন করাই ভাল ‡, কেবল সহ্যগুণ ধর, সব সহিয়া থাক, তোমাদের আত্মোৎকর্ষ ও মঙ্গল হইবে। পূর্ব্বকালের মুনি ঋষিরা এই রূপ যোগসাধনা করিয়াছিলেন। তাহারা পরের হাতে সর্ব্বস্ব দিয়া বনে গিয়াছিলেন। তবে কেন তোমরা দেশের জন্য এত ক্যাচ্ ক্যাচ্ কর। ধীর হও, শান্ত হও, অহিংসা শিক্ষা কর। এখন এই সমস্ত ধর্ম্মভাবে উদ্বোধিত হইয়া লোকে নবজীবন পাইয়াছে, এবং সাধারণকে নবজীবন দান করিতেছে।

* নবজীবন—২ সংখ্যা শ্যেনকপোত ও পাইলক।

‡ নবজীবন—৩ সংখ্যা—অনুশীলন।

অহিংসা ধর্ম্ম আর প্রকৃষ্টরূপে আচরণ করিতে গেলে আহারাদি পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, আহারাদির সহিত আমরা অনেক জীব হিংসা করি। এক জল পানে সহস্র কীটাণু সংহার করি। সুতরাং আহারাদি করিতে গেলে অহিংসা ধর্ম্ম ভালরূপে সাধন করা হয় না। এজন্য আহারাদি ত্যাগ করা যায় এরূপ উপায় আবশ্যক। সে উপায়ও বাহির হইয়াছে। ঐ দেখ লোকে যোগ শিক্ষা দিতেছে। এই যোগ সাধন করিতে পারিলেই আহারাদির হাত হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে। চোক বুজিয়া যোগাভ্যাসও কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজে তাহার একটু একটু চিহ্ন দেখা দিয়াছে। লোকে প্রকৃত রূপে যোগী হইতে পারিলেই মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া বিনা আহারে কতকাল জড়পিণ্ডবৎ চোক বুজিয়া বসিয়া থাকিবে। তখন অহিংসা ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা সাধন হইবে। মানুষের হাত পা নাড়াতেও পাছে একটী কীটাণু মরে, তাহা নিবারণ হইবে। সকলেই বৌদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিবে। বৌদ্ধ দেবতায় পৃথিবী পূরিয়া যাইবে। সত্যযুগ আর কাহার নাম। সেই অহিংসা ধর্ম্ম, সেই যোগের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদিগের রিপু সকলের দমন হইয়া আসিতেছে। রাগ আর নাই বলিলেই হয়, আত্ম-মর্য্যাদা ও অভিমান অনেক কাল গিয়াছে। আর কি চাও। এ সকল কি সত্যযুগের গোড়া নয়? এ যদি সত্যযুগের গোড়া না হয়, তবে আমি নাচার। আমি এই ছয় দফা অকাট্য প্রমাণ দিয়া বুঝাইলাম যে সত্যযুগ আসিতেছে। যিনি একান্ত না বুঝিবেন তাঁহাকে বুঝান আমার সাধ্য নয়।

সত্যযুগাকাঙ্ক্ষী।

শরীর তাপ।

নং ৪

শরীর তাপের বৃদ্ধি।

সমস্ত দিবা ও রাত্রি ভাগের মধ্যে তাপ সমভাবে থাকে না; ইহার হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে প্রাতঃকালে নয় দশটা এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অপরাহ্ণ চারি পাঁচ-টার সময় সুস্থ ব্যক্তির শারীর তাপ সর্ব্বোচ্চ সীমা প্রাপ্ত হয়। এই সর্ব্বোচ্চ সীমা সচরাচর ৯৯.৫°। শারীর তাপ উক্ত রূপ নির্দ্ধারিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে অনেক সময় পীড়া সূচিত হইয়া থাকে। জ্বরে শারীর তাপ বর্দ্ধিত হয়। এই বর্দ্ধিত শারীর তাপকে কেহ কেহ জ্বর, বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা জ্বরের একটি

লক্ষণ মাত্র। জ্বরে আণবিক পরিবর্ত্তন বা মৃদু সন্দাহ বৃদ্ধি পাইয়া শারীর তাপকে বাড়াইয়া তুলে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ স্বাস্থ্যে মৃদুভাবে হয়। প্রধানতঃ অনুশ্বাসিক খাদ্য দ্রব্যের সন্দাহে স্বাস্থ্যে শারীর তাপ উৎপাদিত হয়; তখন সঞ্চিত শক্তি প্রায়ই অক্ষয়িত থাকে। পীড়ায় শারীর তাপ যখন বাড়িয়া উঠে, তখন আণবিক পরিবর্ত্তনেরও বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন আবশ্যক মত ইন্ধন প্রয়োগ করিতে না পারিলে অগ্নির তাপ রক্ষা হয় না, সেইরূপ শরীরের আভ্যন্তরীণ সন্দাহের ইন্ধন স্বরূপ আবশ্যক মত খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার না করিলে শারীর তাপ সমভাবে সংরক্ষা করিতে পারা যায় না। কিন্তু জ্বরকালে রোগী অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করিতে পারে না; তথাপি তখন উচ্চ-তাপ কিরূপে সংরক্ষিত হয়? ভুক্ত দ্রব্য যে পরিমাণে পরিপাক পায়, শক্তি সেই পরিমাণে দেহে উপচিত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্বরকালে শক্তির উপচয় স্বল্প পরিমাণে হওয়াতে, সঞ্চিত শক্তি ইন্ধনের কার্য্য করিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জ্বরকালে এই সঞ্চিত শক্তির ক্ষয়, প্রধানতঃ পেশীমণ্ডলেই দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বরাক্রমণের পর শরীরের বসা বা চর্ব্বি অপেক্ষাকৃত অক্ষয়িত অবস্থায় থাকে; কিন্তু পেশীমণ্ডল কৃশ ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাহাদের আণবিক পরিবর্ত্তনে ঘোরতর অপজনন হইয়াছে। স্নায়ু ও স্নায়ুকেন্দ্রও এই রূপে পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এই অপ-জননে অস্থিসমূহ লঘু হইয়া পড়ে; শোণিতের লাল কণার সংখ্যা কমিয়া যায়। সংক্ষেপতঃ শরীরের এমন কোন অংশই থাকে না জ্বরে যাহার কিছু না কিছু পরিমাণে আণবিক পরিবর্ত্তন না হয়।

শরীরের আণবিক পরিবর্ত্তনের পরি-মাণে তাপের পরিমাণ। এই আণবিক পরিবর্ত্তন বা মৃদু সন্দাহে শরীরের সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় হইয়া জ্বরে উচ্চ তাপ রক্ষিত হয়। শারীর তাপ অল্প সময়ের জন্য কিঞ্চিৎ বাড়িয়া উঠিলেই জ্বর বলা যায় না। কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করিলে উক্তরূপ তাপ বৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সেইরূপ প্রচণ্ড রৌদ্র-তাপ লাগিলে শরীর তাপিয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে তাপোদ্গমও কমিয়া আসাতে শারীর তাপ বাড়িয়া উঠে। এইরূপ তাপবৃদ্ধি কোন পীড়া হইতে জনিত নহে; অল্প সময়ের মধ্যেই পুন-র্ব্বার কমিয়া স্বাভাবিক সীমা প্রাপ্ত হয়। শারীর তাপ দীর্ঘকাল উচ্চ ভাবে থাকিলে শরীরের কিরূপ অবস্থা উৎ-পাদন করে, টাইফয়েড্ অবস্থা বর্ণনকালে তাহা বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে।

· শারীর তাপ বাড়িয়া ১০১° হইলে জ্বর সামান্য; ১০৩° পর্য্যন্ত মধ্যবিধ এবং ১০৫° হইলে উচ্চ বলা যায়। কিন্তু যদি তাহা ১০৬° অতিক্রম করে, তাহা হইলে রোগীর অবস্থা বিপন্ন হইয়া পড়ে। এই উৎকট শারীর তাপকে ইংরাজিতে হাইপার্ পাইরেক্শিয়া বলে। হাইপার্ পাইরেক্শিয়া একটি দুরূহ অবস্থা। এই সময়ে রোগের দুরূহ লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ১০৭° অতিক্রম করিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে রোগীর জীবন সংশয়াপন্ন হয়। এদেশে অনেকেই স্বল্পবিরামজ্বরে শারীর তাপ অল্প সময়ের মধ্যেই ১০৬° বা ১০৭° হইতে দেখিয়াছেন। এই উচ্চতাপ অল্পক্ষণ থাকিয়াই কমিয়া আসিলে রোগীকে সংশয়াপন্ন করে না; কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল থাকিলে রোগের দুরূহ লক্ষণ সকল শীঘ্র পরিস্ফুট হইয়া থাকে। প্রচণ্ড তাপাক্রমণে* ১০৭° ১০৮° পর্য্যন্ত তাপ উঠিলেও রোগীকে অনেক সময় আরোগ্য লাভ করিতে দেখা যায়। আমেরিকায় কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লি বাতরোগে আক্রান্ত হইলে তাহার কক্ষদেশে তাপ পরিমাণ ১১০° হইয়াছিল। তাহার চিকিৎসাভার মহাত্মা ডাকটার হস্তে অর্পিত হয়। তাপ সেরূপ উৎকট হইলেও রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত স্কা'বরা নগরে যে একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা শুনিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। একটি যুবতী রমণী মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া উৎকট জ্বরে আক্রান্ত হইলে তাহার শারীর তাপ ১২২° অতিক্রম করিয়াছিল; তথাপি সে মহিলার প্রাণনাশ হয় নাই। কিন্তু এ ঘটনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, তাপমান যন্ত্র কক্ষদেশে স্থাপিত হইলে গাত্রবস্ত্রের সহিত তাহার সংঘর্ষণ হইয়াছিল; তাহাতেই যন্ত্রে তাপপরিমাণ বেশি হয়। এই অনুমান সত্য কিনা তাহা নিরূপণ করা কঠিন। যদি তাহা যথার্থই হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় প্রতীত হইতেছে যে, তাপ-পরীক্ষা সতর্কতার সহিত সাধিত হয় নাই। তাপ-পরীক্ষার উপর রোগীর অবস্থা নিরূপণ, এবং রোগীর অবস্থা-নির্ণয়ের উপর চিকিৎসা নির্ভর করে। এইরূপ অবস্থায় যদি সতর্ক হইয়া তাপ পরীক্ষা না করা যায়, তাহা হইলে অনেক সময়ে রোগীকে বিপদে পাতিত করা হয়।

নং ৫

শরীর তাপের হ্রাস।

শীতপ্রধান দেশে রাত্রি দ্বিপ্রহরে স্বাস্থ্যে শারীর তাপ সর্ব্বনিম্ন সীমা প্রাপ্ত হয়; সেই নিম্নতম সীমা কয়েক ঘণ্টা থাকিয়া বাড়িতে আরম্ভ করে; কিন্তু

* Insolatio or Sunstroke.

এদেশে ঠিক সেরূপ নহে। এদেশে সর্ব্বনিম্ন তাপ রাত্রি ৪।৫ টার সময় হয়। শরীর দুর্ব্বল থাকিলে তাপ অধিক পরিমাণে কমিয়া আইসে। শরীরের আণবিক পরিবর্ত্তন বা মৃদু সন্দাহে যে, শারীর তাপ উৎপাদিত হয় তাহা পূর্ব্বে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে। যখন এই আণবিক পরিবর্ত্তনের হ্রাস হয় অথবা তাপোদ্গম অধিক পরিমাণে হইতে থাকে, তখন শারীর তাপ কমিয়া যায়। তাপোৎপাদনের হ্রাস ও তাপোদ্গমের বৃদ্ধি বিষয় অনুশীলন করিবার পূর্ব্বে, শারীর তাপ কত দূর কমিয়া আসিলে বিপদজনক হয় তাহা আলোচনা করা যাউক।

শারীর তাপ হ্রাস হইয়া যদি ৯৬° ফ. বা ৯৫° ফ. পর্য্যন্ত নামিয়া আইসে এবং তাহার সহিত কোন বিশেষ আনুষঙ্গিক কারণ না থাকে, তাহা হইলে বিপদ-সূচক বলা যায় না। যে কোন কারণেই হউক না কেন তাপ ৯৫° ফ. ডিগ্রির কম হইলে বিপদজনক বলিয়া প্রতীত হয়; তখন রোগীর অবস্থানু-যায়ী আশু প্রতিকার বিধান করা আব-শ্যক। তাপপরিমাণ ৯৫° ডিগ্রির যত নীচে নামিবে রোগীর অবস্থা ততই সঙ্কটময় হইবে। যদি ৯৩.৭° হয় বিপদ ঘোরতর বলিয়া স্থিরীকৃত হয় এবং আরও কমিয়া ৯২° ডিগ্রির নীচে গিয়া পড়িলে রোগী এত অবসন্ন ও হিমাঙ্গ হইয়া আইসে যে তাহার প্রাণ সংশয় হইয়া উঠে; কিন্তু যদি সুরাপানের আতিশয্যে এরূপ অবস্থা সঙ্ঘটিত হয় তাহা হইলে রোগীর জীবন তত সংশয়াপন্ন নহে। উন্ডার্‌লিখ্ সাহেব বলেন সুরাবিষে শারীর তাপ হ্রাস হইয়া ৯০° ডিগ্রিতে আসিলেও রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। বিসূচিকা রোগের আক্রমণে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িলে তাপ ৯৩° ডিগ্রি এবং তদপেক্ষা কম হইলেও রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা যায়। কিন্তু এই অবস্থায় দেহের বহির্ভাগের তাপ কম, আভ্যন্তরীণ তাপ সেরূপ নহে; আভ্যন্তরীণ তাপ সময়ে সময়ে জ্বরতাপের ন্যায় থাকে।

ভৌতিক নিয়মসমূহ শারীর তাপ সংরক্ষণে বিশেষ সহায়তা করে। শরীরের প্রত্যেক অংশে আণবিক পরিবর্ত্তন বা মৃদুসন্দাহে তাপ উদ্ভূত হইতে থাকে, নিঃশ্রবণ ও প্রসবণের সাহায্যে এবং সংবেষ্টক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে তাপ উদ্গত হওয়াতে স্বাস্থ্যে বাড়িয়া উঠিতে পারে না, এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে রহিয়া যায়। কোন কারণে বহির্বাষ্পের তাপ কমিয়া আসিলে, অথবা হিমসেক করিলে তাপ অধিক পরিমাণে ক্ষরিত হইয়া কমিয়া আইসে, এই জন্য আচ্ছাদন বসনাদি ও গৃহের আশ্রয় লইতে হয়। এই সকল উপকরণ ব্যতিরেকে মনুষ্য শীতপ্রধান দেশে তাপ রক্ষা করিতে পারে না; ইহা শরীরতাপ

বর্ণনের প্রথমেই লেখা হইয়াছে। বসনাদি শারীর তাপ রক্ষণে বিশেষ সহায়তা করে বটে; কিন্তু শরীরের কতকগুলি ক্রিয়া দ্বারা এই তাপ সংরক্ষিত হয়। যতক্ষণ সেই সকল সুসম্পন্ন হইতে থাকে এবং বহির্বাষ্প অতিশয় শীতল না হয় ততক্ষণ গ্রাসাচ্ছাদন বসনাদি সামান্য প্রয়োজন; কিন্তু বহির্বাষ্পের শৈত্যের বৃদ্ধিতে অধিক আবশ্যক হইয়া উঠে।

বহির্বাষ্পের শৈত্যাধিক্যে শারীর ত্বক্ সঙ্কুচিত হয়। ঐ সঙ্কোচনে বহির্ভাগস্থ রক্তবহা নালী সমুদায় সঙ্কুচিত হওয়াতে ত্বকে শোণিতের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং দেহের গভীর প্রদেশে শোণিত অধিক পরিমাণে তাড়িত হয়। এতন্নিবন্ধন যন্ত্রসমূহে ক্রিয়া বাড়িয়া উঠে ও তাপোৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সঙ্কুচিত ত্বকে শোণিত সঞ্চালন অবাধে হইতে না পারায় বহির্বাষ্পের প্রভাবেও শারীর তাপ অধিক ক্ষয়িত হইতে পারে না। তখন তাপোদ্গমের কারণই তাপরক্ষার কারণ হইয়া উঠে। গ্রীষ্মকালে বহির্বাষ্পের তাপ যখন বাড়িয়া উঠে তখন শরীরের উক্তরূপ অবস্থার বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; তৎকালে ত্বক্ ও তৎসম্বন্ধীয় নালী সমুদায় বিস্ফারিত হইয়া উঠে, শরীরের বহির্ভাগে অধিক পরিমাণে শোণিত অবাধে সঞ্চালিত হইতে থাকে এবং গভীরস্থিত স্থানে কম হইয়া আইসে। গ্রীষ্মকালে অধিক তাপোৎপাদনের আবশ্যক নাই; যন্ত্র সমুদায়ে শোণিত স্বল্প থাকাতে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। গ্রীষ্মকালে স্বল্প তাপোৎপাদনের সহিত স্বল্প তাপোদ্গম হইয়া থাকে; কেননা বহির্বাষ্পে অধিক তাপ থাকাতে তাপোদ্গম অধিক পরিমাণে হইতে পারে না, সময়ে সময়ে বহির্বাষ্পের তাপে শরীর তাপিয়া উঠে।

শরীরে হঠাৎ শৈত্য সংস্পর্শ হইলে কিরূপ অবস্থা জনিত হয় অধ্যাপক এ. বি. গ্যারট্ বহুল সন্দর্শন দ্বারা তাহা স্থির করিয়াছেন। শীতপ্রধান দেশে সমস্ত সন্দর্শনই হইয়াছিল। তিনি শরীরের সমস্ত আচ্ছাদনবস্ত্র খুলিয়া লইয়া কয়েক জন ব্যক্তির শারীর তাপ মাপেন; মাপিয়া দেখিলেন তাপ-পরিমাণ না কমিয়া বাড়িয়া উঠিল। বহির্বাষ্পে তাপ অধিক কম থাকিলে তাপ-পরিমাণ অধিক হইয়া উঠে; কিন্তু বহির্বাষ্পের তাপ ৭০: ডিগ্রির বেশি থাকিলে তাপ-পরিমাণ কমিয়া যায় এবং অল্প সময় পরেই পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শৈত্যের সংস্পর্শের অব্যবহিত পরেই শোণিত অধিক পরিমাণে যন্ত্র সমূহের অভ্যন্তরে তাড়িত হইয়া উক্তরূপ তাপ বর্দ্ধন করিয়া থাকে; কিন্তু এরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিলে সর্ব্ব শরীরের তাপ ক্ষয় হইয়া আইসে।

শৈত্যের সংস্পর্শে ত্বক্ ও তৎসম্বন্ধীয় নালী সমুদয় সঙ্কুচিত না হইলে, তাপোদ্গম অধিক পরিমাণে হয়, ও

অনেক সময় পীড়া সঞ্জাত হইয়া থাকে। কোন কারণে ত্বক্ শিথিল হইয়া পড়িলে উক্তরূপ অবস্থা সংঘটিত হয়। শীত স্পর্শে তাহারা সমুদায় সম্যক্‌রূপে সঙ্কুচিত হইতে পারে না; হয়ত বিষ্টম্ভিত ভাবে বিস্ফারিত থাকিয়া যায়। দেহের বহির্ভাগে অধিক শোণিত সঞ্চালিত হওয়াতে বহির্বাষ্পের প্রভাবে তাপক্ষয় অধিক হইতে থাকে; এই তাপ-ক্ষয়ে ঘর্ম্মনিঃসারক গ্ল্যাণ্ড্‌স্ সমুদায় বিশেষ সহায়তা করে। তাপ অধিক পরিমাণে ও অবিরত উদ্গত হইলেও শৈত্যবোধ না হইতে পারে; কেননা ত্বকের সরু সরু স্নায়ুগুলি উষ্ণ শোণিতে সিক্ত। শীতবোধ একটি আপেক্ষিক অনুভূতি মাত্র; তুলনা দ্বারা প্রতীত হয়। এই অনুভূতি স্নায়ু দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। যখন ত্বকস্থিত স্নায়ুর শেষভাগ সকল উষ্ণ শোণিতে পরিপ্লুত, তখন তাহারা বহির্বাষ্পের শৈত্য অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু যখন অবিরত তাপ-ক্ষয়ে বহিঃশোণিতের উষ্ণতা কমিয়া আইসে তখনই স্নায়ুমণ্ডল বহির্বাষ্পের অবস্থা বুঝিতে পারে ও শীত বোধ করিতে থাকে। শোণিত সতত সঞ্চালিত অবস্থায় থাকাতে ত্বকস্থিত শোণিত-তাপ নিঃসারিত করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অভ্যন্তরের শোণিত বাহিরে আইসে। এইরূপ ক্রিয়া অবিরত হওয়াতে সর্ব্ব শোণিতের তাপ ক্ষয়িত হইয়া থাকে। স্নায়ুমণ্ডল যখন বহির্বাষ্পের শৈত্যাবস্থা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে হয়ত তখন সর্ব্ব শরীরের তাপ অধিক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে শারীর তাপ উক্তরূপে অধিক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া অনেক সময় ব্যক্তিগণকে শৈত্যাক্রান্ত করে। এইরূপ শৈত্য-আক্রমণকে সর্দ্দি বলা যায়।

বহির্বাষ্পের উষ্ণ তাপে শরীর যখন তাপিয়া উঠে তখন হঠাৎ শৈত্য প্রয়োগ করিলে অনেক সময় যে বিশেষ অনিষ্ট হয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুর্ব্বল শরীরে এরূপ অনিষ্ট হইবার অধিক সম্ভাবনা। এই জন্য সুস্থ শরীরের উষ্ণ অবস্থায় শৈত্য প্রয়োগ নিতান্ত নিষিদ্ধ। সবল ব্যক্তিও উক্তরূপে শৈত্য প্রয়োগ করিয়া পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি প্রচণ্ড রৌদ্র হইতে আসিয়াই স্নান করিল; স্নানের অব্যবহিত পরেই তাহার সর্দ্দি হইল। অপর এক ব্যক্তি শীতকালে উষ্ণ বাষ্পময় নাট্যমন্দিরে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়াই গ্রীষ্ম বোধে বাহিরে আসিল; সেও সেইরূপ পীড়াক্রান্ত হইল। অধিক পরিমাণে শারীর তাপ ক্ষয় হইয়া উক্তরূপ পীড়া উৎপাদন করে। কিন্তু অনেকে উপর্য্যুপরি শৈত্য প্রয়োগ করিয়াও পীড়াগ্রস্ত হয় না, এমন কি দারুণ প্রচণ্ড রৌদ্রে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের পরই শীতল জলে স্নান করিলেও তাহাদের

স্বাস্থ্যের কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মায় না। অভ্যাস অন্যতর প্রকৃতি। অভ্যাস বশতঃ শৈত্য প্রয়োগে তাহাদের পীড়া হয় না। শৈত্যের সংস্পর্শে তাহাদিগের বহিঃস্থিত রক্তবহা নালী সমুদায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ায় অধিক তাপ উদ্গত হইতে পারে না। অধিক তাপোদ্গম না হইলে দেহের অনিষ্ট হইবার কম সম্ভাবনা। এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা নিজ নিজ সন্তানদিগকে শৈশবাবস্থায় গাত্রাচ্ছাদন দেয় না; শীতকালেও সামান্য বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখে। এরূপ করাতে ক্রমে বহির্বাষ্পের তাপের পরিবর্ত্তনে কোন ঋতুতেই সেই সকল শিশুর অধিক অপকার হয় না। ক্রমাগত অভ্যস্ত হইয়া তাহাদিগের ত্বক্ বহির্বাষ্পের তাপ পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে কার্য্য করিতে শিখে। এইরূপ অনেক শিশু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা বৃষ্টিতে অনবরত খেলা করিতেছে, শীত কালে সামান্য কাপড়ে আচ্ছাদিত আছে কিন্তু বহির্বাষ্পের তাপের পরিবর্ত্তনে পীড়াক্রান্ত হয় না। অপর কতকগুলি শিশু সামান্য কারণেই পীড়াক্রান্ত হইতেছে। অভ্যাসই উক্তরূপ বিভিন্নতার কারণ। যাহারা অধিক পরিমাণে গাত্রাচ্ছাদন ব্যবহার করিয়া থাকে, গাত্র অনাবৃত করিলে তাহাদিগের অধিক তাপক্ষয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু যাহারা গাত্রাচ্ছাদন স্বল্প ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদিগের ত্বক্ কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কুচিত থাকে; বহির্বাষ্পের তাপের পরিবর্ত্তনে তাহাদিগের বিশেষ অপকার হয় না। কিন্তু দেহকে শৈত্যের বিপক্ষে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত করা বিপজ্জনক। বসন ব্যতীত শীতকালে এবং শীতপ্রধান দেশে কোন সময়ে তাপরক্ষা হইতে পারে না। ইহার বিপক্ষে কার্য্য করিতে গিয়া অনেকে দেহকে বিপন্ন করিয়াছে। লোকে অপ্রতুল বশতঃ সামান্য বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু শৈত্যের বিপক্ষে আবশ্যকীয় বসনাদি ব্যবহার না করা নিতান্ত ভ্রম। গাত্রাচ্ছাদনের আতিশয্য যেমন অনেক সময় পীড়া উৎপাদন করে, স্বল্প বস্ত্রাদিতেও সেইরূপ অপকার হইবার সম্ভাবনা।

সংবেষ্টন তাপের হ্রাসে শারীর তাপের হ্রাস বিষয়ে আর অধিক না লিখিয়া পীড়ায় এবং নিঃস্রবণ ও প্রস্রবণের আতিশয্যে তাপ হ্রাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। নিঃস্রবণ ও প্রস্রবণের দ্বারা শারীর তাপ সচরাচর ক্ষয়িত হয়। যে পরিমাণে তাপ ব্যয়িত হয় সেই পরিমাণে উৎপাদিত না হইলে তাপ হ্রাস হইয়া আইসে। এই জন্য অনশনে, স্বল্প আহারে অথবা অন্য কোন কারণে শরীর পোষণে বিঘ্ন হইলে শারীর তাপ কমিয়া আইসে। শরীর হঠাৎ অবসন্ন হইলে শারীরিক ক্রিয়া সমুদায় যখন মৃদুভাবে হইতে থাকে তখন তাপের পরিমাণও কমিয়া যায়।

সুরা অধিক পরিমাণে পান করিলে শরীর তাপের হ্রাস হয়; কিন্তু অল্প পরিমাণে পান করিলে, অনেক সময়ে সেরূপ হইতে দেখা যায় না। সুরা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ত্বকের ক্রিয়া সংবর্দ্ধন করে ও অনেক সময় ঘর্ম্ম উত্তমরূপে নিঃসারিত করিয়া থাকে। ত্বকের এইরূপ উত্তেজনা হওয়াতে তাপ-ক্ষয় বৃদ্ধি পায়; এজন্য পীড়িত অবস্থায় সুরা সেবনে 'ত্বকের কার্য্য উক্তরূপে না হইলে ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন সুরায় দেহের আণবিক পরিবর্ত্তন কমাইয়া আনে তাহাতেও শারীর তাপ হ্রাস হইয়া থাকে। নিঃস্রবণ ও প্রস্রবণের আতিশয্যে শারীর তাপ একেবারেই অধিক কমিয়া আসিতে পারে। বিসূচিকা রোগে শরীরের জলীয় অংশ অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া শারীর তাপ নিঃসারিত করে এবং রোগীকে অল্প সময় মধ্যে বিকল ও হিমাঙ্গ ও নিস্তেজ করিয়া ফেলে। প্রবল জ্বরে শরীর অতিশয় বিষাক্ত হইয়া পড়িয়াছে এমত অবস্থায় নিঃস্রবণ ও প্রস্রবণের আধিক্যে শারীর তাপ অল্প সময় মধ্যেই কমিয়া আসিয়া স্বাভাবিক অথবা সময়ে সময়ে তদপেক্ষা কম হইয়া থাকে। যান্ত্রিক ক্রিয়ার উক্তরূপ আধিক্যে রোগীর জীবনকে সময়ে সময়ে বিপন্ন হইতে দেখা যায়। বিশেষ আবশ্যক না হইলে চিকিৎসক যান্ত্রিক পীড়ার উত্তেজনা করেন না; কিন্তু কোন কোন সময়ে পীড়িতাবস্থায় যান্ত্রিক ক্রিয়া আপনি বাড়িয়া উঠে, চিকিৎসককে তাহা কমাইয়া আনিতে হয়। শরীর পীড়াবিষে অতিশয় বিষাক্ত হইলে অথবা শরীর-যন্ত্রের কার্য্যের কোন বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিলে সময়ে সময়ে নিঃস্রবণ ও প্রস্রবণ সমুদায় অতিশয় বাড়িয়া উঠে। প্রকৃতি আরোগ্য বিধানের সহায়তা করে বটে কিন্তু সময়ে সময়ে তাহা রোগীকে বিপন্ন করিয়া থাকে। তখন তাহার কার্য্যের প্রতিরোধ বা হ্রাস না করিলে জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া পড়ে।

এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে গাত্রাচ্ছাদন বিষয়ে কতিকত কথা না বলিয়া থাকিতে পারা গেল না। গাত্রাচ্ছাদন দিবারাত্রির মধ্যে কোন্ সময়ে অধিক আবশ্যক? এই প্রশ্নের উত্তর স্বাস্থ্যকালীন তাপপরিমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতে পারে। স্বাস্থ্যে তাপ-পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছে। শীতপ্রধান দেশে রাত্রি দুই প্রহরের পর শারীর তাপ সর্ব্বনিম্ন সীমা প্রাপ্ত হয়। এদেশে এই সময় রাত্রি চারি পাঁচটা। এই সময়ে পৃথিবীর উপরি-ভাগের ও বহির্বাষ্পের তাপও সেই পরিমাণে কমিয়া আইসে। নিম্নতম তাপ শরীরের দুর্ব্বল অবস্থার পরিচয় দিয়া থাকে। সেই অবস্থায় গাত্রাচ্ছাদনের যে অধিক প্রয়োজন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা সাধারণে

বিদিত না থাকাতে অনেক অনিষ্ট উৎপাদিত হইয়া থাকে। অনেক সময় পীড়া রাত্রির শেষভাগে দেহকে আক্রমণ করে। এই সময়ে গাত্রাচ্ছাদন ব্যবহার করা স্বাস্থ্যরক্ষার যে প্রধান উপযোগী তাহা অনেকেই বিদিত নহে। এমন অনেককে দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা গ্রীষ্মকালের দিবাভাগে গাত্রাচ্ছাদন ব্যতীত থাকে না, কিন্তু রাত্রিতে গাত্রাচ্ছাদন ব্যবহার করা আবশ্যক বোধ করে না; তাহাদের মধ্যে অনেকেই পীড়িত; কেহ কেহ সর্দ্দি, কাশ, হাঁপানি রোগে জর্জ্জরিত। তথাপি গাত্রাচ্ছাদনের কথা উত্থাপিত হইলে তদ্বিপক্ষে বাক্‌পটুতা দেখাইতে চেষ্টা করে। গ্রীষ্মকালে বসন ব্যবহার করা যে কেবল একটি সভ্যতার লক্ষণ ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস যত শীঘ্র বিদূরীত হয় ততই মঙ্গল। রাত্রির শেষভাগে জীবের জীবনীশক্তি স্বভাবতঃ কম থাকাতে চিকিৎসক সেই সময় রোগীর তাপ-রক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হয়েন।

কণ্বমুনি ও প্রস্পেরো।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

টেম্পেষ্ট নাটকের প্রত্যেক অঙ্ক, প্রত্যেক দৃশ্য প্রীতিময় প্রস্পেরোর রঙ্গশীল আধ্যাত্মিক তত্ত্বময় অভিনয়ে বিভাসিত। ভীষণ বাত্যাসমাকুল জলধিতরঙ্গের ভীম আস্ফালন তাঁহার চরণতলে আসিয়া বিলীন হইতেছে। আকাশবিহারী প্রেতগণের অলৌকিক শক্তি তাঁহারই অসীম যোগবলে উদ্ভূত হইতেছে, তাঁহারই অসীম শক্তিতে বিলুপ্ত হইতেছে! মিরান্দা ও ফারডিনান্দের প্রীতির নির্ঝর হিমাচলচরণে ভাগীরথীর ন্যায় তাঁহার চরণতলে আসিয়া অসীম পুলকে অতুল শোভায় ক্রীড়া করিতেছে! তিনি কখনও অতুল আনন্দে অনিলঅঙ্গে মিশিয়া নেপল্‌স সম্রাটের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা দেখিয়া হাসিতেছেন, কখনও অদৃশ্য থাকিয়া, পাপান্ধ এন্‌টোনিও ও সিবাষ্টিয়ানকে মানব-হৃদয়ের সুখ দুঃখের গূঢ়তত্ত্ব দেখাইয়া দিতেছেন। এই প্রীতিপূর্ণ রঙ্গস্থলে তিনি প্রত্যেক অভিনেতার শিক্ষাগুরু! এই মধুর ঐকতান বাদনে তিনি প্রত্যেক যন্ত্রের, প্রত্যেক তানের নিয়ন্তা! এই মনোমোহন কাব্যে তিনি প্রত্যেক সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা! টেম্পেষ্ট নাটক যেন বিহগকূজিত, ললিত গীতিতে উচ্ছ্বসিত, মৃদুমারুতসেবিত শারদীয় পূর্ণিমা নিশি; প্রস্পেরো তাহাতে পূর্ণ-গৌরবময় পূর্ণেন্দু! আর

কণ্বমুনি? আমরা সেই তেজঃপুঞ্জ কান্তি একবার মাত্র দেখিতে পাইয়াছি। সেই তেজোময় অরুণমূর্ত্তি কেবল একবার মাত্র আমাদের নয়নসম্মুখে আসিয়া, আমাদিগকে সৌন্দর্য্যছটায় বিমুগ্ধ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। মহাকবির মহাকৌশলময় চিত্র! আমরা অভিজ্ঞান-শকুন্তলের প্রথম অঙ্কে দেখিয়াছিলাম, কালিদাস বিস্ময়কর চিত্রকৌশলে, কণ্বমুনিকে দূরে রাখিয়াই, আমাদের সাক্ষাৎকারে না আনিয়াই, তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যে আমাদের হৃদয় নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। আমরা অভিজ্ঞানশকুন্তলের অভিনয়ের পর অভিনয়, দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম! কণ্বমুনি স্বয়ং একবার বই আর দেখা দিলেন না, কিন্তু প্রত্যেক নূতন অভিনয়ে, প্রত্যেক নূতন চরিত্রে সেই মহামুনির তেজঃপুঞ্জ কান্তি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর বর্ণে, নূতন হইতে নূতনতর সৌন্দর্য্যে বিভাসিত দেখিতে লাগিলাম! সেই অনুপম শান্তিরসের প্রস্রবণ সুন্দর হইতে সুন্দরতর তরঙ্গভঙ্গে, প্রবল হইতে প্রবলতর উচ্ছ্বাসে ছুটিতে লাগিল! যেমন সূর্য্যরশ্মি হইতে পরিদৃশ্যমান জগতের বিবিধ বর্ণের উৎপত্তি, সেইরূপ যেন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রত্যেক চরিত্রের জীবন এই মহামুনির মহান্ সৌন্দর্য্য! গৌতমী ও শার্ঙ্গরব, শকুন্তলা ও প্রিয়ম্বদা, দুষ্মন্ত ও মাতলি যেন সেই সৌন্দর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব মাত্র। আমরা সেই সকল আংশিক সৌন্দর্য্য দেখাইয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। কণ্বমুনি-চরিত্রের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার জন্য আয়াস আবশ্যক করে না, দর্শক আপনা আপনি আপনার অজ্ঞাতসারে সেই সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া যায়! বল্কলশোভিনী, তপোব্রতচারিণী তপস্বিনী বালার প্রথম দর্শনে যে কণ্বমুনিকে যিনি অসাধুদর্শী বলিয়াছিলেন, পরক্ষণেই আবার তাঁহারই মুখে শুনিলাম:—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং,
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী,
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং
নাকৃতীনাম্॥

আবার যখন তিনি মাধব্যের নিকটে গিয়া তপোবনদর্শনবৃত্তান্ত বিবৃত করিবার সময় বলিতেছেন

"অর্কস্যোপরি শিথিলং
চ্যুতমিব নবমালিকাকুসুমম্"

তখন দেখিলাম রাজাধিরাজ দুষ্মন্তের মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় সেই উজ্জ্বল তপনকিরণে আলোকিত হইয়াছে!

প্রস্পেরো যেমন মিরান্দার শিক্ষাগুরু, কণ্বমুনি সেইরূপ শকুন্তলার। উভয়ের শিক্ষার একই উদ্দেশ্য কিন্তু উভয়ের শিক্ষাপ্রণালী অনেক অংশে বিভিন্ন! প্রস্পেরো অতিযত্নে প্রতিনিয়ত বালিকাকে নয়নসম্মুখে রাখিয়া, সংসারকে সাগরপারে নিক্ষেপ করিয়া,

প্রলোভনের পদার্থমাত্রকে দৃষ্টির বাহিরে রাখিয়া অনন্ত সাগরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের উপাদানে মিরান্দার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যখন তিনি দেখিলেন নির্ম্মাণক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে, সংসারের তরঙ্গ আঘাতে সে হৃদয় নিমজ্জিত হইবার নহে, সেই পূর্ণ কৌশলে নির্ম্মিত, পূর্ণায়তন, সেই অনন্ত সাগরের অনন্তের উপাদানে গঠিত হৃদয়, পূর্ণসুখে অনন্তকাল অনন্তের সৌন্দর্য্যে ভাসিবে, তখন তিনি সেই সাগরবাসিনী মনোমোহিনী যোগিনী বালাকে নির্জ্জন সাগরতীর হইতে সংসারকোলাহলে লইয়া গেলেন! সেই জন্যই মিরান্দার শিক্ষা শেষ হইলে ত্রিকালদর্শী বৃদ্ধ প্রস্পেরো বলিয়াছিলেন—

"The hour's come now,
The very minute bids thee ope
thine ear."

সেই জন্যই বৃদ্ধ গর্ব্ব করিয়া হাসিতে হাসিতে কন্যাকে বলিয়াছিলেন—

"——And here
Have I, thy schoolmaster, made
thee more profit
Than other princesses can, that
have more time
For vainer hours and tutors not
so careful."

যথার্থ কথা! এমন আশ্চর্য্য শিক্ষা কি আর কাহারও সম্ভব! এখন শিক্ষাগুরু জগতে কি আর আছে? আমরা অভিজ্ঞানশকুন্তলে ইহা অপেক্ষাও যেন অধিকতর কৌশলময় শিক্ষাপ্রণালী দেখিতে পাই। প্রস্পেরোর ন্যায় কণ্বমুনি শকুন্তলার জন্য এরূপ মনুষ্যাহিবরতি প্রলোভনশূন্য শিক্ষাগৃহের নির্দ্দেশ করেন নাই। শকুন্তলার শিক্ষাগৃহ তপোবন অথচ লোকালয়! ধীর, প্রশান্ত, বিভুপ্রেমমত্ত, সন্ন্যাসীর প্রেমনিকেতন, অথচ কুসুমকিশলয়শোভিত, ভৃঙ্গনিনাদিত, ঋতুরাজ সেবিত, অনঙ্গবিহরিত প্রমোদকানন! কণ্বমুনি এই গূঢ়তম উদ্দেশ্যময় উচ্চতম শিক্ষার জন্য এই মধুরতাময় অনঙ্গের লীলানিকেতন প্রমোদ-উদ্যান শান্তিরসে পরিপ্লুত করিয়া রাখিয়াছেন! তিনি শকুন্তলার অভিনব বপু বল্কলে মণ্ডিত করিয়াছেন কিন্তু তাহা হইতে পাণ্ডুপত্রোদরস্থ কুসুমের ন্যায় কি মাধুর্য্য বিকীর্ণ হইতেছে!

"কঠিনমপি মৃগাক্ষ্যা বল্কলং কান্তরূপং
ন মনসি রুচিভঙ্গং স্বল্পমপ্যাদধাতি।
বিকচসরসিজায়াঃ স্তোকনির্ম্মুক্তকণ্ঠং
নিজমিব কমলিন্যাঃ কর্কশং বৃন্তজালম্॥"

কণ্বমুনি তাপসবৃন্দের পবিত্র সহবাসে, শান্তিরসের অবিরাম উচ্ছ্বাসে, প্রকৃতির চারুপ্রেমে আপন শিষ্যার হৃদয় গড়িয়াছেন; কিন্তু তিনি তাহাকে আশ্রমবাসিনী, গৃহত্যাগিনী, সন্ন্যাসিনী করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীতে চারুশীলা মধুরভাষিণী

সন্ন্যাসিনীর চিরকৌমার্য্যের বিধান নাই! তিনি আধুনিক ভারতের বালবিধবার জনকের ন্যায়নীলোৎপল-পত্রে শমীলতা ছেদনের ব্যবস্থা করেন নাই। তাই শার্ঙ্গরব শারদ্বতের ইঙ্গুদীতরুশোভী, ছিন্নদর্ভাঙ্কুর, ধূমাচ্ছাদিত হোমকাননের পার্শ্বে আমূলমুকুলিত মাধবীলতাশোভিত উদ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই গাম্ভীর্য্যময়ী তাপসবৃদ্ধা গৌতমীর সমীপে প্রিয়বাদিনী রসালাপ-ময়ী অনুসূয়া প্রিয়ম্বদাকে রাখিয়াছেন। তাই মহামুনির শিষ্যা শিরীষকোমল করে বারিকুম্ভ লইয়া নিঃস্বার্থ ধর্ম্মাচরণ-কামনায় সর্ব্বপ্রসব কুসুমহীন তরুতলে বারি সিঞ্চন করিতে করিতে বলে—

"ইদানীমতিক্রান্তকুসুমসময়ানপি বৃক্ষান্ সিঞ্চামঃ, তেন অনভিসন্ধিগুরুকো ধর্ম্মো ভবিষ্যতি!" *

তাই আবার সেই প্রেমময় যোগীর শিষ্যা নবপল্লবপূর্ণ বাতান্দোলিতশাখা তরুবর প্রেমের রহস্যকথা বলিবে বলিয়া ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছে, মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে বলে—

"সখী! এষ বাতেরিত পল্লবাঙ্গুলীভিঃ
কিমপি বাহরতীব মাং চূতবৃক্ষঃ,
যদ্যাবদেনং সম্ভাবয়ামি!"

তাই সেই তপোবলশালিনী সন্ন্যাসিনী প্রত্যাখ্যানকালে পরুষ বচনে, লোহিত-কুটিল লোচনে পুরুরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"অনার্য্য! কিং আত্মনো হৃদয়ানুমানেন সর্ব্বং প্রেক্ষসে, কঃ ইদানীং অন্যো ধর্ম্ম কঞ্চুকব্যপদেশিনস্তৃণাচ্ছন্ন কূপোমস্য তবানুকৃতং প্রতিপৎস্যতে!"

তাই আবার প্রেমময়ী বিলাসিনী সন্তপ্ত নয়নে পতির প্রতি চাহিয়া বলিতেছে—

"ভগ্নেদানীং দুরারোহিণী আশালতা।"

শকুন্তলার শিক্ষক কলুষময় সংসারকে পুণ্যময় তপোবন করিতে পারেন! বিলাসিনী কামিনীকে কামনাশূন্যা যোগিনী করিতে পারেন। পাপ-চিন্তাময় ইহসংসার আনন্দময় সুরলোকে পরিণত করিতে পারেন। ঐশ্বর্য্যমত্ত দুরন্ত নরপতিকে বনবাসিনী তাপস-বালার চরণতলে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন!

প্রস্পেরোর শিষ্যার ন্যায় কণ্বমুনির শিষ্যাও প্রেমময়ী যুবতী, সরলতাময়ী বালিকা, স্নেহময়ী রমণী, নিষ্কাম-ধর্ম্মচারিণী তপস্বিনী। কিন্তু প্রস্পেরোর শিষ্যা এমন তেজোময়ী যোগিনী নহে। এমন সর্ব্বলোকরঞ্জিনী গৃহিণী নহে। প্রস্পেরোর সারল্যপুত্তলি পিতার সম্মুখে প্রেমিককে নিঃসন্দিগ্ধমনে আলিঙ্গন করিয়া বলে

"—I am fool
To weep at what I am gald of!"

আর কণ্বমুনির স্বর্গচ্যুত মেনকাবালা

* প্রাকৃতভাষার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইল।

প্রীতিবিস্ফারিত নয়নে প্রেমিককে দেখিতে দেখিতেও বলে "মুঞ্চ মুঞ্চ মং, এক্কাঅ গণোপহবামি।"

কে বলে কালিদাস শৃঙ্গাররসের কবি? আমরা অভিজ্ঞান শকুন্তলের অভ্যন্তরস্থ শান্তিরসের স্বরূপ দেখিবার জন্য বৃথা কাব্যজগত অন্বেষণ করি।

কণ্ব মুনিচরিত্র যেমন দুষ্মন্তের চিত্রে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেইরূপ টেম্পেষ্ট নাটকে এলনসো ও এ্যান্তোনিও প্রস্পেরোর প্রতিনায়ক। একদিকে যোগবলশালী মনোরাজ্যের রাজা অসীম আধ্যাত্মিক শক্তিবলে মহৎ হইতে মহত্তর যোগী, অপর দিকে অসীম ঐশ্বর্য্যশালী অতুল পরাক্রম নরপতি! দুই জনের বিভিন্নরূপ মহত্ত্বের চিত্র পরস্পরের সম্মুখীন। দর্শক মুগ্ধনেত্রে আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করে, বল দেখি কাহার মহত্ত্ব কাহার সৌন্দর্য্য অধিক? দুষ্মন্তের হীরক-খচিত সিংহাসনের না কণ্বমুনির তপনরশ্মিময় যোগাসনের? এলনসোর রত্নরাজি-শোভিত বীরবপুর না প্রস্পেরোর যোগবলে জ্যোতির্ম্ময় কান্তির? সাগর সমীপে সরোবর! হিমালয়চরণে শৈলখণ্ড! সিংহের সম্মুখে মূষিক! মহাপরাক্রম পুরুরাজ সুখলাভ কামনায়, নবজীবনের আশায় কনকপ্রাসাদ ছাড়িয়া মহর্ষির আশ্রম তরুমূলে ধাবমান হইতেছেন। সেখানে গিয়া প্রীতিপূর্ণ অন্তরে বলিতেছেন—

"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি
বসুধাতলাৎ।"

আপন সুবর্ণনিকেতনে প্রত্যাগমন করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে বলিতেছেন—

"অহন্যহন্যাত্মন এব তাবৎ
জ্ঞাতুং প্রমাদস্খলিতং ন শক্যম্।
প্রজাসু কঃ কেন পথা প্রযাতী-
ত্যশেষতঃ কস্য পুনঃ প্রভুত্বম্॥"

যিনি এই মাত্র বাহুবলে একাকী অমরবিরোধী দুর্দ্ধর্ষ দানবদলকে পরাস্ত করিয়া দেবগণকে বিস্মিত করিয়াছেন তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রম দেখিয়া রোমাঞ্চিত শরীরে বলিতেছেন

"প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা
সৎকল্পবৃক্ষেবনে।
তোয়ে কাঞ্চনপদ্মরেণু কপিশে
পুণ্যাভিষেকক্রিয়া॥"

প্রস্পেরোর অসীম যোগবলদর্শনে মোহিত ও বিস্মিত হইয়া নেপলস সম্রাট্ মুগ্ধ হৃদয়ে বলিতেছেন

"This is as strange a maze as e'er
men trod;
And there is in this business
more than nature
Was ever conduct of; some
oracle
Must rectify our knowledge."

পাপাচারী এনটোনিও সসম্ভ্রমে যোগীরাজের চরণতলে লুটাইতেছে! ইনিইনা মিলান দেশের পদচ্যুত রাজা? যিনি ইচ্ছা করিলে ভীষণ জলধি হৃদয়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন তিনি

আজ রাজ্যত্যাগী সাগরসৈকত প্রবাসী দীনহীন সন্ন্যাসী! রাজাধিরাজ দীনহীন সন্ন্যাসীর চরণতলে লুটাইল; তপোবলের যোগালোকে রাজপ্রাসাদ আলোকিত হইল! সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরের বাহুবল সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক বলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল! আর আমরা এই তেজঃপুঞ্জ চিত্রদ্বয়ের স্বরূপ বর্ণনা করিবার জন্য বৃথা প্রয়াস পাইব না! অই দেখ মহাযোগী প্রস্পেরো রঙ্গভূমি প্রেমালোকে আলোকিত করিয়া, নেপল্‌স সম্রাটের খদ্যোতালোক আপন পূর্ণেন্দু-কিরণে বিলীন করিয়া অসীম উল্লাসে বলিতেছেন

"Now my charms are all over-thrown!
And what strength I hav's mine own!
* * * *
As you from crimes would pardoned be,
Let your indulgence set me free."

আর অই দেখ মহামুনি কণ্ব আধ্যাত্মিক জগতের প্রেম সিংহাসনে আসীন হইয়া সস্মিত মুখে দুষ্মন্তের মুখে শুনিতেছেন।

"মমাপিচ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগত শক্তিরাত্মভূঃ।"

তাই বলিতেছিলাম প্রস্পেরো ও কণ্বমুনি কাব্যজগতে চন্দ্রসূর্য্য! যতদিন মনুষ্যের হৃদয় থাকিবে, মহাকবিদ্বয়ের চিত্র যুগল কাব্যজগত অতুল আলোকে বিভাসিত করিবে, মনুষ্য জাতিকে অনন্তপ্রেম শিক্ষা দিবে।

পরিব্রাজক।

শত বর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ।

৬

সন্ধ্যা রাত্রি ও প্রাতঃকাল।

বাঙ্গালায় চারিযুগ সন্ধ্যা হইতেছে আর যাইতেছে; রাত্রি আসিতেছে আর পোহাইতেছে। কিন্তু চারিযুগের প্রলয় এক দণ্ডে ঘটিয়াছিল, এমন কত রাত্রি আসিয়াছে; আসিয়া সহজে পোহায় নাই,—আবার পোহাইবে, লোকে তাহা মনেও ভাবে নাই।

এক শত বৎসর। আজও তাহাও হয় নাই,—ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল রাত্রি আসিতেছে, রাত্রিকালে বাঙ্গালার লোক সুখে ঘুমাইয়া বাঁচিতেছে। সে কালে বাঙ্গালীর চক্ষে নিদ্রা ছিল না। ঘুম পাইলে কেহ নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে পারিত না। সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইত। শতবর্ষের সঙ্গে এখনকার তুলনা হইবে বলিয়া সেই সব

দুঃখের কাহিনী কিছু কিছু লিখিয়া দিতেছি।

বেলা নাই। বড় বড় বৃক্ষের আগায় অল্প অল্প রৌদ্র ঝিক্ মিক্ করিতেছে। মাঠের গোরু সারি দিয়া গ্রামের ভিতর আসিতেছে, পয়স্বিনী গাভির পালে ছোট ছোট বাছুরগুলি লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিতেছে। বাঁশবন কলরবে পূর্ণ। কাক শালিক ও ছাতারে পাখী গ্রাম তোলপাড় করিতেছে। ফিঙ্গা ও তালচোঁচ উড়িয়া উড়িয়া কীট পতঙ্গ ধরিয়া খাইতেছে। এ সময়ে গৃহস্থের বাটীতে সকলেই ব্যস্ত। পুরুষেরা মজলিস্ ভাঙ্গিয়া হস্ত মুখ ধুইতে যাইতেছেন; কেহ কেহ গোয়াল ঘরে ঘুঁটে জ্বালিয়া ধূঁয়া করিতেছেন। সেকালে লুসিফার ছিল না। রাত্রিতে আগুন করিবার জন্য ঘরে ঘরে চকমকি থাকিত। কেহ কেহ মালসা ভরিয়া তুষ ঘুঁটের আগুন জ্বালাইয়া রাখিত। দে-শলাইয়ের মধ্যে পাকাঠীতে গন্ধক মাখান, তাহাই আগুনে দিয়া লোকে আলো জ্বালিত। বৃদ্ধ ব্যক্তির নিদ্রা হয় না, তাঁহারা কাসিতে কাসিতে সারারাত্রি তামাকু খান। সে জন্য বেলাবেলি অগ্নির আয়োজন করিয়া রাখিতেছেন। কেহ সোলা পোড়াইতেছেন; কেহ নারিকেলের মুটী পাকাইতেছেন; কেহ অঙ্গার দেখিয়া রাখিতেছেন। তখন টীকার চলন ছিল না।

এ সময়ে অন্তঃপুরে আরও ধূম। বড় বড় বালকেরা হো হো করিতেছে। কেহ কেহ লুকাচুরী খেলিতেছে; একবার সদর বাটীতে, একবার অন্তঃপুরে ছুটাছুটি করিয়া যাইতেছে। ছোট ছোট শিশুরা মার অঞ্চল ধরিয়া পাছু পাছু ফিরিতেছে আর নানা রকম আবদার লইয়া কাঁদিতেছে। এয়োস্ত্রী পতির কল্যাণে কালিকাব্রত লইয়াছেন; বেলা গেল, রাত্রি হইলে আর অন্ন ভোজন করিতে পাইবেন না,—তাই বামহস্তে তাড়াতাড়ি গ্রাস তুলিতেছেন। বৃদ্ধ গৃহিণীরা পা মেলিয়া ছিন্নবস্ত্রে সলিতা পাকাইতেছেন। কেহ প্রদীপ পরিষ্কার করিতেছেন। কেহ কেহ শয্যা পাতিয়া রাখিতেছেন।

রাত্রির প্রতীক্ষা অনেকে করে। দুশ্চরিত্র লোক সন্ধ্যা পানে চাহিয়া থাকে; কিন্তু রাত্রি কাহারও প্রতীক্ষা করে না,—সময়ে আসে, সময়ে পোহায়। সময় আসিল, দিবা অবসান,—সন্ধ্যা হইল। চারিদিক্ ঘোর ঘোর; মশার ঝাঁক বন্ বন্ করিয়া ডাকিতেছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ঘাসের উপর সপ্তমে সুর চড়াইয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে; কালপেঁচা ও লক্ষ্মীপেঁচা নিঃশব্দে কোটর হইতে উড়িয়া যাইতেছে; ইন্দুরগুলা ধান্যের গোলায় লাফালাফি করিতেছে। নিকটে একটা শিকারী বিড়াল গুটী মারিয়া পড়িয়া আছে।

সেঁজ তারা পশ্চিম দিকে দপ্ দপ্

করিয়া উঠিল। সময়ের গুণে ইহাই আবার সুখতারা হয়, আজি সেই তারা হইয়া কাল সন্ধ্যায় উদিত হইয়াছে। বালকেরা উর্দ্ধমুখে এক পায়ে প্রাঙ্গণে নাচিতে নাচিতে তারা গুণিতে লাগিল,—আকাশে একটি তারা। একটী তারা দেখিলে এক চক্ষু কাণা হয়। হিন্দুদের কথায় কথায় যেমন বিপদ, বিপদের শান্তিও তদ্রূপ কথায় কথায়। বালক,আপনার একজন সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমার আমার কয় চোখ?' সঙ্গী উত্তর করিল—'চারি চোখ।' বালক বলিল,—'শত্রু বেটার এক চোখ।' অমনি নিশ্চিন্ত। চক্ষু নষ্ট হইবার আশঙ্কা এক কথায় ঘুচিল। ক্রমে আকাশ নক্ষত্রে ও তারায় তারায় ছাইয়া গেল। যেখানে দেখিবে, উপরে শুধুই তারা;—তারার পাঁতি, তারার সারি, গগনের নীল জমিতে যেন জ্বলন্ত হীরার হার ছড়ান। এমন সাজ কেবল আকাশে আছে, আর অল্পের উপর কতকটা ময়ূরের পাখায়,—জগতে আর কোথাও নাই।

পুণ্যবান্ লোকেরা নক্ষত্রলোকে গিয়া বাস করেন, বালকেরা বাটীর গিন্নীদের মুখে এই গল্প শুনিত। এখন আকাশ পানে চাহিয়া তাহাদের সেই কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে, কোন কোন বালক এক একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে অঙ্গুলি ফিরাইয়া বলিতেছে—'ঐ আমার ঠাকুরদাদা, ঐ আমার ঠাকুর মা।' নক্ষত্র অধিক দপ্‌দপে হইলে পুণ্যের ফল ভোগ কিছু উচ্চদরের হয়।

আজিকালি বাঙ্গালায় মুখ ঢাকা অন্ধকার হইলেই কাক-খোলার মহা আড়ম্বর পড়িয়া যায়,—মেদিনী দুলিতে থাকে। সেকালে এত বোতল ছিল না, সন্ধ্যার পর ঘরে ঘরে এত কাক-খোলার মজ্‌লিসও বসিত না। তখন কাঁসর ঘণ্টার বাদ্যধ্বনি ছিল। সন্ধ্যার সময় কুলকামিনীরা শঙ্খ বাজাইয়া মঙ্গলাচরণ করিতেন। কেহ ধূপধুনা জ্বালিতেছেন, কেহ প্রদীপ লইয়া দেবমন্দিরের ও তুলসীমণ্ডপের কাছে প্রণাম করিতেছেন। ব্রাহ্মণেরা সায়ংসন্ধ্যা সারিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে শীতলভোগ দিতেছেন। মধ্যে মধ্যে এক একবার উল্কাপাত হইতেছে, অমনি সকলে রামনাম স্মরণ করিতেছেন। উল্কাপাত দেখিলে মহাপাতক হয়, ইহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস। প্রবীণলোকে বলেন, এক একটী উল্কা এক একটী নক্ষত্র। নক্ষত্রগুলি এক একটী জীব। আকাশ হইতে খসিয়া পড়িলে, উহা ধান্য, ব্রীহি, কলায় প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করে। মানুষ ঐ সকল দ্রব্য খাইলে শরীরে জীবের সঞ্চার হয়। ধর্ম্ম জানেন, কি ঘটে বলিতে পারি না। শুনিতে পাই, ইংরাজি মত নাকি অন্য রকম। রাত্রি-ভিখারী পথে পথে গান করিয়া বেড়াইতেছে, বৈষ্ণবেরা খোল বাজাইয়া নাম

সংকীর্ত্তন করিতেছে। গ্রামে মহাধূম। এ সময়ে বাটীর বৃদ্ধগৃহিণীর কাছে সমারোহ কিছু বেশী বেশী। তিনি অন্ধকারে পা মেলিয়া তূল পিঁজিতেছেন, —সে কালে তৈলের অভাবে অধিকক্ষণ প্রদীপ জ্বলিত না। গৃহস্থেরা যথাকালে সন্ধ্যা দেখাইয়া দীপ নিবাইয়া দিতেন। গিন্নীঠাকুরাণীর দন্ত নাই, গুড়মাখা মুড়ীচূর্ণ খাইতেছেন আর অভ্যাসের গুণে না দেখিয়া তূল পিঁজিতেছেন। চারি দিকে পাড়ার ছেলে। তাহারা গল্প শুনিতেছে। 'রাজপুত্র' সওদাগরের-পুত্র ও কোটালের পুত্র' এক রাত্রির গল্প। আর এক রাত্রিতে হাঁসের উপকথা। তাহার পর ডাইন ও ভুতের গল্প। সাঁতরাদের বউ চুল খুলিয়া আঁচল নোটাইতে নোটাইতে যাইতেছিল, তাহাকে ভুতে পাইয়াছে। দক্ষিণপাড়ার দাসেদের বউ উঠানে ভাত খাইতেছিল, তাহাকে ডাইনে দৃষ্টি দিয়াছে। এই অবকাশে বিজ্ঞ গৃহিণী, বালকদিগকে অনেকগুলি হিতোপদেশ শিখাইয়া রাখিলেন। ভর সন্ধ্যাকালে ত্রিমাত্রা পথে দাঁড়াইতে নাই, দাঁড়াইলেভূতে পায়। রাত্রিকালে মানুষকে নিশিতে তুলিয়া লইয়া যায়; অতএব ঘুমের সময় কেহ ডাকিলে, তিন ডাকের পর উত্তর দিবে। ইত্যবসরে একটা হুহু শব্দ হইল, চারি দিক সোঁ সোঁ ঝম্ ঝম্ করিয়া উঠিল। আমরা এখন তাহাকে ঝড় বলি, সে কালে তাহাই ডাকিনীর গাছ-চালান। গিন্নী বালকদিগেকে বুঝাইয়া দিলেন,—ঐ ডাকিনীতে গাছ চালিয়া আনিতেছে। যদি রাত্রি প্রভাত হয়, আর লইয়া যাইতে পারিবে না। যেখানে রাত্রি পোহাইবে, গাছটী সেইখানেই থাকিবে। এইরূপ অনেক স্থানে 'না—জানি' গাছ আছে।

গৃহিণীর পুত্রবধূ গর্ভবতী। তিনি শয়নগৃহ হইতে পাকশালায় যাইতে-ছিলেন। ইতিমধ্যে এক ঝাঁক কি পাখী মাথার উপর দিয়া ডাকিয়া গেল। গিন্নীর দুশ্চিন্তার পরিসীমা নাই। পাখী গুলার নাম 'পাইতীপাশ'। গর্ব্ভবতী স্ত্রীলোকের মাথার উপর দিয়া ঐ পাখী উড়িয়া গেলে ঘোর বিপদ। যতদিন না তাহারা ফিরিয়া আসে, সে পর্য্যন্ত সন্তান ভুমিষ্ঠ হয় না। গিন্নী এই সংস্কারের বশে অসাবধান বউটীকে ভৎসনা করিয়া ভুত ঝাড়াইয়া দিলেন।

বালকেরা ভুতের গল্প শুনিয়া কাঠ!—ভয়ে আড়ষ্ট! এই কোমল শৈশবকাল হইতে বৃদ্ধ পিতামহী পৌত্রের মনে ভূত রাখিয়া দিলেন। আর সাতসমুদ্রের জল দিয়া ধুইলেও সে সংস্কার মুছিবার নয়। বৃক্ষতলে শুষ্কপাতা পড়িলে বিকটাকার ভুত বলিয়া বোধ হয়। গাছে জ্যোৎস্নার ছায়া পড়িলে স্পষ্ট প্রেতিনীর মত দেখায়। কিন্তু আজি কালি লোকের তাদৃশ কুসংস্কার নাই, এখন বাঙ্গালীর ভূতপ্রেতের বাতিক

অনেকটা করিয়া আসিতেছে। বলিতে আহ্লাদ হয়, এখনকার শিক্ষকেরা নাকি বিদ্যালয়ের সুখাসনে ঠেস্ দিয়া, ভূত প্রেত নাই এই কথার সার সার উপদেশ বাছিয়া, সাহস পূর্ব্বক ছাত্রদিগকে শিখাইয়া থাকেন। তবে, স্বয়ং গুরু-দেবকে এ পর্য্যন্ত পত্নীর অঞ্চল ধরিয়া রাত্রিকালে ঘরের বাহিরে আসিতে হয়। হউক,—সেটী কিছু অব্যবস্থা নয়। কথা আছে,—গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তদনুসারে চলিবে; কিন্তু তিনি নিজে কি করেন, তাহার প্রতি চক্ষু দিবে না।

ভূত আছে কি না, বলা কঠিন। কিন্তু সেকালে ভূত ছিল, তাহা বলা সহজ। তখন রাত্রি হইলে লোকের দ্বারে দ্বারে ভূত নাচিয়া বেড়াইত। তন্মধ্যে মানুষ ভূতই সব। পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে প্রায় সচ্চরিত্র লোক ছিলেন না। পাঁচ সাত খানি গ্রাম খুঁজিলে দুই একজন সচ্চরিত্র মানুষ পাওয়া যাইত কি না, এখন অনুমান করিয়া সে কথা বলিতে গেলে, আমাদের মত পাষণ্ড ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তের বিধি মিলিবে না। বলিতে হয় না; তবু যদি বলি—ছিলেন; তাহাতে আমাদের গৌরব বটে, কিন্তু তখনকার লোকের ঘোর কলঙ্কের কথা। সে কালে প্রাচীনেরা বলিতেন, সভ্যতা ও সামাজিকতা শিখিবার স্থান বেশ্যালয়। মানুষ হইয়া যে বেশ্যালয়ে না গেল, তাহার মনুষ্যজন্ম কেবল বিধাতার আত্মবিস্মৃতির দোষে। টপ্পা ও কবির সখীসংবাদ জানিলে এবং মধ্যে মধ্যে বেশ্যালয়ে গেলে মানুষ দুটা কথা বলিতে শিখে। পল্লীগ্রামে বেশ্যালয় নাই, কাজেই যে বাটীর পুরুষ প্রবাসে, সেইখানে তখনকার মজ্‌লিসের শিক্ষানবিসেরা সভ্যতা শিখিতে যাইত। পুরুষ গৃহে আসিলে শিক্ষানবিসের চিত্তের উচ্চাটন ঘটিত, সুতরাং তাহারা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ভূত সাজিয়া পথে পথে ফিরিত। যেখানে পুরুষের চরিত্রে এত দোষ, তদ্রূপ স্থলে স্ত্রীলোকের স্বভাব যে ভাল থাকিবে, এমন আশা করাই বাতুলের কাজ। আমাদের কুলীনের ঘরে এই নাট্যটা কিছু বেশী অঙ্কে হইয়া গিয়াছে। কুলীনকন্যারা প্রায় চিরকুমারী থাকিতেন, যাঁহাদের বিবাহ হইত, সে কেবল সহমরণে যাই-বার জন্য—অশীতিপর বৃদ্ধবয়সে। উপযুক্ত সময়ে যাহাদের বিবাহ হইত, সে সকল হতভাগিনী প্রায় পতিমুখ দেখিতে পাইত না। কিন্তু সুখের সংবাদ এই, এমন অবস্থাতেও নিঃসন্তান নারী অল্পই ছিল।

গ্রামে নিবিড় অন্ধকার। বাহিরে আলো নাই, কোন গৃহেও আলো নাই। শ্যামের দোকানে কেবল একটী প্রদীপ মিড়্ মিড়্ করিতেছে। কিন্তু মজ্‌লিসের জাঁক কিছু অধিক। শ্যামের দাদা ঠাকুর মাচুনীর উপর আসর জম্‌কাইয়া বসিয়াছেন, ভূমিতে তালপাতার চটীর

উপর চাষার দল। দাদা ঠাকুর অল্প কৃষ্ণবর্ণ, বক্ষঃস্থল ঘন রোমাবলীতে ঢাকা; কাঁধে চাঁপাফুলের মত পাটকরা গামোছা; গলায় ধপ্ ধপে এক গোছা পরিষ্কার যজ্ঞোপবীত; কপালে, কাণে ও কণ্ঠে রক্ত চন্দনের ফোঁটা; সোণার তারে দুটী পতিত দন্ত বাঁধান, গালভরা মিসি; বড় বড় কুঞ্চিত চুলে বাউরী কাটা। মজলিসের মধ্যে হাসিয়া হাসিয়া চাষাদিগকে নানা দেশ বিদেশের গল্প শুনাইতেছেন;—তিনি দাদা ঠাকুর না কি, তাই সব জানেন। ইংরাজেরা গন্ধর্ববংশ; ভগবতীর শাপে ম্লেচ্ছ হইয়াছে। তাহারা কালী দুর্গা কিছুই মানে না। যে দিন মানিবে, অমনি মুখে রক্ত উঠিবে। দাদা ঠাকুর এই সকল গল্প করিয়া চাষামণ্ডলীর মন কাড়িয়া লইতেছেন; আর ব্রহ্মাণ্ডের খবর রাখেন বলিয়া কত বাহবা পাইতেছেন।

দোকানে এখনও কেনাবেচা চলিতেছে। ইতর লোকেরা তৈল, লবণ, লঙ্কা প্রভৃতি ক্রয় করিতেছে। তাহার পর রন্ধন হইবে, তাহারা খাইবে। সে কালে সন্ধ্যা হইলেই শয়ন করার প্রথা ছিল না। রাত্রিকালে গ্রামবাসীরা একপ্রকাশ্য স্থানে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করিতেন। বৃদ্ধেরা বালকদিগকে নিকটে ডাকিয়া পূর্ব্বপুরুষের নাম ও গাঁই গোত্র শিখাইতেন। কখন কখন তাহাদিগকে নামতা ও কড়া গণ্ডা ঘোষাইতেন।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইল। চৌকীদার হাঁকিয়া বেড়াইতেছে। দাদা ঠাকুর দোকানীর হিসাব পত্র রাখিয়া স্বচ্ছন্দমনে কোথাও সামাজিকতা শিখিতে গেলেন, তাহার পর বাটী গিয়া ভোজন করিবেন। ক্রমে গ্রাম নিঃশব্দ হইল, গৃহস্থেরা সদর খিড়কীর দ্বার রুদ্ধ করিল। যাহার অর্থ নাই, সে সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল। এ দেশে সর্পভয়, তাই সে কালের লোক শয়নকালে আস্তীক ও গরুড়ের নাম স্মরণ করিত। আজি কালি সে প্রথা প্রায় সকলে ভুলিয়া যাইতেছে। জগতের কোন দ্রব্যে কেবল দোষ নাই, কেবল গুণও নাই,—দোষে গুণে সংসার। পূর্ণিমার চন্দ্রে কলঙ্কের কালি, সেই চাঁদে আবার শীতল সৌন্দর্য্য। এখনকার হিন্দুরা সান্‌কীতে ভোজন করেন বলিয়া তাঁহাদের অষ্টেপৃষ্ঠে কেবল দোষম'খান নয়, চরিত্রে অনেক গুণও আছে। আমাদের নবীন যুবকেরা বেশ্যালয়কে শিক্ষাস্থান বলিয়া সে নরককুণ্ডের গৌরব বৃদ্ধি করেন না। কৌলীন্য মর্য্যাদাও লোকের অনাস্থার সামগ্রী হইতেছে। বহুবিবাহও দিন দিন রহিত হইয়া আসিতেছে।

এখন তস্করের গল্প। রাত্রিকালে চোরের নাম করিতে হইলে সঙ্কেতে বলিতে হয়—'রাত্রির কুটুম্ব কচ্ছপ।' কচ্ছপ শব্দ চোরের পক্ষে বড় অযাত্রা। সে কালে বাঙ্গালীরা শয্যায় গিয়া

দেবতার নাম স্মরণ করিবার সময় কচ্ছপ নামটীও স্মরণ করিতেন। এখনও অনেক বৃদ্ধ লোক 'কচ্ছপ' 'কচ্ছপ' বলেন।

ঘোর নিশীথ কালে ত্রিপ্রান্তর মাঠে কেহই নাই। মানুষের সম্পর্ক নাই,— ময়দান জনশূন্য। কেবল এক একবার শৃগালেরা ফেউ ফেউ করিয়া উঠিতেছে; জলপিঁপী ও গাংচিল ডাকিয়া ডাকিয়া উড়িতেছে। মানুষের মধ্যে কুলটা কামিনী আর দুর্বৃত্তা শাশুড়ীর অত্যাচারে পীড়িত অভাগিনী কুলবধূ। ইহারাই এখন মাঠ দিয়া পলাইতেছে। মাথায় আগুনের মালসা, হাতে ধূনার সরা। এক একবার মালসায় ধূনা দিতেছে, আর দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। ইহাই সাক্ষাৎ পেত্নিনী। স্পষ্ট দেখিতে পাইলেও কেহ নিকটে যাইতে পারিত না। তখনকার অসুর সদৃশ লাটিয়ালও ভূতকে ভয় করিয়া চলিত।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ এক প্রকার অরাজক ছিল বলিলে হয়। বাটী হইতে দশ পনর ক্রোশ দূরে যাইতে হইলে, পিতা মাতা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসিতেন, স্ত্রী কপালের সিন্দুর মুচিয়া হাতের শাঁখা ভাঙ্গিতেন, জ্ঞাতিরা অশৌচ গ্রহণ করিতেন। পথে এত বিপদ। মাঠে একাকী গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। দস্যুরা একখানি ধুতি ও চাদরের লোভে প্রাণ নষ্ট করিয়াছে। এখনও এক এক স্থানের দুর্গম পথে যাইবার সময় পথিকরা অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইয়া দেয়,—'ঐ সেই মুণ্ডমালার পুষ্করিণী। সেই হাজারী গাড়ীর খাত এই।' পূর্ব্বে সহস্র সহস্র হতভাগ্য ব্যক্তি ঠেঙ্গাড়িয়াদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছে, ঐ সকল স্থানে আজও তাহাদের অস্থিমুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে।

কিন্তু বিপদ সর্ব্বত্র সমান। যেমন জনশূন্য মাঠে, গ্রামের ভিতরও তদ্রূপ। সে কালে এক এক খানি গ্রামে পেসাদার অতিথি সেবক ছিল। পেসাদার অতিথি সেবকের অর্থ বিড়াল তপস্বী। ইহাদের পাল্লায় বিশ ত্রিশ জন করিয়া লাঠিয়াল থাকিত। অপরাহ্ণ হইলে তাহারা দূরতর পথে গিয়া বিদেশী লোকের অনুসন্ধান করিত। কাহাকে একাকী পাইলে অতিথি সৎকার সেই খানেই শেষ করিয়া দিত, বাটীতে আনিয়া অনর্থক আর ঝঞ্ঝাট বাড়াইত না। কিন্তু সে সময় একাকী পথ চলিতে অল্প লোকেরই সাহস ছিল। রাধা গোয়ালার সদৃশ অসুর অবতারও কখন কখন দস্যুর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে। লাঠিয়ালদের বিলক্ষণ উপস্থিত বুদ্ধি ছিল, তাহারা ক্ষেত্র বুঝিয়া কাজ করিত। যদ্যপি পথিককে বলবান্ দেখিল, অথচ সঙ্গে টাকা কড়ী আছে, তাহা বুঝিতে পারিল, এমন স্থলে ঠেঙ্গাড়িয়ারা নিজেও বিদেশী পথিক সাজিত। পথিকের সঙ্গে পথিকের মত হইয়া মিশিত। পরে সুযোগ পাইলে

পশ্চাদ্দিক হইতে তাহার গলায় ফাঁশ দিয়া টানিত। এতদ্ভিন্ন দূর হইতে ফিঙ্গে কল দ্বারা লোষ্ট্র ও ভাঁটা ছুড়িয়া মারিত। কিন্তু তখন সচরাচর লোকে প্রায় দলবদ্ধ হইয়া পথ চলিত, তাহা না চলিলে বিপদের শঙ্কা পদে পদে। অধিক লোক থাকিলে তস্করদের অসুবিধাও অধিক। তখন তাহারা গলায় বস্ত্র দিয়া বিনয় করিতে করিতে পথিকদিগকে অতিথিশালার কর্ত্তা প্রভুর কাছে আনিয়া দিত। অতিথিশালা খানি অতি পরিপাটী। চতুর্দ্দিক উচ্চ উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা, মনে করিলে সহসা কেহ পলাইতে পারে না। ভিতরে প্রশস্ত ঘর। ঢালা শয্যা বিছান রহিয়াছে। হুঁকা গাড়ু গামোছা সকলই প্রস্তুত। কর্ত্তা নিজে স্বতন্ত্র কুশাসনে উপবিষ্ট। সর্ব্বাঙ্গে হরিমন্দিরের ছাপ; গলায় মোটা মোটা তুলসীর কণ্ঠি; মস্তক মুণ্ডিত; নাসিকা হইতে ব্রহ্মতালুর অন্তভাগ পর্য্যন্ত ফোটা কাটার ছটা। তেল মাখেন না, মাছ খান না,—জীবহিংসায় বড় বীতরাগ। হাতে হরিনামের ঝুলি; চোরা গণেশের ভয়ে তাহার ভিতর বিদ্যুৎবেগে ঘন ঘন মালা ঘুরাইতেছেন। এমন ইষ্টনিষ্ঠ দেখি নাই; শেষকালের চিন্তা ভিন্ন আর জানেন না!

অতিথিরা দ্বারে উপস্থিত। কর্ত্তা অমনি শশব্যস্ত হইয়া—'আসুন,আসুন! আসতে আজ্ঞা হউক। আজি কি সুপ্রভাত? আজি কি ভাগ্যের উদয়? জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যবলে আজি এই সব মহাত্মাদিগকে পাইলাম'—ইত্যাদি বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। পথিকদের মুখ শুষ্ক; পথশ্রমে ভিতরের শোণিত পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। এক হাঁটু ধুলা। কেহ খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছেন। পিপাসায় তালু ফাটিয়া যাইতেছে। কর্ত্তার সমাদর শুনিয়া সকলেই আহ্লাদে গদগদ। কেহ শতরঞ্জের উপরে লম্বা হইয়া শুইলেন; মুহুর্মুহুঃ তামাকু টানিতেছেন; কেহ পা ধুইতেছেন। ও দিকে জলখাবার ও রন্ধনের আয়োজন হইতেছে। পরিচারকগণ বড় ব্যস্ত। রাত্রিতে পাকভোজনের পর সকলে ঘুমাইলেন। কিন্তু ইহাই শেষ ঘুম। এ অতিথিশালায় নিদ্রাভঙ্গ হইবার ব্যবস্থা নাই। কর্ত্তা পথিকদের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পর রাত্রির আবার অতিথিসৎকারের সম্বল করিয়া রাখিলেন। সেকালে অনেক নরাধম পাপিষ্ঠ লোক এইরূপে বিলক্ষণ অর্থ সঙ্গতি করিয়াছিল।

থাক্ বাঙ্গালার এ কলঙ্ক। কিন্তু এমন অতিথিসেবা কোথাও নাই, কোন দেশে ছিল না। বিদেশী পথিক রাত্রিকালে আশ্রয় না পাইলে পূর্ব্বে অনেকেই তাহাদিগকে স্থান দিয়া পান ভোজন করাইতেন। অতিথিসৎকার করা বাঙ্গালার চিরকালের অভ্যাস। যথার্থ এই গুণ ছিল বলিয়া দুষ্টলোকে কপট-

দাতা সাজিত, তাই নিঃসহায় লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিত। আসল দ্রব্য না থাকিলে তাহার নকল চলে না। সুবর্ণ আছে বলিয়া গিল্টির কৃত্রিম সৌন্দর্য্য দেখিলে সোণা বলিয়া ভুল হয়। সে কালে ঘরে ঘরে অতিথিসেবা ছিল বলিয়া বিড়ালতপস্বীরা তাহার সঙ্গে ভেল চালাইতে পারিত।

বিদেশী পথিকের দশা এই। গ্রামবাসীর স্বস্তিও তথৈবচ। তখন যাহার একটু অর্থসঙ্গতি ছিল, তেমন লোক আপন গৃহে শুইতেন না, দরিদ্র প্রতিবাসীর ঘরে শুইয়া থাকিতেন। ডাকাইত পড়িলে প্রথমেই কর্ত্তাকে লইয়া টানাটানি। কোথায় মাল আছে, সহজে না দেখাইয়া দিলে তস্করেরা তাঁহার মুখে মসাল পূরিয়া দিত, মস্তকে কুঠারাঘাত করিত। কর্ত্তা এই দুর্গতির ভয়ে অন্যের গৃহে শুইতেন। কিন্তু যাঁহার পাকা বাড়ী ছিল, চোর পড়িলে সহসা গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না, তাদৃশ ব্যক্তি পরের ঘরে শুইতেন না। তবে আপন গৃহে থাকিলেও সুখে নিদ্রা যাওয়া ভার। ঘরের মধ্যে একটা ইন্দুর নড়িলে আতঙ্কে প্রাণ দুর দুর করিয়া উঠিত। প্রত্যেক রাত্রিতে এত উদ্বেগের চেয়ে যমযন্ত্রণা ভাল।

সে কালের বড়মানুষের দেউড়ী রাত্রি কালে গম্ গম্ করিত। গৌড়গোয়ালা এবং ভোজপুরে পালওয়ানে সদর দরজা গিজ্ গিজ্ করিতে থাকিত। গৌড়গোয়ালা মিস্ মিসে কাল; চুলে ঝুঁটীবাধা, হাতে রূপার বালা; মালকোঁচা করিয়া কাপড় পরা, কাছে তেলপাকা সাত হাত লাঠি। বাহু মলিতে মলিতে এদিক্ ওদিক্ পায়চালি করিতেছে। ভোজপুরে দ্বিতীয় যমের দূত! দক্ষিণ হস্তে হলুদে চোপান সূতা বাঁধা; গলায় পলার ও সোণার মাদুলী; গেরীমাটীতে রাঙ্গান কাপড় আঁটিয়া পরা; বুক ফুলাইয়া দেউড়ীর এদিক ওদিক ফিরিতেছে। দেউড়ীর দেউলে বন্নাম গোঁজা; ঢাল, তলওয়ার, ও তীরধনুক সারি সারি ঝুলিতেছে। ডাকাইত পড়িলে দ্বারবানেরা প্রাণপণে লড়াই করিত। কিন্তু কথা আছে, কাঁটা না হইলে কাঁটা বাহির হয় না।—নিজে চোর না হইলে চোর ধরিতে পারে না। ঐ সকল গৌড়গোয়ালা এবং ভোজপুরে ডাকাইতের দল বাঁধিয়া প্রায় অপরের বাটীতে চুরী করিত। সে জন্য কর্ত্তা সর্ব্বদাই বকিতেন, গালি মন্দ দিতেন। দরয়ানেরা ভয়ে ও লজ্জায় মুখ খানি চুণপানা করিয়া থাকিত।

কিন্তু দরয়ানদের দুষ্কর্ম্ম দেখিলে সকল বাটীর কর্ত্তা ভৎর্সনা করিতেন না। তখনকার অনেক ভদ্র লোকেও পেসাদার দস্যু ছিলেন, তাঁহারা চোর পুষিয়া রাখিতেন। ভদ্রসন্তানকে চুরী করিতে নাই; চুরী করিলে সমাজে অখ্যাতি হয়; তাই শুদ্ধ অখ্যাতির ভয়ে তাঁহারা নিজে

ডাকাইতি করিতে যাইতেন না, স্বচ্ছন্দে গৃহে বসিয়া নিরীহ ভালমানুষটীর মত কেবল খাঁতের মাল সামলাইতেন। এই সমস্ত বাবু চোর আপনাদের দুর্নাম ঢাকিবার জন্য, গৃহে দেবসেবা, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলসত্র, অতিথি-সেবা প্রভৃতি অনেক সৎকর্ম্ম করিতেন। তখন ইংরাজেরা এমন গাঢ় হইয়া বসেন নাই, এ দেশের নাড়ীনক্ষত্রও ভালরূপ বুঝিতেন না, সুতরাং এই সকল দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকের প্রতি তাঁহাদের অবিশ্বাস ছিল না। দৈবাৎ গয়েন্দা দ্বারা ভিতরের গূঢ় কথা রাষ্ট্র হইলে বরং বিপরীত ফল ফলিত। তখন জেলার হাকিমরা বড়মানুষের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহাদের মাসিক বেতনে ধূমধামের নবাবীচাল চলে না; না চলিলেই টাকা কর্জ্জ করা আবশ্যক হয়। সুতরাং ধনী লোকেরা টাকা কর্জ্জ দিয়া বিপদ্ উদ্ধারের জন্য সাহেবদিগকে হস্তগত করিয়া রাখিতেন। উপরে একজন মুরুব্বি আছেন, কাজেই দুষ্ট লোকের বুকের পাটা দশহাত বৃদ্ধি হইত, তাহারা নির্ভয়ে সর্ব্বত্র চুরী ডাকাইতি করিত।

গ্রামের মধ্যে হালদাররা অত্যন্ত ধনী লোক। তিন মহলা চক্‌মিলান বাড়ী। সদর্ খিড়কীতে পাহারাদার। কর্ত্তা কোম্পানীর হাতীখানার দেওয়ান.—দুই হাতে লুটিয়া খান। জনরব যে, সাত ঘড়া আকবরী মোহর, পঞ্চাশ ঘড়া টাকা তাঁহার বাটীতে পোতা আছে। তদ্ভিন্ন হীরা, মুক্তা, শাল, দোশালা এবং কাশ্মীরী রুমালের ত কথাই নাই। ভীমে সর্দ্দার প্রসিদ্ধ ডাকাইত। পূজার সময় আসিয়াছিল, কর্ত্তা তাহাকে ভীম দাদা বলিয়া পাঁচশত টাকা নগদ এবং একজোড়া গঙ্গাজলী সাল বক্‌সিস দিলেন। দাদার তাহাতে মন উঠে নাই। কেন উঠিবে? সেকি ন-কড়া ছ-কড়া দরের মানুষ? সুতরাং পত্র আসিল— "আমাকে সত্বর আর পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিতে হইবে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ। বিলম্ব হইলে, রাত্রি-কালে সাক্ষাৎ করিব।" কর্ত্তা ভয়ে ভয়ে আবার পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। কিছু দিন গেল। ভীম সর্দ্দারের টাকার অনাটন হইয়াছে, পুনর্ব্বার পাঁচ শত টাকার বরাতী পত্র আসিল,—কর্ত্তা ভীমের খাজাঞ্চী। কিন্তু এবার বিরক্ত হইয়া ভয়ে ভয়ে যৎসামান্য টাকা পাঠাইলেন, বরাত মত ঘটিয়া উঠিল না। ভীমের চক্ষু রাগে রক্তবর্ণ। ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। এক রাত্রি যায়, দুই রাত্রি যায়,—অমাবস্যা আসিল। অন্ধকারে কোলের মানুষ দৃষ্ট হয় না। ইতিমধ্যে হালদারদের বাটীতে রে রে শব্দ উঠিয়াছে; মসালের আলোতে চতুর্দ্দিক যেন দিন দুই প্রহর। ঘাঁটীর পাক তলয়ার ঘুরাইতে. ঘুরাইতে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে। ওদিকে কেহ

কপাট কাটিতেছে, কেহ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, কেহ বস্ত্রালঙ্কার লুটিয়া লইতেছে। কর্ত্তা সেতখানার ভিতর লুকাইয়া আছেন। এদিকে দরয়ানেরা তুমুল লড়াই বাধাইয়াছে। ডাকাইতদের দশ পাঁচটা খুন হইল, বাটীরও দশ পাঁচটা খুন হইল। দিবসে পাছে কেহ চিনিতে পারে, সে কারণ চোরেরা আপন পক্ষের লোকদের মাথাগুলা কাটিয়া লইয়া গেল।

এই সকল তখনকার উচ্চ অঙ্গের চুরী। ক্ষুদ্র চুরী কথায় কথায়। উমী মগুবানী চাল্‌কীর ব্যবসা করে। তাহার উঠানে ধান ভিজিতেছিল, বামা চৌকীদার ছাঁকিয়া লইয়া গিয়াছে। রাধা ছুতারণী চিঁড়া কুটিয়া দাওয়াতে রাখিতেছিল, বলাইদাস বৈরাগী তখন ডুব্‌কী বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে আসে। বাড়ী ঘেরা নয়; বৈরাগী মহাপ্রভুর ভোগ দিবে বলিয়া ধামা শুদ্ধ চিঁড়া চুরী করিয়াছে। উত্তর পাড়ার তেলীদের বাড়ী সিঁদ হইয়াছে। এইরূপ সকল রাত্রিতেই ছোট বড় এক একটা উৎপাত ঘটিত।

ভোর হইয়াছে। লোচন বাগ্‌দী তালের চেটায় শুইয়া বাঁশীতে বিভাস গাইতেছে। উষার মুরলীরব,—সে মন-ভুলান সুর, তাই এত বিপদের পরও গ্রাম যেন একটু জুড়াইল। ভোরের শীতল বাতাসের হিল্লোল বহিতে লাগিল। বাদুড়ের পাল পাকা ফলের গাছ হইতে উড়িয়া যাইতেছে; বনের ভিতর দইয়াল, কোকিল ও পাপিয়া গান গাইতেছে,—রাত্রি নাই, মুসলমান পাড়ায় কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল। হিন্দুরা এই অপবিত্র সুর শুনিয়া 'রাম' 'রাম' বলিলেন। প্রবীনেরা—"পুণ্যশ্লোকো নলরাজা, অহল্যা দ্রৌপদী" ইত্যাদি নাম স্মরণ করিতেছেন। কেহ কোষা লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। গিন্নীরা উঠিয়া কেহ ছড়া ঝাঁট দিতেছেন; কেহ ধান ভানিতেছেন; কেহ চাউল কাঁড়িতেছেন, কেহ ধান সিদ্ধ করিতেছেন। ছুতর বাড়ী চিঁড়া কোটার শব্দ, কলুঘরে ঘানি গাছের কাঁচ্ ক্যাঁচ্ ধ্বনি, গ্রামকে জগাইতেছে। বালিকারা উঠিয়া দেব-মন্দিরের উঠানে ঝাড়ুনী দিতেছে। শিশুরা ধামী ভরিয়া মুড়ী লইতেছে। বড় বড় বালকদের কোঁচড়ে জলপান, বগলে তালপাতার তাড়ী,—ছুটাছুটি পাঠশালায় যাইতেছে। দুগ্ধপোষ্য শিশুরা আধ আধ কথা কহিতে পারে,—'চিথা, চিথা'—করিয়া চাঁদ খাব বলিতেছে আর জননীর গলা ধরিয়া আবদারে আবদারে পাগল করিতেছে। সৌখীন যুবারা টিয়াপাখীর ভাঁড় লইয়া পথে পথে ফিরিতেছে। এ সময়ে পাক, মণ্ডল এবং চৌকীদারেরা অতিশয় ব্যস্ত। তাহারা মাঠে গিয়া কেবল গ্রামের সীমা দেখিয়া বেড়াইতেছে। রাত্রিতে নিজগ্রামে দুই চারিটা খুন হইয়াছে কি না; ভিন্ন গ্রামের লোক আপনাদের সীমা ছাড়াইয়া

মৃতদেহ ফেলিয়া গিয়াছে কি না,—এই সকলের অনুসন্ধান করা তাহাদের প্রাতঃকৃত্য। প্রশংসার কথা এই, তখনকার চৌকীদার ও পাক মণ্ডলের কর্ত্তব্যজ্ঞানটুকু বিলক্ষণ ছিল,—নিত্য করিতে হইলে কার্য্যপটুতাও আপনি আসিয়া ঘটে। তাহারা নিজ গ্রামের মাঠে মৃতদেহ দেখিতে পাইলে গোপনে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সীমায় ফেলিয়া আসিত। এইরূপে চালানী মড়া, নিজে চলিতে না পারিলেও, কখন কখন ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িত।

হালদারদের বাটীর ডাকাইতীর তদন্ত, আগামী প্রস্তাবের কথা।

সমর-শেখর।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নৈদাঘ মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যতাপে জগৎ ক্লান্ত, অবসন্ন ও স্তম্ভিত। মধ্যে মধ্যে আবার উচ্ছ্বাসময় বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীবগণের যন্ত্রণা দ্বিগুণিত করিতেছে। ষট্‌চক্রের মধ্যে ঠাকুরগণ আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক স্ব স্ব কক্ষ মধ্যে নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিষ্কার করিতেছেন। তরবার, ভল্ল, খড়্গ, বন্দুক, পট্টিশ, কুঠার, ছুরিকা, ও বিবিধ প্রকার শর প্রত্যেকেরই পার্শ্বে গৃহের অঙ্গনতলে স্থাপিত রহিয়াছে। প্রত্যেকেই এক একটী করিয়া সেই সমস্ত অস্ত্রে যথাযোগ্য শাণ দিতেছেন। এইরূপেই ঠাকুরদিগের প্রত্যেক গৃহেই হিস্ হিস্ ঘিশ্ ঘিশ্, ঘশর ঘশর, ঝন্ ঝন্ প্রভৃতি নানা প্রকার শব্দ শ্রুত হইতেছে। ওদিকে শীতল অন্তঃপুরচ্ছায়ায় ঠাকুরাণীদের মধ্যে কেহ চরকা ঘুরাইয়া অবিরাম ঊর্ণ সূতা কাটিতেছে, কেহ পাক দিতেছে, পাক দিয়া ধনুকের নিমিত্ত মোটা মোটা গুণ প্রস্তুত করিতেছে। কোথায়ও দশ পনর জন একত্রিত হইয়া রাশীকৃত শরাসন হইতে এক একগাছি লইয়া তাহাতে গুণযোজনা করিতেছে। অপর একস্থলে সুড়ঙ্গস্থ একটী গৃহমধ্যে বারুদ প্রস্তুত হইতেছে;—তাহাতেও অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ নিযুক্ত। এইরূপে চক্রের অভ্যন্তরে আজি এক ভাবী যুদ্ধ-ব্যাপারের আয়োজন হইতেছে।

এদিকে চক্রের অপর এক স্থলে পাঠকের সেই পূর্ব্বপরিচিত কক্ষমধ্যে নারায়ণস্বামী ও সন্ন্যাসী একত্রে উপবিষ্ট হইয়া নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন। উভয়েই একখানি বিস্তৃত গালিচার উপর উপবিষ্ট। সন্ন্যাসী বিনয়নম্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া অবধি শ্রীমুখে নানা প্রয়োজনীয়

বিষয় অবগত হইয়াছি। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ; এক্ষণে জগতের প্রধান প্রধান দেশে কি কি ঘটিতেছে এবং কে কোথায় শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছে, দাসকে শিক্ষা দিয়া কৃতার্থ করুন।"

স্বামীঠাকুর আরম্ভ করিলেন;—"বৎস! জগতের কোন অংশের কথা বলিব? আজি ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ; পৃথিবীর যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিবে, সেই দিকেই দেখিতে পাইবে ঘটনাস্রোত, তর তর বেগে ধাবিত হইতেছে। কোন স্থল শোণিতে প্লাবিত; কোন প্রদেশ অশ্রুসিক্ত,—অনল দগ্ধ; কোন কোন স্থল পবিত্র আলোকে, নবীন উৎসাহে, প্রচণ্ড ধর্ম্মোন্মাদে উন্মাদিত।" এই কথা বলিয়া তিনি সন্ন্যাসীর সম্মুখে একখানি ইয়োরোপের মানচিত্র স্থাপন করিলেন এবং পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন "বৎস! আশিয়া ছাড়িয়া সাধনার পবিত্র স্থল ইয়োরোপের দিকে নয়নপ্রান্ত কর। আজি ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ; দেখ, দেখ পাশ্চাত্য মণ্ডলে কি এক প্রচণ্ড ঘটনা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যে মহাদেশ ধর্ম্মের কুসংস্কারে নিমগ্ন ছিল, আজি তাহা ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে; ঐ দেখ বিটনবার্গ নগরের বিরাট ভজনালয়সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কে এক মহাপুরুষ গগনভেদী স্বরে গম্ভীরকণ্ঠে বলিতেছেন "অজ্ঞানান্ধ মানব! কেন মানবের পদসেবা করিবে? কেন কপটী স্বার্থপর ধূর্ত্ত যাজকে দেবত্ব আরোপ করিবে? কেন ভণ্ডের বাক্য ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া শিরোধার্য্য করিবে?" দেখ, বৎস, ঐ সন্ন্যাসীর নয়ন হইতে জ্বলন্ত তাড়িত অগ্নি বহির্গত হইতেছে; ঐ প্রলয়ঙ্কর অনলের তেজে ইংলণ্ডের হেনরী, স্কটলণ্ডের জেম্‌স, ফ্রান্সের ফ্রান্সিস, স্পেনের চার্ল্‌স, পর্ত্তুগেলের মেনুয়েল বজ্রাহতপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন; ঐ দেখ রোমে টাইবরতটে সেণ্ট পিটরের প্রচণ্ড মন্দির কাঁপিতেছে; তন্মধ্যে ভীরু লিও কম্পিত হৃদয়ে নিজ ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হইতেছেন। আজি মহাপুরুষ লুথর প্রকৃতির বিশাল ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিলেন, কালে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবে। তিন শতাব্দীর মধ্যে সেই বৃক্ষ ফলবান হইলে তাহাতে যে ফল ফলিবে সেই ফলের মধুর আস্বাদনে লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে; জগৎ স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিবে। সেই দিন কত নরহত্যাদি হইবে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পাশ্চাত্য জগৎ ছাড়িয়া একবার আশিয়া মণ্ডলে দৃষ্টিপাত কর;—দেখ, একমাত্র ভারতভূমি ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই একপ্রকার শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এই দগ্ধরাজ্যের সকল স্থলেই অশান্তি,—শোণিতপাত—অত্যাচার,—অজ্ঞানান্ধতা। এ অজ্ঞানান্ধকার হইতে কে ভারতকে উদ্ধার করিবে? কে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিবে? কে

এই অশান্তি—অসাম্য—অত্যাচার দূর করিবে? হা জগদীশ! আর কেন—আর কেন?" নারায়ণ স্বামী ও সন্ন্যাসী উভয়েরই নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল; উভয়েই উত্তরীয়াঞ্চলে নয়নজল মোচন করিয়া মুহূর্ত্তকাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে নারায়ণ স্বামী ভারতের বিস্তৃত মানচিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বৎস! এইত সাগরাম্বরা শৈলমেখলা সুবিশাল ভারতসাম্রাজ্য দেখিতেছ, ইহার কোন্ কোন্ প্রদেশে কোন্ কোন্ রাজবংশ রাজ্য করিতেছে, অগ্রে তাহা তোমাকে বলি শুন; ভারতের প্রধানতম রাজধানী পবিত্র দিল্লিনগরে যবনের প্রভুত্ব। লোডীবংশীয় ইব্রাহিম সম্প্রতি ভারতের উচ্চতম সিংহাসনে সেই নগরে আরূঢ় রহিয়াছেন। কিন্তু তিনি নামে ভারতের অধীশ্বর; যাহাদিগকে তিনি সামন্ত রাজা বলিয়া মনে মনে গর্ব্ব করেন, বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে দুই চারি জন তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করে; অবশিষ্ট সকলে নিজ নিজ রাজ্য লইয়াই ব্যস্ত। দক্ষিণাবর্ত্তে ব্রাহ্মণীবংশ অন্তর্বিপ্লবের তরঙ্গে কম্পিত; তাহারা ইব্রাহিমকে গ্রাহ্যও করে না। কিন্তু বৎস, ভারতক্ষেত্রে যবনেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। উত্তর ও দক্ষিণে যবন; পশ্চিমে পঞ্চনদ প্রদেশে ইব্রাহিমের সেনাপতি দৌলত লোডী স্বীয় প্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্ররচনায় প্রবৃত্ত। গুজ্জরে মজেফ্ফর শাহ হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধনে ধৃতব্রত। বঙ্গে সুদূর অনুগাঙ্গ প্রদেশে ভগবতী লক্ষ্মীর বিলাসক্ষেত্রে মহম্মদের বংশীয় সৈয়দ হুষেণ শাহ গৌড় সিংহাসনে আসীন। বৎস! ঐ বঙ্গের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করিবে। কেননা ঐ বঙ্গের একস্থলে ভাগীরথীতীরস্থ একটী প্রান্তরে ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যলিখন একদিন লিপিবদ্ধ হইবে। সে দিন এখনও সুদূর-পরাহত; কিন্তু সে দিনের কথা ভাবিয়া দেখিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। ঐ যে কয়েকজন শ্বেত-পুরুষ সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি কয়েকটী নগরে সাগ্রহে ভারতের পণ্যদ্রব্যজাত সংগ্রহ করিতেছে; কোথাও বলে, কোথাও বিনয়ে, কোথাও বা অন্ধকারে সংগ্রহ করিতেছে;—উহাদের আদর্শে উৎসাহিত হইয়া, উহাদের নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক বণিকবেশে ইংরাজ নামধেয় যে কতিপয় শ্বেতপুরুষ আসিবে, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ ভারতে একাধিপত্য বিস্তার করিবে। উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব—ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই যবনের অধিকার। কেবল মধ্যপ্রদেশে রাজপুতানায়; দাক্ষিণে কৃষ্ণার শাখানদী তুঙ্গভদ্রা তটস্থ বিজয় নগরে এবং সুদূর দক্ষিণে মহীশূর রাজ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেছেন। রাজস্থানে সুপ্রসিদ্ধ গিহ্লোট, রাঠোর, কুশাবহ; বিজয় নগরে নরসিংহবংশীয় নৃপতি রঘুবর।

মহীশূর ইহার অধীন। এতদ্ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থলে সামান্য সামান্য অনেক হিন্দু নরপতি আছেন, কিন্তু তাঁহাদের অনেকে যবনের পদানত, অবশিষ্ট সকলে নির্ব্বীর্য্য। তাহাদের কথা বলিয়া আর কি করিব? এই বিশাল ভারতরাজ্যের মধ্যে প্রায় বিংশতি কোটী মানব আছে; কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের মন ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধাবিত; একের সহিত অপরের সহানুভূতি নাই, মিল নাই, মিত্রতা নাই। সকলেই স্বার্থসাধনে তৎপর; কিন্তু সে স্বার্থ কি, তাহা হতভাগ্যেরা একবার ভাবিয়া দেখে না। পরস্পরের উদরপোষণই যদি মানবের একমাত্র স্বার্থ হয়, তবে পশু ও মানবে কি প্রভেদ রহিল? পশুগণও ত উদর পূরণের জন্য পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া থাকে; তাহাদেরও ত অপর চিন্তা নাই। হায়! মোহান্ধ ভারতবাসী কবে ইহা বুঝিবে? কবে তাহারা এই পাশব স্বার্থের পরিবর্ত্তে মানবীয় স্বার্থ আদর করিতে শিখিবে? হা ভগবন্! সে দিন কি আসিবে না?" নারায়ণ স্বামী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন। তখন সন্ন্যাসী সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরুদেব! তবে আমাদের সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা কৈ? এ ঘোরমোহান্ধ ভারতবাসীকে কে জাগাইতে পারিবে? হায়, জাগাইতে কত কাল লাগিবে?"

"আমরা না পারি, আমাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণ কি তাহা পারিবে না? আজি ভারতের এক প্রান্তে আমরা যে বীজ বপন করিলাম, কিছুকাল পরে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবে। তখন এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া হিন্দু মুসলমান সকলকে এক মহান্ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিবেন। সেই চেষ্টা সফল হইলে জানিব ভারতে জাতীয়তার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা নিরস্ত থাকিব না। যে মহাব্রতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, যথাসাধ্য তাহা উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা করিব। সমর ও তোমার ন্যায় শিষ্য থাকিতে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি; এখন তোমরা দুই জনে আমার দুইটী বাহু।"

"কেন প্রভো! মূলরাজ প্রভৃতি আপনার ত আরও অনেক শিষ্য রহিয়াছে; তাহাদিগকে কি আপনি স্নেহ করেন না।"

"এত অধিক নহে। হাঁ, তাহারা ধর্ম্মাত্মা, সদাচারী, বীর ও সত্যবাদী বটে; কিন্তু তোমাদের সমান নহে। তোমাদের উপর নির্ভর করিয়া আমি এখনই অনন্ত কালের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিতে পারি; কিন্তু তাঁহাদের উপর তত নির্ভর করিতে পারি না।"

রাধানাথ শিকদার।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

১৮১৩ খৃঃ অব্দে অক্টোবর (আশ্বিন) মাসে কলিকাতাস্থিত জোড়াসাঁকোর অন্তঃপাতী শিকদারপাড়ায় রাধানাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। শিকদারেরা ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। ইঁহারা কলিকাতার আদিম নিবাসী *। তিতুরামের দুই পুত্র, রাধানাথ ও শ্রীনাথ; ও তিন কন্যা। ইহাদের মধ্যে রাধানাথ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। শ্রীনাথ রাধানাথের অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। শ্রীনাথ হিন্দুকলেজের (Anglo-Indian College) একজন গণনীয় ছাত্র। ইনি এগার বৎসর চারি মাস ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া প্রভূত প্রতিপত্তির সহিত সুখ্যাতি পত্র প্রাপ্ত হন। তিনি গণিতবিদ্যায় সহাধ্যায়ীগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন; এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহকারী কণ্ট্রোলার জেনেরল স্বর্গীয় রায় শ্যামাচরণ দে বাহাদুর ও শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি মহোদয়গণের সহাধ্যায়ী ছিলেন। কলেজ হইতে পাঠ সমাপন করিয়া সরভেয়ার জেনেরলের আফিসে কম্পিউটিং বিভাগে প্রবিষ্ট হন এবং পরিশেষে "Chief native Computor"এর পদ লাভ করেন। তিনি ১৮৪৫ খৃঃ অব্দ হইতে পেন্সন গ্রহণ করা পর্য্যন্ত রাধানাথের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তিনি ১৮ বৎসর কর্ম্ম করিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন। রাধানাথের পরলোকগমনের দেড় বৎসর পরে তিনিও পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিন ভগিনী এখনও জীবিত আছেন।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ২২ জুলাই রাধানাথের

---

* শিকদারেরা মুসলমানদিগের আমলে কলিকাতার শান্তিরক্ষার প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদিগকে পূর্ব্বেকার Commissioner of Police বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই কার্য্য তাঁহারা বংশ পরম্পরায় করিয়া আসিতে ছিলেন। পূর্ব্বে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের অধীনে লাঠিয়াল পাইক প্রভৃতি অনেক লোক জন থাকিত ও তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত কাহারও বিবাহ, শ্রাদ্ধ অথবা অন্য কোন সমারোহের কার্য্য সম্পন্ন হইত না। অর্থব্যয় না করিলে তাঁহাদের অনুমতি পাওয়া দুর্লভ হইত এবং তাঁহারা অনেক সময়ে অধিক অর্থ পাইবার নিমিত্ত উৎপীড়ন করিতে ছাড়িতেন না। তাঁহারা কলিকাতার শেঠ ও বসাকগণের চাঁই স্বরূপ বাস করিতেন এবং তাহাদিগের উপর প্রভুর ক্ষমতা চালাইতেন। শান্তি সংস্থাপনের ভার বংশপরম্পরায় তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে তাঁহাদের বংশে লেখা পড়ার চর্চ্চা অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। তাঁহাদের এতদূর ক্ষমতাছিল যে শিকদারদের বাটীর সম্মুখে কোন ইংরাজ টুপি কি ছাতা মাথায় দিতে পাইতেন না। জাতি বাছিয়া লোকের উপর উৎপীড়ন করাই তাহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়াছিল। প্রথম প্রথম ইংরাজাধিকৃত কলিকাতারও তাঁহাদে পূর্ব্ব ক্ষমতা লুপ্ত হয় নাই এবং লোকে তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ ভয় করিত। শেষে একবার একব্যক্তিকে অর্থের জন্য উৎপীড়ন করায় তাঁহাদের এক জন অপদস্থ হন সেই অবধি তাঁহাদের পূর্ব্বক্ষমতা সমূলে বিনষ্ট হয়।

পিতার জীবন শেষ হয়। তিনি দৈনন্দিন লিপির (Diary) একস্থানে তাঁহার পিতার সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন "My father was a man of very good intentions and very persevering in the pursuit of any object which he took into his head to perform. At the same time he was an unhappy man ; the circumstances which produced his unhappiness were as follows—1*st* His blindness. (This is a misfortune he could not bear, and to this day when he is dying, he has not given up the hope of recovering his sights.) 2*ndly*, My not marrying and living as a Hindu. 3*rdly*, My eldest sister not getting any children."

অর্থাৎ তাঁহার পিতা সদভিপ্রায়সম্পন্ন ও একজন অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মানসিক ক্লেশের তিনটী প্রধান কারণ ছিল (১) তাঁহার চক্ষু নষ্ট হইয়া যাওয়া (২) রাধানাথ বিবাহ না করা (৩) রাধানাথের-জ্যেষ্ঠা ভগিনী নিঃসন্তান হওয়া। রাধানাথের বয়স যখন ৪০ বৎসর সেই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতার যাহা কিছু ছিল, ভাল ঘরে কন্যাগণের বিবাহ দিতে সমুদায়ই খরচ হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং পঠদ্দশায় রাধানাথের ও শ্রীনাথের অন্ন বস্ত্রের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। রাধানাথের অপেক্ষাও শ্রীনাথ অধিক কষ্ট পান। পঠদ্দশায় কষ্টের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে ৩০। ৪০ বৎসর পরেও শ্রীনাথ অশ্রু সংবরণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যাঁহারা হীন অবস্থা জনিত পাঠাবস্থায় কষ্ট পাইয়াছেন এবং পরে যাঁহাদের অবস্থা ভাল হইয়াছে তাঁহারাই এই অশ্রুপাতের অর্থ সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। রাধানাথ যে ষোল সিক্কা টাকা বৃত্তি পাইতেন তাহার অধিকাংশ পুস্তকাদি ক্রয়ে ব্যয় করিতেন; শ্রীনাথের বৃত্তির টাকায় সংসারের অন্নকষ্টের অনেক লাঘব হয়।

রাধানাথের মাতার অনেক সদ্‌গুণ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয় শ্রীনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন ও মধ্যে মধ্যে শিকদার পাড়ার বাটীতে যাইতেন। রাধানাথের জননী লাহিড়ী মহাশয়কে পুত্র নির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেন ও তাঁহাকে ভোজন করাইতে ভাল বাসিতেন। সেই বিষয় গল্প করিতে আরম্ভ করিলে বর্ষীয়ান্ দেবতুল্যপ্রকৃতিসম্পন্ন রামতনুর মুখে এখনও অতুল আনন্দ চিহ্ন লক্ষিত হয়। রাধানাথের পরলোক গমনের চারি বৎসর পরে তাঁহার জননী কালগ্রাসে পতিত হন। পিতা মাতার স্বভাব চরিত্রের উপর বালকের মনোবৃত্তি বিকশিত হওয়া নির্ভর করে। রাধানাথ পিতার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা, অকপটতা ও মিতব্যয়িতা

প্রভৃতি সদ্‌গুণ লাভ করিয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজনকে যত্নের সহিত প্রতিপালন ও বিশেষ সাহায্য করার প্রবৃত্তি থাকা তাঁহার জননীর সৎস্বভাবের ফল।

শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কথা উপস্থিত হইলে আগে ডেবিড্ হেয়ার (David Hare) সাহেবের কথা মনে পড়ে। তাঁহার বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ, হৃদয়ও তদোধিক প্রশস্ত ছিল। তিনি যদিও হেয়ার স্কুল (Hare School) বা হিন্দু কলেজ (Anglo-Indian College) সংস্থাপন করেন নাই, তথাপি তাঁহার উদ্যোগ, অধ্যবসায়, আন্তরিক যত্ন ও উন্নতির চেষ্টা না থাকিলে এই সকল বিদ্যামন্দির সুচারু রূপে চলিত কি না সন্দেহ। তিনি অনেক বাঙ্গালি বালককে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া স্বোপার্জ্জিত লক্ষমুদ্রা ব্যয় করেন। রাধানাথ যে সময়ে কলেজ ত্যাগ করেন তখন হেয়ার সাহেব কলেজের অধ্যক্ষ কমিটির একজন সভ্য ছিলেন; ও শ্রীনাথ কলেজ ছাড়িবার সময় তিনি পরিদর্শক ছিলেন। গণিতবিদ্যা সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক প্রদান করিয়া তিনি রাধানাথকে সাহায্য করেন।

এদেশে শিক্ষা প্রচলনের নিমিত্ত ডেবিড্ হেয়ার যেউদ্যোগ, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন সেই উপকারের নিমিত্ত কিরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা যায় ১৮৩০ খৃঃ অব্দে এই বিষয় বিবেচনা করার জন্য এক মহতী সভা হয়। এই সভায় বহুজনসমাগম হইয়াছিল এবং দুই দিবস তাহার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রধান বক্তাগণের মধ্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,রাধানাথ শিকদার ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায়। সেই সময় রাধানাথ শিকদার বহুকালব্যাপী অত্যাচার ও অরাজক হেতু দেশের হীন অবস্থার বিষয় বিশেষ বিবৃত করেন ও ডেবিড্ হেয়ারের এদেশে আসিয়া আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করাকে "সুখতারার" উদয়ের সহিত উপমা দিয়া ছিলেন*।

রাধানাথ প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতে যান। পরে কিছু কাল ফিরিঙ্গি কমল বসুর স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে পুত্র ইংরাজি লিখিতে ও বলিতে শিখিলেই কোন সওদাগরের আফিসে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিবেন—তাহা হইলে অর্থাগম হইবে, কিন্তু তাঁহার বিদ্যাভ্যাসে মনযোগ দেখিয়া পড়া বন্ধ করাইয়া আফিসে পাঠাইতে সাহস করেন নাই। রাধানাথ ১০ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হওয়াতে এদেশে প্রথমে উচ্চ অঙ্গের ইংরাজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান

* "Radhanath Sikdar dwelling on the debased State of the country, owing to misrule and oppression instanced the coming of David Hare as the morning star to dispel our ignorance."—Biographical Sketch of David Hare.

শিক্ষা দিবার বীজ রোপিত হয়। এই বীজ কিরূপে বৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং সুফল প্রসব করে এস্থলে সেই বিষয়ের আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবেক না।

১৮৩২ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে তিনি আপন বিদ্যাভ্যাসের একটি বিবরণ প্রকটিত করেন। তাঁহার হস্তলিখিত সেই সুন্দর বিবরণটী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়া দিব। সেই সময়ে হিন্দুকালেজে কোন্ বিষয়ে কতদূর শিক্ষা প্রদান করা হইত ও কি কি পুস্তক পড়ান হইত ও কিরূপ লোকে শিক্ষাদান করিতেন এই সকল বিষয় উহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইবে।

"১৮২৪ খৃঃ অব্দে আমি হিন্দুকালেজের নবম বা সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হই। উচ্চ শ্রেণিস্থ বালকেরা নিম্ন শ্রেণিস্থ বালকগণের উপর অযথা ক্ষমতা চালাইতেন; ইহার কারণ এই যে তখন অল্প সংখ্যক শিক্ষক ছিলেন, উচ্চতম শ্রেণিস্থ বালকেরা নিম্ন শ্রেণিস্থ বালকগণকে শিক্ষা দিতেন। উচ্চশ্রেণিস্থ বালকেরা শিক্ষকের স্থলাভিষিক্ত হইয়া, বালকস্বভাবসুলভ অভিলাষ, অনভিজ্ঞতা, অথবা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া নিম্নশ্রেণিস্থ বালকগণকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেন; এবং প্রায় তাহারা কেহই তজ্জন্য শাস্তি পাইতেন না। এই জন্যই উচ্চশ্রেণিস্থ বালকদিগের ভয়ে অথবা তাহাদিগকে বাধ্য করণ মানসে, নিম্নশ্রেণিস্থ বালকেরা তাহাদের বশীভূত থাকিত। তাহাদের প্রাধান্য ও ক্ষমতা যাহাতে বিস্তারিত হয় সেই জন্য তাহারা সর্ব্বদাই গাম্ভীর্য্য ও প্রাধান্যসূচক ভাবভঙ্গি ব্যক্ত করিত।

"পূর্ব্বোক্ত ঘটনা অপেক্ষা আরও প্রয়োজনীয় ঘটনা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক; কারণ তদ্দ্বারা তৎকালীন কালেজের অবস্থা ভাল বুঝা যাইবে। সমবয়স্ক বালকগণ আপনাদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিত। এই প্রকার বন্ধুত্ব নির্ব্বাচন, কালে স্ব স্ব পাপ প্রবৃত্তি ও পাপ পথানুসরণ বিষয়ে সাহায্য করিত। এই জন্য উচ্চশ্রেণিস্থ অল্পবয়স্ক বালক নিম্নশ্রেণিস্থ সমবয়স্ক বালকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিত এবং নিম্নশ্রেণিস্থ অধিকবয়স্ক বালক উচ্চশ্রেণিস্থ সমবয়স্ক বালকগণের সহিত সখ্য ভাবে কাল কাটাইত। তখনকার কালেজ ছাত্রদিগের বিদ্যা অতি অল্প হইত, ইহাতেই তাহারা গণনীয় ও মাননীয় হইত। পরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা যথা সময়ে উল্লেখ করিব। আমি এই অবস্থাতে নবম শ্রেণিতে কাল কাটাই পর বৎসর ৭ম শ্রেণীতে উন্নত হই।

"D' Ansleme সাহেব, ৪জন সহকারী শিক্ষক ও উচ্চ শ্রেণিস্থ বালকগণ শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পর বৎসর ৫ম শ্রেণীতে উন্নীত হই। এই সময়ে শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটিল। Mr. D' Ansleme প্রথম শ্রেণির শিক্ষা প্রদান করিতেন ও সমস্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বা-

.বধায়ক ছিলেন। Mr. Molles মলিস ২য় ও ৫ম শ্রেণীর শিক্ষক হইলেন। Mr. Pascal প্যাসকেল তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষক হইলেন। Mr. Forme ফর্ম্মি ৪র্থ ও ৭ম শ্রেণীর শিক্ষক হইলেন।

"অন্যান্য শ্রেণীর (কারণ তখন প্রায় ১০শ্রেণী ছিল) দেশীয় ছাত্র-শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। আমি মলিস (Mollis) সাহেবের নিকট ইংরাজি ব্যাকরণ শিক্ষা করি।

"১৮২৬ খৃঃ অব্দে আমি ৪র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হই এবং ডিরোজিও সাহেবের অধীনে উপদেশ গ্রহণ করি। তাঁহার নিকট ইংরাজি রচনা, ব্যাকরণ ও পদ্য প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করি"।

এস্থলে ডিরোজিও সাহেব সম্বন্ধে তাঁহার মত অবিকল উদ্ধৃত হইল। এতদ্বারা প্রথম ইংরাজি অক্ষর শিক্ষা করিয়া তাঁহার ৮ বৎসরে কিরূপ ইংরাজি লিখিবার ক্ষমতা জন্মাইয়াছিল জানা যাইবে।

"Mr Derozio was a very kind and indulgent teacher; and though often vain of his attainments, was nevertheless a learned man. He first taught us (the whole class) the object and end of knowledge, an information which cannot be too highly valued; and implanted that ambition of literary fame in my bosom which I am glad to affirm directs and actuates all my efforts even to this day. He first directed my metaphysical studies and gave us those moral and liberal principles which I hope will ever influence my actions. Cut off in the prime of prime, amidst innumerable projects for the reformation of India, his untimely death must ever be a matter of regret; and it may be safely affirmed also that he has been the cause and the sole cause of that spirit of enquiry after truth, and that contempt of vice, which are so fashionable among the enlightened portion of the community, and which cannot but be beneficial to India."

এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে কবিবর ডিরোজিও সাহেব অত্যন্ত দয়ালু, ক্ষমাশীল শিক্ষক ও একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছাত্রগণকে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য এরূপ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার ছাত্রেরা তাহা কখন ভুলেন নাই। তিনি ছাত্রগণকে সকল সৎ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন ও অসৎ পথ তাহারা যাহাতে অনুসরণ না করে সেইজন্য সতত চেষ্টা করিতেন। তিনি ভারতের একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন ও জন্মভূমির মঙ্গল কামনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পরলোকগমনে তাঁহার ছাত্রবৃন্দ শোকে অধীর হইয়াছিলেন।

"দুই বৎসর পরে ২য় শ্রেণীতে উন্নতী হই। এই বৎসর হইতে রস (Ross)

সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আরম্ভ করি। তিনি ছাপান গ্রন্থ পড়িয়া যাইতেন এবং কোন কোন দিন কেবল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা (experiment) দেখাইতেন। তাঁহার সেই বক্তৃতা কাহারও হৃদয়গ্রাহী হইত না। কলেজের সকল শিক্ষক অপেক্ষা টাইটলার সাহেবের শিক্ষাপ্রণালী অতি উত্তম। তিনি প্রশ্ন চ্ছলে শিক্ষা দিতেন।

"১৮২৯ খৃঃ অব্দে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হই। "আমি কালেজে নিম্নলিখিত বৎসরে নিম্নলিখিত ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করি *।

"শেষ তিন বৎসর আমি রস ও টাইটলার সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করি। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে টাইটলার সাহেবের নিকট গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করি। এই বৎসর হইতে উচ্চ গণিতের শিক্ষা আরম্ভ হয়। এই বৎসর ইঁহার নিকট নিউটনের প্রিন্‌সিপিয়া (Newton's Principia) গ্রন্থের ১ম ভাগ অধ্যয়ন করি। পর বৎসর সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ ও বাটীতে নিজে চেষ্টা করিয়া উচ্চ গণিতের কতক কতক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি।

"গণিত শাস্ত্র বিষয়ে আমি কালেজে কতদূর শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা নিম্নে দেওয়া গেল" *।

"সেই সময়ে কালেজে গণিত শিক্ষা উত্তম রূপ হইত। যে সকল বিষয় অধীত হইত এক্ষণকার গণিত শাস্ত্রে যাহারা এম, এ, পরীক্ষা প্রদান করেন তাঁহাদিগের পঠিতব্য বিষয় অপেক্ষা ঐ গুলি কোন অংশে ন্যূন ছিল না। পরিশেষে তিনি কর্ণেল এভারেষ্টর নিকট উচ্চ গণিতের অন্যান্য বিষয় শিক্ষা লাভ করেন ও গণিত কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে শিক্ষা আবশ্যক তাহাও উক্ত সাহেবের নিকট সমধিক পরিশ্রম ও যত্নের সহিত শিক্ষা করেন।

কালেজ ত্যাগ করিবার সময় রাধানাথকে যে প্রশংসাপত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল †।

---

*১৮২৪ Murray's Spelling.
১৮২৫ Mavor's Spelling এবং বাক্যাবলি।
১৮২৬ Reading Exercises and Grammar.
১৮২৭ History of Greece. Gay's Fables
১৮২৮ Geography and Grammar.
১৮২৯ History of England.
Virgil's Æneid.
১৮৩০ Russel's Modern Europe. Shakespere.
Homer's Odyssey.
১৮৩১ Robertson's charles V. Shakespere.

* ১৮২৮ Euclid, Bk. I, props. 29.
১৮২৯ Euclid, Bks. I to IV, and Algebra up to Quadratic Equations.
১৮৩০ Euclid, BK. VI, Fluxions, Maxima and Minima, Tangents, Rectifications quadraticus.
*১৮৩১ Whole of Euclid's Elements, Spherical Trignometry, Fluxions, Taylor's and Maclaurin's Theorems, Kepler's Problems.
১৮৩২ Windhouse's Analytical Trigonometry, Jephson's Fluxions, Lagrange's Theorem, Windhouse's Astronomy

† These are to certify that *Radha nath Sicdar* has studied in the Anglo Indian College for a period of *seven years and ten months*, that at the time of quitting College he was in the *first* class, that he

এতদ্দারা জানা যায় যে তিনি ৭ বৎসর ১০ মাস এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান কালেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কালেজ ত্যাগ করিবার সময় ১ম শ্রেণীতে ছিলেন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য ও সাধারণ জ্ঞানজনক বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত অধিক পারদর্শিতা লাভ হইয়াছিল এবং তাঁহার স্বভাব চরিত্র বিশেষ সন্তোষজনক ছিল।

"কালেজ ছাড়িয়া আমার ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তজ্জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি। ১৮৩২ খৃঃ আমি Great Trigonometrical Survey of India আফিসে কম্পিউটর (Computor) নিযুক্ত হইয়া আরও গণিত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অভ্যাস করি। এক্ষণে (৭ই অক্টোবর ১৮৩২) আমি Surveyor (সারভেয়ার) নিযুক্ত হইয়া Serunge Base lineএ কার্য্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে ১৫ অক্টোবর যাত্রা করিব। এক্ষণে আমার সংস্কৃত পাঠের ব্যাঘাত হইবে বটে, কিন্তু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিব।"

রাধানাথের পিতার দরিদ্রাবস্থা তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের বড় প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। তিনি বলিতেন "কলেজে একমনে পড়িতে পাইতাম না, একবার পড়ার কথা মনে পড়িত, পরক্ষণেই বাটীতে ফিরিয়া যাইয়া কি খাইব, মা বুঝি এখনও কিছুই খান নাই, এই সকল ভাবনা মনে উদিত হইয়া পড়ার ব্যাঘাত ঘটিত"। তাঁহার কালেজের বেতন লাগিত না সত্য, কিন্তু অধিক মূল্যের পুস্তক ক্রয় করিতে হইত। পরের পুস্তক চাহিয়া লইলে অধিককাল পড়িতে পাইবেন না বলিয়া নিজে পুস্তক কিনিতে বড় ভাল বাসিতেন। সে সময়ে পুস্তকের বড় অসদ্ভাব ছিল; দু চারি জন বাঙ্গালির বাটী ব্যতীত কোথাও দু চারি খানি সামান্য ইংরাজী পুস্তক খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। কালেজের অধ্যক্ষেরা ছাত্রদিগের জন্য ইংলণ্ড হইতে পুস্তক আনাইয়া দিতেন। সে সময়ে কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে কালেজের অধ্যাপকগণ ব্যতীত এমন কেহ ছিল না যাহাদ্বারা সেই সকল সন্দেহ মীমাংসা হইতে পারিত। রাধানাথ ও তাঁহার সহাধ্যায়ীগণ নিজে

---

has acquired *very considerable* proficiency in the English language and Literature and in the Elements of general knowledge and that his conduct has been *entirely* satisfactory.

Calcutta the 18 th Feb. 1832.

G. T. F. Speca B. D.
Head Master.
H. H. Wilson.
Visitor.
Chandra Comar Tagore.
Radha madhub Banerjee.
Rossomoy Dutt.
David Hare.
Ram Comul Sen.
Parassuna Coomar Tagore.
Radha Kanto Deb.
Managing Committee.

চেষ্টা করিয়া সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন। একণে যেমন কেবল পুস্তকের সাহায্যে সহজ উপায়ে অন্যের উপদেশ ব্যতীত কোন বিষয় শিক্ষা করা যায় সেরূপ পুস্তকের বিলক্ষণ অসদ্ভাব ছিল। সকল বিষয় নিজে করিয়া লইতে হইত।

হিন্দুকালেজে উত্তীর্ণ প্রথম যুবকদল বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজের চাল চলন অনুকরণ করিয়া দেশের লোকের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব প্রচলিত আচার ব্যবহার রীতি নীতি অন্যথা করিতে দেখিয়া প্রাচীন ব্যক্তিগণ মনে মনে এই ভাবিয়াছিলেন যে অল্প দিনের মধ্যেই ম্লেচ্ছের আচরণে দেশ উৎসন্ন হইবে ও নব্য সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে সেই সংস্কার আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ১৮৩০খৃঃ ডফ (Duff) সাহেব এ দেশে আসেন ও ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন এবং তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। আহার ব্যবহার বিষয় সম্বন্ধেও অনেক শৈথিল্য হইয়া আসিয়াছিল। নব্য বাবুরা মুসলমান খানসামার রন্ধন করা দ্রব্য অতি উপাদেয় মনে করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেন। বিস্কুট, ফাউলকারি, বিফষ্টিকের কথা উপস্থিত হইলে অনেকের মুখে জল আসিত। দেশীয় প্রচলিত আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তে নূতন ইংরাজি আচার ব্যবহার দিন দিন প্রচলিত হইতে লাগিল। কোলাকুলি ও প্রণামের চিরাধিকৃত স্থান কর মর্দ্দন (সেকহ্যাণ্ড) আসিয়া দখল করিল। মদ্যপান ও মাতলামি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং এক নূতন রকমের আমোদ প্রমোদ সৃষ্টি হইল। শিক্ষিত লোকে দেব দেবীর পূজায় আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন না; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎসবের সময় কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখা যাইত না। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস লোপ হইতে দেখিয়া বৃদ্ধেরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের উদ্ধারও তাঁহাদের চক্ষে হিন্দুধর্ম্ম লোপ বই আর অন্য কিছুই অনুভূত হয় নাই। শিক্ষিত যুবকদলের সকলেই প্রায় একেশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। দেব দেবী পূজা না করিয়া যাঁহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন বৃদ্ধেরা তাঁহাদিগকে খৃষ্টান বলিতেন। রামতনু বাবুকে বৃদ্ধেরা 'তনু খৃষ্টান' বলিতেন। ইংরাজি শিক্ষা প্রভাবে হঠাৎ যুবকদলের চক্ষু ফুটিয়াছিল সুতরাং তাহারা কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই— ইহা ভিন্ন এত বাড়াবাড়ির প্রকৃত কারণ আর কিছুই নহে। কিন্তু ইহাঁরা যে প্রকার দেশের উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও বিস্মৃত

হওয়া উচিত নহে। ইঁহারাই অধুনাতন উন্নতির জন্মদাতা। ইঁহারাই নিম্নলিখিত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের মূল মন্ত্রদাতা।

১। ইংরাজেরা অসভ্য অবস্থা হইতে বিদ্যানুশীলন দ্বারা যতদূর উন্নত হইয়াছেন, অসভ্য ইংরাজেরা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যেরূপ হইয়াছেন, বিদ্যাবলে আমরাও চেষ্টা করিলে সেইরূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিব ইহা প্রচার করেন।

২। ইংলণ্ডবাসী ইংরাজেরা মুখে, কাগজে ও পুস্তকে যে রূপ লিখিয়া থাকেন এদেশীয় ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ তাহার কিছুই করেন না। ইঁহারাই এ তত্ত্ব প্রথম প্রকাশ করেন।

৩। পূর্ব্বে দেশীয়গণ উচ্চ চাকুরীর মধ্যে দারগাগিরি ভিন্ন আর কিছুই পাইতেন না। উচ্চপদে মূর্খ ইংরাজগণ নিযুক্ত হইতেন। ইঁহারা শাসন কর্ত্তাগণকে প্রথম দেখাইলেন যে বিদ্যাবলে ইংরাজদিগের অপেক্ষা সেই সকল কার্য্য তাঁহারাও উত্তমরূপ নির্ব্বাহ করিতে পারেন; এবং তাঁহাদিগের দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে উচ্চ অঙ্গের কার্য্য সমূহ নির্ব্বাহ হইতে পারে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া দেশীয়দিগের জন্য উচ্চ বেতনের পদ সৃষ্টি করেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই সকল পদে নিযুক্ত হইয়া প্রভূত প্রতিপত্তির সহিত কার্য্য করেন।

৪। রাজকার্য্যে সমান ক্ষমতা পাইবার জন্য দেশীয় ও ইংরাজগণের মধ্যে যে সমর বহ্নি তাঁহারা প্রজ্জলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা এক্ষণেও নির্ব্বাপিত হয় নাই। এই বহ্নি যে কখনও নির্ব্বাপিত হইবে তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বে ইংরাজদিগের উপর এদেশীয় কোন কর্ম্মচারীর ক্ষমতা চলিত না। বেণ্টিঙ্কের সময় হইতে ইংরাজের সম্পত্তির উপর দেশীয় কালা মুন্সেফের ক্ষমতা প্রবল হইল।

৫। কুসংস্কারকে দেশ হইতে দূরীভূত করাই তখনকার শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিরূপে দেশের লোক প্রচলিত কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া উন্নতি মার্গে অগ্রসর হইবে সেই বিষয়ে তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করেন।

৬। ইঁহারা প্রথম সংবাদপত্র প্রচার করিয়া দেশীয় লোকের মত স্বদেশে ও বিদেশে প্রচার করার পথ প্রদর্শন করেন।

৭। প্রকাশ্য সভা সংস্থাপন করিয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক দোষ গুণ আলোচনা করার পথ পরিমার্জ্জিত করেন।

৮। আপনারা যে বিদ্যার আস্বাদন পাইয়াছেন দেশের লোক সেই স্বাদে যেন বঞ্চিত না হয় এই উদ্দেশে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

৯। দুর্দ্দান্ত ইংরাজ হস্ত হইতে এ

দেশের রাজনীতি ও আইন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন।

১০। সকল মনুষ্যই সমান ও বিদ্যাদ্বারা গণনীয় ও মাননীয় হইয়া থাকে; সকলেরই স্বার্থ রক্ষা করা উচিত; ইংরাজ কিম্বা বাঙ্গালি যে কেহ অত্যাচার করিলে তাহার ন্যায়ানুসারে প্রতিবিধান করা উচিত; ইহা কার্য্যে পরিণত করেন।

১১। রাজনৈতিক ও ব্যবহার শাস্ত্রে গবর্ণমেণ্ট কোন অন্যায় পথ অবলম্বন করিলে সাধ্যানুসারে তাহার প্রতিবিধান করেন ও উপযাচক হইয়া সৎ পরামর্শ প্রদান করেন।

১২। নির্ভীকভাবে ইংরাজের অত্যাচার ও দেশের অরাজকতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাহাতে যদি কেহ বিপদে পড়ে তাহাকে সাহায্য করেন।

১৩। তাঁহারা সততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। যে সময়ে উৎকোচ গ্রহণ ন্যায্য পাওনার সামিল ছিল, সেই সময়ে ইহাঁরা প্রভূত ধনের লোভ সংবরণ করিয়া দেখাইয়াছেন, উৎকোচ গ্রহণ মহাপাপ। দেশের-'চালাক' শ্রেণীর লোকেরা ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে গণ্ডমূর্খ মনে করিতেন।

ডিরোজিওর শিষ্যদল সকলেই দেশের এক একটি রত্ন ছিলেন। তাঁহারা যে কোন প্রকারে হউক দেশের উপকার সাধনে যত্নবান ছিলেন। তাঁহাদিগের দলকে লোকে "ইয়ং কলিকাতা" বলিত। ইহাঁরাই প্রথম উৎকোচ গ্রহণ ও মিথ্যা কথা কহা অত্যন্ত দোষাবহ কার্য্য বলিয়া প্রচার করেন ও ঐ সকল বিষ বৃক্ষের মূলে কুঠারঘাত করেন।

"ইয়ং কলিকাতা" বলিতে নিম্নলিখিত তেজস্বী, সত্যপ্রতিপালক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সততাসম্পন্ন, ও বিদ্বান ব্যক্তিগণকে বুঝায়—

রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃত লাল মিত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী।

ইহাঁরা কোম্পানির চাকুরি করিতে গিয়া মহৎ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তখন সাহেবেরা তাঁহাদিগকে বড় মান্য করিতেন, অনেকে ভয় করিতেন, ও কেহ কেহ তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা দেখিয়া মনে মনে ঈর্ষা ও প্রকাশ্যে তাঁহাদের নিন্দা করিতেন।

মৃচ্ছকটিক ও তদুল্লিখিত আচার ব্যবহার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা।—এই গ্রন্থে প্রধানতঃ চারিটী স্ত্রীলোকের বিষয় উল্লিখিত আছে;—বসন্তসেনা ও তৎ-পরিচারিকা মদনিকা, এবং চারুদত্তের বিবাহিতা স্ত্রী ধূতা ও তৎপরিচারিকা রদনিকা। গ্রন্থের প্রধান নায়িকা বসন্ত-সেনা; সুতরাং গৃহস্থের ঘরের অপেক্ষা বেশ্যাদিগের আচার ব্যবহারই অধিক পরিমাণে গ্রন্থে প্রকাশ।

বেশ্যার রঙ্গভূমিতে অভিনয়ঃ—বেশ্যাগণের রঙ্গভূমিতে অভিনয়ের বিষয় এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যৎকালে বসন্তসেনা শকার কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া চারুদত্তের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন শকার বসন্তসেনা ভ্রমে রদনিকার কেশ ধারণ করিয়াছিল। রদনিকা সভয়ে বলিল "মহাশয়েরা কি আরম্ভ করিলেন!"

শকারের সঙ্গীয় বিট বলিল "এ যে অন্যের স্বরসংযোগ বলিয়া বোধ হই-তেছে!"

শকার বলিল "মহাশয় বিড়াল দধির শরের লোভে শব্দ পরিবর্ত্তন করে, এই দাসীর কন্যা বসন্তসেনাও সেইরূপ স্বর পরিবর্ত্তন করিয়াছে।"

বিট। কি! স্বর পরিবর্ত্তন করিয়াছে! কি আশ্চর্য্য! অথবা আশ্চর্য্যই বা কি? এই বসন্তসেনা রঙ্গপ্রবেশ করিয়া নৃত্য-গীতাদি কলা শিক্ষা করায় ও প্রতারণায় চতুর বলিয়া স্বর পরিবর্ত্তনে নিপুণা হইয়াছে।*

এতদ্দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে কেবল আধুনিক নাট্যশালাতে ভারতবর্ষে যে বেশ্যারা নূতন অভিনয় কার্য্য সম্পা-দন করিতেছে, এমন নহে, দ্বিসহস্র বৎসরের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষের রঙ্গ-ভূমিতে বেশ্যারা অভিনয় কার্য্য সম্পাদন করিত। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও বেশ্যাদিগকে "নটী" বলে।

বেশ্যা বিবাহঃ—এই সময়ে বেশ্যা-দিগের বিবাহ হইত। বিবাহিতা বেশ্যা ও "রক্ষিতা" বেশ্যা যে সম্পূর্ণ পৃথক তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

চতুর্থ অঙ্কে, ব্রাহ্মণচৌর শর্ব্বিলক যখন অপহৃত অলঙ্কার গুলি লইয়া বসন্ত-সেনার দাসী মদনিকার সঙ্গে আলাপ করিতেছিল, তখন বসন্তসেনা গবাক্ষ দিয়া দেখিয়া বলিলেন "যখন মদনিকা ইহাকে নিশ্চল দৃষ্টিতে সতৃষ্ণ ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে তখন বোধ হয়

---

* ইয়ং রঙ্গপ্রবেশেন কলানাং চোপ-শিক্ষয়া।
বঞ্চনা পাণ্ডিত্যেন স্বরনৈপুণমাশ্রিতা॥
প্রথমাঙ্কঃ

এই ব্যক্তি মদনিকাকে অভুজিষ্যা (অনন্যভোগ্যা অর্থাৎ রক্ষিতা) করিতে ইচ্ছা করিয়াছে।"(১)

এই স্থলে বেশ্যাদিগকে অনন্যভোগ্যা করিবার কথা দেখা যাইতেছে। কিন্তু বেশ্যার যে বিবাহ হইত ও বিবাহিত বেশ্যা যে সমাজে গৃহীত হইত তাহা নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বুঝা যাইবে। যখন শর্ব্বিলক অপহৃত অলঙ্কার লইয়া বসন্তসেনাকে অর্পণ করিল এবং বসন্তসেনা মদনিকাকে দাস বৃত্তি হইতে মোচন করিয়া তাহাকে শর্ব্বিলকের হস্তে সমর্পণ করিলেন তখন মদনিকা বসন্তসেনার পদতলে পতিত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেই বসন্তসেনা বলিল "সম্প্রতি তুমিই আমার বন্দনীয়া হইয়াছ, অতএব শকটে আরোহণ কর, আমাকে মনে রাখিও।"(২)

নীচ বর্ণের স্ত্রীগণ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলে যে শ্রেষ্ঠতর বর্ণ প্রাপ্তি হইত, তাহা এস্থানে স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে।

ব্রাহ্মণদ্বারা পরিগৃহীত বেশ্যা যে ব্রাহ্মণবধূ হইত তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শর্ব্বিলক মদনিকাকে বলিতেছে

"তুমি বসন্তসেনা হইতে দুষ্প্রাপ্য বধূ শব্দ ও অবগুণ্ঠন প্রাপ্ত হইয়াছ।(১)

এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে বিবাহিত বেশ্যা স্ত্রী বলিয়া ব্যবহৃত হইত।

শর্ব্বিলক যখন শুনিলেন পালক রাজা তাহার সুহৃদ্ আর্য্যককে বদ্ধ করিয়াছে তখন তিনি বলিলেন "আমি কলত্রবান্ হইয়াছি। হায় কি কষ্ট! অথবা পৃথিবীতে সুহৃদ ও বনিতা উভয়ই মনুষ্যের প্রিয়, কিন্তু সম্প্রতি শত সুন্দরী হইতেও আমার আত্মীয় প্রিয়তম।"(২)

এই স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে পরিণীতা বেশ্যা "কলত্র" ও "বনিতা" শব্দে বাচ্য হইয়াছে।

আবার, যখন শর্ব্বিলক আর্য্যকের উদ্ধার সাধন সংকল্প করিয়া শকট হইতে অবতীর্ণ হইলেন তখন মদনিকা সাশ্রু নয়নে অঞ্জলিবদ্ধা হইয়া বলিল "আর্য্যপুত্র। এরূপ করিবেন না, অগ্রে আমাকে গুরুজনদিগের নিকট লইয়া চল।"

(১) "জধা অদিসিণিদ্ধাত্র চিন্তল দিট্টীয়ে আপিবন্তী বিঅ এদং নিজ্ঝাঅদি, তধা তক্কমি এসো সো জণো এদং ইচ্ছদি অভুজিস্সং কাদুং।"

চতুর্থ অঙ্ক।

(২) "সম্পদং তুমং জ্জেব বন্দণীআ সংবুত্তা ত্তা গচ্ছ আরুহ পবহণং সুমরেসি মাং।"

চতুর্থ অঙ্ক।

(১) যত্র তে দুর্লভং প্রাপ্তং বধূশব্দাবগুণ্ঠনম্।

চতুর্থাঙ্ক।

(২) কলত্রবাংশ্চাস্মি সংবৃত্তঃ। আঃ কষ্টম্ অথবা

দ্বয়মিদমতীব লোকে প্রিয়ং নরাণাং সুহৃচ্চ বনিতা চ। সম্প্রতিতু সুন্দরীণাং শতাদপি সুহৃদ্‌বিশিষ্টতমঃ॥

চতুর্থ অঙ্ক।

এ স্থলে আমরা দেখিতেছি যে বেশ্যা বিবাহ সমাজে চলিত ছিল।

বোধ হয় রাজার আদেশেও বেশ্যার বেশ্যাত্ব যাইবার বিধান ছিল।

যখন আর্য্যা ধূতার অগ্নিপ্রবেশের নিকট সকলে সমাগত হইয়াছে তখন শর্ব্বিলক বসন্তসেনাকে বলিল "আর্য্যে বসন্তসেনে! রাজা পরিতুষ্ট হইয়া আপনাকে বধূশব্দে অভিহিত করিয়াছেন" বসন্তসেনা বলিলেন "কৃতার্থ হইলাম" (১) শর্ব্বিলক বসন্তসেনাকে অবগুণ্ঠনাবৃত করিয়া দিলেন।

ইহা বলা বাহুল্য যে অবগুণ্ঠন কেবল কুলবধূগণ ব্যবহার করিতেন ও উহা তাঁহাদের বিশেষ চিহ্ন ছিল। বেশ্যাগণ কখনও অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিত না।

এস্থলে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে শর্ব্বিলক হয়ত নীচশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং তাহার কুলশীলের উপর কোন দৃষ্টি ছিল না, বেশ্যাকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু এরূপ সন্দেহের কারণ নাই। শর্ব্বিলক কেবল চুরি করিয়াছিলেন এই তাঁহার চরিত্রে প্রধান কলঙ্ক, নতুবা গ্রন্থকার তাঁহার স্বভাব অন্যরূপে ঘৃণিত বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। শর্ব্বিলক কেবল মদনিকার নিষ্ক্রয়ার্থে চুরি করিয়াছেন। শর্ব্বিলকের কথায় বিশ্বাস করিলে, সে উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করে। চুরি যে ভয়ানক দুষ্কার্য্য শর্ব্বিলক তাহা পুনঃপুনঃ বলিয়াছে। যখন শর্ব্বিলক চুরির সময় গৃহ অন্ধকার করিল তখন বলিল "অন্ধকারকে ধিক্, অথবা, আমি চতুর্ব্বেদপারদর্শী অশূদ্র প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া বারবিলাসিনী মদনিকার জন্য দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নিজ ব্যবহারে অন্ধকারকেও তিরস্কৃত করিয়াছি।"

শর্ব্বিলক চুরি করিবার পর বলিতেছে "হায় কি কষ্ট, গণিকা মদনিকার জন্য ব্রাহ্মণকুল কলঙ্কিত করিলাম অথবা আত্মাকেই কলুষিত করিলাম।"

এইরূপ নানাপ্রকার ব্যবহারে শর্ব্বিলক সমাজে পতিত বা হীনাবস্থাপন্ন বলিয়া যে গণিত ছিল এরূপ বোধ হয় না।

বিশেষতঃ চারুদত্তের স্বভাব নিষ্কলঙ্ক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তিনি সমাজ বিগর্হিত বেশ্যা বিবাহ করিবেন ইহা অনুমান হয় না। এবং গ্রন্থকার সমাজবিগর্হিত কার্য্য দ্বারা তাঁহার নায়কের চরিত্র দূষিত করিবেন ইহাও সম্ভবপর নহে। বোধ হয় তৎকালে স্ত্রীলোকেরা পাদুকা ব্যবহার করিত না। পঞ্চম অঙ্কে বসন্তসেনা অভিসরণার্থ উপস্থিত হইলে তৎসমভিব্যাহারী বিট সংবাদ পাঠাইল যে বসন্তসেনা" পাদৌ নূপুরলগ্ন কর্দ্দমধরৌ প্রক্ষালয়ন্তী স্থিতা"

শকটঃ—এই সময়ে গো-শকটের ব্যবহার ছিল। রাজশ্যালক শকার

(১) শর্ব্বি। আর্য্যে বসন্তসেনে! পরিতুষ্টো রাজা ভবতীং বধূশব্দেনানুগৃহ্ণাতি।
বস। অজ্জ কদত্থম্হি।

দশম অঙ্ক।

এক জন অতি বিলাসী লোক ও বসন্তসেনারও প্রচুর সম্পত্তি; কিন্তু উভয়ই গো-শকটে যাতায়াত করিতেন। অশ্বের দ্বারা শকট চালনার ব্যবহার উল্লেখ নাই।

গরুর নাক ফোঁড়াইয়া তন্মধ্যে রজ্জু প্রবিষ্ট করিয়া তদ্বারা চালিত হইত। (১)

দাস প্রথাঃ—এই কালে দাসত্ব প্রথার প্রচলন ছিল। দাস ক্রয় হইত। দ্বিতীয়াঙ্কে যখন দ্যূতসভাধ্যক্ষ মাথুর সংবাহককে দশ সুবর্ণ মুদ্রার জন্য বড় উৎপীড়ন করিতে লাগিল, তখন সংবাহক রাজপথে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "মহাশয়গণ আমাকে দশ সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা ক্রয় করুন" দাস-ক্রয় প্রথা না থাকিলে এই রূপ বলিবার কোন কারণ ছিল না। এই ঘটনা দ্বারা দাস প্রথা ও আত্মবিক্রয় উভয়ই দৃষ্ট হইতেছে। দাসীর গর্ব্ভোৎপন্ন ব্যক্তি দাস হইত, "গর্ব্ভদাসী" "দাস্যাঃপুত্র" (২) ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

দাস্য মোচনঃ—অর্থ লইয়া দাসত্ব মোচনের প্রথা ছিল। মদনিকা বসন্তসেনার দাসী, তাহার দাসত্ব মোচনের জন্য শর্বিলক চুরি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

চতুর্থাঙ্কে মদনিকার দাসত্ব মোচন জন্য শর্ব্বিলক অলঙ্কার অর্পণ করিয়াছে তাহা বোধ হয় পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ আছে।

প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে বা রাজার আদেশে দাসত্ব মোচন হইত। এইরূপে মদনিকা দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া শর্ব্বিলক কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং দশম অঙ্কে চারুদত্তের অভিপ্রায় মত রাজার আদেশে স্থাবরক দাস বৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে।

ফলিত জ্যোতিষঃ—এই সময়ে ফলিত জ্যোতিষের বিশেষ আলোচনা ছিল।

যৎকালে আর্য্যক বন্ধন ভেদ করিয়া পলায়ন করে তখন চন্দনক বলিতেছিল "কাহার জন্মরাশির অষ্টমস্থানে সূর্য্য, কাহার চতুর্থে চন্দ্র, ষষ্ঠে ভার্গব গ্রহ এবং কাহার পঞ্চমে মঙ্গলগ্রহ; বল, কাহার ষষ্ঠ স্থানে বৃহস্পতি, নবমে শনি? চন্দনক বাঁচিয়া থাকিতে কে আর্য্যককে হরণ করে?"

জ্যোতিষের প্রচলন ও তাহার সাধারণতঃ আলোচনা ও বিশ্বাস না থাকিলে এইরূপ উল্লেখ থাকিত না।

---

(১) চেটঃ। হী হী, ভোঃ-মএ বি জাণখনকে বিগুমলিদে তা জব গেণ্হিঅ আঅচ্ছামি। এদে ণশ্শা লজ্জু কড্আ বইল্লা ** ষষ্ঠাঙ্ক।

ভিক্ষুঃ (শকারং দৃষ্টা সভয়ম্) হী অবিদ হী মাণহে। এশে শে লাঅ শ্শাল শণ্ঠাণে আঅদে এক্কেণ ভিক্খুণা অবলাহে কিদে অণ্ণং পি জহিং জহিং ভিক্খুং পেক্খদি তহিং তহিং গোণব্ব ণাসং বিন্ধিঅ ও পাহেদি ** অষ্টমাঙ্ক।

(২) দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম অঙ্ক

কাক চরিত্রঃ—কাক চরিত্র তৎকালে পরিজ্ঞাত ছিল। চারুদত্ত যৎকালে বিচারালয়ে আহূত হন (নবমাঙ্ক) তিনি বায়সের রুক্ষস্বরে অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছিলেন এবং শুষ্কবৃক্ষস্থিত সূর্য্যাভিমুখী বায়সের রবে নিঃসংশয় অমঙ্গল অবধারণ করিয়াছিলেন। (১)

শুভাশুভ চিহ্নঃ—কতকগুলি চিহ্ন যাত্রাকালে শুভ ও অশুভ বিবেচিত হইত। বর্ত্তমান কালেও ঠিক ঐরূপই বিবেচিত হয়।

পুরুষের দক্ষিণনেত্রস্ফুরণ, পথে সর্প দর্শন, চরণস্খলন, বাম বাহুর বিকম্পন প্রভৃতি অমঙ্গল সূচক বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। শ্বেত কাকের আবির্ভাব উপদ্রব জনক বলিয়া বিশ্বাস ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে এইরূপ শ্বেত কাকের আবির্ভাব অধিকাংশ অধিবাসীর মনে মহতী ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। যাত্রাকালে সম্মুখে শ্রমণক (সন্ন্যাসী) দর্শন অমঙ্গলাকর বলিয়া বিবেচিত হইত (২) চোরেরা চুরি কালে স্ত্রীদর্শন অমঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করিত এবং প্রস্তাব লেখক যতদূর অবগত আছেন তাহাতে এখনও চোরেরা যাত্রাকালে বা গৃহ প্রবেশকালে স্ত্রীলোক দর্শনকে অশুভকর বলিয়া বিশ্বাস করে (১)

দ্যূতক্রীড়াঃ—দ্যূতক্রীড়ার আধিক্যের বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়াঙ্কে দ্যূতক্রীড়কদিগের দুর্দশা ও সভাধ্যক্ষের (আড্ডাধারীর) অত্যাচার সবিশেষ বর্ণিত আছে। দ্যূতক্রীড়া এতদূর প্রচলিত ছিল যে চারুদত্ত দ্যূত ক্রীড়াতে বসন্তসেনার ন্যস্ত অলঙ্কার হারাইবার কথা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই।

দ্যূতক্রীড়ায় আড্‌ডাধারী টাকা আদায়ের জন্য পরাজিত ব্যক্তির নানা শারীরিক ক্লেশ দিত। বর্ণিত আছে, সংবাহক পণের টাকা না দিতে পারায় তাহাকে বৃক্ষে লম্বমান হইয়া অবনতশিরে নিস্পন্দভাবে সমস্ত দিন যাপন করিতে হইত, তাহার পৃষ্ঠদেশে লোষ্ট্রের আঘাতে কড়া পড়িয়াছিল এবং কুক্কুরগণ তাহার জঙ্ঘাদ্বয় প্রতিদিন চর্ব্বণ করিত। কিন্তু এ সকল শাস্তি ত আড্ডাধারীর ইচ্ছা ক্রমে। রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়াও পরাজিত ব্যক্তির নিকট অর্থ আদায়ের উল্লেখ দেখা যায়।(২) সুতরাং

(১) দারুণনাদস্তককোটরোপগো বায়সো মহাভয়দাঃ।

ছিন্নাগ্রেহঙ্গচ্ছেদঃ কলহঃ শুষ্কদ্রুমস্থিতে ধ্বাঙ্ক্ষে। ঐন্দ্রাদি দিগবলোকী সূর্য্যাভিমুখো রুবন্ গৃহে গৃহিণঃ

রাজভয় চৌর বন্ধন কলহাঃ স্যুঃপশুভয়ঞ্চ

বরাহ মিহির।

(২) চারু (পরিক্রম্য)

কথমভিমুখমনাভ্যুদয়িকং শ্রমণকদর্শনং।

সপ্তম অঙ্ক

(১) কস্মিন্ স্ত্রীজনদর্শনঞ্চ ন ভবেৎ স্যাদর্থ সিদ্ধিশ্চ মে।

তৃতীয়াঙ্কঃ

(২) দ্যূতকরা। ভট্টা! বসন্তসেনা গেহং পবিট্ঠো সো।

দ্যূতক্রীড়া রাজানুমোদিত বলিতে হইবে।

প্রাতর্ভোজনঃ—বোধ হয় প্রাতঃকালে একবার সামান্যরূপ ভোজন (Breakfast) হইত। কল্যবর্ত্ত (প্রাতরাশ) শব্দের অনেক স্থলে ব্যবহার দেখা যায়। দ্বিজ ভিন্ন অন্য জাতির এরূপ ভোজন হইলেও হইতে পারে কিন্তু এইস্থলে একটী কথার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণেরা ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করেন। প্রাতঃকালের আচমন মন্ত্র ও মধ্যাহ্ন সময়ের আচমনের মন্ত্র পৃথক্। রাত্রিকালে হস্ত পদ, উদর প্রভৃতি দ্বারা যে পাপ কার্য্য সাধিত হইয়াছে (১) তাহার প্রশমনার্থ প্রাতরাচমন মন্ত্র পঠিত হয়। আবার দ্বিপ্রহরের সময় যে আচমন মন্ত্র পাঠ হয় তাহাতে উচ্ছিষ্ট ও অভোজ্য ভোজনের পাপ হইতে পবিত্রতা লাভের জন্য প্রার্থনা হয়। (২) মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ভোজন না থাকিলে উচ্ছিষ্ট ও অভোজ্য ভোজনের পাপ দূরীকরণার্থ কেন তৎকালে উপাসনা হইবে? রাত্রিকালীন অভোজ্য ভোজনের পাপ দূর করিবার জন্য ত প্রাতরাচমনেই প্রার্থনা থাকিল; আবার সায়ংকালে দিবা ভাগের নিষিদ্ধ ভোজনের পাপক্ষয় কামনা হইয়া থাকে। (১) তবে কি পূর্ব্বকালে প্রাতর্ভোজন প্রচলিত ছিল? বলা বাহুল্য, অধুনা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোনরূপ ভোজনের ব্যবহার দ্বিজাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

মৎস্য ভোজনঃ—মৎস্য ভোজন বোধ হয় নীচশ্রেণীর লোকে করিত। মনু মৎস্য ভোজনে দোষ উল্লেখ করিয়াছেন (২) শকারের আচার ব্যবহার ঘৃণিত বলিয়া চিত্রিত হইয়াছে। তিনি মৎস্যাহার করেন বলিয়া বর্ণিত আছে (৩) এবং তিনিই বসন্তসেনাকে "মৎস্যাসিকা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।(৪)

ধর্ম্ম:—গৃহস্থেরা প্রতিদিবস মাতৃকাদিগকে বলিপ্রদান করিতেন। এই বলি চতুষ্পথে দেওয়া হইত। চারুদত্ত প্রতিদিবস এই বলি প্রদান করিতেন।

স্ত্রীলোকেরা ব্রত ও উপবাস করিতেন।

মাথুরঃ। ভূদাইং সুবণ্ণাইং

দ্যূতকরঃ। লাঅ উলং গহুঅ নিবেদেম্হ।

মাথুরঃ। এস ধুত্তো ইদো ণিক্কমিঅ অণ্ণত্ত গমিস্সদি তা তা উঅরোধেণেব গেণ্হেমহ।

দ্বিতীয়াঙ্ক

(১) যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু।

(২) যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বাদুশ্চরিতং মম সর্ব্বংপুণন্তুমামোপোহ্যসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।

(১) যদহ্না মা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু।

(২) মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদঃ তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ। মনু।

(৩) দশমাঙ্ক

(৪) প্রথমাঙ্ক।

চারুদত্তের স্ত্রী ধূতার রত্নষষ্ঠীব্রতগ্রহণের উল্লেখ আছে। প্রস্তাবনাতেও "অভিরূপপতি" নামে এক ব্রতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্য বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; শকারের উপর ঘৃণা উৎপাদনের জন্য একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উপর শকার কর্ত্তৃক অত্যাচারের বর্ণনা আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর তৎকালে সাধারণের সহানুভূতি না থাকিলে এরূপ বর্ণনা করিবার কোন কারণ নাই। সংবাহক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হওয়ার বৃত্তান্ত লিখিত আছে। হিন্দু দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের নাম ও সহ্য-বাসিনীর উল্লেখ দেখা যায়। কার্ত্তিক চোরের দেব। দশকুমারচরিতেও কার্ত্তিক এই বিদ্যার অধিষ্ঠাতা দেব বলিয়া বর্ণিত আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ থাকা বোধ হয় না।

এই স্থানে হিন্দুসমাজের সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে চাই। যখন কোন সম্প্রদায় হিন্দু সমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন হিন্দুগণ সেই সম্প্রদায়কে নিজ দলভুক্ত করিয়া গোল মিটাইয়া ফেলিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য যে সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল এবং অধিকাংশ লোক তাহা গ্রহণ করিল, যখন হিন্দু সমাজে ভয়ানক আন্দোলন ও সমাজ ছিন্নভিন্ন ও অস্থির হইল তখন হিন্দুগণ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার কল্পনা করিয়া বৌদ্ধদিগকে হিন্দু সম্প্রদায়ে আনিলেন। কলিতে একমাত্র কল্কি অবতার স্থলে বুদ্ধ ও কল্কি দুই অবতার হইলেন। যখন শৈব ও বৈষ্ণবদিগের বড় গোল বাধিল তখন হরি ও হর অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া হরিহর-মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। আবার যখন করাল-বদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, মুক্ত-মালা বিভূষিতা, দিগম্বরী, গলদ্রুধির-চর্চ্চিতা, শবকর-কাঞ্চী বিভূষিতা, ঘোর-রাবা, শ্মশানালয়বাসিনী, ঘোররব শিবা-বেষ্টিতা কালীর উপাসকগণের সহিত স্মেরানন, সৌম্যমূর্ত্তি, শিখিপুচ্ছধারী, বনমালাবিভূষিত, পীতাম্বরধর, চন্দন-চর্চ্চিত, বংশীবদন নিকুঞ্জবিহারী বয়স্যগণ-পরিবেষ্টিত কৃষ্ণের উপাসকগণের ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হইল তখন হিন্দুসমাজে আবার ঘোর বিপ্লব। দেখিয়া শুনিয়া কৃষ্ণ কালী হইলেন। এইরূপ আপোষ রফা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

শাসন ইত্যাদিঃ—রাজপথে আলো দিবার প্রথা ছিল না। মহাভারতে ভীষ্মের শরশয্যায় যুধিষ্ঠিরের প্রতি উপদেশে রাজপথে আলোক দানের ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু উহা যে কার্য্যে পরিণত হইত তাহা এ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাজপথে আলো না থাকায় অত্যাচারের বৃদ্ধি হয় ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রথমাঙ্কে বসন্তসেনা অন্ধকারে অভি-সরণ করাতে শকারের হাতে নানা প্রকার ক্লেশ পাইয়াছিলেন। প্রথমাঙ্কে

চারুদত্ত বসন্তসেনাকে তদীয় বাস ভবনে লইয়া যাইতে রাজমার্গ-বিশ্বাস-যোগ্য প্রদীপ জ্বালিতে আদেশ দিয়াছিলেন। "রাজমার্গ বিশ্বাসযোগ্য আলো" দ্বারা যে কি বুঝিতে হইবে তাহা আমরা নিশ্চয় জানি না। হয়ত ব্যক্তি বিশেষের প্রত্যায়ক আলো লইবার নিয়ম ছিল।

স্থানে স্থানে থানা ছিল। থানার সংস্কৃত নাম গুল্মস্থান। ষষ্ঠ অঙ্কে আর্য্যকের পলায়ন সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর থানায় থানায় সতর্কভাবে রক্ষী পুরুষগণকে থাকিবার জন্য আদেশ হইয়াছিল।

বোধ হয় উজ্জয়িনী নগরীতে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের বাসভূমি পৃথক নির্দ্দিষ্ট ছিল। চারুদত্ত ব্রাহ্মণ হইলেও বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তিনি "শ্রেষ্ঠি চত্বরে" বাস করিতেন।

বিচার ঃ—নবমাঙ্কে বিচারালয়ের একটী সুন্দর দৃশ্য আছে। স্মৃতির নিয়ম অনুযায়ী বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইত। পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে বিচারক-দিগের পরামর্শের বিরুদ্ধে রাজা পালক ব্রাহ্মণ চারুদত্তের উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন; মনু বিধান করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের কোনও স্থলে প্রাণদণ্ড হইবেনা। (১) পালক রাজা মনুর এই বিধানের বিপরীতে কার্য্য করায় গ্রন্থকার অভিনয়দর্শকদিগের মনে পালকের উপর ঘৃণা জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আর্য্যক-হস্তে তাঁহার মৃত্যু স্বরূপ দণ্ড বিধান করিয়াছেন। মনুর বিধানের প্রতি সাধারণের যে আস্থা ছিল তাহা এই ঘটনা দ্বারা দেখা যাইতেছে।

বিচারের সময়ঃ—প্রাতঃকালে বিচার-কার্য্য আরম্ভ হইত। শকার বিচারার্থী হইয়া প্রাতঃস্নান করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন (১) এবং চন্দনকও প্রভাত হইলে পর বিচারালয়ে আগমন করেন। (২)

কাত্যায়নও বিধান করিয়া গিয়াছেন যে দিবা চারিদণ্ডের পর দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বিচারের সময় (৩)

বিচারক;—বিচারকার্য্য বোধ হয় ব্রাহ্মণ দ্বারা সাধিত হইত। বিচারক কোন্ শ্রেণীর লোক ছিলেন মৃচ্ছকটিক পাঠে তাহা নিশ্চয় অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু মনুর বিধানের উপর আস্থা দেখিয়া অনুমান হয় যে অধিকরণক (বিচারক) ব্রাহ্মণ ছিলেন। মনু বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ মাত্র নামধারী, যে ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা নাই, সেও বিচার করিবে; কিন্তু শূদ্র কখনও বিচারক

---

(১) ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বপাপেষ্বপি স্থিতং। রাষ্ট্রাদেনং বহিষ্কুর্য্যাৎ সমগ্র ধন মক্ষতম্।।—মনুঃ।

(১) আর্য্যদর্শন ৯ম খণ্ড ২৩৮ পৃ

(২) আর্য্যদর্শন ৯ম খণ্ড ২৩৯ পৃ

(৩) দিবসস্যাষ্টমং ভাগং মুক্ত্বা ভাগত্রয়স্তু যৎ। স কালো ব্যবহারানাং শাস্ত্রদৃষ্টঃ পরঃ স্মৃতঃ॥—কাত্যায়ন।

হইবে না।(১) কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে কোনও কারণে যদি রাজা স্বয়ং বিচার করিতে না পারেন তবে বেদ-পারগ বিদ্বান ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিবেন; বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ না পাইলে ক্ষত্রিয়কে নিয়োগ করিবেন, অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্যকে নিযুক্ত করিবেন—শূদ্রকে যত্ন পূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন। (২)

ব্যাস অতি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত সহকারে এই বিষয়ের ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন দ্বিজ দুঃশীল হইলেও সে পূজ্য; শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হইলেও পূজ্য নহে; কে দুষ্টা গাভীকে পরিত্যাগ করিয়া সুশীলা গর্দ্দভীকে পূজা করে (৩)

পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে বিচারকের সঙ্গে শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থের উপবেশনের বিষয় উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত বচন প্রমাণে বোধ হয় যে কায়স্থ শূদ্র নহে, শূদ্রেতর অন্য জাতি। কায়স্থ যে শূদ্র নহে, ইহা লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়াছে এস্থলে তাহার অবতারণা করা নিষ্প্রয়োজন।

বিচারকের সহায়তার জন্য বণিক্ নিয়োজনের ব্যবস্থা কাত্যায়ন করিয়া গিয়াছেন। (১) সুতরাং এখনকার এসেসরের মত তৎকালে লোক নিযুক্ত হইত।

বিচারালয়ে উপবেশনান্তরই অর্থিদিগকে আহ্বানের নিয়ম দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়েও এই নিয়ম প্রচলিত। কেহ অভিযোগ করিলে তাহার অভিযোগ লিপিবদ্ধ হইত। লিপিপ্রকার সম্বন্ধে ব্যাস বলিয়াছেন যে প্রথমে ফলকে অথবা ভূমিতে পাণ্ডু লিপি করিয়া, ন্যূনাধিক সংশোধন করনান্তর পত্রে সন্নিবেশিত করিতে হইবে (২) নবমাঙ্কে যৎকালে শকার বিচারকের নিকট যাইয়া বলিল "কোন কুপুত্র দ্বারা বসন্তসেনা হত হইয়াছে—আমা দ্বারা নহে।"

বিচারক বলিলেন "হে শ্রেষ্ঠি কায়স্থ! "আমা দ্বারা নহে" এই ব্যবহার পদ (বিচার্য্য বিষয়) প্রথম লেখ।

(১) জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুবঃ। ধর্ম্ম প্রবক্তা নৃপতে র্ন চ শূদ্রঃ কদাচন ॥—মনুঃ।
নাধ্যাপয়তি নাধীতে স ব্রাহ্মণব্রুবঃ স্মৃতঃ
—মনুঃ

(২) যদা কার্য্যবশাদ্রাজা ন পশ্যেৎ কার্য্যনির্ণয়ং। তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং বেদপারগং॥ যদি বিপ্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ। বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥
কাত্যায়নঃ।

(৩) যঃ শূদ্রো বৈদিকং ধর্ম্মং স্মার্ত্তং বা ভাষতে যদি। তস্য দণ্ড দ্বিসহস্রে স্ফুক্কনী চৈব ভেদয়েৎ।
দুঃশীলোহপি দ্বিজঃ পূজ্যঃ ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। দুষ্টাং গাং কঃ পরিত্যজ্য চ্চয়েৎ শীলবতীং খরীম্ ॥—ব্যাস

(১) কুলশীলবয়োবৃত্তবৃত্তিবদ্ভিরমৎসরৈঃ। বণিগ্‌ভিঃ স্যাৎ কতিপয়ৈঃ কুলবৃদ্ধৈর ধিষ্ঠিতং ॥

(২) পাণ্ডুলেখেন ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ। ন্যূনাধিকন্তু সংশোধ্য পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ ॥—ব্যাস

কায়স্থ। যে আজ্ঞা—আর্য্য লিখিলাম।

শকার। বিচারক মহাশয়! আমি বলিয়াছি যে আমা দ্বারা দৃষ্ট হয় নাই—কেন কোলাহল করিতেছেন (ইহা বলিয়া পাদদ্বারা লিখিত মুছিয়া ফেলিল)

এইরূপ পাদদ্বারা লেখা মুছিয়া ফেলার উল্লেখ দৃষ্টে বোধ হয় ভূমিতে পাণ্ডুলিপি হইত।

অর্থিদিগের অভিযোগ অবিলম্বেই শ্রবণ করা না করা বিচারকের ইচ্ছার উপর নির্ভর ছিল। যৎকালে শোধনক শকার বিচারার্থী হইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া বিচারককে সংবাদ দিল তিনি বলিলেন "ভদ্র বহির্গমন করিয়া তাহাকে বল "অদ্য তোমার মোকদ্দমা হইবে না।" কিন্তু শকার অসৎ স্বভাব তাহা সকলেই জানিত; বোধ হয়, সেই জন্যই এরূপ ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যাত করিবার উল্লেখ আছে (১) বিচারক এইরূপ প্রত্যাখ্যান বাক্যে যে শকারকে দূর করিতে পারেন নাই তাহা বোধ হয় পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ আছে।

ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তিদিগের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে সাদরে আহ্বান করা হইত। চারুদত্তকে আহ্বানের সময় বিচারক শোধনককে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় (১)। বৃটীষ গবর্ণমেণ্টে কেবল দেওয়ানি মোকদ্দমায় (Summons) সমনের পরিবর্ত্তে পত্র লিখিয়া জানাইবার বিধান আছে। (২)

অর্থী প্রত্যর্থী ও সাক্ষী দিগকে আসন দিবার উল্লেখ পাওয়া যায়। চারুদত্তের বিরুদ্ধে যে পর্য্যন্ত অপরাধ প্রমাণিত না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত তিনি আসনে উপবিষ্ট ছিলেন—অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পরই তাঁহাকে আসন হইতে অবতারিত করা হয়। শকার ও বসন্তসেনার মাতা আসনে উপবিষ্ট হইতে আদিষ্ট হইয়াছিল।

বিচারঃ—যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবহার পদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন শূলপানি তাহার অর্থ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে রাজা স্বয়ং বিবাদ উত্থাপন করিবেন না (৩)

---

(১) অধিকবর্ণকঃ। কথং প্রথমমেব রাজশ্যালঃ কার্য্যার্থী। যথা সূর্য্যোদয়ে উপরাগো মহাপুরুষনিপাতমেব কথয়তি। শোধনক! ব্যাকুলেনাদ্য ব্যবহারেণ ভবিতব্যম্; ভদ্র! নিষ্ক্রম্য উচ্যতাং গচ্ছ অদ্য ন দৃশ্যতে তব ব্যবহার ইতি।—নবমাঙ্ক

(১) ভদ্র শোধনক গচ্ছ আর্য্য চারুদত্ত মস্বৈরমসন্ত্রাস্তমনুদ্বিগ্নং সাদরমাহ্বয় প্রস্তাবেনাধিকরণিকস্তাং দ্রষ্টুমিচ্ছতীতি।—নবমাঙ্ক।

(২) Section 91 of the Civil Procedure Code.

(৩) স্মৃত্যাচার ব্যপেতেন মার্গেনাধর্ষিতঃ পরৈঃ আবেদয়িত চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ।—যাজ্ঞবল্ক্যঃ

"স্মৃত্যাচার ব্যপেতেন" "স্মৃতিসদাচারবহির্ভূতেন" মার্গেণ "বর্ত্মনা" পরৈঃ "আধর্ষিতঃ" "অর্থতঃ শরীরতো

গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে ব্যবহার (মোকদ্দমা) দুই প্রকার। নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা প্রকাশ হইতেছে। যখন শকার বিচারকের নিকট বসন্তসেনার অপঘাতমৃত্যুর সংবাদ দিল তখন শ্রেষ্ঠি ও কায়স্থ জিজ্ঞাসা করিল "এই ব্যবহার (১) কাহাকে অবলম্বন করিবে"।

বিচারক বলিলেন "এইরূপ স্থলে দ্বিবিধ ব্যবহার।"

শ্রেষ্ঠি ও কায়স্থ। কি প্রকার?

বিচারক। বাক্যানুসারে ও অর্থানুসারে। যেখানে অর্থী ও প্রত্যর্থী থাকে সে স্থানে বাক্যানুসারে হইয়া থাকে; যে স্থলে বিচারকের বুদ্ধি নিষ্পাদ্য সে স্থলে অর্থানুসারে হইয়া থাকে।

শ্রেষ্ঠি ও কায়স্থ। তবে বসন্তসেনার মাতাকে এই ব্যবহার অবলম্বন করিতেছে।

বিচারক। তাই বটে। ভদ্র শোধনক! তুমি বসন্তসেনার মাতাকে উদ্বিগ্ন না করিয়া আহ্বান কর। (২)

বসন্তসেনার মাতার নিকট হইতে যখন জানা গেল যে বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে গমন করিয়াছিলেন তখন বিচারক বলিলেন "এই ব্যবহার চারুদত্তকে অবলম্বন করিতেছে।" তখন চারুদত্তকে আহ্বান করা হইল।

বিচার্য্য বিষয় নির্ণয়ঃ—

বিচার্য্য বিষয় (issue) ধার্য্য করার নিয়মও ছিল। বসন্তসেনার মাতার মুখে চারুদত্তের নিকট বসন্তসেনার গমন বৃত্তান্ত শুনিয়া বিচারক আদেশ দিয়াছেন যে "ধনদত্ত! 'বসন্তসেনা আর্য্য চারুদত্তের গৃহে গমন করিয়াছে' ইহা ব্যবহারের প্রথম পদে লিখ।" এবং যৎকালে শকার প্রথমে সংবাদ দিল যে কাহা দ্বারা যেন বসন্তসেনা হত হইয়াছে—আমা দ্বারা নহে, তখন বিচারক আদেশ দিয়াছিলেন "আমাদ্বারা নহে" এই ব্যবহার পদ (বিচার্য্য বিষয়) প্রথমে লিখ।" শকার যে এই ব্যবহার পদ পদদ্বারা মুছিয়া ফেলে তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

বা পীড়িতঃ" চেৎ রাজ্ঞি "রাজনি" নিবেদয়েৎ তদ্ব্যবহার দর্শনস্থানং; চেদিত্যত্র যদিতি মৈথিলাঃ। আবেদয়তি চেৎ— অনেন স্বয়ং বিবাদোত্থাপনং রাজ্ঞা ন কর্ত্তব্যমিতি শূলপানি মহামহোপাধ্যায়াঃ।

(১) কাত্যায়ন ব্যবহার শব্দের অর্থ করিয়াছেন যথাঃ—

বি নানার্থে, অব সন্দেহে, হরণং হার উচ্যতে। নানা সন্দেহ হরণাৎ ব্যবহার ইতি স্থিতিঃ॥

(২) শ্রেষ্ঠি কায়স্থৌ। ভো কিং এসো ববহারো অবলম্বদি

অধি। ইহ হি দ্বিবিধো ব্যবহারঃ

শ্রেষ্ঠি কায়স্থৌ। কেরিসৌ।

অধি। বাক্যানুসারেণ অর্থানুসারেণচ। যস্তাবৎ বাক্যানুসারেণ স খল্বর্থি প্রত্যর্থিভ্যঃ। যশ্চার্থানুসারেণ স অধিকরণ বুদ্ধি নিষ্পাদ্যঃ।

শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ। তা বসন্তসেনামাদরং অবলম্বদি ববহারো।

অধি। এবমিদম্; ভদ্রশোধনক বসন্তসেনামাতরমনুদ্বেজয়ন্নাহ্বয়।

ভয় প্রদর্শন ও বেত্রাঘাতঃ—আসামীর উত্তরে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ থাকিলে ভয় দেখাইয়া যথার্থ কথা বাহির করার উল্লেখ দেখা যায়, এই ব্যবহার যে অতি দূষণীয় তাহা বলা বাহুল্য। বিচারক চারুদত্তের প্রত্যুত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—

"আর্য্য চারুদত্ত! সত্য কথা বলুন; ইদানীং আমাদের ইচ্ছা হইলেই আপনার সুকুমার গাত্রে কর্কশ কশা নিঃশঙ্ক ভাবে পতিত হইবে। (১)

মৃচ্ছকটিকের বিচারকের চরিত্র যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে এক জন সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। কশাঘাতের প্রচলন না থাকিলে তাঁহার মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হওয়া সম্ভব পর নহে।

দিব্য পরীক্ষাঃ— সাক্ষীর মুখে মোকদ্দমার অবস্থা শুনিয়া বিচার ভিন্ন অন্য প্রকার বিচার ছিল। ইহার নাম দিব্য (ordeal)। স্মৃতিশাস্ত্রে নয় প্রকারের দিব্য পরীক্ষার উল্লেখ আছে যথা তুলা, অগ্নি, উদক, বিষ, কোষ, তণ্ডুল, তপ্তমাষক, ফাল, ধর্ম্মজ। (২) এই সকল দিব্য পরীক্ষার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা আছে।

চারুদত্তের প্রতি রাজার আদেশ প্রচার হইল যে "সামান্য অর্থের কারণে যে ব্যক্তি দ্বারা বসন্তসেনা নিহত হইয়াছে, তাহার গলদেশে সেই সকল আভরণ বদ্ধ করিয়া ডিণ্ডিম প্রচার করতঃ দক্ষিণ মসানে লইয়া শূলে আরোপিত কর। যে কেহ ভবিষ্যতে এই রূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে তাহাকেও এইরূপ নিগ্রহ সহকারে দণ্ড-ভোগ করিতে হইবে।" চারুদত্ত এই আদেশ ধর্ম্মবিগর্হিত মনে করিলেন। কারণ, প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ বধ্য নহে,— রাজা ব্রাহ্মণ বধের আজ্ঞা দিলেন। দ্বিতীয়তঃ দিব্য পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার দোষ নির্ণয় হইতে পারিত এ স্থলে তাহা হইল না। তিনি বিষাদে বলিলেন "বিষ সলিল তুলা অগ্নি দ্বারা বিচার প্রার্থনা স্বত্বেও অসম্যক্ বিচারে অদ্য আমার শরীরে করপত্র (করাত) প্রদত্ত হইবে। যদি শত্রুর কথাতে ব্রাহ্মণবংশীয় আমাকে বধকর তবে পুত্র পৌত্র সহিত নরক মধ্যে পতিত হইবে।" (১)

(১) অধি। আর্য্য চারুদত্ত! সত্যমভিধীয়তাম্।
ইদানীং সুকুমারেঽস্মিন্ নিঃশঙ্কং কর্কশাঃ কশাঃ। তব গাত্রে পতিষ্যন্তি সহাস্মাকং মনোরথৈঃ॥—নবমাঙ্ক

(২) ধটোঽগ্নিরুদকঞ্চৈব বিষং কোষশ্চ পঞ্চমং।
ষষ্ঠঞ্চ তণ্ডুলং প্রোক্তং সপ্তমং তপ্তমাষকং।
অষ্টমং কাল মিত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্মৃতং
দিব্যান্যেতানি সর্ব্বানি নির্দ্দিষ্টানি স্বয়ম্ভুবা।
—বৃহস্পতিঃ।

(১) অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥
—মনু।

এই স্থলে দিব্য পরীক্ষার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মনুষ্যমারণ প্রভৃতি মহাপাতকাদি গুরুতর অভিযোগে তুলা, অগ্নি, বিষ ও কোষ এই কয়েক প্রকারের দিব্য পরীক্ষার নিয়ম ছিল। প্রস্তাব সুদীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় নিয়ম বিস্তৃত রূপে লিখিলাম না।

দণ্ডাজ্ঞাঃ—বিচারক তত্ত্ব নির্ণয় মাত্র করিতেন, দণ্ডাজ্ঞা রাজ হস্তে ছিল। বিচারক চারুদত্তের দোষ নির্ণয় করিয়া, রাজার নিকট দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের জন্য শোধনককে প্রেরণ করিলেন, এবং বিহিত বোধে "বিপ্র বধ্য নহে—সমস্ত ধনের সহিত নির্ব্বাসনের উপযুক্ত" একথা রাজাকে স্মরণ করিয়া দিতেও ত্রুটি করেন নাই। রাজা চারুদত্তের প্রতি যে আদেশ প্রচার করেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

অধুনা জেলার জজেরা মনুষ্যহত্যার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড বিধান করা সঙ্গত বোধ করিলে হাই-কোর্টের মতের অপেক্ষা করেন, তদ্রূপ বিধান এই স্থলে দৃষ্ট হইতেছে।

রাজাজ্ঞা পরের মুখে প্রচারিত হওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে। শোধনকের মুখে রাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচার করেন—কোন লিখিত আদেশ প্রদানের উল্লেখ মৃচ্ছকটিকে দৃষ্ট হয় না। এই নিয়ম যে মন্দ তাহা বলা বাহুল্য।

যে ব্যক্তির আত্মীয় অন্য দ্বারা হত হইত সে অভিযুক্তকে মুক্তি দিলে রাজদণ্ড হইতে অভিযুক্ত মুক্ত হইত না। বসন্তসেনার মাতা চন্দনদত্ত রাজপুরুষ কর্ত্তৃক যথার্থ গৃহীত হইলে বিচারককে বলিল "মহাশয়েরা সদয় হউন! সদয় হউন! যে ব্যক্তি সম্প্রতি ন্যস্ত সুবর্ণ ভাণ্ড রাত্রিতে চৌরকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে তাহার পরিবর্ত্তে চতুঃসমুদ্র সারভূত রত্নমালা দান করিয়াছে, সেই এখন সামান্য অর্থের কারণে কেন এমন অকার্য্য করিবে? আমার কন্যা যদি হত হইয়া থাকে, সে হত হইয়াছে; বাছা আমার জীবিত থাকুক। আর, অর্থি প্রত্যর্থির মধ্যে ব্যবহারে আমি অর্থি—অতএব ইহাঁকে মুক্ত দিন" বসন্তসেনার মাতার একথায় কেহ কর্ণপাত করে নাই। বিচারকের আদেশ ক্রমে তাহাকে দূর করিয়া দেওয়া হয়।

বধ্যের সজ্জা ঃ—প্রাণদণ্ডার্থ বধ্যভূমিতে লওয়ার সময় অভিযুক্তকে পৃথক বেশভূষায় সজ্জিত করা হইত।

চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে লইবার সময় তাহার গলে করবীর মালা, শরীর রক্তচন্দনচর্চ্চিত (১) শ্মশানজাত পুষ্প দ্বারা বেষ্টিত এবং পিষ্ট চূর্ণ পরিব্যাপ্ত(২) এবং

(১) দিন্ন কলবীর দামে ইত্যাদি
নয়ন সলিলসিক্ত পাংশুরুক্ষী কৃতাঙ্গং।
পিতৃবন সুমনোভিঃ বেষ্টিতং মে শরীরম্ *
* * রক্ত গন্ধানুলিপ্তম্ * *
—দশমাঙ্ক

(২) সর্ব্বগাত্রেষু বিন্যস্তৈ রক্তচন্দন হস্তকৈঃ।
পিষ্ট চূর্ণাবকীর্ণশ্চ...... —দশমাঙ্ক

তাঁহার বিনাশের জন্য শূল স্বয়ং বহন করিতে হইয়াছিল। (১)

অপরাধ ঘোষণা ঃ—বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতে অভিযুক্তের দোষ স্থানে স্থানে পটহ ও ডিণ্ডিমধ্বনি দ্বারা ঘোষণা করা হইত। চারুদত্তের অপরাধ ও দণ্ড চারি স্থানে ঘোষণা করা হয়। বলা বাহুল্য যে শেষ ঘোষণা স্থান শ্মশান।

বিবিধপ্রকার বধসাধন ঃ—নানা প্রকার বধসাধন হইত—শূলে আক্ষেপণ, কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ, করপত্র (করাত) দ্বারা বিদারণ, খড়্গ দ্বারা নিষ্কাষণ, হস্তীর পদতলে নিঃক্ষেপণ দ্বারা প্রাণ দণ্ড হইত।

বধ্যের মুক্তি ঃ—প্রভূত পরিমাণে অর্থ প্রদান করিলে বধ্যের মোচন হইত। শ্মশানে চারুদত্তকে কে বধ করিবে এই তর্ক মীমাংসার পর যখন একজন চণ্ডালের পালা স্থির হইল, তখন সে বিলম্ব করিতে লাগিল; অপর চণ্ডাল বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল "আমার স্বর্গগত পিতা বলিয়া গিয়াছেন "যদি তোর কখন বধের পালা হয় তবে বধ্যকে সহসা বধ করিস না।"

দ্বিতীয় চণ্ডাল। কেন?

প্রথম চণ্ডাল। কখনও কোন সাধু অর্থদ্বারা বধ্যকে মোচন করিতে পারে। কখনও বা রাজার পুত্র হইতে পারে সেই মহোৎসবে সকল বধ্যের মোচন হয়। কখনও বা হস্তী বন্ধন ভেদ করায় সম্ভ্রম হেতু বধ্যের মুক্তি হয়; কখনও বা রাজার পরিবর্ত্তনে সকল বধ্যের মুক্তি ঘটে।"

এই স্থলে কোন কোন অবস্থায় বধ্যের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তি হইতে পারিত তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শিল্প ঃ—বসন্তসেনার গৃহনির্ম্মাণ-কৌশল ও তাহার আশ্চর্য্য সশ্রীকতার বর্ণনা ও প্রাঙ্গণাদির বিভাগ ও পারিপাট্যের বর্ণনা চতুর্থ অঙ্কে লিখিত আছে। তৎসমস্ত উদ্ধৃত করিলে প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় বিস্তারিত লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম।

নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত জন্য ভারতবর্ষ প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। বসন্তসেনা বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়াছিলেন—তৎসমস্তের নাম আমরা জানি না। তাঁহার অলঙ্কারের শিল্পচতুরতায় চক্ষুতে ধাঁধা লাগিত। (১) এতদ্ব্যতীত আমরা আর অলঙ্কারের শিল্প বিষয়ে অধিক বলিতে পারিলাম না।

বিবিধ ঃ—রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদির বহুল প্রচার ছিল ও সাধারণে তাহা সম্যক অবগত ছিল।

---

(১) অংসেন বিভ্রৎ করবীর মাল্যং স্কন্ধেন শূলং * —দশমাঙ্ক

(১) বসন্তসেনার মাতাকে বিচারকালে বসন্তসেনার অলঙ্কার প্রদর্শন করিলে তিনি বলিলেন "আর্য্য শিল্পিকুশলতায় আমার দৃষ্টিতে ধাঁধা লাগিয়াছে—না; এ সে অলঙ্কার নহে।"—নবমাঙ্ক।

শকারের বাক্যে উপমার ছড়াছড়ি; উহার অধিকাংশই মহাভারত ও রামায়ণ হইতে গৃহীত। তিনি কখন হনুমান দ্বারা সুভদ্রাকে হরণ করাইয়াছেন, কখনও রামের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে সন্তানের কথা উল্লেখ করিতেছেন। সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ করিবার জন্য যে কবি এইরূপ বাক্যের আরোপ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণের নিকট রামায়ণাদি জ্ঞাত না থাকিলে ফল এরূপ বর্ণনা করিতেন না।

সঙ্গীত ঃ—এই কালে সঙ্গীতের সবিশেষ আলোচনা ছিল। রেভিল নামক এক ব্যক্তির অত্যুৎকৃষ্ট সঙ্গীতের বিষয় মৃচ্ছকটিকে উল্লিখিত আছে। (১) চারুদত্তও একজন সঙ্গীতবিদ্যায় বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন। শর্ব্বিলক চুরি করিবার সময় তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করতঃ চারিদিক দেখিয়া বলিলেন "একি মৃদঙ্গ, দর্দ্দুর, পণব—আবার এই যে বীণা—এই যে বাঁশী—আবার এই সকল পুথি—একি নাট্যাচার্য্যের গৃহ?

চুরিবিদ্যা ঃ—চুরি একটী যে প্রধান বিদ্যা এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হইতে পারে না—

পৃথিবীর আদিম কাল হইতে এই বিদ্যার অনুশীলন হইয়া আসিতেছে; রাজগণও ইহার অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, এমন কি অনেকের রাজত্ব কেবল এই বিদ্যার প্রসাদাৎ। কিন্তু তাঁহারা ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া State Policy, Political manœuvre, annexation of kingdom, conquest ইত্যাদি সুমিষ্ট নাম দিয়া থাকেন। সে যাহা হউক এককালে এই বিদ্যা যথানিয়মে অভ্যাস করা হইত। দশকুমারচরিতে রাজপুত্রগণ নানা প্রকার বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে চুরি বিদ্যাও অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে চুরি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন দৃষ্টান্ত সহকারে তাহা গ্রন্থকার দণ্ডী বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ নীচ কার্য্যে লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক কুমারগণ নিজের চুরির কথা বলিয়া বাহাদুরী প্রকাশ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, মৃচ্ছকটিকপাঠে জানা যায় যে চৌরদিগের দেবতা ছিল—ইনি কার্ত্তিকেয়। শর্ব্বিলক আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে ভগবান কার্ত্তিকেয় চারি প্রকারের সন্ধি খননের উপায় দেখাইয়াছেন; যথা, পক্ক ইষ্টকের আকর্ষণ,

(১) রক্তঞ্চ নাম মধুরঞ্চ সমং স্ফুটঞ্চ
ভাবান্বিতঞ্চ ললিতঞ্চ মনোহরঞ্চ।
কিংবা প্রশস্ত বচনৈর্বহুভির্মদুক্তৈ
রন্তর্হিতা যদি ভবেদ্বনিতেত মন্যে॥

অপিচ

তং তস্য স্বর সংক্রমং মৃদুগিরঃ শ্লিষ্টঞ্চ তন্ত্রীস্বনং
বর্ণানামপি মূর্চ্ছনান্তরগতং তারং বিরামে মৃদুম।
হেলা সংযমিতং পুনশ্চ ললিতং রাগদ্বিরুচ্চারিতং
যৎ সত্যং বিরতেঽপি গীত সময়ে গচ্ছামি শৃণ্বন্নিব॥

তৃতীয়াঙ্ক।

অপক্ক ইষ্টকের ছেদন, পিণ্ডময় ইষ্টকে জলসেচন ও কাষ্ঠময়ের উৎপাটন।

এই লোকপ্রসিদ্ধির সর্ব্বোত্তম সাধন ও স্বল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ বড়লোক হইবার অত্যাশ্চর্য্য অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে দেবতার প্রণাম হইত। শর্ব্বিলক সিঁধ কাটিবার পূর্ব্বে নমস্কার করিতেছেন—"নমো বরদাকুমারকার্ত্তিকেয়ায়, নমো কণকশক্তয়ে ব্রহ্মণ্যায় দেবায় দেবব্রতায়, নমো ভাস্করনন্দিনে, নমো যোগাচার্য্যায় যস্যাহং প্রথমঃ শিষ্যঃ।"

শর্ব্বিলক আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন যে তিনি যোগ রচনা দ্বারা শরীর বিলেপন করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান গুণ এই যে ইহা গাত্রে লিপ্ত থাকিলে রক্ষিগণ দেখিতে পায় না এবং শস্ত্র গাত্রে ব্যথা উৎপাদন করিতে পারে না। শর্ব্বিলক একপ্রকার বীজ মন্ত্রপূত করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া গৃহমধ্যে লুক্কায়িত ভাবে ধনাদি রক্ষিত আছে কি না জানিতে পারিতেন।

শর্ব্বিলক একজন পাকা চোর ছিলেন। তিনি নানা প্রকারের সন্ধি (সিঁধ) খনন করিতে সমর্থ ছিলেন। তিনি চুরির পূর্ব্বে ভাবিতেছিলেন যে কি প্রকারের সন্ধি করিবেন—পদ্মের ন্যায়, অথবা সূর্য্যের মত, অথবা বাল চন্দ্রের ন্যায় অথবা দীর্ঘিকার মত, অথবা স্বস্তিক সদৃশ কিম্বা পূর্ণকুম্ভবৎ সন্ধি খনন করিবেন এবং কোন স্থানে আত্মশিল্প প্রদর্শন করিবেন, যাহা দেখিয়া প্রাতে পৌরগণ বিস্মিত হইবে ও দোষ কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৌশলের প্রশংসা করিবে।

এই সকল পাঠে বোধ হয় চুরি বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি ছিল।

অগ্নিপ্রবেশ।—অপমান হইতে রক্ষার জন্য অথবা শোকবিহ্বলতা বশতঃ স্ত্রীলোকদিগের অগ্নিপ্রবেশ বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। মৃচ্ছকটিকেও তাহার উল্লেখ দেখা যায়। চারুদত্তের মৃত্যুর সম্ভাবনা জানিয়া ধূতা শোকে বিহ্বল হইয়া অগ্নিপ্রবেশের উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মের ষাঁড়।—ভারতবর্ষে গরু একটী "ধন" বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট বৃষের দ্বারা গো-সন্তানের সুব্যবস্থার জন্য সম্ভবতঃ ধর্ম্মের ষাঁড়ের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। অন্ততঃ ধর্ম্মের ষাঁড়ের দ্বারা ঐরূপ উপকার সাধিত হয়। অধুনাতন মিউনিসিপালিটির প্রসাদে এই বেওয়ারিশ জন্তুগণ মলমূত্র ও আবর্জ্জনাদি বহনের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে; ভরসা আছে শীঘ্রই এই শ্রেণী অন্তর্হিত হইবে। এই শ্রেণীর হ্রাসের সঙ্গে গোবৎস সকল ক্ষীণবল হইতেছে। সে যাহা হউক, মৃচ্ছকটিকে ধর্ম্মের ষাঁড়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

(১) নগরচত্বর বৃষভ ইব রোমন্থায়মানাস্তিষ্ঠামি।

প্রথমাঙ্ক

দেখ।

দেখ,—
বহুকাল পরে পুন
আসিয়াছি আজ, শুন—
নয়ন তুলিয়া দেখ চাহিয়া বদনে,—
জ্বলুক উন্মত্ত শিখা নয়নে নয়নে।

দেখ—
ক্ষিপ্ত সৌদামিনী ভালে
যেই বহ্নি সদা জ্বলে,—
যেই স্রোত বহে তাহে প্রত্যেক চমকে
শূন্য করি অই আঁখি ঢাল তা'এবুকে।

দেখ—
পূর্ণ স্রোতস্বতী ক্রোড়ে
উন্মাদ পবন উড়ে
যেই উন্মত্ততা সদা করে বিতরণ,
দেহ ঢালি,—এই বক্ষে করিব ধারণ।

অই—
নিবিড় জলদপাশে
চারু শশধর হাসে
তার সেই কোমলতা—কত শান্তিময়!—
ঢাল প্রিয়তমে আজ পূরিয়া হৃদয়।

আজ—
পূর্ণিমায় পাপিয়ার
পূর্ণ স্বরে যে চীৎকার
মাতায় পরাণ,—পূরি অনন্ত গগন,—
আমার হৃদয় তাহে হউক মগন!

এই কয় মাস—
অই চিত্র প্রতি পলে
এঁকেছি গগন ভালে,—
চাঁদের কিরণ ভাঙ্গি গঠিয়া মূরতি,
অশ্রুপাতে নিরজনে পূজিয়াছি নিতি।

পূজা!—
সে পূজা কি পূজা,—তোরে
বুঝাব কেমন ক'রে,—
বুঝাবার নহে তাহা,—বুঝে না সংসার!
শরতে সারদা পূজা নহেত আমার।

সে ত—
মৃৎ-মূর্ত্তি গঠাইয়ে,
তণ্ডুল কদলি দিয়ে,
অর্থশূন্য মন্ত্র পাঠ নহে পূজা মম!
কামনা নহেক পুণ্য—কিম্বা ধনাগম!
এ হৃদি কামনাশূন্য
নাহি মম পাপ পুণ্য
কামনা, বাসনা—ভক্তি,-যোগের সাধন!
এ হৃদয়ে মম নাহি অন্য আকিঞ্চন।

ছার পুণ্য—ছার অর্থ
নতুবা এ পূজা ব্যর্থ!—
ব্যর্থ এই জন্মবাহী ভক্তিপ্রস্রবণ!
কেন আমি আজনম যোগে নিমগন?
আইস,—আইস দেবি,—
দেখাই প্রাণের ছবি,
দেখাই সংসারে এই কি আছে কামনা!—
জীবনের লক্ষ মম—চিত্তের বাসনা!

বহুকাল পরে পুন
ডাকি আজ,—দেবি-শুন,
দেখি চাহি—দেখ চাহি তুলিয়া নয়ন;—
এই ভিক্ষা—কর পূর্ণ এই আকিঞ্চন।

শ্রীস:—

মনোযোগ।

এ যোগ সামান্যতঃ দুই প্রকার। সুযোগ আর কুযোগ। যাহা দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় তাহাকে সুযোগ বলা যায়। আর যাহা দ্বারা মায়ানিগড়ে বদ্ধ হইয়া মানব সংসারানলে দগ্ধ হয় তাহাকে কুযোগ বলে। যোগাভ্যাসের প্রাথমিক কার্য্য মনঃস্থৈর্য্যকরণ। মন সর্ব্বদা চঞ্চল। সেই চঞ্চল মনকে যে সকল কার্য্য দ্বারা বশীভূত করিতে হয় তাহাকেই যোগক্রিয়া বলা যায়। প্রস্তাব্য বিষয় নির্ণয় করিতে গিয়া শারীরতত্ত্ববিদেরা বলিয়াছেন, মন দৈহিক ধর্ম্ম ভিন্ন পদার্থান্তর নহে। শরীর ধ্বংস হইলে মনেরও ধ্বংস হয়। যতদিন শরীর বিকৃতভাবাপন্ন না হয় ততদিন মনও সুস্থ থাকে। সুস্থ মনকে বশীভূত করিবার জন্য শারীরিক যত্ন ভিন্ন অন্য ক্রিয়া করিতে হয় না। অদূষিত শরীরস্থ মনকে বুদ্ধি সহযোগে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে লইয়া যাইতে পারা যায়। শরীরের মধ্যে মস্তিষ্কই প্রধান দ্রব্য। সেই মস্তিষ্ক যে ক্রিয়া দ্বারা সচ্ছন্দে থাকে তাহাই করা বুদ্ধিমান লোকের উচিত। মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে মনেরও বিকৃতি জন্মে। মনের বিকৃতি জন্মিলে মন সর্ব্বদা চঞ্চল হইয়া থাকে। মনশ্চাঞ্চল্যই বাতুলতা। আর মনঃ-স্থৈর্য্যই ধীরতা।

সদসদ্বিবেক দ্বারা মনের চঞ্চলতা নিবারণ করা যায়। তদন্যথায় মনঃ-প্রশমনের উপায়ান্তর নাই। যেখানে সদসদ্বিবেকশক্তির অভাব সেখানে মত্তমাতঙ্গসদৃশ মন অন্য কিছুতেই নিবারিত হয় না। বাতুল ব্যক্তির সদসদ্বিবেকশক্তি না থাকায় তদীয় মন সতত অপ্রশান্ত। সদসদ্বিবেকশক্তি পরিষ্কৃতবুদ্ধিসম্ভবা।

বুদ্ধি ও বিবেকশক্তি দৈহিক ধর্ম্ম-বিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেমন পুষ্পগন্ধ পুষ্পধর্ম্ম, পদার্থান্তর নহে, তেমনি মন বুদ্ধি ও বিবেকশক্তি প্রভৃতি কতকগুলি দৈহিক ধর্ম্ম ভিন্ন পদার্থান্তর নহে। অতএব মনঃস্থৈর্য্যার্থ যোগ যাগাদি অবলম্বন করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

মনোযোগ সম্বন্ধে জড়বাদীদিগের মত সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে আধ্যাত্মিক চৈতন্যবাদীরা যাহা বলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল। জড়বাদীরা বলিয়াছেন যে মানবের মন দৈহিক ধর্ম্মবিশেষ ভিন্ন অন্য স্বতন্ত্র কোন পদার্থবিশেষ নহে। যেহেতু মনকে দেহের সহিত পরিবর্দ্ধিত ও ক্ষয় হইতে দেখা যায়।

মন দেহের আশ্রয়ে থাকিয়া দেহের বৃদ্ধি ও হ্রাসানুসারে হ্রাস বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এ কথা আপাততঃ যে

যুক্তিযুক্ত বোধ হয় সেটি রজ ও তমো গুণের ধর্ম্ম। সাত্ত্বিক লোকসকল নির্ম্মলা বুদ্ধি ও সদ্‌যুক্তি দ্বারা জানিতে পারেন যে নিরাকার মহত্তত্ত্বজাত অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারাত্মজ মন, মনঃপ্রসূত আকাশ, আকাশসম্ভূতি বায়ু, বায়ুর সন্তান তেজঃ, তেজের সন্তান সলিল, সলিলাত্মজ পৃথিবী। সেই পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন হইতে ক্রমে উৎপন্ন হওয়া শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা যখন সাবাস্ত হইতেছে তখন শরীরাতিরিক্ত মন যে পৃথক পদার্থ তাহা অস্বীকার্য্য নহে। এ সম্বন্ধে পঞ্চদশীর পঞ্চীকরণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

অন্যচ্চ, দেহের ধর্ম্ম যদি মন হইত তাহা হইলে দেহিমাত্রেরই একই প্রকার মন হইত। দেখ মনুষ্যের মন যেরূপ, মানবাকার বনমানুষের মনত সে প্রকার দেখা যায় না। আবার বনমানুষের যে প্রকার মন, শাখামৃগ হনুমান ও বানরাদিতে ত সেইরূপ মন নাই।

এইরূপে ক্রমশঃ হস্তী অশ্ব ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুতে মনের তারতম্য দেখা যাইতেছে। আর পক্ষী, জলচর ও ভূচর কীটপতঙ্গাদি নানাবিধ শরীরধারী প্রাণী আছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে এমন কতকগুলি দেহী আছে যে তাহাদিগের মনের কার্য্য কিছুই নাই। ইহাতেও মন দেহধর্ম্মাতিরিক্ত পদার্থ প্রমাণ হইতেছে। মনের কার্য্য সঙ্কল্প আর বিকল্প। এই সঙ্কল্প আর বিকল্প মনুষ্যে যেমন আছে এমন আর কোন দেহীতে যে আছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তবে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদিতে মন যে একেবারে নাই এমন কথাও বলা যায় না। পশুপক্ষ্যাদিতে যে মন আছে তাহা অপ্রশস্ত ও যৎসামান্য। পশুপক্ষ্যাদিতে মন আছে বলিয়া উহারা ইন্দ্রিয়শালী। যাহার ইন্দ্রিয় যত কম তাহার মনও তত অপ্রশস্ত। বৃক্ষ লতা তৃণ গুল্মাদি দেহী ও প্রাণী বটে কিন্তু উহাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় মাত্র নাই বলিয়া উহারা নির্ম্মন দেহী। আবার মন যদি দৈহিক ধর্ম্ম হইত তাহাহইলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় জীবিত সকল দেহেই দেখা যাইত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় মনুষ্যে দেখা যায়। পশুপক্ষ্যাদিতে কেবল জাগ্রৎ আর নিদ্রা এই দুইটি মাত্র অবস্থা প্রকাশ পায়। স্বপ্ন দশা যে উহাদিগের আছে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অপরঞ্চ। মন যদি প্রকৃতরূপে দৈহিক ধর্ম্মই হইত তাহা হইলে মানব মাত্রেরই একই রূপ মন হইত। মানব শরীরত একই প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত। তবে কেন প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক কার্য্য একইরূপ হয় না। সচরাচর দেখা ও শুনা যায় যে পিতাপুত্রের ও ভ্রাতা ভগিনীর মানসিক কার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। ইহার সহস্র সহস্র উদাহরণ দেওয়া

যাইতে পারে। পিতা ও মাতা যেমন প্রকৃতির লোক, তৎপুত্র ও কন্যাগণ সেরূপ প্রকৃতি লাভ করিতে পারে না কেন? পিতা মাতা যে যে উপাদানে পুত্রসন্তান উৎপন্ন করিয়াছেন তাহাতে সকল পুত্রের ও কন্যাগণের মন ও প্রকৃতি বিভিন্নরূপ যখন দেখা যাইতেছে তখন দেহাতিরিক্ত মনের অস্তিত্ব কে না স্বীকার করিবেন? এতদ্ভিন্ন সমাধি, মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তি-গত মনুষ্যের দেহে মনের কার্য্য না হইবারই বা কারণ কি? তখনত মানবের দেহ ধ্বংস হয় নাই, তবে কেন মানসিক ক্রিয়ার অভাব হয়? ইহার প্রকৃত তথ্য যখন জড়বাদীর হৃদয়ঙ্গম হইবে তখন দেহধর্ম্মাতিরিক্ত মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দৃঢ়রূপে বোধ হইবে।

মন শরীরস্থ প্রাণবায়ু আর অবিকৃত শোণিতে মিলিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র গতায়াত করিতেছে। প্রাণস্পন্দনে মনের স্পন্দন। প্রাণস্পন্দন রহিত করাকে যোগসাধনা বলে। ইহার উপায় যাহারা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন তাঁহারাই যোগবিৎ। যোগশাস্ত্রে প্রাণ-স্পন্দ নিরোধের নানাবিধ উপায় আছে। যে উপায়ে জীবনী শক্তির কোন ব্যাঘাৎ না হয় সেই উপায় লয় যোগে বিশদ-রূপে বলা হইয়াছে। তাহা অতি কঠিন এবং প্রাণসঙ্কটকর। এতদ্ভিন্ন রাজযোগ ও মন্ত্রযোগ-সাধকের পক্ষে উক্ত যোগ সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া ভারতে মন্ত্রযোগই এখন প্রচলিত।

নিরাকার নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা নিজ মায়ায় আবৃত হইলে তিনি প্রথমে মহত্তত্ত্ব, তৎপরে অহঙ্কার, তৎপরে মনোরূপে সৃষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন আর বুদ্ধি— ইহারা ভূতাতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক পদার্থ। ভৌতিক প্রলয়ে ইহাদিগের ধ্বংস হয় না। প্রাকৃতিক প্রলয়ে ঐ মহত্তত্ত্বাদি কেবল প্রকৃতিতে বিলীন হন মাত্র। নচেৎ কস্মিন্ কালেও ধ্বংস হন না।

উক্ত আধ্যাত্মিক জগতীয় মৌলিক পদার্থ চতুষ্টয়, বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ রূপে যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে জানা যায়। মানবধর্ম্মাবলম্বী উক্ত বাসুদেবাদিচতুষ্টয় জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ষড়বিকার স্বীকার করতঃ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া পুনরায় স্বস্ব পুরাতন মূর্ত্তিতে মিলিত হন।

বাসুদেব মহত্তত্ত্বে, সংকর্ষণ অহঙ্কারে, প্রদ্যুম্ন মনে, অনিরুদ্ধ বুদ্ধিতে মিলিত হন।

মন দেহাতিরিক্ত আধ্যাত্মিক পদার্থ বলিয়া যে সকলেই স্বীকার করেন তাহাও দেখান যাইতেছে। কি জড়-বাদী, কি অজড়বাদী ইহাঁরা সকলেই যে কোন কার্য্য করিবার অগ্রে মন দ্বারা সেই কার্য্যের আকৃতি গঠন করিয়া পরে হস্ত পদাদি দ্বারা তাহা নির্ম্মাণ করেন। তদ্ব্যতীত কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না। অমনস্ক

ব্যক্তিকে কখন কোন কার্য্য করিতে কেহই দেখেন নাই। মূর্চ্ছিত ও সমাধিগত এবং সুষুপ্ত ব্যক্তি এ বিষয়ের প্রকৃত উদাহরণস্থল। এই সকল লোক জীবিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সত্বে যে দৈহিক ধর্ম্মানুসারে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না ইহাতেও মনের পৃথক অস্তিত্ব কি প্রমাণ হয় না? অপরঞ্চ। সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ বাক্য আছে যে 'মনে করা ও মনে হওয়া। এই কথার অর্থ ও তাৎপর্য্য এই—কোন কথা ভুলে না যাওয়া কিম্বা কোন কার্য্য অন্তরে করা ও হওয়া। মন স্বতন্ত্র আছে বলিয়া এরূপ কার্য্য হয় ও এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা যায়। আর এক কথা এই যে পুষ্প-গন্ধের ন্যায় যদি মন হইত তাহা হইলে যেখানে দেহ সেই থানেই মন থাকিত। দেহ ছাড়া অন্যত্র মনের গতি হইতে পারিত না। দৈহিক মন যখন স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, তখন মনকে পুষ্পগন্ধবৎ দৈহিক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। অপর, মনুষ্যের সুখ আর দুঃখ দৈহিক আর মানসিক ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে দৈহিক দুঃখ অপেক্ষা মানসিক দুঃখ ও সুখ বলবান। অতএব সেই দেহাতিরিক্ত আধ্যাত্মিক মনকে স্থির করিতে হইলে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। তাহাতে যিনি অশক্ত তিনি দৃষ্টি স্থির করিতে শিক্ষা করুন। হঠ আর লয় যোগ অভ্যস্ত হইলে প্রাণায়াম আর দৃষ্টিস্থির সুচারুরূপে হইতে পারে। হঠযোগে প্রাণায়াম সাধনার জন্য যে সকল ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তন্মধ্যে নেতি ধৌতি আর বস্তি ক্রিয়া আর খেচরী মুদ্রাবন্ধন করা সদ্‌গুরুর উপদেশ-সাপেক্ষ হেতু কঠিন।

কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি গৃহস্থ, কি উদাসীন, কি রাজা, কি প্রজা, সকলেরই মনোযোগী হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। অমনোযোগীর সকল কর্ম্মই বিশৃঙ্খল হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

সমাজ-সংস্কার।

এ জগৎ পরিবর্ত্তনময়। কি প্রাকৃতিক জগৎ, কি মনুষ্য-সমাজ, যে দিকে চাহিবে সেই দিকেই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবে ভূতত্ত্ববিদ্যায় প্রকাশিত করে, এ জগৎ কত পরিবর্ত্তের পর পরিবর্ত্ত দিয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তদ্রূপ বর্ত্তমান জনসমাজ একদিনের সৃষ্টি নহে; বহু-কালের চিন্তা এবং বহুকালের অনুষ্ঠানের ফল। আবার বর্ত্তমান জনসমাজ ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ভিন্নরূপে পরিণত হইবে। পরিবর্ত্তন জগতের এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। জনসমাজের পরিবর্ত্তন

অবশ্যম্ভাবী। জনসমাজ কখন একভাবে স্থির থাকিতে পারে না। যুগে যুগে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সমাজের হিতাহিত বিবেচনায় এই পরিবর্ত্তনকে কখন উন্নতি কখন অবনতি বলা হয়।

ইউরোপীয় জনসমাজ কেমন শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, তাহা ইউরোপীয় ইতিবৃত্তে প্রকাশিত করে। সেই সমাজের প্রতি যুগ, প্রতি পরিবর্ত্তন, ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। তদ্রূপ ভারতীয় আর্য্যসমাজ প্রতি যুগে যুগে পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য দেয়। হিন্দু আচার ব্যবহার প্রতি যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। বৈদিক আচার ব্যবহারের এখন অল্পই নিদর্শন আছে। এই পৌরাণিক যুগে বৈদিক আচার ব্যবহার কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! কিন্তু সকল আচার ব্যবহারই শাস্ত্রসিদ্ধ এবং মুনি ঋষিগণের চিন্তাসম্ভূত কালোপযোগী বিধান। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় আচার ব্যবহারকে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রচলিত করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ আপন সভ্যতা এবং বিদ্যা লইয়া পৃথিবীর এক কোণে আত্মগরিমায় অবস্থিত ছিল। তাহার সহিত অপরাপর দেশের সংস্রব ছিল না। এইরূপ আত্মগরিমায় ফুলিয়া ভারতবর্ষ ক্রমশঃ ভিতরে ভিতরে দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছিল। অপর দেশের সহিত সংস্রবে আসিলে কত দূর আন্তরিক বলের প্রয়োজন হয়, কতদূর বলে আত্মপক্ষ সমর্থন ও রক্ষা করা যায় প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহা কখন জানে নাই। প্রাচীন হিন্দুগণকে কখন অপর দেশীয় জ্ঞান ও বুদ্ধিবলের প্রভাব অতিক্রম করিয়া তিষ্ঠিতে হয় নাই। তাহাদিগের সভ্যতা ও বিদ্যা আদি হইতে যে দিকে উন্মুখীন হইয়াছিল, তাহাদিগের গতি সেই দিকেই বরাবর গিয়াছে। সে বেগের বিপরীত দিকে আর কোন বল দণ্ডায়মান হয় নাই। দুইবার মাত্র এই বেগের গতিরোধ করিতে দুইটি দণ্ড স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই প্রবল বেগে সে দণ্ডদ্বয় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। একবার বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিপক্ষে চার্ব্বাকবিদ্যা উত্থিত হয়, কিন্তু ষড়দর্শনের ঘোর আবেগে চার্ব্বাকবিদ্যা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। আর একবার বৌদ্ধধর্ম্ম দার্শনিক কর্ম্মকাণ্ডের আতিশয্য নিবারণ করিতে উত্থিত হয়, কিন্তু পৌরাণিক যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব তিরোহিত হইয়াছে। এই ঘাত প্রতিঘাত জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের দ্বন্দ্ব। কর্ম্মকাণ্ড অতিশয় প্রবল হইলেই জ্ঞান তাহার আতিশয্য নিবারণে উদ্যত হয়। যখন হিন্দু জনসমাজের জীবনীশক্তি ছিল, যখন তাহার সভ্যতা এবং বিদ্যার প্রাদুর্ভাব ছিল, তখন এরূপ ঘটিয়াছে? ঘটিয়া হিন্দু আচার ব্যবহারের যুগান্তর উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। আজি যদি হিন্দু জনসমাজের জীবনীশক্তি থাকিত,

হিন্দু বিদ্যা এবং সভ্যতার প্রাদুর্ভাব থাকিত এবং ভারতবর্ষ যদি শুদ্ধ হিন্দুবলে তিষ্ঠিয়া থাকিত, তবে এখন ইহার সহিত যখন অপরাপর দেশের সংস্রব ঘটিয়াছে, তখন যে ইহার সভ্যতা ও বিদ্যা, ইহার আচার ও ব্যবহারের কোন ব্যতিক্রম ঘটিত না এমত কি সম্ভব হইতে পারে? যখন যুগে যুগে এই ভারতীয় সমাজের সংস্কার ঘটিয়াছে, তখন যে ইহা চিরকাল বর্ত্তমান অবস্থায় অবস্থিত থাকিত, তখন যে ইহার বর্ত্তমান আচার ব্যবহার সকল চিরকাল একভাবে তিষ্ঠিয়া থাকিত, এমত কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। হিন্দু রাজা থাকিলে, আজি হিন্দু মুনি ঋষিগণের প্রাদুর্ভাব থাকিলে, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিবারই কথা। কারণ, চিরকালই এইরূপ পরিবর্ত্তনই ঘটিয়া আসিয়াছে। দেশ কাল পাত্র উপযোগী করিয়া আচার ব্যবহারের সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

গতিই, জীবনীশক্তির নিদর্শন। স্থির ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া থাকা মৃত্যুর লক্ষণ। যে সমাজের জীবনীশক্তি আছে, সে সমাজে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ভারতীয় জনসমাজের যখন জীবনীশক্তি ছিল, তখন সে সমাজ স্থির ও অচঞ্চল ভাবে পড়িয়া ছিল না। সে সমাজের উষ্ণ শোণিতে তাহার ধমনীসকল সচঞ্চল ছিল। সেই সমাজ-শরীরের যখন যে ব্যাধি উপস্থিত হইত, সেই ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ প্রদত্ত হইত। পাপ, তাপ এবং সমাজের অমঙ্গল দূর করিবার চেষ্টা ছিল। সামাজিক সংস্কার ও সংশোধন হইত। মনুষ্যসৃষ্ট ও মনুষ্যপ্রবর্ত্তিত আচার ব্যবহার মাত্রেরই ভাল মন্দ দুই ভাব অবশ্যম্ভাবী। প্রচলিত আচার ব্যবহার কিছু কাল পুরাতন হইলেই তাহার কুভাব ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পড়ে। সেই কুভাব দূরীকরণার্থ সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সমাজ যখন জীবিত থাকে তখনই এই প্রয়োজন সাধনে সচেষ্ট হয়। প্রাচীন হিন্দুসমাজে এ চেষ্টার অভাব ছিল না। সুতরাং হিন্দু আচার ব্যবহারের বরাবরই সংশোধন হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এক্ষণে হিন্দুসমাজের আর জীবনীশক্তি নাই। হিন্দুসমাজে হিন্দু রাজা নাই, হিন্দু রাজ্যে মুনি ঋষিগণের প্রাদুর্ভাব নাই। অথচ আচার ব্যবহার সকল বহুকাল পুরাতন হইয়া আসিয়াছে। এই প্রাচীন আচার ব্যবহার এক্ষণে জরাগ্রস্ত হইয়াছে। ইহাদিগের তেজ তিরোহিত হইয়াছে। ইহাদিগের মন্দ ভাবেরই প্রাবল্য ঘটিয়াছে। সেই কৌলীন্যপ্রথার উৎকৃষ্ট ভাব আর সঞ্জীবিত নাই। বাল্যবিবাহ এখন অনেক অমঙ্গল প্রসব করিতেছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকাতে দেশ পাপাচারে প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। জাতিভেদের বন্ধনাদি ক্রমশঃ আপনাআপনি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। অগ্রকাশ্যে জাতিবিচার নাই বলিলে

হয়। সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছে। সাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপ লোপ পাইয়াছে। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি বাহ্য আড়ম্বরমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূজোপলক্ষে কেবল তামসিক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সাত্ত্বিক ভাব তিরোহিত হইয়াছে। ব্রত বার প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। কালধর্ম্মে হিন্দুর সমাজে এক্ষণে যুগান্তর উপস্থিত।

এই কালধর্ম্ম বুঝিয়া সে দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাগণের দুঃখে কাতর হইয়া নিদান পক্ষে বালিকা বিধবাগণের পুনরুদ্বাহ যাহাতে বঙ্গসমাজে প্রচলিত হয়, তজ্জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণকার শিক্ষিত সমাজের মুখাপেক্ষী হইয়া সেই সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, ভবিষ্যতে তাঁহার প্রস্তাবিত বিবাহ অবশ্যই প্রচলিত হইবে। তিনি নিজে কৃতকার্য্য না হউন ভবিষ্য শিক্ষিত দলে তাহা প্রচলিত করিতে উদ্যোগী হইবে। কিন্তু কষ্ট, এখন ত বিপরীত ভাব দেখিতেছি! এক্ষণে শিক্ষিত দলের মধ্যে সমাজসংস্কার হওয়া ক্রমশঃ দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজসংস্কার সম্বন্ধে তাঁহাদিগের যে প্রবৃত্তি, তাহা বেশভূষা সংস্কার দিয়াই পরিতুষ্ট হইতেছে। কেবল হ্যাট, পেণ্টুলন পরিয়া, মদ্যমাংস প্রভৃতি খাইয়া সে প্রবৃত্তির পরিতোষ সাধন হইতেছে। যাহাতে আপাততঃ কষ্টের লেশ মাত্র আছে, এমত সমাজ সংস্কারে আধুনিক শিক্ষিত দলের প্রবৃত্তি নাই। প্রকৃত সমাজ সংস্কার পথে এক্ষণে দ্বিবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে।

১। আমাদের শিক্ষিত জনগণ এক্ষণে অনেকে সংস্কারবিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছেন। "যেন তেন প্রকারেণ" তাঁহারা এক্ষণে সংস্কারের প্রতিপক্ষতা সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা অতি অসার যুক্তি বাহির করিয়া পুরাতন প্রথা সকলের পক্ষ সমর্থন করিতে যত্ন করিতেছেন। যে জন্য এই সংস্কারের প্রয়োজন, সেই অমঙ্গল সকল তাঁহারা কদাচ উল্লেখ করেন না। কি সদুদ্দেশ্যে এই প্রথা সকল প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাই বাহির করিয়া দেখাইতে যান। উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, এক্ষণে আমাদের প্রাচীন আচার ব্যবহার দ্বারা কিরূপ গরলময় ফল উৎপাদিত হইতেছে, তাহা দেখা কি অগ্রে কর্ত্তব্য নহে? এবং যাহাতে সেই অনিষ্ট নিবারিত হয় এমত চেষ্টা করাও কি উচিত নহে? কিন্তু সে দিক দিয়াও তাঁহারা হাঁটেন না। যত কূট যুক্তি দিয়া স্বপক্ষ সমর্থনে যত্নশীল হয়েন। যত বিদ্যা বুদ্ধি, সকলই এই কুটিল পথে নিয়োজিত করেন। আপনাদের বিপক্ষ পক্ষ খণ্ডন করিতে তত উদ্যোগী দেখি না। সংস্কারপক্ষীয় প্রবল যুক্তিসকল আজি পর্য্যন্ত কিছুই খণ্ডিত হয় নাই। মাথা ঘামাইয়া কেবল বর্ত্তমান আচার ব্যবহারের স্বপক্ষ যুক্তি দিতেই তাঁহারা বেশি

তৎপর। ম্যালথসের মত কেবল গরিব বিধবার বেলাই প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। ব্রহ্মচর্য্য কেবল বিধবার জন্য। আপনারা যথেচ্ছাচারী হউন না কেন, তাহাতে ক্ষতি নাই। জোর করিয়া বাল-বিধবাগণকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইতে হইবে। তাহারাও গোপনে গোপনে পাপাচারে দেশকে ভাসাইয়া দিয়া বিলক্ষণ প্রতিশোধ লয়। অনেক হতভাগিনী হিন্দু বিধবা জারজ সন্তানকে গোপনে গোপনে হত্যা করিয়া থাকে। এই হত্যার জন্য তাহারা কাহার দোষে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়? স্বামিবিরহে যে হিন্দু বিধবাগণ জীবিকাবিরহিত হইয়া সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যভিচারিণী হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সে পাপদশা কাহার দোষে ঘটিতেছে? এই সমস্ত দৃষ্টান্তের সংখ্যা এত অধিক, যে তাহা কোন মতে উপেক্ষিত হইতে পারে না। নির্দ্ধন, বালবিধবা এবং এরূপ উপায়হীনা বিধবাগণের বিবাহ হওয়া একান্ত উচিত। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত দল এ কথাই একেবারে মুখে আনেন না। তাঁহারা বিধবাবিবাহ প্রথাকেই নিন্দা করিয়া বসেন। বিধবাবিবাহ শুদ্ধ বঙ্গদেশেই প্রচলিত নাই। পৃথিবীর আর সর্ব্বত্রই ত প্রচলিত আছে। সেখানে সমাজ কিরূপে চলে? সে যাহা হউক, এক্ষণে আমরা যুক্তি দেখাইতে চাহি না। আমরা এই পত্রেই সংস্কার পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি, সে সমস্ত যুক্তি আজিও অখণ্ডিত রহিয়াছে। শিক্ষিতগণ যখন সমাজ সংস্কারের বিরোধী হইয়া কুতর্কের পথ অবলম্বন করেন, তখন তাঁহারা যে দেশের দোষ ও অনিষ্টের প্রতি একেবারে অন্ধ হইয়া বসেন, ইহাই আশ্চর্য্য। আরও আশ্চর্য্য এই, তাঁহারা হৃদয়-ব্যথা কিরূপে চাপা দেন আমরা বুঝিতে পারি না এবং বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝিয়া বর্ত্তমান জীর্ণ শীর্ণ ও বিবিধপাপতাপপ্রসবিনী রীতি নীতি-সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন না। আচার ব্যবহারের দোষের বেলাই অন্ধ হইয়া বসেন। দেশের দোষ এবং অনিষ্ট গোপন করিয়া রাখিলে, তাহা কি কখন লুকাইয়া রাখা যায়? তাহা যে অনুক্ষণ আমাদের হৃদয়ে শেল বিঁধিয়া দিতেছে। এই শেল কিসে অপসারিত হয়, তজ্জন্য কি আমরা দায়ী নহি? আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি কি শুদ্ধ নীচ আশয়ে নিয়োজিত থাকিবে? দেশের কর্ত্তব্য সাধনে তাহা কি প্রয়োজিত হইবে না?

২। এই সমাজ-সংস্কার বিরুদ্ধ আর একটি বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে? সে বিঘ্ন এক্ষণকার ধর্ম্মালোচনা। এই ধর্ম্মালোচনার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তাহা আমরা বিচার করিতে চাহি না। কিন্তু ইহাতে লোকের মন এক্ষণে সমাজ-সংস্কার হইতে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিতেছে। যে সমাজসংস্কারের দিকে তাহাদের চিন্তা নিবিষ্ট হওয়া উচিত,

সেই সমাজসংস্কার এক্ষণে তাঁহাদের মন হইতে বিদূরিত হইতেছে। আমাদের আধুনিক ধর্ম্মালোচনার মুখ্য ফল যে কি হইবে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু এতদ্দ্বারা আপাততঃ উক্ত গৌন কুফল দাঁড়াইতেছে। আমরা এমত কথা বলিতে চাহি না যে আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী এইরূপ গৌন উদ্দেশ্য সাধন জন্য, ধর্ম্মালোচনা কিছু বিশেষরূপে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তবে তাঁহারা যেমন ধর্ম্ম-সংস্কারে উদ্যোগী হইয়াছেন তৎসঙ্গে সঙ্গে যদি সমাজসংস্কারও গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে লোকের মন শুদ্ধ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট না হইয়া সমাজের দিকেও পড়িত। কিন্তু লোকে ক্রমে একদেশদর্শী হইয়া দাঁড়াইতেছে। অনেকে মনে করেন যে, সমাজসংস্কারের প্রয়োজন নাই বলিয়া আমাদের শিক্ষিত-মণ্ডলী তাহার আলোচনা করেন না। ধর্ম্মের সঙ্গে যে সমাজসংস্কারেরও প্রয়োজন আছে, আমাদের শিক্ষিতগণ এরূপ অনুষ্ঠান ও আলোচনা করেন,– তাহা অতীব প্রার্থনীয়। শুদ্ধ ধর্ম্ম আলোচনার জন্য কয়েকখানি সাময়িক পত্র উদয় হইয়াছে। কই, সমাজসংস্কার আলোচনার জন্য কোন পত্র ত বিশেষরূপে নিয়োজিত নাই। এই জন্য বলিতেছি, এই সকল সাময়িক পত্র দ্বারা এই কুফল দাঁড়াইতেছে যে, লোকের মন এক্ষণে অধিকন্তু সমাজসংস্কার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মের দিকেই আকৃষ্ট হইতেছে। তাহাতে সমাজসংস্কারের পক্ষ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। সমাজসংস্কার পথে এই সকল সাময়িক পত্র অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ধর্ম্ম আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কার-আলোচনা এই সমস্ত পত্রে গৃহীত হয়, ইহাই প্রার্থনীয়। সামাজিক আচার ব্যবহার লইয়াই যখন হিন্দু ধর্ম্ম, তখন সেই হিন্দুধর্ম্মকে অঙ্গহীন করিয়া ধর্ম্মালোচনা করা কখন বিধেয় নহে। হিন্দু ধর্ম্মের আলোচনার সঙ্গে সামাজিক আচার ব্যবহারেরও আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আর প্রকৃত আলোচনা করিতে হইলে সমস্ত দোষ গুণের আলোচনা করাও কর্ত্তব্য। শুদ্ধ দোষ দেখা যেমত উচিত নহে, শুদ্ধ গুণের উদ্ঘোষণ করাও তদ্রূপ উচিত নহে। বরং গুণ অপেক্ষা দোষ সকল খুঁজিয়া বাহির করা সমাজসংস্কারকের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। দোষ না বাহির করিলে কিসের সংস্কার হইবে? দোষ সকলকে ঢাকিয়া রাখা সমাজসংস্কারকের উচিত নহে, কিন্তু যাহাতে সেই দোষের মোচন হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য।

অধুনা সমাজসংস্কার পথে যে দুই কণ্টক স্থাপিত রহিয়াছে আমরা তাহা প্রদর্শন করিলাম। এই ব্যাঘাত হেতু আমাদের সমাজসংস্কার কার্য্যের যে বিলম্ব ঘটিতেছে না এমত নহে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই, কালসহকারে এই ব্যাঘাত তিরোহিত হইবে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

শরীরতাপ।

নং ২।

সুস্থ শরীরে তাপের পরিমাণ।

বানডার লিচ্ সাহেব কক্ষদেশে তাপমান যন্ত্র স্থাপন করিয়া পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে শীতপ্রধান দেশে সুস্থ ব্যক্তির তাপপরিমাণ গড়ে ৯৮°৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট, ৩৭°৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড*। ভারতবর্ষেও এই পরিমাণ ঠিক। এস্থলে শীতপ্রধান দেশীয় দ্বাদশ-বর্ষ-বয়স্ক একটি বালকের তাপপরিমাণের একটি বিবরণ সন্নিবেশিত হইল। সমগ্র দিবা ও রাত্রিমানের মধ্যে শরীর কতদূর উত্থান ও পতন হয় তাহা এই বিবরণে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রত্যূষে চারি পাঁচটার সময় তাপপরিমাণ ৯৮ফ. অথবা কিঞ্চিৎ অধিক। দিবার বৃদ্ধির সহিত ক্রমে বাড়িয়া প্রাহ্ণে নয় দশটার সময় সর্ব্বোচ্চ সীমা প্রাপ্ত হয়। সুস্থ ব্যক্তির শরীর-তাপের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ সচরাচর ৯৯°। এই পরিমাণ অপরাহ্ণ চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত সমভাবেই থাকে; কিন্তু যত সন্ধ্যা হইয়া আইসে, ততই ইহা হ্রাস হইয়া সচরাচর রজনী দ্বিপ্রহরে সর্ব্বনিম্ন হইয়া পড়ে; সে সময় ইহা ৯৭° অথবা ৯৬°ও হইতে পারে। সেই নিম্নতম অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া তাপ-পরিমাণ ঠিক সমভাবেই থাকে, ক্রমে বাড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রাহ্ণ নয় দশ ঘটিকার সময় সর্ব্বোচ্চ হইয়া উঠে। এই উচ্চতম ও নিম্নতম তাপপরিমাণের প্রভেদ সচরাচর ২° মাত্র হয়।

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ প্রান্তরভূমি-সমূহে, শীতপ্রধান দেশের সমান তাপ-পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার হ্রাস বৃদ্ধির সময়ের পার্থক্য পরি-লক্ষিত হয়। এতৎপ্রদেশে প্রত্যূষে ৩½, ৪½ টার মধ্যে সর্ব্বনিম্ন, এবং অপরাহ্ণে ৪, ৫টার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পরি-মাণ দেখিতে পাওয়া যায়। উষ্ণপ্রধান দেশের সুস্থ ব্যক্তির তাপপরিমাণের উচ্চতম বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত বেশী এবং নিম্নতম হ্রাস কম। এতদুভয়ের মধ্যে কেবল এক বা দেড় ডিগ্রীর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; শীতকালে সর্ব্বত্র, এবং স্থানবিশেষে শীতের প্রাধান্য বশতঃ এই প্রভেদের কিছু আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

অতি বৃদ্ধ নীরোগ ব্যক্তিগণের শরীর-তাপ যুবকদিগের অপেক্ষা কম। ডাক্তার

* ডাক্তার রবর্ট বলেন স্বাস্থ্যে শরীর-তাপের পরিমাণ গড়ে ৯৮°৪ ফ.; ডাক্তার মার্চিসেন বলেন ৯৮°৫।

বলেন যে সুবিজ্ঞদিগের শরীর-তাপ ৯৭° ডিগ্রির বেশী না হইলেও তাহাদিগকে সুস্থ বলা যাইতে পারে।

স্বাস্থ্যে শরীর-তাপ পরিমাণের বৃদ্ধি ৯৯.৫° পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; সময়ে সময়ে ইহারও অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম করিলে, অথবা অধিকক্ষণ সূর্য্যকিরণে থাকিলে শরীরের তাপপরিমাণ ৯৯°.৫ অপেক্ষাও অধিক হয়। এই তাপবৃদ্ধি কোন পীড়াজনিত নহে, কারণ অল্প সময় মধ্যেই ইহা কমিয়া স্বাভাবিক হয়। কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিকক্ষণ থাকিলে জ্বরসূচক বলিয়া প্রতীত হয়। এতদ্ব্যতীত সময় বিশেষে শরীর-তাপের স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে উহা রোগের পরিচায়ক বোধ করিতে হইবে। যেমন দিবসে শরীর-তাপ যে পরিমাণ থাকিলে সুস্থ অবস্থা সূচিত হইয়া থাকে; সেরূপ দিবসে না হইয়া রাত্রিকালে হইলে, নিশ্চয়ই রোগের লক্ষণ বলিয়া প্রতীত হইবে।

ডাক্তার রিংগার শীতপ্রধানদেশস্থ মানবগণের শরীরতাপ সন্দর্শন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ব্যক্তিগণের প্রত্যহ ২° ফারেন্‌হাইট্‌ পরিমাণের প্রভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু চল্লিশের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণের ইহা অপেক্ষাকৃত অল্প। তাহা সচরাচর ১°, বা তাহা অপেক্ষাও কম হইয়া থাকে। পরিশ্রম ও বিরামকালে তাপের তারতম্য জাইগার সাহেব বিশেষরূপে সন্দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সন্দর্শনের ফল;—পরিশ্রম না করিলে দৈনিক প্রভেদ ২°২° এবং দারুণ শারীরিক পরিশ্রম করিলে এই দৈনিক প্রভেদ ·৭°। তিনি সৈনিকদিগের রেকটামে তাপ পরীক্ষা করিয়া উক্তরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে কক্ষস্থলের অপেক্ষা রেকটামে তাপ-পরিমাণ ·১ ডিগ্রী অধিক। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কারণে শরীর-তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শরীরের সর্ব্বস্থলের তাপপরিমাণ একরূপ নহে। স্বাস্থ্যে শোণিতের তাপপরিমাণ ১০০° ফ.। কিন্তু শোণিত-সঞ্চালনের কেন্দ্র অপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থলে এবং শরীরের বহির্ভাগে তাপ অপেক্ষাকৃত কম। এই জন্য শরীরের অভ্যন্তর অপেক্ষা বহির্ভাগের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তাপ কম হইয়া থাকে। শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপপরিমাণ বুঝিবার জন্য রেকটম, কক্ষদেশ ও মুখগহ্বরে তাপ-মান যন্ত্র সংস্থাপন করা গিয়া থাকে। উক্ত তিন স্থলের তাপপরিমাণের প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কক্ষদেশে ৯৮°৬; রেকটমে ১° বেশি এবং মুখ-গহ্বরে, কক্ষদেশ অপেক্ষা বেশি কিন্তু রেকটম অপেক্ষা কিছু কম। রেকটম ও মুখ-গহ্বরের তাপপরিমাণ বোধ হয় এদেশে কিছু কম। ডাক্তার লরি (Laurie) কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি জেলের

কয়েদীদিগের তাপপরিমাণ দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে কক্ষদেশ অপেক্ষা রেকটমে ·৬°ফ. বেশি।

শরীরের অন্যান্য স্থলেরও তাপের পরিমাণ সন্দর্শিত হইয়াছে। ম্যারাগ্লিয়ানো (Maragliano) এবং সেপিলি (Seppili) মস্তকের তাপের পরিমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সন্দর্শন অনুসারে মস্তকের বাম দিকে তাপপরিমাণ ৯৭·৩°; দক্ষিণ দিকে ৯৬·৯ফ.। পিটার বলেন উদরের বহির্ভাগের তাপপরিমাণ ৯৫·৯ এবং বক্ষঃস্থলের ৯৩·৮। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থলের তাপপরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের সন্দর্শনের ফলের অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সন্দর্শনের ফল জ্ঞাত হওয়া যে আবশ্যক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রস্তাবের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় বলিয়া তৎসমুদায় পরিত্যক্ত হইল। ড্যাকষ্টা সাহেবের মেডিকেল ডায়গ্নসিস্ নামক পুস্তকে শরীরতাপ প্রসঙ্গে (Temperature of the body) এ বিষয়ের সবিস্তর বর্ণনা আছে।

যে সকল ডাক্তার ভারতবর্ষীয় লোকের শরীর-তাপ পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে ডাক্তার লরি এবং ক্লেবর্ণের সন্দর্শনের কিয়দংশ এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। ডাক্তার লরি * কর্ত্তৃক রেকটমের তাপ পরীক্ষিত হইয়াছিল। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেলের কয়েদিগণের শরীরতাপ পরীক্ষা করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কি দেশীয়, কি ইয়ুরোপীয় সকলেরই রেকটমের তাপপরিমাণ গড়ে ৯৯.২°ফ.। উক্ত সন্দর্শন প্রাতে ছয়টা, দিবা দ্বিতীয় প্রহরে, এবং অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকা, এই তিনটি সময়ে হইয়াছিল। তাহার পরীক্ষার ফল এই:—স্বাস্থ্যে প্রত্যূষে ছয়টার সময় কক্ষদেশের তাপপরিমাণ ৯৮.৩° ফ.; এবং সমস্ত দিবামানের মধ্যে সচরাচর দুই এক ডিগ্রী বেশি হইয়া থাকে। সেরূপ আধিক্য কোন পীড়ার পরিচায়ক নহে।

ডাক্তার ক্লেবর্ণের হস্তে একটা সিপাহী সেনা দলের চিকিৎসার ভার অর্পিত ছিল। শীত ও বসন্ত কালে তিনি সেই সমস্ত সৈনিকের শরীর-তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন †। প্রাতে ছয় সাতটা এবং অপরাহ্ণ পাঁচ ছয় ঘটিকায় সময় তিনি উক্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। তৎকর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী

---

* ডাক্তার লরি এক্ষণে লাহোর মেডিকেল স্কুলে শল্যচিকিৎসার অধ্যাপক। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট নামক মাসিক পত্রিকায় স্বাস্থ্যে তাপ পরিমাণ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এস্থলে তাহা দ্রষ্টব্য।

† এতদ্বিবরণ ডাক্তার ক্লেবর্ণ ১৮৭০ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসের ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন।

সুস্থকায় ৪৬৬ জন ব্যক্তির শরীর-তাপ পরীক্ষিত হইয়াছিল। সেই তাপের পরিমাণ প্রাতে গড়ে ৯৭.৮৫, এবং অপরাহ্নে ৯৮.৮৪°; প্রায় এক ডিগ্রীর প্রভেদ।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে প্রত্যূষে ৪ ঘটিকার সময় সুস্থ শরীরের তাপ এদেশে সর্ব্বনিম্ন পরিমাণে কমিয়া যায়। অস্মদ্দেশীয় কবিরাজগণ অতি পুরাকাল হইতে এই গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন এবং এই জন্যই তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে উক্ত সময়ে জীবের জীবনী শক্তি অধিকতম পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাণীদিগের, সেই সঙ্কটকালে শরীরের মধ্যে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। শরীরতাপের নিম্নতম হ্রাস কালে, জীবনীশক্তি যে অধিক পরিমাণে কমিয়া যায় তাহা অধুনাতন চিকিৎসকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। পৃথিবীর উপরিভাগ এবং বহির্বাষ্পের তাপপরিমাণ হ্রাস হওয়াতে জীবের শরীর-তাপ অধিক পরিমাণে ব্যয়িত হয়। অতএব এই সময়ে শরীরের তাপ রক্ষা বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয় স্থানান্তরে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে। ডাক্তার চেম্বার্স সাহেব এ বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন। অভিজ্ঞতাবলে তিনি যে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্বীয় ছাত্রমণ্ডলীকে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন নাই। উক্ত প্রত্যূষকালে আপনার চিকিৎসাধীন দুর্ব্বল রোগিগণের জীবনীশক্তিকে সংরক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই সময়ে তিনি তাঁহাদিগের প্রত্যেককে তাপ-রক্ষণোপযোগী এক খানি গাত্রবসন এবং কিয়ৎ পরিমাণে বলকারক ঔষধ ও আহার প্রদান করিতেন। তৎপ্রদর্শিত এই সুচারু পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তদীয় শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ অনেক রোগীর জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

শরীর-তাপ মাপিবার জন্য কোন্ স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এবং উপযুক্ত? কক্ষদেশ, মুখগহ্বর বা রেকটম? ইহার প্রত্যেক স্থলের সুবিধা অসুবিধা আছে। শেষোক্ত দুইটি স্থল শরীরের দুইটি গহ্বর, অনেক সময় বহির্বাষ্পের অবস্থান্তরে অবস্থান্তরিত হয় না। এই দুইটি স্থলের তাপের পরিমাণ লইলে শরীরের দুইটি গহ্বরের তাপপরিমাণ লওয়া হয়। কক্ষদেশও এক প্রকার গহ্বর। যখন বাহু দেহের সংস্পর্শে রাখা যায় তখন কক্ষদেশ একটি বদ্ধ গহ্বরের ন্যায় হইয়া থাকে; তথায় বহির্বাষ্পের কোন সংস্পর্শ থাকে না। কিন্তু বাহু যখন বিস্তারিত থাকে তখন বহির্বাষ্পের অবস্থানুসারে কক্ষদেশের তাপের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই জন্য বাহুর সংস্থাপনানুসারে তাপের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহির্বাষ্পের সংস্পর্শে কক্ষদেশ শীতল থাকিলে তাপের পরিমাণ কম দেখিতে পাওয়া

যায় এবং তাপমান যন্ত্র অনেকক্ষণ না রাখিলে শরীরের তাপ প্রকৃত রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় না। কক্ষদেশে সচরাচর দশমিনিট কাল তাপমান যন্ত্র সংস্থাপন করিলেই, যন্ত্রের আভ্যন্তরীণ পারদ যত দূর উঠিবার তাহা উঠিয়া থাকে। কিন্তু বহির্বাষ্পের সংস্পর্শে কক্ষদেশের তাপের হ্রাস হইলে, কক্ষদেশে যন্ত্রের মূলদেশ চাপিয়া রাখাতে, এই স্থলের তাপ বাড়িতে আরম্ভ করে ও সময়ে সময়ে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত যন্ত্রের পারা উঠিয়া থাকে।

মুখগহ্বরে ও রেকটমে বহির্বাষ্পের প্রভাবে তাপের তারতম্য প্রায়ই হয় না। এইজন্য এই দুই স্থলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাপের পরিমাণ লইতে পারা যায়। অনেক সময় দশ মিনিটকাল রাখিতে হয় না, পাঁচ মিনিটেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কক্ষদেশে তাপমান যন্ত্র সংস্থাপন করিবার যেমন সুবিধা রেকটমে ও মুখগহ্বরে সেরূপ নহে। কক্ষদেশে এই যন্ত্র রাখিতে কোন রোগীর আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল যখন রোগী অতিশয় শীর্ণ, তখন তাপমান যন্ত্র উত্তম রূপ বসাইতে পারা যায় না। অনেক ব্যক্তির কক্ষদেশে তাপমান যন্ত্র সংস্থাপন করিবার জন্য একটি যন্ত্র দ্বারাই কার্য্য সমাধা হইতে পারে, কিন্তু মুখগহ্বরে তাহা হওয়া সুসিদ্ধ নহে। এক ব্যক্তির মুখের ভিতর তাপমান যন্ত্র সংস্থাপন করার পর সেই যন্ত্র অন্য ব্যক্তি মুখগহ্বরে দিতে চায় না ও অতি রুগ্ন অবস্থায় মুখগহ্বরে তাপমান যন্ত্র সংস্থাপন করা সহজ নহে। বিশেষতঃ যখন রোগী অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, তখন মুখগহ্বরে এই যন্ত্র সংস্থাপন করা যাইতে পারে না। রেকটমে তাপমান যন্ত্র সন্নিবেশিত করায় বিশেষ আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগেরই অধিক।

নং—৩

পীড়ায় তাপের পরিমাণ।

সুস্থাবস্থ ব্যক্তির শারীর তাপ দিবা ও রাত্রি ভাগে যে গতিতে উত্থিত ও পতিত হয় তাহার ব্যত্যয় হইলে অনেক সময়ে পীড়াসূচক হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া স্বাভাবিক তাপ সকল সময় স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে। অনেক নূতন ও পুরাতন রোগে রোগীর শারীর তাপের হ্রাস বা বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহা ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। যত ক্ষণ তাপ উৎপাদন ও তাপক্ষয় অক্ষুণ্ণ ও সমভাবে হইতে থাকে, শারীর তাপ ততক্ষণ বাড়িতে পারে না; তাপোৎপাদনের বৃদ্ধিতে তাপের বৃদ্ধি, এবং তাপক্ষয়ের বৃদ্ধিতে তাপের হ্রাস হয়। পীড়ায় তাপোৎপাদনের বৃদ্ধির সহিত তাপ-ক্ষয় কম হইলে শারীর তাপ আরও অধিক বাড়িয়া উঠে। পীড়িতাবস্থায় তাপোৎ-

পাদন, ও তৎসঙ্গে তাপক্ষয় কার্য্য সুস্থাবস্থার ন্যায় হওয়া অসম্ভব নহে। এই জন্য পীড়ায়, সময়ে সময়ে, তাপের কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না;—ইহা ঠিক সুস্থাবস্থার তাপের ন্যায় থাকে। সময়ে সময়ে শরীরের বহির্ভাগের তাপ আভ্যন্তরীণ তাপ অপেক্ষা কম। বিসূচিকা রোগে ইহার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোগে শরীর যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কক্ষদেশের তাপ, স্বাভাবিক তাপ অপেক্ষা কম; কিন্তু আভ্যন্তরীণ তাপ সেরূপ নহে। সেই অবস্থায় রেক্টমের তাপ সময়ে সময়ে জ্বরতাপের সমতুল্য হইয়া থাকে।

তাপমান যন্ত্র দ্বারা রোগ ও রোগের ভাবী ফল নির্ণয়, এবং চিকিৎসার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।

১ম। রোগনির্ণয়।—রোগনির্ণয় বিষয়ে তাপমান যন্ত্র সর্ব্বদাই অনেক সহায়তা করিয়া থাকে। রোগীর ব্যাধি নিরূপণে এই যন্ত্র হইতে চিকিৎসক যে কতদূর সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এরূপ অনেক পীড়া আছে যাহাতে রোগীর বাহ্য-লক্ষণ দেখিয়া রোগ নিরূপণ করিতে পারা যায় না; সেই স্থলে তাপমান যন্ত্র বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। এক ব্যক্তির বক্ষের পার্শ্বদেশে হঠাৎ গুরুতর বেদনা হইল; বেদনা সেই স্থলে যেন শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল; কাশিতে গেলে বা জোরে নিশ্বাস লইলে বেদনা যেন দুঃসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। চিকিৎসক সেই ব্যক্তির নিকট আনীত হইলেন। বেদনার প্রকৃতি দেখিয়া এবং ইহার আকস্মিক আক্রমণের বিষয় শুনিয়া তিনি স্থির করিলেন যে হয় প্লুরিসি না হয় প্লুরোডিনিয়া হইতে সেই কঠোর ব্যথা জনিত হইয়াছে। এতদুভয় রোগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের লক্ষণসমূহ পরিস্ফুট হইলে, এই পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ। কিন্তু হয়ত চিকিৎসক এমন সময়ে আহুত হইয়াছেন যখন রোগনির্ণায়ক লক্ষণ-সমূহ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় নাই। প্লুরিসি একটি প্রাদাহিক পীড়া; কিন্তু প্লুরো-ডিনিয়া একটি অপ্রাদাহিক পীড়া। কাশিলে অথবা নিশ্বাস লইলে উভয়বিধ রোগেই বেদনা দুঃসহ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। হয়ত কাশি আছে। যদি তাহা থাকে, তাহা হইলে প্লুরিসি বলিয়া বোধ হইবে। কেননা কাশি প্লুরিসি রোগের একটি লক্ষণ। যদি তাহা না থাকে তাহা হইলে প্লুরো-ডিনিয়া হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্লুরো-ডিনিয়ার সঙ্গেও কাশি থাকা অসম্ভব নহে। সামান্য সর্দ্দি হইয়া রোগী অল্প অল্প কাশিতেছে এরূপ অবস্থায় বেদনা হইলে তাহা প্লুরিসি বা প্লুরোডিনিয়া হইতে জনিত হইয়াছে, তাহা তাপমান

যন্ত্র সহজেই মীমাংসা করিয়া দেয়। প্লুরিসি একটি প্রাদাহিক পীড়া; ইহার সঙ্গে জ্বর থাকে; প্লুরোডিনিয়া অপ্রাদাহিক এবং তাহার সহিত জ্বর থাকে না। বেদনার অন্য কোন লক্ষণ না থাকিয়া কেবল জ্বর থাকিলেই চিকিৎসক অনুমান করিয়া লইতে পারেন যে প্লুরিসি হইতে সে বেদনা জনিত হইয়াছে।

তাপমান যন্ত্র রোগ নির্ণয় বিষয়ে কিরূপ সহায়তা করে, এস্থলে তাহার আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে অধিকতর বিবরণ জানিতে হইলে, পাঠক ভিন্ন ভিন্ন রোগে তাপের ভিন্ন ভিন্ন গতি ও পরিমাণ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিবেন।

২য়। রোগের ভাবী ফল নির্ণয়।—রোগের ভাবী ফল কি হইবে? রোগ ভাল হইবে কি না? এ প্রশ্নের মীমাংসা কেবল তাপমান যন্ত্র দ্বারা সকল স্থলে স্থিরীকৃত হইতে পারে না। শারীর তাপ দীর্ঘকাল উচ্চ ভাবে থাকিলে অথবা অধিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিলে বিপজ্জনক বলিতে হইবে। সেইরূপ শারীর তাপ অধিক কমিয়া আসিলে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়। তাপের এই হ্রাস ও বৃদ্ধির সীমা আছে; সেই সীমা অতিক্রান্ত হইলে জীবন সংশয়াপন্ন হয় এবং অনেক সময় আরোগ্য লাভ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তাপের এই উচ্চতম বৃদ্ধি ও নিম্নতম হ্রাস সম্বন্ধে, শারীর তাপের বৃদ্ধি ও হ্রাসের বিষয় বর্ণন কালে বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে।

রোগের ভাবী ফল রোগীর শারীরিক অবস্থার উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে। দুর্ব্বল শরীরে তাপ অল্প বাড়িলে যেরূপ বিপজ্জনক, বলিষ্ঠ শরীরে সচরাচর সেরূপ নহে। যাহাদের মস্তিষ্ক সহজেই উত্তেজিত হয় শারীর তাপ অধিক উচ্চ হইতে না হইতে তাহাদের মস্তিষ্কবিকার উৎপাদিত হইয়া থাকে। মূত্রগ্রন্থির পীড়া থাকিলে অল্প জ্বরেই শরীর বিষাক্ত হইয়া জীবনকে সংশয়ান্বিত করিয়া তুলে। এতৎ সম্বন্ধে টাইফয়েড্ অবস্থা বর্ণনকালে বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে।

রোগের ভাবী ফল নির্ণয় করিবার সময় একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তাপের পরিমাণের সহিত নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্খ্যার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কক্ষদেশের স্বাভাবিক তাপ পরিমাণ সচরাচর গড়ে ৯৮.৬° এবং নাড়ী ও শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্খ্যা প্রতিমিনিটে ৭২ ও ১৮ বার। ইহা পূর্ব্বে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে তাপ ১° বাড়িলে নাড়ী ৮ বার অধিক বহমান হয় এবং ফুস্ফুসের কার্য্য ২ বার বেশি হইয়া থাকে। তাপ যতই বাড়ুক না কেন হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসের কার্য্য এই অনুপাতেই বাড়িয়া থাকে; সেইরূপ বাড়িয়া তাপ আবার কমিয়া আসিলে নাড়ী ও শ্বাসের সংখ্যা সেই অনুপাতেই কমিয়া আইসে। এতৎ

সম্বন্ধে নাড়ী বর্ণন কালে বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছে; এক্ষণে সেই সকল বিষয়ের পুনরালোচনা অনাবশ্যক। তবে তাপ বাড়িয়া, কমিয়া আসিলে তৎসঙ্গে নাড়ীর সঙ্খ্যা যদি নিয়মিত রূপে না কমে, তাহা হইলে যে চিন্তার কারণ এস্থলে তাহারই উল্লেখ করা গেল। উক্ত রূপ অবস্থায় অনেক সময়ে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা অথবা শোণিতের স্বল্পতা বুঝায়। শরীরে তাপ কমিবার কালে নাড়ীর সঙ্খ্যা বাড়িয়া উঠিলে রোগীর জীবনী শক্তির হ্রাস বুঝায়; তখন উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য বিধান না করিলে ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা।

উল্লিখিত বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে তাপমান যন্ত্র চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করে। ইহাদ্বারা তাপ বৃদ্ধির পরিমাণ ঠিক অবগত হইয়া, চিকিৎসক রোগের প্রতিবিধান করিতে পারেন; শারীর তাপ উচ্চ হইয়াছে অথবা আরও উচ্চ হইতেছে দেখিয়াই, যে যে উপায়ে আশু তাপক্ষয় করা যাইতে পারে, তাহা অবলম্বন করিতে পারেন; এবং তাপ কমিল কি না অথবা কতদূর কমিয়া আসিল তাহা এই যন্ত্র দ্বারা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারেন। নিঃশ্রবণ ও প্রস্রবণের বৃদ্ধি সাধন, ও শৈত্য প্রয়োগ তাপ কমাইয়া আনিবার প্রধান উপায়। বিপদসূচক শারীর তাপের বিপক্ষে চিকিৎসক যখন এই সকল উপায় অবলম্বন করেন তখন তিনি তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে, কার্য্যের ফল যত সুচারু রূপে জানিতে পারেন, তত আর কিছুতেই নহে। তাঁহাকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে হয় না; তিনি ঠিক প্রয়োজন মত তাপ কমাইয়া আনিতে পারেন।

উচ্চ শারীর তাপ বিপজ্জনক বটে, কিন্তু অনেক সময় একেবারে কমাইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে গেলে রোগীকে বিপন্ন করা হয়। টাইফস্ ও টাইফয়েড্ প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ায় শারীর তাপ এক নির্দ্ধারিত কাল উচ্চভাবে থাকে; এরূপ স্থলে চিকিৎসক তাপের পরিমাণ কমাইতে পারেন বটে কিন্তু কমাইয়া একেবারে স্বাভাবিক করিতে চেষ্টা করেন না; কেননা তাহা করিলে অনেক সময় রোগীকে বিপদে পাতিত করা হয়। এই সকল পীড়া, নির্দ্ধারিত ভোগ কাল অতীত হইলে আপনিই ভাল হইয়া আইসে। কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে তাপ অধিক কমাইতে পারা যায়। জ্বর সামান্য থাকিলে নাড়ী পরীক্ষা ও গাত্রস্পর্শে তাপ-পরিমাণ সময়ে সময়ে বুঝিতে পারা যায় না। শরীরস্পর্শে তাপ অনুভব করা একটি আপেক্ষিক অনুভূতি মাত্র; চিকিৎসকের হস্তের তাপ অধিক থাকিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাপমান যন্ত্র নির্দ্ধারিত প্রণালীতে সন্নিবেশিত হইলে সেই ভুল হইতে পারে না।

বাঙ্গালীর ভীরুতা।

মৃত্যু-ভয়ের তুল্য ঘোরতর যন্ত্রণাদায়ক আধি আর কিছুই নাই। অতএব যে ব্যক্তি নিরন্তর মৃত্যু-ভয়ে বিহ্বল তাহার পক্ষে মৃত্যুই মঙ্গল—জীবন ধারণ তাহার বিড়ম্বনা। যে অভাগা প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে, জীবন্মৃত হইয়া

দেহভার বহনাপেক্ষা মৃত্যু কি তাহার বাঞ্ছনীয় নয়? মৃত্যু হইলেইত সকল পার্থিব যন্ত্রণার অবসান হইল—তবে মৃত্যুকে ভয় কি? মৃত্যু যখন এক দিন নিশ্চয় অবধারিত রহিয়াছে, তখন মৃত্যুকে ভয় করা কেন?

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ
ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।"

এপিকিউরস বলেন—

"When death comes we are no more either to suffer or to enjoy. Yet it was the groundless fear of this nothing that poisoned all the tranquillity of life and held men imprisoned even when existence was a torment. Whoever had surmounted that fear was armed at once against cruel tyranny and against all the gravest misfortunes."—*Bain.*

যে হতভাগা ব্যক্তি সর্ব্বদা মৃত্যু-ভয়ে কাতর, লোকে তাহাকে ভীরু বা কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে এবং যথার্থই সে ব্যক্তি উপহাসের যোগ্য। প্রণয়ে সন্দেহ যেমন বিষম বিষময় ভীরুতাও সেইরূপ সর্ব্ববিধ যন্ত্রণার আকর। প্রণয়ে সন্দেহ অকারণ বলিয়া উপহাস্য। ভীরুতাও সেই জন্য বিদ্রূপ-যোগ্য ও ঘৃণার্হ। বাঙ্গালীকে সেই জন্যই অন্যান্য জাতীয়েরা ঘৃণা ও বিদ্রূপ করিয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে ব্যক্তি যে পরিমাণে দৈহিক যন্ত্রণা, নির্যাতন ও অপমান সহ্য করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে মৃত্যুকে ভয় করে, সে সেই পরিমাণে ভীরু। বাঙ্গালী সর্ব্বাঙ্গে বাণ ফুড়িয়া সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া নিজ-রুধির-প্লাবিত কলেবরে বাদ্য সহ আনন্দে নৃত্য করিতে পারে, পিঠ ফুড়িয়া চড়ক গাছে ঘুরিতে পারে কিন্তু একটা সামান্য যবন তর্জ্জন করিলে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। প্রভু লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গাত্রের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে সেলাম করিয়া থাকে এবং মাতাল দেখিলে শত হস্ত তফাৎ দিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে প্রস্থান করে।

"হস্তী হস্তসহস্রেণ শত হস্তেন বাজিনঃ।
শৃঙ্গিণো দশ হস্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ॥"

চাণক্যের এই শ্লোকটি বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভীরুতা অন্যান্য জাতি মধ্যে, ব্যক্তি বিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর ইহা জাতিগত রোগ, বাঙ্গালীর ন্যায় ভীরু আর কোন জাতিই নহে। এবম্প্রকার জাতিগত ভীরুতা, কেবল আমাদের দৈহিক দুর্ব্বলতা ও কুশিক্ষার ফল। যে কোন কার্য্যে কায়িক বলের আবশ্যক সে কার্য্যে বঙ্গবাসিগণ কখনই প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইবে না। বাঙ্গালী প্রতি মুহূর্ত্তে আপনার দুর্ব্বলতা অনুভব করে, তাই বাঙ্গালীর সাহস নাই, তাই সে দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ পাঠান বা প্রমত্ত গোরা দেখিলে ভয় পায় ও তাহাদিগকে দানব বা দৈত্যের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে। মৃগ যেমন সর্ব্বদা প্রবল পরাক্রান্ত সিংহ ব্যাঘ্রের পথ ছাড়িয়া দূরে অবস্থান করে আমরাও ঠিক সেই রূপ পাঠান বা গোরাদিগকে সর্ব্বদা দূরে পরিহার করি। তাহারা প্রহার করিলে প্রতিশোধ লইতে আমাদের সাহস হয় না। প্রহার অপমান সকলই আমরা সহ্য করি—দুর্ব্বল বলিয়া সহ্য করি—মরিতে ভয় করি বলিয়া সহ্য করি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে—"তোমরা এত দুর্ব্বল কেন?" আমরা আমাদের দেশের দোষ দিয়া

বলিয়া থাকি যে এদেশের জলবায়ু খারাপ তাই আমরা দুর্ব্বল। স্বীকার করি আমাদের দেশের আব-হাওয়া ভাল নয়। যে দেশ অনন্তুতুষারমণ্ডিত সহস্র-নিম্নগা-জনক হিমাদ্রির পাদমূলে এবং অতলস্পর্শ, অনন্তজলরাশি সাগর-কূলে সংস্থিত; যে দেশ অগণ্য নদ নদী, ও শৈবালসংকুল অসংখ্য হ্রদ, তড়াগ-সমাকীর্ণ; যে দেশে চারিমাস ঘোরতর বর্ষার পর ক্রমাগত চারিমাস অবিশ্রান্ত নিহার প্রপাত হয় এবং যে দেশের মৃত্তিকা কখনও শুষ্ক হইতে দেখা যায় না সে দেশের জলবায়ু দূষিত হইবে ইহা বিচিত্র কি? কিন্তু যথার্থই কি কেবল জলবায়ুর দোষে আমরা দুর্ব্বল? আমরা যে প্রকার আহার করি, যে প্রকার বস্ত্র পরি, যে প্রকার শয্যায় শয়ন করি এবং যে প্রকার গৃহে অবস্থান করি তাহাতে কি আমাদের সুস্থ থাকিবার কথা? আমাদের শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবার কথা? পুরাতন সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্নে সার পদার্থ কি আছে? শাক কচু, লাউ কুমড়া, আমড়া তেঁতুল, কি পথ্য? না মৎস্য স্বাস্থ্যকর খাদ্য? দুগ্ধ উত্তম বটে কিন্তু দুগ্ধ কি আমাদের সকলের অদৃষ্টে ঘোটে? যুটিলেও আমরা তাহা বিকৃত করিয়া খাই—ছানা করিয়া, ক্ষীর করিয়া দধি করিয়া খাই। ক্ষীর, ছানা, দধি কি কুখাদ্য নহে? যাহা বলকর তাহা আমরা কৈ খাই? মাংস আমরা কৈ খাই? ডিম্বব্যবহার ত আমাদের আদৌ নাই। আটা ময়দাও আমরা অনেকেই খাই না।

"Observe the various operations
"Of food and drink in several
nations.
"Was ever Tartar fierce or cruel
"Upon the strength of water-gruel?
"But who shall stand his rage and
force,
"If first he rides, then eats his
horse?
"And if I take Don Congrene
right
"Pudding and beef make Britons
fight."

পানীয়ে বা অদনে অধিক পরিমাণে মৃদংশ থাকিলে শোণিতপ্রবাহ অবরুদ্ধ হয়। শোণিত, শরীরমধ্যে অবাধে সঞ্চালিত না হইতে পারিলে দূষিত হইয়া নানা প্রকার রোগ উৎপাদন করে। শোণিতই আমাদের জীবন অতএব যে সকল খাদ্যে শোণিত প্রবাহের ব্যাঘাৎ না জন্মে সেই সকল খাদ্যই আমাদের খাওয়া উচিত। মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ ও দ্রাক্ষারসে মৃদংশ কম পরিমাণে থাকে অথচ এ সকল খাদ্য যৎপরোনাস্তি বলকর, বিশেষ মাংসের ন্যায় বলকর খাদ্য আর কিছুই নাই কিন্তু মাংস আমরা আদৌ খাই না। যাহা কিছু পুষ্টিকর, যাহা কিছু বলকর, তাহা আমরা প্রায়ই খাই না। তবে আমরা বলিষ্ঠ আর কিসে হইব? মাংসের তুল্য বল-কর ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য আর কিছুই নাই, মাংস যেমন শীঘ্র হজম হয় এমন আর কোন পদার্থই নহে। একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন—

"Animal food being composed of the most nutritious parts of the food on which the animal lived, and having been already digested by the proper organs of an animal, requires only solution and mixture, whereas vegetable food must be converted into a substance of an animal nature by the proper

action of our own viscera, and consequently requires more labour of the stomach and other disgestive organs."

খাদ্য সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ডিক্‌শন্ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The most cursory examination of the human teeth, stripped of every other consideration should convince any body with the least pretension to brains that the food of man was never intended to be restricted to vegetables exclusively."

মাংসভোজী জীবমাত্রেই উদ্ভিজ্জভোগী প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর বলবিক্রমশালী। সিংহ ব্যাঘ্রের নিকট বৃহদাকার হস্তীও পরাভূত হয়। কুক্কুর বিড়াল স্বাধীন কিন্তু হাতী ঘোড়া পরাধীন—গাধা, গরু পরাধীন। যাহারা উদ্ভিজ্জমাত্রভোজী তাহারা সকলেই ভীরু এবং ভীরু বলিয়া ঘৃণিত। সিংহ ব্যাঘ্রের কথা ছাড়িয়া দাও, পক্ষিরাজ বাজের কথা ছাড়িয়া দাও, মাংশভোজী কুক্কুর বিড়ালও যথেচ্ছা সুখে বিচরণ করে, কিন্তু হাতী ঘোড়া ভারবাহী পশু—পদবাচ্য। বঙ্গদেশবাসী মুসলমানেরাও বাঙ্গালী হিন্দুদিগের অপেক্ষা বহুগুণে বলিষ্ঠ ও সাহসী—তাহারা মাংস খায় বলিয়া বলিষ্ঠ, মাংস খায় বলিয়া সাহসী।

একজন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন—

"If I were to be charged with the special mission of degrading a nation in mind and body—stunting the form and weakening in the same proportion, the mental and moral nature—there is no way in which I could so readily accomplish my object as through food."

এই কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিব'র নিমিত্ত আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না, আর্য্যজাতির অবনতির ইতিহাসই, উচ্চৈঃ স্বরে, ইহার সারবত্তার পরিচয় দিতেছে।

হিন্দু আর্য্যগণ যত দিন মাংস খাইয়াছিল তত দিন ভারতে আধিপত্য করিয়াছিল। কিন্তু কুক্ষণে বুদ্ধদেব যে দিন ভারতে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" প্রচার করিলেন সেই দিন হইতেই ভারতের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। ঐ "অহিংসা পরমো ধর্ম্মই" ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। ঐ "অহিংসা পরমো ধর্ম্মই" ভারতবাসীদিগকে উদ্যমশূন্য, উৎসাহশূন্য, নির্বীর্য্য, নির্জীব, ক্লীবতুল্য করিয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে আমরা পুরুষানুক্রমে যে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি; চাণক্য পণ্ডিত বালকবৃন্দের উপদেশ জন্য যে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, আমাদের পিতামহীগণ যে জুজু ও জটেবুড়ীর গল্প রচনা করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমরা আশৈশব ঘরে, বাহিরে, ও বিদ্যালয়ে যে প্রকার শিক্ষা লাভ করিতেছি তাহাতে আমাদের সাহসী বা বিক্রমী হইবার সম্ভাবনা কোথা? আমরা যে ভীরু ও নীচপ্রকৃতি হইব তাহার আর বিচিত্র কি? যেমন গুরু তেমনই শিষ্য—যেরূপ শিক্ষা সেইরূপ কার্য্য, ইহাত প্রসিদ্ধই আছে। পূর্ব্বকার আর্য্যগণ যে প্রকার শিক্ষা পাইয়াছিলেন সেইরূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তখনকার অবলাগণও নিজ নিজ আত্মজদিগকে যেরূপ উপদেশ দিতেন শুনিলে আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হইতে হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাভারত হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

* পূর্ব্বকালে বিদুলানাম্নী এক দীর্ঘদর্শিনী যশস্বিনী রাজনন্দিনী ছিলেন। তিনি আপন ঔরসপুত্রকে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক বিনির্জ্জিত হইয়া উদ্যমশূন্য বিষণ্ণ চিত্তে শয়ান থাকিতে দেখিয়া এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন—"রে শত্রুনন্দন, তুমি আমার নন্দন নও, আমার গর্ভেও তোমার জন্ম হয় নাই এবং তোমার পিতাও তোমার উৎপাদন করেন নাই; তুমি কুলের কণ্টক-স্বরূপ হইয়া কোথা হইতে আসিয়াছ, বুঝিতে পারি না। তোমার না আছে সংরম্ভ, না আছে পুরুষকার; তোমার আকার, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি সকলই ক্লীবের ন্যায়; তোমাকে পুরুষ বলিয়া গণনা করাই অবিধেয়; তুমি চিরকালের নিমিত্ত একেবারে নিরাশ হইয়া বসিয়াছ? রে দুর্ব্বুদ্ধে, যদি কল্যাণের কামনা থাকে, তবে এখনও পুরুষোচিত চিন্তাভার বহন কর। অল্প দ্বারা পরিতৃপ্ত রাখিয়া অপরিমেয় আত্মাকে অনর্থক অবমানিত করিও না। নির্ভীক হও; উৎসাহ ও অধ্যবসায় দ্বারা দৃঢ়তর করিয়া শঙ্কাপহৃত চিত্তের প্রতিসংহার কর। রে কাপুরুষ! পরাজিত, মানশূন্য এবং বন্ধুবর্গের শোকপ্রদ হইয়া অখিল অরাতিদলের আনন্দ বর্দ্ধন করত এইরূপে শয়ন করিয়া থাকিও না; শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্নগা সকল যেমন অল্প জলেই পরিপূর্ণা হয় এবং মূষিকের অঞ্জলি যেমন অল্প দ্রব্যেই পূর্ণ হইয়া উঠে, সেইরূপ কাপুরুষেরাও অত্যল্পমাত্রে পরিতৃপ্ত হওয়ায় সহজেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। রে কুলাঙ্গার, বরং কুপিত বিষধরের দন্তোৎপাটন করিয়া নিহত হও, তথাপি কুক্কুরের ন্যায় নীচভাবে নিধন প্রাপ্ত হইও না। জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়াও বিক্রম প্রকাশ কর।"

এ প্রকার শিক্ষা এখন কি আর আমরা কুত্রাপি পাইয়া থাকি? জননী হইয়া সন্তানকে বলিতেছে—হয় আপনার গৌরব রক্ষা কর, নয় নিতান্ত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হও—এরূপ তেজস্বিনী জননী ভারতে এখন কি আর আছে? রমণীর কথা দূরে যাউক, বাঙ্গালীর কথা দূরে যাউক, দৃঢ়কায় পঞ্জাবী ও বলবান রাজপুতদিগের মধ্যেও কি এ প্রকার তেজস্বিতা লক্ষিত হয়? ভারতবাসিগণ বহুকাল পরাধীন থাকিয়া, যাহা কিছু ভীরুতার মহৌষধ তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে—তাহারা আত্মমর্য্যাদা, স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশবাৎসল্য ও স্বধর্ম্মানুরাগ—যাহাতে মানুষের উৎসাহ, সাহস ও তেজস্বিতা বৃদ্ধি হয় তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা বহু দিন পরাধীন থাকিয়া অপমান ও নির্য্যাতন সহিষ্ণু হইয়া ভীরু হইয়া পড়িয়াছে।

শিক্ষা দ্বারা ভীরুতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে, ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস এবং সমস্ত মানবজাতির ইতিহাসেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিতেছে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অতীব কদর্য্য ও অসম্পূর্ণ, অতএব অগ্রে এই শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার না হইলে এবং স্ত্রীশিক্ষার যথোচিত উন্নতি না হইলে আমাদের ভীরুতা অপনীত হইবার অতি অল্পই সম্ভাবনা আছে।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

---

* বর্দ্ধমানাধিপতি কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্ব ২২৭পৃষ্ঠা দেখ।

শতবর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ।

৫

পল্লীগ্রাম।

এক শত বৎসর আগে যিনি বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আজি যদি তিনি আর একবার আসিয়া দেখিতে যান, দেখিবেন, আর তেমন পল্লী নাই। এখন কোন স্থান নরক ঘুচিয়া স্বর্গ হইয়াছে; কোন স্থান স্বর্গ ছিল, আজি সেখানে নরকের বাজার বসিয়াছে। শতবর্ষের উন্নতি এবং অবনতি কেমন স্পষ্ট, আজি পাঠককে তাহাই দেখাইব।

বাঙ্গালার প্রায় সকল পল্লীগ্রামের চতুর্দ্ধারে বিস্তীর্ণ মাঠ। বৈশাখ মাসে দুইপ্রহরের সময় দাঁড়াইয়া দেখ, চারি দিক ধূ ধূ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে জল সেঁচিবার এক একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পাড়ে বট অশ্বত্থের গাছ। রাখালেরা গোরু ছাড়িয়া দিয়া ছায়ায় খেলা করিতেছে। দুরন্ত বালকেরা চালে উঠিয়া লাফ দিতেছে। কেহ গাছের কোঠরে হাত পুরিয়া পাখীর ছানা পাড়িতেছে। কোন ছেলের হাতে পাখীর খাঁচা। কেহ কেহ অর্দ্ধশুষ্ক ঘাসের উপর খেজুরের ঝাটী বুলাইয়া পাখীর জন্য ফড়িং মারিতেছে। কাহারও আহার হয় নাই, কোঁচড়ে হাত ভরিয়া থাবা থাবা ভিজান চাউল খাইতেছে। কাহারও গুড় মুড়ী খাওয়া হইয়াছে, জল খাইবার জন্য পুকুরে নামিতেছে। কেহ কেহ একহাঁটু জলে দাঁড়াইয়া দুই হাতে অঞ্জলি পূরিয়া জলপান করিতেছে। কতকগুলা ছেলে পাড়ে কাপড় ফেলিয়া জলে সাঁতার দিতেছে। কেহ কেহ ডুব দিয়া মৃণাল তুলিতেছে, কেহ কেহ পথে চাকী ভাঙ্গিয়া খাইতেছে। কোন কোন পুষ্করিণীতে বাগ্দী ও কৈবর্ত্তের স্ত্রীলোকেরা কাঁকালে হাঁড়ী বাঁধিয়া ঝিনুক, শামুক, গুগ্লী ও পেঁকো মাচ ধরিতেছে। কোন পুষ্করিণীতে এ সকল কিছুই নাই। সেখানে ধোবা মাথায় চাদর বাঁধিয়া হুস্ হাস্ করিয়া কাপড় কাচিতেছে। ধোবানীর কাঁধে ভিজা কাপড়ের বোঝা, পাড়ের উপর কাচা কাপড় মেলিয়া দিতেছে। গোবৎস রৌদ্রে অনেকক্ষণ চরিয়া বৃক্ষের ছায়ায় জাবর কাটিতেছে। কোথাও পয়স্বিনী ধেনু বাছুরের গা চাটিতেছে। মহিষের গায়ে রৌদ্র সহে না, তাহারা জলে সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া আছে।

এমন সময়ে মাঠে বড় একটা ফসল থাকে না। কচিৎ কোথাও কৃষকেরা ক্ষেত্রে আকের বীজ বসাইতেছে। বালকেরা ডগার টিকলী কুড়াইয়া খাইতেছে। বেলা দুই প্রহর অতীত।

অসময়ে ভোজন করিলে কৃষকদের পিত্তবৃদ্ধি হয় না। পিত্তবৃদ্ধি ভদ্র লোকদের জন্য। চাষের সময়ে কৃষকদের ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে থাকে না। কষ্টের অবস্থায় শরীরে না সহিলেও সকলই সহাইতে হয়। রৌদ্রে বসিয়া সকলে অধিকক্ষণ শ্রম করিয়াছে, ললাট বহিয়া দর দর ঘর্ম্মধারা ছুটিতেছে। কেহ কেহ কলিকায় তামাকু সাজিতেছে, কেহ চকমকী ঠুকিতেছে, কেহ নুড়া হইতে আগুন ভাঙ্গিতেছে। কেহ বা তামাকু টানিতে টানিতে পথপানে চাহিয়া আছে। কাহারও দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা, কাহারও যুবতী ভার্য্যা, কাহারও বৃদ্ধ মাতা পাথর ভরিয়া ভাত আনিতেছে।

এখন মাঠের মধ্যে পথিকের বড় রহট নাই। টোলের অধ্যাপকমহাশয় বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কোথায় নিমন্ত্রণ গিয়াছিলেন,রৌদ্রে পুড়িতে পুড়িতে শিষ্যদের সঙ্গে গৃহে আসিতেছেন। মুণ্ডিত মস্তক ভিজা গামোছায় ঢাকা, তাহার উপর তালপত্রের ছত্র। কাঁধে নামাবলী, হাতে চটী জুতা; ধুলা উড়িয়া হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিতেছে। ভট্টাচার্য্যমহাশয় রৌদ্রের উত্তাপে অতিশয় কাতর হইয়াছেন, এক এক বার "ত্রাহি মাং মধুসূদন" বলিয়া ডাক ছাড়িতেছেন। পশ্চাতে শিষ্যগণ। তাহাদের সকলের মাথায় ছত্র নাই। কেহ দোবজায়, কেহ গামোছায় মস্তক ঢাকিয়া যাইতেছে,—হাতে সরাপূর্ণ চিনি ও সন্দেশ।

মাঠের মধ্য দিয়া যে দিকে সচরাচর দূরের পথিকেরা যাতায়াত করে, গ্রামের পুণ্যবান্ ধনাঢ্য ব্যক্তি তথায় জলসত্র দিয়াছেন। একটী পুরাতন বট কিম্বা অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে দোচালা কুটীর বাঁধা। তন্মধ্যে সারি সারি জালাপূর্ণ কর্পূরবাসিত সুশীতল জল। কলসী-পূর্ণ গুড়, গামলায় ছোলা ভিজিতেছে। চারি পাঁচটা লোটা, দুই তিনটী চুমকী, দুই তিনটী ঝারী, পাঁচ সাতখানি রেকাবী। হুঁকা, তামাকু; নিকটে আগুন জাগিতেছে। কুটীরের পাশে দুইহাত উচ্চ বাঁশে স্তম্ভ, স্তম্ভে চোঙ্গা বাঁধা। ভদ্র পথিকেরা আসিয়া হুঁকায় তামাকু খাইতেছেন, কেহ পা ধুইতেছেন। তাঁহাদের জন্য রেকাবীতে ও চুমকীতে জলখাবার আয়োজন হইতেছে। ইতর লোকেরা হাতে করিয়া গুড় ছোলা লইতেছে এবং কেহ ঝারীর নলে, কেহ বাঁশের চোঙ্গায় জলপান করিতেছে। জলসত্রের অনুচরেরা ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে, সন্ধ্যা না হইলে অবকাশ নাই।

ক্রমে ভূমির আলি দিয়া, ক্ষেত্রের উপর দিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে উপস্থিত। এইবার দুই একখানি ঘরের চাল দেখা যাইতে লাগিল। গ্রামের প্রান্তভাগে স্থানে স্থানে বড় বড় পুষ্করিণী, পুষ্করিণীর পাড়ে বাবলা বন, তেঁতুল বন ও বৃহৎ বৃহৎ তালবৃক্ষ। তালবৃক্ষের শুষ্কপাতা রৌদ্রের সময় বাতাস লাগিয়া ঝন্ ঝন্

করিতেছে। ভট্টাচার্য্যমহাশয় আহারের পর বহির্দ্দেশে গিয়াছিলেন; মাথায় ভিজা গামোচা, দক্ষিণ হস্তে গাড়ু, কাণে যজ্ঞোপবীত, বাম হস্ত উঁচ করিয়া ঘাটে যাইতেছেন,—হস্তমৃত্তিকা করিবেন। পথের ধারে সারি দিয়া কুলকামিনীগণ মলমূত্র ত্যাগ করিতেছিলেন। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় আসিয়াছেন, তাই সকলে উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। এ কুপ্রথা এখনও সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। গৃহের লক্ষ্মীদেবীরা এ দিকে লজ্জায় বাঁচেন না। ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া থাকেন; কিন্তু মলমূত্র ত্যাগ করিবার সময়, সদর পথ ও সদর পুষ্করিণী ভিন্ন তাঁহাদের অঙ্গশুদ্ধি হয় না।

ভট্টাচার্য্যমহাশয় পুষ্করিণীতে উপস্থিত। দেখেন, একঘাট স্ত্রীলোক। কেহ পা মেলিয়া তেল হলুদ মাখিতেছে, কেহ আমলা ও মাটী দিয়া মাথা ঘসিতেছে, কেহ জলে পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ মাজিতেছে। কাহারও ছেলে জলে ঝাঁপাইতেছিল, সে তাহার হাত ধরিয়া তুলিতেছে। কেহ কলসীতে জল ভরিতেছে, কেহ কাঁসার পাঁইচা তেঁতুল দিয়া মাজিতেছে, কেহ হাতের শঙ্খ পরিষ্কার করিতেছে কিন্তু কাহারও মুখ বন্ধ নাই। ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ এই স্নানের ঘাটে। ঘোষালদের গিন্নী ঠাকুরাণী বউগুলাকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। হালদারদের বড় বউ উত্তম রন্ধন করে। মিত্রদের কর্ত্তা মরিয়া ভূত হইয়াছেন, গত রাত্রিতে বউগুলা দেখিয়াছে। রামী বৈষ্ণবী ডাইনের মন্ত্র জানে, সে ছেলে খায়। এই স্নানের ঘাটে সংবাদের আর বাকি নাই। ও দিকে পুষ্করিণীর ঈশান কোণে গোরা মণ্ডল কাছা হাতে করিয়া বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে, জলে নামিতে পারিতেছে না। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় কি করেন, তিনি নববধুর চেয়েও লজ্জায় অধিক জড় সড় হইয়া মাথা হেট করিয়া পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে হস্তমৃত্তিকা করিলেন। স্ত্রীলোকদের ভ্রূক্ষেপ নাই।

সে কালে দশটা বেলা ছিল না, দশটা বেলা কাহাকে বলে বাঙ্গালীরা সে কথা বুঝিতেন না। তখন দশটার ভোজনও চলিত ছিল না। সে সময়ে বাঙ্গালীরা প্রহর বুঝিতেন। ঘড়ী বুঝিতেন। যাঁহারা পরের চাকুরী করিতেন, দশটার সময় ভোজন করিয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্ম-স্থানে ছুটাছুটি করিয়া যাইতে হইত না। সেকালে বাঙ্গালীদের পরের সেবা, পরের চাকুরী অতি অল্পই ছিল। যাঁহারা করিতেন, সে সকল লোক দশটা বাজিলে কর্ম্মস্থানে যাইতেন না। বেলা দেড় প্রহর হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত হিন্দুদের পূজা আহ্নিকের সময়। এখনকার বাঙ্গালীরা আস্তিকও নন নাস্তিকও নন। তাঁহাদের পূজা আহ্নিক নাই, নিয়মিত দেবার্চ্চনা নাই। ভগবানকে যাঁহারা ভক্তি করেন, এ যুগের তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী। শৈশব কাল হইতে চক্ষের উপর সোণার ডাঁটীর

চস্‌মা পরিতে পারিলে এবং গালভরা দাড়ী গোঁপ রাখিলে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়। আজি কালি কতকগুলি নব্য-সম্প্রদায়ের লোক এই পরম পথে দাঁড়াইয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া আমরা এমন ভরসা করিতে পারি, আর কিছু দিন পরে বালকেরা পরচুলা পরিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে।

বাঙ্গালায় অতিশয় গ্রীষ্ম। চৈত্র বৈশাখ মাস আসিলে রৌদ্রে পাতাল পর্য্যন্ত পুড়িয়া যায়। এ দেশে দুই প্রহরের সময় ভোজনাদি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা উচিত। তাহা হইলে ভুক্ত দ্রব্য অনায়াসে জীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু সে নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। যে দেশে বেলা এক প্রহরের সময় সূর্য্যোদয় হয়, প্রাতঃকালে হাড়ভাঙ্গা শীতে কেহ গৃহের বাহিরে আসিতে পারে না, শীতল বাতাসে শোণিত মাংস জমিয়া যায়, সেই থানে দশটা হইতে পাচটা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হয়। ইহার পূর্ব্বে কিম্বা পরে হিমের প্রকোপে জড় সড় হইয়া কাজ করা সুকঠিন। দেশকাল পাত্র বুঝিয়া সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের সে বিবেচনা নাই। তাই হিমরাজ্যের নিয়ম এ দেশে চলিয়াছে। এখন ভোজনান্তে কেহ বিশ্রাম করিতে পান না, তাই কোন ব্যক্তির আর পূর্ব্বের মত আহারশক্তি নাই। একমুষ্টি চাউলের অন্ন ভোজন করিলেই পেট ফুলিয়া উঠে। তাহার পর অম্ল ও অজীর্ণরোগ প্রায় ষোল আনা লোকের ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীরা প্রাতঃকালে আপনার কর্ম্মস্থানে যাইতেন। দেড় প্রহর বা দুই প্রহরের সময় গৃহে আসিয়া দেবপূজাদি নিষ্পন্ন করিয়া ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে কেহ বিশ্রাম করিতেন, কেহ পাশা শতরঞ্জ ও তাস খেলিতেন, কোন কোন ব্যক্তি পুরাণাদি পাঠ করিতেন। ফলতঃ এ সময়ে কঠিন পরিশ্রম করার রীতি আদৌ ছিল না।

তখন ঘড়ী ধরিয়া নিয়মিত সময়ে রন্ধন করিতে হইত না বলিয়া স্ত্রীলোকেরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। ছোট ছোট বালকদের জন্য পান্তভাত থাকিত। তাঁহারা প্রাতঃকালে মুড়ী মুড়কী ও গুড় খাইতে খাইতে গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় যাইত, একপ্রহর বেলার সময় পর্য্যুষিত ভাত খাইত। আবার বেলা আড়াই প্রহর কিম্বা তিন প্রহর বাজিলে গরম ভাত খাইত। বাটীর বিধবা স্ত্রীলোক ভিন্ন আর আর সকলেরই এইরূপ খাদ্যের নিয়ম ছিল। সুতরাং তখনকার স্ত্রীলোকেরা দুই দণ্ড এক স্থানে বসিয়া গল্প করিতে পাইতেন। স্নানের ঘাটে সকল রকমের মেয়ে আসিয়া মিলিত হয়, তাই সেখানে গল্প করিতে কিছু সুখ জন্মে।

স্নানের ঘাটের নিকটেই গ্রামদেবতার

পীঠ। বৃহৎ বট অশ্বথ কিম্বা অন্য কোন বৃক্ষে সিন্দুর চন্দন মাখান। গোড়ায় ছোট বড় নানা আকারের লোড়ালুড়ী পড়িয়া আছে। এই গ্রাম-দেবতা একরকম নন। কোথাও তাঁহার নাম পঞ্চানন, কোথাও মহাকাল, কোথাও ওবরাসুর।

গ্রামদেবতা গ্রাম রক্ষা করেন। বিপদকালে তিনিই গ্রামবাসীদের সহায়। মহামারী হউক, অন্য কোন বিঘ্ন বিপত্তি হউক, গ্রামবাসীরা এই দেবতার পূজা মানন করেন। পরে মনস্কামনা পূর্ণ হইলে ছাগ মেষ বলি দিয়া বৃক্ষমূলে পূজা হোমাদি শেষ করিতে হয়।

এইবার গ্রামের সীমা। পল্লীগ্রামের প্রান্তভাগে ভদ্র লোকের বাস নাই। হাড়ী, ডোম, চণ্ডাল, মুচী প্রভৃতি ইতর লোকেরা এখানে বাস করে। তাহাদের বাটীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নাই; রাংচিত্রে, বাঘাভেরেণ্ডা প্রভৃতি বৃক্ষের বেড়ায় বাড়ী ঘেরা। গৃহের মধ্যে একখানি কি দুইখানি দোচালা কুটীর,—তাহা তালপত্রে ছাওয়া। উঠানে বৃহদাকার কুকুর। অপরিচিত লোক দেখিলেই ভেউ ভেউ করিয়া ডাকিয়া উঠে। কুকুর ডাকিলে কামড়ায় না, ত্রাসে কাছে আসিতে পারে না। দূর হইতে গর্জ্জন করে, যষ্টি কি লোষ্ট্র তুলিলেই পলাইয়া যায়। ক্রমে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে দুই চারিজন ভদ্র লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। যাঁহার সঙ্গে দেখা হইতেছে তিনিই জিজ্ঞাসা করিতেছেন "মহাশয়ের নিবাস?" পল্লীগ্রামে অদ্যাবধি অপরিচিত লোক গেলে তাঁহার রক্ষা থাকে না। গ্রামবাসীদের পরিচয় দিতে দিতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়।

বেলা আড়াই প্রহর অতীত হইয়াছে। এ সময় পল্লীগ্রাম কতকটা নিশ্চিন্ত। কৃষকদের কতকগুলি গোরু মাঠে চরিতে গিয়াছে, কতকগুলি ছায়ায় দাঁড়াইয়া জাব খাইতেছে। কৃষকের মাহিনাদার চাকর স্নান করিয়া দরজায় নিদ্রা যাইতেছে। মজুরলোকের লেপ বালিস প্রভৃতি শয্যার পারিপাট্য চাই না। তাহারা তালের চ্যাটা পাতিয়া সুখে নিদ্রা যায়।

ইতর লোকদের এখনও পাক চড়ে নাই। তাহাদের বালক বালিকারা দোকানে তৈল লবণ কিনিতে যাইতেছে। হাতে আঁককাঠী ও তৈলের ভাঁড়। কাহারও অঞ্চলে ধান কিম্বা চাউল, কাহারও অঞ্চলে কড়ী। সে কালে টাকা পয়সার এত চলন ছিল না। লোকে ধান্যাদি দিয়া দ্রব্য ক্রয় করিত। ধান্যাদি দিয়া যে মূল্য বাকি থাকিত তাহা হিসাবের খাতায় চড়িত না। ছোট লোকদের আঁকবাড়ীই হিসাবের খাতা। এখনও অনেক পল্লীগ্রামে আঁকবাড়ীর চলন আছে। এক গাছি বাঁশের কঞ্চি মধ্যস্থলে চিরিতে

হয়। তাহার এক অর্দ্ধাংশ দোকানীর নিকট থাকে, অপর অর্দ্ধাংশ ক্রেতা আপনার কাছে রাখে। মূল্য বাকি থাকিলে উভয় খণ্ড একত্র মিলিত করিয়া সৌহাস্ত্রে তাহাতে দাগ দিতে হয়। অজ্ঞ লোকদের তাহাই ডুপ্লিকেট দলিল। ক্রমে যত সরস্বতীর কৃপা দৃষ্টি পড়িতেছে, ইতর ভদ্র সকলেই লেখা পড়া শিখিতেছে, আঁকবাড়ীর চলন ততই কমিয়া আসিতেছে।

দিবসের এই সময় গ্রামের ভদ্রপল্লীতে মহা ধূম। অলস লোকেরা নাসিকা ডাকাইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। আমুদে লোকেরা কেহ প্রকাশ্যদেবালয়ে কেহ আটচালায়, কেহ চণ্ডীমণ্ডপে তাস পাশা বা শতরঞ্জ লইয়া বসিয়াছেন। কোথাও আড়ীমার চীৎকারে, কোথাও বোমভেস্তার হুঙ্কারে, কোনখানে মাতেঃ ধমকে পাড়াতে ভূমিকম্প হইতেছে। তামাকুর ধোঁয়াতে চতুর্দ্দিকে দিন দুই প্রহরে কুজঝটিকা আসিতেছে। অর্দ্ধবৃদ্ধ লোকদের সভার চিত্র আর এক প্রকার। সেখানে এত হাসির ঘটা নাই; এত চীৎকার হুহুঙ্কার নাই। এ সকল মজলিসে পুথী পড়া হইতেছে। সেকালে ছাপার পুস্তক ছিল না। বাঙ্গালীরা তুলট কাগজে বড় বড় অক্ষরে কাশীদাসী মহাভারত ও কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ লিখিয়া রাখিতেন। পুথীর আকার লম্বা, আড়ে অপ্রশস্ত। নীচে ও উপরে দুই খানি তক্তা কিম্বা গুবাকের খোলা থাকিত। গৃহস্থেরা ছিন্ন বস্ত্রে সেই পুথী বাঁধিয়া রাখিতেন।

সভার সৌন্দর্য্য বড়। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা দেউলে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। যুবারা কেহ পাঠ কেহ শোণ কাটিতেছেন। স্ত্রীলোকেরা কেহ তুলা পিঁজিতেছেন, কেহ আপনা টেকোতে সুতা কাটিতেছেন, কেহ কেহ অন্যের মাথায় উকুন দেখিতেছেন, কেহ বৃদ্ধার মস্তক হইতে পাকা চুল তুলিতেছেন—আর এক মনে এক ধ্যানে পুথীপড়া শুনিতেছেন।

পাঠক নিজে প্রবীণ ব্যক্তি। চক্ষুর দৃষ্টি আছে, কিন্তু চসমা না হইলে ভাল রূপ দেখিতে পান না। সম্মুখে পুথী খুলিয়া সুর করিয়া তাহা পাঠ করিতেছেন। চীৎকার করিয়া যখন কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, সেই সময় এক একবার তামাকু টানিতেছেন। শ্রোতারা এই অবসরে এক একটা বিচার করিয়া লইতেছেন। কেহ বলিতেছেন 'ঠাকুর এত কুচক্র না করিলে অভিমন্যুর মৃত্যু হইত না।' কেহ বলিতেছেন, 'অন্ধটাই যত রঙ্গের মূল। ধৃতরাষ্ট্র নিজে ভাল হইলে এত বিরোধ কেন ঘটিবে?' এই রূপে যাঁহার যেমন বুদ্ধিতে আসিতেছে, তিনি সেই রূপ মত দিয়া মহামুনি বেদব্যাসের উপর টীকা করিতেছেন।

এখন ইংরাজি বিদ্যার চর্চ্চা বাড়িয়াছে, পল্লীগ্রামে পুথীপড়ার আর তেমন জাঁক নাই। আমাদের পিতৃ-

পুরুষেরা ব্যাস বাল্মীকির কবিত্ব লইয়া বাদানুবাদ করিতেন, ভীমার্জ্জুনের বীরত্বের প্রশংসা করিতেন। কিন্তু এখনকার লোকে বেদব্যাস বাল্মীকিকে ভুলিয়া গিয়াছেন। ভীমার্জ্জুনের নাম শুনিলে হয়ত তাঁহারা গ্রামের পশ্চিম পাড়ার ভীমে বাগ্দী ও অর্জ্জুনে ডোম ভাবিয়া বসেন। ইহাঁরা এখন হোমর ভার্জিলকে চেনেন। কবির নাম করিতে হইলে হোমর ভার্জ্জিলের গুণগান করিয়া আপনাদের বিদ্যাপা দর্শিকতাকে সার্থক জ্ঞান করেন। শূর বীরের নাম করিতে হইলে ইহাঁরা এজেকৃস একিলিজের প্রশংসা করিয়া ভাবে গড়াগড়ী দেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

শরীর-তাপ।

সুস্থ ব্যক্তির শরীর-তাপের পরিমাণ সকল প্রদেশেই প্রায় একরূপ। কি উষ্ণ, কি নাতিশীতোষ্ণ, কি শীতকটিবন্ধে;—সাহারার অগ্নিময়, প্রশস্ত মরুভূমিতেই হউক, বঙ্গদেশের বিস্তৃত প্রান্তরেই হউক, অথবা উত্তর মহাসাগরের তুষার-মণ্ডিত, বিশাল হিমানী প্রদেশেই হউক, মানব যে স্থলেই বাস করুক না কেন, তাহার শরীর-তাপের পরিমাণ সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ থাকে। এই তাপ ব্যবহার্য্য বসনের উপর কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। বসন ব্যবহার করা সভ্যতার পরিচায়ক একটি নিদর্শন বটে; কিন্তু আর্কটিক মহাসাগরের রাশীকৃত বরফাবৃত বেলাভূমে যে সকল লোক বাস করে, সভ্যতা কাহাকে বলে যাহারা স্বপ্নেও জানে না, তাহারা কি লজ্জা নিবারণের জন্য বসন ব্যবহার করিয়া থাকে? না প্রকৃতি সতী তাহাদের জীবন রক্ষার্থ শোণিত-সিক্ত, অসংস্কৃত পশুচর্ম্ম বসনরূপে ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তাহারা বসন ভিন্ন শরীর-তাপ রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। কারণ সে প্রদেশের বহির্বাষ্প স্বভাবতঃ শীতল থাকাতে অধিক তাপোদ্গম হইয়া থাকে সুতরাং শরীরের তাপও অধিক পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বসন শরীর-তাপ রক্ষার একটী প্রধান উপকরণ বটে, কিন্তু গৃহে আশ্রয়গ্রহণ, অগ্নিশেক এবং উষ্ণ পানীয় দ্রব্য সেবন প্রভৃতি আরও অনেক উপকরণ আছে। কিন্তু দেহের কতকগুলি আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া দ্বারা উক্ত তাপ শরীরের প্রয়োজনানুসারে জনিত ও সমভাবে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। কি প্রকারে এই তাপ জনিত ও সংরক্ষিত হয়

তাহা ক্রমে বিবৃত হইতেছে। দেশ ও ঋতুভেদে আহারেরও প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে তাপোৎপাদক খাদ্য দ্রব্য যে পরিমাণে আবশ্যক হইয়া থাকে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সে পরিমাণে আবশ্যক হয় না। এবং মনুষ্য যে প্রদেশে শীতকালে তাপোৎপাদক দ্রব্য যে পরিমাণে সেবন না করিলে শরীর-তাপ রক্ষা করিতে পারে না ও কখন সুস্থাবস্থায় থাকিতে সক্ষম হয় না, সেই প্রদেশে গ্রীষ্মকালে সেই পরিমাণে তাপোৎপাদক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ত্বরায় পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়ে। স্কুইমোরা স্বদেশে রুচি ও আগ্রহ সহকারে তৈলবিশিষ্ট দ্রব্য ও বসা বা চর্ব্বি অধিক পরিমাণে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। তাহারা এরূপ না করিলে সেই দারুণ হিমপাত হইতে জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু যদি তাহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নীত হয়, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই তাহাদের আহারের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠে। তখন তাহারা সেই নূতন দেশের তাপোৎপাদক কন্দ, মূল, ফল ও অপরাপর আহার্য্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। তাহাদিগের অধিক পরিমাণে ঘৃতাদি ভোজনের ইচ্ছা ও ক্ষুধা আর থাকে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী আহার অবলম্বন না করিলে তাহারা কখনই দীর্ঘকাল স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে না। সেইরূপ গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসী কোন ব্যক্তি শীতপ্রধান দেশে নীত হইলে তাহারও আহারের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তখন সে তাপোৎপাদক দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিয়া থাকে।

ভৌতিক নিয়মও শরীর-তাপ রক্ষার বিশেষ সহায়তা করে। বহির্ব্বাষ্প শীতল হইলে তাহার সংস্পর্শে শরীরের বহির্ভাগ সঙ্কুচিত হয়। সেই সঙ্গে ত্বকের ও ইহার অব্যবহিত নিম্নস্থিত রক্ত-বহা নালী সমুদায়ও ক্ষীণাকৃতি ধারণ করাতে গভীরস্থিত নালীতে শোণিত তাড়িত হয়। তখন সাতিশয় তাপোদ্গম হইতে পারে না। গভীরস্থিত যন্ত্র সমুদায়ে অধিক পরিমাণে শোণিত থাকাতে, অধিক কার্য্য হইতে থাকে সুতরাং তাপোদ্গমনও অধিক হয়। বহির্ব্বাষ্প উষ্ণ থাকিলে ত্বকের ও ইহার নিম্নস্থিত নালী সমুদায় বিস্ফারিত হইয়া উঠে এবং শরীরের বহির্ভাগে অধিক পরিমাণে শোণিত থাকে; কিন্তু বহির্বাষ্প উষ্ণ থাকাতে তাপোদ্গম অল্প হইয়া থাকে। শরীরের বহির্ভাগে অধিক শোণিত থাকাতে গভীর স্থল সমূহে শোণিতের হ্রাস হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাপোৎপাদন কমিয়া যায়। ভৌতিক নিয়মের এই সাহায্যে শরীর-তাপ সংরক্ষিত হইয়া থাকে; তাহা স্থানান্তরে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইবে।

তাপ, শক্তির একটি নিদর্শন। শরীরের

শক্তি উপযুক্ত আহারের সাহায্যে উপচিত হইয়া থাকে। যে পরিমাণে আহার পরিপাক পায়, শরীর সেই পরিমাণ শক্তি লাভ করে। এই শক্তির কিয়দংশ শরীর পোষণে ব্যয়িত হয়; এবং সেই পোষণে শরীর অক্ষুণ্ণ ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। কিন্তু ভুক্ত দ্রব্যের অধিকাংশই শরীরের তাপরক্ষণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শোণিত ফুস্ফুসের অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া শ্বাসবায়ু হইতে অম্লজান বহন করে, এবং সেই অম্লজান শরীরের সর্ব্ব স্থলেই নীত হইয়া রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটন করে। অম্লজানের এই রাসায়নিক সংযোগে বা মৃদু দাহে আহারজনিত শক্তির অধিকাংশ ব্যয়িত হয়।

আহার পরিপাক পাইয়া প্রধানতঃ দুই প্রকারে শরীরের কার্য্য করিতে থাকে। তজ্জন্য আহারীয় দ্রব্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। শরীরপোষক এবং আনুশ্বাসিক বা তাপোৎপাদক। অ্যাল্‌বিউমেন্ ও গ্লুটেন ইত্যাদি দ্রব্য শরীর পোষণ করে এবং শর্করা, শ্বেতসার, চর্ব্বি ও নানাবিধ তৈলাদি দ্রব্য কেবল শরীরের তাপোদ্গমনে ব্যয়িত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত জল প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য আছে তাহা সেবন না করিলে শরীর কখনই রক্ষা করা যায় না। শরীর-তাপের আলোচনায় তাপোৎপাদক দ্রব্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু প্রত্যেক রাসায়নিক সংযোগে ও বিশ্লেষে তাপোৎপাদন হওয়ায় শরীরপোষক দ্রব্যসকলও কিয়ৎ পরিমাণে তাপোদ্গমন করিয়া থাকে। দ্রব্যসকল যখন পরিপাক পায় এবং পোষণকার্য্য সমাধা করে এবং যে সময়ে শারীরিক ক্রিয়া বশতঃ সঞ্চিত শক্তির ব্যয় হইতে থাকে তখন শরীরের অভ্যন্তরে আণবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। কতকগুলি দ্রব্য কেবল তাপোৎপাদনে ব্যয়িত হয় বলিয়া তৎসমুদায়কে তাপোৎপাদক বলা যায়; কিন্তু পোষক দ্রব্যগুলিও সম্পূর্ণরূপে তাপোৎপাদক না হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে তাপোৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব তৎসমুদয় যে একেবারে তাপোৎপাদক নহে এমত বলা যাইতে পারে না।

শ্বেতসার, শর্করা এবং নানাবিধ তৈল ও বসা প্রভৃতি যেরূপ উপাদানে নির্ম্মিত তাহাতে তৎসমুদায় পদার্থ শরীরতাপ রক্ষার বিশেষ উপযোগী। অঙ্গার ও জলজান এই দুইটি প্রধান দাহ্য "মূল পদার্থ"। প্রকৃতির সর্ব্বত্র এই দুইটি পদার্থ বহুলরূপে বিতরিত আছে। জীবগণ শরীরের তাপ রক্ষার নিমিত্ত যে সকল আহারীয় দ্রব্য সেবন করে তৎসমুদায় প্রায় সম্পূর্ণই এই দুইটি মূল পদার্থে গঠিত। শর্করা এবং যে সকল পদার্থ হইতে শর্করা উৎপাদিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়কে কার্ব্বো-হাইড্রেট বা অঙ্গারজল বলা যাইতে পারে; কেননা সেই সকল দ্রব্যে জল ও

অঙ্গারের রাসায়নিক সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। তৈল ও বসাদি দ্রব্যে ঠিক সেরূপ সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সকল পদার্থে অঙ্গার ও জলজান অধিক পরিমাণে থাকাতে ইহাদিগকে হাইড্রো-কার্ব্বণ বা জলজান অঙ্গার বলা যাইতে পারে। শরীর-তাপ রক্ষার্থ এই সকল আনুশ্বাসিক দ্রব্য অম্লজানের সহিত রাসায়নিক সংযোগে মৃদুভাবে সন্দাহিত হয়। অঙ্গারজান সন্দাহিত হইয়া কেবল অঙ্গার অম্ল এবং জলজান অঙ্গার সন্দাহিত হইয়া অঙ্গার অম্ল ও জল উভয়ই উৎপাদিত করে। অঙ্গার অম্ল প্রধানতঃ প্রশ্বাসবায়ুর সহিত শরীর হইতে নির্গত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সুস্থাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন নিঃস্রবণের সহিত নিঃসৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ইউরিয়া একটি নিঃস্রব্য পদার্থ। ইউরিয়া পোষক দ্রব্য হইতে উৎপাদিত। এই সকল নিঃস্রব্য পদার্থের জনন বিষয় অনুশীলন করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে সর্ব্বপ্রকার ভুক্ত দ্রব্য হইতেই শরীর-তাপ জনিত হইয়া থাকে।

তাপোৎপাদক দ্রব্য মৃদুভাবে সন্দাহিত হইয়া শরীর-তাপ রক্ষা করে। এই সন্দাহকার্য্য যাহাতে সুপ্রণালীক্রমে অনুশীলন হইতে পারে তজ্জন্য আনুশ্বাসিক ভুক্তদ্রব্য শরীরের অভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকে। যকৃৎ অনুশ্বাসক পদার্থের বৃহৎ আধার। শ্বেতসার যেরূপ রাসায়নিক সংযোগে গঠিত তাহার অনুরূপ একটি পদার্থ যকৃতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম গ্লাইকোজেন। শ্বেতসার প্রভৃতি পদার্থ ভুক্ত হইলে পাচনপ্রক্রিয়া দ্বারা শর্করে পরিণত হইয়া শরীরে প্রবেশ করে। এই শর্কর যকৃতের অভ্যন্তর দিয়া যাইবার সময় এই যন্ত্রের ক্রিয়া দ্বারা জলীয় অংশের একভাগ ত্যাগ করিয়া শ্বেতসারে পরিণত হয়। এই শ্বেতসারই গ্লাইকোজেন। এই গ্লাইকোজেন যকৃৎ হইতে ক্রমে আবশ্যকানুসারে নির্গত হইয়া সর্ব্বশরীরে সন্দাহিত হইতে থাকে। কিন্তু এই গ্লাইকোজেন যকৃৎ হইতে মুক্ত হইবার পূর্ব্বে এক অংশ জল গ্রহণ করিয়া আবার শর্কর হইয়া পড়ে। শরীরের অন্য অন্য স্থলেও গ্লাইকোজেন পাওয়া যায়। সন্দাহকার্য্য পেশীতেই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। প্রত্যেক পেশীতে গ্লাইকোজেনের সংস্থান আছে।

বসা ও তৈল অধিক পরিমাণে সেবন করিলে তাহার কিয়দংশ শরীরের চর্ব্বি উৎপাদন করে। শর্কর আদি পদার্থ হইতেও শরীরের বসা উৎপাদিত হইয়া থাকে। শরীরপোষক দ্রব্য হইতেও কিয়ৎ পরিমাণ চর্ব্বি জনিত হইতে পারে। এই চর্ব্বিও শরীরের সঞ্চিত আনুশ্বাসিক দ্রব্য। অবশ্যকানুসারে ইহা তাপোৎপাদনে ব্যয়িত হয়।

ডাক্তার রঃ—

পরেশনাথ গিরি*।

(কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।)

হেরি দূরে ঊর্দ্ধশিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিতপটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ মূরতি ?
এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে ?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী—
খচিত শিলার বর্ম্ম কুসুম রতনে
তোমার ? যে হরশিরে শশিকলা হাসে,
সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্য শিরে
চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেম পাশে!
হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনীরে
সেবিলা বীরেশ যবে পাশুপত আশে
ইন্দ্রনীলা† নীলচূড়ে দেব ধূর্জ্জটীরে।

সঙ্গীত ও উপাসনা।

আমি একদিন একাকী একটী নির্জ্জন প্রদেশে অরণ্যানীবেষ্টিত নদীবক্ষে রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। সহসা উষাকালে উচ্চ, মধুর, প্রীতিময় ঐকতান

---

* পরেশনাথ পর্ব্বত বাঙ্গালার উত্তর দিকে অবস্থিত। মাইকেল মধুসূদন যখন পুরুলিয়ায় কিয়ৎকাল অবস্থান করেন, সেই সময় একদিন প্রাতঃকালে দূরে পরেশনাথের অস্পষ্টচ্ছায়া অবলোকন করিয়া এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাটী রচনা করেন।

† পাণ্ডব-তৃতীয় বীরকেশরী অর্জ্জুন যে পর্ব্বতে তপোবল ও বাহুবল প্রদর্শন পূর্ব্বক ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিয়া পাশুপত লাভ করেন, সে পর্ব্বতের নাম "ইন্দ্রনীল" নহে, ইন্দ্রকীল। "কিরাতার্জ্জুনীয়ং" গ্রন্থের ৫ম সর্গ পাঠ করিলে, উক্ত বিষয়ক সমুদায় বৃত্তান্ত অধিগত হইবে।

বাদনে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রার আবেশে চমকিত বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিলাম এ নির্জ্জন, লোকালয়-শূন্য অরণ্যমধ্যে এ ঐকতান বাদন কোথা হইতে আসিল! উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মনোনিবেশ সহকারে সেই ঐকতান বাদন কোথায় বাজিতেছে শুনিতে লাগিলাম। আমি ইহার পূর্ব্বে অনেক বার অনেক স্থানে সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম, বহুবিধ দেশীয় বিদেশীয় যন্ত্রসমূহের সমবেত বাদ্যধ্বনি শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এমন মৃদুল গম্ভীর, এমন প্রীতিময়, সুধাময় সঙ্গীত আর কখনও আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। কোকিলের পঞ্চম স্বরের কুহুর সঙ্গে, ষড়্জসংবাদিনী ময়ূরীর কেকা, পাপীয়ার সপ্তম তান, না জানি কেমন করিয়া সঙ্গীতের কোন্ অপরিজ্ঞাত, অননুভবনীয় নিয়মে মিশিতেছিল! তাহার সঙ্গে তটিনীর কুল কুল রব, বাতাসের তর তর শব্দ, বিটপীসমূহের শর শর নিনাদ কি মধুর রবে মিশিতেছিল। রেখবের সঙ্গে ধৈবত এমন মধুর তানে মিশে, পঞ্চমের সঙ্গে সপ্তমের এমন ঐক্য হইতে পারে, ধার সঙ্গে নী এমন সুন্দররূপে মিলিত হয়, আমি পূর্ব্বে কখনও তাহা কল্পনা করিতে পারি নাই।

ক্রমে আমার নৌকা অরণ্যপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া লোকালয়ের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। তখন সেই মধুময় প্রীতিময় গীতধ্বনি ক্রমে মনুষ্যকুলের ভয়াবহ হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে বিলীন হইয়া গেল! তখন অতীত দিনের, বাল্যকালের, একটী কথা বারম্বার আমার মনে পড়িতে লাগিল। একদা বাল্যকালে পঠদ্দশায় কালেজের অধ্যাপনাগৃহে বসিয়া আমরা কয়েকজন সমপাঠী অবকাশকালে বাল্যকালের চপলতাবশতঃ টেবিল চাপড়াইয়া, হাসির গট্রা উঠাইয়া গীত গাহিতেছিলাম। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ইংরাজশিক্ষক তাহা শুনিতে পাইয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তোমরা জান না, সঙ্গীত কি পবিত্র জিনিস, তাই সঙ্গীতের সঙ্গে এমন করিয়া উপহাস করিতেছ। সঙ্গীত হাসি খেলার জিনিস নহে, ঈশ্বরোপাসনার জন্য, অনন্ত প্রেম ঘোষণা করিবার জন্য সঙ্গীতের সৃষ্টি! কথাটী মনে রাখিও, যখন আমার মত চুল পাকিবে, তখন একদিন এ কথা বুঝিতে পারিবে।"

সেই শ্বেতশ্মশ্রু গম্ভীরবদন পণ্ডিত-প্রধান আচার্য্যের উপদেশ এতদিন পরে হৃদয়ঙ্গম হইল। ঈশ্বরোপাসনার জন্য, অনন্ত প্রেম ঘোষণার জন্য, সঙ্গীতের সৃষ্টি! কি সুন্দর কথা! কি বৈজ্ঞানিকতত্ত্বপূর্ণ উপদেশ!

এই যে সম্মুখে অসীম ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি ইহা কি কেবল মাধ্যাকর্ষণে সংযোজিত, অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মপরম্পরায়

সংরক্ষিত, প্রাণশূন্য, চেতনাহীন, জড়পিণ্ড মাত্র? প্রতি মুহূর্ত্তে কি প্রতি মনুষ্যের কর্ণকুহরে ললিত তানে মধুর কণ্ঠে সঙ্গীতরহস্য গীত হইতেছে না? ধনতৃষ্ণাতুর সংসারলোলুপ মরীচিকা-লোভে ধাবমান মনুষ্য তাহা শুনিয়াও শুনে না। যেমন শিশুর বাক্যস্ফূর্ত্তির জন্য শব্দময়ী অবনী নানা শব্দে প্রতি-ধ্বনিত, সেইরূপ মনুষ্যজাতিকে অনন্ত প্রেম শিখাইবার জন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনবরত ললিত গীতিতে নিনাদিত। তাই বুঝি নারদের বীণা অবিরাম হরিনাম বর্ষণ করিত, ভুতনাথ ভবানীপতি ডম্বরুধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতেন! তাই বুঝি কৃষ্ণের বাঁশরীতে যমুনা উজান বহিত, ইন্দ্রালয়ে অমরসভা অপ্সরীগণের কণ্ঠসঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত! তাই বুঝি চতুর্ব্বেদ উচ্চ সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, চৈতন্যের মধুময় হরিনামসঙ্গীতে ভারত বিমোহিত। তাই বুঝি খৃষ্টীয় জগত এক দিন খৃষ্টীয় ঋষির মুখে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল যে,

"Morning stars
Sang together and sons of God
Shouted for joy!"

ঈশ্বরোপাসনার জন্য সঙ্গীতের আবশ্যকতা যে মনুষ্যজাতি সভ্যতার আদিম অবস্থায়, সমাজবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করিয়াছে, ইতিহাস সে বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। প্রাচীন বৈজ্ঞানিক প্লুটার্ক (Plutarch) বলিয়াছেন যে সৃষ্টিকর্ত্তা সঙ্গীতের সম্বন্ধ অনুসারে জগৎ রচনা করিয়াছেন। "The universe was framed and constituted on the principle of music." আরকিটাস (Archytas), নিকোমেকস (Necomachus) প্রভৃতি গ্রীসদেশীয় প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ একদা বহু পরিশ্রমে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ সঙ্গীতযোগে পরস্পর আকৃষ্ট। তাহারা এত দূরবর্ত্তী না হইলে আমরাও তাহাদের সঙ্গীত শুনিতে পাইতাম। মহাকবি সেক্ষপিয়র (Shakespeare) লিখিয়াছেন—

"There is not the smallest orb
which thou beholdest
But in his motion like an angel
sings,
Still quiring to the youngeyed
cherubims.
Such harmony is in immortal
souls,
But whilst the muddy vesture of
decay
Doth grossly close us in, we
cannot hear it."

পিথাগোরস (Pythagoras) বলেন এই গ্রহগণের গীতি মনুষ্য শুনিতে পায় না বটে কিন্তু দেবতাদের কর্ণকুহরে অনবরত ধ্বনিত হইতেছে! দার্শনিক কবি মিল্টনের কাব্যেপড়িয়াছি,

"Yonder starry spheres
Most regular when most irregular
they seem;
That in their motions, harmony
divine
So smooths her charming tones,
that God's own ear
Listens delighted!"

ইজিপ্তদেশে ধর্ম্মযাজকগণ সঙ্গীত চর্চ্চার সূত্রপাত করেন। ঈশ্বরোপসনার জন্য সঙ্গীত অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া সকলকে রীতিমত সঙ্গীতবিদ্যায় উপদেশ দিবার জন্য তাঁহারা একটী সঙ্গীতবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাতে চারি সহস্র ছাত্রকে শিক্ষা প্রদান করা হইত। উপাসনাকালে গায়কসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হইত। এক দল কণ্ঠসঙ্গীত করিবে ও অপর সকল দল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যন্ত্র বাজাইবে। প্রেসিডেণ্ট পটার (President Potter) নামক একজন আধুনিক আমেরিকা দেশীয় পণ্ডিত বলেন যে এক সময়ে ইজিপ্তদেশীয় উপাসক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সঙ্গীতবিদ্যার এতাদৃশ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল যে বিবাহস্থলে, দীক্ষাকালে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়, সকল প্রকার সম্পদ ও বিপদে বিজ্ঞানুমোদিত বিশুদ্ধ সঙ্গীত শুনা যাইত। (Professor chappele) প্রফেসর চ্যাপেল নামক একজন ইংরাজ পণ্ডিতের মতে আধুনিক ঐকতান বাদ্য অতি পূর্ব্বকালে ইউরোপের উপাসনামন্দির-সমূহে প্রচলিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Undoubtedly the ancients did practise harmony, even at the time of the building of the pyramids; it is not a matter of doubt, but a mathematical certainty."

প্লুটার্ক বলেন অতি প্রাচীনকালে গ্রীকদেশীয় পণ্ডিতগণ সঙ্গীত ঈশ্বরোপাসনার প্রধান উপায় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তর অনুসন্ধান ও গবেষণার পর লিখিয়াছেন,—

"Theatres were unknown, and music consisted of those sacred strains which were employed in the temple as a means of paying adoration to the Supreme Being."

ক্রমে উপাসকসম্প্রদায়গণ কর্ত্তৃক সঙ্গীতের এত উৎকর্ষ সাধিত হইয়া উঠিল যে আনাকারিসিস (Anacharisis) খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার গ্রীসভ্রমণ "Travels of Greece" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে

"The sacred hymns sung by the choruses of youths were so harmonious and so well seconded by the art of the poet, as frequently to draw tears from the greater part of the audience."

খৃষ্টীয় পাদ্রিদিগের যত্নে খৃষ্টীয় পঞ্চম

শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ আমব্রোজের (Ambrose) সঙ্গীতবিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রিগরির (Gregory the great) সময়ে ইউরোপের সর্ব্বত্র সঙ্গীতের চর্চ্চা বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইল এবং প্রেসিডেণ্ট পর্টারের মতে এই সময়ে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে এমন উপাসনাগৃহ একটীও ছিল না যেখানে নিয়মিতরূপে উপাসনার সঙ্গে সঙ্গীতের আলোচনা না হইত! যদি ধর্ম্মপ্রচারকগণ ঈশ্বরোপাসনার জন্য সঙ্গীতের আবশ্যকতা কার্য্যে পরিণত না করিতেন তবে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এত দিন কোথায় পড়িয়া থাকিত বলা যায় না।

এইরূপে সঙ্গীতের উন্নতি সম্বন্ধে জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে উপাসনা ও সঙ্গীতের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। অনন্ত অসীম প্রকৃতি ইহাই শিক্ষা দিতেছে। ইতিহাস ইহাই দেখাইয়া দিতেছে। এই জন্যই ইংরাজকবি ড্রাইডেন গাইয়াছিলেন—

"From harmony, from heavenly harmony
This universal frame began;
From harmony to harmony
Through all the compass of the notes it ran,
The diapason closing full in man."

এই জন্যই পণ্ডিতগণের মধ্যে সঙ্গীতের এত আদর দেখিতে পাই। প্লেটো বলিতেন যে সঙ্গীতবিদ্যা না শিখিলে মনুষ্যের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এক জন ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকাদেশীয় পণ্ডিতের প্রবন্ধ হইতে কয়েকটী কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"One of the most serious defects in our modern system of early education is, * * * the neglect of music as an art and as a science; and we do verily believe that if the time occupied with puerile Peter Parley's treatises on natural theology was devoted to Haydu and Mozart, it would furnish to our children a far more effectual security against infidelity; for whatever aids in the cultivation of a believing heart precludes those objections from ever obtaining an effectual lodgment in the soul."

লুথার (Luther) বলেন, যে শিক্ষক আপন ছাত্রদিগকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিতে না পারেন আমি তাঁহাকে শিক্ষক বলিয়া শ্রদ্ধা করি না। তিনি লিখিয়াছেন:—

"It is beneficial to keep youth in the continual practice of this art. A school-master must know how to sing, otherwise I do not respect him. * * * The demon who creates such sad

sorrows and ceaseless torments retire as fast before music as before devinity.”

ভারতবর্ষে আধুনিক হিন্দুদিগের মধ্যে সঙ্গীতবিদ্যার এ অবনতির কারণ কি? প্রায় ভারতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে জনসাধারণের নিকট সঙ্গীতবিদ্যা অপকৃষ্ট ও অশ্রদ্ধেয়। সঙ্গীত অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য, সঙ্গীত বেশ্যাগৃহের জন্য, আজি ভারতের অনেক স্থানে এ সংস্কার বদ্ধমূল। পিতার সম্মুখে পুত্র সঙ্গীত করিবে, শিক্ষকের নিকট ছাত্র গীত গাইবে, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। যে কুলকামিনী গীত গাইতে জানে তাহাকে দিন রাত গলা চাপিয়া রাখিতে হয়। হয়ত কখনও সে অতি গোপনে সুবিধামত আপন বয়স্যার কাণে কাণে একটী গীত গাইল, কিন্তু যদি দুরদৃষ্টক্রমে গুরুজনের কর্ণে প্রবেশ করিল, শাশুড়ী ননদী শুনিতে পাইলেন, তবে আর তাহার রক্ষা নাই। যে ছেলে গান গাইতে শিখিয়াছে সেতো বংশের কুলাঙ্গার, তাহার আবার লেখা পড়া শিখিবার আশা কি? এ সংস্কার কোথা হইতে আসিল? আর্য ভূমে কি সঙ্গীতের চর্চ্চা ছিল না? আমাদের বিশ্বাস, যে দিন ভারতরমণী পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় অন্তঃপুরে প্রাচীরের অবরোধমধ্যে আবদ্ধা হইল, যে দিন ভারতবাসী আপন রত্নহার পরের গলায় পরাইয়া ‘পরলৌহশৃঙ্খল’ পরিল, যে দিন লোমহর্ষণ পাপাচারসমূহ স্বদর্পে রাক্ষসমস্তক উন্নত করিয়া আর্য্যসন্তানকে ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল করিল, সেই দিন হইতে এ দেশে সঙ্গীতের এ দশা ঘটিয়াছে। আমরা অপর প্রবন্ধে এ কথা স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব। মুসলমান! তুমি ভারতের অনেক উপকার সাধিত করিয়াছ! বীণাপাণি যে দেশের লোকের গৃহদেবতা, দেবর্ষি নারদ যাহাদের শিক্ষাগুরু, শঙ্খ ঘণ্টা যাহাদের অতি প্রয়োজনীয় তৈজস সামগ্রী, আজি সেই দেশে সঙ্গীতবিদ্যা ঘৃণার্হ, অশ্রদ্ধেয়! মাতঃ আর্য্যভূমি! তোমার পবিত্র ভাগীরথীতটে সে অমরভবনে অভ্যস্ত, গগনব্যাপী গম্ভীর বেদধ্বনি আজি কোথায় গেল? সে সঙ্গীতযোগে দীক্ষিত বিভুগুণগানে উন্মত্ত, তপোবনবাসী আর্য্যঋষিগণ আজ কোথায় লুকাইলেন! সেই অসংখ্য দেবালয়ে অসংখ্যকণ্ঠনিঃসৃত প্রেমময় পুলকময় কণ্ঠগীতি আজি কোথায় বিলীন হইল। নিষ্ঠুর কালস্রোত! তুমি ভারতে আপন পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ! ভারতের অনেক রত্ন, অনেক অমৃত তোমার রত্নগর্ভে ভাসিয়া গিয়াছে।

পরিব্রাজক।

সংস্কার-রহস্য।

গর্ব্ভাধান।

এখন যেমন লোকে কিসে ঘোড়া ভাল হইবে, গাছ ভাল হইবে, গোরু ভাল হইবে, ইত্যাদি বাহ্যিক উন্নতির চিন্তা করিয়া, তাহার উপায় অবধারণ করে, প্রাচীন লোকেরা তেমনি কিসে মানুষ ভাল হইবে, কেবলমাত্র তাহারই চিন্তা করিত। কি কার্য্য করিলে ভাল সন্তান জন্মিবে, কেবল তাহারই চিন্তা করিত। ধার্ম্মিক,সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বলশালী, বিক্রমান্বিত ও সদ্বুদ্ধি পুত্র ও কন্যা উৎপাদন করাই তৎকালের লোকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তজ্জন্যই তাঁহারা, তদুদ্দেশেই প্রথম হইতে ক্ষেত্র সংস্কার অর্থাৎ যাহাতে সন্তান উৎপাদন করিতে হইবে, তাহার বিবিধ সংস্কার করিতেন। নিজ নিজ সহধর্ম্মিণীকে রজোদর্শনদিনাবধি বিবিধ নিয়মের অধীনে রাখিতেন। তাঁহারাও রজোদর্শন দিন হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত আপন আপন স্বামীর উপদিষ্ট পথে অবস্থান করিতেন। এই প্রবন্ধে আমরা আর্য্য ঋষিদিগের উপদিষ্ট সংস্কার কাণ্ডটী ব্যক্ত করিব। তাহার ভাল মন্দ বিচার পাঠকগণই করিবেন। নারী রজস্বলা হইলে তাঁহাদিগের কি কি বিধি ও নিষেধ প্রতিপালন করা উচিত তাহা স্বয়ং প্রজাপতি দক্ষ বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"অঞ্জনাভ্যঞ্জনে স্নানং প্রবাসং দন্তধাবনম্।
ন কুর্য্যাৎ সার্ত্তবা নারী গ্রহাণামীক্ষণং তথা॥
নখানাং কৃন্তনং রজ্জুতালপত্রাদিবন্ধনম্।
দগ্ধে শরাবে ভুঞ্জীত পেয়ং চাঞ্জলিনা পিবেৎ॥"

নারী রজস্বলা হইলে তিন দিবস পর্য্যন্ত অঞ্জন (চোকে কাজল পরা), অভ্যঙ্গ (তৈল হরিদ্রাদি মাখা), স্নান, বিদেশগমন, দন্তমার্জ্জন, চন্দ্রগ্রহণ কি সূর্য্যগ্রহণ দেখা, নখকর্ত্তন, এবং রজ্জু নির্ম্মাণাদি গুটিকতক বিরক্তিকর কার্য্য করিবেন না। মৃত্তিকাপাত্রে ভোজন করিবেন এবং পেয় দ্রব্য অঞ্জলি দ্বারা পান করিবেন। মহর্ষি বশিষ্ঠও এইরূপ করিতে বলিয়াছেন; যথা—

"নাঞ্জ্যান্নাভ্যঙ্গ্যান্নাপ্সু স্নায়াদধঃ শয়ীত
ন দিবা স্বপ্যান্নাগ্নিং স্পৃশেন্ন রজ্জুং
সৃজেন্ন দন্তান্ ধাবয়েন্ন মাংসমশ্নীয়াদিতি।"

রজস্বলা নারী তিন দিবস পর্য্যন্ত অঞ্জন ব্যবহার করিবেন না, তৈল ম্রক্ষণ করিবেন না। জলমগ্ন হইয়া স্নান করিবেন না, খট্টোপরি শয়ন করিবেন না, অর্থাৎ মৃত্তিকোপরি শয়ন করিবেন।

দিবসে নিদ্রা যাইবেন না, অগ্নির তাপ লাগাইবেন না, রজ্জু নির্ম্মাণ করিবেন না। (ইহা দেখিয়া অনুমান হয়, পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকেরা অনেক শ্রম কার্য্য করিত), দন্তমার্জ্জন করিবেন না, মাংস ভোজন করিবেন না। (এই নিষেধ দ্বারা অনুমান হইতেছে, পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরাও মাংসাহার করিত)।

এই সকল নিয়ম এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে। এ সকল ক্লেশ স্বীকারের কোন সুফল আছে কি না, তাহা আমরা জানি না, বুঝিতেও পারি না।

ঐরূপ নিয়মে তিন দিবস অতিবাহিত করিয়া চতুর্থ দিবসে স্নান ও মলাপনয়নাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া নিশিযোগে শুচি ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া স্বামী সহ সঙ্গতা হইবেন। চতুর্থ দিনেও যদি রজঃস্রাব নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তৎপর দিবসে ঐ সকল কার্য্য করিবেন। কেননা রজঃস্রাব সত্ত্বে অভিগমন নিষিদ্ধ। যথা—

"ষোড়শর্ত্তু নিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বাণ্যাদ্যাশ্চতস্রশ্চ বর্জয়েৎ॥"

[যাগ্যবল্ক্য।

"আদ্যাশ্চতস্র ইতি চতুর্থদিনে রজোহনিবৃত্তৌ জ্ঞেয়ম্॥"

পুরাতন আর্য্যেরা সকলেই একবাক্যে দিবসে স্ত্র্যভিগমন নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পরম মান্য শ্রুতিতেও দিবাসম্ভোগ নিষেধ আছে। যথা—

"প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দতি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে।
ব্রহ্মবর্চ্চসমেব তৎ যৎ রাত্রৌ সংযুজ্যন্তে॥"

যাহারা দিবসে রতি কার্য্যের জন্য সংযুক্ত হয়, তাহারা প্রাণকে ক্ষয় করে। যাহারা রাত্রে সংযুক্ত হয়, তাহারা ব্রহ্মচর্য্য করে।

মহর্ষি শঙ্খলিখিত স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত করিয়াছেন যে—

"নার্ত্তবেঽপি দিবা ব্রজেৎ।"

ঋতুকালেও দিবাভিগমন করিবে না।

ধর্ম্মবক্তা আপস্তম্ব মুনি বলেন,—

"স্নানং রজস্বলায়াস্তু চতুর্থেঽহনি শস্যতে।
গম্যা নিবৃত্তে রজসি না নিবৃত্তে তু কথঞ্চন।

রজস্বলা নারীর চতুর্থ দিনে স্নান করাই প্রশস্ত এবং রজস্রাব নিবৃত্তি না হইলে তাহারা সংসর্গের উপযুক্ত হয় না।

এই সকল বিধি ব্যবস্থা দেখিয়া ইহাই নিশ্চয় হইতেছে যে, হিন্দু আর্য্যেরা প্রথম স্ত্র্যভিগমনকালে অনেক প্রকার নিয়মের অধীন হইতেন এবং রজোদর্শন হইলে ৩।৪ দিবস পর্য্যন্ত স্ত্রীলোককে অগম্যা বলিয়া স্থির করিতেন। রজোনিবৃত্তি হইলেও তাঁহারা দিবাভিগমন করিতেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব এই যে, দিবাসঙ্গমে প্রাণ ক্ষয় বা আয়ুক্ষয় হয়। নিজ শরীরের স্বাস্থ্য নাশ হয় অথচ ভবিষ্যৎ অপত্যের উন্মত্ততা জন্মে; এইরূপ অভিপ্রায়েই তাঁহারা উল্লিখিত

প্রকারের গর্ভাধান সংস্কারের নিয়ম ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ সকল কথা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কি না, তাহা আমরা জানি না, ফল আমাদের বিবেচনায় ঐ প্রকার নিয়ম ভাল বলিয়াই বিবেচিত হয়।

মহর্ষি মনু ও মহাযোগী যাগ্যবল্ক্য এ স্থলে আরও এক দুর্ব্বিজ্ঞেয় তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, নারী রজোদর্শনদিনাবধি ১৬ দিন পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণের যোগ্যা থাকে। অতএব ঐ ১৬ দিনের মধ্যে যুগ্ম দিনে, রাত্রে, এবং একবার মাত্র অভিগমন করিবেক। অযুগ্ম দিবসে গর্ভাধান করিলে কন্যা এবং যুগ্ম দিবসে গর্ভাধান করিলে পুত্র জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যথা—

যুগ্মাসু পুত্রো জায়েত স্ত্রীয়োঽযুগ্মাসু
রাত্রিষু।"

"এবং গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং ক্ষামাং মঘাং মূলঞ্চ
বর্জয়েৎ।
সুস্থ ইন্দৌ সকৃৎ পুত্রং লক্ষণ্যং জনয়েৎ
সুতম্॥"

প্রথম শ্লোকের অর্থ এই যে, যুগ্ম রাত্রে গর্ভাধান করিলে তদ্গর্ভে পুত্র জন্মে। অযুগ্ম (বিযোড়া) রাত্রে অভিগমন করিলে তদ্গর্ভে কন্যা জন্মে। দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ক্ষামা অর্থাৎ শুষ্কশরীরা পুষ্পিতা স্ত্রীতে মঘা ও মূল নক্ষত্র বর্জ্জন করিয়া চন্দ্র শুদ্ধি কালে একবার মাত্র অভিগমন করিবেক। তাহা হইলে তদ্গর্ভে গুণান্বিত বা লক্ষণান্বিত পুত্র জন্মিবে। এ স্থলে সংস্কারময়ূখ গ্রন্থকার বলেন যে, "ক্ষামতা চ অস্নিগ্ধভোজনাৎ কার্য্যা রজঃক্ষয়ার্থম্।" অর্থাৎ রজোদর্শনি হইলে তাহাকে ৩। ৪ দিন রুক্ষ, ভোজন করাইবেক, রজোবর্দ্ধক স্নিগ্ধ ভোজন দিবেক না। যিনি এইরূপ নিয়ম ও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করেন, সেই রমণীই সুপুত্র প্রসব করিতে পারেন। অন্যথাচরণ করিলে অনেক দোষ ঘটনা হয়। *

পত্নীর গর্ভ হইলে পর, পত্নীর ও পতির উভয়েরই কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিবার বিধান আছে। তন্মধ্যে পতির প্রতিপাল্য নিয়মগুলি অগ্রে বর্ণনা করা যাউক।

" বপনং মৈথুনং তীর্থং বর্জয়েৎ
গুর্ব্বিণীপতিঃ।
শ্রাদ্ধঞ্চ সপ্তমাম্মাসাদূর্দ্ধঞ্চান্যচ্চ বেদবিৎ॥"
"ক্ষৌরং শবানুগমনং নখকৃন্তনঞ্চ
শ্রাদ্ধঞ্চ বাস্তুকরণং স্মৃতিদূরযানম্।
উদ্বাহমম্বুধিজলে গমনং তথৈব
মায়ুঃক্ষয়ং ভবতি গর্ভিণিকাপতীনাম॥"
[আশ্বলায়ন।

* এ সকল নিয়ম এখন প্রতিপালিত হয় না। প্রাচীনা গৃহিণীরা পূর্ব্বে এ সমস্তই প্রতিপালন করিতেন। যিনি কেবল কন্যাই প্রসব করেন, পুত্র হয় না বলিয়া দুঃখিতা, আমরা অনুরোধ করি, তিনি যেন অন্ততঃ একটীবার পরীক্ষার জন্য উপরের লিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করিয়া দেখেন।

"দহনং বপনঞ্চৈব চৌলং বৈ গিরিরোহণম্।
নাব আরোহণঞ্চৈব বর্জয়েৎ গুর্ব্বিণীপতিঃ॥"
[গালব।

"প্রযক্তগর্ভাপতিরন্বিযানং মৃতস্য বাহং ক্ষুরকর্ম্ম সঙ্গম্।
তস্যাস্তু যত্নেন গয়াদি তীর্থং যাগাদিকং বাস্তুবিধিং ন কুর্য্যাৎ॥"
[সংস্কারময়ূখ।

প্রথম শ্লোকের অর্থ এইরূপ :—পত্নীর গর্ভ ছয়মাস পূর্ণ হইলে পতি মস্তক-মুণ্ডন, স্ত্রীসঙ্গ, তীর্থযাত্রা, শ্রাদ্ধান্ন-ভোজন এবং অন্য শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া নির্ণীত আছে, সে সমস্তই বর্জন করিবেন।

দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ :—ক্ষৌর, শবানুগমন, নখকর্ত্তন, শ্রাদ্ধান্ন-ভোজন, বাস্তুকরণ (গৃহযাগাদি), দূরদেশগমন, বিবাহ, সমুদ্রজলে গমন, (অবগাহন অথবা পোতারোহণ), এই কয়েকটী কার্য্য করিবেন না, করিলে আয়ুঃক্ষয় হইবে।

তৃতীয় বচনের অর্থ এইরূপ :—স্ত্রী গর্ভিণী হইলে তৎপতির শবদাহ, মস্তক-মুণ্ডন, চূড়াকার্য্য, পর্ব্বতারোহণ ও পোতারোহণ নিষিদ্ধ।

চতুর্থ কবিতার অর্থ এইরূপ :—ব্যক্ত-গর্ভ পত্নীর পতি সমুদ্রযাত্রা, শববহন, ক্ষুরকার্য্য, গয়াতীর্থ গমন, যাগ যজ্ঞ ও বাস্তুবিধির অনুষ্ঠান করিবেন না।

পত্নীর গর্ভ হইলে পতির এ সকল কার্য্য নিষিদ্ধ হইল কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ঐ কার্য্যের দ্বারা গর্ভের অহিত কি নিজের অহিত, তাহা বুঝা ভার। যাহাই হউক, এ সকল ব্যবহার পল্লীগ্রামে অদ্যাপি প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। উপ-রোক্ত শ্লোকে যে স্ত্রীসংসর্গের নিষেধ কথা আছে, তাহা গর্ভিণী পক্ষেই জানিবেন; অর্থাৎ স্ত্রী গর্ভিণী হইলে পতি সে স্ত্রীতে সংগত হইবেন না, এইরূপ উপদেশ করাই উক্ত নিষেধের মর্ম্ম। পরন্তু তাহা প্রথমাবধি নহে। মহর্ষি অত্রি এই কথাটী স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। যথা—

"ষণ্মাসাৎ কাময়েন্মর্ত্ত্যো গর্ভিণীং স্ত্রিয়মেবহি।"

মনুষ্য ছয়মাস পর্য্যন্ত (কেহ বলেন পাঁচমাস সমাপ্তি পর্য্যন্ত) গর্ভিণী রমণীকে প্রার্থনা করিবেন, তৎপরে আর নহে।

এত গেল পুরুষের কর্ত্তব্য। এক্ষণে স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি, তাহা বলা যাইতেছে।

"নাবস্করেষূপবিশেৎ মুষলোদূখলাদিষু।
জলঞ্চ নাবগাহেত শূন্যাগারঞ্চ বর্জয়েৎ॥
বিলিখেন্নখৈর্ভূমিং নাঙ্গারেণ ন ভস্মনা।
ন শয়ালুঃ সদা তিষ্ঠেৎ ব্যায়ামঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥
ন তুষাঙ্গারভস্মাস্থিকপালেষু চ সংবিশেৎ
বর্জয়েৎ কলহং লোকৈর্গাত্রভঙ্গং তথৈবচ॥
ন শয়ীতোত্তরশিরা ন চাধোবাঃ শিরা কচিৎ।
ন বস্ত্রহীনা নোদ্বিগ্না ন চার্দ্রচরণা সতী॥"

"সন্ধ্যায়াং হি ন ভোক্তব্যং গর্ভিণ্যা বরবর্ণিনি।

ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ব্বদা ॥
ন শয়ালুঃ সদা তিষ্ঠেৎ খট্টাচ্ছায়া
বিবর্জয়েৎ।
সর্ব্বৌষধিভিঃ কোষ্ণেণ বারিণা স্নান-
মাচরেৎ ॥
দানশীলা তৃতীয়ায়াং পার্ব্বত্যা ভক্তি-
মাচরেৎ।
গর্ব্তিণী কুঞ্জরাশ্বাদিশৈলহর্ম্মাদিরোহণম্ ॥
ব্যায়ামং শীঘ্রগমনং শকটারোহণং ত্যজেৎ
শোকং রক্তবিমোক্ষঞ্চ সাধ্বসং
কুক্কুটাসনম্ ॥
ব্যবসায়ং দিবাস্বাপং রাত্রৌ জাগরণং
ত্যজেৎ।
অতিক্ষারস্তু নাশ্নীয়াৎ অত্যম্লমতি
ভূরি চ।
অত্যুষ্ণমতিশীতঞ্চ গুর্ব্বাহারং
পরিত্যজেৎ।
যস্ত তস্যা ভবেৎ পুত্রঃ স্থিরায়ুর্বুদ্ধি-
সংযুতঃ
অন্যথা গর্ভপতনং সা চাপ্নোতি ন
সংশয় ॥"

[পদ্মপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ।

গর্ভবতী রমণী অবস্করে অর্থাৎ যে স্থানে জঞ্জাল থাকে সে স্থানে বসিবেন না। মুষল, উদুখল, কি অন্য কোন উচ্চ কঠিন পদার্থের উপর উপবেশন করিবেন না। জলমগ্ন হইয়া অর্থাৎ ডুব দিয়া স্নান কি ক্রীড়া করিবেন না। শূন্য গৃহে বাস ও শয়ন করিবেন না। নখের দ্বারা ভূমি আঞ্চোড়ন, অঙ্গার কি ভস্মের দ্বারা বিলেখন করা নিষেধ। সদা সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিবেন না। তাঁহার পক্ষে ব্যায়াম অর্থাৎ উৎকট পরিশ্রম করা নিষেধ। তুষ, অঙ্গার, ভস্ম, ও অস্থির উপর শয়ন করিতে নাই। কলহ ও গাত্রভঙ্গ অর্থাৎ হাঁই তোলা অথবা অঙ্গমোট্টন (আড়া মোড়া খাওয়া) বর্জন করা বিধেয়। উত্তর শিরে ও অধঃশিরে শয়ন (মাথা নিচু করিয়া শয়ন) অতীব নিষিদ্ধ। বিবস্ত্রা হওয়া, উদ্বিগ্ন হওয়া ও সদা সর্ব্বদা আর্দ্রপদ অর্থাৎ ভিজা পায়ে থাকা নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ উক্ত প্রকারে শয়ন করা অতীব নিষিদ্ধ। ঠিক সন্ধ্যাকালে ভোজন করা গর্ব্তিণী নারীর অকর্ত্তব্য। সদা সর্ব্বদা বৃক্ষমূলে গমন ও উপবেশন নিষিদ্ধ। নিরন্তর শয়ন ভাল নহে। খট্টার ছায়ায় শয়ন ও উপবেশন নিষিদ্ধ। গর্ব্তিণী নারী ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিবেন। দান-শীলা হইবেন ও পার্ব্বতী দেবীর পূজাদি করিবেন। হস্তী, অশ্ব ও তৎপ্রকার অন্য কোন যানে উঠিবেন না ও গিরি-শিখরে আরোহণ করিবেন না। ব্যায়াম, শীঘ্রগমন (দৌড়ান), শকটারোহণ, শোক, রক্তমোক্ষণ, ভয়, কুক্কুটাসন (উপু হইয়া বসা), ব্যবসায় (কামক্রীড়া) দিবা নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ,—এ সমস্তই গর্ব্তিণীর পক্ষে নিষিদ্ধ। অত্যন্ত ক্ষার ও অত্যন্ত অম্ল ভোজন ভাল নহে এবং বহু ভোজনও নিষিদ্ধ। অত্যুষ্ণ, অতি শীতল ও গুরুপাক দ্রব্য পরিত্যাগ করাই ভাল। যে গর্ব্তিণী এইরূপ আচরণশীলা

হইয়া কাল যাপন করেন, অনন্তর তাহার যে পুত্র হয়, সে পুত্র দীর্ঘায়ু ও বুদ্ধিযুক্ত (প্রোথ বা বলশালী) হয়। বিপরীত আচরণ করিলে হয় গর্ভপাত, না হয় অন্য কোনরূপ বিপদ হয়।

পূর্ব্বকালের রমণীরা কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন, তাই তাঁহারা উল্লিখিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থা হইতেন। এখনকার রমণীরা বোধ হয় উহার একটীও রক্ষা করিতে পারেন না। ঐ সকল অনুষ্ঠানের বাস্তবিক কোন সুফল আছে কি নাই, তাহা আমরা জানি না। সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই মাত্র জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে অর্থাৎ রমণীগণ যে সময়ে ঐ সকল নিষ্ঠা প্রতিপালন করিতেন, সে সময়ের লোক সকল অরোগী, দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ, সরলস্বভাব, ধার্ম্মিক ও দীর্ঘায়ু হইত, এখন তাহার অনেক বৈপরীত্য ঘটনা হইতেছে।

দোহদ বা সাধ।

গর্ভ হইলে এ দেশে সাধ দেওয়ার প্রথা আছে। এই প্রথাটী শাস্ত্রমূলক। এমন কি চিকিৎসাশাস্ত্রেও ইহার বিধান দৃষ্ট হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

"দোহদস্যা প্রদানেন গর্ভোদোষ-
মবাপ্নুয়াৎ।
বৈরূপ্যং মরণং বাপি তস্মাৎ কার্য্যং প্রিয়ং
স্ত্রিয়াঃ॥"

গর্ভিণী হইলে অভিলাষের আধিক্য হয়। বিবিধ খাদ্যে স্পৃহা জন্মে। বিবিধ উপভোগের ইচ্ছা হয়। সে সময়ে যদি তাহারা অভিলষিত না পায়, তাহা হইলে গর্ভস্থ সন্তানের দোষ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, দোহদ অর্থাৎ গর্ভিণীর অভিলষিত প্রদান না করিলে গর্ভস্থ বালক দোষাক্রান্ত হয়; অর্থাৎ হয় তাহার বৈরূপ্য (কুৎসিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি), না হয় তাহার বিনাশ, ইহার অন্যতর ঘটনা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য।

পুংসবন।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলেন চারিমাস পূর্ণ না হইতে গর্ভের পুংসবন সংস্কার করা কর্ত্তব্য। যথা—

গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ
পুরা।"

ঋতুকালে গর্ভাধান, গর্ভ হইলে পর স্পন্দনকাল না আসিতে আসিতে পুংসবন সংস্কার করা বিধেয়। পুংসবন নাম কেন? তাহা সংস্কারময়ূখকার ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। যথা—

"পুমান্ সূয়ত অনেনেতি পুংসবনং কর্ম্ম
নামধেয়ম্॥"

এই ক্রিয়ার দ্বারা গর্ভিণী পুরুষ সন্তান প্রসব করে, সুতরাং ইহার নাম পুংসবন।

সুশ্রুত বলেন, "চতুর্থে মাসি চলনাদভি-
প্রায়ং করোতি।"

গর্ভস্থ বালক চারিমাসে চলিত হয়, সুতরাং সেই সময়ে তাহার অভিপ্রায় অর্থাৎ মনের অঙ্কুর জন্মে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। অতএব, চারি মাসের পূর্ব্বেই পুংসবন কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। সেই জন্যই জাতুকর্ণ নামক ঋষি বলিয়াছেন যে,—

"দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা মাসি পুংসবনং ভবেৎ।
ব্যক্তে গর্ভেঽথবা কার্য্যং সীমন্তেন সহাথবা॥"

দ্বিতীয় মাসে, তৃতীয় মাসে, কিংবা গর্ভ স্পষ্ট হইলে পুংসবন কার্য্য করিবেক অথবা সীমন্তোন্নয়ন-সংস্কারের সঙ্গে এই কার্য্য করিবেক।

"তচ্চ কর্ম্ম পঞ্চগব্যসহিত মাষদ্বয়যুক্ত দধি-প্রাশনম্।"

[সংস্কারময়ূখ।

এই কার্য্যটী কিরূপ? তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত সংস্কারময়ূখকার বলেন যে, পঞ্চগব্য ও মাষদ্বয় (মাষকলায়) যুক্ত মন্ত্রপূত দধি ভক্ষণ কার্য্যের নাম পুংসবন। ক্রমশঃ

শ্রীরামদাস সেন।

মনুষ্যত্ব। *

"If Horses or Lions had hands, and were to represent each his Deity, it would be a Horse or Lion"—*Xenophanes.*

জৈমিনির শিষ্যগণ অন্যান্য দর্শন-শাস্ত্রকে ঈশ্বরগড়া শাস্ত্র বলিতেন। এই ঈশ্বরগড়া বিদ্যা পৃথিবীতে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। গাছ পাথরের উপাসক হইতে, নিরাকার ব্রহ্মোপাসক পর্য্যন্ত সকলেই বিভিন্নাকার ঈশ্বর কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন। তেত্রিশ কোটি দেবতা ক্রমে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্ম-বাদ, ব্রহ্ম ক্রমে যোগতত্ত্বের শৈব ব্যোমবাদ, এবং ব্যোম ক্রমে চার্ব্বাক দর্শনের সর্ব্বশূন্যবাদে পরিণত হইয়াছে। আবার একমাত্র নিরাকার ব্রহ্ম বহু সাকার দেবতায় অবতারণ করিয়াছেন। শুদ্ধ আর্য্যধর্ম্মের ঈশ্বর-অনুমান যে এইরূপ বিভিন্ন প্রকার এমত নহে,অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মেরও এই গতি। প্রাচীন ইহুদী ধর্ম্মে মোসেসের জিহোবা হইতে প্রফেট্‌গণের লর্ড (Lord), এবং প্রফেট্‌গণের লর্ড হইতে জিসসের ঈশ্বর যে কেমন বিভিন্ন প্রকার,

---

* নবজীবন, ২, ভাদ্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মনুষ্যত্ব-শীর্ষক প্রস্তাবের সমালোচনা।

তাহা বাইবেল পাঠকমাত্রেই জানেন। আবার খৃষ্টান ধর্ম্ম যত প্রাচীন হইতেছে, ততই তন্মধ্যে যে কত বিভিন্ন প্রকার ঈশ্বর-কল্পনার সমাবেশ হইয়া আসিতেছে, তাহা খৃষ্টান সম্প্রদায়গণের মতামত পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীত হয়। বাস্তবিক ঈশ্বরগড়া বিদ্যা এ পৃথিবীতে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। এই জন্য কোন লোক বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু মনুষ্য যে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অধুনাতন ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে কোমৎ তাহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। তিনি এক প্রকার নব ঈশ্বরের সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহার নাম Humanity অথবা মনুষ্যত্ব। বঙ্কিমবাবু সেই মনুষ্যত্ব-ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে "Nineteenth Century"তে স্পেন্সারের সহিত হ্যারিসনের বিচার চলিতেছে। স্পেনসার বিজ্ঞান-বিৎ দার্শনিক পণ্ডিত। বিজ্ঞান যে পর্য্যন্ত শিক্ষা দেয়, তিনি সেই পর্য্যন্তই স্বীকার করেন, তাহা অতিক্রম করিতে রাজি নহেন। হ্যারিসন কোমতের মন্ত্রশিষ্য, তিনি কোমৎদর্শনের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ এবং তাহারই মতামত প্রচারার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্পেনসার বলেন যে, আমরা বাহ্যজগৎ এবং মনুষ্যের অন্তর্জগৎ পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাই, তন্মধ্যে প্রকৃতির অনন্ত ও অচিন্তনীয় শক্তি নিহিত আছে, সমুদায় ব্যক্ত প্রকৃতি সেই অচিন্তনীয় পদার্থেরই বিকৃতি অথবা পরিণাম মাত্র। সাংখ্যকার কপিল ভারতের অতি প্রাচীন কালে এই প্রকার মতই শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই অনন্ত এবং অচিন্তনীয় পদার্থকে ঈশ্বর বল, ক্ষতি নাই। কিন্তু হ্যারিসন বলেন, এরূপ শুষ্ক ও নির্গুণ ঈশ্বর লইয়া আমরা কি করিব? আমরা এরূপ ঈশ্বরকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতে পারি না,—এরূপ ঈশ্বর আমাদের ভক্তিভাজন হইতে পারেন না। আমরা এরূপ ঈশ্বর চাই, যাঁহাকে আমরা ভক্তি ও প্রীতি করিতে পারি,—যাঁহার উচ্চতার আদর্শে আমরা উঠিতে পারি। সেরূপ ঈশ্বর কোমৎ দেখাইয়া দিয়াছেন। সেই ঈশ্বর মনুষ্য-শক্তি এবং মনুষ্যপ্রেমের চরম সীমা,—সে ঈশ্বর প্রেম, দয়া ও জ্ঞানে সম্পূর্ণ। এই প্রকার ঈশ্বরই মনুষ্যের উপাসনার পাত্র।

আজি বঙ্কিম বাবুও "নবজীবনে" হ্যারিসনের ন্যায় কোমৎ-ঈশ্বরের ব্যাখ্যা দিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ ইংলণ্ড নহে। এখানে তত্ত্বজ্ঞানের অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এখানে অনেক মত অনেকেরই জানা আছে। এই তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশে কোন নূতন দেবতা শীঘ্র স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই

দর্শনপ্লাবিত দেশে কোন নূতন মত শীঘ্র প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

কোমৎদর্শনের দিকে বঙ্কিম বাবুর যে বেশী ঝোঁক, তাহার আভাস "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" শীর্ষক প্রস্তাবেই পাওয়া গিয়াছিল। এবারে তিনি স্পষ্টই কোমতের "Religion of Humanity" প্রচারে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার কৌশল এই, তিনি সেই মতকে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, তৎপরে লোককে সেই প্রকার হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ ও দীক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এ কৌশল মন্দ নহে।

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বঙ্কিমবাবুর ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা দিতেছেন। তাঁহারা ইউরোপীয় জ্ঞানে শিক্ষিত হইয়া সেই ইউরোপীয় জ্ঞানালোকে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সেই আলোকে হিন্দুধর্ম্ম যেরূপ প্রতীত হইয়াছে, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে সেইরূপে ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছেন। একদিন হিন্দুধর্ম্মের এরূপ ব্যাখ্যা ছিল না। আমরা যে বর্ণের কাঁচ দিয়া জগৎ দেখিব, জগৎ সেই বর্ণেরই আভাতে প্রতীত হইবে। আমাদের হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা এখন এইরূপ ব্যাখ্যা হইতেছে। তাহা যে সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা, তৎপক্ষে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ। শশধর তর্কচূড়ামণি এবং বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি এক্ষণকার হিন্দুধর্ম্মের উপদেশকগণের ব্যাখ্যা এইরূপ ইউরোপীয়ভাবে পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্ম্মের এরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সতর্ক হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই উপদেশকগণ সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে যেন ইউরোপীয় জ্ঞানালোচনার সিদ্ধান্ত সকলের সমর্থনার্থই ব্যবহার করিতেছেন। আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, ইহাঁদের হস্তে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব বাড়িতেছে, কি কমিতেছে? কেহ ইউরোপীয় জীববিজ্ঞানের (Biology) তত্ত্বসকল এবং (Darwin's Theory of Evolution) ডারউইনের পরিণাম-বাদ আমাদের শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া বাহির করিতেছেন। কেহ বা প্রকাণ্ড হিন্দুধর্ম্মকে ক্ষুদ্র কোমৎদর্শনতত্ত্বে গুটাইয়া আনিতেছেন। কোমতের Religion of Humanity হিন্দুশাস্ত্র মধ্যেই নিহিত ছিল কি না, আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু কোমৎদর্শনতত্ত্ব না পড়িয়া, কেহ যে তন্মধ্য হইতে তাহা আজি বাহির করিতে পারিত, এমত অনুমান হয় না। ভূতত্ত্ববিদ্যা-নিষ্কাশিত পার্থিব ভূস্তরের মত হিন্দুশাস্ত্রমধ্যে অনেক প্রকার চিন্তা ও মতামতের স্তর বাঁধিয়া রহিয়াছে। যিনি বিদ্যাবলে যে স্তরকে যেরূপে দেখাইতে পারিবেন, হিন্দুধর্ম্ম সেইরূপে প্রতীয়মান হইবে। কোমৎদর্শনের আলোকে এক্ষণে বঙ্কিমবাবু

হিন্দুধর্ম্মের "মোক্ষ" এবং "ঈশ্বরে লীন হওয়ার" নিগূঢ় অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। এরূপ অর্থ বাহির করাতে গুণপনা আছে বটে, কিন্তু তাহাই যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম,এ কথা কে অবধারণ করিয়া দিবে? এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি কোমতের মত সমর্থন করিলেন, কি হিন্দুধর্ম্মের গৌরব বাড়াইলেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

সে যাহা হউক, তিনি যে মত প্রচারে উদ্যত, দেখা যাউক, সেই মত কতদূর গ্রহণীয় হইতে পারে। তাঁহার "মনুষ্যত্ব"-শীর্ষক প্রস্তাবের সার মর্ম্ম এই যে, কি শারীরিক, কি মানসিক, মনুষ্যের সমুদায় বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি সাধন করাই মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ব অর্জ্জন জন্য আদর্শের আবশ্যক। সেই আদর্শ কেবল ঈশ্বরে পাওয়া যায়। বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে কিম্বা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত প্রকৃতির অচিন্তনীয় শক্তিতে সে আদর্শ দিতে পারে না। সগুণ ঈশ্বরে কেবল সে আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য" সেই ঈশ্বরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই আদর্শের "সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তি ভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে, প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে; —তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতিঃ আমাদিগের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার গুণের মত গুণ, তাঁহার নির্ম্মলতার মত নির্ম্মলতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্ব্বত্র মঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য্য ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন, যে তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব;—ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাব-প্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।"

বঙ্কিমবাবু আরও বলেন, এই "উপাসনা-তত্ত্বের সার মর্ম্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়া ছিলেন, এমন আর কোন জাতিই বোঝে নাই।" কেবল হিন্দু জাতিই যে এই উপাসনাপদ্ধতি বুঝিয়াছিলেন, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। হিন্দু জাতি মধ্যে অন্যান্য উপাসনাপ্রণালীও ছিল। হিন্দুধর্ম্মের নানাবিধ উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে, উক্ত উপাসনাপ্রণালী অন্যতম মাত্র। ভাগবতে এবং অধুনাতন কালে এই

মত প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণবেরা অধিকন্তু উক্ত উপাসনাপ্রণালী অবলম্বন করেন। সে যাহা হউক, হিন্দুধর্ম্মে নানাবিধ উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত থাকাতে উক্ত উপাসনাপ্রণালী অধিক সমাদৃত হয় নাই; এবং বিশেষরূপে অবলম্বিত হয় নাই। পাঁচ প্রকারের মধ্যে এই উপাসনাপ্রণালী মিশিয়া আছে। ইহা কখন যে প্রধানত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহাও প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। হিন্দুরা এই উপাসনাপ্রণালীকেই যে প্রশস্ত বিবেচনা করিতেন, এমত প্রতীত হয় না। বৃহৎ হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে ইহা অংশ মাত্র ছিল,—কোথায় মিশিয়া গিয়াছিল! ভারতে যোগশাস্ত্র এবং পুরাণোক্ত উপাসনার প্রাচুর্য্যে ও আড়ম্বরে এই উপাসনাপ্রণালী প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে নাই। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, যোগ-শাস্ত্র, পুরাণ এবং তন্ত্র-প্রথিত উপাসনা-প্রণালী—শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি নানাবিধ উপাসনাপ্রণালী যে সময়ে সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাদের ধূমধামে, এবং ঘোর ঘটায়, এই কঠিন ও আন্তরিক উপাসনাপ্রণালী বড় জোর করিয়া উঠিতে পারে নাই। যতদিন অবধি এই মত প্রচারিত হইয়াছে, ততদিন হইতেই ইহা নিতান্ত দুর্ব্বল ও নির্ব্বীর্য্য ভাবে পড়িয়া আছে। হিন্দুধর্ম্মে ইহা মত মাত্র ছিল, কখন এই মত সজীবতা প্রাপ্ত হয় নাই—কখন সাধারণ্যে প্রচলিত হয় নাই;—বিশেষরূপে উৎকৃষ্ট মত বলিয়া গৃহীত হয় নাই। অন্যান্য সহজ উপাসনাপ্রণালী থাকাতে এই কঠিন প্রণালী তেমন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

হিন্দুরা এই উপাসনা-তত্ত্বের সারমর্ম্ম কেমন বুঝিয়াছিলেন, তাহা প্রতীত হইতেছে। হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতি যে এই উপাসনাপ্রণালী বুঝে নাই, এ কথা সত্য নহে। হিন্দুধর্ম্মে বরং এ উপাসনাপ্রণালীর তত আদর ছিল না; কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্মে এই উপাসনাপ্রণালীই একমাত্র প্রশস্ত মার্গ বলিয়া স্থির হইয়াছিল। কোমৎ এই উপাসনাপ্রণালী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন মাত্র। কোমতের পূর্ব্বে থিয়োডোর পার্কার এই সর্ব্বাঙ্গীন উপাসনাপ্রণালীর ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।* জিসসই কেবল বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন "Be perfect as God" তিনি Old Testament এর উপাসনাপ্রণালীর সহিত নিজ প্রণালীর পার্থক্য এইরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—The Priest said, "Keep the Law, and reverence the Prophets" But Jesus said "Be perfect as God." "Worship the Father in spirit and in truth" "call no man your

* See Thedore Parker's "Discourse of matters pertaining to Religion" Book III., Chaps. III. and V and "Theism, Atheism and Popular Christianity".

Father on earth" ইত্যাদি। বঙ্কিম বাবু যে আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, খ্রীষ্টানধর্ম্ম সেই আদর্শ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে। জিসসই কেবল স্পষ্ট করিয়া এই আদর্শ গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। আর বঙ্কিম বাবু যে, "সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য" উপাসনার কথা উল্লেখ করেন, তাহাও বাইবেলে ঈষৎ গূঢ়ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে। জিসস বলিয়াছিলেন "Thou shalt love the Lord, thy God with all thy heart, and with all thy soul and with all thy mind." পার্কার বলেন:—"To say all in brief, these, two cardinal doctrines (*viz* : Love to God and Love to man) demanded a *Divine life* where every action of the hand, the head, the heart, is in obedience to the law of the soul—in harmony with the All-perfect. This was Christ's notion of worship. It asked for nothing ritual, formal; laid no stress on special days, forms, rites, creeds. Its rite, its creed, its substance, and its form, are all contained in that one command, Love Man as yourself; God above all." পার্কার আবার বলেন "No friend of Religion and of man can be hostile to the christianity of Christ. This proposes no partial end, but an absolute object—*The perfection of man*, or *oneness with God.*

এক্ষণে প্রতীত হইতেছে যে, যে ধর্ম্ম, যে আদর্শ, এবং যে যুক্তি বঙ্কিম বাবু প্রচার করিতেছেন, তাহা খৃষ্টান জাতি সমুদায়ের মধ্যে বহুকাল ধরিয়া প্রচারিত আছে। তবে তিনি কিরূপে বলেন, উপাসনাতত্ত্বের সার ধর্ম্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই।

আর একটী কথা। ইতিপূর্ব্বে অনেক খৃষ্টানেরাও বলিয়াছিলেন যে ভাগবতে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম স্পষ্টই ব্যাখ্যাত আছে। সুতরাং বঙ্কিম বাবু যে এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম, খৃষ্টীয় মত দ্বারা বুঝাইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু কথা এই, এইরূপ মর্ম্ম কি সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম? হিন্দু ধর্ম্মে কি অন্য প্রকার উপদেশও বিদ্যমান নাই। যদি বল—থাকিতে পারে, কিন্তু সে সকল ধর্ম্মপথ ততদূর ভাল নহে। কোন্ পথ ভাল, কোন্ পথ মন্দ, কোন্ পথ সম্ভব, কোন্ পথ অসম্ভব, কোন্ পথ অবলম্বিত হইতে পারে, কোন্ পথ হইতে পারে না, সে এক স্বতন্ত্র কথা। বঙ্কিম বাবু ত হিন্দুধর্ম্ম-প্রোক্ত সমস্ত ধর্ম্মপথের বিচার করিয়া বলেন নাই, যে মনুষ্যত্ব ধর্ম্মতত্ত্বই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। অতএব, তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম্মপথই যে প্রশস্ত এবং তাহাই যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম এমত প্রমাণিত হয় না।

"এক্ষণে বঙ্কিমবাবু-প্রোক্ত মনুষ্যত্ব-ধর্ম্ম পথের প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা পূর্ব্ববারে প্রদর্শন করিয়াছি, বঙ্কিম বাবুর ঈশ্বর কেবল অবিশুদ্ধ অভ্যুপগম (Hypothesis) মাত্র। এই পরিদৃশ্যমান ব্যক্ত প্রকৃতি যদি বাস্তবিক সৃষ্ট হইয়া থাকে এমত প্রমাণিত হয় এবং মনুষ্যের নির্ম্মাণকার্য্যের ন্যায় যদি সৃষ্টি-ব্যাপারেরও এক জন কর্ত্তা থাকা সম্ভব হয়, তবেই সৃষ্টিকর্ত্তাস্বরূপ কোন ঈশ্বর-সত্তার অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে, নহিলে নহে। কিন্তু মনে করুন এরূপ ঈশ্বর সম্ভব; বাস্তবিক, একজন সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। তার পর বিচার্য্য এই—যিনি ছিলেন তিনি তৎপরে ছিলেন এবং এখন আছেন কি না? এ কথার উত্তরে, বঙ্কিমবাবু আর একটি কথা ধরিয়া লইয়াছেন। অথবা বঙ্কিমবাবুর মতে তত্ত্বজ্ঞানে তাহা ধরিয়া লইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানে স্থির করিয়া লইয়াছে যে "এই জগৎ ঈশ্বর-নিয়ত"। "এ জগৎ ঈশ্বর-নিয়ত" বলিলে এমত স্পষ্ট বুঝায় না যে সেই নিয়ন্তা বরাবর বিদ্যমান ছিলেন এবং আজিও আছেন। তথাপি মনে করিয়া লও, যে ঐ কথার অর্থ তাহাই। অর্থাৎ ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিয়া বরাবর জগৎ ব্যাপার নিয়মিত করিয়া আসিতেছেন। তাহা হইলে বলিতে হইল, যে প্রতিদিন এবং প্রতিক্ষণে যাহা ঘটিতেছে, তাহা সেই নিয়ন্তার বিশেষ আজ্ঞানুসারে ঘটিতেছে—এ জগৎ আবহমানকাল কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী চলিতেছে না। কারণ, কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী চলিলে, সেই নিয়ম স্থাপনের পূর্ব্বে নিয়ন্তার সত্তাই প্রমাণিত হইতে পারে—তৎপরে তাঁহার অস্তিত্ব সেই নিয়ম দ্বারা আর প্রমাণিত হয় না। কারিকর মরিয়া গেলেও তন্নির্ম্মিত যন্ত্র থাকিতে এবং চলিতে পারে। এবং যন্ত্র যদি এ প্রকার হয় যে, তাহা বরাবর যথানিয়মে চলিতে পারে তবে আর ভবিষ্যতে কারিকরের সহিত সেই যন্ত্রের কোন সম্পর্ক থাকে না। সে যাহা হউক, মনে করুন বাস্তবিক সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগৎনিয়ন্তা স্বরূপ এক জন ঈশ্বর পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন এবং আজিও আছেন। তাহা হইলেই যে সেই ঈশ্বর পুরুষকে সগুণ হইতেই হইবে, এমত প্রমাণিত হয় না। তাঁহার নির্গুণ হওয়াই অধিক সম্ভব। কারণ, সৃষ্ট পদার্থের যাহা ধর্ম্ম, তাহারই নাম গুণ। এই গুণ যে সৃষ্টিকর্ত্তাতেও বর্ত্তমান, এরূপ অনুমান করিলে, সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত সৃষ্ট পদার্থের কোন প্রভেদ থাকে না—দুই এক পদার্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু বঙ্কিম বাবু ত তাহা বলিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন আমরা নির্গুণ ঈশ্বর চাহি না,—ঈশ্বর যদি বাস্তবিক নির্গুণ হন, তবে সেই নির্গুণ ঈশ্বরকে লইয়া আমরা কি করিব? নির্গুণ ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না।

সুতরাং সেরূপ ঈশ্বরে আমাদের উপকার নাই। যাহাতে আমাদের লাভালাভ নাই, সে ঈশ্বরে আমাদের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর বাস্তবিক নির্গুণ হইলেও আমাদের প্রয়োজন অনুসারে একটি সগুণ ঈশ্বর গড়িতে হইবে। যে ঈশ্বর আমরা গড়িয়া লইব, তাহা একজন সগুণ নরোত্তম নারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণ)। এই জন্য আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা যে ঈশ্বর এমত প্রমাণিত হয় না; কিন্তু মনুষ্য যে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। বঙ্কিমবাবুর ঈশ্বরানুমান কেমন অসঙ্গত এবং কাল্পনিক তাহা প্রতিপন্ন হইল।

তিনি বলেন, মনুষ্যত্ব ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে একটী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। এরূপ আদর্শ যে নেহাৎ চাই কেন, তাহা তিনি প্রতিপন্ন করেন নাই। আদর্শ না হইলে যে উন্নতিলাভ হয় না, এ কথা সত্য নহে। জগতের যত উন্নতি সাধন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ত স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষভাবে হইয়াছে। নিউটন, সেক্‌সপিয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কি আদর্শ দেখিয়া বিদ্যার এবং আপনাপন উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন? প্রাচীন ভারতের উন্নতি কোন্ আদর্শানুযায়ী ঘটিয়াছিল? ভারতের মুনি ঋষিগণ কাঁহার আদর্শ দেখিয়া নিজ নিজ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন? খৃষ্টান ধর্ম্মে ঈশ্বরের আদর্শ দেওয়া ছিল বটে, কিন্তু সেই আদর্শানুযায়ী কি ফল ফলিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে চাই। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু বলেন "এরূপ রাজগুণ বর্ণনা যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অনুমেয় যে এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল।" বঙ্কিমবাবু আরও বলেন, "সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোল-কল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।" সুতরাং কাব্য পুরাণ এবং আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, জনকরাজ, ভীষ্ম, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল আদর্শ-চরিত দেওয়া আছে, তাহা বঙ্কিম বাবুর মতেই লেখকদিগের স্বকপোল-কল্পিত, অতিরঞ্জিত চিত্রমাত্র। সেগুলি বাস্তবিক চরিতমালা নহে। বেশ,—তবে এক্ষণে এই কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য হইয়া উঠে।

(১) হিন্দু এবং খৃষ্টান ধর্ম্মোক্ত আদর্শ দ্বারা জগতের কি উপকার দর্শিয়াছে? তাহার বাস্তবিক ফলাফল কি কি?

(২) সে সকল আদর্শ কি সাধারণ সকল লোকেই গ্রহণ করিয়াছিল? যদি গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে তাহার ফল ব্যক্তিবিশেষে বিপরীত হইয়াছিল কেন?

(৩) আত্মোন্নতি এবং সমাজোন্নতি সাধন জন্য কি আদর্শ নেহাৎ চাই?

(৪) আদর্শ কি প্রতি লোকের পক্ষে উপযোগী হয়?

এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে আদর্শের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হয় না। বঙ্কিম বাবু যখন আদর্শের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করেন নাই, তখন আমরা স্বীকার করি না, যে মানবের উন্নতি জন্য সকলের পক্ষে আদর্শের একান্ত আবশ্যকতা আছে।

ঈশ্বর-আদর্শের কথা দূরে থাক, মনুষ্য-আদর্শই দেখুন। ভারত এখন পরাধীন, ইটালীও এককালে পরাধীন ছিল। ম্যাটসিনি এবং গারিবল্ডি ইটালীর অধীনতা মোচন করিয়াছিলেন। সেই আদর্শে একজন স্বদেশ-হিতৈষী ভারতের পরাধীনতা মোচন জন্য সংকল্প করিলেন। কিন্তু সেরূপ করিলে কি হইবে, তিনি দেখিলেন, ভারত ইটালী নহে। এজন্য এখানে ম্যাটসিনির দৃষ্টান্ত খাটিতে পারে না। যিনি ম্যাটসিনির দৃষ্টান্ত খাটাইতে চান, তাঁহাকে অগ্রে ভারতকে তুলিতে হইবে। না হয় নিজ সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইবে। জেমস মিল যেরূপে ষ্টুয়ার্ট মিলের শিক্ষা দিয়াছিলেন, মনে করুন, সেই আদর্শ একজন গ্রহণ করিল। কিন্তু কথঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া দেখিল যে, তাহার সন্তান ষ্টুয়ার্ট মিল নহে এবং তিনিও জেমস মিল নহেন। সুতরাং সে আদর্শ তাঁহার সন্তানের শিক্ষাকল্পে খাটিল না। যখন খাটিল না, তখন তিনি সে আদর্শ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং বলিতে হইবে আদর্শের সম্পূর্ণ উপযোগিতা নাই বলিয়া তাহার সম্পূর্ণ ফলোপধায়িতা নাই।

আবার দেখুন, ম্যাটসিনি এবং গ্যারিবল্ডি যে প্রকারে ইটালীর অধীনতা মোচন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সে প্রকার কার্য্য-প্রণালীর আদর্শ কোথায় পাইলেন? জেমস মিলই বা নিজ সন্তানের শিক্ষাপ্রণালী কোন্ আদর্শ দেখিয়া শিখিয়াছিলেন? যদি বল, তাঁহাদের সম্মুখে আদর্শ ছিল না, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আদর্শ সকলের পক্ষে আবশ্যক নহে এবং আদর্শের উপযোগিতাও সকল সময় প্রতিপাদিত হয় না।

কিন্তু মানব-আদর্শের সম্পূর্ণ উপযোগিতা এবং আবশ্যকতা না থাকিলেও কিয়ৎ পরিমাণে থাকা সম্ভব হয়। সকল লোকেই যে আদর্শানুযায়ী কার্য্য করে এমত নহে। অনেক স্বাধীনচেতা মনুষ্য আদর্শের ধার ধারে না। এবং মনুষ্য মাত্রেই স্বভাবতঃ স্বাধীনতা-প্রবণ। অনেকের দেখিয়া অনেকে শিখে বটে, কিন্তু সেরূপ লোক সমাজের কিয়দংশ মাত্র। অনেক পুত্র পিতার ন্যায় কার্য্য প্রণালীর অনুসরণ করিয়া পিতার নাম রাখিতে চেষ্টা করেন এবং অনেকেই করেন না। মানব-আদর্শ ঠিক উপযোগী না হইলেও অনেকে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া আপনার উপযোগী করিয়া লন। মনুষ্যের অনুকরণ বৃত্তি আছে বটে, কিন্তু মনুষ্য

সকল কার্য্যেই অনুকরণ করিতেছে এমত নহে। অনুকরণ বৃত্তির বিপক্ষে স্বাধীনতার প্রবৃত্তি অনেক সময়ে এবং অনেক লোকে প্রভুত্ব লাভ করিয়া থাকে। তবে মানুষের অনুকরণ বৃত্তি আছে বলিয়া চরিতাখ্যায়কেরা সাধু লোকের জীবন-চরিত লিখিয়া থাকেন এবং উপন্যাসলেখকেরা আদর্শতুল্য নায়ক নায়িকার চিত্র অঙ্কিত করেন। কিন্তু এ সমুদায় মানব-আদর্শ, এবং মানবের নিকট মানবাদর্শের সম্পূর্ণ না হউক কথঞ্চিৎ উপযোগিতা ও প্রয়োজন আছে। কারণ, সকল লোক স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে চায় না,—আদর্শ থাকিলে তাহাদের অনেক সাহায্য হয়। আদর্শ, সাহায্য মাত্র। এই মানবাদর্শের সাহায্য সকল লোক গ্রহণ করে না, সকল সময়েও গ্রহণ করে না, এবং সম্পূর্ণরূপেও গ্রহণ করে না।

মানবাদর্শের কথঞ্চিৎ ফলোপধায়িতা দেখিয়া, কোন কোন ধর্ম্ম-গুরু সেই আদর্শকে উত্তোলিত করিতে গিয়াছেন। তুলিতে গিয়া তাঁহারা একেবারে সেই আদর্শকে ঈশ্বর করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা বলি এরূপে আদর্শ উত্তোলিত হয় নাই, আদর্শ একেবারে বিনষ্ট করা হইয়াছে।—মনুষ্য-আদর্শ লোকে বরং কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করে, কিন্তু ঈশ্বর-আদর্শ লোকে গ্রহণ করে না। লোকে তাহা কখন গ্রহণ করে নাই। গ্রহণ করে নাই কেন? গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া গ্রহণ করে নাই। সুতরাং যাহা গ্রহণীয় নহে, তাহাকে আদর্শ বলিয়া অভিহিত করিলে কি হইবে, প্রকৃতপক্ষে, তাহা আদর্শ নহে। এই জন্য বলিয়াছি মনুষ্য-আদর্শই—আদর্শ, ঈশ্বরাদর্শ আদর্শ নহে। এ কথা আরও বিশদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন জন্য আদর্শ চাই। নির্গুণ ঈশ্বর সেরূপ আদর্শ হইতে পারেন না, সগুণ ঈশ্বরই আমাদের আদর্শ-স্বরূপ হইবার উপযুক্ত পাত্র। এই কথা সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

(১) পৃথিবীতে যাঁহারা নির্গুণ ঈশ্বরবাদী পরম পণ্ডিত এবং ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহাদের কি আত্মোন্নতি হয় নাই?

(২) যাঁহারা একই দেবতার আরাধনা করেন সেই উপাসক সম্প্রদায় মধ্যে সকলেরই কি উন্নতি হয়? যদি না হয়, কেন হয় না? প্রত্যুত, অনেক লোক বিপরীত দোষ গুণে ভূষিত হয় কেন? যদি বল, আদর্শ-দেবতা এক ছিল, কিন্তু লোকের দোষ গুণে ভিন্ন ফল ফলিয়া থাকে। তবে আর আদর্শের গুণ কোথায়? অসম উপকরণকে আদর্শ যদি একদিকে আনিতে সমর্থ না হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, হয় সেই আদর্শ গৃহীত হয় নাই, না হয়, আদর্শের উপকারিতা নাই। এখন

ভাল ফল হইল, তখন বলিলে আদর্শের গুণে হইয়াছে, কিন্তু যখন মন্দ ফল ফলিল, তখন মনুষ্যের দোষ দিলে কেন? আবার দেখ, মন্দ ফল অধিক ফলে, কি ভাল ফল অধিক ফলে? যদি দেখিতে পাও, মন্দ ফল অধিক ফলিয়াছে, তবে কি বলিবে না, আদর্শ না থাকাই ভাল ছিল, অথবা আদর্শ থাকা না থাকা সমান কথা? পৃথিবীতে যে ভাল ফল অধিক ফলিয়াছে, এ কথা প্রমাণ করা চাই। যদি প্রমাণ করিতে পার, তবে কি দেখাইতে পার, সেই ভাল ফল সমুদায় আদর্শ জন্য ঘটিয়াছে? মন্দ ফল সকল যেমন আদর্শে আরোপ কর না, তেমনি ভাল ফল সকলও যে কেবল আদর্শ জন্য ঘটিয়াছে, এ কথা কি প্রমাণ করিতে পার?

বঙ্কিমবাবু বলেন, হিন্দুধর্ম্মে সগুণ ঈশ্বর হিন্দুজাতির আদর্শস্থানীয় ছিল; আমরা দেখাইয়াছি, জিসসও সেই আদর্শ খৃষ্টানজাতি সমুদায়কে দিয়া গিয়া ছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, সে আদর্শ কি গৃহীত হইয়াছিল? খৃষ্টান ও হিন্দুজাতি কি ঈশ্বরকে আদর্শ ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে? আর যদি একই আদর্শ ছিল এমত কথা বল, তবে উভয় জাতির উন্নতি ও সভ্যতা একপ্রকার হয় নাই কেন? হিন্দুজাতির উন্নতি ও সভ্যতা এবং খৃষ্টানজাতি সমুদায়ের সভ্যতা কি বিভিন্ন প্রকার নহে?

ঈশ্বর-আদর্শ পৃথিবীতে গৃহীত হইয়াছে কি না, তাহা উক্ত কতিপয় প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের সংস্কার এই যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরাদর্শ গৃহীত হয় নাই। কি ইউরোপ কি আর্য্য-ভারত কোথাও ঈশ্বরাদর্শ গৃহীত হয় নাই। গৃহীত হয় নাই কেন—এ কথার উত্তরে আমরা বুঝিতে পারি যে, গৃহীত হইতে পারে না বলিয়াই হয় নাই। গৃহীত হইতে পারে না কেন, তাহার কারণ একে একে নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথমতঃ। মনুষ্য আপনাপন বৃত্তি সমুদায়ের অনুশীলন করিয়া তবে উন্নতি লাভ করে। অতএব অনুশীলনই আমাদের উন্নতির উপায়। আমাদের উৎকর্ষ অনুশীলন দ্বারা লব্ধ হইবে, কিন্তু ঈশ্বরে যে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা রহিয়াছে তাহা অনুশীলন-লব্ধ নয়। সুতরাং অনুশীলন দ্বারা যে সে আদর্শে উঠিতে পারা যায় এমত সম্ভব নহে। যে ঈশ্বরত্ব অনুশীলন দ্বারা লব্ধ হয় নাই, সেই উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা কখন অনুশীলন দ্বারা লাভ করা যাইতে পারে না। মনুষ্যাদর্শ গৃহীত হয় এই জন্য যে, সেখানে আদর্শ এবং আদর্শের অনুকরণকারী উভয়ই এক নিয়মের বশবর্ত্তী। কিন্তু ঈশ্বর ও মনুষ্য যখন এক নিয়মের বশবর্ত্তী নহে, তখন ঈশ্বর কিরূপে মনুষ্যের আদর্শ-স্থানীয় হইতে পারেন?

দ্বিতীয়তঃ। আমাদের জ্ঞান, বাহ্য এবং অন্তর্জগতের গুণজ্ঞান মাত্র। আমাদের জ্ঞানের সীমা প্রকৃতি। আমরা প্রকৃতির বাহ্যগুণ ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারি না। আমাদের শক্তিও প্রাকৃতিক শক্তির বিশেষ প্রকার নিয়োজন মাত্র। আমরা প্রাকৃতিক শক্তিকে আপনাদের কার্য্য-উপযোগী করিয়া লই মাত্র। শক্তি কি, আমরা তাহা জানি না। জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থ কি, তাহাও আমরা জানি না। আমাদের জ্ঞান এবং ঈশ্বরের জ্ঞান সমান প্রকৃতির নহে। আমরা যে অর্থে ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলি, সে অর্থে

মনুষ্যজ্ঞান জ্ঞানই নহে। ঈশ্বরের জ্ঞান বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান, যেহেতু, বস্তুতত্ত্বজ্ঞান না থাকিলে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না। কিন্তু আমাদের জ্ঞান বস্তুর লক্ষণ জ্ঞান মাত্র। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা বস্তুতত্ত্ব লইয়া, মনুষ্যের সর্ব্বজ্ঞতা বস্তুর গুণ ও ধর্ম্ম লইয়া। যখন আদর্শ এবং অনুকারীর জ্ঞানের এরূপ প্রকৃতিগত বিভিন্নতা রহিয়াছে, তখন আমরা ঐশ্বরিক সর্ব্বজ্ঞতাকে কিরূপে আদর্শস্থানীয় করিতে পারি?

তৃতীয়তঃ। যে কথা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে বলা হইল, ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিশীলতা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। ঈশ্বরের শক্তি যে প্রকার, আমাদের শক্তি সে প্রকার নহে। আমাদের শক্তি, প্রাকৃতিক শক্তির বিনিয়োগ মাত্র। কিন্তু আদর্শ ঈশ্বর শক্তি-স্বরূপ। শক্তির শক্তি যাহা তাহাই ঈশ্বর। শক্তির শক্তি কি, তাহা আমরা আদৌ বুঝিতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বরের শক্তিশীলতা আমাদের অনুকরণীয় হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ। ঈশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময় পরম পবিত্র-স্বরূপ। বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন, পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার মত পবিত্র হইতে চেষ্টা করিবে। বেশ কথা, ভাল হইতে কে না চায়? কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং মনুষ্যের উৎকর্ষ কি এক প্রকার পদার্থ? ঈশ্বরের পবিত্রতা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা এবং সর্ব্বশক্তিশীলতার ফল। তাহা ঈশ্বরের প্রকৃতিগত গুণ। কিন্তু আমাদের উৎকর্ষ-লাভ অভ্যাস ও অনুশীলনের ফল। যাহা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা এবং সর্ব্বশক্তিশীলতার ফল, তাহাকে বা পবিত্রতা বলিব কি প্রকারে? ঈশ্বর সম্বন্ধে অপবিত্রতা সম্ভব নহে। ঈশ্বরের নিত্য প্রকৃতি যাহা, তাহাকে পবিত্রতাই বল, আর যাহাই বল, তাহার অর্থ পবিত্রতা প্রভৃতি কোন শব্দেই প্রকাশিত হইতে পারে না। যাহা অপবিত্র হইতে পারে না তাহা আবার পবিত্র কি প্রকারে হইতে পারে? যাহার পরিবর্ত্তন নাই, বিকৃতি নাই, যাহা নিত্যস্বভাবসম্পন্ন, তাহা আবার পবিত্র কি প্রকারে হইতে পারে? সুতরাং ঈশ্বরের পবিত্রতা আমাদের অনুকরণীয় হইতে পারে না।

পঞ্চমতঃ। ঈশ্বরপ্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকৃতি, ঈশ্বরের শক্তি সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি। মনুষ্য সৃষ্ট জীব, মনুষ্যের সৃষ্ট প্রকৃতি ঈশ্বরপ্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান এবং মনুষ্য শক্তিহীন। এইরূপ বিশ্বাস থাকাতে, মনুষ্য ঈশ্বরানুকরণে উদ্যত হয় না। যতক্ষণ কোন মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, ততক্ষণ তিনি আমাদের অনুকরণীয় হয়েন, কিন্তু যেই মাত্র তিনি দেবতা অথবা ঈশ্বরাবতার বলিয়া অভিহিত হয়েন, অমনি তিনি মনুষ্যের লক্ষ্য হইতে অপসারিত হয়েন। দেবতার পদে উত্তোলিত হইলেই মনুষ্য আদর্শস্থান হইতে ভ্রষ্ট হয়েন; তিনি মনুষ্যের মানসচক্ষুঃ হইতে অন্তর্হিত অথবা দূরস্থ হয়েন। যখন মনুষ্য দেবতার পদে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার আদর্শ এইরূপ দূরস্থ হয়, তখন স্বয়ং ঈশ্বরের আদর্শ কিরূপে সমীপবর্ত্তী হইতে পারে? অনন্ত ঈশ্বর মনুষ্য হইতে যত অন্তর, তাঁহার আদর্শও তত অন্তরে অবস্থিত থাকে।

সগুণ ঈশ্বর বলিলে এক্ষণে অনেক লোকে যাহা বুঝেন, আমরা দেখাইলাম, সেরূপ সগুণ ঈশ্বর মনুষ্যের আদর্শস্থানীয় হইতে পারেন না। আদর্শ-

স্থানীয় হইতে পারেন না বলিয়া তিনি কখন আদর্শস্থানীয় হয়েন নাই। মানব-দৃষ্টিকে সেই ঈশ্বরের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া দিলে কি হইবে? মানব দেখে, ঈশ্বর এক স্বতন্ত্রপ্রকৃতির পদার্থ। সে পদার্থের সহিত মানবপ্রকৃতির কোন সাদৃশ্য নাই। মানবদৃষ্টি তজ্জন্য সেই লক্ষ্য হইতে নিরাশায় ফিরিয়া আসে, ফিরিয়া পৃথিবীর দিকে অর্পিত হয়। যাহা সম্ভব, যাহা নিজ প্রকৃতির সদৃশ, এমত আদর্শ স্থির করিয়া চরিত্রগঠনে নিয়োজিত হয়।

ঈশ্বর যখন মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ হইলেন,—মনুষ্য যখন হাজার চেষ্টা করিলেও সেই প্রকৃতি পাইতে পারিবেন না,—আমাদের জ্ঞানের হাজার অনুশীলন হইলেও সে জ্ঞান যখন নিজ প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকৃত বস্তুতত্ত্বজ্ঞানে আসিতে পারিবে না,—আমাদের শক্তি সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইলেও যখন ঐশ্বরিক শক্তির প্রকৃতি লাভ করিতে পারিবে না,—আমাদের আত্মা সহস্র গুণে পুণ্য-পূত হইলেও যখন সেই অনন্ত মঙ্গলময় ঈশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় এবং একভাব-সম্পন্ন নিত্য ভাবে উঠিতে পারিবে না,—সেই ভাবকে যদি তুমি পবিত্রতা বল, তবে সেরূপ পবিত্রতা যখন অর্জ্জিত পদার্থ নহে, এবং যখন তাহা যে মানব-চেষ্টায় অর্জ্জন করা যাইবে এমত সম্ভাবনা নাই,—তখন, হে ধর্ম্ম-গুরু, তুমি কিরূপে বল, যে মানব ঈশ্বরে লীন হইবে; এবং লীন হইলে তাহার মুক্তি হইবে? জলের সহিত জলই মিশিতে পারে। জলের সহিত তৈল মিশে না। ঈশ্বরের সহিত তদ্রূপ ঈশ্বর মিশিতে পারে কিন্তু মনুষ্য মিশিবে কেন? আমরা জানি ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হওয়া অথবা ঈশ্বরে লীন হওয়ার অর্থ মৃত্যু। মৃত্যু হইলেই সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই জন্য মৃত্যুই মনুষ্যের পক্ষে মুক্তি হইয়া দাঁড়ায়। মুক্তির যে আর কোন অর্থ সঙ্গত, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আর, প্রাকৃতিক অনন্ত মূল পদার্থ—যাহা স্পেনসরের অনন্ত Inscrutable Power of Nature তাহাকে যদি ঈশ্বর বল, তবেই মনুষ্য ঈশ্বরে লীন হইতে পারেন। মৃত্যু হইলে যখন এই দেহযন্ত্র পঞ্চীকৃত হয়, তখনই তাহা অনন্ত প্রাকৃতিক শক্তি-স্বরূপ ঈশ্বরে লীন হইয়া যায়। বোধ হয়, ঈশ্বরে লীন হওয়া এবং মনুষ্যের মুক্তির প্রকৃত অর্থ এই। মৃত্যু হইলেই মনুষ্য সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত হইলেন এবং তখন তিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত মিশিয়া সেই অনন্ত প্রকৃতি-শক্তি-স্বরূপ ঈশ্বরে লীন হইয়া গেলেন।

কিন্তু বঙ্কিমবাবুর অর্থ, বোধ হয়, অন্যরূপ। তিনি বলেন—তুমি এই মনুষ্য-প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ অনুমান কর, এই মনুষ্য-প্রকৃতির সম্পূর্ণতা অনুমান কর। সেই অনুমান তোমার ঈশ্বর। তুমি যখন সেই আনুমানিক চরমোৎকর্ষ লাভ করিবে, তখন তুমি দেখিবে যে, যাহা তুমি পূর্ব্বে কল্পনামাত্র করিয়াছিলে, তাহা সত্য হইয়াছে। এবং অনুমান সত্য হওয়া যাহা, তোমার ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হওয়া তাহা। সেই আনু-মানিক চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া তুমি তোমার ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া গেলে। সুতরাং তুমি ঈশ্বরে লীন হইলে। বঙ্কিমবাবুর মতে এই চরোমৎকর্ষ-অবস্থা প্রকৃত সুখের অবস্থা। কিরূপ সুখের অবস্থা তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি। সে যাহা হউক,

এই সুখের অবস্থা পাইয়া তোমার দুঃখের অবসান হইল, সুতরাং তুমি মুক্তি লাভ করিলে। বঙ্কিমবাবুর মতে হিন্দুধর্ম্মের মুক্তি এই।

এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্কিমবাবু কোমতের Humanity লইয়া ঈশ্বর গড়িলেন; এবং সেই ঈশ্বর-কল্পনার সহিত মুক্তির সঙ্গত অর্থ ঘটাইলেন। এই কল্পনায় একখানি সুন্দর কাব্য সৃষ্ট হইল—ঈশ্বর এবং মনুষ্যজীবনের মুক্তি যাহার প্রধান কল্পনা। ঈশ্বরের কল্পনায় বঙ্কিমবাবু মনুষ্যজীবনের কাব্য গড়িলেন। তিনি কি ধর্ম্ম সম্বন্ধেও উপন্যাস লিখিতে চান?

ধর্ম্মের যাহা সত্য, অনেক পণ্ডিত সেই সত্যকে কল্পনাময় কাব্য রূপে দেখাইতে চান। এরূপ করাতে ধর্ম্ম কেবল কবিত্ব হইয়া পড়ে। লোকে যাহা প্রকৃত দেবতা জ্ঞান করে, তাহা রূপক (Symbol) মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যাহা রূপক, তাহা রূপক মাত্র—তাহা সুন্দর কল্পনা মাত্র—তাহা প্রকৃত দেবতা নয়। যাঁহারা দেবতাকে এইরূপ রূপক মাত্রে পরিণত করিতে চান, তাঁহারা ধর্ম্মের স্বরূপতা বিনষ্ট করেন। তাঁহারা লোককে বুঝাইতে চান যে, যাহা তোমরা প্রকৃত দেবতা বলিয়া অর্চনা করিতেছ, তাহা কবির কল্পনা মাত্র, তাহা প্রকৃত দেবতা নহে। আমরা অনেক পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি যে হিন্দুধর্ম্মের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার কল্পনা সাংখ্যদর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতির রূপক মাত্র—ঈশ্বর এবং মানবীয় ঈশ্বর-প্রেমের অনুরূপ কল্পনা মাত্র। এই বহুকালের পুরাতন ব্যাখ্যা নবজীবনের দ্বিতীয় সংখ্যায় বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু লেখক হয় ত জানেন না যে, তিনি এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তদ্রূপ, আমাদের কালীমূর্ত্তি যে একটি সুন্দর রূপক, তাহা বহুকাল পণ্ডিত-মণ্ডলী মধ্যে জানা আছে। সেই রূপক ভাঙ্গিয়া দিয়া শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় দেবতাকে রূপকমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া সত্যকে যে অসত্য করিলেন, তাহা বোধ হয় তিনি ততদূর বোঝেন নাই। ধর্ম্ম কবিত্বময় তাহা আমরা জানি। কিন্তু ধর্ম্ম-গুরুগণ সেই কবিত্বকে সত্যরূপে দেখাইয়া আসিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের এই জন্য কোন বিষয়ের স্পষ্ট কারণ ও প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া নাই। ইহার অভিপ্রায় অতি নিগূঢ়।

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম, বঙ্কিমবাবুর ঈশ্বর প্রকৃত পদার্থ নহে, তাহা একটি সুন্দর কল্পনা মাত্র। মনুষ্যের সমুদায় শক্তির সামঞ্জস্য ও সম্পূর্ণতা অনুমান করিতে হইবে। সেইরূপ অনুমান করিয়া ঈশ্বর গড়িয়া তাঁহাকে আদর্শ করিতে হবে। এরূপ ঈশ্বর গড়া কি সম্ভব? আমরা কোন্ বিষয়ের সাকার কল্পনা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি? যাহা দেখিয়াছি, তাহারই রূপ মনে কল্পনা করিতে পারি। অনন্তের ভাব মনের আপেক্ষিক (Relative Idea) জ্ঞান মাত্র, কিন্তু অনন্তের স্বরূপ জ্ঞান অথবা সাকার কল্পনা (Conception or Concept) হৃদয়ে উদয় হয় না। যাহা আদর্শ হইবে, তাহার রূপ হৃদয়ে দেখা চাই। যাঁহার সামীপ্য, সালোক্য এবং সারূপ্য উপাসনা করিতে হইবে, তাহার স্বরূপ-জ্ঞান (Concept) হৃদয়ে উদয় হওয়া চাই। আমরা পূর্ব্বে যে ঈশ্বরের বিষয় লিখিয়াছি তাঁহার কোন স্বরূপ-জ্ঞান হয় না বলিয়া তিনি আদর্শ হইতে পারেন না। সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত ও নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ে উদয় হয় না বলিয়া তিনি

আদর্শ হইতে পারেন না। মনুষ্যের (Human perfection) সম্পূর্ণতা এবং মনুষ্যশক্তির সম্যক্ সামঞ্জস্য কি কেহ কখন দেখিয়াছে? যাহা কেহ কখন দেখে নাই, তাহার স্বরূপমূর্ত্তি কল্পনায় আনা যায় না। Human perfection, কেহ কখন দেখে নাই, তাহা আপেক্ষিক জ্ঞান মাত্র, তাহার স্বরূপ জ্ঞান অসম্ভব। অতএব বঙ্কিমবাবু যাঁহাকে ঈশ্বর বলেন সেই সম্পূর্ণ মনুষ্য—সেই মনুষত্ব (Humanity) মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারে না। মনুষ্য যাহা কল্পনা করিবে, তাহা মনুষ্যশক্তির বর্দ্ধিত অনুমান মাত্র। মনুষ্যের যেখানে দুই হাত, মনুষ্য সেখানে ভগবতীকে দশভূজা গড়িয়াছে। কিন্তু মনুষ্য আবার জানে, অতিশয় কিছু নয়। এই জন্য রাবণকে রাক্ষস গড়িয়াছে। বঙ্কিম বাবু যে শ্রীকৃষ্ণের কল্পনাকে এত প্রশংসা করেন, তাহা আর কিছুই নয়, সামান্য লোক অপেক্ষা অধিকতর বলবান, অধিকতর বুদ্ধিমান পুরুষের কল্পনা মাত্র। যখন তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা কল্পিত হইয়াছে, তখন তাঁহাকে অধিকতর বুদ্ধিমানই বা কিরূপে বলিব? মনুষ্যের কল্পনায় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। খুব খানিকটা জোর, খুব খানিকটা বুদ্ধি, খুব খানিকটা জ্ঞান, হদ্দ এই প্রকার একটি পুরুষ সৃষ্ট হয়। কিন্তু উহাদের সম্পূর্ণতা এবং সামঞ্জস্য কিরূপ তাহা অনুমেয় নহে। অতি বুদ্ধির সহিত অতি ভক্তির সামঞ্জস্য কিরূপ, অধিক জ্ঞানের সহিত অধিক কার্য্যের সামঞ্জস্য কিরূপ, অধিক শারীরিক বলের সহিত অধিক জ্ঞানের সামঞ্জস্য কিরূপ, তাহা আমরা কখন দেখি নাই। সুতরাং আমরা তাহার স্বরূপ কল্পনা করিতে পারি না। এক জনকে অধিক বল এবং অধিক জ্ঞান দিয়া কল্পনা করিলেই কি শারীরিক বলের সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য হইল? অসুরের ন্যায় বল লাভ করিতে গেলে আমার জ্ঞান লাভ হয় কই? পরমায়ুঃ সবে ৬০ কি ৭০ বৎসর। এই পরমায়ুঃ মধ্যে কেহ কি অসুরের ন্যায় বলবান হইয়া আবার জ্ঞানার্জ্জনের সময় পায়? যিনি অধিক জ্ঞানার্জ্জন করিতে গেলেন তিনি হয় তো অধিক জ্ঞানই পাইলেন। তাহার অন্যান্য বৃত্তি সকলের অনুশীলন হয় কই? এই ৬০।৭০ বৎসর মধ্যে সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ অনুশীলন করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক কে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ দ্বারা মুক্তি পাইতে পারে? এই জন্য আমরা বলি বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্ম ও মুক্তি, কথার কথা মাত্র। কিন্তু তিনি এমত কথা বলিতে পারেন, ষোল আনা না হয়, আট আনা ত হবে, ছয় আনা ত হবে। তাহা হইলেও ত আর মনুষ্যের ভাগ্যে ধর্ম্ম লাভ ঘটিল না। তিনি মুক্তি পাইলেন না। বঙ্কিম বাবু যাহাকে প্রকৃত সুখ বলেন, তাঁহার সেই প্রকৃত সুখ লাভও ঘটিল না। সুতরাং আমরা আবার বলি বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্ম ও মুক্তি, কথার কথা মাত্র। তাঁহার ঈশ্বর-সৃষ্টি কিরূপ কল্পনা মাত্র, তাঁহার আদর্শ-সৃষ্টি কিরূপ অসম্ভব, তাহাও আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা আরও দেখাইয়াছি, আদর্শবিরহিত হইলে যে উন্নতি হয় না, এমত নহে। যদি আদর্শ-বিহীন উন্নতি সম্ভব হয়, তবে অবশ্য বলিব, বঙ্কিম বাবু যাহাকে মনুষত্ব অথবা ধর্ম্ম বলেন, সেই মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্ম লাভ যদি সম্ভব হয়, তবে তৎকল্পিত ঈশ্বরবিরহেও তাহা লাভ করা যাইতে পারে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

সমর-শেখর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সুরশেখরের পবিত্র জীবনী আজি পাঠকদিগের নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিব। হিজিরা ৪১৫ (খ্রীঃ ১০২৪) অব্দে সোমনাথ দেবের পবিত্র মন্দির দুর্দ্ধর্ষ মাহমুদ গজনান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে রাও বিক্রমসিংহ নামক জনৈক সৌর রাজপুত নিজ ধন সম্পত্তি ও হতাবশিষ্ট আত্মীয়স্বজন এবং কতিপয় পরিচারক লইয়া সমুদ্রপথে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার তরণী কালিকূটের দক্ষিণস্থ একটী গিরিকূটের পাদদেশে আসিয়া সংলগ্ন হয়। তথায় বিক্রমসিংহ নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিকটবর্ত্তী গিরিকন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নির্জ্জন গিরিগহন—নিকটে লোকালয় নাই। তথাপি বিক্রম নির্ভয়ে সেই বিজন নিবিড় অরণ্যে বাস করিতে মনস্থ করিলেন। সুখের মধ্যে-তত্রত্য ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। দেখিয়া বিক্রম সেই স্থলেই এক খানি কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন এবং দস্যুভয়ে ধনসম্পত্তি নিকটস্থ একটী গিরিগহ্বরে প্রোথিত করিয়া কৃষি-অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই এক খানি কুটীরের স্থলে দুইখানি, দুইখানির স্থলে পাঁচখানি,—পাঁচখানির স্থলে দশ খানি; ক্রমে তাহা একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইল॥ বিক্রম সিংহ সেই পল্লীর অধিপতি হইলেন, নাম বিক্রমপুর রাখিলেন এবং গচ্ছিত অর্থের সাহায্যে ঘোটক ও অস্ত্রশস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া পঞ্চশত সৈনিক নিয়োগ করিলেন। দুই এক বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুরের নাম কালিকূটে বিস্তৃত হইল। কালিকূট তখন মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বিক্রমের অধ্যবসায় এবং বিক্রমপুরের ক্রমিক উন্নতির বিবরণ শ্রবণ করিয়া মহীশূর রাজ তাঁহাকে দূত দ্বারা ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বিক্রমসিংহ তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; উপযুক্ত বেশবিন্যাস করিয়া ত্রিশত অশ্বারোহীর সহিত রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সরল কথাবার্ত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার হস্তে কালিকূট নগর ও আরও তিন শত গ্রাম দান পূর্ব্বক তাঁহাকে তৎপ্রদেশের রাজপদে অভিষেক করিলেন।

সেই দিন হইতে ক্রমে দশ পুরুষ অতীত হইয়া গেল। শেষে সুরশেখর রাজা হইলেন। ভবানীশঙ্কর তাঁহার কনিষ্ঠ। ভবানীশঙ্কর স্বভাবতঃ ক্রুর ও দুরাত্মা। ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে সে অর্থের

সাহায্যে রাজ্যের সৈন্যসামন্তদিগকে হস্তগত করিল এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র সমর-শেখরকে বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন করিতে গিয়া পথিমধ্যে ভিলদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া আসিল। বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া বলিল "দস্যুরা সমরকে কাড়িয়া লইয়াছে।" সরলহৃদয় সুরশেখর তাহার কপটতা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সমরকে আর পাইলেন না। এইরূপে অনেক দিন অতীত হইল। ক্রমে ভবানীশঙ্করের ব্যবহার দর্শনে সুরশেখরের মনে সন্দেহ হইতে লাগিল। ক্রমে সতীশ জন্মগ্রহণ করিলেন। দুরাচর ভবানী তাহাকে জন্মরাত্রেই ধাত্রীদ্বারা নদীতে নিক্ষিপ্ত করিল। সুরশেখরের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি ভবানীশঙ্করকে শাস্তি দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই দুর্ব্বৃত্ত পরিশেষে তাঁহারই প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইল। রাজ্যের সমস্ত সৈনিক ও সামন্তদিগকে একত্রিত করিয়া সেই পাপিষ্ঠ স্বীয় অগ্রজের প্রাণনাশার্থ প্রাসাদ অবরোধ করিল। সুরশেখর অতি কষ্টে মহিষীর সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং গোপনে দূরদেশে পলায়ন করিলেন। পশ্চিমাচলের মধ্যস্থ পঞ্জোর নামক নিবিড় গিরিগহনে লুক্কায়িত থাকিয়া সুরশেখর ছদ্মবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া সমরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে পাইলেন এবং পঞ্জোরে লইয়া আসিয়া অতি সন্তর্পণে ও সতর্ক ভাবে লালন পালন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শশিশেখর সুরশেখরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই ভবানীশঙ্করের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ছিলেন; বুঝিতে পারিয়া সুরশেখরকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। সতীশকে জন্মরাত্রিতেই নদীতে নিক্ষেপ করিলে শশিশেখর তাহাকে তুলিয়া লইয়া ছিলেন এবং অনেক দিন পরে ছদ্মবেশী সুরশেখরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার হস্তে শিশুকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই পঞ্জোরের গিরিস্থানে সতীশ লালিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি বড় হইলেন। কিন্তু সুরশেখর তাঁহাকে পরিচয় দেন নাই এবং সমরকেও বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। কেন যে তিনি সেরূপ অজ্ঞাত ভাবে নিজ পুত্রের নিকট রহিলেন, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, সেই সময় হইতে তাঁহার মনে আর একটী গভীরতর চিন্তার উদয় হইল। সে সময়ে ভারত যবনশাসনে নিতান্ত নিপীড়িত, ভারতের অন্তঃসার শূন্য—ভারতসন্তান বিভ্রান্ত, আত্মবিস্মৃত ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরে খড়্গহস্ত। ভারতীয় অধিকাংশ হিন্দু রাজ্যের পরস্পরের সহিত সহানুভূতি নাই, পরস্পরের মধ্যে একতা নাই;—

সুভ্রাতৃত্ব নাই। আপনার লইয়াই সকলে সন্তুষ্ট। কেহ ভারতের বিষয় ভাবে না। যাহার রাজ্য আছে, সে তাহার রক্ষাতেই ব্যতিব্যস্ত; যাহার নাই, সে পরানুগ্রহে জীবিত; যে কাপুরুষ, লঘুচেতা সে আত্মরক্ষার্থ যবনের পদানত, যবনের ধর্ম্মে দীক্ষিত। ভারতের সেই সর্ব্বজনীন দুর্ভাগ্যকালে —সেই ভারতসন্তানগণের শোচনীয় অধঃপতন-সময়ে মাতৃভূমির দুর্দ্দশা দেখিয়া সুরশেখরের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যে হিন্দু চতুর্বর্ণের মধ্য একতা নাই—রাজার প্রজার সদ্ভাব নাই—পিতা পুত্রের মধ্যে সহানুভূতি নাই। ব্রাহ্মণগণ পৈতৃক পবিত্র নীতি ত্যাগ করিয়া ঘোর সার্থপর ও নিষ্ঠুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা দুরভীষ্ট সাধন করিতেছেন। সমাজে ঘোরতর বৈষম্য; কাহারও বিবাহ হয় না, কেহ আবার শত শত রমণীর পাণি গ্রহণ করিতেছে। কোন হতভাগিনী আজন্ম কুমারী হইয়া কাল যাপন করিতেছে,—কেহ বা নাম মাত্র বিবাহিত হইয়াছে, পরন্তু প্রকৃত বিধবার ন্যায় অতি কষ্টে দিনযামিনী যাপন করিতেছে। একদিকে সহমরণের পৈশাচিক মূর্ত্তি, অপর দিকে অভাগিনী কুলিনকন্যার মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, এক দিকে স্বার্থপর পাষাণ-হৃদয় কুলিন ব্রাহ্মণের ঘোর অত্যাচার, অপর দিকে বংশজ হতভাগ্যের শোচনীয় দুরবস্থা। এই সকল হৃদয়ভেদী সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র মনোদর্পণে প্রতিফলিত হওয়াতে সুরশেখর একদা চিন্তা করিলেন, "কি, বশিষ্ঠ বাল্মীকি, ব্যাস, পরশুরাম, ও ভীষ্মার্জ্জুনের লীলাভূমি ভারত কি এইরূপ রিপুপদতলে চিরকাল দলিত হইবে? ভারতসন্তানগণ কি এইরূপ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় চিরজীবন যাপন করিবেন? ভ্রাতায় ভ্রাতায় কি সদ্ভাব হইবে না? সহানুভূতি, সাম্য, একতা কি কেহ বুঝিবে না? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র কি পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিবে না?" এইরূপ গভীর চিন্তা উদিত হওয়াতে তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত সেই ষট্‌চক্র সৃষ্টি করিলেন। ষট্‌চক্রের মূলমন্ত্র ভ্রাতৃত্ব। তথায় স্ত্রীপুরুষ একত্রে থাকিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এমন কি চণ্ডালও একত্রে একপাত্রে আহার করিবে। সাম্য তাঁহাদের মূলমন্ত্র,—সন্ন্যাস ও আত্মোৎসর্গ তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম—স্বাধীনতা তাঁহাদের প্রধানতম কাম্য।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

লোপ সোরেজ অনেক দিন হইতে হিন্দু কারাগারে আবদ্ধ। গোয়াস্থিত পর্ত্তুগিজ প্রতিনিধি তাঁহার উদ্ধারের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যে সেনাপতি

ও আহার সোরেজের অনুসন্ধানে এক-বার যায়, সে আর ফিরিয়া আইসে না। গোয়ানগরীতে ক্রমে ক্রমে বিষম বিশৃঙ্খলার উদয় হইল। আলবুকার্ক অনেক দিন হইল পদচ্যুত হইয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত শাসনকর্ত্তার অভাবে তিনি এতদিন স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। মনে ছিল, সোরেজ আসিয়া তাঁহাকে গুরুতর কার্য্যভার হইতে নিষ্কৃতি দিবেন; কিন্তু তাহা হইল না। সোরেজ নিরুদ্দেশ।

আলবুকার্কের পক্ষে সোরেজ নিরুদ্দেশ, কিন্তু আমরা তাঁহার উদ্দেশ পাইয়াছি। তিনি সেই পশ্চিমাচলের উত্তর প্রদেশ স্থিত একটী শৃঙ্গোপরি কারাবদ্ধ। ঐ দেখ, তিনি সেই উচ্চ পাষাণ গৃহের অভ্যন্তরে উন্মত্তের ন্যায় ইতস্তত: বিচরণ করিতেছেন। মাথায় টুপি নাই; কেশশ্মশ্রু রুক্ষ—ধূলি ধূসরিত; অঙ্গরাখা ছিন্ন ভিন্ন; হস্ত দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ করিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে সজোরে কারাগৃহের ভিতর ভ্রমণ করিতেছেন। গৃহটী দীর্ঘে বিংশতি হস্ত এবং প্রস্থে আট হাত হইবে। গৃহের ভিতরে কিছুই নাই; কেবল একপার্শ্বে একখানি খট্টা,—খট্টার সম্মুখে একটী টেবেল;—টেবেলের দুইপার্শ্বে দুই খানি কাষ্ঠাসন। বোধ হয় কারাধ্যক্ষ সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন বলিয়া দুইখানি আসন রহিয়াছে। গৃহটী একটী বিচ্ছিন্ন শৈলকূটের শিরোদেশে স্থাপিত। শৈলকূট তিন দিকে খোলা, কেবল একদিকে একটী সমোচ্চ গিরিশৃঙ্গ আছে;—সেই শৃঙ্গটী কারাগারের সহিত একটী লৌহ সেতু দ্বারা সংলগ্ন। সেই সেতু দিয়াই কারাগারে আসিতে হয়। কারাগারের চারি দিকেই একটী করিয়া বাতায়ন এবং যে দিকে লৌহসেতু, সেই দিকে একটী দ্বার। দ্বারও বাতায়নগুলি লৌহদণ্ডময়। সমস্তগুলিতেই লোহার কবাট; তন্মধ্যে একমাত্র প্রবেশদ্বার ছাড়া আর সবগুলি উন্মুক্ত; কিন্তু সমস্ত জানালাতেই লোহার মোটামোটা গরাদে। সেই সমস্ত উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া অনন্ত গগন সোরেজের নয়নপথে পতিত হইতেছে; অনন্ত গগনে অনন্ত জলদমালা অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাই-তেছে; আকাশবিহঙ্গকুল তাহার উপর যেন সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে;—তাহাদের গতি স্বাধীন,—অপ্রতিরুদ্ধ—তেজস্বিনী। সোরেজ যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই সমস্ত স্বাধীন;—সেই দিকেই যেন স্বাধীনতার স্বর্গীয় মূর্ত্তি অনন্ত লীলায় মগ্ন রহিয়াছে। কিন্তু তিনি কি?—পরাধীন, কারারুদ্ধ, অবমানিত। কোথায় তাঁহার সেই জীবনতোষিণী আশার মোহিনী মূর্ত্তি?—সেই স্নিগ্ধ শান্তোজ্জ্বল আভা?—সেই স্বর্গীয় সুখের আবাসভূমি মাতৃভূমিই বা কোথা? কোথায় আজ তিনি ভারতে ইমানিয়ুলের প্রতিনিধি হইবেন, রাজ-সম্মান ভোগ করিবেন, না, আজি কারা-গারে! বন্দী—স্বাধীনতাচ্যুত—অব-মানিত! আর সহ্য হইল না। মস্তিষ্ক জ্বলিয়া উঠিল, প্রতি লোমকূপ দিয়া যেন জ্বলন্ত অনলশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় একটী বাতায়নের দিকে ধাবিত হইলেন, সজোরে তাহার লৌহদণ্ডের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এই সময়ে বহির্দ্দেশ হইতে দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ শ্রুত হইল। সোরেজ চমকিত হইয়া সেই দিকে অগ্নিময় নয়ন নিক্ষেপ করিলেন,—দেখিলেন কারাধ্যক্ষ প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার হৃদয় সহসা উল্লম্ফিত হইয়া

উঠিল; তিনি প্রচণ্ড বল সহকারে সেই উন্মুক্ত দ্বারভাগে ধাবিত হইলেন, গায়ে যত জোর কারাধ্যক্ষকে ধাক্কা মারিলেন; কিন্তু তাঁহাকে পদমাত্রও অপসারিত করিতে পারিলেন না। কারাধ্যক্ষ ক্ষিপ্র-হস্তে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সোরেজের হাত ধরিলেন। সোরেজ উন্মত্তের ন্যায় নিজ হস্ত মুক্ত করিয়া বিকট চীৎকার সহকারে প্রাণপণে কারাপতির গলদেশ চাপিয়া ধরিলেন। কারাধ্যক্ষের দেহে অসীম বল। তিনি অবলীলাক্রমে সোরেজের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাহাকে শূন্যে উত্তোলন পূর্ব্বক কক্ষায় উপর নিক্ষেপ করিলেন। সে আঘাতে বন্দীর সর্ব্বাঙ্গ যেন চূর্ণ হইয়া গেল। ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে নীরবে ভূমিতলে পতিত থাকিয়া সোরেজ ধীরে ধীরে উত্থিত হইলেন এবং মৃদুস্বরে বলিলেন "আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আপনি কখন আসিলেন?'

কারাধ্যক্ষও তদনুরূপ ধীরতার সহিত উত্তর করিলেন "এই মাত্র আসিতেছি। আপনি কেমন আছেন?'

"অদ্য বড় ভাল নহে। শরীর কেমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে;—মন কেমন উড় উড় করিতেছে;—হৃদয়ে গুরুতর বেদনা বোধ হইতেছে। আমায় আর কতদিন এরূপ অবস্থায় থাকিতে হইবে?

"সে আপনার ইচ্ছাধীন; আপনি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই নিষ্কৃতি পাইতে পারেন!"

সোরেজ ঈষৎ বিস্মিত হইলেন, বলিলেন "নিষ্কৃতি পাওয়া নিজের ইচ্ছাধীন কিরূপ? যখন অপরের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে, তখন তাহা নিজের ইচ্ছাধীন কেমন করিয়া হইতে পারে!"

"কেন, আমেডিসের মালিম যেমন করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।"

সোরেজের ললাট কুঞ্চিত হইল; ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, নয়ন দিয়া অনল স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি ঈষৎ কটু-স্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি, পিতৃলোকের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া!"

"পিতৃলোকের ধর্ম্ম কি!"

"কেন পবিত্র খৃষ্ট ধর্ম্ম।"

"এ ধর্ম্ম কি আপনার পিতৃপুরুষগণ আজন্ম ভোগ করিয়া আসিতেছেন? খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে তাঁহারা খৃষ্ট ধর্ম্ম কোথায় পাইয়াছিলেন?"

"আমি ও সব কিছু বুঝি না। আমার যাহা দৃঢ় সংস্কার, তাহাই করিব, যে ধর্ম্মের আজন্ম অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছি, প্রাণান্তেও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আপনাদের ইচ্ছা হয়, আমাকে মুক্তি দিবেন। জীবনের প্রতি আর আমার মমতা নাই।"

"যদি জীবনের উপর মমতা নাই তবে স্বাধীনতা চাহিতেছ কেন?"

"এখন আর চাহি না; স্বাধীনতার জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিব না। হস্তপদাদির স্বাধীনতার জন্য আত্মার স্বাধীনতা কেমন করিয়া হারাইব? আপনি চলিয়া যান, আমি এই কারাগারেই জীবন অতিবাহিত করিব।"

"আর অধিক দিন কারাগারে থাকিতে হইবে না। পর্টুগিজের বিরুদ্ধে শৈবী সেনা শীঘ্রই প্রকাশ্য সমর ঘোষণা করিবে, তাহা হইলেই আপনি মুক্তি পাইবেন।"

সোরেজ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে যুদ্ধ হইবে?"

"যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে, বোধ হয় এক সপ্তাহের মধ্যেই শৈবী সেনা গোয়া অবরোধ করিবে।" বলিয়া কারাধ্যক্ষ সোরেজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। দ্বার পুনর্ব্বার রুদ্ধ হইল।

রাধানাথ শিকদার।

প্রথম প্রস্তাব।

"The proper study of mankind is man"—*Pope.*

১৪ বৎসর হইল রাধানাথ শিকদার ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তাঁহার সহাধ্যায়িগণ, বন্ধুগণ ও আত্মীয়গণের মধ্যে অনেকেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি, শারীরিক বল, আচার ব্যবহার ও সকল কর্ম্ম স্বাধীনভাবে নির্ব্বাহ করা বিষয়ে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করেন। হিমালয়স্থিত মসুরী ও ডেরাডুন ও ফরাসি অধিকারস্থ ফরাসডাঙ্গায় তাঁহার সম্বন্ধে অশেষপ্রকার গল্প এক্ষণেও প্রচলিত আছে। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট তাঁহার বিষয় কিছু না কিছু জানা যায়। তাঁহার গণিতশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও শারীরিক বলের প্রশংসা বঙ্গীয় প্রাচীন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মুখে ধরে না। কি ইংরাজ, কি ফরাসী, কি বাঙ্গালী, কোন কার্য্যগতিকে তাঁহার সহিত আলাপ হইলে কেহ তাঁহাকে ভয় করিত, কেহ ভক্তি করিত, কেহ কেহ বা মনে মনে পূজা করিত। কিন্তু এক্ষণকার নব্য সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় নাই, অধুনাতন ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তাঁহার পরলোকগমনের ছয় বৎসর পরে তাঁহার এক ইংরাজ বন্ধুর হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল, তাঁহার কীর্ত্তিলোপের সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছিল ও হৃদয় কাঁদিয়াছিল। এই মহাত্মা সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭৬ সালের ২৪ জুন, তারিখের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রে এরূপ লিখেন—

"We feel quite certain that we shall command the sympathy of every highly educated native in India for our determination to rescue the name of one of the *greatest Mathematicians* which has adorned the honorable list of those who 'measured and computed the great Indian arc from neglect by those who owe so much to his memory"(১) শ্রদ্ধাস্পদ

(১) এই প্রবন্ধের লেখক কর্ণেল ম্যাকডোনাল্ড। ইনি ডেপুটী সরভেয়র জেনারল ছিলেন। তিনি পাওনিয়র ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় মৃত বন্ধুর পক্ষ সমর্থন করেন। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনতৎপর বাঙ্গালীর বন্ধু ম্যাকডোনাল্ড সাহেব এই অপরাধে গবর্ণর-জেনারল লর্ড লিটন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও—

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন "পরলোকগত রাধানাথ শিকদার—ইনি গণিতবিদ্যা অতি উত্তমরূপ জানিতেন, ইনি অতি বলশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না। এ নিমিত্ত দুষ্টস্বভাব ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বনিত না। সর্ব্বদা তাহাদিগের সহিত তাঁহার মুষ্টিযুদ্ধ হইত। ইনি বাবু প্যারিচাঁদ মিত্রের সহায়তায় "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ করিয়া পণ্ডিতী ভাষার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত সহজ ভাষায় রচনা করিবার দৃষ্টান্ত প্রথম প্রদর্শন করেন"। (২)

ডিরোজিও সাহেবের জীবনচরিতের এক স্থানে তাঁহার বিষয় এই মর্ম্মে লেখা আছে—রাধানাথ শিকদার ডিরোজিওর বন্ধুগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গণিতবেত্তা এবং অনেক কাল সরভেয়র-জেনেরলের আফিসে নিযুক্ত ছিলেন। সেই দলের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী ছিলেন এবং তাঁহার এই ধারণা ছিল যে আহারীয় বস্তুর উপর লোকের স্বভাব ও কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। তিনি বলিতেন যে গোখাদক জাতিরা পৃথিবী শাসন করে। যদিও খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই তথাপি তিনি সম্পূর্ণরূপে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ইংরাজি ধরণে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাহার বিশ্বাস ছিল যেযত দিন পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণ অধিক পরিমাণে গোমাংস ভক্ষণ না করিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা প্রধান জাতির মধ্যে পরিগণিত হইবে না। তিনি এই দ্রব্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। (৩)

পরলোকগত প্যারিচাঁদ মিত্র প্রণীত ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিতে তাঁহার বিষয় এইরূপ লেখা আছে—"সর্ব্ব প্রযত্নে দেশের উপকার সাধন করাই রাধানাথ শিকদারের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তাঁহার খেয়ালের মধ্যে গোমাংস

অপদস্থ হন ও তাঁহাকে তিন মাসের জন্য সরকারী কর্ম্ম হইতে সস্‌পেণ্ড করা হয়। সকল সংবাদপত্র এই অবিচার দেখিয়া কর্ণেল সাহেবের পক্ষ সমর্থন করেন। গবর্ণমেণ্টের হুকুমের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The decision of the Government of India is that Lieutenant Colonel Macdonald [illegible] be suspended from departmental duty on the receipt of these orders for a period of 3 months, on the expiration of which he will be placed in the *2nd* grade of [illegible] Superintendents of Revenue Survey immediately below Lieutenant Colonel Oakes, on a salary of Rs. 1327-14 per [illegible]. During the period of his suspension from [illegible] Lieutenant Colonel Macdonald will [illegible] the pay of his rank as an officer of the staff corps. It is further the desire of the Governor-General in Council that Lieutenant Colonel Macdonald shall not be again employed at head-quarters without the special sanction of government."

(২) হিন্দু বা প্রেসিডেন্সী কালেজের ইতিবৃত্ত ৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

• Radhanath Sickdar was the best mathematician in the group of Derozio's friends, and was long employed in the Surveyor-General's office. Physically he was the sturdiest of the lot, and held the theory that the food of a people determined their character and capacities. Beef eaters he declared ruled the world. Though not a Christian he had renounced Hindooism altogether and lived after the English fashion. He believed that India would never become a great nation till the inhabitants made use of diet consisting extensively of beef, in which he largely indulged.—*Calcutta Review, April* 1881

ভক্ষণ প্রচলন করাই প্রধান। তিনি বলিতেন গোখাদকেরা কখন পরাভূত হয় না। বাঙ্গালীদিগের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে শারীরিক উন্নতি আবশ্যক। অথবা যুগপৎ শরীর ও চরিত্র উভয়েরই উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হওয়া আবশ্যক। তিনি তিন বৎসর আমার সহিত "মাসিক পত্রিকা" সম্পাদন করেন।" (৪)

হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকায় এরূপ লিখিত আছে—"গণিতাধ্যাপক ডাক্তার টাইটলার তাঁহাকে প্রতিভাসম্পন্ন মনে করিতেন এবং তিনি (রাধানাথ) ও রাজনারায়ণ বসাক হিন্দুজাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নিকট নিউটনের প্রিনসিপিয়া গ্রন্থের উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যপাঠে প্রভূত আনন্দ লাভ করিতেন এবং মাসিক পত্রিকার জন্য প্লুটার্ক ও জেনোফন লিখিত গ্রন্থ হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন। তিনি কড়া ধরণের লোক ছিলেন এবং সদ্য সদ্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন এবং কার্য্যকরণ কালে ক্ষিপ্রকারিতার ন্যূনতা তাঁহাতে কখন পরিলক্ষিত হয় নাই। রাধানাথ অসাধারণ লোক ছিলেন ও তাঁহার অনেক সদ্‌গুণ ছিল। (৫)

১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের কমন্‌স সভা গ্রেট ত্রিগনমেট্রিকেল সারভে (Great Trignometrical Survey) সম্বন্ধে যে রিপোর্ট গ্রহণ করিয়া ছাপাইতে অনুমতি করেন তাহাতে এরূপ লেখা আছে:—জরিপ বিভাগের যাঁহারা সৈনিক শ্রেণীভুক্ত নহেন এবং যাহারা সবএসিষ্টাণ্ট নামে অভিহিত, তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর রাজভক্ত, কার্য্যতৎপর, ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এবং তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা ভারতবর্ষের শিক্ষার উন্নত অবস্থার বিশেষ পরিচায়ক। তাঁহাদের মধ্যে ভারতবাসী ব্রাহ্মণকুলজাত বাবু রাধানাথ শিকদার সুচারুরূপ কার্য্য নির্ব্বাহে ক্ষমতাশালী বলিয়া বিশিষ্টরূপ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার গণিত বিষয়ের শিক্ষা উচ্চ অঙ্গের। (৬)

(৪) Radhanath Sikdar had an ardent desire to benefit his country. His hobby was beef, as he maintained that beef-eaters were never bullied, and that the right way to improve the Bengalees was to think first of the Physique or perhaps physique and morale simultaneously. He conducted with me a monthly Bengalee Magazine called Masic Patrica for about 3 years.—*Biographical Sketch of David Hare, page* 32.

(৫) Dr Tytler, Professor of Mathematics thought highly of him, and he and Rajnaran Bysack were the first Hindu who received instruction from him in Newton's Principia. He wasparticularly fond of Greek and Latin literature and wrote several articles from Plutarch * * Xenophon &c. for the Patrika. He was a rough and ready man and never slow to show his pluck when there was occasion for it. * * Radhanath was a remarkable man and had many good qualities.—*Hindu Patriot, May 23rd, 1870.*

(৬) A more loyal, zealous, and energetic body of men than the Sub-Assistants forming the civil establishment of the Survey Department is nowhere to be found and their attainments are highly creditable to the state of education in India. Among them may be metioned, as most conspicuous for ability Babu Radhanath Sikdar, a native of India, of Brahmhinical extraction whose mathematical acquire-

রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর লিখিয়াছেন "আগেকার অফিসের কর্ত্তা সাহেবেরা তাঁহার নিকট গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগের গৌরব বর্দ্ধন করিতেন।" (৭)

১৮৩০ খৃঃ হইতে ১৮৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাধানাথ শিকদার সভ্য জগতে গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন, বঙ্গভাষা ও বামাগণের উন্নতি কামনায় পত্রিকা প্রকাশ ও ভারতের মঙ্গলের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি সম্যকরূপে সর্ব্ব প্রথমে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিগণের নিকট বাঙ্গালীর বিদ্যা বুদ্ধি ও শারীরিক বল দ্বারা কি হইতে পারে দেখাইয়াছেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী যুবক যিনি লাপলাস (Laplace) ও নিউটনের (Newton) উদ্ভাবিত গণিতশাস্ত্র পাঠ করিয়া বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের সত্যানুসন্ধানে সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পিতা মাতা ভাই বন্ধু সমস্ত ত্যাগ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে গৃহ ত্যাগী হইয়া সত্যের অনুসন্ধানে কর্ণেল এভারেষ্টের (Col Everst) (৮) সহিত হিমালয় শিখরে শিখরে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। যিনি গ্রীক, লাটিন, ফরাসি, জর্ম্মন সংস্কৃত ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার অনুশীলনে চিরজীবন কখন বিরত হন নাই; যাঁহার সাহস, অধ্যবসায়, সত্যপ্রিয়তা, শরীর ও মনের তেজ যৌবন কাল হইতে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সমভাবে বর্ত্তমান ছিল; যাঁহার নাম আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইংলণ্ডের মহাসভা ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; যাঁহার বিজ্ঞানশাস্ত্রের যশজ্যোতিঃ জর্ম্মনদেশ পর্য্যন্ত প্রতিফলিত হইয়াছিল; যাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি ভারতবর্ষীয় গ্রেট ট্রিগনমেট্রিকেল জরিপ (Great Trigonometrical Survey) বিভাগের স্তম্ভে স্তম্ভে বর্ত্তমান রহিয়াছে; যাঁহার গণিত শাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক সকল তাঁহার অগাধ বিদ্যার সাক্ষ্য দিতেছে অদ্য আমরা তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। একজন সহায় সম্পত্তি বিহীন বাঙ্গালী যুবক কেবল স্বকীয় বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা তৎকালীন ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান ও

ments are of high order.—*Report of the G. T. S. of India submitted to the House of Commons, 15th April, 1851.*

(৭) " * And pretends to have taken Lessons from my deceased friend Radhanath Sikdar, out of Laplace and Newton.—"*Bengaliana*" *Page 69.*

(৮) Colonel Everst R, A. F. R. S. Surveyor General of India and Superintendent G. T. S. of India. উক্ত মহাত্মার নামেই হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ "এভারেষ্ট শৃঙ্গ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইনি রাধানাথের পরম বন্ধু ও শিক্ষক ছিলেন। ইনি পণ্ডিত সমাজে অসাধারণ গণিতজ্ঞ বলিয়া খ্যাত। রাধানাথকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার সময় ইনিই বলিয়াছিলেন "I will make you a man" আমি তোমাকে এক জন মানুষের মত মানুষ করিয়া দিব।

গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কার্য্য বিভাগে কিরূপে সর্ব্বোচ্চ পদলাভ করিয়াছিলেন ও শারীরিক ও মানসিক শক্তি দ্বারা প্রভূত প্রতিপত্তি ও সম্মানের সহিত কিরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন পাঠক যদি জানিতে চাও আমার সঙ্গে চল, তাঁহার জীবন অপূর্ব্ব ঘটনাপূর্ণ।

যে সময়ে রাধানাথ জন্ম গ্রহণ করেন তখন প্রজ্বলিত হুতাশনে অবলা বঙ্গবিধবাগণ আপনাদিগকে আহুতি দিতেন। সেই সময়ে বৎসর বৎসর কেবল কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে সাড়ে তিন শত চারি শত বঙ্গবিধবা বৈধব্য যন্ত্রনা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিতেন। তখন গঙ্গাসাগরে জীবন্ত শিশু নিক্ষেপ করিয়া বঙ্গ রমণীরা মহা পুণ্য সঞ্চয় করিতেন। সেই বৎসর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় রঙ্গপুরের সরকারি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, পুস্তক রচনা, সতীদাহনিবারণ ও এদেশে ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তখন ভারতে ইংরাজ রাজ্য অতি অল্প পরিমাণে সংস্থাপিত হইয়াছে। তখন ইংরাজগণের চক্ষুশূল পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ পঞ্জাব ও কাশ্মীরের সিংহাসনে আসীন।

তাঁহার জন্মকালে ইংরাজ রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল নিম্নলিখিত তালিকা পাঠ করিলে জানা যাইবে।

Territory acquired by Lord Clive :—

1757. Twentyfour Purgunnahs.
1759. Muslipatam &c.
1760. Burdwan, Midnapore, chittagong.
1765. Bengal, Behar &c.
1765. Company's jaghire in the vicinity of Madras.
1766. Northern Sircars.

Territory further acquired :—

1775. *Zamindary of* Benares.
1776. Island of Salset.
1778. Nagore (from the Raja of Tanjore).
1778. Guntoor Circar.
1786. Pulo Pinag &c. (from the king of Queda).
1792. Malabar, Dindigul, Salem, Baramahl &c.

Territory acquired by Marquis of Wellesly :—

1799. Coimbatoor, Canara, Wynad &c.
1799. Tanjore.
1800. Districts acquired by the Nizam from Tippoo Sultan in 1792 and 1799.
1801. Carnatic.
1801. Goruckpoor, Lower Dooab, Bereilly &c. (from the Vizier of Oude.)
1802. Districts of Bundelcund.
1803. Kuttack and Balasore (from the Rajah of Berar).
1803. Upper part of the Doab, Delhi Territory &c. (from Dowlat Rao Scindia).
1805. Districts in Gujerat.
1815. Kumaon and part of the Terrai (from Nepal.)

তখন ঠগী ও ডাকাইতগণ ভারতের দেশে দেশে পথিকের সম্পত্তি লুণ্ঠনে ব্যস্ত। তখন প্রথম বাঙ্গলা সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ প্রচারিত হয় নাই। তখনও হিন্দুকলেজ সংস্থাপিত হয় নাই। তখনও প্রাতঃস্মরণীয় মেটকাফ সাহেব মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন

নাই। ভারতে ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনের প্রধান সহায় ও দণ্ডবিধি আইনের পাণ্ডুলিপিপ্রণেতা লর্ড মেকলে সাহেব এ দেশে আসেন নাই। তখনও প্রথম কাবুলযুদ্ধে ইংরাজের নামে কালি পড়ে নাই। তখনও বীরভূমি পঞ্জাবে সমরবহ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই। তখনও সিন্ধুদেশে স্বাধীনতালক্ষ্মী বিরাজমান ছিলেন। তখনও অর্থ পিচাশ স্বাধীনতা-বিক্রেতা পঞ্জাবী বীরগণ মুদ'ক, চিলেন-ওয়ালা, ফিরোজ সহর, আলিওয়াল, ও সোবরাউন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। তখনও পঞ্জাব, পেগু, সেতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, অযোধ্যা ও বিরারের রাজলক্ষ্মী বলে ছলে, ইংরাজকবলে কবলিত হয় নাই। এখনকার মত তখন রেলের গাড়ি, ষ্টীমার দ্বারা গমনাগমনের এরূপ সুবিধা ছিল না, বিচারকার্য্যের নিমিত্ত ভাল বিচারক ও বিচারালয় ছিল না, কোম্পানির সিবিল সার্ব্বেন্টেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। এক্ষণকার মত ডাকের ও তারের খবরের বন্দোবস্ত ছিল না। এদেশীয়গণ উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেন না। দেশে ইংরাজি স্কুল ছিল না, পড়িবার বহি ছিল না ও পড়াইবার লোক ছিল না। তখন বদান্যবর রামদুলাল দে (মৃ ১৮২৫) মতিলাল শীল (জ ১৭৯১—মৃ ১৮৫৪) ও সুবিখ্যাত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (জ ১৭৯৪—মৃ ১৮৪৬) স্বাধীন বাণিজ্য দ্বারা বঙ্গের নাম দেশে দেশে প্রচার করিতেছেন। রাধানাথের জন্মের ৭ বৎসর পূর্ব্বে অসাধারণ মেধাবী ও সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (মৃ ১৮০৬) মানবলীলা সংবরণ করেন। তখন ও সার রাজা রাধাকান্ত দেবের (জ ১৭৮৪—মৃ ১৮৬৮) শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশিত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় অক্ষয় বৃক্ষ রোপিত হয় নাই। প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ও ঠাকুর আইনাধ্যাপক স্থাপয়িতা প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের (জ ১৮০১—মৃ ১৮৬৮) বয়স কেবল ১২ বৎসর ও প্রসিদ্ধ পাঁচালি প্রণেতা দাসরথি রায় (জ ১৮০৪) কেবল ৯ বৎসরের বালক ও ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের (১৮০৯) বয়স কেবল ৪ বৎসর। তখন মদন মোহন তর্কালঙ্কার (জ ১৮১৫), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০), ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (জ ১৮২৭), কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জ ১৮২৮), দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯), বিচারপতি শম্ভু নাথ পণ্ডিত (১৮২০), দ্বারকা নাথ মিত্র (১৮৩৩), হিন্দুপেট্রিয়টের বিখ্যাত সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪—১৮৬১), পুরাতত্ত্ববিৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৪), রাজনীতিজ্ঞ রাজা দিগম্বর মিত্র (১৮১৩—১৮৭৯), ধার্ম্মিকবর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১০), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৫), গোবিন্দ সামন্ত-প্রণেতা রেভারেণ্ড লাল-বেহারী দে (১৮২৬) ও অধ্যাপক প্যারী-চরণ সরকার তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

ক্রমশঃ

মৃচ্ছকটিক ও তদুল্লিখিত আচার ব্যবহার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা সংক্ষেপে এই প্রকরণের কয়েকটী চরিত্রের বর্ণনা করিব। যে কয়েকটী চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বসন্তসেনা, চারুদত্ত, ধূর্ত্তা ও শকার প্রধান।

বসন্তসেনা। বসন্তসেনা বেশ্যার গর্ভজাত এবং বেশ্যালয়ে প্রতিপালিত; এবং বেশ্যার সংসর্গে তিনি কালযাপন করিতেন। কিন্তু বেশ্যাবৃত্তির উপর তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা—তিনি সৎসংসর্গাভিলাষিণী, গুণগ্রাহিণী, নিস্পৃহা, বদান্যা, সলজ্জা, অচঞ্চলা, এবং স্থির-প্রতিজ্ঞা। গ্রন্থকার সরিসৃপ-পরিবেষ্টিত, দুর্গন্ধ-শৈবালপরিপূর্ণ, দূষিত জলাশয়ের কুৎসিত পঙ্ক হইতে অপূর্ব্ব সহস্রদল-পদ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে প্রণয়ে স্বার্থনাশ নাই সে প্রণয় প্রণয়ই নহে। বসন্তসেনার প্রণয়ে স্বার্থনাশের পরাকাষ্ঠা। বসন্তসেনাকে করায়ত্ত করিবার জন্য সংস্থানক (শকার) স্ত্রীলোকের অতি প্রলোভনের দ্রব্য—দশ সহস্র সুবর্ণ মূল্যের অলঙ্কার প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য শকট প্রেরণ করিয়াছিল। বসন্তসেনার মাতাও শকারের নিকট যাইবার জন্য দাসী দ্বারা আদেশ করিয়া পাঠান; আদেশ শুনিবামাত্র বসন্তসেনা ক্রোধ করিয়া দাসীকে বলিলেন "দূর হও, পুনরায় এমন কথা মুখে আনিও না।" দাসী ভয়ে কাঁপিয়া বলিল "তবে আপনার মাকে কি বলিব?" বসন্তসেনা বলিলেন "বলিও, যদি মা আমাকে জীবিতা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে যেন এমন আদেশ কখনও না করেন।"

বসন্তসেনা অত্যধিক মূল্যের "চতুঃ-সমুদ্রসারভূত" রত্নাবলী পাইয়া ক্ষণ-মাত্রও তাহা আত্মসাৎ করিবার বাসনা করেন নাই। তাঁহার অসঙ্গত অর্থ-লিপ্সা যে ছিল না গ্রন্থকার অতি সুস্পষ্ট রূপে তাহা দেখাইয়াছেন।

বসন্তসেনা যে অর্থের লালসা রাখেন না, তাহার অকাট্য প্রমাণ দরিদ্র চারু দত্তের উপর তাঁহার মনঃসমর্পণ। মদনিকা বসন্তসেনাকে শূন্যহৃদয়া দেখিয়া যখন জানিল যে বসন্তসেনা অনুরাগবতী হইয়াছে, তখন বলিল "আপনি কি রাজা অথবা রাজবল্লভ সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?"

বসন্তসেনা বলিলেন "আমি কাহাকেও ধনের জন্য সেবা করিতে ইচ্ছা করি না—প্রণয়তৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা করি।" মদনিকা একে একে জানিলেন বসন্তসেনার প্রণয়ের পাত্র রাজা নহে,

রাজবল্লভ নহে, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নহে, অতুল বিভবশালী বণিকও নহে, একজন দুর্দ্দশাপন্ন দরিদ্র যুবকমাত্র। যখন বসন্তসেনা জানাইলেন যে সে ব্যক্তি চারুদত্ত, মদনিকা বলিল "শুনেছি, তিনি দরিদ্র।" বসন্তসেনা অমনি বলিলেন "এই জন্যই আমি কামনা করি।"

মদনিকা বলিল "আর্য্যে কুসুমহীন সহকারপাদপ কি মধুকরী কখন সেবা করে?"

বসন্তসেনা বলিলেন "এই জন্যই ত তাহাদিগকে মধুকরী বলে"—মধুর সঙ্গে এক মাত্র সম্পর্ক—এ সম্পর্ক বসন্তসেনা ঘৃণা করেন। এই স্থলে গ্রন্থকার অল্পকথায় বসন্তসেনার স্বার্থত্যাগ ও গুণগ্রাহিতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন।

বসন্তসেনা যে শকারের হস্তে নির্দ্দয়রূপে প্রাণসঙ্কট কষ্ট পান তাহাও চারুদত্তের উপর অনুরাগের অন্যতম ফল। যে প্রণয়ে বসন্তসেনা ধনের আশা করেন নাই, প্রাণের আশা করেন নাই, তাহাকে নিঃস্বার্থ প্রণয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

বসন্তসেনা বদান্যা। সংবাহকের মুক্তি ও মদনিকার দাস্যমোচন ও রোহসেনকে সুবর্ণশকট নির্ম্মাণ জন্য অলঙ্কার দান, ইহা প্রমাণ করিতেছে। সংবাহক এক সময়ে চারুদত্তের ভৃত্য ছিল। চারুদত্তের নামে বসন্তসেনা উন্মত্তা—চারুদত্তের চাকর ছিল বলিয়া সংবাহকের কত আদর!

বসন্তসেনা সহৃদয়া। তিনি বিশুদ্ধ প্রণয়ের আস্বাদন বুঝিতে পারিতেন—নিজ প্রণয়ের বাধা পাইয়া, প্রণয়ের বাধার ক্লেশ বুঝিতেন; যখন জানিলেন যে মদনিকা শর্বিলকের প্রতি প্রণয়বতী, এবং মদনিকার দাস্য, প্রণয়ের এক মাত্র প্রতিরোধক; তিনি তৎক্ষণাৎ মদনিকাকে দাস্যবৃত্তি হইতে মুক্ত করিলেন।

এইরূপ বদান্যতা ও সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া তিনি অহঙ্কারশূন্য। মদনিকাকে মুক্তি দিয়া তিনি অবিলম্বে শকটে আসিয়া বিদায় দিয়া বলিলেন "সম্প্রতি তুমি আমার বন্দনীয়া হইয়াছ, আমাকে মনে রাখিও।" বসন্তসেনার কথায় তাঁহার অকপট আনন্দ ও বিনয় সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি নিজের স্তুতিবাদ শুনিতে ভাল বাসিতেন না। সংবাহক বসন্তসেনাকে জীর্ণোদ্যানে মৃতবৎ অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়া যখন বসন্তসেনার পূর্ব্বকৃত উপকার উল্লেখ করতঃ নিজের পরিচয় দিল তখন বসন্তসেনা স্তুতিবাদ শুনিতে চাহেন নাই।

বসন্তসেনা চতুরা। বেশ্যার তনয়ার চতুরতা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু বসন্তসেনার চতুরতা বেশ্যার চতুরতা নহে; ইহা নির্দ্দোষ প্রণয় সাধনের চতুরতা—ইহার উদ্দেশ্য মহৎ। চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অনুরাগ ও তাঁহার বিচ্ছেদজনিত বসন্তসেনার কষ্ট দেখিয়া মদনিকা বলিল "আর্য্যে! যদি চারুদত্ত আপনার

অভিলষিত ব্যক্তি হইয়া থাকেন তবে সহসা অভিসার করুন না কেন?"

বসন্তসেনা জানিতেন চারুদত্ত নির্ধন হইলেও তাঁহার পূর্ব্ব স্বভাব যায় নাই। তিনি বলিলেন "চারুদত্ত প্রত্যুপকার করিতে অশক্ত; সহসা অভিসার করিলে, প্রত্যুপকার করিবার আসক্তি হেতু হয়ত তাঁহাকে পুনরায় দর্শন পাইব না।"

মদনিকা। তবে কি এই কারণে তাঁহার হস্তে অলঙ্কার ন্যস্ত করিয়াছেন?

বসন্তসেনা। ঠিক কথা বলেছ।

পাঠকগণ এই আলাপে দেখিবেন, বসন্তসেনার হৃদয় কত প্রশস্ত ও তিনি কেমন সহৃদয় এবং অলঙ্কারন্যাসে তাঁহার কি সদাশয়পূর্ণ গূঢ় অভিপ্রায় ছিল।

বসন্তসেনা গুণগ্রাহিণী। শর্ব্বিলকের হস্তে অপহৃত ন্যস্ত অলঙ্কার পুনঃপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে যখন বসন্তসেনা মৈত্রেয়ের হস্তে অমূল্য রত্নমালা প্রাপ্ত হইলেন এবং মৈত্রেয় জানাইল যে ন্যস্ত ধন চারুদত্ত দ্যূতে হারাইয়াছেন, তখন চারুদত্তের ব্যবহারে বসন্তসেনা যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। সেই সময় হইতে চারুদত্তকে তিনি দ্যূতকর বলিতে ভাল বাসিতেন—কারণ, এই অলীক দ্যূতক্রীড়ার প্রস্তাবে চারুদত্তের হৃদয়ের মহানুভাব তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। যখন বিদূষক চারুদত্তকে সংবাদ দিল যে অপহৃত সুবর্ণভাণ্ড প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে চারুদত্ত বসন্তসেনার সমভিব্যাহারিণী দাসীকে বলিলেন "ভদ্রে! সত্যই এই কি সেই সুবর্ণভাণ্ড?" দাসী বলিল "হাঁ তাহাই বটে।" চারুদত্ত বলিলেন "ভদ্রে! আমার নিকট প্রিয় সংবাদ দিয়া কেহ নিষ্ফল হয় নাই, অতএব তুমি এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর।" কিন্তু নির্ধন চারুদত্ত অঙ্গুরীয় দিতে চাহিয়া দেখেন তাঁহার অঙ্গুরীয় নাই। তিনি লজ্জিত হইলেন। নিকটে বসন্তসেনা বসিয়াছিল। চারুদত্তের এই ভাব দেখিয়া মনে মনে বলিলেন "এই জন্যই ইহাঁকে কামনা করি।" বসন্তসেনা যে কেমন গুণগ্রাহিণী গ্রন্থকার তাহা এই স্থলে উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন।

বসন্তসেনা লজ্জাশীলা। বসন্তসেনা অভিসারে যাইয়া সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "আমি প্রবেশ করিয়া কি বলিব?" তাঁহার সঙ্গিনী বলিল "বলিও, দ্যূতকর! তোমার এই সন্ধ্যা সময় ত সুখে অতিবাহিত হইতেছে।" বসন্তসেনা কহিলেন "বলিতে ত পারিব?" এই গণিকাকন্যার এ সলজ্জভাব কেমন সুন্দর!

বসন্তসেনা সাধারণ নারীর ন্যায় পরের গোপনীয় কথা জানিতে ইচ্ছুক নহেন। বসন্তসেনা মদনিকাকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিলে, শর্ব্বিলক অপহৃত অলঙ্কার লইয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। মদনিকাও কর্ত্রীর আদেশ বিস্মৃত হইয়া শর্ব্বিলকের সঙ্গে আলাপে নিযুক্তা হইল।

বিলম্ব দেখিয়া বসন্তসেনা গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন মদনিকা সস্পৃহ নয়নে নিশ্চল দৃষ্টিতে শর্ব্বিলককে দেখিতেছে, তখন তিনি মদনিকাকে আহ্বান করিয়া তাহার প্রণয়ের বিঘ্ন করা অসঙ্গত মনে করিলেন। শর্ব্বিলক সশঙ্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বলিল "মদনিকে! তোমাকে কিছু গোপনীয় কথা বলিব— এ স্থান নির্জ্জন বটে ত?"

মদনিকা বলিল "তাহাই বটে"। বসন্তসেনা মনে মনে বলিলেন "গোপনীয় কথা বলিতে চাহিতেছে—তবে আমি শুনিব না।" সাধারণ মনুষ্য হইলে পরের গোপনীয় শুনিবার জন্য কত উৎসুক হইত। গ্রন্থকার এই স্থলে বসন্তসেনার স্বজনের উপর মমতাও উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন।

আমরা দুই একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া বসন্তসেনার চরিত্রের কিয়দংশ দেখাইলাম; কোন চরিত্রের বিস্তৃত সমালোচনা এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। গ্রন্থকার বসন্তসেনার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা স্নিগ্ধ, দোষরহিত নানাগুণসম্পন্ন।

চারুদত্ত। আমরা সংবাহক প্রভৃতির মুখে জানিয়াছি যে চারুদত্তের বিভব বর্ত্তমানে তিনি দানশীল ও সাধু পুরুষ ছিলেন। আমাদের সহিত তাঁহার দরিদ্রাবস্থায় পরিচয়। দরিদ্র বলিয়া চারুদত্তের সর্ব্বদা আক্ষেপ। দরিদ্র সম্বন্ধে তাঁহার আক্ষেপোক্তিতে গ্রন্থকার বিলক্ষণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে আমরা তাহা উল্লেখ করিলাম না।

দরিদ্র অবস্থাতেও চারুদত্তের সাধুতা, সত্যবাদিতা বা সরলতার কোন প্রকার হ্রাস হয় নাই, বরং পরিস্ফুট হইয়াছে। বসন্তসেনার গোপনে গচ্ছিত বহুমূল্য অলঙ্কার চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে চারুদত্ত আপনাকে যারপরনাই বিপদাপন্ন মনে করিলেন। প্রথমতঃ, ন্যস্ত ধনের বিনাশ ও বসন্তসেনার ক্ষতিপূরণে তাঁহার অসামর্থ্য। দ্বিতীয়তঃ, চরিত্রদূষণ অপবাদ রাষ্ট্রের আশঙ্কা। কিন্তু মৈত্রেয় দেখিল গোপনে ন্যস্ত ধন গোপনে হৃত হইয়াছে। ন্যাসের সময়েরও অন্য সাক্ষী নাই—চুরি করারও কোন সাক্ষী নাই। শঠ পরামর্শকের ন্যায় সে বলিল "আমি এই ন্যাসের বিষয় মিথ্যা বলিব। কে দিয়েছে? কে নিয়েছে? কেই বা তাহার সাক্ষী?"

দুর্ব্বলহৃদয় কোন ব্যক্তির নিকট এরূপ প্রস্তাব করিলে সে সাধুবাদ দিয়া মৈত্রেয়ের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিত। চারুদত্ত বলিলেন "আমি ন্যস্ত ধন প্রত্যর্পণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিব, কিন্তু চরিত্রধ্বংসকারক মিথ্যার কখনও আশ্রয় গ্রহণ করিব না।" চারুদত্ত যে কতদূর মহদন্তঃকরণের লোক তাহা এস্থলে উত্তমরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

অলঙ্কার ন্যাসে বসন্তসেনার যে গূঢ় অভিপ্রায় ছিল চারুদত্ত তাহা জানিতেন না। যখন চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে রত্নমালা দান করিলেন, তখন চারুদত্ত, পাছে বসন্তসেনা অপহরণ বৃত্তান্ত জানিয়া রত্নমালা লইতে অস্বীকার করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এই ভাবিয়া মৈত্রেয়কে বলিয়া দিলেন "বসন্তসেনাকে আমার হইয়া বলিও যে সুবর্ণভাণ্ড নিজের বিবেচনায় দ্যূতে হারিয়াছি—এই রত্নমালা গ্রহণ কর।"

মৈত্রেয় বলিল "যে দ্রব্য খেলেম না, ভোগ করিলেম না, এমন সামান্য জিনিস—তাও আবার চোরে নিয়েছে তার জন্য আপনি এই অমূল্য রত্নাবলী কখনও দিবেন না।"

চারুদত্ত বলিলেন "যে বিশ্বাস সহকারে আমার নিকট এই দ্রব্য ন্যস্ত করিয়াছে সেই সুমহৎ বিশ্বাসের মূল্য স্বরূপ এই রত্নাবলী দিতেছি—সুতরাং তুমি ওরূপ বলিও না।" তুমি আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর যে বসন্তসেনাকে এই বস্তু গ্রহণ না করাইয়া আসিবে না।" মৈত্রেয় বলিল "দরিদ্র হইয়াও যে অত্যন্ত দানশীলতা দেখাইতেছ।"

চারুদত্ত বলিল "সখে! আমি দরিদ্র কিসে? আমার সম্পদ বিপদের অনুগতা ভার্য্যা, তুমি সুখদুঃখে সুহৃৎ, আমি সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই, দারিদ্রের এ সকল দুর্লভ; তবে আমি দরিদ্র কিসে?"

পাঠকমহাশয়গণ এই আলাপে দেখিতে পাইবেন চারুদত্তের মন কত উচ্চ।

আবার যখন মৈত্রেয় রত্নমালা বসন্তসেনাকে দান করিয়া আসিল তখন চারুদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "বয়স্য যে কার্য্যে গিয়াছিলে, তাহার কি হইল?"

মৈত্রেয় বলিল "কার্য্য নষ্ট হইয়াছে।"

চারুদত্ত ভাবিলেন বসন্তসেনা বুঝি অলঙ্কারের বিনিময়ে রত্নাবলী গ্রহণ না করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি বলিলেন "কি! সে কি রত্নাবলী গ্রহণ করে নাই?" এই প্রশ্ন চারুদত্তের হৃদয়ের ভাব কেমন সুস্পষ্ট দেখাইতেছে। তাঁহার নিজের দরিদ্রতা, তাঁহার স্ত্রীর সহায়তা, সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তিনি পরের ভাবনা ভাবিতে ছিলেন। বিদূষক বলিল "আমাদের কি তেমনি অদৃষ্ট হবে? সে নব-নলিনীতুল্য কোমল অঞ্জলি মস্তকে লইয়া গ্রহণ করিল!" চারুদত্ত বলিলেন "তবে বিনষ্ট হইল এ কথা কেন বল?"

চারুদত্তের হৃদয় যেমন মহৎ তিনি আবার তেমনই সরল। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা অনুকরণীয়। তিনি নীচতম ভিক্ষাবৃত্তি করিতে স্বীকৃত ছিলেন, তথাপি তিনি সত্যভ্রষ্ট হইতে সম্মত হন নাই। এ দিকে তিনি নিজের ভ্রম স্বীকারে প্রস্তুত, তথাপি অপরকে মিথ্যাবাদী বলিতে অগ্রসর নহেন। শর্ব্বিলক কর্তৃক সুবর্ণভাণ্ড অপহরণ বৃত্তান্ত বোধ হয় পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ আছে। প্রথমতঃ

যথন চারুদত্ত ও মৈত্রেয় রদনিকা কর্ত্তৃক জাগরিত হইল, তথন সুবর্ণভাণ্ড ন্যাসের কথা কাহারও স্মরণ ছিল না। চারুদত্ত সন্ধিখননের কুশলতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিদূষক বলিল "এই সন্ধি দুই প্রকারের লোকে করিয়া থাকিবে—এই ব্যক্তি আগন্তুক হইবে অথবা চুরি ও সন্ধিখনন শিক্ষা করিতেছে; নতুবা উজ্জয়িনীতে কে এমন আছে যে আমাদের ঐশ্বর্য্য জানে না?"

চারুদত্ত বলিল "আমার প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিয়া কোন বিদেশী সন্ধিখনন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পশ্চাৎ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আহা! এ লোকটা যাইয়া বন্ধুদিগকে কেমন করিয়া বলিবে 'যে বণিকের গৃহে প্রবেশ করিয়া কিছুই পাই নাই।"

বিদূ। তুমি আবার চোরের মনের ভাব ভাবিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে? সে ভাবিয়াছে এই প্রকাণ্ড গৃহ কত রত্ন ভাণ্ড—সুবর্ণ ভাণ্ড—বলিতে বলিতে বসন্তসেনার সুবর্ণ ভাণ্ডের কথা মনে পড়িল। তথন বলিল "সে সুবর্ণভাণ্ড কোথায়?"

এই স্থলে বলা আবশ্যক হইতেছে যে শর্ব্বিলক যথন গৃহে কোন দ্রব্য না পাইয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায়, তথন মৈত্রেয় অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় চারুদত্তকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিল "বয়স্য সন্ধির মত দেখিতেছি, চোর বুঝি আসিয়াছে, তুমি এই সুবর্ণভাণ্ড লও" এই বলিয়া সুবর্ণভাণ্ড চারুদত্তের হাতে দিতে উদ্যত হইল। শর্ব্বিলক তথন দেখিল, তাহার সন্ধিখনন বৃথা হয় নাই। সে অবসর বুঝিয়া বিদূষকের হস্ত হইতে উহা গ্রহণ করিল। সন্ধিখননের জন্য জল সেচন করাতে চৌর শর্ব্বিলকের হস্ত শীতল হইয়াছিল। বিদূষক চারুদত্ত ভ্রমে শর্ব্বিলকের হস্তে অলঙ্কার দিবার সময় বলিল "বয়স্য তোমার অগ্রহস্ত শীতল।" শর্ব্বিলক তথন কক্ষে হস্ত রাখিয়া উষ্ণ করিয়া উহা গ্রহণ করিল। বিদূষক বলিল "লইয়াছ?"

শর্ব্বিলক বলিল "ব্রাহ্মণের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারি না—লইলাম।"

বিদূষক বলিলেন "এখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাই"। শর্ব্বিলক মনে মনে বলিল "মহাব্রাহ্মণ! শতবর্ষ ঘুম আইস।"

চৌর নিষ্ক্রান্ত হইবার পর যথন পূর্ব্বোক্ত রূপ চারুদত্ত ও বিদূষকের সহিত আলাপ হইতেছিল তথন অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় অলঙ্কার প্রত্যর্পণের কথা বিদূষকের স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায় সে বলিল "বয়স্য তুমি সতত বল যে মৈত্রেয় মূর্খ, মৈত্রেয় অপণ্ডিত, কিন্তু আজ তা বলিবার যো নাই, আমি সুবর্ণভাণ্ড তোমার হাতে দিয়ে ভাল করেছি; তা না হলে, চোর নিয়ে যেতো।"

চারুদত্ত বলিল "বয়স্য পরিহাস করিও না।"

বিদূষক বলিল "আমি যেন মূর্খই হইলাম, আমার কি পরিহাসের দেশ কাল বিবেচনা নাই?"

চারু। কোন্ সময়?

বিদূ। যখন তোমাকে বলিলাম তোমার অগ্রহস্ত শীতল।

চারু। হাঁ—তা হতে পারে।

এস্থলে পাঠক মহাশয় দেখিবেন যে চারুদত্ত নিজের ভ্রম স্বীকারে প্রস্তুত, তথাপি তিনি বিদূষককে মিথ্যাবাদী মনে করেন নাই।

চারুদত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক। শকার তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার ও অসম্ভব দুষ্কার্য্য আরোপ করিয়া তাঁহার প্রাণবধের জন্য যত্ন, ও তাহা সিদ্ধপ্রায় করিয়াছিল; সেই শকার যখন আবার প্রাণভয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইল তখন তিনি তাহাকে অভয় দান করিলেন। বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, এমন কি বসন্তসেনা বিরহে তিনি মৃত্যু স্বীকার করিয়াছিলেন; যখন সকলে শকারকে বধ করিবার নিমিত্ত চারুদত্তকে আদেশ দিতে অনুরোধ করিতে লাগিল তখন সেই বসন্তসেনা চারুদত্তের গলদেশ হইতে বধ্যমালা লইয়া শকারের গলায় পরাইয়া দিলেন। ইহা অপেক্ষা আর স্পষ্ট অনুরোধ কি হইতে পারে? কিন্তু চারুদত্ত একবার যাহা বলিয়াছেন তাহা কাহারও কথায় ফিরাইয়া লইবার লোক নহেন। তিনি সমস্ত অনুনয় অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বলিলেন "আমি শরণাপন্নকে অভয় দিয়াছি—ইহাকে বধ করিতে দিব না।" চারুদত্ত সকলের প্রিয় হইতে বাসনা করেন বটে কিন্তু প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বা সত্যভ্রষ্ট হইয়া প্রিয় হইতে চাহেন না।

চারুদত্তের চরিত্রে আরও অনেক সুন্দর অংশ আছে; প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে আমরা এই স্থলে ক্ষান্ত হইলাম। বসন্তসেনা চারুদত্তকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"গুণপ্রবালং বিনয়প্রশাখং বিশ্রম্ভ-মূলং মহনীয়পুষ্পং তং সাধুবৃক্ষং স্বগুণৈঃ ফলাঢ্যং—"

গ্রন্থকার ঘটনা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে চারুদত্তের এই সকল বিশেষণ নিরর্থক নহে।

ধূতা। ধূতা অল্পই দেখা দিয়াছেন কিন্তু যেটুকু দেখা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়।

চারুদত্ত যেমন চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করাকে মহৎ অনিষ্টজনক মনে করেন, ধূতাও ঠিক সেইরূপ বিবেচনা করেন। অলঙ্কার অপহৃত হইবার সংবাদ পাইলে ধূতা দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্য্যপুত্র ও আর্য্য মৈত্রেয়ের শরীর অপরিক্ষত আছে, একথা ত ঠিক?"

দাসী বলিল "স্বামিনি, তা সত্য বটে কিন্তু সেই বেশ্যার অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে।" এই সংবাদ শুনিয়া ধূতা মূর্চ্ছিত হইলেন। আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন "আর্য্যপুত্রের চরিত্রের হানি হওয়া

অপেক্ষা শরীরের হানি হওয়া ভাল ছিল।” এরূপ মনের ভাব অসামান্য মহত্ত্বের পরিচয়।

তার পর, ধূতা চারুদত্তের শিরে বিশ্বাস-ঘাতকতার দোষ যাহাতে পড়িতে না পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতৃদত্ত একটী রত্নাবলী মাত্র ছিল, ধূতা মনে করিলেন অলঙ্কারের বিনিময়ে উহা দেওয়ার জন্য চারুদত্তের হস্তে দিবেন। কিন্তু চারুদত্তকে দিতে গেলে তাহা ত চারুদত্ত লইবেন না। চিন্তা করিয়া ধূতা মৈত্রেয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন “আর্য্য আপনি পূর্ব্বাস্য হউন”। মৈত্রেয় পূর্ব্বাস্য হইলেন। ধূতা তাঁহার হস্তে রত্নাবলী দিয়া বলিল “ইহা প্রতিগ্রহণ করুন।” বিস্মিত হইয়া মৈত্রেয় বলিল “একি!” ধূতা বলিলেন আমি রত্নষষ্ঠি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম; তাহাতে বিভবানুসারে ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়—এপর্য্যন্ত দান হয় নাই; সেই জন্য এই রত্নমালা দান করিলাম, গ্রহণ করুন।”

মৈত্রেয় সমস্ত বুঝিতে পারিয়া বলিল “গ্রহণ করিলাম; প্রিয় বয়স্যকে এ কথা বলি।”

ধূতা বলিলেন “আর্য্য মৈত্রেয়! আমাকে লজ্জা দিবেন না।” ধূতা চলিয়া গেলেন, চারুদত্তের মুখে প্রশংসাবাদ শুনিবার অপেক্ষাও করিলেন না।

ধূতা এইবার প্রথম দেখা দিয়া তাঁহার অসাধারণ গুণবত্তা ও মধুর লজ্জাশীলতা দেখাইয়া গেলেন।

অপর আর এক স্থলে তাঁহার কথা আমরা শুনিয়াছি। বসন্তসেনা যখন ষষ্ঠ অঙ্কে ধূতাকে রত্নমালা ফিরাইয়া পাঠাইলেন, ধূতা চারুদত্তের দত্ত সম্পত্তি পুনর্গ্রহণ অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া দাসীর মুখে বলিয়া পাঠাইলেন “আর্য্যপুত্র বসন্তসেনাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই রত্নাবলী দিয়াছেন, আমার ইহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। বসন্তসেনাকে বলিও যে আর্য্যপুত্রই আমার আভরণ বিশেষ।”

দুর্দ্দশাপন্ন জাতিস্বভাব-ভূষণপ্রিয় রমণীর নিস্পৃহতা ও উদারতা কেমন স্পষ্টরূপে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন।

ধূতার সহিত আমাদের শেষবার অগ্নি-প্রবেশের সময় দেখা হইয়াছে। পতির লজ্জাজনক মৃত্যুসংবাদ কর্ণে প্রবেশ না করে এই অভিপ্রায়ে তিনি অগ্নি প্রবেশের জন্য উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে চারুদত্ত নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বসন্তসেনার প্রতি চারুদত্তের প্রণয়ে কোন ঈর্ষ্যা প্রকাশ না করিয়া বসন্তসেনাকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ইহা অপেক্ষা দাক্ষিণ্যের পরিচয় আর কি হইতে পারে?

শকার। শকারের চিত্র স্থানে স্থানে অতিরঞ্জিত, দুষ্টবুদ্ধিতে শকার অতুলনীয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাশয় সংক্ষেপে বলিয়াছেন

"অপার্থমক্রমং ব্যর্থং পুনরুক্তহতোপমং।
লোকন্যায়বিরুদ্ধঞ্চ শকারবচনং বিদুঃ॥"

শকারের বচন এইরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় হইলেও যেখানে স্বার্থ সাধনের সম্বন্ধ আছে, সেখানে শকারের বুদ্ধি আঠার আনা খেলে। একজাতীয় লোক আছে যাহারা অন্যের নিকট পাগল বা ছিটযুক্ত বলিয়া বিখ্যাত হইতে ভাল বাসে। তাহাদিগকে লোকে পাগল বলুক বা তাহার কথায় হাসুক, তাহাতে সে ক্ষতি মনে করে না; অথচ সে কাজের বেলায় পাগল নহে—সে সময় নিজের লাভটী সমগ্র বুঝিয়া লয়, পাগল বলিয়া তাহাকে কেহ প্রতারিত করিতে পারিবে না; এবং পাগল বলিয়া সে আরও কিছু অধিক স্বার্থসিদ্ধি করিবে; এরূপ পাগলামিতে লাভ আছে। কোন কার্য্যে সে কাহারও অনিষ্ট করিলে লোকে পাগল বলিয়া তাহাকে ক্ষমা করে—দোষ লয় না। আবার পাগল বলিয়া লোকে দয়া করিয়া নিজের কিছু ক্ষতি করিয়া পাগলকে লাভবান্ করে। সচরাচর আমরা এরূপ লোককে মতলবি পাগল বলি। শকার এই শ্রেণীর লোক। দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য সে বসন্তসেনার পশ্চাতে রাজপথে ধাবমান হইতেছে—সেখানে পাগলামি নাই; অথচ বসন্তসেনার অনুসরণে যাইতে যাইতে রামায়ণের নায়িকার সঙ্গে মহাভারতের নায়কের সঙ্গে অপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার সহিত উপমা ও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে, এ স্থানে পাগলামি আছে। যখন জীর্ণোদ্যানে বসন্তসেনাকে বধ করিবার জন্য শকার স্থিরসংকল্প হইয়াছে সে সংকল্পের ভিতর পাগলামি নাই—সে স্থির সংকল্প; অথচ তৎকালে সঙ্গীদের সঙ্গে নানা প্রকার অর্থশূন্য হাস্যোদ্দীপক কথা বলিতেছে, সেখানে পাগলামি। চারুদত্তের উপর মিথ্যা অভিযোগ আনয়নে পাগলামি নাই; ভয়ানক দুষ্কার্য্যে ব্রতী হইয়া চারুদত্তের বিনাশ সাধনে নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে, সে সকলের মধ্যে অস্থিরতা নাই; কিন্তু সেই সংকল্পিত বিষয় ছাড়া অন্য কথায় তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা অস্থিরতা দেখাইতেছে। শকারের এই চরিত্রের বিষয় মনে না রাখিলে শকারের স্বভাবচিত্র উপলব্ধি হয় না।

শকারের শঠতা, নির্দ্দয়তা, বৈরনির্যাতন-স্পৃহা ইত্যাদি অসৎ প্রবৃত্তির অনেক দৃষ্টান্ত সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে আমরা শকারের চরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম না এবং এই অনার্য্য চরিত্রের আর্য্যদর্শনে বিস্তারিত সমালোচনা না থাকায় পাঠক মহাশয়েরাও বোধ হয় অসন্তুষ্ট হইবেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসন্ন—

সমাজচিন্তা।*

ইউরোপীয় এবং স্বদেশীয় সমাজের তুলনায় সমালোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পূর্ণবাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক—বিশেষতঃ আর্য্যদর্শনের একজন প্রধান প্রবন্ধরচয়িতা। এই জন্য ইতস্ততঃ করিয়া এতদিন এ পুস্তকের সমালোচনা করি নাই। তাঁহাকে প্রশংসা করিলে আত্মপ্রশংসাকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইব, এবং নিন্দা করিলে প্রকৃত গুণের অনাদর-জনিত অপরাধে অপরাধী হইব, এই আশঙ্কায় এতদিন গ্রন্থখানি ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আর ফেলিয়া রাখা ভাল দেখায় না বলিয়া আমরা ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

'স্বাধীনতা, সাম্য, ও প্রেম'—এই তিন মূলমন্ত্রে উদ্দীপিত হইয়া পূর্ণবাবু এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে স্বাধীনতা, সাম্য ও স্বজাতিপ্রেমই বর্ত্তমান ইউরোপীয় উন্নতির ভিত্তিভূমি, এবং তাহার অভাবই এসিয়ীয় অবনতির মূলীভূত কারণ। স্বাধীনতা ব্যতীত মানবপ্রকৃতির ও মানবসমাজের পূর্ণবিকাশ অসম্ভব। ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে সেই স্বাধীনতার লোপ হওয়ায়, এখানকার মানবপ্রকৃতি ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে। পূর্ণবাবু ইউরোপীয় সভ্যতার বৃহৎ দৃশ্যপটের অভ্যন্তরে এই স্বাধীনতা দেবীকে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের মধ্যে জাজ্বল্যমান দেখিয়া ও তদ্বিরহে এসিয়ীয় সমাজের দুরবস্থা দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে স্বাধীনতা ব্যতীত মানবসমাজ ও মানবপ্রকৃতির পূর্ণস্ফোটন সম্ভবপর নহে। এই মতের সহিত আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

কিন্তু তিনি গ্রন্থারম্ভে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত এ সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য নাই। তিনি লিখিয়াছেন 'শত শত বর্ষ ধরিয়া ইংরাজগণ রাজত্ব করুন, ভারতে তাঁহাদিগের রাজত্ব প্রোথিত হউক, এই আমাদিগের আন্তরিক বাসনা, এই আমাদিগের প্রার্থনা।' যদি স্বাধীনতার অভাবেই এ দেশের এই দুর্গতি, তবে কোন্ প্রাণে—কোন্ সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি চিরদিন স্বদেশকে সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিতে প্রস্তুত হইলেন?

পূর্ণবাবু লিখিয়াছেন যে 'ইংলণ্ড আজি ভারতের শিক্ষাগুরু- * * *- ইংরাজগণ হইতে আমরা এই চারিটী প্রধান ও নূতন ভাব লাভ করিয়াছি। (১) ঐহিক সুখের প্রতি অনুরাগ।

* শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য ১৲টাকা মাত্র।

(২) স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ। (৩) স্বদেশের প্রতি অনুরাগ। (৪) স্বজাতির প্রতি অনুরাগ।'

প্রাচীন আর্য্যেরা ঐহিক সুখের প্রতি অনাদর শিক্ষা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের লক্ষ্য স্বতন্ত্র ছিল। 'অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ'—তাঁহারা ঐহিক সুখভোগ করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়িতেন না। বস্তুতঃ ঐহিক সুখে পূর্ণাসক্তি, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সবিশেষ অন্তরায়। ঐহিক সুখে পূর্ণাসক্তি থাকিতে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা হইতে পারে না। নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধনা ব্যতীতও মানবপ্রকৃতির পূর্ণ উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে না। স্বাধীনতার প্রতি যাঁহার অনুরাগ, তিনি সামান্য ভোগ সুখের অধীন হইতে পারেন না। যাঁহার সুখ বাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ, তিনিই প্রকৃত স্বাধীন ও প্রকৃত সুখী। এই জন্যই ভারতীয় ঋষিবৃন্দেরা 'অনাস্থা বাহ্যবস্তুষু' এই নীতি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বহির্জগৎ অপেক্ষা অন্তর্জগতের উপর রাজত্ব করা অধিকতর শ্লাঘাকর বলিয়া মনে করিতেন। বস্তুতঃ যিনি অন্তর্জগতের অধীশ্বর—ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপর যাঁহার পূর্ণ ঈশিত্ব—তাঁহার নিকট সমস্ত বহির্জগতের অধীশ্বরত্ব তুচ্ছ বোধ হইবে সন্দেহ নাই। এ কঠোর যোগসাধনা কয় জনের ভাগ্যে ঘটিতে পারে? ভারতীয় আর্য্যেরা জাতিসাধারণের জন্য এ কঠোর সাধনা ব্যবস্থা করেন নাই। জাতিসাধারণকে ঐহিক সুখের অনুসরণে নিরত থাকিতে বলিয়া, কতিপয় নেতার জন্যই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আজও ভারতীয় হিন্দুজাতিসাধারণ ঐহিক সুখের অনুসরণে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত। তবে 'আমরা ঐহিক সুখের প্রতি অনুরাগ ইংলণ্ড হইতে শিক্ষা করিলাম' এ কথা কিরূপে সত্য হইতে পারে?

স্বজাতির প্রতি অনুরাগ ভারতীয় আর্য্যেরা যেরূপ জানিতেন এরূপ পৃথিবীর আর কোন জাতি জানিতেন কি না সন্দেহ। স্বজাতিপ্রেম না থাকিলে কতিপয়মাত্র আর্য্যপুরুষ কখন এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। একটী আর্য্যের কেশ স্পর্শ করিলে তখন সমস্ত আর্য্য-হৃদয় বাজিয়া উঠিত। সে দিন এখন গিয়াছে সত্য, কিন্তু সে নীতি ভারত-বক্ষে খোদিত রহিয়াছে। যাহার চক্ষু আছে, সেই সে নীতি পড়িতে পারিবে—তাহা শিখিতে বৈদেশিকের শরণাপন্ন হইতে হইবে না।

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—যে জাতি একদিন এই গান গাহিয়াছিলেন, সেই আর্য্যজাতির সন্ততিগণকে স্বদেশানুরাগ শিখিতে ইংরাজের শরণাপন্ন হইতে হইবে—ইহাও আশ্চর্য্যের কথা। তবে এ বিষয়ে ইংরাজের নিকট আমরা কোন শিক্ষা পাই নাই, এ কথাও

বলিতে পারি না। কারণ প্রাচীন আর্য্যেরা অধুনাতন বিশ্ব-জনীন ভৌগোলিক স্বদেশানুরাগ জানিতেন কি না সন্দেহ। তাঁহাদিগের স্বদেশানুরাগ স্বজাতিপ্রেমের সহিত এরূপ জড়িত ছিল যে দুইটীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহারা ভাবিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ইংরাজ যেমন ইংরাজমাত্রকেই ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করেন, ভারতীয় আর্য্য সেইভাবে ভারতীয় অধিবাসিমাত্রকেই আলিঙ্গন করিতে পারিতেন না। 'ইংরাজ' শব্দ শুনিলে ইংরাজের মনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, 'ভারতবাসী' এই শব্দ শুনিলে ভারতীয় আর্য্যের অন্তরে সে সুখোদয় হইত কি না সন্দেহ। তাঁহার জাতিভেদ এই বিশ্বজনীন ভৌগোলিক স্বদেশানুরাগের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। এই ভৌগোলিক স্বদেশানুরাগের নাম পেট্রিয়টিজম্। ইংরাজ এই পেট্রিয়টিজম্ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। আরও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে ইংরাজ আমাদিগকে স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ শিক্ষা দিয়াছেন। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের বলবতী ইচ্ছা ইংরাজের নিকটই আমরা শিক্ষা করিয়াছি। ইংরাজ ভারতে না আসিলে সমস্ত ভারতবাসীকে এক সহানুভূতিসূত্রে গ্রথিত করার প্রসঙ্গও উঠিত কি না সন্দেহ।

ভারতীয় আর্য্যেরা ব্যক্তিগত পূর্ণবিকাশ লইয়া যত ব্যস্ত ছিলেন, জাতীয় পূর্ণবিকাশের জন্য ততদূর ব্যাকুল ছিলেন না। ঋষিগণ প্রত্যেকে আদর্শ পুরুষ হইতে চেষ্টা করিতেন, অনেকে সেই চেষ্টায় দেবত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু জাতীয় দেবত্ব স্থাপনের দিকে তাঁহাদিগের ততদূর চেষ্টা ছিল না। পূর্ণ যোগীর আদর্শ ভারতে ভিন্ন আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই অত্যুচ্চ আদর্শ পুরুষের সহিত ভারতের নিম্নতম অধিবাসীর আকাশ পাতাল প্রভেদ ছিল। ভারতের সমতল ক্ষেত্র হইতে হিমাচলের উচ্চতম শৃঙ্গরাজি যেরূপ দূরবর্ত্তী, সেই মহাপুরুষগণ হইতে ভারতের নিম্নতম শ্রেণী তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দূরবর্ত্তী। কালের গতিতে এই দূরত্ব আপনিই কমিতেছিল, ইংরাজ আসিয়া তাহা আরও কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের মঙ্গল সাধন করা ইংরাজের অভিপ্রায় কিনা জানি না, তবে ইংরাজ ইহা দ্বারা যে ভারতের ভাবী মঙ্গলের সূত্রপাত করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরস্পর দূরত্ব যত কমিবে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ ততই বদ্ধমূল হইবে। আমরা বলিনা যে যাঁহারা উচ্চে আছেন তাঁহাদিগকে নামাইয়া নিম্নশ্রেণীর সহিত সমতল করিতে হইবে। চৈতন্য তাহা করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা যে সাম্যবাদের পক্ষপাতী—

সে সাম্যবাদ ছোটকে বড় করিয়া লইয়া সমতল করিতে চাহে, বড়কে ছোট করিতে চাহে না। এই সাম্য যে ছোট তাহার উঠিবার পথে কণ্টক রোপণ না করিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া দেয়।

আমাদের বর্ত্তমান অবনতির একটী প্রধান কারণ ভারতবাসিগণের বৈদেশিকগণের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ। বৈদেশিকগণের সহিত সংঘর্ষ ব্যতীত স্বদেশানুরাগ স্ফূর্ত্তি পায় না। প্রতিযোগিতা ব্যতীত পরের উৎকর্ষ দেখিয়া নিজের উৎকর্ষ সাধন করা যায় না। প্রাচীন আর্য্যেরা আত্মগরিমায় এতদূর অভিভূত হইয়াছিলেন যে ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশে যাওয়া তাঁহারা আবশ্যক মনে করিতেন না। তাঁহারা আত্মোৎকর্ষের এত আদর করিতেন যে পরোৎকর্ষের সহিত তাহার তুলনা করা, এবং তুলনা করিয়া তাহার পুষ্টি সাধন করা আবশ্যক বোধ করিতেন না। এক সময়ে ইহাতে মহৎ ফল ফলিয়াছিল। যখন সমস্ত পৃথিবী অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন জ্ঞানালোকে ভারত জগৎকে ঝলসিত করিয়াছিলেন। মৌলিকতায় তখন ভারত জগতের শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। আত্মোৎকর্ষে তখন ভারত এত মহীয়ান্ হইয়াছিলেন, যে অপর দেশের সহিত তুলনা করিয়া ভারতের কোন উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভারতীয় নিরপেক্ষ উন্নতি যখন চরম সীমায় উপনীত হইল, তখনই এই নিরপেক্ষতাজনিত বিপৎপাত উপস্থিত হইল। উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আপেক্ষিক মাত্র। তুলনা ব্যতীত ইহার মূল্য স্থির হয় না। তুলনা ব্যতীত কিছুই উৎকৃষ্ট নহে, কিছুই অপকৃষ্ট নহে। জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, সকলেরই মূল্য তুলনায়। যখন ভারতের বহিশ্চর রাজ্যসকল অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিলেন, তখনও ভারত আত্মোৎকর্ষগরিমায় অভিভূত হইয়া রহিলেন। ভারতের বাহিরে গিয়া দেখিলেন না যে কোন্ বিষয়ে কোন্ দেশ তাঁহাদিগ অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। শুদ্ধ যে তখন দেখিলেন না এরূপ নহে ভবিষ্যতে আর কেহ যে দেখিবে সে পথেও কণ্টক রোপণ করিলেন। সিন্ধুর অপর পারে গমন বা সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। ইহার বিষময় ফল আমরা পুরুষ পরম্পরায় আজও ভোগ করিতেছি। এক্ষণে সেই নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা জ্ঞান বা অর্থ উপার্জ্জনে দেশ দেশান্তরে গমন করিতেছেন আমরা সেই পুরাকালীন নিষেধের দোহাই দিয়া তাঁহাদিগকে সবিশেষ নির্য্যাতন করিতেছি। অধিক কি কোন বিজ্ঞ সম্পাদক বিদেশপ্রত্যাগত যুবকমণ্ডলীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে ঘোল ঢালিতে আদেশ দিতেও লজ্জিত নহেন। উৎকর্ষের চরম সীমায় আরূঢ় প্রাচীন

আর্য্যেরা যে আত্মগরিমায় অন্ধ হইবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু অধুনাতন পতিত অধমাধম হিন্দু-জাতির এ অভিমান কেন জানি না! যখন ভারতীয় আর্য্যেরা অন্যান্য দেশবাসিগণ অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তখন তাঁহারা অপরকে ম্লেচ্ছ বলিয়া যে ঘৃণা করিতেন তাহা সাজিত। কিন্তু এক্ষণে যাঁহাদিগের অধীন রহিয়াছেন, যাঁহাদিগকে দেবভাবে নিত্য পূজা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করা বিড়ম্বনামাত্র। তাঁহাদিগের দেশে যাহারা পদার্পণ করিবে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত অগ্রহণীয় মনে করা বাতুলতা মাত্র। যাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া মানিতেছেন, তাঁহাদিগের দেশে যাওয়া প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ বলিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না! ধন্য আমাদের শিক্ষা! ধন্য আমাদের আত্মাভিমান!

ইউরোপীয় স্বদেশানুরাগ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ইহা আত্মাভিমানে অভিভূত হইয়া পরদ্রব্য স্পর্শ করা, পরদেশ গমন করা, পরের বস্তু ভোগ করা প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ বলিয়া মনে করে না। তাই ইউরোপের আজ এত উন্নতি। যেখানে যে জিনিস উঠিল, ইউরোপীয় দেশসকল ত্বরিত গতিতে তাহার অনুকরণে আপন দেশে তদনুরূপ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। অনুকরণ কেন করিব, কেন ছোট হইব, এ অভিমান ইউরোপীয় ও আমেরিকা জাতিনিচয়ের মধ্যে নাই। তাই যে দেশে যে যে বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, অচিরকাল মধ্যেই সেই সেই বিষয় আমেরিকা ও ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে। পরস্পরের উন্নতিতে পরস্পর মহীয়ান্ হইয়া উঠিতেছে। এই জন্যই ইউরোপ ও আমেরিকা সভ্যতায় ও বলবত্তায় জগতে অতুলনীয়। কিন্তু হিন্দুজাতির সে পূর্ব্ব সৌভাগ্য নাই। সেই অতীত সৌভাগ্য-জনিত অভিমান রহিয়াছে। বিষধরের বিষ গিয়াছে, কেবল গর্জ্জন অবশিষ্ট আছে।

যতদিন আমাদের এই অভিমান না যাইতেছে, ততদিন আমাদের জাতীয় উন্নতির কোন আশা নাই। যাহার উত্থান-শক্তি নাই, সে যে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে দেখিয়া হিংসা করে। সেইরূপ আমরা উত্থানশক্তিহীন বলিয়া যে সকল ইউরোপীয় জাতি উদ্যোগশীল তাহাদিগকে হিংসা করিয়া থাকি। তাহাদিগের সমান হইবার যে চেষ্টা করে তাহারও হিংসা করিয়া থাকি। এবং সামাজিক নির্যাতন দ্বারা সেই হিংসা প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপে আমরা পদে পদে ভবিষ্য উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিয়া থাকি। জানি না কত দিনে আমরা এ রোগ হইতে মুক্ত হইব। জানি না কতদিনে আমরা বৃথা-অভিমান-মুক্ত হইয়া প্রকৃত গুণের অনুকরণে রত

হইবে। মধুকরেরা যেমন নানাস্থান হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্রকে বিভূষিত করে; যত দিন না আমরা সেই মধুকরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নানা দেশ হইতে গুণরাশি আহরণ করিয়া স্বদেশকে বিভূষিত করিতেছি; ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই! জাতীয় উন্নতির কোন আশা নাই!

আমাদের অবনতির আর একটি প্রধান কারণ উপলব্ধি হয়। পারিবারিক ও সামাজিক অধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতার ফল ইহা অনেকে বুঝিয়াও বুঝেন না। যাহারা পারিবারিক ও সামাজিক অধীনতায় জড়ীভূত, তাহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলেও রক্ষা করিতে অক্ষম। যাহারা পরিবার ও সমাজ মধ্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বা কার্য্য করিতে অক্ষম; তাহারা অধিকতর অমূল্য, অধিকতর কষ্টলভ্য, ও কষ্টরক্ষ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিবে কিরূপে? 'আমি অমুক কার্য্য ভাল বলিয়া জানি, কিন্তু করিতে পারি না; কারণ গৃহে বৃদ্ধা প্রপিতামহী বর্ত্তমান; অথবা অমুক জ্ঞাতি তাহা হইলে আমার অন্ন গ্রহণ করিবে না'—যাঁহারা এই গার্হস্থ নীতি দ্বারা সঞ্চালিত, তাঁহারা কেমন করিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য জীবন আহুতি দিবেন? যতদিন সামান্য সামান্য বিষয়ে আত্মোৎসর্গ অভ্যস্ত না হইবে, ততদিন সেই প্রাণোৎসর্গলভ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার আশা কোথায়? অঙ্কুর না হইতে বৃক্ষের উৎপত্তির আশা কোথায়? রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্রমশঃ পূর্ব্ববর্ত্তী সোপানত্রয় (১) সামাজিক স্বাধীনতা, (২) পারিবারিক স্বাধীনতা ও (৩) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বাধীনতাভাবের ক্রমোন্নতির সর্ব্বপ্রথম সোপান। যাহার নিজের ইচ্ছাশক্তির উপর প্রভুতা নাই, সে পরের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই সঞ্চালিত হইবে। যে নিজে পরাধীন সে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা হইবে কিরূপে। অতএব যদি তুমি রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রবর্ত্তয়িতা হইতে চাও তবে অগ্রে দেখাও যে তুমি নিজে পরের ইচ্ছা শক্তি দ্বারা সঞ্চালিত নও। দেখাও যে তুমি যাহা নিজে ভাল বুঝ, সহস্র বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাহা তুমি কার্য্যে পরিণত কর। দেখাও যে তোমার ইচ্ছা ও কার্য্যের মধ্যে কেহই অন্তরায় হইতে পারে না। দেখাও যে তুমি কর্ত্তব্যানলে নিজের জীবনকে আহুতি দিতে সক্ষম। এইরূপ যে পরিবার ও যে সমাজ আত্ম-ইচ্ছা-শক্তির উপর পূর্ণ প্রভুতা লাভ করিয়াছে, সেই পরিবার ও সেই সমাজই রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রবর্ত্তনে সমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি, যে পরিবার, বা যে সমাজ এই আত্ম-শক্তি-সম্পন্ন হয় নাই, তাহা দ্বারা এ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। কার্য্য ও চিন্তার সামঞ্জস্য ব্যতীত জাতীয়

উন্নতি হয় না। বিচারশক্তি বলে কোন্‌টী কর্ত্তব্য কোন্‌টী অকর্ত্তব্য জানিতে পারিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না। তোমার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে দেখাইতে হইবে যে তুমি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার কর, তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাসও কর। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া তুমি প্রচার কর, যদি তুমি তাহা কার্য্যে না দেখাও, লোকে তোমার কথায় শ্রদ্ধা করিবে না। তোমাকে প্রতারক বলিয়া মনে করিবে। আমাদের দেশে অধুনা এই রোগ বিশ্বজনীন হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই উপদেশ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু উপদেশপালনে কেহই প্রস্তুত নহে। আমাদের দেশে বাক্য-বীরের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু কার্য্যবীর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখে সহস্র সহস্র ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্‌ডী পাওয়া যাইবে, কিন্তু কার্য্যে এক জন মিলিবে না। বাক্যে অসংখ্য সমাজসংস্কারক মিলিবে, কিন্তু কার্য্যে কেহই অগ্রসর হইবে না। কিন্তু শুদ্ধ কথায় আর মন ভিজে না। আমরা এক্ষণে কার্য্য চাই। বাক্যকাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে কার্য্যকাল উপস্থিত হইয়াছে। কার্য্য বিনা জাতীয় জীবন স্ফুরিত হয় না। কার্য্য বৈদেশিকের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা নহে, ব্যক্তিগত ও সমবেত চেষ্টা দ্বারা অন্তর্জাতীয় উন্নতিসাধন। আভ্যন্তরীণ উন্নতি হইলে অনুগ্রহ ভিক্ষার আবশ্যকতা হইবে না। স্বাবলম্বন ব্যতীত জাতীয় উন্নতি হয় না। যে পরের লাঙ্গুল ধরিয়া স্বর্গে উঠিতে চেষ্টা করে, সে মূঢ় ও জগতের ঘৃণার পাত্র। যখন বৈদেশিক আমাদিগকে জ্ঞানী বা ধনী করিয়া দিবে, তখনই আমরা জ্ঞানী বা ধনী হইব —এই বলিয়া যে জাতি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, সে জাতির উন্নতির আশা কোন কালেই নাই। শিশুকে ক্রমাগত ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইলে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কখনই পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয় না। তাহাকে হামাগুড়ি দিয়া ক্রমে বেড়াইতে শিখিতে হইবে। হাবুডুবু না খাইলে কেহ কখন সন্তরণ শিখে না। যে চিরকাল পরের পৃষ্ঠে চড়িয়া সন্তরণ শিখিতে চেষ্টা করে, তাহার আর সন্তরণ শিখা ঘটে না। রাজনৈতিক সাগরে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে সমাজতরঙ্গিণীতে সন্তরণ শিখিয়া লও। ইংরাজ সন্তরণ শিখাইতেছে না বলিয়া দুঃখ করিও না। যাহা তাহার স্বার্থের বিরোধী, সে তাহা করিবে কেন? তুমি হাবুডুবু খাইয়াও নিজে সন্তরণ শিখিবার চেষ্টা কর। ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। পূর্ব্বোক্ত যে সকল মহাসত্য আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, পূর্ণ বাবুর পুস্তকে তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। যাঁহারা বন্ধুর তিরস্কারবাক্যে বিরক্ত হন, তাঁহারাই এই পুস্তক পাঠে অসন্তুষ্ট হইবেন। জ্ঞানী লোকে গম্ভীরভাবে ইহা পাঠ করিবেন। যে যে গুণে

ইউরোপ আজ এত অভ্যুদয়শালী; পূর্ণবাবু আমাদিগকে সেই সেই গুণের অনুকরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যাহার চৈতন্য আছে, সে ইহাতে কর্ণপাত করিবে। যে চৈতন্যশূন্য হইয়াছে, তাহার এ ক্লিষ্টারে কোন উত্তেজনা হইবে না। তাহার উপর ভারতের ভাবী আশা ন্যস্ত নহে। যাহাদিগের জীবনীশক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা ভারতের সঞ্জীবন কার্য্যের উপাদান সামগ্রী হইতে পারিবে না। যাহাদিগের জীবনীশক্তি কিঞ্চিৎ আছে, তাহাদিগকেই পুনঃ সঞ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

পূর্ণবাবু ভারতের সঞ্জীবন কার্য্যোপযোগী যে সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধান—স্বদেশানুরাগ, স্বাধীনতানুরাগ, স্বাবলম্বন, ও আত্মোৎসর্গ। এই কয়টী গুণে ইউরোপ ও আমেরিকা আজ স্বর্গপুরী। ইহার অভাবে আজ ভারত নিশ্চেষ্ট, নির্ম্মম ও স্বার্থান্ধ। আজ ভারতবাসী জাতীয় সুখে ও জাতীয় জীবনে উদাসীন হইয়া নিজের সুখ ও পারিবারিক সুখ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। তাঁহার সমস্ত দেশ, সমস্ত জগৎ, নিজের পরিবার। পারিবারিক জীবনেই আত্মোৎসর্গের সূত্রপাত হয় সত্য, কারণ মহাজন বলিয়া গিয়াছেন 'Charity begins at home' গৃহেই বদান্যতা প্রথম আরম্ভ হয়, গৃহেই লোকে প্রথম আত্ম-ভুলিতে অভ্যাস করে। কিন্তু যাহার আত্মোৎসর্গ সেই সঙ্কীর্ণ সীমায় চিরদিন আবদ্ধ থাকে, সে কখন পূর্ণ মানব হইতে পারে না। এই আত্মোৎসর্গ পরিবার হইতে স্বদেশে, স্বদেশ হইতে মানবজগতে, মানবজগৎ হইতে প্রাণিজগতে, প্রাণিজগৎ হইতে শেষে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয় জগৎ পর্য্যন্ত প্রসৃত হয়। যে সেই উচ্চতম সোপানে উঠিতে চায়, তাহাকে ক্রমশঃ পর পর ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা এক্ষণে প্রথম ক্রমে আছি, আমাদিগকে আপাততঃ দ্বিতীয় ক্রমে উঠিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যেমন আত্ম ভুলিয়া পরিবারগতপ্রাণ হইয়াছি, সেইরূপ পরিবারগতপ্রাণ অবস্থা হইতে স্বদেশগতপ্রাণ হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। এ সাধনা সহজ সাধনা নয়। যে যোগী ইহাতে সিদ্ধ হইবেন, তিনিই ধন্য। সে স্বদেশ বঙ্গদেশ কি ভারত—যাহার জীবনের যেরূপ লক্ষ্য সে সেইরূপ ভাবিতে পারে। তবে অতীতসাক্ষী ইতিহাসে পরীক্ষিত হইয়াছে যে বাঙ্গালা স্বতন্ত্র ভাবে কখন দাঁড়াইতে পারে নাই। কখন যে দাঁড়াইতে পারিবে তাহার আশা দেখি না। প্রকৃতি ভারতকে আসিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে এরূপ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে যে ভারত একটী সমগ্র দেশ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অন্যান্য দেশ ভারতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। সুতরাং আমরা ভারতকে স্বদেশ

বলিয়া মনে করি, এবং বঙ্গদেশকে সেই দেশের অঙ্গ বলিয়া এত ভাল বাসি। এত ভালবাসি বলিয়াই ইহাকে অঙ্গী-ভূত ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করি না। অঙ্গীকে ছাড়িয়া অঙ্গ কখন পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। সুতরাং যাহারা সেই অঙ্গীভূত ভারত হইতে অঙ্গভূত বঙ্গদেশকে বিচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে আত্মঘাতী বলিয়া মনে করি। তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের কোন সহানুভূতি নাই। আমরা ভারতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব।

আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে পূর্ণবাবুর রামাজাতি বিষয়ক প্রস্তাবের সমালোচন করিব। এবার এই পর্য্যন্ত।

অষ্ট্রেলিয়া।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বর্ণখননকারীগণ।—এক সময়ে অষ্ট্রেলিয়ায় কেবল অসভ্যজাতীয়েরা বাস করিত; তৎপরে অপরাধীরা ও ইহাদিগের পর রাখাল ও কৃষকেরা এবং অবশেষে স্বর্ণখননকারীরা যাইয়া তথায় বাস করে।

অষ্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণ আবিষ্কার হইবার সময়ে একটী অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য পরি-বর্ত্তন হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তন ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ঘটে। যখন অষ্ট্রেলিয়ার উপনিবেশীরা শুনিল যে পাহাড় সমূহে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে তখনই তাহারা কোদাল, শাবল ইত্যাদি খুঁড়িবার অস্ত্র লইয়া দ্বীপের সকল অংশ হইতে তদভিমুখে ছুটিল। কৃষকগণ আবাদীভূমি ছাড়িয়া ছুটিল, রাখালেরা খোঁয়াড় ছাড়িয়া ছুটিল; কর্ম্মকারেরা দোকান ত্যাগ করিয়া চলিল, সূত্রধরেরা তাহাদের কর্ম্মস্থান ছাড়িয়া চলিল; ভৃত্যেরা তাহাদের প্রভুদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এই রূপে সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায় ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শশব্যস্তে খননকার্য্যের জন্য ধাবমান হইয়াছিল।

পর্ব্বতবাহিনী একটি নদীর তীরে অব-স্থিত বাথার্ষ্ট নগরে প্রথমতঃ একটী স্বর্ণ ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ায় যত স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল তন্মধ্যে এই স্থানেই সর্ব্ব প্রথমে উহা আবিষ্কৃত হয়। ইহার দুইমাস পরে বালারাট নগরে অপর একটী স্বর্ণক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। বালারাট নগরে পুনর্ব্বার স্বর্ণের আবিষ্ক্রিয়া শ্রবণে, উহা বাথার্ষ্ট নগর হইতে সার্দ্ধ তিন শত ক্রোশ দূরে

অবস্থিত হইলেও খননকারীদিগের মধ্যে অনেকে তথায় আনন্দের সহিত ত্বরিত-পদে প্রস্থান করিল। ইংলণ্ডে সংবাদ পঁহুছিল যে অষ্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তৎক্ষণাৎ সহস্র সহস্র লোক ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় ধাবিত হইল। এখনও তথায় নূতন নূতন স্বর্ণক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইতেছে; স্বর্ণখননকারীরাও তথায় অনবরত যাইতেছে। স্বর্ণখননকারীরা যে কেবল ইংলণ্ড হইতে যাইতেছে তাহা নহে; জর্ম্মণী, ইটালী, চীন ইত্যাদি অন্যান্য সকল দেশ হইতেও অনেক লোক যাইতেছে।

এই সকল খননকারীদিগকে অনেক বিপদ ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। যখন তাহারা প্রথমেই জাহাজ হইতে অবতরণ করে তখন থাকিবার স্থান পায় না, নিদ্রা যাইবার জন্য ঘর পায় না। তাহারা শকট ভাড়া লইয়া তাহার উপর কোদাল, বেলচা, গাঁতি, হাঁড়ি, লেপ এবং বস্ত্রগৃহ চাপাইয়া লইয়া খনি উদ্দেশে প্রস্থান করে। স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণ শকটে আরোহণ করে; পুরুষেরা ধনুক, বন্দুক, এবং বৃহৎ বৃহৎ শিকারী কুকুর সঙ্গে লইয়া শকটের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। পথে অত্যন্ত দস্যুভয়, এজন্য এরূপ সতর্কতার সহিত গমন করা প্রয়োজন হইয়া থাকে।

খননকারীদিগের মধ্যে অনেকে নর-হত্যা ও দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে সচ্চরিত্র লোকের সংখ্যা অতি অল্প। যে সকল ভদ্রলোক নিঃস্ব হইয়া কষ্টে পড়িয়া এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

খননকারীদিগের অনেকে শকট পায় না, তাহারা সমুদয় সামগ্রী একটা বস্তায় পুরিয়া নিজপৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যায়।

খননকারীদিগের প্রত্যেকেই নীল অথবা ঘোর রক্তবর্ণ কাপড়ের চিক্কণ কামিজ পরিধান করে। তাহাদিগের মধ্যে কেহই কোন প্রকার কোর্ত্তা পরে না; প্রত্যেকেরই কার্পাস বস্ত্রের এক একটী দৃঢ় পায়জামা এবং প্রশস্ত পাড়-যুক্ত খড়ের টুপি থাকে, এই টুপিকে তাহারা কপিগাছের টুপি (Cabbage tree hat) কহিয়া থাকে। খননকারী-দিগের আকৃতি ও আচরণ তাহাদিগের নীচ স্বভাবের অনুরূপ। কোন অপরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারা কোনরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে জানে না।

খনি উদ্দেশে যাত্রাকালীন পথে, যাহা-দিগের শকট নাই, তাহারা গাত্রে কম্বল জড়াইয়া বৃক্ষশাখা রাশীকৃত করিয়া তদুপরি নিদ্রা যায়। যাহাদিগের শকট আছে, তাহারা শকটের উপর একখানি ক্যাম্বিস্ কাপড়ের বস্ত্রগৃহ লইয়া যায়। এই বস্ত্রগৃহখানি রাত্রিকালে টাঙ্গাইয়া তাহার নিম্নে শয়ন করে এবং স্যাঁৎসেঁতে হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটী ত্রিপালি পাতিয়া দেয়। পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন শয্যার পরিবর্ত্তে তাহারা অপকৃষ্ট কম্বলের উপরে নিদ্রা যায়। বস্ত্রগৃহের বহির্ভাগে অগ্নি জ্বালাইয়া রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। খননকারীরা ভেড়ার মাংস, চা ও ডম্পরের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে। ডম্পর কথাটা পাঠক হয়ত বুঝিবেন না। ইহা গোলাকার দুই ইঞ্চ পুরু ময়দা ও জলের একত্র মিশ্রণে প্রস্তুত একখানি বৃহৎ পিষ্টক।

খননকারী চা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত চা-পাত্র ব্যবহার না করিয়া হাঁড়ি ব্যবহার করে। পানিকিন্ নামক ক্ষুদ্রপাত্র তাহাদিগের চা-পেয়ালার কার্য্য করে। যতদিন পর্য্যন্ত খননকারী প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ খুঁড়িয়া না পায় ততদিন পর্য্যন্ত আহারের জন্য মাখন, দুগ্ধ ও তরকারী ক্রয় করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য; সুতরাং তাহাকে তখন আলু ও শাকশবজী ব্যতিরেকে মাংস, দুগ্ধ ব্যতিরেকে চা ও মাখন ব্যতিরেকে রুটী খাইয়া থাকিতে হয়। ইহা ব্যতীত সে বড় একটা অন্য প্রকার আহার পায় না।

খনকদিগের মধ্যে সকলেই যদি কেবল চা পানে পরিতৃপ্ত থাকিত, অন্য কোন প্রকার মাদকদ্রব্য পান না করিত তাহা হইলে বিশেষ সুখের বিষয় হইত; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই সুরাপানে আসক্ত। অষ্ট্রেলিয়ার জল মন্দ ও উষ্ণ বলিয়া তাহারা আপন অর্জ্জিত সমুদয় অর্থই এই অগ্নিবৎ প্রাণনাশক পানীয়ে ব্যয় করিয়া থাকে এবং এইরূপে আপন মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

খননস্থানগুলি একসময়ে হরিৎবর্ণ তৃণে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে মাটী-নির্ম্মিত আলি দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে। এই স্থান একসময়ে নানাবৃক্ষের ছায়ায় আবৃত এবং ফুলপুষ্পের গন্ধে আমোদিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে ছেদিত সুতরাং পতিত বৃক্ষসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে। এইস্থান একসময়ে নিস্তব্ধ ও নির্জ্জন ছিল, কিন্তু এক্ষণে বস্ত্রগৃহ দ্বারা আচ্ছাদিত, গাঁতির শব্দে প্রতিধ্বনিত এবং কুকুরের ঘেউ ঘেউ ও মানুষের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। রাত্রিকালে খননস্থানের অনতিদূরে দস্যুদিগের বিকটশব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। দস্যুদিগের ভয় জন্মাইয়া দিবার জন্য খননস্থানে সততই বন্দুকের আওয়াজ করা হয়। সেখানকার বায়ু সর্ব্বদাই অস্ত্রশস্ত্রের ঝমঝমানি, বন্দুক পিস্তলের আওয়াজ ও সুরাপানে উন্মত্ত লোকদিগের ভীষণ চীৎকারে পূর্ণ হইয়া থাকে। চুরি ও হত্যাকাণ্ড প্রতি রাত্রিতেই হইয়া থাকে। প্রত্যেক লোকেই বস্ত্রগৃহে নিদ্রা যাইবার সময়, স্বীয় কুকুরকে প্রহরী রাখিয়া এবং পিস্তলে বারুদ ও গুলি ভরিয়া সজ্জিত করিয়া বালিসের নিকট রাখিয়া দেয়। যাহার কুকুর নাই সে হাঁড়ি কুড়ি ব্যঞ্জনপাত্র প্রভৃতি যাহা কিছু আছে সমুদায় বস্ত্রগৃহের দ্বারে রাশীকৃত করিয়া

এরূপভাবে রাখিয়া দেয় যে কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেই সে সমুদয় সামগ্রী হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যাইবে এবং সেই শব্দে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে।

প্রত্যেক খনকের নিজের এক একটী খুঁড়িবার গর্ত্ত বা খনি আছে। কিন্তু খুঁড়িবার পূর্ব্বে সে গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত কর্ম্মচারীর নিকটে গিয়া অনুমতিপত্র ক্রয় করে। ইহার প্রত্যেকটীর মূল্য ১৫ টাকা। যে মাসে সে অনুমতি প্রাপ্ত হয় সেই মাসের শেষ পর্য্যন্ত সে স্বেচ্ছানুসারে যে কোন স্থানে খননকার্য্য করিবার অধিকারী হয়। তাহার পর মাসে তাহাকে পুনর্ব্বার আর একটী অনুমতিপত্র ক্রয় করিতে হয়। অনেক খননকারী এইরূপ করিতে না পারিয়া, অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে খননকার্য্য আরম্ভ করে; কিন্তু প্রহরীরা সতত চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং প্রত্যেকের নিকট অনুমতি পত্র দেখিয়া থাকে যদি কোন খনক তাহা না দেখাইতে পারে তাহা হইলে তাহাকে ১৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৩০ টাকা দণ্ড দিতে হয়।

খননকারী অনুমতিপত্র পাইবামাত্র তাহার থাকিবার উপযুক্ত ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমিও দাবী করিয়া থাকে। এই ভূমিখণ্ড পতিত বৃক্ষের গুঁড়ি দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া লইয়া সে খননকার্য্য আরম্ভ করে। খনকেরা সকলেই সোৎসাহে ও বহু আশা করিয়া খননে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে স্বর্ণপ্রাপ্তি ঘটিয়া উঠে না। স্বর্ণ পাইবার পূর্ব্বেই কেহ দশ ফিট, কেহ কুড়ি ফিট, কেংবা এক শত ফিট পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ছাড়িয়া দেয়; কেহই গভীর করিয়া গর্ত্ত খনন করে না। কোন স্থানে শীঘ্র স্বর্ণ না পাইলে তৎক্ষণাৎ সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র খুঁড়িতে যায়। খননকারীরা যখন গর্ত্ত খনন করে, তখন তাহাদের মস্তক শশকের ন্যায় গর্ত্ত হইতে একবার বাহিরে আইসে একবার ভিতরে প্রবেশ করে। ইহা দেখিতে অত্যন্ত কৌতুকাবহ।

কেহই আপন নির্দ্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত খনন করিতে পারে না; কিন্তু ভূমির নিম্নে তাহার যতদূর ইচ্ছা ততদূর খুঁড়িতে পারে।

খননস্থানে ভিজা গর্ত্ত আছে, এবং শুষ্ক গর্ত্তও আছে। অধিকাংশ সুবর্ণ ভিজা গর্ত্তেই পাওয়া যায়; কিন্তু জলের উপর সমস্ত দিন দাঁড়াইয়া থাকা অত্যন্ত অসুখকর। যখন একজন মৃত্তিকা খনন করে তখন অপরজন জল ছেঁচিয়া ফেলিতে আরম্ভ করে। কখন কখন অতি শীঘ্র জল ছেঁচিয়া ফেলা অসম্ভব হইয়া উঠে। যদি খনি মধ্যে প্রখর সূর্য্যোত্তাপে এই দুইটী কার্য্য একজনকে করিতে হইত তাহা হইলে তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যাইত এবং তাহার ঐ কার্য্যদ্বয়ের কোনটাই উত্তমরূপে সম্পন্ন হইত না।

ভিজা খনি অপেক্ষা শুষ্ক খনি অধিকতর উষ্ণ এবং তাহা খনন করা অধিকতর পরিশ্রম ও ক্লেশসাপেক্ষ। প্রখর সূর্য্যোত্তাপে চল্লিশ ফিট্ গভীর গর্ত্তের নিম্নে সমস্তদিন খনন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। ইহাতে শ্বাস বন্ধ হইবার সম্ভব। আশ্চর্য্য! মনুষ্যের অর্থতৃষ্ণা এত প্রবল যে সে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে তথাপি অর্থলাভের চেষ্টা হইতে বিরত হইবে না।

খনন স্থান মৌচাকের ছিদ্রের ন্যায় গর্ত্তে পরিপূর্ণ। অন্ধকারে বাহিরে যাওয়া অতীব দুষ্কর ও বিপদ্জনক; কারণ এক বস্ত্রগৃহ হইতে অন্য বস্ত্রগৃহে যাইতে হইলে অনেক বড় বড় গর্ত্ত পার হইয়া যাইতে হয়। গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়া অনেকেরই বিপদ ঘটিয়াছে।

খননকারী দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও বিপদ আপদ সহ্য করিয়া পুরস্কার স্বরূপ কি প্রাপ্ত হয়? এখন তখন একটী সুবর্ণ তাল দেখিতে পায়। টাপারি ফলের ন্যায় বৃহৎ একটী স্বর্ণতাল অত্যন্ত মূল্যবান। সেখানে কখন কখন মনুষ্যের মস্তকের তুল্য বৃহৎ স্বর্ণতাল দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটী স্বর্ণতাল যে পায় তাহার পক্ষে শুভাদৃষ্ট!

মনুষ্যাকারের একটী স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি কুড়িজন মনুষ্যের তুল্য ভাবি এবং তাহার মূল্য পঞ্চদশ লক্ষ টাকা। অর্দ্ধছটাক পরিমাণ স্বর্ণের মূল্য চল্লিশ টাকা। অর্দ্ধছটাক পরিমাণ সুবর্ণ যে স্বর্ণতাল হইতে পাওয়া যায় সে স্বর্ণতাল অতিক্ষুদ্র। কিন্তু সর্ব্বদা স্বর্ণকে স্বর্ণতালরূপে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহা সচরাচর মাটীর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং সেই জন্য দেখিতে পাওয়া সুকঠিন হয়। ইহাকেই স্বর্ণ রেণু কহে।

অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম না করিলে মাটী হইতে স্বর্ণ পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। গামলাতে মাটী ধৌত করিয়া স্বর্ণ বাহির করিবার একটী মাত্র উপায় আছে। কিন্তু বস্ত্র ধৌত করণ অপেক্ষা ইহাতে অধিক পরিশ্রম ব্যয় হইয়া থাকে। এই ধৌত করণ প্রক্রিয়াকে শোধন কহে। খননকারী গর্ত্ত হইতে মাটী উঠাইয়া ঠেলা গাড়ীতে করিয়া উঠাইয়া এক নিঃসরের নিকটে লইয়া যায় ও একটী বৃহৎ গামলা মধ্যে উহা রাখে; তৎপরে সে হাতাদিয়া গামলার মধ্যে জল ফেলিতে ও মৃৎপিণ্ড গুলিকে ভাঙ্গিবার জন্য খন্তা দ্বারা আলোড়ন করিতে থাকে। সময়ে সময়ে সে কর্দ্দমময় জলের খানিকটা ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার তাহাতে অধিক পরিমাণে জল দেয়। সেই সময়ে খননকারী কখন কখন জুতা খুলিয়া গামলার ভিতরে প্রবেশ করিয়া পাদিয়া জল ও মৃত্তিকা একত্রে ঘুঁটিতে থাকে।

এই রূপ প্রক্রিয়ার অনেক ক্ষণ পরে যখন কৃষ্ণবর্ণ মলিন স্বর্ণখণ্ড গুলি প্রাপ্ত হয় তখন সেগুলিকে একটী দোল্লাতে রাখিয়া শিশুর ন্যায় অনবরত দোলাইতে থাকে। এই দোল্লা যদিও দোল্লার

আকৃতিতে প্রস্তুত তথাপি ইহা যথার্থ দোলা নয়, ইহা এক প্রকার বৃহৎ ঝাড়নী। ইহার নিম্নে অনেক ছিদ্র আছে। এই সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া মাটী বহির্গত হইয়া যায় এবং পরিশেষে ঝাড়নীর অধঃস্থিত একটী ক্ষুদ্র তাকে স্বর্ণবিন্দু সকল অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে। তখন কত স্বর্ণ হইয়াছে তাহা ধৌতকারীরা কি প্রকার আগ্রহের সহিত দেখে! কত আনন্দের সহিত, কত যত্নের সহিত সেগুলিকে থলিয়াতে সংগ্রহ করে! ইহার বিনিময়ে অর্থ পাইবার জন্য কত আনন্দে বণিকদিগের নিকট গমন করে! কিন্তু অনেকে স্বর্ণ না পাইয়া হতাশ হইয়া যায়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া যায় তথাপি তাহাদের ভাগ্যে অত্যল্প মাত্র স্বর্ণ জুঠে না। খননস্থানে তাহারা খুঁড়িতে থাকে, শোধন করিতে থাকে, ঝাড়নীতে ঝাড়ে, শেষে দেখে কিছুই নাই! এইরূপ দশা প্রায় অনেকেরই ঘটে। কেহ কেহ হতাশ হইয়া মরিয়াও যায়।

প্রত্যেক বারের খননে যে সমুদায় স্বর্ণ লব্ধ হয় সেই সমুদায় স্বর্ণ যদি খনন-কারীদিগের মধ্যে তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে প্রত্যে-কের ভাগে এক তোলা অপেক্ষা কিছু অধিকপরিমাণ স্বর্ণখণ্ড অথবা কুড়িটী টাকা পড়ে। কিন্তু তাহা একজন খনন-কারীর পরিশ্রম ও কষ্টের পুরস্কারের উপযুক্ত হইতে পারে না। সেই স্থানে খাদ্য এত দুর্মূল্য যে তাহার কুড়ি টাকা শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়। সেখানকার কোন কোন স্থানে এক খানি পাউরুটীর মূল্য প্রায় আড়াই টাকা এবং একটী ডিম্ব অথবা অর্দ্ধ সের দুগ্ধের মূল্য আট আনা। লোকের অর্থ এত কম তাহাতে আবার খাদ্য সামগ্রী এত দুর্মূল্য! উঃ তাহাদিগকে কি কষ্টে থাকিতে হয়! তাহাদের কুড়িটী টাকা কত শীঘ্র ফুরাইয়া যায়! খননকারীরা এত পরিশ্রমে যাহা পায় তাহা অপেক্ষা তৎস্থানীয় সূত্রধার, মালী ইত্যাদি ব্যবসায়ীরা অল্প পরিশ্রমে ও কৌশলে তাহার তিন চারি গুণ অধিক লাভ করে। স্বর্ণখনন করিতে গেলে যদি এই প্রকার কখন কষ্ট পাইতে হয়, কখন হতাশ হইতে হয়, কখন মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে তবে লোকে কেন স্বর্ণের নিমিত্ত খনন করিয়া থাকে? আশার কুহক! তাহারা মনে করে যদিই বা তাহাদিগের ভাগ্যে স্বর্ণ জুঠে। প্রত্যেকেই মনে করে হয়তো আমিও ফুটির মত একটা স্বর্ণতাল পাইয়া একবারেই ধনী হইতে পারিব।' এই রূপে খননকারীরা ধনী হইবার নিমিত্ত সততঃ ব্যতিব্যস্ত হয়। তাহারা যদি একবার খানিকটা স্বর্ণ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাদিগের সহস্র পরিশ্রম ও কষ্টের পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

যাহারা অনেক পরিশ্রম ও কষ্টে স্বর্ণ লাভ করিয়াছে তাহাদিগের পক্ষে উহা উপকারী না হইয়া বরং বিশেষ অপকারী

হইয়া থাকে। কষ্টার্জ্জিত স্বর্ণ যে কি প্রকারে ব্যয়িত হইয়া থাকে তাহা দেখিলে অত্যন্ত দুঃখ হয়। যে বৃক্ষতলে একজন খনক খননকার্য্য হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিশ্রামার্থে বসিয়াছে সেই স্থানেই দেখা যায় যে রাশি রাশি ভগ্ন বোতল পড়িয়া রহিয়াছে!! যে স্থান মনুষ্যের পদস্পৃষ্ট হইয়াছে সেই খানেই ভগ্ন বোতল সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য! মদে মদেই দেশ উৎসন্ন গেল।

কিন্তু সমুদয় অর্থ কেবল মদেই ব্যয় হইতে পারে না। কেহ কেহ অর্থ লইয়া কি করিতে হয় তাহা না জানিয়া উহা বৃথা নষ্ট করে। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে খনকেরা মোহরগুলি নুড়ির ন্যায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া খেলা করিতেছে এবং স্বদেশের ব্যাঙ্ক নোটগুলি পুরাতন লিপি-পুস্তকের পত্রের ন্যায় পুড়াইয়া ফেলিতেছে। কেহ কেহ অশ্ব ক্রয়ে আপন স্বর্ণ ব্যয় করিয়া থাকে। তাহারা সেই ক্রীত ঘোটকোপরি আরোহণ করিয়া ঘোড়দৌড় করে এবং এত বেগে দৌড় করে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের হস্তপদাদি বা গ্রীবা ভগ্ন হইয়া মৃত্যুউপস্থিত না হয় ততক্ষণ আর ঘোড়দৌড়ের শেষ হয় না।

একদা একজন খননকারী আপন স্ত্রীর নিমিত্ত একটা জমকাল গাউন ক্রয় করিবার মানসে দোকানে যায়। সে ব্যক্তি অত্যন্ত কোমলস্বভাব ছিল এবং স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সতত ইচ্ছা করিত। দোকানদার তাহাকে নানা প্রকার সুন্দর কাপড় দেখাইল, কিন্তু একটাও তাহার মনোনীত হইল না। সে বলিল "আমি ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর এক খানি চকচকে কাপড় চাই।" অবশেষে দোকানদার তাহাকে উজ্জ্বল কমলালেবুর বর্ণের একটী চকচকে সাটীন দেখাইলে সেইটী তাহার মনোনীত হইল। তখন সে বলিল "আমার স্ত্রী কার্পাস বস্ত্রের গাউন পরিয়া আমার সহিত বিবাহিত হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে সে যথার্থ স্বর্ণময় একটী গাউন পরিতে পাইবে।" যদিও এই সাটিনের প্রত্যেক গজের মূল্য চল্লিশ টাকা এবং গাউনের মূল্য ছয় শত টাকা তথাপি সেই ব্যক্তি আরও অধিক মূল্যের অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করণাভিলাষী হইয়া সেই সাটিনের মূল্য ফেলিয়া দিয়া সগর্ব্বে এবং সানন্দ পদ-বিক্ষেপে চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, তাহার স্ত্রীকে এই জমকাল পরিচ্ছদ পরিধানে যে প্রকার দেখাইয়া ছিল তদপেক্ষা তাহার পূর্ব্বতন সামান্য বেশে তাহাকে অধিকতর সুন্দর দেখাইত।

এই সমস্ত ব্যক্তি আপন উপার্জ্জিত অর্থ সদ্ব্যয়ে ব্যবহার না করিয়া কেবল দিবারাত্র বৃথা আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিয়া নষ্ট করে ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। আশ্চর্য্য! অতি কষ্টে অর্জ্জিত সেই অর্থ ইহারা সৎকার্য্যে ব্যয় না

করিয়া মোহান্ধ হইয়া কেবল অসৎ ব্যয়ে নষ্ট করতঃ পুনর্ব্বার দারিদ্র্য দুঃখে নিপতিত হয়।

একজন যুবতী ভদ্রমহিলা একদা মেলবোর্ণে * বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন যে একটী অল্পবয়স্ক বালিকা কলস হস্তে বেগবাহিনী নির্ঝরিণী তীরে নত হইয়া জল তুলিতেছে। বালিকাটীর পরিচ্ছদের অধিকাংশ যোড়ে পরিপূর্ণ হইলেও তাহা অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। তাহার মুখমণ্ডল ম্লান ও পরিশুষ্ক; তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন সে অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছে। ভদ্রমহিলাটী কৃপাপূর্ব্বক সেই বালিকাকে কলস পূরণে সাহায্য করিলেন কিন্তু কলস পূর্ণ হইলেও বালিকার এরূপ শক্তি ছিল না যে উহা অধিক দূর বহন করিয়া লইয়া যায়। তদ্দর্শনে মহিলাটী তাহাকে ইহার বহন বিষয়েও সাহায্য করিয়াছিলেন।

অতঃপর তাঁহারা উভয়ে ক্যানভ্যাস † নগরাভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে ভদ্রমহিলাটী বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নূতন দেশ কি তোমার ভাল লাগে?" বালিকা উত্তর দিল "না! আমরা এখানে অনাহারে মুমূর্ষু প্রায়; আমরা যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন আমাদিগের খাদ্যের অভাব ছিল না; বাবা কেরাণী ছিলেন এবং তখন আমাদের পরিষ্কার পরিপাটী একটী বাড়ী ও দুইজন দাসী ছিল। কিন্তু তিনি এখানে আসিয়া দেখিলেন যে কাহারও কেরাণীর আবশ্যক নাই; অধিকন্তু তিনি সূত্রধার অথবা কর্ম্মকারও হইতে পারেন না, সুতরাং করিবার কিছুই পাইলেন না। সেই জন্য অগত্যা তিনি খননকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া এখান হইতে অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে একখানিও পত্র পাই নাই; আমাদের নিকট টাকা কড়ি যাহা কিছু ছিল সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছে। সেই জন্য মা আমাদের বাসবাটী ছাড়িয়া বস্ত্রগৃহে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মা অত্যন্ত পীড়িত; আমাদের একটী অল্পবয়স্ক শিশু মরিয়া গিয়াছে এবং আমাদের এমন উপায়ও নাই যে চিকিৎসক আনাইয়া মাকে আরোগ্য করাইব।

ভদ্রমহিলা বালিকাটীর দুঃখকাহিনী শুনিয়া দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া সত্বর সেই দুর্ভাগ্য পরিবারের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বালিকাটী তাঁহার হস্ত ধরিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। তিনি দেখিলেন যে বালিকার পীড়িতা মাতা কম্বল জড়াইয়া বস্ত্রগৃহের এক কোণে স্যাঁৎসেঁতে জমীতে শুইয়া অল্প অল্প

* অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটী বৃহৎ নগর।

† এই স্থান মেলবোর্ণের সন্নিকটবর্ত্তী। ইহার নাম Canvas Town, কারণ ইহা Canvas কাপড় নির্ম্মিত বস্ত্রগৃহের দ্বারা পরিপূর্ণ।

চাহিতেছে এবং তাহার পার্শ্বে একটী শিশু বসিয়া রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, বলিয়া গেলেন পরদিন পুনরায় তথায় আসিবেন।

পরদিন প্রত্যুষে তিনি একজন বন্ধুসহ এক বোতল মদ, চা, চিনি এবং এরারুট ময়দা লইয়া সেই বস্ত্রগৃহে যাইলেন। কিন্তু যে কোণে মাতা শুইয়াছিল সেই কোণের দিকে নেত্রপাত করিয়া কি দেখিলেন?—একটী বিবর্ণ মৃত শরীর! সেই মৃত শরীরের পার্শ্বে একজন শোকার্ত্ত মনুষ্য বসিয়া আছে! তাহার পদ প্রান্তে কতকগুলি স্বর্ণতাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং সে ব্যক্তি হতাশনয়নে তাহাদিগের উপর চাহিয়া রহিয়াছে! তাহার সে দৃষ্টি যেন বলিতেছে "হায়! এক্ষণে এই সকল স্বর্ণ কি হইবে? আমার স্ত্রী পুত্র মরিয়া গেল; আমার এ সকলই বৃথা!" হায়, তাহার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব সহিল না; সে আশা করিয়াছিল যে স্বর্ণতাল আনিয়া তাঁহার স্ত্রী পুত্রগণকে দেখাইবে কিন্তু তাহা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। সপ্তাহ ধরিয়া সে স্বর্ণতালসহ তাহার স্ত্রীপুত্রের অন্বেষণে মেলবোর্ণ নগরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল কিন্তু তাহারা যে বাটী ছাড়িয়া বস্ত্রগৃহে আসিয়াছে কেহ তাহা জানিত না, সুতরাং কেহই বলিতে পারে নাই যে তাহারা কোথায় গিয়াছে। সে যে খনি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল ইহা তাহার শিশু সন্তান-দিগের পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, কারণ তাহার ন্যায় অনেক খননকারী খননকার্য্য হইতে আদৌ ফিরিয়া আইসে নাই। তাহারা মরিয়াছে কি বাঁচিয়াছে বা কোথায় গিয়াছে তাহাদিগের কিছু মাত্র সন্ধান নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীহিতেন্দ্র—

ওয়ালেস্।

ষোড়শ অধ্যায়।

ওয়ালেসের বিচার ও প্রাণদণ্ড।

কার্লাইলের কারাগার হইতে মণ্টীথ ওয়ালেস্‌কে সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ও ওয়ালেস্ কৃষ্ণবর্ণের শকটযানে আরূঢ়, ও দুইশত অশ্বারোহী ইংরাজ সৈন্য সেই কৃষ্ণ শকটের পশ্চাদ্বর্ত্তী। এইরূপে সেই বন্দিশকট কার্লাইল হইতে দক্ষিণাভি-মুখী হইল। প্রচণ্ডবেগে শকট চলিতে লাগিল। যেন স্কটিশসূর্য্য সে দিন দক্ষিণ সাগরে অস্তমিত হইবার জন্য সেইদিকে

ছুটিল! অথবা যেন কোন দৈবী শক্তি স্কট্‌লণ্ডের বক্ষঃস্থল হইতে ইহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া সুদূর দক্ষিণাপথে প্রক্ষিপ্ত করিল! সহসা যেন স্কটিশ গগন তমসাচ্ছন্ন হইল! সহসা যেন স্কটিশ হৃদয়ের রক্তস্রোত বন্ধ হইল! যিনি স্কট্‌লণ্ডের পুনরুদ্ধারের জন্য বক্ষ চিরিয়া রক্ত দিয়াছিলেন, জন্মভূমির পুনরুদ্ধারের জন্য যিনি সমরাঙ্গনকে সুখশয্যা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, আজ সেই স্কটিশ্‌বীর স্কট্‌লণ্ডকে শূন্য করিয়া স্কট্‌লণ্ডের জাতিদ্রোহিতা ও স্বার্থপরতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আত্ম-বলি দিতে ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিতে-ছেন—এই সংবাদে স্কট্‌লণ্ডের আবাল-বৃদ্ধবনিতা আজ গৃহে গৃহে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে।

এই সংবাদে ওয়ালেসের প্রিয় সহচর লঙ্‌ভিলের শোকের আর সীমা রহিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যতদিন তিনি ইহার প্রতিশোধ লইতে না পারি-বেন, ততদিন স্বদেশ ফিরিয়া যাইবেন না—স্কট্‌লণ্ডেই অবস্থিতি করিবেন। তিনি লকমেবেনে গমন করিলেন, তথায় এড্‌ওয়ার্ড ব্রুসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তথায় তাঁহারা স্কট্‌-লণ্ডেশ্বর রবার্ট ব্রুসের আগমনপ্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্যান্‌-কবরণ্‌ স্বাধীনতা সমরে লঙভিল এই রবার্ট ব্রুসেরই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্কট্‌লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য অদ্ভুত রণ-নৈপুণ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ব্রুস্‌ আসিয়া ওয়ালেসের বৃত্তান্ত শুনিয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এড্‌-ওয়ার্ড ব্রুস ভ্রাতার নিকট ওয়ালেসের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিলেন, এবং প্রতি-শোধ লইবার জন্য শীঘ্র বদ্ধপরিকর হইতে বলিলেন।

এদিকে সেই কৃষ্ণরথ ওয়ালেস্‌কে লইয়া যথাসময়ে ইংলণ্ডে পৌঁছিল। এড্‌ওয়ার্ডের আনন্দের আর সীমা রহিল না। ওয়ালেস্‌ ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট ধৃত হইয়া উক্ত মাসের ২২এ তারিখে লণ্ডনে আনীত হন, সুতরাং পথে সপ্তদশ দিবস অতীত হইয়াছিল। পথে ইংলণ্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা সবিস্ময়ে স্কটিশবীরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ওয়ালেসের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোক লণ্ডনে প্রবেশ করিল। সে দিবস ফেঞ্চর্চ ষ্ট্রীটের কোন গৃহস্থের বাটীতে তাঁহাকে রাখা হইল। পরদিন ওয়ালেস্‌ অশ্বপৃষ্ঠে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে নীত হইলেন। ইংলণ্ডের প্রাণ্ডমার্সাল সার্‌ জন্‌ ডি গ্রেড্‌, লণ্ডনের রেকর্ডার জিওফে, মেয়র, সেরিফ, আল্‌ডারমেন্‌ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত গমন করিলেন। পশ্চাতে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক ধাবিত হইল। এড্‌ওয়ার্ডের ব্যাকুল-তার সীমা ছিল না। যাহাতে জজেরা ওয়ালেস্‌কে দোষী সাব্যস্ত করেন, এই

জন্য তিনি সেই দিবস বার বার জজের সংখ্যা পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কখন তিন জন, কখন চারিজন, কখন পাঁচজন জজে বিচার করিবেন স্থির করিলেন। কখন দুইজন, কখন তিন জনে কোরম্ হইবে স্থির করিলেন। দালানের দক্ষিণ মঞ্চে ওয়ালেস্ উপবেশিত হইলেন। ওয়ালেস্ স্পর্দ্ধা করিয়া পূর্ব্বে বলিতেন যে তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে বসিয়া ইংলণ্ডের রাজমুকুট মস্তকে পরিধান করিবেন। আজ তাই ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁহাকে সেই হলে বসাইয়া তাঁহার মস্তকে লরেল মুকুট অর্পিত হইল। ক্ষুদ্রতেজা এড্ওয়ার্ড এরূপ নিদারুণ সময়ে ওয়ালেস্কে এরূপ মর্ম্মবেদনা দিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইংরাজরাজের এ অভ্যাস চিরন্তন। এক দিন ওয়েল্স পেট্রিয়ট্ লিওলিন্কেও এইরূপ মর্ম্মন্তুদ অপমান করা হইয়াছিল। তাঁহার মস্তক কাটিয়া লইয়া লণ্ডন টাওয়ারের উপর রাখিয়া তদুপরি আইভী লতার মুকুট অর্পিত হইয়াছিল। ওয়ালেসের বধের পর সার সাইমন্ ফেজরেরও এই দুর্দ্দশা করা হইয়াছিল।

ওয়ালেসের বিরুদ্ধে রাজবিদ্রোহিতার অভিযোগ করা হইল। সিগ্রেভ, মালুরী, স্যাণ্ডউইচ, ব্লাক্ওয়েল্, ব্লিণ্ড্, এই পাঁচজন জজে ওয়ালেসের বিচার আরম্ভ করিলেন। বিচারের ফল যাহা হইবে তাহা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত ছিল। তথাপি জজেরা লোকধর্ম্মের অনুরোধে ওয়ালেস্কে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি রাজবিদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছ, তুমি দোষী কি নির্দ্দোষী ?' ওয়ালেস্ উত্তর দিলেন 'আমি নির্দ্দোষী, কারণ আমি কখন ইংলণ্ডেশ্বরের প্রজা ছিলাম না, সুতরাং রাজবিদ্রোহিতার অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে হইতে পারে না'। জজেরা ওয়ালেসের এ সঙ্গত উত্তরে কর্ণপাতও করিলেন না। অন্তর্জ্জাতীয় বিধি অনুসারে তিনি যে রাজবিদ্রোহিতা অপরাধে দণ্ডনীয় হইতে পারেন না, তাহা জগৎ বুঝিল, কিন্তু জজেরা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। কারণ তাঁহারা এড্-ওয়ার্ডের নিকট নিজ নিজ কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিক্রীত করিয়াছিলেন। তাই আজ তাঁহারা বিচারকের মর্য্যাদায় ও দায়িত্বে পদাঘাত করিয়া বিড়ম্বনাময় লোক-দেখানে বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাই আজ তাঁহারা নিম্নলিখিত অযৌক্তিক ও ন্যায়বিগর্হিত মন্তব্য প্রকাশ ও দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন। তাঁহারা বিচারাসনে বসিয়া এড্ওয়ার্ড যাহা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাই করিয়া বিচারকের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলেন। রায়ের মর্ম্ম এই—'স্কট্-লণ্ডেশ্বর জন্ বেলিয়ল্ রাজ্যচ্যুত হওয়ায়, এড্ওয়ার্ড স্কট্লণ্ড বিজিত ও অধিকৃত করেন। স্কট্লণ্ডের যাজকমণ্ডলী, আরল্ ও ব্যারন্গণ, এবং অন্যান্য

প্রজাবৃন্দ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। তিনি স্কট্‌লণ্ডময় শান্তি প্রচার করিয়াছেন, এবং স্কট্‌লণ্ডের রীতি নীতির অনুযায়ী শাসনপ্রণালী তাহাতে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। এই সকল সত্ত্বেও উক্ত ওয়ালেস্ অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে আক্রমণ করিয়াছে, লানার্কের সেরিফ হেসেলরিগকে বধ করিয়া তাঁহার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়াছে; ক্রমশঃ উপচিত-বল ও প্রভাবান্বিত হইয়া ইংরাজ দুর্গ-সকল সবলে গ্রহণ করিয়াছে; স্কট্‌লণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুরূপে স্কট্‌লণ্ডে নিজের আদেশ প্রচার করিয়াছে, পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিয়াছে; ফরাশিরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে; নর্দ্দাম্বর্ল্যাণ্ড, কম্বর্ল্যাণ্ড, ও ওয়েষ্ট-মোরল্যাণ্ড আলোড়িত করিয়া বেড়াইয়াছে,—ফলকার্ক সমর ক্ষেত্রে প্রকাশ্য যুদ্ধে ইংলণ্ডেশ্বরের সম্মুখীন হইয়াছিল, এবং পরাজিত হইবার পর যখন তাহাকে ব । হইল যে ক্ষমা চাহিয়া শান্তি গ্রহণ করুক্, তখন শান্তি গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিল। সুতরাং সেই কারণে তাহাকে সেই সময়েই আইন-বহির্ভূত (Out-lawed) করা হইয়াছে, এবং সে তাহার পর আর ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট ক্ষমা চাহিয়া শান্তি ভিক্ষা করে নাই, সুতরাং তাহাকে জবাব দেওয়ার ও আত্মপক্ষসমর্থনের অধিকার দেওয়া ইংলণ্ডের আইন অনুসারে অবৈধ ও ন্যায়বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অতএব তাহাকে সে অধিকার দেওয়া হইতে পারে না। এক্ষণে তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বিহিত হইল—আরও এই আদেশ দেওয়া গেল যে তাহার মস্তক ছেদন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করা হইবে। ধন্য বিচারক! ধন্য তোমার বিচারপ্রণালী! যেমন রাজা তেমনই বিচারক!

বধ্যভূমিতে যাইবার পথের দুই ধারে দুই শ্রেণী সশস্ত্র পুরুষ, পশ্চাতে অসংখ্য লোক ধাবিত—এই অবস্থায় ওয়ালেস্ বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। ওয়ালেসের মুখে সাহস ও শান্তি বিরাজমান। স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে ওয়ালেসের মনে যেন অপরিসীম আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তিনি একজন যাজক অথবা কন্‌ফেসর চাহিলেন, দুরাচার এড্‌ওয়ার্ড তাহা দিলেন না—বলিলেন যে, যে ওয়ালেস্ সম্বন্ধে সে কার্য্য করিবে, তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বিহিত হইবে। কাণ্টরবরীর বিসপ্ এড্‌ওয়ার্ডকে ধিক্কার দিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া ওয়ালেসের কন্‌ফেসরের কার্য্যে ব্রতী হইলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিতে আদেশ দিলেন,—কিন্তু তাঁহার সহচর মন্ত্রিবর্গ তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন।

ওয়ালেস্ বিসপের নিকট জীবনের

কাহিনী কিছুই গোপন না করিয়া সমস্ত ব্যক্ত (Confess) করিলেন এবং নতজানু হইয়া নিজ আত্মাকে ঈশ্বরে অর্পণ করিলেন। বিসপ্ পরবর্ত্তী দৃশ্য দেখিতে পারিবেন না বলিয়া বধ্যভূমি হইতে পলায়ন করিলেন। ঘাতকেরা তাহার পর তাঁহাকে বধ্যযূপের নিকট লইয়া গেল। তাঁহার হস্তপদ তখনও সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ—আজ ত্রিশ দিন ধরিয়া তাঁহাকে এই অবস্থায় রাখিয়াছে। ওয়ালেস্ লর্ড ক্লিফোর্ডের নিকট তাঁহার চিরসহচর উপাসনাপুস্তকখানি ফিরিয়া চাহিলেন। এই পুস্তকখানি কারাগারে লইয়া যাইবার সময়, তাঁহার গাত্রবস্ত্র সহ কারাধ্যক্ষের জিম্মায় রক্ষিত হইয়াছিল। হাড়কাটে যখন তাঁহার মস্তক সন্ন্যস্ত হইল, তখন তিনি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে সেই পুস্তক ধরিতে বলিলেন। পুস্তক তাঁহার নয়নসম্মুখে ধরা হইল, তিনি এক দৃষ্টিতে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ চৈতন্য রহিল, ততক্ষণ মাতৃদত্ত এই পুস্তকের দিকে ভক্তিভাবে তাকাইয়া রহিলেন। এদিকে ঘাতকেরা তাহাদিগের নৃশংস কার্য্য সাধন করিয়া ফেলিল। আজ ইংলণ্ডের বধ্যভূমিতে স্কট্লণ্ডের গগনের চাঁদ রাহুগ্রস্ত হইল! আজ বসুমতী বীররক্তে উক্ষিত হইয়া প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিল! আজ ইংলণ্ডের বক্ষ সেই রুধিরানলে পুড়িয়া ছারখার হইল! ২৩এ আগষ্ট ভীষণ নৃশংসতার সহিত এই বীরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। পিশাচেরা সেই বীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিল। মস্তক লণ্ডন সেতুর উপর, দক্ষিণ হস্ত নিউকাসল্ সেতুর উপর স্থাপিত করা হইল। বাম হস্ত বারউইকে, দক্ষিণপদ পার্থে, ও বামপদ আবার্ডিনে প্রেরিত করা হইল। এইরূপে সেই মহাবীর প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত স্কটিশ পেট্রিয়ট্ স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য —এবং অনন্তকাল মানবজাতির শিক্ষার জন্য—আত্মোৎসর্গ করিলেন। ধন্য ওয়ালেস্! ধন্য তোমার আত্মোৎসর্গ! পুণ্যভূমি সেই দেশ, যে দেশে তোমার মত পুণ্যাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ধন্য সেই জাতি, আত্মজন্ম দ্বারা তোমার মত লোক যে জাতিকে অনুগৃহীত করেন!

যে সর্ব্বসংহারক মৃত্যু জগতের কোন প্রাণীকে ছাড়ে না, ভাল মন্দ বিচার করে না, সেই ওয়ালেসের দেবোচিত গুণগ্রাম সহিতে না পারিয়া, অকালে তাঁহাকে কুক্ষিগত করিল! কিন্তু মূঢ়! তোমার বৃথা চেষ্টা! যিনি নিজের অদ্ভুত আত্মোৎসর্গে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে কুক্ষিগুপ্ত করিয়া রাখা তোমার অসাধ্য। তুমি মূর্খ তাই তাঁর গলিত ঘৃণ্য স্থূল শরীর লইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছ! ঐ দেখ ওয়ালেস্ বিদ্যুন্ময় সূক্ষ্মশরীরে দাসত্ব-নিপীড়িত মৃতপ্রায় কোটী কোটী মানবদেহে জীবন সঞ্চার করিতেছেন। প্রচণ্ড বায়ুতাড়নে তাঁহার চিতাভস্মের এক একটী রেণু অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে সমস্ত

পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। সেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শ করা যমের অসাধ্য। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যাহাকে স্পর্শ করে, সেই অমরত্ব লাভ করে। সে বিদ্যুৎ যে শরীরে সংক্রামিত হয়, সে আর মৃত্যুকে ভয় করে না। যাহার স্থূল শরীরে মমতা, স্থূলশরীর-ভোগ্য ভোগবিলাসিতায় আসক্তি, সেই মৃত্যুভয়ে জড়ীভূত হয়। উৎসর্গীকৃতপ্রাণ নিষ্কাম যোগী মৃত্যুভয় জানে না, কর্ত্তব্যপালনের জন্য মৃত্যুকে প্রিয় সুহৃৎভাবে আলিঙ্গন করে। তাই ঘাতকগণের উত্তোলিত খড়্গ দেখিয়াও ওয়ালেসের মুখ বিষণ্ণ হয় নাই; তিনি জননী জন্মভূমির জন্য স্থূল শরীর বিসর্জ্জন করিতেছেন বলিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া এডওয়ার্ড নিজের পিশাচত্ব দেখাইলেন মাত্র। তাঁহার সেই পৈশাচিক কার্য্যে ওয়ালেসের কীর্ত্তি অনন্তকালস্থায়িনী হইল, কিন্তু তাঁহার যশঃ-শশধর চিরকালিমায় আবৃত হইল!

বর্ষার মেঘ।

(পদ্যপৌঙক্তিক পদ্য-গদ্য)

১

আকাশ নীল—অনন্ত নীল,
মানব-চক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল!
দক্ষিণদিক্‌শোভিনী দিগঙ্গনার অঙ্গুলি হ'তে
ধীরে ধীরে বায়ুস্রোতে
একখানি সূক্ষ্ম মেঘ ভাসিয়া আসিল।
সূক্ষ্ম মেঘ বলিলাম কেন?
অনন্ত নীলাকাশপটের একটি পাশে
অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গাঙ্কিত বক্ষে
একটি ক্ষুদ্র পত্রের ন্যায় যে মেঘ,
সে কি বৃহৎ?—না—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র!
আমিও এই কালসমুদ্রে বা কালাকাশে
তস্মাদপি ক্ষুদ্র,
বা ক্ষুদ্রতম শব্দের পর
যদি অন্য কোন বিশেষণ থাকে,
আমি তাই।
আমি, আকাশ-কোলে
ঐ ক্ষুদ্রতম মেঘের তুলনায় কালের কোলে
'নাই' বলিলেই হয়।
অহো, তবে কালের চেয়ে অনন্ত কে?—
মহান্ কে?
তা কি জান না?—ঈশ্বর।
একই কথা—যিনি ঈশ্বর, তিনিই কাল।

২

এ কি হ'ল?
এই কয়টি কথা ভাবিতে ভাবিতে
ক্ষুদ্র মেঘ বৃহৎ—বৃহত্তর হ'ল!
বামনমূর্ত্তি বিরাটমূর্ত্তিতে পরিণত হ'ল!
অহো, ক্ষুদ্র মেঘ এত বড়!

বুঝিয়াছি—
জগতে কেহই ক্ষুদ্র নয়।
ক্ষুদ্র কেন হইবে ?
যিনি জগতের স্রষ্টা,
তিনি ক্ষুদ্র হইলে
জগৎ, জগদ্বাসী প্রাণী অপ্রাণী ক্ষুদ্র হইত,
সুতরাং কেহই ক্ষুদ্র নয়।
যাহাকে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পরমাণু বলে
তাহা না কি এত ক্ষুদ্র যে
অণুবীক্ষণ-যন্ত্র চক্ষে না ধরিলে
দেখা যায় না—বোঝা যায় না,
আবার অণুবীক্ষণও কখন কখন হারি মানে।
তবে বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিকের মতে
পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতম আর কিছুই নাই।
কিন্তু আমার বিবেচনায়
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বড় ভ্রান্ত ;
নহিলে এমন কথাও কি বলে ?
কি আশ্চর্য্য !
সকলের চেয়ে পরমাণু ক্ষুদ্র !
পরমাণু সর্ব্বক্ষুদ্র হ'লে
সর্ব্ববৃহৎ কে ?

৩

ভাই বৈজ্ঞানিক !
একবার বেস্ ক'রে ভেবে দেখ দেখি,—
তোমার বিজ্ঞানের পুঁজী পাটা কি লইয়া ?
পরমাণু লইয়া নয় ?
তোমার সূর্য্য কি ?
চন্দ্র কি ?
বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি আদি গ্রহ কি ?
সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ ইউরেনস্ কি ?
বিশ্বসংসার কি ?
ব্রহ্মাণ্ডের পর ব্রহ্মাণ্ড তার পর ব্রহ্মাণ্ড—
এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড,
সে সকলই বা কি ?
পরমাণু নয় কি ?
যদি পরমাণুই হ'ল,
তবে তুমি কোন্ লজ্জায়—কোন্ মুখে
পরমাণুকে ক্ষুদ্র বল ?
যদি বল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুযোগে
এই সকল বৃহৎ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে,
কিন্তু পরমাণু নিজে ক্ষুদ্র,
তবে তুমি ভ্রমের অঙ্ক কসিতে খুব মজবুৎ।
ভাই, তুমি কি জান না,
যাদের সংযোগে বা একতায়
অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড গড়িতে পারে,
তা'রা কখনো ক্ষুদ্র ?
তা'দের চেয়ে তবে বড় কে ?—ঈশ্বর।
ও একই কথা—যে ঈশ্বর সেই পরমাণু।*

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

---

* যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্যাপৌণ্ডিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটী নূতন অঙ্গ। লেখা তো হইল। এখন পাঠকমণ্ডলী কি বলেন।—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

শিশির-বিন্দু।

ঐ যে দুর্ব্বাদলোপরি শিশিরবিন্দু বালার্ককিরণে প্রতিভাত হইয়া মুক্তাফলের ন্যায় ঝকমক করিতেছে, উহার উৎপত্তির বিবরণ এক্ষণে বিদ্যালয়ের ছাত্র মাত্রেই অবগত আছে। কিন্তু তাহার সেই জ্ঞানটুকু সংগ্রহ করিবার জন্য যে কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? এই যে কণপরিমিত শিশিরবিন্দু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তাহার তত্ত্বনিরূপণেই যদি যুগ যুগান্তর কাটিয়া গেল, তবে এই অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব এবং সেই অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি কারণ কত কালে নিরূপিত হইবে এবং কেই বা তাহা নিরূপণ করিবে কে বলিতে পারে?

পরিষ্কার নির্মেঘ রাত্রিতে যখন তারকাপুঞ্জ আকাশে প্রস্ফুটিত হয়, যখন নিশানাথ শীতল রশ্মি বিতরণ করেন, তখনই প্রভূত পরিমাণে হিমপাত হয়; এই ব্যাপারটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই প্রাচীন পণ্ডিতবর্গ তারকামণ্ডল এবং চন্দ্রকে শিশিরোৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন; এজন্য তাঁহারা চন্দ্রের নাম হিমাংশু রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে তারকা এবং চন্দ্র হইতে শিশির কণা বর্ষিত হয়। শিশিরপাতের এই কারণানুমান প্রাচীনতম।

ইহার পর পণ্ডিতবর্গ শিশিরপাত সম্বন্ধে আর একটী অনুমান উপস্থিত করেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে যখন দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালে বহুগুণে বায়ু শীতল হয় তখনই শিশিরপাত হইয়া থাকে। যে দিন আকাশ পরিষ্কার না হয়, আকাশে চন্দ্র তারকা পরিদৃশ্যমান না হয়, সেই দিন শীতাধিক্য হয় না এবং শিশিরপাতও হয় না; ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা অনুমান করেন যে বায়ুর শৈত্যই শিশিরোৎপত্তির কারণ, আর চন্দ্রতারকা এই শৈত্যের কারণ। সূর্য্য যেমন দিবাভাগে উষ্ণ রশ্মি বর্ষণ করেন, রজনীযোগে সেইরূপ চন্দ্রতারকা হিমাংশু বিতরণ করেন; সেই শীতল রশ্মিপাতে বায়ুমণ্ডল শীতল হয় এবং বায়ু শীতল হইলেই আকাশ হইতে শিশিরপাত হয়। এই অনুমানের অনেক গুলি দোষ। প্রথম কথা এই যে চন্দ্রতারকা সত্য সত্যই হিমাংশু বিতরণ করে কি না?—বহুকাল পর্য্যন্ত সকলের সেই বিশ্বাসই ছিল; কিন্তু অধুনাতন কালে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির উৎকর্ষ হওয়াতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে তারকারশ্মি এবং চন্দ্ররশ্মি শীতল নহে, বরং উষ্ণ। সূর্য্য যেরূপ উত্তাপ বর্ষণ করে, চন্দ্রতারকাও ঠিক সেইরূপ উত্তাপ বিতরণ করে; তবে উভয়ের

পরিমাণের তারতম্য আছে মাত্র। চন্দ্র-তারকার কিরণজাল সূর্য্যকিরণ অপেক্ষা বহু সহস্র গুণে নিস্তেজ; এত নিস্তেজ যে উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত উহা সহজে উপলব্ধ হয় না। কিন্তু ঐ রশ্মি এত নিস্তেজ হইলেও গ্রহতারকাগণ হইতে যে উত্তাপ বর্ষিত হয় তাহার সমষ্টিপরিমাণ অতি প্রভুত। পৃথিবী বাহির হইতে যে উত্তাপ প্রাপ্ত হয়, এই উত্তাপসমষ্টি তৎপরিমাণের নিতান্ত স্বল্পাংশ নহে। উপরি-উক্ত অনুমানের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে বায়ু শীতল হইলেই আকাশ হইতে শিশিরপাত হয় কেন তাহার কোন ব্যাখ্যা নাই।

ইহার পর পণ্ডিতপ্রবর আরিষ্টটল্ শিশিরপাতের আর একটি ব্যাখ্যা দেন। আরিষ্টটলের ব্যাখ্যা অনেকাংশে প্রকৃত ব্যাপার কাছাকাছি আসিয়াছিল। সেই প্রাচীনকালে আরিষ্টটল যত বিস্তৃত পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কোন পণ্ডিতই সেরূপ পারেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি নানাবিষয়িণী ছিল; এমন কোন বিষয় নাই, বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নাই যাহা তিনি ব্যাখ্যা করিয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি এইরূপ সর্ব্বতঃ-প্রসারিণী হওয়াতে তিনি কোন একটি বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারেন নাই। দুই একটি পরীক্ষা করিয়া, দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতেন; সুতরাং পরীক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত না হওয়াতে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি অভ্রান্ত হইত না। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহা হইতে অনুমান বলে তর্ক করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পৌরাণিক প্রথা মহামতি বেকন কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হয়। ভূয়োদর্শন এবং পরীক্ষা লব্ধফলগুলি একত্রিত করিয়া তন্মধ্য হইতে সাধারণ ধর্ম্মগুলি বাছিয়া লইয়া তর্কের যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, তাহা মহামতি বেকন প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার Novum Organum গ্রন্থ আধুনিক বিজ্ঞানের যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বিজ্ঞান এক্ষণে শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

আরিষ্টটল্ শিশিরবিজ্ঞান সম্বন্ধে দুইটি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ১ম, ঝঞ্ঝাবাতাদিরহিত শান্ত রজনীতেই শিশিরপাত হয়; ২য়, পর্ব্বত শিখরোপরি শিশিরপাত হয় না। আরিষ্টটলের এই দুইটি উক্তি এক্ষণে পরিশুদ্ধ করিয়া বলিতে গেলে একটু সামলাইয়া বলিতে হইবে যে পর্ব্বতোপরি বা ঝটিকোপদ্রুত রজনীতে অতি অল্পই শিশিরপাত হইয়া থাকে। এই দুইটি ব্যাপার দেখিয়া তিনি এইরূপে তর্ক করিলেন:—শিশির অবশ্য এমন কোন নৈসর্গিক ক্রিয়া সম্ভূত যাহা ঝঞ্ঝাবাতাদিতে নিষ্ক্রিয় হয় এবং যাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে অধিক উর্দ্ধে কার্য্যকরী হয় না; অতএব সিদ্ধান্ত হইল বায়ু মধ্য হইতে বাষ্প নির্গত হইয়াই শিশিরের উৎপত্তি হয়। তিনি বলেন "জল এবং উত্তাপের একত্র মিশ্রণে

বাষ্পের উৎপত্তি; যতক্ষণ পর্য্যন্ত জল উত্তাপ প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা বাষ্পাকারে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে; কিন্তু বাষ্প অধিক উর্দ্ধে উঠিতে পারে না, কেননা অধিক উপরে উঠিলে উত্তাপ স্বতন্ত্র হইয়া চলিয়া যায়; আরও ঝঞ্ঝাবাতাভিহত রজনীতেও বাষ্প বায়ু মধ্যে থাকিতে পারে না; বায়ুর সঞ্চালনে বাষ্প উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই কারণেই উচ্চ স্থানে এবং ঝটিকোপদ্রুত রজনীতে শিশিরোৎপত্তি হয় না।” চন্দ্রনক্ষত্রাদিকে তিনি শিশিরোৎপত্তির কারণ স্বীকার করেন না, প্রত্যুত বলেন “সূর্য্যই উহার কারণ, যেহেতু সূর্য্যোত্তাপে জল হইতে বাষ্প উদ্গত হয়, এবং যখন উত্তাপের অভাব হয় তখন বাষ্প পুনরায় জলে পরিণত হয়”। আরিষ্টটলের এই মত কতক অংশে সত্য হইলেও অনেকভ্রমসংকুল। উত্তাপ যে একটি পদার্থ, উহার মিশ্রণে যে জল বাষ্প হয় এবং উচ্চ স্থানে ও ঝটিকাভিঘাতে যে ঐ উত্তাপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এ মতটি ভ্রমসংকুল। উত্তাপ চলিয়া গেলে ঘনীভূত বাষ্প শিশিরাকারে উপর হইতে পড়ে এমতটিও ভ্রমসংকুল। সূর্য্যের অদর্শনই যে বাষ্প ঘনীভূত হইবার কারণ এমতও ঠিক নহে; সূর্য্যের অদর্শন ব্যতীত শীতোৎপত্তির যে অপর কারণ আছে তাহা পশ্চাৎ উল্লিখিত হইবে। তবে আরিষ্টটল্ যে অনুমান করিয়াছিলেন বায়ু হইতে বাষ্প নির্গত হইয়া শিশিরের উৎপত্তি হয় ইহা বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ লাভ। আরিষ্টটল্ কারণটি ঠিক ধরিয়া ছিলেন কিন্তু কিরূপ প্রক্রিয়ায় সেই কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

আরিষ্টটলের এই মত বহুকাল পর্য্যন্ত লোকের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে পারে নাই। চন্দ্রনক্ষত্রাদি হইতে যে শিশিরপাত হয়, কল্পনাপ্রিয় গ্রীক এবং রোমক জাতি তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বহুকাল পরে পণ্ডিতবর বাপতিস্তা পোরসিয়া পরীক্ষা দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন শিশির উপর হইতে পড়ে না। তিনি দেখিলেন জানালার কাচের ভিতর দিকেও শিশিরপাত হইয়া থাকে এবং উদ্ভিদ্‌গণকে শীত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে কাচের ঢাকন ব্যবহৃত হয় তাহার বহির্ভাগ অপেক্ষা ভিতরের দিকে অধিকতর পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হয়, আবার কোন কোন পদার্থের ভিতরেই শিশিরপাত হয় উপরের দিকে মোটেই হয় না। পোরসিয়া আরিষ্টলের মত উপেক্ষা করিয়া বলেন যে শিশির বাষ্প হইতে জন্মে না প্রত্যুত বায়ু হইতেই জন্মিয়া থাকে।

পোরসিয়ার পরীক্ষার পর ইহাও লক্ষিত হইল যে ভূপৃষ্ঠ হইতে যতই উর্দ্ধে যাওয়া যায় ততই অল্প পরিমাণ শিশিরপাত দেখা যায়। এই ব্যাপার দেখিয়া এবং পোরসিয়াকৃত পরীক্ষা দেখিয়া লোকে সিদ্ধান্ত করিল শিশির

উপরে হইতে পড়ে না, প্রত্যুত ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়।

কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। সকলে দেখিলেন যে বৃষ্টি যেমন সমপরিমাণে সকল বস্তুর উপরে পড়ে শিশির সেরূপে সমপরিমাণে সকল বস্তুর উপরে পড়ে না; কোন পদার্থে অল্প পরিমাণে, কোন পদার্থে অধিক পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হয়। এ এক নূতন বিপদ্। উপর হইতেই পড়ুক আর নীচে হইতেই উঠুক সমপরিমাণে সকল বস্তুর উপর শিশিরপাত হওয়া উচিত, তাহা যখন হইল না তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে শিশির উপর হইতেও পড়ে না অথবা নিম্ন হইতেও উত্থিত হয় না। শিশিরসঞ্চয়ের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যেরই ভিন্ন ভিন্নরূপ কার্য্যকারিতা লক্ষিত হয়।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এইরূপে পুনরায় আরিষ্টটলের ব্যাখ্যার দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। তখন সকলের মনে হইল যে বায়ুতে সঞ্চিত বাষ্প হইতে শিশির উৎপন্ন হইতে পারে, এবং তাহা হইলে পদার্থের উপরে অথবা নীচে অথবা পার্শ্বে যে কোন দিকে শিশির সঞ্চিত হওয়া সম্ভব। আর যে দ্রব্যের উপরে শিশির সঞ্চিত হয়, সেই দ্রব্যের শীতলতাই শিশিরসঞ্চয়ের পক্ষে বিশিষ্ট কারণ বোধ হইল; এজন্য পার্শ্ববর্ত্তী বায়ু অপেক্ষা কোন দ্রব্য শীতল হইলেই সেই বায়ুসঞ্চিত বাষ্প শিশির রূপে তাহার গায় লাগিবে এইরূপ অনুমান করা হইল। বাস্তবিক পরীক্ষাতেও ঠিক তাহাই দেখা গেল। এক গ্লাস জলে বরফ গলাইলে সেই গ্লাসের গায় শিশির সঞ্চিত হইতে দেখা গেল। আমরা যে নিশ্বাস ফেলি স্বভাবতঃ তাহা উষ্ণ; যদি শীতল কাচ অথবা প্রস্তরখণ্ডে নিশ্বাস ফেলি তবে দেখা যায় তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু সঞ্চিত হইয়াছে। নিশ্বাসের সহিত যে জলীয় বাষ্প থাকে শৈত্যস্পর্শে তাহাই ঘনীভূত হইয়া এস্থলে জলাকারে পরিণত হয়।

এইরূপ পরীক্ষাসমূহ দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইল যে শৈত্যস্পর্শে বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পের ঘনত্বেই শিশিরের উৎপত্তি। কিন্তু এই শৈত্য কোথা হইতে আইসে? পরিষ্কার রাত্রিতেই বা প্রভূত পরিমাণে শিশির উৎপন্ন হয় কেন? লণ্ডননিবাসী ডাক্তার ওয়েলস (Wells) এ বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য নানারূপ পরীক্ষা করিয়া অবশেষে তাহার তত্ত্বাবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইলেন। বহুশতাব্দীর পর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল এবং তখনই শিশিরপাতের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জনসমাজে প্রচারিত হইল।

ডাক্তার ওয়েলস্ দশ গ্রেন ওজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশমের নুটি পাকাইয়া রাত্রে এক উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিতেন। প্রাতে উঠিয়া সেগুলি পুনরায়

ওজন করিতেন। রাত্রিতে প্রত্যেক নুটিতে যতটুকু শিশির সঞ্চিত হইত, প্রত্যেক নুটির সেই পরিমাণে ভার বৃদ্ধি হইত। ভিন্ন ভিন্ন রাত্রে উপর্য্যুপরি পরীক্ষা করিয়া ওয়েলস দেখিলেন যদিও মেঘাবৃত রাত্রি অপেক্ষা পরিষ্কার রাত্রিতে সর্ব্বদাই অধিক পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইবার কথা, তথাপি কোন কোন দিন আবার সে নিয়মের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। এরূপ ব্যভিচারের কারণানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি দেখিতে পান যে নুটির উপর কোনরূপ আবরণ গগনাচ্ছাদন করিয়া থাকিলেই তাহাতে অল্পপরিমাণ শিশির সঞ্চিত হয়। পরীক্ষা পাকা করিবার জন্য তিনি চারিটা খুঁটি পুতিয়া তাহার উপর একখানি তক্তা চাপাইয়া ছাদ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে একটি এবং নিম্নভাগে আর একটি নুটি স্থাপন করিলেন। এই পরীক্ষার ফল অতি সন্তোষজনক হইল; তিনি দেখিলেন যে পরিষ্কার রাত্রিতে তক্তার উপরে স্থাপিত পশমের নুটিতে ১৪ গ্রেন এবং নীচে স্থাপিত নুটিতে কেবল মাত্র ৪ গ্রেন শিশির সঞ্চিত হইয়াছে। নানারূপে এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি একইরূপ ফল প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর আবরণ থাকিলেই এরূপ তারতম্য কেন ঘটে তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

ওয়েলস প্রত্যেক নুটির নিকট এক একটি তাপমান যন্ত্র রাখিয়া সেই স্থানের শীতলতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; দেখিলেন যেখানে অত্যধিক শিশিরপাত, সেইখানেই শৈত্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু শিশিরপাত কখনও এই শৈত্যাধিক্যের কারণ নহে। জল বাষ্পাকারে পরিণত হইবার সময় পার্শ্ববর্ত্তী উত্তাপ শোষণ করিয়া শৈত্য উৎপাদন করে; আবার বাষ্পাবস্থা হইতে তরলাবস্থায় পরিণত হইলে উত্তাপ উদগত হইয়া থাকে; এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকলের জানা ছিল। সুতরাং অত্যধিক শিশিরপাতের সঙ্গে অত্যধিক শৈত্যের কারণ অপর কিছু আছে তাহা নিঃসন্দেহ। সেই কারণটি কি, ওয়েলস এক্ষণে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

পূর্ব্বের পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষা উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া ওয়েলস দেখিলেন কাষ্ঠাদির আচ্ছাদন বা অপর কোনরূপ আবরণ থাকিলেই উত্তাপ বাহির হইয়া যাইতে পারে না, সেই আবরণ উত্তাপকে আটকাইয়া রাখে। তখন আকাশের মেঘাবরণও এইরূপ উত্তাপ আটকাইবার কারণ বলিয়া প্রতিভাত হইল। এক্ষণে দেখা যাউক, যে উত্তাপ এইরূপে আটকাইয়া থাকে তাহার স্বরূপ কি? এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে তিন প্রকারে উত্তাপ সঞ্চালিত হইতে পারে। সেই তিন প্রক্রিয়ার নাম (১) পরিচালন (২) স্থানান্তরীকরণ (৩) বিকিরণ। পরস্পর

সংশ্লিষ্ট পদার্থনিচয়ের একটি উত্তপ্ত করিলে যেরূপ প্রক্রিয়ায় সমস্ত পদার্থ গুলি তাতিয়া উঠে তাহাকে পরিচালন-ক্রিয়া (conduction) কহে। কোন একটি উত্তপ্ত পদার্থ স্থানান্তরিত করিয়া যে উত্তাপের স্থানান্তর করা যায় তাহাকে স্থানান্তরীকরণ প্রক্রিয়া (convection) কহে। আর আলোকের ন্যায় উত্তাপও সর্ব্বপ্রকার উত্তপ্ত পদার্থ হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া থাকে; এই প্রক্রিয়াকে বিকিরণ প্রক্রিয়া(radiation) কহে। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে বিকিরণ প্রক্রিয়াই শিশিরোৎপত্তির কারণ। যে পদার্থ হইতে অধিক পরিমাণে উত্তাপ বিকিরিত হয় তাহাই অধিকতর শীতল হয় এবং সেই জন্যই তাহাতে অধিক পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হয়। এই বিকিরণ প্রক্রিয়া কোন রূপ বাধা পাইলে শিশির-সঞ্চয়ের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে।

কোনরূপ আবরণ দ্বারা যে উত্তাপের বিকিরণ আটকাইয়া রাখা যায় ইহা সকল সময়ে স্পষ্ট বুঝা যায় না। যখন উত্তাপের সহিত আলোক বর্ত্তমান থাকে তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই যে কোনরূপ ব্যবধান থাকিলে সেই ব্যবধান ভেদ করিয়া আলোক ও উত্তাপ তাহার অপর দিকে যাইতে পারে না। কিন্তু সকল সময়ে স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও আলোকবিরহিত নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপেরও ঠিক ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। কোনরূপ ব্যবধান থাকিলে উত্তাপ তাহা ভেদ করিয়া বিকীর্ণ হইতে পারে না। উত্তাপ বিকিরণের এই নিয়ম না জানিয়াও আমরা কার্য্যতঃ অনেক সময়ে এই উপায়ে উত্তাপ রক্ষা করি। হিম-প্রধান দেশে কৃষকগণ শাকাদি শীত হইতে রক্ষা করিবার জন্য খুঁটি পুতিয়া রাত্রিতে তাহার উপর চেটাই বিছাইয়া আবরণ দিয়া থাকে। ডাক্তার ওয়েলস্ বলেন "কৃষকগণের এই কার্য্য যে বিজ্ঞান-সম্মত তাহা প্রথমতঃ কখনই ধারণা করিতে পারি নাই, কিন্তু আমার পরীক্ষার পর বুঝিতে পারিলাম উহা শীত নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় বটে"। ডাক্তার ওয়েলস এইরূপ বহু পরিশ্রমের পর ক্রমশঃ শিশিরোৎপত্তির সমস্ত তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করিলেন। পূর্ব্বে, দেখা গিয়াছিল ঘাস অথবা কাষ্ঠ অপেক্ষা ধাতুময় দ্রব্যে অল্পপরিমিত শিশির সঞ্চিত হয়। ইহার কারণ এক্ষণে স্পষ্ট উপলব্ধ হইল। বিকিরণ প্রক্রিয়ায় ধাতু হইতে অতি অল্পই উত্তাপ নির্গত হয়; অতএব ঘাস অথবা কাষ্ঠ যত শীতল হয়, ধাতু তত শীতল হয় না; সুতরাং তাহার উপর তত অধিক শিশির সঞ্চিত হয় না। এই কারণেই প্রস্তর ও কর্করাদি অপেক্ষা ঘাসের উপর অধিক শিশিরপাত হয়। কাচের বিকিরণ-প্রক্রিয়া অতি সুন্দর, এজন্য কাচের উপর অত্যধিক শিশিরপাত হয়। কাচের উপর এই শিশিরপাতের আধিক্য

হেতু জ্যোতির্বিদগণকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইত। রাত্রিতে গগন পর্য্যবেক্ষণ কালে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের পরকলার উপর শিশির পড়িয়া দৃষ্টির অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিত। ওয়েলসের আবিষ্ক্রিয়াতে এই উৎপাতের প্রতিবিধান হইল। দূরবীক্ষণযন্ত্রের প্রান্তভাগে একটা টিনের বা কাগজের চোং সংযোগ করাই এই শিশিরপাত নিবারণের উপায়।

রাত্রিকালে পৃথিবী হইতে শূন্যে উত্তাপ বিকিরিত হয়; কিন্তু আকাশে মেঘাবরণ থাকিলে এই বিকিরণ-ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে। একজন পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে অনাবৃত স্থানে তাপমান যন্ত্রে যে পরিমাণ উত্তাপ লক্ষিত হয়, সেই যন্ত্রের উপর মেঘ আসিয়া ঢাকিলে তাহা অপেক্ষা প্রায় ১০ ডিগ্রি অধিক উত্তাপ দেখা যায়; আবার মেঘ চলিয়া গেলে তাপমান যন্ত্রের পারদ ১০ ডিগ্রি নামিয়া পড়ে। শীতপ্রধান দেশে পরিষ্কার জ্যোৎস্নারাত্রিতে কিয়ৎক্ষণ আকাশে চাহিয়া থাকিলে কাহারও কাহারও ক্ষণিক অন্ধতার উৎপত্তি হয়, কাহারও বা চক্ষুরোগ জন্মে। লোকে ভ্রমবশতঃ চন্দ্রকে এই চক্ষুরোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; কিন্তু চন্দ্র এরূপ চক্ষুরোগের কারণ নহে। নির্ম্মল রাত্রিতে আকাশে চাহিলে চক্ষু হইতে উত্তাপ বিকিরণ হেতু শৈত্যই এই চক্ষুরোগের কারণ। পৃথিবী হইতে উত্তাপ বিকিরণ হইবার পক্ষে মেঘ উল্লিখিতরূপ বাধা জন্মায়; সুতরাং যে দিন আকাশ নির্ম্মল ও পরিষ্কার থাকে সে দিন অধিকতর উত্তাপ বিকিরণ হেতু অধিক শিশিরপাত হয়; আর যে দিন আকাশ মেঘাবৃত থাকে সেদিন অধিক উত্তাপ বিকীর্ণ হয় না; সুতরাং পৃথিবী অধিক শীতল হইতে পারে না, অতএব সেদিন শিশিরপাতও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে।

আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে ভূপৃষ্ঠের উন্নত স্থান গুলিতে সুন্দররূপে উত্তাপের বিকিরণ হওয়া প্রযুক্ত তথায় অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শিশিরপাত হইবে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। উচ্চ স্থান গুলিতে উত্তাপ সুন্দররূপ বিকিরিত হয় বটে, এবং তাহাতে নিকটবর্ত্তী বায়ু শীতল হয় বটে, কিন্তু সেই শীতলতা স্পর্শে তথাকার বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল অতএব গুরু হইয়া নিম্নে নামিয়া পড়ে এবং নিম্নের উষ্ণতর অতএব লঘু বায়ু উপরে উঠে। বায়ুর এইরূপ প্রবাহ বশতঃ উত্তাপের অধিকতর বিকিরণ হইলেও উপরের পদার্থনিচয় সহসা শীতল হইতে পারে না; এবং সেই জন্যই অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তাপ বিকিরণ সত্ত্বেও উপরে অধিক পরিমাণে শিশিরপাত হয় না।

যদি উচ্চস্থানস্থিত কোন পদার্থের নিম্নভাগে কটাহাকার কোন ব্যবধান রাখা যায় তাহা হইলে ঐ ব্যবধান হেতু

এই বায়ু প্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে; সুতরাং তখন প্রভূত শিশিরপাতের পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। উন্নত স্থান অপেক্ষা ভূপৃষ্ঠস্থিত পদার্থনিচয়ে অতি সহজেই শিশিরপাত হইয়া থাকে, কেননা উত্তাপ বিকিরণ হেতু যে শৈত্য জন্মে তৎস্পর্শে নীচের বায়ুস্তর অগ্রে শীতল হয়; হইয়া গুরুত্ববশতঃ সেই থানেই থাকে, আবার উপরের শীতল বায়ু ক্রমে নিম্নে আসিয়া জমিতে থাকে এবং এইরূপে নিম্নের পদার্থনিচয় সহজেই অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়ে। এই অত্যধিক শৈত্য বশতই নিম্নে প্রভূত পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হয়।

শিশিরপাতে প্রকৃতি যে একটী অত্যাশ্চর্য্য রক্ষণী শক্তি বিকাশিত করে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। রাত্রিকালে পৃথিবী এবং তৎপৃষ্ঠস্থিত পদার্থনিচয় হইতে যে উত্তাপ শূন্যে বিকীর্ণ হইয়া যায়, যদি কোন উপায়ে সেই উত্তাপ পুনরবচিত না হয় তাহা হইলে উদ্ভিদ্‌রাজ্যে বিষম বিপদ ঘটে, বৃক্ষ লতা তৃণ গুল্মাদি শৈত্যাধিক্যে একবারে মরিয়া যায়। কিন্তু রাত্রিতে যখন উত্তাপ বিকিরিত হইতে থাকে, প্রকৃতি সুন্দরী তখন শিশিরপাত হইতে উত্তাপ অবচিত করিতে থাকেন। এই প্রস্তাবের স্থানান্তরে বলা হইয়াছে জল তরলাবস্থা হইতে বাষ্পাবস্থায় পরিণত হইবার সময় উত্তাপ গ্রহণ করে, আবার বাষ্পাবস্থা হইতে তরলাবস্থায় পরিণত হইবার কালে উত্তাপ উন্মোচন করে। অতএব রাত্রিকালে যখন জলীয় বাষ্প শিশিরবিন্দুতে পরিণত হয়, তখন প্রভূত পরিমাণ উত্তাপ উদ্গত হয়; এই উত্তাপই অনেকাংশে বিকিরণক্রিয়ায় নষ্ট পার্থিব উত্তাপের সমতা বিধান করে। দিবাভাগে বাষ্পাকার ধারণ কালীন জল প্রভূত পরিমাণে সূর্য্যোত্তাপের প্রাখর্য্য হ্রাস করে, আবার রজনীতে শিশিরপাতের সময় দুরন্ত শীতের তীক্ষ্ণতা নষ্ট করে। দিবাভাগে সহস্ররশ্মি সহস্র কিরণজাল বিস্তার করিয়া যখন জল শোষণ করেন, তখন সেই সঙ্গে আবার রাত্রের প্রয়োজন জন্য শোষিত জলে যে উত্তাপ সঞ্চিত করেন ইহা ভাবিতে গেলে কাহার না মন বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়? প্রকৃতির কি সুন্দর কৌশল, কি চমৎকার নিয়ম! আমাদিগের পাদস্পর্শে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তৃণাগ্র হইতে যে সহস্র মুক্তাফল ঝরিত হয় তাহারা যে প্রকৃতি সুন্দরীর রক্ষণী শক্তির জলন্ত সাক্ষী ইহা ভাবিয়া কাহার না শরীর রোমাঞ্চিত হয়?

শ্রীযোগেন্দ্র—

স্বভাব-কবির পরিণয়।

(১)

মধুর বসন্তে সুখ-সমীরণ
সুধা-পরিমল-আমোদভরা,
বহিছে মৃদুল নাচায়ে কুসুমে
লহরে লহরে ভাসায়ে ধরা।
দুলিছে লতায় দুদুল দুদুল
সুললিত তালে বনের ফুল,
মজিয়ে সৌরভে বসিছে উড়িয়া
ঢুলি ঢুলি কালো অলির কুল।
গাহিছে কোকিল তুলিয়ে সুতান
সুধাস্বরে নব রসের ভরে,
ভাসিছে কমল বেশে সুমধুর
উল্লাসে তরল বিমল সরে।
ডাকিছে চাতক কাঁপায়ে বিমান
বাতাস-সাগরে উধাও হয়ে,
ভ্রমিছে সমীর সুখে দশদিশ
সে সুধা-সঙ্গীত লহরী লয়ে।

(২)

এহেন সময়ে সুরূপা কামিনী
ঢলিয়া ঢলিয়া গোলাপ গায়,
কাণে কাণে তার বলিলা কি কথা
হাসিয়া গোলাপ হরষে চায়।
"কোথালো শুনিলি সুখ-সমাচার—
প্রকৃতি সখীর বিবাহ হবে,
জুটিল কোথায় মনমত বর,
বল তবে সখি হবেলো কবে।"
"শুনলো গোলাপ" কহিলা কামিনী,
"শুন সে অপূর্ব্ব হাসির কথা,
প্রভাতের কালে মালতী সকাশে
বিস্ময়ে স্বজনি শুনিনু যথা।
একটী যুবক পাগল মতন
ভ্রমিত সদাই কাননমাঝে,
আপনার মনে কতকি বলিত
নিরখি মোহন স্বভাবসাজে।
রস-অলিরাজ যেমতি স্বজনি
নাচি নাচি আসি সোহাগ ভরে,
প্রেমভরে গেয়ে প্রণয়ের গান
বসেলো মোদের উরসোপরে;
তেমতি সে জন—(কি লাজের কথা!)
কি জানি কি ছলে আসিত ধেয়ে,
অমনি নয়ন মুদিতাম সখি,
কেমনে বললো থাকিব চেয়ে?
সরমে মরিয়া ঢাকিতাম মোরা
কুসুম-যৌবন-সুষমা যত,
তবু সে পাগল না ভুলিত কভু
কাকুতি মিনতি করিত কত!

(৩)

"কভুবা বসিয়ে রসালের তলে
গুণ গুণ করি ধরিত তান,
কি বলিব সখি কি ভাবের ঘোরে
মজিয়া থাকিত তাহার প্রাণ।
কভুবা গায়িত কখন হাসিত
কভু বেড়াইত আপন মনে,
আড়ালে থাকিয়া হেরিতাম সই
আমরা সকলে সে কবিজনে।
কখন বসিয়ে সরসীর কূলে
দেখিত উদাস পাগল মনে,

বিলাসে মাতিয়ে তরঙ্গিণী ধনী
কেমনে খেলে সে জোছনা সনে।
আলিঙ্গন-আশে চারু শশিকর
যেমনি সখীরে জড়ায়ে ধরে,
অমনি সেজন মুচকি হাসিয়া
বাপীকূল হ'তে যাইত সরে।
এইরূপে সই সে পাগল কবি
কতই জ্বালাত রজনী দিনে,—
'এ ঘোর বিপদে' ভাবিনু আমরা
'কে রাখিবে সখী প্রকৃতি বিনে।'
এক দিন সবে এ জ্বালার কথা
নিবেদিনু চারু চরণে তার,
চাহিলা প্রকৃতি দেখিতে তাহারে
বিস্ময়ে মু'খানি করিয়া ভার।
পুন এক দিন নিরখিনু তারে
ভ্রমিতে সে চারু কুসুমবনে,
যেন একমনে বেড়ায় খুঁজিয়া
হারায়ে কি যেন প্রাণের ধনে।
অমনি সত্বরে ডাকিয়া সখীরে
দেখায়ে দিনু সে পাগল জনে,
সখীর শরীর সিহরি উঠিল
কি জানি কি ভাব উদিল মনে।
কালি নিশিযোগে মালতী সকাশে
বলেছে প্রকৃতি গোপন ভাবে,
পাগলিনী সই, বরিবে পাগলে
নতুবা তাহার পরাণ যাবে!

(৪)

"আজিলো স্বজনি পূর্ণিমা নিশিতে
মিলিবে প্রকৃতি পাগল সনে,
না জানি গোলাপ! এহেন নাগরে
কেমনে সখীর ধরিল মনে।
না পাই ভাবিয়া. গুণবতী সখী
কিসে হেন গুণ হেরিল তার—
সইলো সে জন নিরেট পাগল
হৃদয় তাহার ভাবনা-সার!
কি ভাবিবে হায় রসিক পবন
কিম্বা সে বলিবে নবীন চাঁদ,
যেলো নিশিযোগে সখী-প্রেম-আশে
কত ছলে মরি পাতিত ফাঁদ
সুধীর পবন রজনী দিবায়
কাণে কাণে কত গায়িত গান,
তবু তার তরে প্রকৃতি সতীর
প্রেমেতে কভু না মজিল প্রাণ!
আজিলো না জানি কতই গঞ্জনা
দিবে সে সখীর সরল মনে,—
কুসুম-কোমল সজনীর তনু
কেমনে মিলিবে পাষাণ সনে?
সরমে গলিয়া পূরনিমা চাঁদ
বিষাদে বুঝিলো ঢাকিবে মুখ,
শুভ পরিণয়ে অশুভ নিরখি
কোথালো গোলাপ! রাখিব দুঃখ?"
এতেক কহিয়া সে কামিনী ধনী
নিরবিলা নব লাজের ভরে,
গোলাপ রঙ্গিণী তুলিয়া বদন
কহিলা তাহায় সান্ত্বনা তরে।

(৫)

"কেনলো কামিনি! এত রোষ তোর
রূপবতী সতী প্রকৃতি প্রতি—
মদনে ত্যজিয়া অপর পুরুষে
কভু কি রতির ধায়লো মতি?
অবশ্য প্রকৃতি পেয়েছে তাহার
রূপের গুণের প্রমাণ ভালো—

ভানু বিনা সখি তাড়ায়ে আঁধারে
কে পারে করিতে জগতে আলো ?
পূর্ণিমা-বিমানে সুবিমল শশী
সবারি নয়নে সমান হাসে,
বললো স্বজনি বিনা কুমুদিনী
প্রাণভরে তারে কে ভালবাসে ?
বুঝেছে কুমুদ বিবিধ প্রকারে
সে চারু চাঁদের কতই মান,
তাইত স্বজনি মজে সুখ-প্রেমে
সোহাগে সে তারে সঁপেছে প্রাণ !
তুমিলো কামিনি ভুবনাক আর
ব'ল না সখীর কিরূপ রুচি,
চললো দুজনে যাই তার পাশে
বিষাদ মনের কালিমা মুছি।
চললো আমোদে মাতিগে কৌতুকে
কি বল তাহাতে আছেলো দোষ,
না গেলে প্রাণের প্রকৃতি সুন্দরী
অভিমানে মনে করিবে রোষ।"—
এত বলি দোঁহে চলিলা হরষে
প্রণয়-প্রতিমা প্রকৃতি পাশে,
মধুর বিলাসে সাজিয়ে মধুর
বিমল পুলক লাভের আশে।

(৬)

নিশা-সমাগমে সখীগণ মেলি
সাজায় সতীরে মোহন বেশে,
সাজে ফুলকুল বিমল উল্লাসে
বিধুমুখে মরি মধুর হেসে।
গগনে উদিল উজল চন্দ্রমা
হরষে হেরিতে অপূর্ব্ব ঘটা,
শোভিল তারকা সুবিমল-ভাতি
ছড়ায়ে অম্বরে রূপের ছটা।

বহিল পবন সুধীর প্রবাহে
শ্রুতিসুখকর মধুর স্বরে,
বসিল ভ্রমর কুসুম-উরসে
সুমধুর মধু পানের তরে।
ভরিয়া কানন গাহিল যে গান
মজিল তাহাতে কুসুম-মন,—
প্রকৃতিরে লয়ে বাহিরিল তবে
হেলি দুলি ফুল-ললনাগণ।
বসিল আসিয়া প্রেমময় কবি
ভূষিত আপন পাগলী বেশে,
হৃদয়ে কল্পনা ঠিক সেইরূপ
খেলিত যেমন আপন দেশে।
বসায়ে সতীরে কবি-বামপাশে
সব সখী মেলি হুলুই দিল,
কবির মানসে সে সুধা ঝঙ্কার
মোহ-আকর্ষণে কাড়িয়ে নিল।
আসিয়া তখন কল্পনা সুন্দরী
চারু করে কর মিলায়ে দেয়,
সিহরিত-তনু লাজুক প্রকৃতি
ঢলিয়া কবির পড়িল গায়।

(৭)

অমনি হরষে ফুলবালাগণ
ফিরায়ে আনন হাসিয়ে উঠে,
নাচিল উল্লাসে হেমময়ী লতা—
বিলাস-মাধুরী প্রবাহ ছুটে !
প্রকৃতির প্রেমে মজিয়ে হরষে
হইল পাগল পাগল-কবি,
অনিমেষ চখে চাহিয়া রহিল
হেরিতে সে চারু কোমল ছবি।
চাহিয়া চাহিয়া নয়নে নয়ন
নীরবে কত কি কহিল কথা,

সরসী-উরসে প্রফুল্ল নলিনী
প্রাণসখা সহ আলাপে যথা।
উভয়ের প্রাণ উভয়ের পানে
চলিল প্রণয়-মিলন তরে,—
সাগরের সনে মিলিতে সোহাগে
ঝরিণী-হৃদয় যেমতি ঝরে।
প্রকৃতির চারু সুষুমা-লহরী
ভরিয়া রহিল কবির মন,
চাপিয়া চাপিয়া ধরিলা হৃদয়ে
পাইলা কি যেন নিজের ধন।

(৮)

সুখের মিলনে স্বভাবের কবি
মিলিয়া মানস-বাসনা সনে,
নিতুই আমরি! লাগিলা ভ্রমিতে
পুলকে প্রকৃতি-বিলাস-বনে।
এরূপে বিরলে প্রণয়ের ভরে
প্রতিদিন আসি মিলে সে তথা,
লয়ে সখীগণে বিহারে হরষে
চির-আমোদিনী প্রকৃতি যথা।
অরসিক কবি সমাপিল হেথা
স্বভাব-কবির বিবাহ-কথা,—
না জানি রুষিয়া রসিকা রমণী
হাসিয়া কতই কহিবে কথা!

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

সিংহল বিজয়।*

(কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত)

—স্বর্ণসৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে!
রুষি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা;—
হেদে দেখ, শশিমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে!
কি লজ্জা! থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
রাজ্য ওরে আমি, সই! উদ্যান স্বরূপে
সাজানু সিংহলে কিলো দিতে পরজনে?
জ্বলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশিমুখি,
কমলার অহঙ্কার; দেখিব কেমনে
স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা?
জলধি জনক তাঁর; তেঁই শান্ত তিনি
উপরোধে। যা, লো সই, ডাক সারথিরে
আনিতে পুষ্পকে হেথা। বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি; প্রভঞ্জনে লয়ে
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে?
স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে
ঘর্ঘরি। হেষিল অশ্ব, পদ আস্ফালনে
সৃজি বিস্ফুলিঙ্গবৃন্দে। চড়িলা স্যন্দনে
আনন্দে সুন্দরী, সাজি বিমোহন সাজে!

---

* এই কবিতার আরম্ভ আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। সেই অংশ পাওয়া গেলে, কবির আভাস জানিতে পারা যাইত। এই শেষ অংশ দেখিয়া প্রারম্ভ যে অতি সুন্দর হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বিজয়ের সিংহলযাত্রা ঐতিহাসিক সত্যমূলক ঘটনা। মাইকেল মধুসূদনের কবিতায় সেই চিত্র ফলিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, দেশের ও দেশভাষার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইত, সন্দেহ নাই। শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়*—সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ বাবুকে না জানেন এমন লোক অতি বিরল। কিছুদিন পূর্ব্বে এদেশে ইউরোপীয় চিকিৎসা এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে বৈদ্যচিকিৎসা একবারে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল কিন্তু পণ্ডিতবর হারাধন, গঙ্গাপ্রসাদ, রমানাথ, ব্রজেন্দ্র, গোপীমোহন প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণের চিকিৎসানৈপুণ্যেই পুনরায় এ দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার এত আদর হইয়াছে। আজি আমাদের বিশেষ গৌরব ও আহ্লাদের বিষয় এই যে চিকিৎসকপ্রবর গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয় স্বকীয় তত্ত্বাবধানে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাঁহারা পরিশ্রম এবং ব্যয় স্বীকার করিয়া আয়ুর্ব্বেদের নষ্ট রত্ন সমুদায় উদ্ধৃত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন তাঁহারা আমাদের অকপট গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র; এজন্য আমরা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ এবং বিজয় রত্নকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

* অষ্টাঙ্গ হৃদয়—অর্থাৎ মহামতি বাগ্ভট বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ। অরুণদত্ত কৃত টীকা সহিত চিকিৎসক-শিরোভূষণ শ্রীযুক্ত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে শ্রীবিজয়রত্ন সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক অনুবাদিত, সংশোধিত ও প্রকাশিত।

অষ্টাঙ্গ হৃদয় খণ্ডশ প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার যে কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার অনুবাদ আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহা কেবল অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের অনুবাদ নহে, ইহার অনুবাদপ্রসঙ্গে অনুবাদক বিজয় বাবু প্রচলিত সমগ্র আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেরই জ্ঞান ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া যেরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে আমরা কোন বৈদ্যকগ্রন্থে তাহা দেখিতে পাই নাই। ইহাঁর অনুবাদের ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল। অনুবাদক মহাশয় স্থানে স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সহিত হোমিওপ্যাথি এবং য়্যালোপ্যাথি চিকিৎসার মত সন্নিবিষ্ট করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞানে যেরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব সন্তোষজনক। নূতন আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মূলসূত্র যে সুমহান্ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে বিজয় বাবু এক স্থলে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রকৃতি নামক প্রস্তাবটীতে বিলক্ষণ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন দ্রব্যগুণতত্ত্বের অনুবাদেও যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ আমরা এই গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদের যে কোন অংশ পাঠ করিয়াছি তাহাতেই অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান অনুবাদক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে নূতন জীবনীশক্তি প্রদান করিয়া সমাজের যেরূপ হিত সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য সকলেরই তাঁহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা বিধেয়।

অনেক দিন গত হইল, বোম্বাই নগরে সটীক অষ্টাঙ্গ হৃদয় অতি পরিষ্কার-রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। সুশিক্ষিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের মুদ্রাঙ্কণে মূল এবং টীকারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। যথা:—

ক। পূর্ব্ব পুস্তকে শ্লোকগুলি দুই তিন খণ্ড করিয়া তাহার নিম্নে যথোপযুক্ত টীকা সন্নিবেশিত করাতে পাঠকগণের অভ্যাসের অসুবিধা হইত, কিন্তু বর্ত্তমান মুদ্রাঙ্কণে শ্লোকগুলি একত্র সন্নিবেশিত করিয়া সেই অভাব বিদূরিত করা হইয়াছে।

খ। অনেক স্থলেই অন্যান্য আদর্শ পুস্তক হইত পাঠান্তর উদ্ধৃত করা হইয়াছে।—

গ। বোম্বাইয়ের মুদ্রিত পুস্তকে যে টীকা ছিল, তাহাতে পুস্তকান্তর হইতে আরও অতিরিক্ত টীকার পাঠ যথাযথরূপে সংযুক্ত করা হইয়াছে। যথা—প্রথম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, ৩৩ পৃঃ। "তমস্তিমিরং" হইতে "একৈকঃ" পর্য্যন্ত॥ প্রথমখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৩ পৃঃ। "দিনচর্য্যা অস্মিন্নধ্যায়" হইতে "নিষ্পদতে" পর্য্যন্ত।

ঘ। কোন কোন স্থলে টীকাতে এরূপ অতিরিক্ত পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে যে, তাহা না হইলে সেই সেই স্থলে অর্থসঙ্গতিই হয় না। যথা—প্রথমখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় ৪১ পৃঃ। "সুখীন স্যাৎ" এই বাক্যের পর "তথাহি" হইতে "স্যাৎ" পর্য্যন্ত॥ দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৬ পৃঃ। "ইত্যধিরোগকৈ বর্জ্জয়েৎ" এই বাক্যে পরিবর্ত্তে "তান্ রোগান্ কৈর্জয়েৎ? ইত্যত আহ তিক্তৈরিতি"॥ তৃতীয়খণ্ড ৫ অধ্যায় ১২১ পৃঃ। "এভিরেব" হইতে "কৃতে" পর্য্যন্ত। ইত্যাদি।

বাস্তবিক গ্রন্থখানি যেরূপ সুসম্পাদিত হইতেছে, তাহাতে প্রতিগৃহে ইহার আদর দেখিলে সম্পাদকের পরিশ্রম সার্থক হয় এবং আমরাও সুখী হই।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।*—ভূমিকায় সম্পাদক লিখিয়াছেন "সামাজিক নীতি এবং ধর্ম্ম ইত্যাদির ন্যায় চিকিৎসা-বিষয়েও আজি কালি মহাবিপ্লব উপস্থিত। কোন একটী রোগ ঘটিলেই কেহ বলেন "বৈদ্যচিকিৎসা কর" কেহ বলেন "এলোপ্যাথি চিকিৎসা কর" অথবা কেহ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। সুতরাং এইরূপে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় গৃহস্থকে অনেক সময়েই সমূহ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। কেবল গৃহস্থ কেন, ইহা দ্বারা চিকিৎসকও কর্ত্তব্যজ্ঞানে চঞ্চল হইয়া থাকেন। * * * এই জন্য আমরা প্রচলিত চিকিৎসা-সমূহের মধ্যে কোন্টী দ্বারা কোন্ রোগের বিশেষ উপকার হয়, দৃষ্টফলানুসারে তাহা নির্ব্বাচন করিতে কলিকাতাস্থ লব্ধনামা ও কৃতবিদ্য চিকিৎসকগণের সাহায্যে "চিকিৎসা-সম্মিলনী" নামক অর্থাৎ কবিরাজী ও ডাক্তারী এই উভয়বিধ চিকিৎসার মধ্যে আমাদের দেশে কোন্ কোন্ রোগে কোন্ কোন্ চিকিৎসা বিশেষরূপে উপযোগী, অস্ত্রচিকিৎসা ও পিচ্‌কারী দেওয়া প্রভৃতি আশুফলদায়ক ক্রিয়াগুলি ঐ উভয়বিধ চিকিৎসার কাহার মধ্যে কতদূর উৎকৃষ্ট এবং রোগপরীক্ষা, দ্রব্য-গুণতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি চিকিৎসকের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলিই বা কোন্ মতে কতদূর শ্রেষ্ঠ; তদ্বিষয়ক আলোচনা-পূর্ণ

* চিকিৎসা-সম্মিলনী। চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ খাস্তগির, ও কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"একখানি পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যোগ করিলাম।"

সম্পাদকদ্বয়ের এই উদ্দেশ্যের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু আমরা আরও একটু অগ্রসর হইতে চাই। কেবল কবিরাজী ও ডাক্তারী মতদ্বয়ের তুলনায় সমালোচন কেন আমরা কবিরাজী ডাক্তারী ও হোমিওপ্যাথী এই তিন পদ্ধতির একত্রে সম্মিলন দেখিলে সুখী হই। যাহা হউক ডাক্তার অন্নদাচরণ এবং কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র যে দুরূহ ব্রত সাধনে উদ্যত হইয়াছেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সফল হউক। ডাক্তার অন্নদাচরণ একজন বহুদর্শী সুনিপুণ চিকিৎসক এবং চিকিৎসা সাহিত্যেও সুপরিচিত; কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র একজন উদ্যমশীল ও বুদ্ধিমান যুবক; আমরা আশা করি ইহাঁদিগের সমবেত যত্নে প্রারব্ধ দুষ্কর কার্য্যটি সুসমাধা হইবে। চিকিৎসা-সম্মিলনীর প্রথম খণ্ডে যে কয়টি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে সকলগুলিই অসম্পূর্ণ; এরূপ অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করা অন্যায়, এজন্য তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। তবে যেটুকু লেখা হইয়াছে তাহাতে লেখকগণের অনুসন্ধিৎসা, বহুদর্শন ও লিপিচাতুর্য্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসা-সম্মিলনী যে দুরূহ সংকল্প সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন তাহার তুলনায় ইহার কলেবর নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়াছে। আর ক্ষুদ্র হওয়ারই বা আশ্চর্য্য কি? এই অসার উপন্যাসপ্লাবিত দেশে এরূপ সারগর্ভ পত্রের আদর হওয়া বিশেষ দুরূহ। আমরা আশা করি চিকিৎসা-সম্মিলনী সমস্ত বিঘ্ন বাধা কাটাইয়া আপন কর্ত্তব্য সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন।

ব্যবসায়ী।* আমরা ব্যবসায়ীর পুনরভ্যুদয় দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। শ্রীনাথ বাবু ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছেন এবং এ দেশে এ পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্যেই নিযুক্ত আছেন অতএব তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত এবং বহুদর্শী ব্যক্তিগণের নিকট আমরা অনেক প্রত্যাশা করি। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক পত্রের মধ্যে ব্যবসায়ী সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশিত হয়। তাহার পর অনেকগুলি ঐ বিষয়ক উৎকৃষ্ট পত্র প্রচারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গদেশের অভাব অনুযায়ী পর্য্যাপ্ত পত্রিকা এখনও প্রকাশ হয় নাই, এজন্য ব্যবসায়ীকে এবং শ্রীনাথ বাবুকে পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে যে মাসিক অর্থ সাহায্য দিতেন যদিও তাহা বন্ধ হইয়াছে তথাপি আমরা আশা করি সাধারণ পাঠকবর্গের উৎসাহে পরিপোষিত হইয়া ব্যবসায়ীর দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবে। প্রথম সংখ্যায় বিবিধ সংবাদ, কৃষিক্ষেত্র, কৃষির উন্নতি, বান্ধা কপি, ষ্টিরিও টাইপ, ও চার আবাদ বাড়িতেছে কেন এই কয়েকটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সমস্তই উৎকৃষ্ট এবং সরল ভাষায় লিখিত। স্থানাভাব বশতঃ আমরা উহার বিস্তৃত সমালোচনা করিতে পারিলাম না। কৃষির উন্নতি শীর্ষক প্রস্তাবের সকল মত আমাদের অনুমোদিত নহে। আর্য্যদর্শনের স্তম্ভে ঐ বিষয়ে আমরা সময়ে সময়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন আমরা শিক্ষিত ব্যক্তি

* ব্যবসায়ী। ২য় ভাগ। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক মাসিক পত্র। শ্রীশ্রীনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত।

গণের পক্ষে কৃষিব্যবসায় অনুপযোগী মনে করি না। বাস্তবিক বঙ্গদেশে বহু-সংখ্যক ভদ্রলোক কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকেন। (কৃষি অর্থে অবশ্য হলকর্ষণ বলি না); তাঁহারা শিক্ষিত হইলে যে কৃষির উন্নতি সম্ভব নহে এ কথা আমরা স্বীকার করি না।

ভারতী *—১২৯১ সাল বঙ্গীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় হইবে। প্রথম শ্রেণীর সাময়িকপত্রগুলি দীর্ঘ নিদ্রার পর আবার নবোৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। বঙ্গদর্শন অদৃশ্য হইয়াছেন বটে কিন্তু তৎ পরিবর্ত্তে নবজীবনের অভ্যুদয় হইতেছে। অনুষ্ঠান পত্রপাঠে যতদূর অনুমান করিতে পারা যায় তাহাতে বোধ হয় সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্গদর্শন যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন নবজীবন সেই স্থান বা তদপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিবেন। বান্ধব পুনরায় পূর্ব্ব-গৌরবে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। আর ভারতী অলৌকিক বেশে আজি বঙ্গ-সমাজে অবতীর্ণা। ভারতী আজি যে ভুবনমোহিনী বেশে জনসমাজে আবির্ভূতা তাহা দেখিয়া হৃদয় উৎফুল্ল, মন উল্লসিত এবং প্রাণ আশায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। মাতর্ভারতভূমি! তোমারই সে অতীত পুণ্যদিনে আত্রেয়ী অরুন্ধতী, খনা লীলাবতী প্রভৃতি যে সমস্ত পূত-চরিত রমণীরত্ন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে, আজি এই বঙ্গে, এই নির্জীব, পরপদ-দলিত, জ্ঞানালোকবিহীন, অন্ধতমসাচ্ছন্ন বঙ্গে, পরপ্রত্যাশী, পরপদসেবী, অসার অপদার্থ বাঙ্গালীর ঘরে, তাঁহাদের পদাঙ্ক-অনুসারিণী রমণীরত্ন আজিও আছেন, ইহা দেখিয়া কাহার না হৃদয় উৎসাহে আশায়, আনন্দে বিভোর হয়? শত শত বৎসর চলিয়া গেল, আমাদের সমাজের অর্দ্ধাঙ্গীভূত রমণীকুলকে দলিত, নিপীড়িত নিষ্পেষিত করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু এই নিপীড়ন, এই নিষ্পেষণ, এই নির্য্যাতনের মধ্য হইতেও আজি এক আর্য্য-রমণী রাজরাজেশ্বরী ইংলণ্ডভূমির বিদ্যামন্দিরে দেবভাষা সংস্কৃতের ব্যাখ্যা করিতেছেন, আর এক ব্রাহ্মণপত্নী শিল্প বিজ্ঞানের আবাস, স্বাধীনতার বিলাস-ভূমি আমেরিকায় বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব সমস্ত শিক্ষা করিতেছেন, আর এক কুল-কামিনী গৌড় জনকে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের তত্ত্ব কথা বিবৃত করিয়া শুনাইতেছেন, ইহা কি অর্থশূন্য, নিষ্ফল? যাঁহারা স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকারদানে অনিচ্ছুক তাঁহারা দেখুন রমণীগণ পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারেন কি না। যাঁহারা মনে করেন ভারতরমণীর দশা নিরাশা-সাগরে নিমগ্ন তাঁহারা দেখুন, তাহার উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে কি না!

সাত বৎসর পরে আবার ভারতীর নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তবে বোধ হয় ইহা বলা অসঙ্গত নহে যে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর হস্তে ভারতীর কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই।

ভারতে দুর্গোৎসব *—বিশেষ কিছু গুণপনা দেখিলাম না। গ্রন্থকার অল্পবয়স্ক বালক অতএব অধিক কিছু প্রত্যাশা করিবারও নাই।

* ভারতী। অষ্টমভাগ। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

* ভারতে দুর্গোৎসব। শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত ও শ্রীকালিদাস লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক আনা।

পাণ্ডববিজয়।

প্রথম সর্গ।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত।)

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে,
কুরুকুল-রাজাসন লভিলা দ্বাপরে
ধর্ম্মরাজ ;—সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী,
নব রঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ আসরে,
কহ, দেবি ! গিরি-গৃহে সুকালে জনমি
(আকাশ-সম্ভবা ধাত্রী কাদম্বিনী দিলে
স্তনামৃতরূপে বারি) প্রবাহ যেমতি
বহি, ধায় সিন্ধুমুখে, বদরিকাশ্রমে,
ওপদ পালনে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ
চলিল, হে কবি-মাতঃ যশের উদ্দেশে।
যথা সে নদের মুখে সুমধুর ধ্বনি
বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে
সমদেশে ; কিন্তু ঘোর কল্লোল, যেখানে
শিলাময়স্থল রোধে অবিরল গতি ;—
দাসের রসনা আসি রস নানারসে,
কভু রৌদ্রে, কভু বীরে, কভু না করুণে—
দেহ ফুলশরাসন, পঞ্চফুলশরে।

সাধনা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

শিক্ষাজনিত চিত্তপ্রশস্ততা ও প্রসারিত দৃষ্টি হইতে, নিজ এবং বহু 'নিজ' সংঘটিত জাতীয়, উভয়বিধ অভাব যাহা যাহা, তাহা সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এই জন্য সাধারণ কথায় বলিয়া থাকে যে শিক্ষার সঙ্গে অভাবের বৃদ্ধি হয়। অভাবের বৃদ্ধিই উন্নতির নিমিত্ত স্বরূপ। যে অভাব ব্যক্তিগত, তাহা ব্যক্তিগত শক্তি দ্বারা পরিপূরিত হয়। পুনশ্চ, যে অভাব জাতিগত, তাহা কেবল একমাত্র জাতীয় শক্তি দ্বারা পরিপূরিত হইতে পারে। সমশ্রেণীভুক্ত প্রকৃতির বহুমানব লইয়া এক এক জাতি ; সুতরাং আর আর বিষয়ের সহ, তাহাদের সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষাজনিত অভাবও, তদ্রূপ এক ও জাতীয় আকারযুক্ত হইবার কথা। এইরূপে বহু অভাব, বা অভাব বিশেষ, যখন জাতিমধ্যে সর্ব্বত্র পরিচালিত হইয়া, জাতীয় আকার ধারণপূর্ব্বক সকলকে সমান উত্তেজিত করিতে থাকে ; তখনই, সেই অভাব সমূহ বা অভাব বিশেষ পরিপূরণার্থে সর্ব্বত্র সমধর্ম্মী যে শক্তিসঞ্চালন, তাহা হইতে

উৎপন্ন সহানুভূতি ও যৌগিকাকর্ষণের ফলে কর্ম্মক্ষেত্রে জাতীয় একতার উৎপত্তি হয়; এবং একবার এ জাতীয় একতা উৎপাদিত হইলে, জগতে মনুষ্য-শক্তিসাধ্য এমন কোন্ কার্য্য, অথবা কোন্ জাতীয় শ্রী আছে, যাহা সুসাধিত না হইতে পারে? বাঞ্ছারাম, এইরূপেই জাতীয় একতার উৎপত্তি হয় এবং ইহাই জাতীয় একতা। এ একতা দ্বারা প্রতি জাতীয়স্থ ব্যক্তি ভ্রাতৃবৎ পরিলক্ষিত হইতে থাকে; এবং এখন তুমি যে বিশ্বাসের অভাবে কোন প্রকার সমবেতসাধ্য কার্য্যে পারগ হইতে পারিতেছ না, তখন দেখিবে সেই বিশ্বাস আপনা আপনি কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সমবেতসাধন তখন অনায়াস-সাধ্যের মধ্যে গণিত হয়। এ জাতীয় একতা, কেবল বিশ্বাসশূন্য মৌখিক চীৎকার, সভাসমিতি বা বচনবাগীশীতে সম্পন্ন হয় না। সেরূপে একতা সাধন করিতে যাওয়া কেবল পণ্ড শ্রম মাত্র; সে শ্রমে অন্য অনেক সৎকার্য্যের সিদ্ধি হইতে পারিত। একতা সাধন করিতে চাও? তবে আবার বলি, শূন্যহৃদয়, শূন্যমন, কেবল বচনবাগীশী বা বিলাপ পরিতাপ করিলে কিছুই হইবে না। বিলাপ, পরিতাপে কখনই কিছু হয় না; কেবল আহা উহু করিলে, কেবল কাঁদিলে, কেবল পরের মুখ দেখিয়া করুণা করিলে, কাজ হয় না। মানুষ হইয়া শিশুর আচরণ করিলে, কে কবে তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করে? যদি করে, তবে সে কেবল দূর দূর, ছেঁই ছেঁই! বাপু নীভিংম্যান, তুমি উন্নত, একতা সাধন জন্য তুমি কিছু অধিক ব্যস্ত, এবং বলিতে কি তাহার চেষ্টা তোমার কর্ত্তব্যও হইতেছে; কিন্তু এরূপ মিছা চীৎকারে কি হইবে, ক্ষণেক ক্ষান্ত হও, চুপ কর, কথা শুন, অভাব অনুভব কর, হৃদয় পূর্ণ কর, তদনন্তর যাও, দেশে দেশে যাও, দুয়ারে দুয়ারে যাও, যাহাতে একতা সাধন হইতে পারে তাহার মূল মন্ত্র যাহা তাহা জাগ্রত করিতে শিখগে, শিখাওগে। দেখ, ইউরোপীয় রাজ-নৈতিকেরা কেবল আপন আপন দল মাত্রের উদরপোষণ হেতু কেমন অক্লিষ্ট মনে দুয়ারে দুয়ারে বেড়াইতেছে; আর তুমি তোমার দেবারাধ্যা জন্মভূমির শ্রী-পোষণ হেতু দুয়ারে দুয়ারে বেড়াইতে পার না? কিসের আশঙ্কা তোমার? জাননা কি, আশঙ্কা অনভ্যাসে জন্মিয়া থাকে; অভ্যাসে জীবন বলিদানও আমোদের মধ্যে পড়িয়া যায়? মরণের ভয় বা যে কোন ভয় বা যে কোন বিষয় অভ্যাস এবং প্রথায় হয়; অভ্যাস এবং প্রথায় যায়। দেখ অভ্যাসের গুণে যে পঞ্জাবী কিছু দিন পূর্ব্বে সকল শাসনের বাহির যে কাবুলী, তাহাকেও শাসন করিয়াছে; আজিকে আবার সেই পঞ্জাবী চুনোগলির চড় খাইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে! যে রাজপুত-ক্ষেত্রে ইংরাজ উড্ প্রতিপদক্ষেপে

থার্ম্মপিলি ও মারাথন-ক্ষেত্র দেখিতে পাইত,সেই রাজপুত্রবংশ অভ্যাসদোষে এখন লম্বোদর, আফিংভোজী, কাপুরুষ, আচারে এবং আকারে বাইজীর ভেড়ুয়া বা তবলাদার! দেখ, অভ্যাস-অনভ্যাসের এমনই গুণ। এ গূঢ় রহস্য দেখিয়াও প্রবুদ্ধ হইবে না কি? বুদ্ধিমানের প্রবুদ্ধ হইতে কয় দিন লাগে। বুদ্ধিমান যদি তুমি,যাও তবে, এ মহাব্রত অবলম্বন কর গিয়া; দীক্ষিত কর,দীক্ষিত হও; একতার মূল ও মহামন্ত্র ঘরে ঘরে শিখাও। ইহাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন, দেশাধিপতি সন্তুষ্ট হইবে: প্রজার উন্নতিতে রাজ্যেশ্বরের লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। আবার জিজ্ঞাসা করি, বুঝিয়াছ কি যে একতা শিখাইতে 'একতা' শব্দের আবশ্যক হয় না? পুনশ্চ নিম্ন শ্রেণীকে আহার ব্যবহারে উন্নত করিতে চেষ্টা কর, যদ্দ্বারা সে তোমার অভাবের অংশভাগী হইতে পারে; উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত কর, যদ্দ্বারা তোমার অভাবজনিত একতায় সে যোগদান করিতে আগ্রহযুক্ত হয়, এবং যদ্দ্বারা সে আপন কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ হইতে সক্ষম হয়। তাহাদের ফেলিয়া তুমি অগ্রসর হইলে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না; তুমি চিত্তস্বরূপ, তাহারা হস্ত; চিত্তে সহস্র ইচ্ছা ও সহস্র অনুরাগ থাকিলেও, হস্ত যদি বেবশ হয়, তবে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। তাহার পর তুমি নিজে উন্নত হও, যদ্দ্বারা তোমার অধস্তনবর্গ তোমার সহবাসরক্ষার্থে দেখা দেখিও উন্নতি লাভ করিতে পারে। চেষ্টা কর, চেষ্টা কেবল চেষ্টা, চেষ্টায় কি না হয়, যত্নে কি না ফলে?—"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ, পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।"

অতঃপর বাঞ্ছারাম, সুশিক্ষা দ্বারা চিত্তপ্রশস্ততা লভিয়া, আত্মসংস্কারের দ্বারা আত্মশুদ্ধি সাধিয়া, এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, কি শারীরিক কি মানসিক, তোমাকে নিহিত তাবৎ শক্তির যে সমগ্র সঞ্চালন, তাহারই নাম সাধনা বা কার্য্য; এবং এরূপ শক্তিসঞ্চালন হইতে যে পদার্থ রূপ গ্রহণ করে বা নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম সাধনফল বা কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিবার জন্যই, আমাদিগের এ জগতে আগতি; এবং ইহার প্রতি ঔদাস্য করিলেই আমাদিগের অধোগতি ও অগতি। যতক্ষণ দেখিবে যে মানব বা যে জাতি কর্ম্মপরায়ণ; ততক্ষণ নিশ্চয় জানিবে, সে মানব বা সে জাতির দুর্ভাগ্য বা অধঃপাতের সম্ভাবনা নাই। সহস্র বিপৎপাত হইলেও, সে তাহা হইতে উদ্ধার হইয়া উঠিতে পারিবে; সত্যের আশ্রয় থাকিলে, বিপদ ঊর্দ্ধসংখ্যায় ক্ষণেক কাল মাত্র মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তদতিরিক্তে আর কিছু করিতে পারে না। কিন্তু যখন দেখিবে কর্ম্ম ঘুচিয়া তাহার স্থলে

অকর্ম্মের আরম্ভ হইয়াছে, তখনই জানিবে যে সে মানব বা সে জাতির অধঃপাতে যাইবার দিন সেই পরিমাণে নিকট হইয়া আসিতেছে। এখন, এই হিসাবে, আমাদের সমাজের প্রতি একবার তাকাইয়া দেখ, তথায় কি হইতেছে। তথায় কি শিক্ষা, কি আত্মসংস্কার কি কর্ত্তব্যবুদ্ধি কি কর্ত্তব্যবুদ্ধির মূল ঈশ্বরে বিশ্বাস, কি শক্তিসঞ্চালন, ইহার কিছুরই গূঢ় এবং সাত্ত্বিক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়ার যো নাই। শিক্ষা যাহা তাহা চাকুরীর উপযুক্ত লিখন পঠন শিখিতে; আত্মসংস্কার যাহা তাহা লোক ভুলাইতে; কর্ত্তব্যবুদ্ধি যাহা তাহা উদরপূর্ত্তি করিতে এবং শক্তিসঞ্চালন যাহা তাহা চাকুরী রাখিতে। যে কয়েকটী পদার্থে মনুষ্যকে দৃঢ় এবং প্রকৃতিস্থ করিতে পারে, তাহার সকলগুলিরই যেখানে অভাব, সেখানে আর কি বলিবার আবশ্যক হয় যে কি জন্য তোমার ভারতীয় সমাজ প্রলয়বাতাবিতাড়িত ঘোর প্রলয়ঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যে ওতপ্রোত হইয়া হাবু ডুবু খাইতেছে; কেনইবা এখানে নানা বিষয় একাকারে উদ্ভাবিত হয় অথচ একটীও তাহার গোটা বাঁধে না; কেনই বা এখানে তাবৎ বিষয় মৌখিক, আভ্যন্তরীণ জীবনব্রত একটীও হয় না এবং কেনই বা এখানে সমবেত সাধন কথা মাত্র, সমবেতসাধ্য কার্য্য একটীও কখন সম্পন্ন হয় না? যেখানে সকলেই নিয়মশূন্য প্রলয়প্রতিরূপ, সেখানে কে কাহার উপর স্থির বিশ্বাস করিতে বা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে?

কর্ম্ম শ্রমসাধ্য; কিন্তু তুমি আয়েসবিলাসী। তুমি ভাবিতেছ, কর্ম্মের জন্য ভোগফল যাহা তাহা বহুদূরে; আপাততঃ কেবল খাটুনী সার মাত্র, কেবল আমার আয়েস আরামের ব্যাঘাত; অতএব রেখে দেও তোমার কার্য্য কর্ম্ম! নির্ব্বোধ, তাহা নহে। ‘আপাতত’ ধরিলেও বৃথা খাটুনী নহে। গৌণ ভোগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কর্ম্মের নিকট-ভোগ বিস্তর; ইহার মধ্যে আরও একটী শ্রেষ্ঠ বিষয় এই, তোমার অকর্ম্মা আয়েস আরামের পরিণাম যাহা তাহা শোচনীয়, কিন্তু এ নিকট-ভোগের পরিণাম যাহা তাহা উত্তরোত্তর সুখকর। এ জগতে যাবতীয় কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এক একটী আনুষঙ্গিক সুখও ঈশ্বর নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। তোমার নৈমিত্তিক কার্য্যের কথা ছাড়িয়া দাও; নিত্য কার্য্যেরই মধ্যে দেখ,—তোমার শরীর রক্ষার্থে আহার গ্রহণ, বংশরক্ষার্থে সন্তানোৎপাদন, লোকযাত্রাবশে সংসারী হওন, ইত্যাদি তোমার নিত্যকার্য্য; কিন্তু দেখ ইহার সঙ্গে সঙ্গে কতটা আশু সুখ আশু তৃপ্ত নিহিত করা রহিয়াছে; এত পরিমাণে নিহিত আছে ও তাহা এত চিত্ত-আকর্ষক যে, কখন কখন তুমি সেই গুলিকেই সুখের চরম ভাবিয়া, তাহার অতিরিক্ত উপার্জ্জনের

আশায় ধাবিত হওত, আত্মধ্বংসে অগ্রসর হইয়া থাকি। যেমন আশু সুখ দেখিতেছ আহার বিহার সংসারাদিতে; এ জগতের তাবৎ কার্য্যেই কার্য্যের পরিমাণ অনুরূপ, সেইরূপ আশু সুখ নিহিত করা রহিয়াছে। তাহাও আবার এক প্রকারে নহে, নানা প্রকারে; তোমার সুকার্য্যে সুখ্যাতি, মহৎকার্য্যে মহত্ত্ব, পরোপকারে যশ, এ সকল আবার সাক্ষৎসম্বন্ধে আশু সুখের উপর অধিকন্তু ভোগ্য পদার্থ। ইহার পর আর ও কি বলিবে, কর্ম্মারব্ধ বৃথা খাটুনী? বাঞ্ছারাম, যদি সুখ ও তৃপ্তি প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহার প্রাপ্তি কঠিন নহে, কিন্তু কঠিন মনের ধাঁধা ঘুচাইয়া তাহার উপায় স্বরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া; পুনশ্চ ইহাও বলি, সকল ধাঁধা নিরসনের উপায় আবার একমাত্র কর্ম্মে প্রবৃত্তি। তুমি যাহাকে আয়েস আরাম বল, তাহা যথার্থ আয়েস আরাম নহে; উহা কোন এক বা তদধিক ভোগ্য বিষয়ের অতিরেক বা বীভৎস ভাবে গমন ও তদ্দ্বারা আত্মধ্বংসের পথ পরিষ্কারকরণ মাত্র।

তাহার পর, এ সকল কার্য্য এবং তাহার আশু সুখ ও আয়েস আরামের অতীতে, আরও কতকগুলি অতিমহৎ কর্ম্ম আছে, যাহার আনুষঙ্গিক অপর কোন আশু সুখ নাই; যাহা আছে তাহা কেবল একমাত্র চিত্তপ্রসাদ। এ কথা কেবল অতিমহৎ কর্ম্মসমূহের পক্ষে খাটে; সেরূপ কর্ম্মের সাধক যাহারা তাহারা ক্ষণজন্মা। ঈশ্বর যে এ সকল কর্ম্মের সঙ্গে অন্য কোন আশু সুখ নিহিত করেন নাই, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি জানেন যে, এ সকল মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনার্থে যাহারা নিযুক্ত, তাহারা তেমন স্বল্পপ্রাণ ও ক্ষুদ্রমনা নহে যে তাহাদিগকে খাড়া রাখিবার জন্য, বালকবৎ আনুষঙ্গিক সুখামোদ ও তৃপ্তির প্রয়োজন হয়। এরূপ মহামনারাই সাধারণত জগদ্‌গুরুপদবাচ্য হইয়া থাকেন। মহচ্চিত্তগণ ফলের প্রত্যাশা রাখেন না।

এক্ষণে কর্ম্মসংসারের মধ্যে কোন্ কর্ম্মে তুমি পারগ, কোন্ কর্ম্ম তুমি করিবে, কোন্ কর্ম্ম তুমি করিবে না বা কোন্ কর্ম্ম তোমার করা উচিত, তাহার নির্ব্বাচন বা নিরূপণ পক্ষে আমি কি বলিব? দেশ কাল ও পাত্র এবং শিক্ষা-শক্তি ও যোগ্যতা, এতদনুসারে যে কর্ম্মে তুমি পারগ, যাহা তুমি চেষ্টা করিলে হস্তায়ত্তে আনিতে পার, তাহাই প্রাণপণে সাধিবে; অপর যাহা যাহা তাহার প্রতিকূলতা করে, তাহার পরিহার বা তাহাকে বিদূরিত করিবে; ইহাই তোমার কর্ত্তব্য। মনুষ্যশক্তি সর্ব্বদাই অসীম অনন্তমূর্ত্তি-বিশিষ্ট; তাহাকে আপাদমস্তক অনুজ্ঞা বা নিয়মগণ্ডি দ্বারা আবদ্ধ করিতে যাওয়া মহাভ্রমের কার্য্য। শক্তিপরিচালনের সূত্র প্রদর্শন ও পরিচালনের ধারা বাঁধিয়া দেওন; এবং তাহা হইতে

যাহাতে চ্যুত না হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরিচালকের নিকট পরিচালিতেরও অধীনতা সেই পর্য্যন্ত। তদতিরিক্তে কি ধর্ম্ম কি আইন, যাহা দ্বারাই দৃঢ় বাঁধিতে যাইবে, তাহাতেই কেবল অনর্থের উৎপত্তি হইতে থাকিবে। মানব সর্ব্বত অধীন হইয়া সৃষ্ট হয় নাই; সুতরাং তাহাকে সর্ব্বত অধীন করিতে গেলে, প্রতিঘাতে বিপরীত ক্রিয়ার উৎপাদন হইয়া থাকে। নিয়ম এবং স্বাধীনতা, এ দুয়ের সামঞ্জস্য হওয়া উচিত। ইহা বোধ হয় লক্ষ করিয়াছ যে, যেখানে ধর্ম্ম বন্ধনের গোঁড়ামি অধিক, সেই থানেই অধিক অনর্থোৎপত্তি; যেখানে আইনের কঠোরতা অধিক,সেই থানেই অপরাধের সংখ্যা বেশি এবং অপরাধের আকারও গুরুতর; যেখানেই দপ্তর-নিয়মের চাপাচাপি, সেই থানেই গোঁজামিলান পাটোয়ারীপণার বাহুল্য। দেখ, ইংরাজী ছাঁছুনী বাঁধুনী আইনের ফল, দেশশুদ্ধ মিথ্যাপ্রাণ মামলাবাজী; ইংরাজী দপ্তর নিয়মের ছাঁছুনী বাঁধুনীর ফল, কেবল রিপোর্টপ্রাণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট; ধর্ম্মবন্ধনের গোঁড়ামীর ফল, ভারতের আধুনিক অধঃপতন; আর ভারতীয় রাজশাসনের ফল মহৎপ্রাণের দুরভাব। অতএব মনুষ্যশক্তিকে ছন্দোবন্ধে আবদ্ধ করা সর্ব্ব অনিষ্টের মূল। কেবল কর্ম্মোপযোগী করিয়া দিবার নিমিত্ত ছন্দোবন্ধের প্রয়োজন; কিন্তু কর্ম্মনির্ব্বাচন ও সাধনস্থলে, পূর্ণ স্বাধীনতার একান্ত আবশ্যক বলিয়া জানিবে।

কিন্তু এই সুযোগে এখানে এই একটী কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কোন একটী কার্য্য আপাতত সুকার্য্য বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, সহসা তাহার মোহে মোহিত হইও না। যে কার্য্য কেবল তোমার সুখ বা শুভ উৎপাদন করে, কিন্তু সমাজ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা সুকার্য্যরূপে দৃষ্ট হইলেও সু নহে। দেখ, দাতৃত্ব সুবৃত্তি এবং দান করা সুকার্য্য; কিন্তু যদি অপাত্রে দান কর, তবে আর তাহা সুকার্য্য রহিল না। হইতে পারে সেরূপ দান করায় তোমার মনে কিঞ্চিৎ সুখোৎপত্তি হয়, কিন্তু সমাজ তাহাতে সমূহরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কারণ, সেরূপ দানে আলস্যের প্রতি উৎসাহ হওয়ায় অলসতার বৃদ্ধি হেতু যতগুলি লোক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, সমাজ এক দিকে ততগুলি লোকের শ্রম এবং শ্রমোৎপন্ন ফলে বঞ্চিত, অন্য দিকে ততগুলি লোকের ভারে ভারগ্রস্ত হয়। ঐরূপ ক্ষমা করা একটী সৎকার্য্য; কিন্তু অননুতপ্ত দুষ্টকে ক্ষমা করিলে, আগে সে সঙ্কুচিত থাকায় যেখানে একটা দুষ্টামী করিত, এখন সে অসঙ্কুচিত হওয়ায় একটার স্থানে পাঁচটা দুষ্টামী করিবে; অতএব দেখ ইহাতে সমাজের লোকসানের ভাগ কত অধিক। এইরূপ দৃষ্টি তাবৎ কার্য্যে রাখা উচিত। যে কার্য্য নিজ এবং সমাজ উভয়ের সুখ

বা শুভোৎপাদক, তাহা উত্তম; যাহা কেবল নিজের সুখোৎপাদক কিন্তু যাহাতে সমাজের শুভ বা অশুভ কিছুই ঘটে না, তাহা মধ্যম; যাহাতে কেবল নিজের সুখ কিন্তু সমাজের যাহাতে অসুখ তাহা অধম, এখানে নিজের সুখের প্রতি ত্যাগস্বীকার আবশ্যক; আর যে কার্য্যে নিজেরও অসুখ সমাজেরও অসুখ, তাহা অধমাধম। সমাজ যদিও উচ্ছৃঙ্খলতা ও মতিচ্ছন্নতা হেতু সকল সময়ে এ সকল কু ও সু কার্য্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারুক, তথাপি তুমি, তোমার আত্মকর্ত্তব্যবোধ অনুসারে যাহা সুকার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত, তাহা করিয়া যাইবে; সমাজ এখন তাহা বুঝিতে না পারিলেও, যখন তাহার মতিচ্ছন্ন ভাব বিগত হইবে, তখন তাহা বুঝিতে পারিবে। সমাজের শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্বন্ধে সহজ কথায় তোমাকে এই একটী সঙ্কেত বলিয়া দিতেছি যে, পরিবারস্থ থাকিয়া পিতা-মাতার সুখাসুখের প্রতি দৃষ্টি রক্ষা পূর্ব্বক যেরূপ আত্মচালনা ও ত্যাগস্বীকারাদি করিয়া থাক, সমাজ সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ করিবে; সমাজও তোমার পিতৃমাতৃস্থলীয়, এবং ভারতসন্তানের পক্ষে সুধু আবার পিতৃমাতৃস্থলীয় নহে, বৃদ্ধ বায়ান্তরে প্রাপ্ত অবুঝ পিতৃমাতৃ-স্থলীয়; কিন্তু তা বলিয়া কি হইবে, পিতা যাহাই হউন তথাপি তিনি—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ;" আলেক্‌জাণ্ডারের এক ফোঁটা মাতৃ-অশ্রুতে আন্তিপেতরের শত শত পত্র বানের মুখে ভাসিয়া গিয়াছিল! বিশেষ সমাজের লোকসানে তোমার লোকসানও ত কম নহে; বরং অন্যবিধ লোক-সানের অপেক্ষা অপার গুণে অধিক। ভারতসন্তান, আরও একটী কথা স্মরণ রাখিও, সত্ত্ব-রজ-তম এই ত্রিগুণসমাবেশে জগৎসৃষ্টি, এই ত্রিগুণসমাবেশে তোমার সৃষ্টি; অতএব তোমার কর্ম্মস্থলীতে এই তিন গুণেরই সার্থকতা হওয়া আবশ্যক, নতুবা তোমার কর্ম্মজীবন বিফল হইয়া যাইবে; কেবল সত্ত্বগুণের মোহিনী মূর্ত্তিতে মোহাভিভূত হইও না।

এখানে আরও একটী কথার অব-তারণা করা আবশ্যক। আমাদের সাধনা-স্থলে আর কতকগুলি এমন বিঘ্ন আছে, যাহা আমাদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র অনবধান বা বিবেচনার দোষে উপস্থিত হইয়া, প্রায় সমস্ত নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়া থাকে। উহা, বলিতে গেলে, বস্তুত সাধনার জন্য অবলম্বিত উপায়ের মধ্যে কোন এক ত্রুটি বিশেষের ফল মাত্র। কি শারীরিক কি মানসিক, যন্ত্র-গুলি যখন সামঞ্জস্য সংমিলনে ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে, তখন তাহা স্বাস্থ্যের চিহ্ন; সুতরাং পরিণামফলও সুন্দর হইয়া থাকে; তদন্যতরে রোগ, পরিণামফলও তদ্রূপ হয়। কথিত বিঘ্ন-গুলি, সামঞ্জস্যচ্যুত চিত্তবৃত্তি বিশেষের অযথা অনুসরণ হইতে উৎপন্ন হইয়া

থাকে; তন্মধ্যে অতি কল্পনা এবং অতি আশা এই দুইটী প্রধান অনিষ্টকারী। অতি কল্পনার মোহ অতি দুরন্ত; ইহার মূর্ত্তি আশু-মনোহারী সুতরাং সহসা আকৃষ্ট করিয়া থাকে। মানব ইহার মোহে পড়িয়া অকর্ম্মণ্য খেয়ালী হইয়া যায় এবং সেরূপ মানবের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' অভিনীত হয়। এমনও দুর্ভাগ্যবান কল্পনাপ্রিয় অনেক দেখা গিয়াছে, যে, যাহারা কেবল উপন্যাস পড়িয়া, উপন্যাস সংসারে বিচরণ করত, সত্য সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়; বিপুলা অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়াও, একটা সামান্য কল্পিত সৃষ্টির মোহে মোহিত হওত, একেবারে অকর্ম্মণ্যতায় আসিয়া উপনীত হয়। অতি পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে! সত্য বটে কল্পনা সর্ব্ব মঙ্গলের নিদান ও প্রসূতি স্বরূপ কিন্তু তাহাও, জানিবে, কল্পনা যতক্ষণ লাগামসংযুক্ত; যতক্ষণ তাহা কর্ম্মভূমির সীমা ত্যাগান্তে শূন্য-পথে প্রধাবিত না হয়; যতক্ষণ অপরাপর মানসিক বৃত্তিসহ সামঞ্জস্যচ্যুত হইয়া হইয়া না যায়।

অতি আশার পরিণাম নিরাশা; নিরাশার পরিণাম অকর্ম্মণ্যতা এবং জগতের প্রতি বিদ্বেষভাব। আশা অনন্ত হইলেও, দেশ কাল ও যোগ্যতা অনুসারে পরিমাণ করিয়া লওয়া আবশ্যক, নতুবা তাহা নানা বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে। ভারতসন্তান আশার পরিমাণ করিতে না জানিয়া, এক্ষণে নিরাশায় মগ্ন হইয়া আছে; কোন দিকেই সম্ভবতা বা কোন দিকেই সফলতা দেখিতে পাইতেছে না। বাঞ্ছারাম, ইহাই না এখন তুমি সর্ব্বদা ভাবিয়া থাক;—যথায় কোটি কোটি মানব সমবেত, এবং যথায় জাতীয় কার্য্য কোটি কোটি মানবের সমবেত-সাধ্য, তথায় আমি একা ক্ষুদ্র মানব যত্ন ও শ্রম করিলে কি গণনায় আইসে বা কি করিয়া তুলিতে পারি? বাপু, আশার আয়তন দিগন্ত প্রসারিত করিয়াছিলে, এখন তাহার প্রত্যাবর্ত্তে জড়িত হইয়া, এ নিরাশামগ্ন হইতেছ কেন?—কোটি মানবের ভার একা লইতে তোমাকে কেহ বলে নাই। সে ভার যাহারা লইতে পারে, তাহারা লউক; কিন্তু তুমি আপন ভারে কতদূর ভারমুক্ত হইয়াছ বলিতে পার?—তাহাত তোমার কাজ, সে ভার ত অন্যে লইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির আপন ভারে ভারমুক্ত জ্ঞান ও আপন ভারে যথাবিধি সাত্ত্বিক ভাবে ভারমুক্ত হইতে পারিলেই যে যথেষ্ট হইল; কাজ কি তোমার অন্যের খোঁজ লইয়া। তুমি আপন খোঁজ পূর্ণ ভাবে লইতে শিখ, আপন শক্তি যথা পরিমাণে যত্ত দিকে তুমি চালাইতে সক্ষম তাহাতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। তবে জাতীয় কার্য্য? বিদ্যুৎবজ্রঘোষী ধারাবর্ষী মেঘ একেবারে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয় না। এক একটী নগণিত বাষ্প সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন ভাবে,

নানা দিগ্‌দিগন্তে নানাস্থানে নানা দেশে উত্থিত হইয়া, শেষে প্রবাহ বায়ুযোগে একত্রীকৃতে, অনন্ত কোটী নিঃসম্বন্ধ বাষ্প সংযোজিত ও সম্বন্ধযুক্ত হইবায়, আজিকে মেঘমূর্ত্তিতে তোমার ঘর ও দেশ ভাসাইবার জন্য, আকাশমণ্ডলে সমাগত হইয়াছে। তোমারও কর্ম্ম সকল যদিও এখন নিঃসম্বন্ধ, নির্জ্জন, নগণিত বাষ্পবৎ; কিন্তু সর্ব্বদা তাহারা সেরূপ নিঃসম্বন্ধ থাকিবে না। নৈসর্গিক নিয়ম সেরূপ নহে। জানিবে, সত্বরেই এক-জাতীয় প্রকৃতি হেতু, প্রতিব্যক্তির অভাব জাতীয় অভাবে পরিণত হওয়ায়, তদুৎপন্ন একতারূপী প্রবাহবায়ু উপস্থিত হইয়া, প্রতিব্যক্তিগত কর্ম্ম, যাহা এখন নগণিত বাষ্পবৎ, তাহাদের একত্রীকরণে, মহামেঘ মূর্ত্তি রচনা করিয়া কালে ধারা বর্ষণ করিতে থাকিবে; এবং যে পাহাড় পর্ব্বত এখন দুর্ভেদ্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, কালে তাহাও সে তরঙ্গাভি-ঘাতে ভিন্ন এবং ভগ্ন হইয়া যাইবে।

এখন তোমার পক্ষে মোটের উপর কথা এই, তোমার কাজ তুমি করিয়া যাও; পরের কাজ পরে দেখিবে; তোমার স্বনিহিত শক্তির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার হইলেই যথেষ্ট। বিশেষ তোমার পাপ পুণ্যের অপরে যখন কেহ ভাগী হইবে না; এবং স্রষ্টার নিকট প্রাপ্য যাহা, তাহা সমস্তই যখন তোমার নিজের; তখন অন্যের দিকে তাকান বা অন্যের দিকে তাকাইয়া নিরাশ হওয়ার আবশ্যক? তুমি আপন মনে আপনি কার্য্য করিয়া যাও; অপর কোন সৎকর্ম্মশীল তোমার নিকটস্থ হইলে, সম-ধর্ম্মী যৌগিকাকর্ষণের ফলে, দেখিবে, সে আপনা হইতে আসিয়া অতর্কিত ভাবে তোমাতে সম্মিলিত হইবে; ও তুমিও অতর্কিত ভাবে আশু হইয়া সম্মিলিত হইয়া যাইবে। অতএব নিরাশায় মাতিয়া সকল পণ্ড করিও না; অথবা অপরিমিত আশাতে মজিয়াও সকল বিনষ্ট করিও না। পুনশ্চ মহৎ কর্ম্মপক্ষে ইহা জানিবে যে, মহত্ত্ব সহসা পরিচিত হয় না, মহৎ কর্ম্মমাত্রে সহসা ফলযুক্ত হয় না। মহত্ত্ব পরিচিত হইতে, বা মহৎকার্য্য ফলযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে যে বর্ষ, বহুবর্ষ, শতাব্দী, বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়া যায়। কথায় বলে এ পৃথিবীতে শয়তানেরও প্রতাপ অর্দ্ধেক; যদিও মহত্ত্ব অবিনাশী, তথাপি তাহা প্রচার হইবা মাত্র, তাহাকে বিলোপ করিবার জন্য চারিদিক হইতে শয়তানী ফৌজ আসিয়া ঘিরিয়া বইসে। প্রথমে সাময়িক তাচ্ছিল্য, উপহাস বা অশ্রদ্ধা আসিয়া আক্রমণ করে। কালে তাহারা হটিলে, তখন ভক্তির ভেক ধরিয়া পেসাদারী টীকা, টিপনি, ব্যাখ্যা প্রভৃতি আসিয়া নানা আড়ম্বরে মহত্ত্বের অর্থ বিরূপ করিয়া তাহার অভিপ্রায় অসিদ্ধ করিতে চেষ্টা পায়। তার পর তাহারাও যখন দূর হয়, তখন মহত্ত্বের অর্থ কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম ও ফলপ্রসূ হইতে থাকে।

দেখ,এই সকল পুনকে শক্র দূর করিতেই কতদিন যায়; তাহার পর অন্য কথা। কিন্তু হইলইবা বাঞ্ছারাম, ক্ষতি কি তাহাতে? কারণ, কর্ম্ম যাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে, সংসার তাঁহার অনন্ত; সুতরাং যোগ বিযোগ জের চলিয়া যথাকালে ফলবান হইতে দেশ এবং কাল কিছুরই অকুলান পড়িবার সম্ভাবনা নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত জ্ঞাত থাকিও, সৎকর্ম্ম যতটুকু হউক, একবার কৃত হইলে আর তাহার লোপ নাহি; তাহা আবশ্যক কালের জন্য অনন্ত গৃহে জমা হইতে থাকিবে; যথানিয়ম তথায় তাহা অঙ্কুরিত, বৰ্দ্ধিত, অনন্ত ফলে ফল-যুক্ত ও প্রতিপ্রসবে অনন্ত বিস্তারে বিস্তার প্রাপ্ত হইতে চলিবে। তুমি অনন্ত ক্ষেত্রে সুবীজমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক; তাহার পর তাহা অঙ্কুরিত, বৰ্দ্ধিত ও ফলবিশিষ্ট হইতে দেখা যাঁহার কার্য্য তিনি দেখি-বেন। তজ্জন্য অনুরোধ অননুরোধ উভয়ই সমান। অতএব, আবার বলি, আশু ফলের দেখা না পাইয়া নিরাশা-মগ্ন হইও না। তোমার অস্তিত্বের যে সার্থকতা তাহা প্রধানত কর্ম্মসংগ্রামে রক্তি বা বিরতির পরিমাণে।

অতঃপর ভারতসন্তান, আর কি সাধনার কথা বলিব? বলিবার অনেক ছিল; যদি দ্বৈপায়নের ন্যায় তত্ত্বদর্শী এবং পেটের ন্যায় বাক্যবিশারদ হইতাম, তাহা হইলে কতক বলিতে সক্ষম হইতে পারিতাম। কিন্তু আমি বিদ্যাশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, শব্দশাস্ত্রে জ্ঞানশূন্য, সৰ্ব্বশূন্য, আমার সে সামর্থ্য কোথায়? তবে সহজ কথায় সত্যবিশ্বাসে যাহা যাহা মনে আসিল তাহা তোমাকে বলিলাম; তুমিও সত্যমনে সাত্বিকী বুদ্ধিতে শুনিও। এখন আবার একবার অনুরোধ করি, নিজ গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তোমার সাধনার আবশ্যক কতদূর। সিদ্ধি ভিতর হইতে আইসে, বাহির হইতে আইসে না,—'কুরু পৌরুষমাত্ম-শক্ত্যা।'

যে পাষণ্ডতার স্রোতোবেগ দেশ আকুলিত করিতেছে, যাহার প্রভাবে সকলই খণ্ড খণ্ড, কেবল উঠিতেছে পড়িতেছে এবং গঠনের কোথাও চিহ্ন বা আশা মাত্র নাই; কতদিনে যে তাহার বেগ ফিরিবে তাহা কে বলিতে পারে? ভারতসন্তান, আর ঘুমে মত্ত হইও না, আর নাস্তিকতার মিছা ঘোরে ঘুরিও না। নাস্তিকতা ভ্রম। ঈশ্বর এখনও সেই জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে সমাসীন থাকিয়া রাজত্ব করিতেছেন; এখনও তিনি বিশ্ব সহ তুমি আমি পিপী-লিকা পরমাণুটীকে পর্য্যন্ত পরিচালিত করিতেছেন। কুতর্কে ভুলিও না। কখন কখন কুতর্কে ভুলিয়া যে প্রকৃতিতে সমস্ত আরোপ করিতেছ, যাহাকে তোমার সর্ব্বেসর্ব্বা শিক্ষয়িত্রী বলিয়া মানিতেছ,তাহারই শিক্ষা অবলম্বন কর; সেই তোমাকে তোমারই কৃত কার্য্যের

দ্বারা শিক্ষা দিবে যে, কর্ত্তা ব্যতীত, চিত্ত ব্যতীত, কর্ম্ম সম্ভবে না,—তোমারও তদুভয় ব্যতীত সম্ভব হয় নাই; এবং ইহাও শিখাইবে যে এ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মই তোমার জীবনের একমাত্র পরিমাণ ও উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের কুজ্ঝটিকাতে অন্ধ হইয়া ভাবিও না যে, তাহার পশ্চাতে চিরজ্যোতি সূর্য্য এখন অস্তিত্বশূন্য; সেই বিজ্ঞানই তোমাকে শিক্ষা দিবে যে, সূর্য্যতেজে কুজ্ঝটিকার উৎপত্তি, সূর্য্যতেজে তাহার স্থিতি, এবং সূর্য্যতেজেই তাহার কর্ম্মকারিত্ব। তোমার বিজ্ঞানও সেই বিশ্বনিয়ন্তৃ-প্রভব-শূন্য হইলে অকার্য্যকর হইয়া থাকে। মিথ্যা সামাজিকতা পরিত্যাগ কর, আত্ম-প্রকৃতিতে প্রকৃতিবান্ হও, আত্মাবলম্বন কর। এক এক জন লইয়া পাঁচ জন; তবে কেন তুমি সেই পঞ্চকৃত মুখসে আত্মগোপন করিয়া আত্মপ্রকাশে লজ্জিত বোধ করিয়া থাক। যে প্রকৃতি পাঁচ জনে লইতে বলে তাহা লইও না, যাহা ঈশ্বর লইতে বলেন তাহাই অবলম্বন করিও। পাঁচ জন হইতে ঈশ্বর বড়। পাঁচ জনের সুখ্যাতি-অখ্যাতি-নির্ম্মিত পন্থাকে পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিও না; তোমার স্রষ্টানিয়োজিত কর্ত্তব্য-বোধের উপর কর্ম্মমূল স্থাপিত করিয়া চলিও, এবং তাহাই পন্থা বলিয়া জানিও। এরূপ কর্ম্মমূল অতলস্পর্শ কাল সমুদ্রকে অতিক্রম করিয়া, যে ভিত্তির উপর স্বয়ং কালসমুদ্র স্থাপিত, সেই ভিত্তির উপর আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ মূলোৎপন্ন কর্ম্ম এবং তাহার যে সার্থকতা, তাহা কালের অপেক্ষা রাখে না।

যে কোন কার্য্য করিবে, চীৎকার করিও না; এত গরমে, এতদূর প্রসারণে, যে কোন পদার্থ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। নির্ব্বাক্ হইতে শিখ; শৈত্যে যৌগিকাকর্ষণের বৃদ্ধি হয়, দূরপ্রসারিত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পদার্থ রচনা করিয়া থাকে। নিত্য সংস্করণ, নিত্য সমাজ, নিত্য বক্তৃতায় তুমি ব্যাপৃত, তাহাতে তোমার আদর ভিন্ন অবমাননা করি না; কিন্তু এই বলি যাহা করিতে হয়, বুঝিয়া করিও; তাহার কর্ত্তব্যভাব এবং আবশ্যকতা অবধারণ করিও। নতুবা অপরে শ্রান্ত হইয়া পিপাসার তাড়নে জলপান করিয়া সুখলাভ করিল; আমিও তাহা দেখিয়া ঘটি ঘটি জলপান করিতে বসিলাম, কিন্তু শ্রান্তি যে তাহার জল-পানে সুখের একমাত্র নিদানভূত কারণ তাহার প্রতি একবারও লক্ষ্য করিলাম না; সুতরাং আমার লব্ধফল উদর ফাটিয়া যাওয়া! আর এক কথা, যাহা করিবে তাহা ভারতীয় হইয়া কর, সাহেব হইয়া করিও না; তাহা হইলে প্রকৃতিনিয়োজিত কর্ম্মস্থলীর বাহিরে গিয়া পড়িবে। যে সকল লোক ভারতীয় ঘুচিয়া সাহেব হইতে চাহে; তাহাদের পরিধেয় সহস্রমুদ্রাক্রীত এবং আহারীয় লক্ষমুদ্রাক্রীত হইলেও, তুমি নিশ্চয়

জানিবে, এই পৃথিবীতে মহত্ত্বের মূল আহার বিহারের অতীতে যদি আর কিছু থাকে, তাহা হইলে তোমার ঐ ছিন্ন বস্ত্র এবং ছিন্ন আহারীয় সত্ত্বেও তুমি তাহাদিগের অপেক্ষা অতুলনীয় মহৎ। তাহারা ভীরু, তুমি তাহাদিগের তুলনে বীরপুরুষস্থলীয়। তাহারা স্বজাতীয় গন্তব্য পথের দুঃখ ক্লেশ ভীত হইয়া, বিধর্ম্মী বিজাতীয় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু তুমি বীরভাবে সেই দুঃখ ক্লেশে দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া, স্বজাতীয় গন্তব্য পথে গতিশীল হইয়াছ। তাহারা উপহাসের স্থল, তুমি সকরুণ অশ্রু-আকর্ষণের স্থল। কুকুরের কণ্ঠে সোণার বণ্টী হইলেও, সে কখন দারিদ্র্যপতিত দুঃখকর্ষিত মানবের সঙ্গে সমতায় আসিতে পারে না। যে জাতীয়ত্ব হেতু স্পার্টানজননী অকাতরে স্বীয় সন্তানকে সমক্ষে বলিপ্রদত্ত হইতে দেখিয়াছে; যে জাতীয়ত্ব হেতু অপূর্ব্ব তীর্থস্থলী থার্ম্মপিলি ক্ষেত্রের উৎপত্তি; যাহার প্রভাবে রামায়ণের রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; যাহার প্রভাবে উইলেম টেল এবং ওয়ালেসের অদ্ভুত কীর্ত্তি; যাহার প্রভাবে অসভ্য বর্ব্বর মেক্সিকো ও পেরুভীয়গণও অকাতরে স্বীয় রক্তধারা বর্ষণ করিয়াছে; এবং যাহার প্রভাবে আধুনিক ভারতীয় ভিন্ন আর যে কোন জাতি অকাতরে রক্তদান করিয়াছে ও করিতে প্রস্তুত; সেই জাতীয়ত্ব যে যে জন যৎসামান্য আপাতত সুবিধার খাতিরে স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হয়, মাতৃভাষা পর্য্যন্ত যাহাদিগের নিকট "অড্" বলিয়া ত্যাজ্য হয়, এই জাগতিক কর্ম্মক্ষেত্রে সে সকল লোকের মূল্যই বা কি, তাহাদের পদার্থই বা কোথায়? তাহারা প্রকৃতির গর্ভস্রাব!

সেই সকল অঘোর স্বপ্নে উন্মত্ত হইও না; আশু চাকচিক্য দৃষ্টে ভুলিও না। ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আত্মজীবনের উদ্দেশ্যে বিশ্বাস কর, তোমার কর্ম্মক্ষমতায় বিশ্বাস কর, এবং কি জন্য তাহা তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে প্রবুদ্ধ হও। ঈশ্বর-প্রীতিকর তোমার কর্ত্তব্য কি তাহার অবধারণ কর;—সুকার্য্য মাত্রই ঈশ্বর-নিয়োজিত। দেখ তোমার সুশিক্ষিত আত্মবুদ্ধিতে এ সংসারে কোন্ কোন্ কার্য্য সৎ এবং মঙ্গলদায়ক, এবং কোন্ কোন্ কার্য্য অসৎ এবং অমঙ্গলদায়ক। যাহা সৎ তাহা বাছিয়া লও। তাহার মধ্যে আবার দেখ, কোন্ কোন্ গুলি তোমার সাধ্যায়ত্ত এবং তোমার মতি গতি ও রুচির পরিপোষক। যে গুলি তোমার সাধ্যায়ত্ত বলিয়া বুঝিবে, এবং যাহাতে তোমার রুচি হইবে, সেই গুলিই তোমার কর্ত্তব্য মধ্যে গণিবে। বহু-কার্য্য, অথবা একটীমাত্র কার্য্য, আমূলত হয়ত একই সময়ে, একই উপায়ে, একই প্রকরণে সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ভাল, তাহাই হউক। এখন দেখ যেগুলি

তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত. তাহার মধ্যে কোন্‌টী বা কোন্‌টীর কোন অংশ, তোমার বর্ত্তমান শক্তি, সময় ও উপায়ে সুসাধ্য হইতে পারে। এরূপ বিচারণায় যে অংশ তোমার আপাতত সুসাধ্য বলিয়া অবধারিত হইবে, তাহাই প্রাণপণে অনুসরণ করিয়া সম্পাদন করিতে যত্নবান হও। দেখিতে পাইবে, উহা সুসম্পাদিত হইতে না হইতে তোমার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য যাহা যাহা এবং তাহার উপায় আদিও যাহা, তাহারা আপনা হইতে তোমার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রাণপণে যত্ন করিও, হেলা করিও না; যেহেতু কে কতখানি কার্য্য করিল তাহা লইয়া পরিমাণ নহে, পরিমাণ কে কতখানি আত্মশক্তির প্রয়োগ করিল। এরূপে কর্ম্মনিরত হও; সমাজও, আজি হউক, কালি হউক, যখন বুঝিতে পারিবে, যখন তোমারই অনুরূপ প্রণালীতে কর্ম্ম করিতে শিখিবে, তখন আর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। তখন দেখিবে, সমাজকে তুমি তাড়াইয়া দিলেও, সে যাইবে না; তোমার সম্মান করিবে; কেবল সম্মান করিবে না, তোমার পূজা পর্য্যন্তও করিবে;—এইরূপ স্থানেই সামাজিক নিয়োজন এবং ঈশ্বর-কৃত নিয়োজন একতায় আসিয়া মিলিত হইয়া থাকে, এবং এই খানেই, একতার তার আসিয়া সমাজের মধ্যে আমূলত পরিচালিত হয়। অতএব আবার বলি, এরূপে কার্য্যনিরত হও, তোমার উন্নতি হইবে, তোমার জাতীয় উন্নতি হইবে, এবং জগতেরও উন্নতি হইবে। তখনই, আর পাঁচ কার্য্যের মধ্যে, ইহাও বুঝিতে পারিবে যে এই গ্রীকদিগের ভগ্নাবশেষ ও উত্তর ফল হইতে কোন্ কোন্ বস্তু গ্রহণ করিবে, কোন্ কোন্ বস্তু করিবে না; এবং আত্মজাতীয় কোন্ অকার্য্যকর বস্তু ফেলিবে, এবং কোন্ বস্তু ফেলিবে না; এবং তখনই কেবল, বিবিধ উপকরণ বিধর্ম্মী হইলেও কেমন করিয়া তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিতে হয় তাহা জানিতে এবং তদ্দ্বারা অপূর্ব্ব সৃষ্টিরচনে সমর্থ হইতে পারিবে। উক্ত জাতীয় ভগ্নাবশেষাদি হইতে কি গ্রহণ করিবে, কি গ্রহণ করিবে না, আমি তাহা নির্ব্বাচন করিলে যদি হইত, তাহা করিতাম। কিন্তু প্রত্যেক প্রকৃতি বিভিন্ন, প্রত্যেক রুচিশক্তি ইত্যাদিও বিভিন্ন, সুতরাং প্রত্যেক নির্ব্বাচনও বিভিন্ন হওয়া কর্ত্তব্য; বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি করিয়া এই বিশ্ব, বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি করিয়াই পূর্ণতা, এখানেও সেই বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি সংযুক্ত হইয়া পূর্ণতা সাধন করুক। আমার নির্ব্বাচনের এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্তি যে আর বাতুলের স্বপ্ন দেখিও না; ইহাতে কোন কার্য্যই হইবে না; কেবল বাতুলতা বৃদ্ধি হইবে মাত্র। প্রস্তুত হইলে এবং অধিকারী হইলে, স্বকার্য্য

আপনা হইতে হাতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ভারতসন্তান, তবে আর স্রোতে গা ঢালিয়া থাকিও না। এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বহুকাল নিদ্রিত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছ; আর কত কাল নিদ্রিত থাকিবে; কত বিশ্রাম করিবে? উঠ, উঠ; সুষুপ্তিরও সীমা আছে, সুষুপ্তি ত্যাগে জাগরিত হও, চক্ষু উন্মীলিত কর; একবার দেখ দেখি; তাকাইয়া দেখ, মাতৃভূমির কি দুরবস্থাই না করিয়াছ; সুষুপ্তি তোমায় কি সর্ব্বনাশই না সাধিয়াছে; সেই সোণার মাতৃভূমি ছারখার, তুমি নিজে ছারখার, চক্ষু থাকিলে দেখিতে পাইতে তোমার সেই জীবনান্তে অবলম্বনস্থল পিতৃস্থানও কিরূপ ছারখার হইয়া আসিয়াছে। এখনও জাগরিত হও; ভারতসন্তান, এখনও জাগরিত হও, হইয়া এখনও সময় থাকিতে স্বকার্য্য বুঝিয়া লও। সাত্বিকপ্রকৃতিযুক্ত, স্বাত্মাবলম্বী কর্ম্মবান হইতে শিখ; ইহ পরলোক উভয়েতেই আবার তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। জয় জগদীশ হরে।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমর-শেখর।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সপ্তাহ কাল অতীত, তথাপি সন্ন্যাসী সেই মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই রহিয়াছেন। মূর্চ্ছিত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য; কিন্তু অন্তরেন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল এবং মস্তিষ্ক কার্য্যতৎপর। তিনি বাহিরে কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না;—সেই শোভমান প্রকোষ্ঠ, সেই নানা অস্ত্রশস্ত্রাদি, সেই প্রকাণ্ড মানচিত্র ও চক্রের নিয়মাবলী, কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না; কিন্তু অন্তশ্চক্ষু দ্বারা নানা দ্রব্যসামগ্রী, নদ নদী, যুদ্ধস্থল, লোকজন, পশুপক্ষী দেখিতেছেন। তাহাদের আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, চালচলন, সমস্তই যেন নূতন বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, অথচ যেন দুই একবার কোথাও তাহাদিগকে দেখিয়া থাকিবেন। তিনি যেন সেই স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিতেছেন, আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন, দেশ উদ্ধার করিতেছেন, সশরীরে স্বর্গে যাইতেছেন, আবার হাসিতে হাসিতে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামিতেছেন। সেই প্রথম রজনীতে বাহকেরা তাঁহাকে খট্টায় শায়িত করিয়া প্রস্থান করিলে তাঁহার

বোধ হইল যেন, এক বিস্তৃত হৈম মন্দির, তাহার দ্বারবাতায়নাদি রজতনির্ম্মিত, রজতের উপর হীরক, মরকত, পদ্মরাগ, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি বিবিধ রত্নের নানাবিধ কুসুম খচিত; কবাটাদি গজদন্তে গঠিত। মন্দিরের প্রাঙ্গণতল বিশুদ্ধ শ্বেত মর্ম্মরে, স্তম্ভরাজি মরকতে, সোপানমঞ্চ বৈদূর্য্যে এবং অলিন্দসমূহ স্ফটিকে বিনির্ম্মিত। গৃহের চতুর্দ্দিকে বৈদূর্য্যশাখাবিশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীপবৃক্ষ;—তাহাতে সুরভিত বর্ত্তিকারাজি মনোহর সৌরভ বিতরণ করিয়া বিমলালোকে সমগ্র মন্দিরকে বিভাসিত করিতেছে;--গৃহস্থিত স্তম্ভে, ভিত্তিগাত্রে, কবাটে, বাতায়নে—সর্ব্বত্র এবং তন্মধ্যস্থ অগণ্য ভক্তবৃন্দের উৎফুল্ল নয়নসমূহে ও রৌপ্যত্রিশূল খচিত উষ্ণীষরাজিতে সেই আলোক প্রতিফলিত হইয়া কোটী চন্দ্র প্রকাশ করিতেছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে অগণ্য লোক;—স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা, যুবকযুবতী, প্রৌঢ়প্রৌঢ়া অগণ্য স্ত্রীপুরুষ কিন্নরকিন্নরী, বিদ্যাধরবিদ্যাধরী একত্রে একদলবদ্ধ হইয়া হস্তে নানা পূজোপচার ধারণপূর্ব্বক একদিকে ধাবমান হইতেছে; অগণ্য লোক, কিন্তু ভিড় নাই, ঠেলাঠেলি নাই, গাদাগাদি নাই, গণ্ডগোল নাই! তাঁহাদের রূপপ্রভায় মন্দিরের আলোকও যেন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি কেহ কাহারও রূপের দিকে অতৃপ্ত নয়নে চাইতেছে না, কেহ কাহারও প্রতি কামকলুষিত কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছে না; সকলেরই দৃষ্টি এক দিকে; সকলেরই মুখে "জয় মা ভৈরবী" বাক্য। অগণ্য কণ্ঠ এক সঙ্গে উত্থিত হইতেছে, যেন একই কণ্ঠস্বর। বালকবালিকা, যুবকযুবতী, প্রবীণ প্রবীণা, এবং বৃদ্ধবৃদ্ধার কণ্ঠস্বর একত্রে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব স্বর সৃষ্ট হইতেছে;—সে স্বর শ্রুতিমনোহর, তাহা ষড়্‌জ-সংবাদী। সন্ন্যাসী বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন; সাগ্রহে সেই সমস্ত লোকের গন্তব্য দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন এক অপূর্ব্ব ভৈরবীমূর্ত্তি,—চতুর্ভুজা,—বালারুণবর্ণা,— ত্রিনয়না,—রত্নাসনসংস্থিতা:—আসন কামক্রোধাদি ষড়রিপুর শিরোদেশে স্থাপিত। দেবীর দুই ভুজ বরাভয়দানে নিরত;—অপর হস্ত যুগলে খর্পর ও খড়্গ ধৃত। সম্মুখে রত্নমঞ্চের উপরিভাগে মঙ্গলরূপী মহাদেব রজতগিরি সদৃশ করজোড়ে দণ্ডায়মান। দেবীর সম্মুখে প্রাঙ্গণে লাবণ্যময় অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ বিরাজিত; কেহ পূজা করিতেছে, কেহ জপ করিতেছে, কেহ স্বহস্তে নিজ বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক পাত্র পূরিয়া শোণিত দিতেছে! সকলেই ভক্তিগদগদ; সকলেরই নয়ন যুগল হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছে। সন্ন্যাসীর হৃদয় বিগলিত হইল; তিনিও "জয়মা ভৈরবী" বলিয়া যেন দেবীর পূজার্থ ধাবমান হইলেন।

এইরূপে প্রথম দিবস অতীত হইল. দ্বিতীয় দিবসে সন্ন্যাসীর বোধ হইল

যেন, তিনি এক প্রচণ্ড শৈবী সেনার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিতেছেন। অসংখ্য ক্ষেত্র, প্রান্তর, উদ্যান, কানন, উপত্যকা ও নদনদী অতিক্রম করিয়া বিশাল অক্ষৌহিণী এক বিরাট দুর্গ সম্মুখে উপস্থিত হইল, দুর্গের প্রাকারাবলীর শিরোদেশে শত্রুগণ সশস্ত্র অবস্থায় দণ্ডায়মান। শৈব বীরগণ যেন দুর্গ অবরোধ করিল; অবরুদ্ধ শত্রুকুল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। রণদামামা বাজিয়া উঠিল। রণমত্ত বীরগণের প্রচণ্ড বৃংহণে রণস্থল কম্পিত হইল। শত্রুগণ প্রাচীর হইতে অগণ্য জ্বলন্ত গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই সমস্ত নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত গোলা শত শত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় বায়ুমণ্ডলকে তাড়িত ঘূর্ণিত, আলোকিত করিয়া ভীষণ শব্দে শৈবী সেনার দিকে ধাবমান হইতেছে;—কিন্তু ওকে? কে ঐ কপালমালী,রুদ্রমূর্ত্তি. ভীষণবেশে অট্ট অট্টহাসে তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে রণস্থলে আবির্ভূত হইল! ঐ বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া শত্রুনিক্ষিপ্ত গোলাপুঞ্জ গ্রাস করিল! দুই হস্তে ভীষণ খর্পর,—খর্পর শোণিতপূর্ণ; মুহুর্মুহু শোণিত পান করিতেছে, মূর্দ্ধ্বণি দিয়া শোণিতধারা নিঃসৃত হইতেছে;—সঙ্গে অসংখ্য পিশাচ;—সকলেই সেই অধর-প্রান্তবাহী রুধিরধারা পান করিতেছে! ভীষণ যুদ্ধ ক্রমে ভীষণতর হইয়া উঠিল। সেই রুদ্রমূর্ত্তির বিকটরব ক্রমে প্রলয় মেঘগর্জ্জন সদৃশ শ্রুত হইতে লাগিল। দুর্গপ্রাকার ভগ্ন হইল! শত্রুসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অকস্মাৎ হাহাকার রবে সমস্ত দেশ পূর্ণ হইল; সহসা নিবিড় অন্ধকারে দশ দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তমোরাশি ক্রমে নিবিড়তর হইতে লাগিল ক্রমে যেন তাহা তাল পাকাইয়া শত-সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া ঘূরিতে ঘূরিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল! সেই সমস্ত ঘূর্ণমান পুঞ্জীভূত অন্ধকারনিচয় তাড়িতগর্ভ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তৎসমূহের অভ্যন্তর হইতে যেন এক-প্রকার উষ্ণ বাষ্প নিঃসৃত হইতে লাগিল। অপর অপর শৈবযোধের কি হইল, সন্ন্যাসী তাহা দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তিনি সেই উৎকট বাষ্প স্পর্শে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেইরূপ মূর্চ্ছিত অবস্থায় তিনি কতদিন রহিলেন, তাহার কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। মূর্চ্ছাভঙ্গে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল। তাঁহার বোধ হইল যেন তিনি অমরাবতীর এক প্রশস্ত পথে অগণ্য দেবলোকের সহিত বিচরণ করিতেছেন। উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ বিমল ধবল অসংখ্য দেবতুরঙ্গের উপর অসংখ্য দেবতা মুক্তাজালজড়িত মনোহর পতাকা হস্তে ধীরে ধীরে যাত্রা করিতেছেন; উভয় পার্শ্বে কিন্নরী ও বিদ্যাধরীগণ মঙ্গলময় বাদ্যের সহিত "বরদে বরদে বর-বর্ণিনি" গীতটী গান করিতেছে। রেথ্যার উভয় পার্শ্বস্থ কুসুমদলাবৃত পাদপশ্রেণীর উপর.

বিকচ-প্রসূনশোভিত মন্দারতরুরাজির স্নিগ্ধ ছায়াতলে মন্দারমালিকাহস্তে শ্রেণী-বদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অসংখ্য দেব-কন্যা সেই অশ্বারোহী বীরদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন, সেই স্বর্গীয় তুরঙ্গ-সেনা ক্রমে একটী স্ফাটিক অট্টালিকার সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল। তথায় অসংখ্য কিন্নর কিন্নরী ও বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী নানা বাদ্যযন্ত্র মিলাইয়া আগমনী গীত গাইতেছে। শত শত কলকণ্ঠ স্বর্গীয় বিহঙ্গ ইতস্ততঃ উড়িয়া শ্রবণমোহন রবে গান করিতেছে। অট্টালিকার মনোহর বৈদূর্য্য অলিন্দের উপরিভাগে অগণ্য ময়ূর ময়ূরী নাচিয়া বেড়াইতেছে। সৌধের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র সন্ন্যাসী দেখিলেন যে, অমরগণ হস্ত প্রসারিত করিয়া সেই দেবসেনার পুরোভাগস্থ অধিনায়ককে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রীতবক্ষে ধারণ করিলেন। অমনি সমস্ত লোক 'জয় শিব শঙ্কর!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে রবে ত্রিভুবন কাঁপিল,—সন্ন্যাসী সহসা অশ্ব হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। অমনি যেন সেই দেবাদৃত সেনাপতি আসিয়া তাঁহার কর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূমিতল হইতে উত্তোলন করিলেন। সন্ন্যাসীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, সেই মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখনও তাঁহার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু যখন সেই মহাপুরুষ হাত ধরিয়া শয্যা হইতে সস্নেহে তাঁহাকে তুলিলেন, যখন সেই সজ্জিত গৃহ, সেই নিয়মপট্ট ও নিজ গৈরিক বসন তিনি দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার মোহ অল্পে অল্পে অপগত হইল। তিনি সসম্ভ্রমে সেই মহানুভব ব্যক্তির চরণে পতিত হইয়া নীরবে অশ্রুজলে তাঁহার চরণ ধৌত করিলেন।

সেই দিন সপ্তম দিবস পূর্ণ হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" মহাপুরুষ ধীর ও সস্নেহ ভাবে উত্তর করিলেন, সে পরিচয় পরে দিব। সন্ন্যাসী বলিলেন নিশ্চয়ই আপনি যেন দেবতা। আমি এ কোথায় আসিয়াছি?

ইহা একটী মঠ,—নাম ষট্‌চক্র।

আমাকে এখানে কে লইয়া আসিয়াছে?

তুমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে, ঠাকুররা লইয়া আসিয়াছেন।

সন্ন্যাসী সেই বালিকার মুখে শুনিয়াছিলেন যে, ঠাকুররা নারায়ণ স্বামীর শিষ্য। কিন্তু সেই স্বপ্নদৃষ্ট দেবগণের কথা তিনি এখনও ভুলিতে পারেন নাই, সেই জন্য ভাবিলেন যে ঠাকুর কি যথার্থ দেবতা?

মহাপুরুষ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া স্নেহসিক্ত বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ভাবিতেছ? তাঁহারা দেবতা কি মনুষ্য, তাহা এখনই দেখিতে পাইবে?"

সন্ন্যাসী বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন, মহাপুরুষের কথার কোন উত্তর দিলেন না। ক্ষণকাল অবনত মস্তকে চিন্তা করিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি এ কোথায় আসিলাম ?—আমার তুরঙ্গ ও রণসাজ কৈ? আমার জননী ভৈরবী কৈ ?"

"জননী ভৈরবীচক্রে আছেন। কেন, তুমি দেখিবে ?"

"হাঁ,দেখিব—দেখিব!" বলিয়া সন্ন্যাসী সাগ্রহে দণ্ডায়মান হইলেন।

মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখিবে —দেখিয়া কি করিবে? শৈব ব্যতীত অপর কাহাকেও দেবী দর্শন দেন না।"

সন্ন্যাসী ক্ষোভ ও বিস্ময় সহকারে বলিলেন "কেন? আমি যে এই মাত্র দেখিলাম; আমি যে এই মাত্র সেই বালারুণবর্ণা, চতুর্ভুজা, ষড়্‌রিপুদলনী, মহামায়া ভৈরবীকে দেখিলাম। তবে তিনি আবার দেখা দিবেন না কেন ?"

"তুমি সে স্বপ্নে দেখিয়াছ।"

"তবে কি তাহা অলীক ?"

"না সমস্তই সত্য। তিনি তোমার মন জানিবার জন্য দেখা দিয়াছিলেন; এখন মন জানিয়াছেন।"

"মন জানিয়াছেন; তবে দেখা দিবেন না কেন? আমি যে দেবীর চরণে এ জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। প্রভো বঞ্চনা করিবেন না, আমিও দেবীর ভক্ত হইয়াছি।"

"শুধু দেবীর ভক্ত হইলে চলিবে না, শৈব হইয়া দেবীর পূজা করিতে হইবে।"

"তাহাতে আমি প্রস্তুত আছি। আপনি একবার মহাদেবীকে দেখান।"

"তবে যথাবিধি স্নান ও কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া শিবমন্ত্র গ্রহণ কর।"

"কাহার নিকট গ্রহণ করিতে হইবে?"

"চক্রের আচার্য্যের নিকট।"

"তিনি কে ?"

"নারায়ণ স্বামী।"

"সন্ন্যাসীর নয়ন দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি অধর দংশন করিয়া বলিলেন "নারায়ণ স্বামী! না মন্ত্রে প্রয়োজন নাই" বলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

মহাপুরুষ তাঁহার হাত ধরিয়া সস্নেহে তুলিলেন,—তুলিয়া বলিলেন "কেন, নারায়ণ স্বামী তোমার কি করিয়াছেন?"

"কিছুই না। আমি জানিয়া শুনিয়া দস্যুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিব কেমন করিয়া ?"

"কেন, তিনি দস্যু হইলেন কিসে ?"

"দস্যু নয় ? তাহার দস্যুতার কয়টী উদাহরণ দিব ? কালিকুটের নিকট পাঞ্জোরে থাকিয়া সে কি না করিয়াছে ? তাহার অত্যাচারে কত গ্রাম কত নগর ছারখার হইয়া গিয়াছে; কত মহিলার সীমন্তের সিন্দুর ঘুচিয়াছে। সে সামরিণকে পদচ্যুত করিয়া কালিকুট অধিকার করিয়াছে,—গোয়ার ভাবী পর্ত্তুগিজ শাসনকর্ত্তা আলমেডার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে, সেই

দুরন্ত দস্যুর নিকট আমি কেমন করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিব ?"

"তুমি দস্যুতা কাহাকে বল ?"

"পরস্বাপহরণই দস্যুতা।"

"নারায়ণ স্বামী কবে পরস্বাপহরণ করিয়াছেন ?"

"অসংখ্য বার।"

মহাপুরুষ ঈষৎ হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "না, তবে তুমি জান না ; তিনি কখনও পরস্ব অপহরণ করেন নাই।"

"সে কি কথা, প্রভো ! তাহার অত্যাচারে কত ধনী লোক পথের ভিখারী হইয়াছে, কত রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তবু আপনি বলিতেছেন যে সে দস্যু নয়। আপনার মতে তবে পরস্ব কি ?

"যাহাতে পরের চিরন্তন অনবচ্ছেদ্য স্বত্ব তাহাই পরস্ব।"

"তাহা কি ?"

"আত্মা। দেখ ধন জন, গৃহ অট্টালিকা, বসন ভূষণ কাহারও নিজস্ব নহে। মানব জীবিত থাকিতেই যখন সে ধন হারায়, প্রিয় জন হইতে বিচ্যুত হয়, যখন তাহার গৃহ অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া যায়, বসন ভূষণ চোরে অপহরণ করিয়া লয়, তখন তাহার সে সমস্ত পদার্থ কেমন করিয়া নিজস্ব হইতে পারে ? অনেকে অনেকের জীবন হত্যা করিয়াছে, কিন্তু ইহলোকে কেহ কখন কি কাহারও আত্মা হরণ করিতে পারিয়াছে ?

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন না, বিভ্রান্তের ন্যায় মহাপুরুষের মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

মহাপুরুষ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন "নারায়ণ স্বামী জীবনে কখনও কাহারও আত্মাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন নাই। কখনও কাহাকে উন্মার্গে লইয়া যান নাই, কখন ধর্ম্মশীল ও পরোপকারীর অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য দুষ্টের দলন, একীকরণ, ধনী দরিদ্রে ব্রাহ্মণ শূদ্রে বৈষম্য দূরীকরণ, সামাজিক সমীকরণ। সহস্র ব্যক্তির উপকারের জন্য তিনি এক ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়াছেন, বৃহৎ মানবসমাজের জন্য তাহার এক কণা স্বরূপ একটী ব্যক্তিকে দলিত করিয়াছেন। নতুবা দেখাও দেখি তিনি কোন্ পরোপকারীর অনিষ্ট করিয়াছেন, কোন্ ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে পীড়ন করিয়াছেন ? তুমি কি সামরিণের সমস্ত বিবরণ জান ? সামরিণ যে কি প্রকারে কালিকূট সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল, তাহা কি তুমি শুনিয়াছ ? সামরিণ কে ? সে ভবানীশঙ্করের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। ভবানী শঙ্কর জ্যেষ্ঠ সুরশেখরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সমরশেখরকে দস্যুদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রকে জন্মমাত্রেই জলে নিক্ষেপ করিয়া, কালিকূটসিংহাসন অধিকার করিয়াছিল, অবশেষে স্বয়ং না রাজা হইয়া সামরিণকে রাজা করিয়া-

ছিল। এ সব কথা তুমি শুনিয়াছ ?”

সবিস্ময়ে সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন “কিছুই নহে, আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না; তবে বাল্যকালে সুরশেখরের নাম শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে কি সামরিণ কালিকুটের প্রকৃত রাজা নহে ?”

“না, সামরিণ রাষ্ট্রাপহারক। বিশ্বাস না হয় এই পাট্টা দেখ” বলিয়া মহাপুরুষ এক খানি পাট্টা বাহির করিয়া দেখাইলেন।

সন্ন্যাসী নিবিষ্ট মনে তাহার আদ্যোপান্ত পড়িলেন। বিস্ময়, আনন্দ ও কৌতূহলে তাঁহার মন আলোড়িত হইল। তিনি বলিলেন “পাপিষ্ঠ সামরিণ! দুরাচার ভবানীশঙ্কর! প্রভো! সুরশেখর এখন কোথায় ?”

“তিনি এই চক্রের ভিতর আছেন।”

সন্ন্যাসী মহাপুরুষের মুখ প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাঁহার কটাক্ষে সংযতাত্মা মহাপুরুষের গম্ভীর বদনমণ্ডলে অণুমাত্রও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। সন্ন্যাসী সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভো! তবে নারায়ণ স্বামীই কি মহারাজ সুরশেখর ?”

মহাপুরুষ বলিলেন “হাঁ, তিনি এখন সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া নারায়ণ স্বামী নাম ধরিয়াছেন।”

“তিনি কোথায় ? একবার আমি তাঁহাকে দেখিব, একবার আমি তাঁহার চরণে পড়িয়া রোদন করিব। ওঃ! আমি তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। তিনি কৈ ?”

“আমিই সেই সুরশেখর।”

“প্রভো!—মহারাজ—গুরুদেব—ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন” বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় সন্ন্যাসী নারায়ণ স্বামীর চরণতলে পতিত হইয়া অশ্রুধারে তাঁহার পদতল বিধৌত করিতে লাগিলেন।

হিন্দুসমাজ-সংস্কার।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি হিন্দুসমাজের সর্ব্বাগ্রকর্ত্তব্য সংস্কার বিধবাবিবাহের পুনঃপ্রচলন। পুনঃপ্রচলন বলিলাম তাহার কারণ এই যে শাস্ত্রের ব্যবস্থায় ও রামায়ণ মহাভারতাদি ঐতিহাসিক মহাকাব্যে বিধবাবিবাহ পূর্ব্বপ্রচলিত থাকার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেদীপ্যমান আছে। যাহা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল ও শাস্ত্রানুমোদিত তাহার পুনঃপ্রচলন দুরূহ কার্য্য নহে। আমাদের দুরূহ বোধ হয় তাহার কারণ আমাদের কার্য্যকরী শক্তি আজও উৎপন্ন হয় নাই।

আমরা এতদিন নিদ্রিত ছিলাম, নিদ্রা-ভঙ্গের পর উঠিয়া কেবল ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি মাত্র। এখনও আমাদের হস্তপদাদি শিথিল হইয়া রহিয়াছে। কার্য্যের নাম শুনিলে এখনও আমাদের ভয় হয়। লিখিয়া বা বক্তৃতা করিয়া যদি অব্যাহতি পাই,তাহা হইলে আমরা সহজে কার্য্যে হাত দিতে চাই না। আমাদের ইচ্ছা যে যতদিন সন্তরণ ভাল করিয়া না শিখিব, ততদিন আর কার্য্য-সাগরে নামিব না। কিন্তু অবোধ লোক! তোমার এ দুরাকাঙ্ক্ষা কেন? জলে না নামিয়াই সাঁতার শিখিবার দুরাশা কেন? তুমি জাতীয়তা লইয়া মুখে আকাশ পাতাল আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছ, কিন্তু এখনও কার্য্যসাগরে পা দিতে সাহস করিতেছ না কেন? শুদ্ধ মৌখিক আন্দোলনে কোন্ দেশ কবে বড় হইয়াছে? যদি জাতীয় স্নায়ু দৃঢ় করিতে চাও, তবে কার্য্য করিতে হইবে। রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের কার্য্য করিবার অধিকার নাই—কেবল চীৎকার বা রোদন করিবার অধিকার আছে। কিন্তু নিষ্ফল আরণ্য রোদনে আর অমূল্য জাতীয় জীবন নষ্ট করা সঙ্গত হইতেছে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া জাতীয় শক্তি ধ্বংস করা কিছুতেই উচিত বোধ হইতেছে না। যখন পঞ্চবিংশতি কোটী লোক একমনে একপ্রাণে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে শিখিব,তখন যাহা আজ আমরা অনুগ্রহ বলিয়া চাহিতেছি, তাহা না চাহিলেও অধিকার স্বরূপ পাইব।

রাজনৈতিক মঞ্চে উঠিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে সমাজের জীর্ণসংস্কার করিয়া লইতে হইবেক। হিন্দুসমাজ-সৌধ বহুদিন সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই জীর্ণসংস্কার করিয়া লইলে, আবার ইহা কতকাল চলিবে। যদি জীর্ণসংস্কার করিতে অসম্মত হই, তাহা হইলে ইহার পতন অনিবার্য্য। সমাজসংস্কার না করিলেই সমাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। প্রবল স্রোতস্বিনীও কালে পঙ্করাশিতে ও দামদলে জড়িত হইয়া পড়ে। দামদল পরিষ্কার ও পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিলে, সেই নদী আবার পূর্ব্বাবস্থা ধারণ করে। যদি তাহা না কর, সেই প্রবল স্রোতস্বিনী কালে মরা নদীতে পরিণত হইবে। প্রকাণ্ড সৌধরাজির মধ্যে মধ্যে জীর্ণ-সংস্কার করিলে তাহা অনন্তকালস্থায়িনী হইতে পারে। কিন্তু জীর্ণসংস্কার না করিলে তাহা অধিক দিন থাকিতে পারে না। সমাজেরও ঠিক সেই অবস্থা।

কোন বিজ্ঞ সম্পাদক লিখিয়াছেন যে সমাজের অধিকাংশ লোকের অভি-মত না লইয়া কোন সমাজসংস্কার হইতে পারে না। ভারতের পঞ্চবিংশতি কোটি অধিবাসীর মধ্যে অন্ততঃ ত্রয়োদশ কোটীর অভিমত না হইলে তুমি যদি সমাজসংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তুমি অসামাজিক লোক,

সমাজ তোমার মত লোককে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে। তিনি ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে অধিকাংশ সভ্যের মত না হইলে কোন বিধি তথায় ব্যবস্থাপিত হয় না। তিনি দেখাইয়াছেন যে মৃত পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করার পদ্ধতি অবতারিত করিবার জন্য অনেক বিজ্ঞ সভ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা বিপক্ষগণের সংখ্যা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন থাকায় তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইতেছে না। এ তুলনা সঙ্গত হয় নাই। কারণ পার্লেমেন্টের সভ্যসংখ্যা ছয় সাত শতের অধিক নহে। সেই ছয় সাত শত লোক সমস্ত ব্রিটনবাসীর প্রতিনিধি হইলেও, সেই ছয় সাত শত লোকের মতের সহিত যে ব্রিটনের অধিবাসিসাধারণের মতসাম্য আছে, তাহা কখনই নহে। প্রতি লক্ষে দুই এক জন করিয়া প্রতিনিধি। সেই দুই এক জন লোক যে এক লক্ষ লোকের মনের মত কথা বলিতে পারিবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। সেই এক লক্ষ লোকের মনস্তুষ্টি বিধান করিয়া কথা বলা দেবতারও অসাধ্য। তাহার মধ্যে কত বিভিন্নমতাবলম্বী লোক আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই জন্য বলিতেছি যে জনসাধারণের মত লইয়া ইংলণ্ডেরও কার্য্য চলিতে পারে না। জনসাধারণ যাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, তাঁহাদিগের মতামতেই সমাজ চলিয়া থাকে। জনসাধারণ তাঁহাদিগের মত শিরোধার্য্য করিয়া লয় বলিয়াই, সমাজ চলিতেছে—নতুবা এতদিনে রসাতলে যাইত।

আমাদের দেশে কোন কালেই দেশব্যাপী প্রতিনিধিপ্রণালী প্রচলিত ছিল না। তবে যে সকল ঋষি নিজ গুণগরিমায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেন, লোকে তাঁহাদিগের মত শিরোধার্য্য করিত। সমাজ তাঁহাদিগের মতামতেই চলিত। সেই জন্যই শাস্ত্রের এত আদর। শাস্ত্র জ্ঞানী জনের উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। হিন্দুসমাজ আজও কিয়ৎ পরিমাণে সেই শাস্ত্র দ্বারা পরিচালিত।

এই শাস্ত্র আমাদের দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিস্বরূপ পরিগৃহীত হইত। তখন জ্ঞানিগণ জনসাধারণ দ্বারা পরিচালিত হইতেন না, জনসাধারণ জ্ঞানিগণ দ্বারা পরিচালিত হইত। বর্ত্তমানসময়ে পণ্ডিতমণ্ডলী বিদায়ের জন্য সাধারণের বা ব্যক্তিবিশেষের তুষ্টিকর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে ব্যাখ্যার শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তারা পরমুখনিরপেক্ষ নিষ্কাম যোগী ছিলেন। তাঁহারা কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া শাস্ত্র লিখিতেন না। যাহা প্রকৃত লোকহিতকর তাহাই ব্যবস্থা করিতেন।

সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় যে সংখ্যা-

বাহুল্যের আধিপত্য সংস্থাপন করিতে চান, তাহাতে শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করা হইবে। তাহাতে জ্ঞানের অবমাননা ও অজ্ঞানের পূজা আরম্ভ হইবে। জনসাধারণের রীতিনীতি বা অভিমত যে সমাজের আদর্শ হয়, সে সমাজের অধঃপতন অনিবার্য্য। দেশাচার শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিলে যে বিষময় ফল হয়, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বর্ত্তমান। দেশাচারের মূল নিরক্ষর জনসাধারণের খামখেয়ালী, শাস্ত্রের মূল যুক্তি, বিজ্ঞান ও ভূয়োদর্শন। সুতরাং আমরা দেশাচারকে আদর্শ করিয়া আর চলিতে চাহি না। পতিত জাতির তাহা আদর্শ হইতে পারে। কিন্তু উত্থানশীল নব্য ভারতের তাহা আদর্শ হইতে পারে না। উত্থানশীল হিন্দুসমাজ যুক্তিমূলক শাস্ত্রকে আদর্শ করিয়া উঠিবে। যে শাস্ত্র সদ্‌যুক্তির উপর সন্ন্যস্ত তাহাই আমরা গ্রহণ করিব। অনক্ষর জনসাধারণ যে দিকে যাইতে বলে, আমরা সে দিকে যাইব না। কিন্তু মহাজন যে মার্গানুসরণ করিয়াছিলেন, সেই মার্গানুসারী হইব। কারণ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—মহাজন যে পথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সুপথ, অন্য পথ কুপথ। সে পথে যাইলে নিশ্চয় বিপদ্ ঘটিবে।

মানসিক দুর্ব্বলতার সময় যখন পতিত জাতি বিপথগামিনী হইতে চায়, তখন যাঁহারা তাহাতে উৎসাহ দেন, তাঁহারা জাতীয় শত্রু। যাঁহারা বন্ধুভাবে সুপথ দেখাইয়া দেন, ও বিপথে যাইতে নিষেধ করেন তাঁহারাই প্রকৃত বন্ধু। ঔষধ যেরূপ তিক্ত, অনেক সময় বন্ধুর উপদেশও সেইরূপ তিক্ত লাগে বটে, কিন্তু ঔষধের ন্যায় ইহা পরিণামহিতকর। অধিক কি অনেক সময় শত্রুর নিন্দাবাদও বন্ধুর স্তোত্রবাদ অপেক্ষা অধিকতর হিতকারী হইয়া দাঁড়ায়। কোন ব্রাহ্ম সংবাদপত্র হিন্দুসমাজের দোষোদ্ঘোষণ করায় কয়জন সংবাদপত্রের সম্পাদক তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন কিন্তু দোষ দেখাইয়া দিলে যে চটিয়া উঠে তাহার দোষ কখন সংশোধন হয় না।

হিন্দুসমাজের স্কন্ধে ব্রাহ্মপত্রিকা যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা অমূলক নহে। হিন্দুসমাজ যখন তেজস্বী ছিলেন, যখন সত্যকে দেবতাভাবে পূজা করিতেন, যখন সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন, তখন ইহাঁর ঔজ্জ্বল্যে জগৎ ঝলসিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ হিন্দুসমাজ পতিত, আজ হিন্দুসমাজে সে সত্যপ্রিয়তা নাই, সত্যের জন্য সে আত্মোৎসর্গ নাই,—তাই হিন্দুসমাজে এত কপটাচার প্রবেশ করিয়াছে। সত্য গিয়াছে, সত্যের আবরণ পড়িয়া আছে মাত্র। আত্মা গিয়াছে, দেহ পড়িয়া আছে মাত্র।

হিন্দুসমাজ এখন স্পষ্ট বলিয়া দেয় যে তুমি যাহা কর না কেন, গোপনে করিও। জিজ্ঞাসা করিলে অস্বীকার করিও, তাহা

হইলে আর তোমার কোন ভয় নাই। যদি তুমি সত্য বল, তোমায় জাতিচ্যুত করিব। আজ বিলাতফেরৎগণ এই জন্যই হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। বিলাতযাত্রিগণ যে অপরাধে অপরাধী, আজ কল সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই প্রায় সেই অপরাধে অপরাধী। তবে একদলকে রাখিয়া আর একদলকে কেন পরিত্যাগ কর? সত্যের এত অনাদর কেন? উইলসনের হোটেলে খাইলে যদি সমাজচ্যুত না কর, তবে বিলাতের হোটেলে থাইলে জাতিচ্যুত কর কেন? একজন গোপন করে, আর একজন গোপন করিতে চায় না বলিয়া? একজনের অপরাধ যে সে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিদেশ গিয়া গত্যন্তর নাই বলিয়া বৈদেশিকের অন্ন গ্রহণ করে, আর একজন গৃহের অন্ন থাকিতেও শুদ্ধ রুচিপরিবর্ত্তনের জন্য যবনান্ন গ্রহণ করে। যদি যবনান্ন গ্রহণ করা বাস্তবিকই দোষ হয়, তাহা হইলে কার দোষ গুরুতর? একজনের লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল, আর একজনের গুরুপাপে লঘুদণ্ড, এ দণ্ডের তারতম্য কেন? একজনের অপরাধ ইচ্ছাকৃত, অপরের অপরাধ কার্য্যবশতঃ। তবে লঘুপাপীর উপর অধিকতর নির্য্যাতন কেন? পূর্ব্বোল্লিখিত সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বিলাতফেরৎগণ সংখ্যায় অতি অল্প, সুতরাং হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে অনায়াসেই পরিত্যাগ করিতে পারেন। এ যুক্তি Might is right এর যুক্তি। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের নির্য্যাতন চিরপ্রসিদ্ধ। আমি প্রবল, তুমি হীনবল—তোমায় আমি প্রহার করিব, তাহাতে আবার যুক্তি কি? পাঁচজনের বাটী, চারিজনের ইচ্ছা হইল, পঞ্চমজনকে তাড়াইব, চারিজনে জোট বাঁধিয়া পঞ্চমজনকে তাড়াইলাম, তাহাতে আবার যুক্তির প্রয়োজন কি? এ কথা বলিলে নাচার। যাঁহারা যুক্তি পথ ছাড়িলেন, তাঁহাদিগকে আঁটিবে কাহার সাধ্য? কিন্তু আপাততঃ জোর যার মুল্লুক তার হইতে পারে—কালে যুক্তিই প্রবল থাকিবে। পাশব বলকে একদিন যুক্তির অধীন হইতেই হইবে। সুতরাং আমরা যাহা যুক্তিসিদ্ধ তাহাই বলিয়া যাইব। আজ তাহাতে জনসাধারণ কর্ণপাত করিতে না পারে, কাল কিম্বা পরশ্ব করিতেই হইবে।

মহাজনে বলিয়া গিয়াছেন—Union is strength.—একতাই প্রকৃত সামাজিক শক্তি। হিন্দুসমাজে একতা নাই বলিয়াই ইহা সমাজিক শক্তিশূন্য। হিন্দুসমাজ বলিলে ইহাতে ঘনীভূত একলক্ষ্যসঞ্চালিত কোন শক্তিকেন্দ্র বুঝায় না। ইহা দ্বারা পরস্পর-মমতা-শূন্য, দূর-বিক্ষিপ্ত, নির্লক্ষ্য বা বিভিন্নলক্ষ্য অসংখ্য সম্প্রদায়ের সমষ্টি মাত্র বুঝায়। যতদিন না আমরা হিন্দুসমাজকে একটী ঘনীভূত, একলক্ষ্য শক্তিকেন্দ্র করিয়া তুলিতে পারিতেছি, ততদিন আমাদিগের

দিগের একটী রাজনৈতিক জাতিরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই।

হিন্দুসমাজ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে, এক্ষণে কিরূপে সেইগুলির ক্রমিক সমন্বয় হইতে পারে, আমাদিগকে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই অতি কঠোর সাধনা। ইহার উপর যদি আমরা হিন্দুসমাজকে আরও অবান্তর ভাগে বিভক্ত করিতে থাকি, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ ক্ষত আর কখন শুকাইবে না। সামাজিক একতার সহিত রাজনৈতিক একতার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে একের অভাবে, আর একটী কখন পরিপুষ্ট হইতে পারে না। যদি তোমার সহিত আমার সামাজিক সহানুভূতি না রহিল, তবে তোমার রাজনৈতিক উন্নতিতে আমার আনন্দ পূর্ণমাত্রায় হইবে কেন? যদি নিম্ন জাতি সাধারণ উচ্চ জাতির সহিত সহানুভূতি করিত, তাহা হইলে যবনেরা কখন ভারতে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারিত না। উচ্চ জাতি নিম্নজাতির প্রতি যেরূপ সামাজিক ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে উচ্চ জাতির প্রতি নিম্ন জাতির মমতা থাকিতে পারে না। এই জন্য তাহারা কোন প্রকার রাজনৈতিক আবর্ত্তনে কোন প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করে না। তাহারা জানে রাজা যিনিই হউন না কেন, তাহাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন আশা নাই। সুতরাং পরিবর্ত্তনে তাহাদিগের কোনও স্বার্থ নাই। এদিকে উচ্চ জাতি সংখ্যায় অতি হীনবল। নিম্নজাতি-নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহারা বহিশ্চর ও অন্তশ্চর শত্রু নিবারণে অক্ষম হইয়া পড়েন।

এরূপ স্থলে রাজনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় জাতিবৈষম্য যাহাতে আর পরিবর্দ্ধিত না হয়, বরং ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে; আমাদিগকে প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সামান্য সামান্য কারণে ব্যক্তিপুঞ্জকে সমাজ-চ্যুত করিয়া খণ্ডশঃ বিভক্ত হিন্দুসমাজকে আরও বিভক্ত করা আত্মঘাত ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব আমরা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই অনুরোধ করি তাঁহারা আর সামান্য সামান্য কারণে লোককে জাতিচ্যুত করিয়া হিন্দুসমাজকে আর হীনবল না করেন। যখন দেখিতেছি ইউরোপ ও আমেরিকা পার্থিব সভ্যতা বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, তখন স্বদেশের উন্নতি সাধনের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা যাত্রা করা একান্ত আবশ্যক। কারণ তুলনায় সমালোচনা দ্বারা আত্ম-দোষ পরিবর্জ্জন ও পরোৎকর্ষের অনুকরণ ব্যতীত কখন দ্রুত উন্নতি সাধন হয় না। যদি কোন দেশ জাতীয় কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগতের উৎকর্ষরাশির অনুকরণে জাতীয় উৎকর্ষ বিধান করিতে পারে, তাহা হইলে সে দেশ অচিরকাল-

মধ্যে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইতে পারে। মনুষ্যজাতি আজ পর্য্যন্ত যত কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছে, আমরা বিনা পরিশ্রমে বা অল্প পরিশ্রমে স্বদেশে আনয়ন করিতে পারি। মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র প্রস্তুত করে আমরাও ইচ্ছা করিলে নানা দেশের রত্ন-রাজি আহরণ করিয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি। জাপানের দ্রুত উন্নতির মূল এই পরোৎকর্ষের অনুকরণ। উন্নতি-শীল জাপান দেখিতে দেখিতে ব্রিটনের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। এদিকে প্রাচীন ভারত, প্রাচীন চীন—স্থিতিশীলতা দোষে প্রায় পূর্ব্বাবস্থায় রহিয়া গেল। এখনও সময় আছে—এখনও আমরা স্থিতিশীলতা দোষ পরিহার করিলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিতে পারি। জাপান যেমন প্রতিবৎসর দলে দলে যুবকবৃন্দকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইতেছে আমরাও যদি প্রতিবৎসর সেইরূপ শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শিখিবার জন্য দলে দলে ভারতীয় যুবকমণ্ডলীকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইতে পারি, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে ভারতের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবে। যে যে গুণে ইউরোপ ও আমেরিকা জগৎকে পরাজিত করিয়াছে, উক্ত যুবকমণ্ডলী দ্বারা আমাদিগের দেশে সেই সকল গুণরাশি আনীত হইবে। উভয় দেশের উৎকর্ষ তারতম্য এইরূপে ক্রমেই কমিতে থাকিবে। যথন এই জাতীয় সংমিশ্রণে এত মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তখন ইহার পথে কণ্টক রোপণ করা স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। ইউরোপ-প্রত্যা-গত যুবকমণ্ডলীকে সমাজচ্যুত করিয়া ভবিষ্য বিলাতগমনের পথে বাধা দেওয়া উচিত নহে। যে কার্য্য ভাল বলিয়া জানি, যে তাহা করিবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে পুনঃ-প্রবেশ করিতে বলা উচিত নহে। মূর্খ লোকের ভয়ে যুক্তি ও শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করা উচিত নহে। শাস্ত্রে জ্ঞানশিক্ষার জন্য দেশান্তরে গমন করা নিষিদ্ধ হয় নাই। বাণিজ্যব্যপদেশে অর্ণবযানে দেশ দেশান্তরে গমনের প্রথাও পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তবে কেন আমরা স্থিতিশীলতার দাস হইয়া সমাজের শীর্ষ-ভূত যুবকমণ্ডলীকে প্রত্যাখ্যাত করিয়া সমাজকে হীনবল করি? সময় আসিয়াছে—যখন উন্নতিশীল হিন্দুসমাজ ইচ্ছা করিলে দলবদ্ধ হইতে পারেন। আধি-পত্য, ধন, সম্পত্তিতে তাঁহারা স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলে স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ অধিক দিন তাঁহাদিগকে চাপিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা দলবদ্ধ হইলে হিন্দুসমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইবে না। তাঁহারা দলবদ্ধ হইলে, তাঁহা-দিগের দ্বারা সমাজের বিশেষ উপকার সাধন হইবে। যে সকল শীর্ষভূত নব্য সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া উন্নতিশীল দলকে হীনবল

করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদিগকে আবার সমাজভুক্ত করিয়া হিন্দুসমাজ বলবৃদ্ধি ও ভারতের ভবিষ্য রাজনৈতিক একতার সূত্রপাত করিতে পারেন।

শতবর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩

গৃহের অবস্থা।

এখন সকল গ্রামেই দেখিতে পাইবে, দুই এক খানি ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা হইয়াছে; চুণকাম করা পাঁচিল খড়ো ঘরের মধ্যে ধপ্ ধপ্ করিতেছে। আর সংকীর্ণ সিঁড়ী নাই, সংকীর্ণ গৃহ নাই; চারিদিকে বড় বড় দোর জানালা বসিয়াছে, সার্সী দিয়া আলো ফুটিয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মকালে ঝিল্‌মিলির ফাঁক দিয়া হু হু শব্দে বাতাস খেলিতেছে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে সকল পল্লীতে কোটা বাড়ী ছিল না, কচিৎ কোথাও এক এক খানি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ দেখা যাইত। দোতলা মাটীর ঘর সে কালের কোটা বাড়ী। এখনও বীরভুম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি অনেক স্থানে সে প্রকার মাটীর কোটার চলন আছে।

পূর্ব্বে লোকের যেরূপ ঘর বাড়ী ছিল, আজি তাহা ভাবিলে আমাদের প্রাণ হাঁপাইতে থাকে। দোরগুলি ছোট ছোট, অনুচ্চ, সংকীর্ণ। মাথা হেঁট করিয়া, শরীর বাঁকাইয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে হইত; অভ্যাস না থাকিলে কপালীর চৌকাটে মাথা ঠুকিয়া যাইত। কোথাও জানালা থাকিত না। জানালার মত যদি কিছু থাকিত, সে তখনকার গবাক্ষ। ছোট ছোট তক্তা পাঁচিলের সঙ্গে দৃঢ়রূপে গাঁথা; তাহাতে গোরুর চক্ষুর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র কাটা। তাহাই সে কালের গবাক্ষ। আলো ও বাতাস খেলিবার জন্য যে কি প্রকার নিরেট পথ রাখা হইত তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। ছোট হউক আর বড় হউক ছিদ্র পাইলেই বায়ুর না গেলে নয়, তাই গবাক্ষ দ্বার দিয়া ঘরে অল্প অল্প বাতাস যাইত। সম্মুখে সূর্য্য ঢলিয়া পড়িলে গৃহমধ্যে একটু একটু আলোও আসিত। অট্টালিকায় উঠিবার সিঁড়ী গুলি ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ ও অনুচ্চ। উপরে চাপদ্বার রাত্রিতে বন্ধ থাকিত। সিঁড়ীর পাশে চোর-কুঠারী। রাত্রিকালে গৃহস্থেরা তাহাতে তৈজস পত্র রাখিতেন। এখন সে কালের অট্টালিকা দেখিলে

জরাসন্ধ রাজার মগধ রাজ্য মনে পড়ে।

সে কালে মনে করিলেই কেহ ভাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতে পারিতেন না। দোতলা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে আগে নবাবের অনুমতি লইতে হইত। নবাবের অনুমতি গ্রহণ—সেত ভগীরথের গঙ্গা আনা, দুই পুরুষে মনস্কামনা সিদ্ধ হইত কি না সন্দেহ। তবে এক সুবিধা এই ছিল, এখনকার আমলাদের মত সে সময়েও নবাব সরকারের কর্ম্মচারীরা সকলের কাছে কিছু কিছু প্রত্যাশা রাখিতেন। তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে কোন হুকুম পাইবার বিলম্ব হইত না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে কালের গৃহগুলি নিরেট ছিল। সে জন্য পাঠকেরা যেন মনে মনে এমন সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিবেন না যে, তখনকার লোকেরা বড় একটা নিশ্বাস প্রশ্বাসের ধার ধারিতেন না, তাঁহারা বায়ু সেবন না করিয়া বাঁচিতে পারিতেন। সে কালের ধনাঢ্য লোকদের গৃহ এক একটী ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল, দুর্গের মত গৃহ নির্ম্মাণ করিবার অনেক প্রয়োজনও ছিল। তখন মোটা ভাত কাপড়ের জন্য কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইত না সত্য, কিন্তু মোটা ভাতে মোটা কাপড়ে সকলে সন্তুষ্ট থাকিত না। ইংরাজ শাসনে অনেক বিষয়ে যেমন আমাদের বাহিরের সুখ সচ্ছন্দতা বাড়িয়াছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমরা পুড়িয়া খাক হইতেছি। আমাদের জীবিকা লাভ দিন দিন অতিশয় কষ্টকর হইতেছে। পূর্ব্বে ইতর লোকদের মধ্যে দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই মাঠে খাটিত। তাহারা লাঙ্গল দিত, ধান্য বুনিত, নিড়াইত, পাকিলে কাটিয়া কৃষকের গৃহে আনিয়া দিত! তাহাতে কাহারও গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট ছিল না। কিন্তু আজ সে বাঙ্গালা নাই। তেমন কুস্তি, তেমন বল, তত আহারশক্তি, একশত বৎসরের মধ্যে সকল ফুরাইয়াছে। আমাদের প্রপিতামহগণ কৈমাছের কাঁটা বাছিয়া খাইতেন না, সে কথা আজ আমাদের কাছে গল্প হইয়াছে। তাঁহারা উদয়াস্তের মধ্যে পাকা চল্লিশ ক্রোশ পথ হাঁটিতে পারিতেন, এখন সে গল্প শুনিলে ভগদত্তের হাতী মনে করি। ইতর লোকদের মধ্যে যাহারা মহা বলবান্ হইয়া উঠিত, তাহারা মাঠে খাটিত না। এক হাঁটু কাদাজলে পড়িয়া পরিশ্রম করা তাহাদের পক্ষে অমর্য্যাদার কথা। মজুরী নাই, বিষয় বিভব নাই; কিন্তু অমর্য্যাদা হয় বলিয়া পোড়া পেট বুঝিবে কেন?—যেমন করিয়া হউক দিন কাটান চাই, সে জন্য তাহারা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিত। সকল গ্রামেই ছোট লোকদের এক একটী ডাকাইতির দল ছিল। ভোরের সময়, দিন দুই প্রহরে এবং সন্ধ্যাবেলায় মাঠের মধ্যে তাহারা পথিকদিগকে ঠেঙ্গাইয়া মারিত। রাত্রিকালে গৃহস্থের বাটীতে পড়িয়া যথা সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইত। তখন ইতর লোকদিগকে

শঙ্কা করিয়া চলিতে হইত, তাহারা কাহাকেও শঙ্কা করিত না। তাহাদের যেমন পরাক্রম সেই রূপ সাহস ছিল। ডাকিয়া হাঁকিয়া, নিমন্ত্রণের পত্র দিয়া তাহারা লোকের ঘরে চুরী করিত। এই সকল পেসাদার দস্যুর ভয়ে সে কালের সম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহ অতিশয় দুর্গম করা হইত।

যাঁহাদের ইষ্টক অট্টালিকা ছিল না, অথচ কিছু কিছু অর্থসংস্থান ছিল, তাঁহারা বড় বড় মৃত্তিকার বাটী নির্ম্মাণ করাইতেন। বাটীর সদর দরজার দুই দিকে দুইটী বসিবার চাতাল; ভিতরে গোয়াল। গোয়াল ঘরের সম্মুখে গোরুর জাব খাইবার সারি সারি গামলা পোতা এক দিকে বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ। সমস্ত চণ্ডীমণ্ডপ প্রায় পশ্চিমদ্বারী কিম্বা দক্ষিণ-দ্বারী। চণ্ডীমণ্ডপের কাঠাম কাষ্ঠে নির্ম্মিত, তাহাতে মকর, মৎস্য, পক্ষী প্রভৃতি নানা রূপ মূর্ত্তি খোদিত। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন লোকেরা ভিতরের ছিটুনী বিচিত্র অভ্র দিয়া মুড়িয়া রাখিতেন। চাল খড়ে ছাওয়া। মটকায় ত্রিপত্র কিম্বা ত্রিশূল লাগান; দেউলের গা খড়ীটী, মসৃণ ও চিক্কণ। চণ্ডীমণ্ডপের দুইপার্শ্বে একচালা। এই চণ্ডীমণ্ডপে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি সকল প্রকার পূজা পার্ব্বণ হইত। অদ্যাপি অনেক স্থানে হয়, হিন্দুরা ইংরাজি পড়িয়া বহুকালের অভ্যাস এখনও ছাড়িতে পারেন নাই। ভিতর বাটীতে রন্ধনশালা ও শয়নগৃহ। তখন টেবেল কেদারা আলমারি ছিল না, বাঙ্গালীর গৃহসজ্জা সামান্য উপকরণেই সারিতে হইত। শয়নগৃহে বাঁশের বৃহৎ আম্‌লা ঝুলিতেছে, তাহাতে ছোট ছোট গেঁটে কড়ী বসান। ঘরের মধ্যে সম্মুখ দেউলে কড়ীর গাছ, কড়ীর লতা পাতা, কড়ীর ঝাড় বুটী। সিন্দুর চুবড়ী কড়ীর, মাথা-ঘসার পাত্র কড়ীর। বাঙ্গালীর গৃহিণীরা কড়ীর কাজে মোটের উপর কতকটা শিল্পনৈপুণ্য দেখাইতেন।

এই গেল বাঙ্গালীর গৃহসজ্জার মহামূল্য আসবাব। ছোট ছোট আসবাবও অনেক ছিল। মাটীর ঘর খড়ে আচ্ছাদিত, সে ঘরে ঝাড় লণ্ঠন শোভা পাইত না। তখন এত ঝাড় লণ্ঠনের চলনও ছিল না। আড় কাটায় সারি সারি দড়ীর শিকা ঝুলিত। সুচিক্কণ সূত্রে এক এক গাছি শিকা পরিস্কার করিয়া বিনান। শিকায় শ্বেত রক্তবর্ণের হাঁড়ী উপর উপর সাজান থাকিত। সোলার পদ্ম, সোলার পাখী, সোলার ঝাড়,—তাহাতে অভ্রের ঝালর ঝল মল করিতেছে। স্থানে২ দেউলের গায়ে আলিপনা দেওয়া। আলিপনাতে লতা পাতা ফুলের ঝাড়। ফুলের ঝাড়ে বসন্তামোদে মাতিয়া ভ্রমর উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে, পাখীরা মাথা হেঁট করিয়া মধু খাইতেছে। তখন কার্পেটের বাঁকা কাজ কেহ বুঝিতেন না। গৃহকর্ম্মের পর আমাদের সতী লক্ষ্মীরা

সরল মনে এই সকল চিত্র দিয়া ঘর সাজাইতেন,কোন কোন থানে কাপড়ের পটও ঝুলাইতেন। চিরদিন হিন্দুদের মনের টান ধর্ম্মের দিকে,—দেউলের গায়ে অনেকে দুর্গানামের শিবমন্দির আঁকিয়া রাখিতেন। কাপড়ের পটেও পুরাণের চিত্র আঁকা থাকিত। কোন থানে রামসীতা সিংহাসনে বসিয়া আছেন; ভাইগতপ্রাণ লক্ষ্মণ কাছে ছত্র ধরিয়া আছেন,শত্রুঘ্ন চামর চুলাইতেছেন। সম্মুখে মহাবীর হনুমান ভূমিতে লুঠাইয়া প্রণাম করিতেছে। কোন থানিতে হিমালয় হইতে গঙ্গার উৎপত্তি আঁকা রহিয়াছে। জল কল কল শব্দে বেগে আসিয়া মর্ত্ত্যে পড়িতেছে, মহাদেব জটা বিছাইয়া দিয়াছেন, আগে আগে ভগীরথ শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া ভাগীরথীকে পথ দেখাইতেছেন। তখন গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিলে কোথাও না কোথাও এক একটী দেবভক্তির অনুষ্ঠান দেখা যাইত। উঠানে তুলসীমণ্ডপ। বৈশাখ মাসে পুণ্যবতী স্ত্রীলোকেরা ঝারা দিয়াছেন, মালসা হইতে টুপ টুপ্ করিয়া জলবিন্দু ঝরিতেছে। লক্ষ্মীপূজা হইয়া গিয়াছে, প্রাঙ্গণে পৈঠার ধাপে ধাপে, ঘরের মেজেতে তাঁহার পাদপদ্ম আঁকা রহিয়াছে। পূর্ব্বের মত বাঙ্গালীর আর তেমন গৃহ নাই, সে মন নাই, তাই তেমন পটও নাই। এখন রামসীতার স্থানে ওয়াটারলুর বৃহৎ চিত্রপট ঝুলিতেছে, পতিতপাবনী গঙ্গার স্থানে গৃহকর্ত্তা আপনার প্রমাণ প্রতিমূর্ত্তি ঝুলাইয়াছেন।

গৃহসজ্জার আরও কিছু লিখিতে থাকিল। বাঙ্গালীরা দ্রব্যসামগ্রী কোথায় রাখিতেন, সে কথা বলা হয় নাই। বেতের পেট্‌রা, বেতের ঝাঁপী তাঁহাদের আলমারী তুরঙ্গের কাজ করিত। সে কালের লোক আয়রন্ চেষ্ট জানিতেন না। তখন চোরের ভয় অতিশয় ছিল, কিন্তু যে সে লোকের ঘরে চুরী করিবার দ্রব্য কিছুই ছিল না। সেজন্য সামান্য বস্ত্রাদি বেতের পেট্‌রাতে থাকিত। পুঁতী পত্র রাখিবার জন্য আধার ছিল। মাথার উপর চালী ঝুলিত। চালী আর কিছুই নয়,—ছোট একখানি চাল। গুবাক কিম্বা তালের কাঠে অতি পরিষ্কাররূপে তাহা নির্ম্মাণ করা। এই চালীর উপর লিখিবার দপ্তর, খাতা ও পুঁথীপত্র থাকিত। সে কালে হিন্দুরা চীনাবাসন জানিতেন না, চীনাবাসনে খাইবার খাদ্যও তখন হিন্দুদের পেট পবিত্র করে নাই। সে কালে সাধারণ গৃহস্থের অল্পই তৈজস পত্র ছিল। রাত্রিকালে তাহা ঘরের মেজেতেই পড়িয়া থাকিত। যাঁহাদের পেতল কাঁসার সামগ্রী অধিক ছিল, তাঁহারা রাত্রিতে চোরের ভয়ে সে সকল দ্রব্য চোর কুঠারীর ভিতর পুরিয়া রাখিতেন।

এই গেল মধ্যবিত্ত লোকের ঘর। ছোট লোকেরা গ্রামের মধ্যস্থলে স্থান পাইত না, এখনও পায় না। তাহারা

গ্রামের প্রান্তভাগে কুটীর বাঁধিয়া বাস করে। যুগের উপর দিয়া যুগ বহিয়া গিয়াছে; কত কুঁড়ী ফুটিল, কত ফুল ফুটিয়া শুকাইয়া গেল, অনেক ছোট জিনিস বড় হইল, কিন্তু হিন্দুদের ছোট জাতি অদ্যাবধি থাকিল, বড় হইতে পারিল না। সৎসহবাসের অভাবই ইহার কারণ। যদি ভদ্রসংসর্গে তাহারা মিশিতে পারিত, তবে এতদিন ভাল শিক্ষা পাইয়া তাহারা ভদ্রলোকের সমান হইত। কিন্তু হাড়ী ডোম চণ্ডাল হিন্দু সমাজের ঘৃণার বস্তু, তাহাদের ছায়া মাড়াইলে স্নান করিতে হয়। বলবানের কাছে দুর্ব্বলে মাথা তুলিতে পারে না, তাই হিন্দুসমাজে ছোট লোকের এ দুর্দ্দশা, তাহাদের ঘরের দুচাল ঘুচিয়া অদ্যাপি চারিচাল হইল না। ঘরের দ্বারে আগড়—কপাট নাই। শয্যার মধ্যে তালের ও খেজুরের চাটা এবং তেলচিটে কাল কাঁথা, ভোজন পাত্র পিতল পাথর।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় দো-চালা ঘরই অধিক ছিল, কেবল হাড়ী ডোমের নয়। অবস্থা একটু সচ্ছল না হইলে চারিচাল বাঁধিয়া কেহ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন না। কাহারও চারিচালের ঘর হইয়াছে শুনিলে লোকে থম্‌থাইয়া দাঁড়াইত। এত জাঁক যে সে লোকের সাধ্য নয়, ভিতরে ভাল রূপ অর্থের রস না হইলে, চারিচাল ঘটিয়া উঠিত না। গ্রামের মধ্যে কাহারও যদি চারিচাল হইল, অমনি দশ জন তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিল, দশ জন তাঁহার কাছে বসিতে লাগিল, লোকের কাছে তাঁহার মান সম্ভ্রম বাড়িল। কিন্তু চারিচাল হইলেও সকলের ঘরে কপাট থাকিত না। কপাট থাকা আরও একটু ভাগ্যের লক্ষণ। সামান্য গৃহস্থের ঘর চারিচালা হইলেও আগড়ে বন্ধন করা থাকিত। এখন আমরা গোয়াল ঘরে আগড় দেখিতে পাই, তাই আগড়ের নাম শুনিলে গোয়াল ঘর মনে পড়ে। কিন্তু তখনকার আগড় এরূপ ছিল না; সমস্ত রাত্রি কুঠারাঘাত করিলেও সে আগড় কাটিতে পারা যাইত না। যাঁহাদের ঘরে দোর হইত, সে সকল লোক তৎকালের বিশেষ ধনী? কিন্তু সে দোরে আর এখনকার দোরে অনেক প্রভেদ। আমরা হাঁসকল ডুম্নি ও কবজায় দোর আঁটিয়া রাখি, পূর্ব্বে এ সকল লৌহের কাজ দ্বারে থাকিত না। কুমীরে কলের উপর দোর ফিরিত ঘুরিত। যাঁহারা এ প্রকার দোর দেখেন নাই, কুমীরে কলের নাম শুনিয়া হয় ত তাঁহারা কি একটা ভারী কাণ্ড বুঝিয়া রাখিলেন। কুমীরে কল আর কিছুই নয়,—চৌকাটের নিম্নে ও উপরের মাটীতে গর্ত্ত কাটা দুইখণ্ড কাঠ বসান, দুয়ারের তক্তায় দুইটী হুল থাকিত, সেই হুল ঐ কাঠের গর্ত্তে লাগাইলে দোর ঘুরিয়া বেড়াইত। এ প্রকার দোর এখনও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে।

লক্ষ্মীদেবী যে দিকে যাইতে একটু বিলম্ব করিতেছেন, সেই সেই স্থানে এখনও কুমীরে কলের উপর দোর ঘুরিতেছে।

যে কালে দোর বন্ধ করিবার জন্য হুক, খিল কিম্বা ছিট্‌কিনি ছিল না। আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহগণ লৌহবারও চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহারা বাঁশের হুড়কো দিয়া দ্বার বন্ধ করিতেন। দ্বারের দক্ষিণ ও বামভাগে দেউলের গায়ে দুইটী গর্ত্ত কাটা, সেই গর্ত্তে হুড়কা লাগান থাকিত। দাওয়া হইতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে সম্মুখে গড়খাই। এই গভীর গর্ত্তটী চৌকাঠের নিম্নে করা হইত। গড়খাই রাখিবার তাৎপর্য্য এই, চোর পড়িলে গৃহস্থেরা তন্মধ্যে একখণ্ড মোটা কাঠ ফেলিয়া দিতেন, তাহাতে সহসা দোর খোলা যাইত না। সে জন্য ডাকাইতরা বড় বড় ঢেঁকী দিয়া দ্বারের উপর আঘাত করিত, সুতরাং সামান্য কপাট আর কতক্ষণ টিকিবে?—শীঘ্রই চূর্ণ হইয়া যাইত।

এখনকার এ বাঙ্গালা আর পূর্ব্বমত নাই। অনেক পল্লীগ্রাম রাজপ্রাসাদ মত অট্টালিকায় সুসজ্জিত হইয়াছে। দোর জানালায় ঝিলমিলি সার্সী পেনালার কাজ, ঘরে আসবাব নূতন প্রকারের হইয়াছে, কাঠে কাগজে আর কাচের দ্রব্যে বাটী ভরিয়া গিয়াছে। বাটীর ভিতরেই রন্ধনশালার পাশে পাইখানা বসিয়া অট্টালিকার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। গৃহস্থের কত সুখ! আর এখন মল মূত্র ত্যাগ করিবার জন্য মাঠে কি বাগানে ছুটিতে হয় না, এ সকল কাজ বিনা পরিশ্রমে বাড়ী বসিয়াই চলিতেছে। কলিকাতায় প্রথম পাইখানার সৃষ্টি হইলে পল্লীগ্রামের লোকেরা ঘরে থাকিয়া তাহার গল্প শুনিতে পাইতেন। সহরে লোকেরা রাত্রিদিন নাকে কাপড় ঢাকা দিয়া বেড়ায়, এই জন্যেই সশরীরে প্রত্যক্ষ নরক ভোগ আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে পাড়াগাঁয়ের মজলিসে এই সকল তামাসার কথা উঠিত আর হাসির ধমকে চণ্ডীমণ্ডপ ফাটিয়া পড়িত।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রীস্বাধীনতা ও শিক্ষা।

প্রথম প্রস্তাব।

"Never will peace and human nature meet
Till free and equal man and woman greet."

প্রকৃতি যেমন ঈশ্বর-ধর্ম্মের, উপকারিতা যেমন নীতি-ধর্ম্মের, স্বাধীনতা সেইরূপ সমাজ-ধর্ম্মের মূল-গ্রন্থি, মতবৈষম্যের কারণ এবং বিবাদের রঙ্গস্থল।

ঈশ্বর সম্বন্ধে যতই তর্ক করুন না কেন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করুন না কেন, এই সুদীর্ঘ তর্কমার্গ অবশেষে প্রকৃতিতে আসিয়া শেষ হইবে—প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া যাইবার আর ক্ষমতা নাই। প্রকৃতিই তত্ত্বমার্গের শেষ সীমা। স্থূল প্রকৃতিতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে গিয়া তর্কের গতি প্রতিরুদ্ধ হইল, আর চলিবার সাধ্য নাই। কিন্তু তার্কিকেরা কখন থামেন না। এই প্রকৃতিক্ষেত্রে দ্বিবিধ তার্কিকদল পরিদৃষ্ট হন। উভয়ই সত্যসন্ধিৎসু, উভয়ই প্রকৃতি অতিক্রম করিবার উদ্যম করিলেন। উদ্যমের ফল কি হইল? এক দল বলিলেন—না; প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া যাইবার মানবের শক্তি নাই, আমাদের অনুসন্ধান প্রকৃতিতেই শেষ হইল। তবে আমরা জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলাম, যখন প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলাম না, তখন প্রকৃতিই জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম; অপর দল একটু প্রকৃতির অনুসারী হইয়া বলিল, প্রকৃতি মূল কারণ বটে, কিন্তু যখন প্রতি কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের ফল মাত্র, তখন প্রকৃতি মূল কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইলেও ঐ কারণের প্রকৃতি অতীত কোন অজ্ঞাত কারণ আছে অনুমান হয় এবং ঐ অজ্ঞাত কারণই ঈশ্বর। এ স্থলে দেখুন প্রকৃতিই বিবাদের রঙ্গ-ভূমি। প্রকৃতি-রহস্য বুঝিতে পারিলেই বিবাদ মিটিয়া যায়। আবার, নীতি-ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন উপকারিতা বা আবশ্যকতা লইয়া সামাজিক সদসতের বিচার হইতেছে। এক সম্প্রদায় বলেন, যাহা সমাজের কল্যাণকর ও উপকারী তাহাই সৎ, যাহা দ্বারা অধিকাংশ লোকের সুখ স্বচ্ছন্দ সংসাধিত হয় তাহাই ভাল, তাহাই সুনীতি; নতুবা ভাল মন্দে কিছু প্রভেদ নাই, কেবল সংজ্ঞাভেদ মাত্র। অপর সম্প্রদায় বলেন—না, তাহা নয়, উপকারিতা ভাল মন্দ নির্ব্বাচক হইতে পারে না, সদসৎ নির্ণয়ের কষ্টি প্রস্তর হইতে পারে না, যাহা ভাল তাহাই ভাল। যাহা ঈশ্বর-অভিপ্রেত তাহাই ভাল, যাহা অভিপ্রেত নয় তাহাই মন্দ। ভালর উপকারিতা আছে, মন্দের নাই এই মাত্র। এস্থলে দেখুন উপকারিতা লইয়া সদসতের সাব্যস্ত হইল—নীতি-ধর্ম্মের মীমাংসা হইল। তেমনি স্বাধীনতা লইয়া সমাজ-ধর্ম্মের সদসৎ, উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা প্রভৃতির বিচার হয়। রাজ-তন্ত্র, ধর্ম্মতন্ত্র ও ব্যবহার-তন্ত্র লইয়া মানবের সমস্ত কার্য্য। এই তিনটী লইয়া সমাজ-গঠন। সূক্ষ্ম বিবেচনায় বুঝা যায় যে সমাজই মানবের সর্ব্বস্ব—কার্য্যভূমি। ঈশ্বরজ্ঞান দার্শনিক জ্ঞান বটে কিন্তু ঈশ্বর-ধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম। নীতি—সেও সমাজভুক্ত। ধর্ম্ম-চর্য্যা, নীতি-চর্য্যা সকলই সামাজিক কার্য্য বই আর কিছুই নয়। রাজতন্ত্র

সম্বন্ধে দেখুন এক সম্প্রদায় বলিতেছে রাজা ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তি—এমত ব্যক্তির অধীন থাকা প্রজার পক্ষে কল্যাণকর, উচিত ও উপযোগী। অপর সম্প্রদায় বলিতেছে রাজার অধীনতা স্বীকার করিব কেন? রাজা কে? মনুষ্য সকলই সমান, আমরাই রাজা—আমাদের মনোনীত ব্যক্তি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ধর্ম্মতন্ত্রে দেখুন এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে আদেশ করিতেছে যে তোমরা আমাদের কৃত ধর্ম্মব্যবস্থা গুলি মান্য করিয়া চলিবে—আদেশ প্রতি পালন করিতে হইবে। অপর সম্প্রদায় বলিতেছে তাহা নয়, আমরা তোমাদের শাসন অধীনতা স্বীকার করিব না। আমাদের বিবেক যাহা আদেশ করিবে, স্বাধীন চিন্তায় যাহা স্থির হইবে, জ্ঞান ও যুক্তি যাহা নির্দ্দেশ করিবে, তাহাই আচরণ করিব। আবার, সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, সেখানেও ঐ ভাব বর্ত্তমান দেখিবেন। রাজা প্রজা, জমিদার রাইয়ত, ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, পুরুষ স্ত্রী, সকলেরই পরস্পর সম্বন্ধের মূল—স্বাধীনতা। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল স্বাধীনতা, ধর্ম্মনৈতিক ব্যবস্থার গ্রন্থি স্বাধীনতা, সমাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্বাধীনতা। মানবের পরস্পর সম্বন্ধ ঐ স্বাধীনতা লইয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। মানবের সমস্ত সম্বন্ধের, সমস্ত কার্য্যের মূলে স্বাধীনতার ভাব বিদ্যমান। ঐ স্বাধীনতা লইয়া মতভেদ, বিচার ও বিবাদ। স্বাধীনতা এমন বাঞ্ছিত স্বত্ব যে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সহজে দিতে চাহে না। উভয়ই স্বাধীনতাপ্রিয়, উভয়ই তল্লাভের জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করে। এজন্য উভয়ের মধ্যে এত বিবাদ। এক সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত অধিকতর ক্ষমতা আছে, অর্থ-বল আছে, বাহুবল আছে, সাধারণের মান্য স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বল আছে, এজন্য তাহারা আপন পদ রাখিবার, নিজের স্বাধীনতা রাখিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করে। অপর সম্প্রদায়ের তাদৃশ বল নাই—তাহারা অপেক্ষাকৃত হীনবল, অথচ স্বাধীনতাপ্রয়াসী। একারণ স্বাধীনতা লাভের জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করে; কিন্তু হীনবল বিধায় তাহা না পাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ হয়। এক দল বল সহকারে অপর দলকে অধীনস্থ রাখিতে চায়। অপর দল তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার বিরোধী হইয়া উঠে, সমাজে অহরহ বিবাদ হয়। এক জন পুরুষ অপর জনকে পীড়ন করে—রাজা প্রজাকে পীড়ন করে, সেও স্বাধীনতা লইয়া। একের বলাধিক্য হেতু স্বাধীনতা অধিক, অপরের হীনবলত্ব হেতু স্বাধীনতা অল্প। উভয়ের মধ্যে স্বাধীনতার অপব্যবহার হইয়াছে, এজন্য এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে পীড়ন করে। আবার দেখুন একজন স্ত্রী অপর স্ত্রী অপেক্ষা দৈব বা অন্য কোন কারণ কর্তৃক

উচ্চ হইয়াছে এজন্য একজন বড়, অপর জন ছোট; এক জন রাজরাণী, অপর জন দাসী; এক জন অপর জনের উপর কর্ত্তৃত্ব করে; একজন অপর জনের উপর নির্ভর করে; উভয় স্ত্রীর সকল বিষয়ে সমান স্বাধীনতা থাকিলে এক স্ত্রী অপরের পরাধীনা হইত না। স্বাধীনতার অপব্যবহারই এই বিভিন্নতার মূল। আরও দেখুন, পুরুষ স্ত্রীর অধীন ও স্ত্রী পুরুষের অধীন। পুরুষ স্ত্রীর অধীন এ ঘটনাটী যদিও অল্প, তত্রাচ স্ত্রীর নিকট পুরুষের অধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি ভাগ্যবতী স্ত্রীর বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাতঃস্মরণীয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বহুসংখ্যক পুরুষের উপর রাজত্ব করিতেছেন। এক সময়ে এলিজাবেথ মহা দক্ষতার সহিত পুরুষের উপর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডে কেন, আমাদের ভারতে দৃষ্টিপাত করুন, অহল্যাবাই, তারাবাই, ঝান্সির মহারাণী প্রভৃতি সুচারুরূপে রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও মহারাণী শরৎ সুন্দরী, স্বর্ণময়ী প্রভৃতি অনেক পুরুষের উপর আধিপত্য করিতেছেন। এই সকল স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা তাহাদিগের অধীনস্থ পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিকতর স্বীকার করিতে হইবে। এস্থলে স্ত্রী যেন পুরুষের স্বামী হইয়া রহিয়াছে। পক্ষান্তরে দেখিতে পাওয়া যায় স্ত্রী পুরুষের অধীন হইয়া রহিয়াছে, পুরুষ স্ত্রীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। এই রূপে দেখা যায় একের স্বাধীনতা অপরের অধীনতার উপর এবং একের রাজ্য অপরের উপর স্থাপিত। কোন কারণ বশতঃ একের ক্ষমতা অধিকতর হওয়াতে সে অপরের উপর ঐ ক্ষমতা চালাইতেছে। আপনি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন থাকিবার জন্য অপরের স্বাধীনতা অপহরণ করিতেছে, অপরকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতেছে—নিজের কর্ম্মোপযোগী করিতেছে। অতএব দেখুন স্বাধীনতা সমাজের সমস্ত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেছে—ছোট বড় স্থাপন করিতেছে। স্বাধীনতাই এই সামাজিক বিভিন্নতার মূল। স্বাধীনতার উপর সমাজ বিন্যস্ত রহিয়াছে। যিনি অধিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন তিনি বড়, যিনি অল্প ভোগ করিতেছেন তিনি ছোট। উচ্চ নীচ এই স্বাধীনতার পরিমাণের অল্পাধিক্য হেতু। পুরুষ স্বাধীনতা অধিক লাভ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তিনি বড়, স্ত্রী তাহা অল্প পরিমাণে উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছে বলিয়া ছোট। এই কারণে স্বাধীন পুরুষ পরাধীনা স্ত্রীর উপর আধিপত্য করে, পুরুষ স্ত্রীলোকের স্বামী—প্রভু। স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির অধীন দাসী। আবার দেখুন, নেপালের রাজা স্বাধীন, পারস্যরাজ স্বাধীন, চীনরাজ স্বাধীন; কিন্তু জয়পুররাজ স্বাধীন নহেন, গোয়ালিয়ারের রাজা স্বাধীন নাহেন। এক জনকে

স্বাধীন বলিতেছি, অপরকে বা বলিতেছি না কেন? ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেই ইংরাজ রাজা, উভয় স্থলেই ইংরাজ স্বাধীন রাজা; কিন্তু ভারত-রাজত্বে যে অল্পপরিমাণ যথেচ্ছাচারিতা আছে, ইংলণ্ডে কি তাহা আছে? জয়পুররাজ স্বাধীন নহেন, ইংরাজ স্বাধীন। স্বাধীনতা এই দুই রাজাকে প্রভেদ করিয়া দিয়াছে। আবার সেই স্বাধীনতা ইংলণ্ড এবং ভারত রাজ্যকেও প্রভেদ করিয়াছে।

এইরূপে দেখা যায় সমাজের সমস্ত সম্বন্ধ স্বাধীনতা লইয়া। স্বাধীনতা সমাজের মানদণ্ড। স্বাধীনতা সামাজিক পক্ষপাতিত্বের ও মতভেদের কারণ। স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধনির্ণয়ও স্বাধীনতা-নিবন্ধন। এক সম্প্রদায় বলিল পুরুষ জাতি কেবল স্বাধীন থাকিবে, স্ত্রীজাতি তাহার অধীনা হইবে। স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপযুক্ত নয়, তাহার স্বাতন্ত্র্য কল্যাণকর নয়, এজন্য এদেশস্থ অন্তঃপুরপ্রথা অত্যুৎকৃষ্ট এবং এজন্য বালিকাবিবাহ প্রচলন বিধবা-বিবাহ নিবারণ সঙ্গত ও কল্যাণকর। অপর সম্প্রদায় বলেন যে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি, উভয়েরই সমান অধিকার। ইহা প্রকৃতি বা ঈশ্বর অভিপ্রেত। অতএব স্ত্রী পুরুষাধীন থাকা উচিত নয়। তাহার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত ও কল্যাণকর। স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিলেই সমস্ত অমঙ্গল ও অপব্যবহারের সংস্কার হয়। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলন ও বিধবা-বিবাহ নিবারণ প্রভৃতি নানা কুপ্রথা ও কু-নীতি, স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দান করিলে, আলোকপ্রবিষ্ট অন্ধকারের ন্যায়, অচিরাৎ দূর হইয়া যাইবে। কারণ, স্বাধীনতা পাইলে তাহারা মনোমত বিবাহাদি করিবে, আপনার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। সমাজসংস্কারের জন্য আর পুরুষের বৃথা মৌখিক কোলাহল আবশ্যক নাই। এক সম্প্রদায় স্বাধীনতা-বাদী, অপর সম্প্রদায় স্বাধীনতা-প্রতিবাদী। স্বাধীনতা-বাদী বলেন যে স্ত্রী-জাতিকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দেও, তাহা হইলেই তাহারা পুরুষের ন্যায় সামাজিক অধিকার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত হইবে এবং সংসার সুশৃঙ্খলায় চলিবে। স্বাধীনতা-প্রতিবাদী বলেন যে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, শিক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের একটী উপসম্প্রদায় আছে, তাহারা বলে যে শিক্ষা দেওয়া উচিত বটে, কিন্তু স্বাধীনতা দেওয়া কদাচ উচিত নয়। এই প্রস্তাবে স্ত্রী-জাতিকে শিক্ষা দিলে তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত কি না, শিক্ষার সঙ্গে অধীনতার অর্থাৎ পরাধীনতার সামঞ্জস্য আছে কি না, আমরা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিব। এজন্য নিম্নলিখিত অংশে বিষয়টীকে বিভাগ করিলাম।—

১। স্বাধীনতা কি?

২। শিক্ষা কি?

৩। শিক্ষা দিলে মনে স্বাধীনতার ভাব উদয় হইবে কি না?

৪। যদি স্বাধীনতার ভাব উদয় হয়, তাহা হইলে মন স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিবে কি না?

৫। যদি শিক্ষা দিলে পুরুষজাতি স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা করে, তাহা হইলে স্ত্রীজাতিও শিক্ষা পাইলে চেষ্টা করিবে কি না?

৬। যদি শিক্ষিত পুরুষ স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টা করায় তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত হয়, তাহা হইলে শিক্ষিতা স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত কি না?

১। স্বাধীনতা কি? স্বাধীনতা কাহাকে বলে? তাহার লক্ষণ কি? সকলেই জানেন যে স্ব-অধীনতা স্বাধীনতা অর্থাৎ আপনি আপনার অধীন থাকার নাম স্বাধীনতা। আপনি আপনারই অধীন থাকিব, অপরের অধীন থাকিব না, অর্থাৎ আপনি আপনার বিবেচনার অধীন হইয়া কার্য্য করিব, অপরের বিবেচনার অধীন হইয়া থাকিব না, এই ভাবটী স্বাধীনতার ভাব। কিন্তু ইহাতে স্বাধীনতার ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে ত পারিলাম না। তবে স্বাধীনতার অর্থ কি? আপনি যাহা সৎ বলিয়া বিবেচনা করিব, আপনি যাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিব, আপনি যাহা আপনার কল্যাণকর বলিয়া বিবেচনা করিব, তাহা অবাধে সংসাধন করিতে পারিব, অন্য কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, এমন ভাবের নাম স্বাধীনতা। মনে করুন, আমি বিবেচনা করিলাম, যে বিধবা-বিবাহ দেওয়া একটী যুক্তিসিদ্ধ ও মঙ্গলকর সদনুষ্ঠান। যদি এমন বিবেচনা করিয়া বিধবা-বিবাহ দিতে পারি, তবেই বলিব আমার স্বাধীনতা আছে, কেন না আপনার বিবেচনানুরূপ কার্য্য করিতে পারিলাম; নতুবা নাই। যদি না দিতে পারি, তবে মনে করিলাম যে আমি দেশাচার বা কোন কিছুর অধীন, ঈপ্সিত কার্য্যানুষ্ঠানে আমার ক্ষমতা নাই, এজন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিব, অন্যে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না! এ বিষম কথা! কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে বুঝা যায়, যে প্রথমতঃ এটী বাতুলের ইচ্ছা নয়, এটী বিবেচনাধীন এবং যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছা। দ্বিতীয়তঃ আমি সভ্য সমাজভুক্ত, এজন্য একক থাকি না; সমাজমধ্যে বাস করি, এজন্য অপরের সহিত সম্বন্ধ আছে। এরূপ সম্বন্ধ থাকিলে কখন অযথা ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারা যায় না। সামাজিক বাধাবাধকতা, নির্ভরতা ও দায়িত্ব আছে। এজন্য সমাজের অন্য লোকের অনিষ্টাচরণ করিতে পারিব না, করিলে আপনার ক্ষতি হইবে। এজন্য আমি অন্যের ক্ষতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য। ইচ্ছামত কার্য্য করিতে

পারিব, কিন্তু অন্যের ক্ষতি করিতে পারিব না। আমি ইচ্ছা অনুযায়ী সকল কার্য্যই করিতে পারিব, কতক্ষণ পারিব? যতক্ষণ আমার কার্য্য অপরের ক্ষতিকর না হয়—ক্ষতিকর হইলে পারিব না। আমি যদৃচ্ছাক্রমে কার্য্য করিলাম, কিন্তু তাহাতে অপরের ক্ষতি হইল—সমাজের হানি হইল বা হইবার সম্ভাবনা রহিল, এমন কার্য্য স্বাধীনতার কার্য্য নয়। সেটী স্বাধীনতার অপব্যবহার বা স্বেচ্ছাচারিতা। আপনার অধীন আপনি, অন্য কাহারও অধীন থাকিব না অথচ আমার কার্য্য অন্যের অনিষ্টকর হইবে না, এমন ক্ষমতার নাম স্বাধীনতা।

আপনি আপনার অধীন থাকিব সে কি কথা? আপনি অর্থ আমি, স্বয়ং। আমি আমার অধীন সে কিরূপ? আমি স্বয়ং যুক্তি দ্বারা আপনার কল্যাণকর যে কোন নিয়ম, পদ্ধতি ও ব্যবস্থা করিব তাহার অধীন থাকিব মাত্র। যে নিয়মে আমার সম্মতি নাই, যে পদ্ধতি স্থাপনার সময় আমার কোন সম্মতি লওয়া হয় নাই, যে ব্যবস্থা আমার সম্মতি ব্যতীত হইয়াছে, তাহার অধীন থাকিব না, তন্নিয়মাধীন থাকিলে আমার স্বাধীনতা কই? আমি তাহা হইলে অপরকৃত নিয়মের পরবশ হইয়া পড়িলাম। আমি স্বতন্ত্র, তুমি স্বতন্ত্র, আমি ব্যতীত অন্য সকল লোক "অপর" পদবাচ্য। যদি নিয়ম স্থাপনার সময় অপর লোক আমার সম্মতি লয়েন তাহা হইলে কি হয়? অপর লোক যদি সম্মতি লয়, তাহা হইলে অপর ত অপর রহিল না, সেত আপন হইয়া গেল—সেত আমিই হইয়া গেলাম, কেন না এ সম্বন্ধে আমার আমিত্ব অর্থাৎ পার্থক্য থাকিল না। কেবল সম্মতি লওয়া বৈত নয়, যদি সেই সম্মতিই অপরকে দিলাম, তাহা হইলে অপর ত আমিত্ব প্রাপ্ত হইল? এক্ষণে বুঝা গেল, যে যদিও আমি ও অপর স্বতন্ত্র বটে, সে স্বাতন্ত্র্য কেবল দৈহিক মাত্র। উভয়ের মত যখন এক হইল, তখন বলিতে হইবে, মত সম্বন্ধে উভয়ই এক—পৃথক হইয়াও এক। যে হেতু চিন্তা এক, উদ্দেশ্য এক, কার্য্য এক, অনুভূতি এক, স্বার্থ এক, সকলি একীভূত—কেবল দেহ মাত্র পৃথক। এই একত্ব বিধায় কোটী কোটী লোক যুটিয়া একটী সম্প্রদায় হয়। কি বৃহদাকার একত্ব!

ধর্ম্মসম্প্রদায়কে একটী বলি কেন? সেত একটী লোক সমন্বিত নয়? মত এক, কার্য্য এক বলিয়া সংখ্যাতীত লোককেও একটী বলি। রাজনৈতিক সম্প্রদায়, দার্শনিক সম্প্রদায়, তাহারাও সহস্র সহস্র লোক হইলেও এক একটী পৃথক থাক হইয়াছে—বহুসংখ্যক লোক এক একটী একত্ব সাধন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেন নাই? তাহাদের মত এক, উদ্দেশ্য এক, কার্য্য এক বলিয়া। ইহাতে বুঝা

যায়, যে শারীরিক বিভিন্নতা থাকিলেও যে অপরের সহিত একত্রীভূত হওয়া যায় না এমন নয়। লোকের মত, উদ্দেশ্য ও কার্য্যের ঐক্য বা একতা থাকিলেই তৎসমুদয় লোককে এ সম্বন্ধে একটী বলিব। তখন আপনার আপনত্ব ও অপরের অপরত্ব উভয়ই এক হইবে—আমি তুমি হইব—তুমি আমি হইবে—আপন পর জ্ঞান রহিবে না। তুমি কোন একটী নিয়ম করিলে, আমি স্বেচ্ছাক্রমে তাহাতে সম্মতি দিলাম, যোগ দিলাম, তোমার মত ও আমার মত একীভূত হইল—মিশিয়া গেল। তখন তোমাতে আমাতে পৃথক রহিল কই? আমার ও তোমার একই হইল, তোমার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, আমার অভীষ্ট নিয়ম ত একই হইল? তবে তুমি প্রবর্ত্তনা করিয়াছ, আমি কেবল তাহাতে যোগ দিয়াছি। তুমি অগ্রগামী হইয়া নিয়মাদির প্রস্তাবনা করিয়াছ, আমি পারি নাই কিন্তু আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছি। আমার এই সম্পূর্ণ অনুমোদন করাতে ঐ নিয়ম প্রবর্ত্তনাতে তোমার যেরূপ মত দেওয়া হইয়াছে আমারও ঠিক সেই পরিমাণে মত দেওয়া হইল। তবে তুমি প্রবর্ত্তক, আমি তদনুগামী; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই। ফলে তোমাতে আমাতে সম্বন্ধে আর পৃথক ভাব নাই। তুমি আমি একই ব্যক্তি হইলাম। তোমাতে আমাতে পৃথক ছিলাম কিন্তু একমত হেতু তোমাতে আমাতে একই ব্যক্তি হইলাম।

বিশ্ব-প্রেমিকের মনেও এই অপৃথক, এই একীভূত ভাব। মানব প্রথমে আপনাকে ভাল বাসেন। এটী প্রাকৃতিক নিয়ম! পরে পিতামাতা, পুত্রকন্যা, স্ত্রীপরিবার বন্ধু প্রভৃতিকে ভাল বাসেন। পরে সেই স্নেহের ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে প্রতিবাসী, গ্রাম্য ও স্বদেশস্থ লোককে ভাল বাসেন। ঐ উদারভাব ক্রমে বিস্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার উদারতা আর স্বদেশে আবদ্ধ থাকে না, বন্ধুর ন্যায় এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থান যুড়িয়া যায়, তখন আর জন্মভূমি স্বদেশ মনে থাকে না—নিখিল সংসারকে জন্মভূমি জ্ঞান হয়। আমার মন যখন এইরূপ প্রশস্ত হয় তখন আমি সমস্ত মানবজাতির দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হই। দূরস্থ তুর্কে যুদ্ধ হইল, আমার মন কাঁপিল, আমেরিকায় দুর্ভিক্ষ হইল মন কাঁদিল। মন বিশ্বময় হইল। আমি বিশ্বে মিশিয়া গেলাম—সমুদ্রে শিশির বিন্দুর ন্যায় মিশিয়া গেলাম!

ধর্ম্ম! ধর্ম্মেও এই একীভূত ভাব। আমি ও তুমি স্বতন্ত্র ব্যক্তি, ঈশ্বর ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র, সাধারণ লোকের এই জ্ঞান, সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির এই ভাব। মন প্রশস্ত হইল, আমার স্বাতন্ত্র্য রহিল না, আমার আমিত্ব গেল, আমার আমিত্ব তোমার তুমিত্বে মিশিয়া গেল। প্রকৃতি স্বতন্ত্র রহিল না, প্রকৃতি ঈশ্বরে মিশিয়া গেল। আবার, আমার আমিত্ব ও তোমার তুমিত্ব ঐ প্রকৃতি ঈশ্বরে মিশিয়া গেল,

জীবব্রহ্ম এক হইল। সকলেই একাকার বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইল—বিশ্ব সংসার একত্ব প্রাপ্ত হইল—প্রভেদ জ্ঞান রহিল না।

প্রণয়! প্রণয়েও ঐ একীভূত ভাব। সরলা বালা পৃথকাঙ্গী। পুরুষও পৃথকাঙ্গ। উভয়ই পরিণয় সূত্রে গ্রথিত হইল—মনে মনে মিলিল—প্রণয় জন্মিল। দুইজনের এক মন, এক চিন্তা, এক জ্ঞান, সকলই এক। উভয় উভয়ে মিশিয়া গেল। দুগ্ধ শর্করা মিলিয়া যেমন সুমিষ্ট ক্ষীর প্রস্তুত হয়, স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া তেমনি একটী মনোহর মূর্ত্তি হইল—উভয়ই এক হইল।

সম্পাদক! তুমি এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তবে কেন প্রবন্ধে "আমরা" এ কথা ব্যবহার কর? কেন একবচন ব্যবহার না করিয়া সাম্যসূচক বহুবচন ব্যবহার কর? তুমিও কি তোমার স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ কর না? দেখিতেছি তুমিও সাধারণের সঙ্গে মিশিয়া যাও। কেন যাও? জন সাধারণের মনের সঙ্গে, চিন্তার সঙ্গে, উদ্দেশ্যের সঙ্গে তোমার মন, চিন্তা ও উদ্দেশ্য মিশাইয়া ফেল—তোমাতে ও সাধারণে অভেদাত্মা মনে কর। কেন কর? তোমার ও জন সাধারণের সুখ একই মনে কর বলিয়া।

আমি যখন সমস্ত বিশ্বকে আপন ভাবিলাম, আমি ও বিশ্ব পৃথক ভাবিলাম না, তখন মনে করিলাম যে আমি বিশ্ব জুড়িয়া রহিয়াছি—আমার শরীরটী যেন প্রকাণ্ড বিশ্ব স্বরূপ। শরীরের অতিশেষভাগে—নখরে—সূ'চ বিদ্ধ করিলে যেমন সমস্ত শরীর যাতনা বোধ করে, তেমনি পৃথিবীর অতি প্রান্তে কোন দুর্ঘটনা হইলে বিশ্বপ্রেমিকের মনে কষ্ট ও দুঃখ হয়—হৃদয়তন্ত্রী যেন কাঁপিয়া উঠে। বস্তুতঃ বিশ্বে একীভূত হওয়ার এই ধর্ম্ম, এই লক্ষণ। আমরা বলি অপরের সঙ্গে এইরূপ একীভূত হইলে আর আপন পর প্রভেদ জ্ঞান থাকে না—তখন আপনি অপর এবং অপর আপনি হওয়া যায়।

স্বাধীনতার ভাবও ঠিক সেইরূপ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্ব-অধীনতা স্বাধীনতা। আপনি আপনার অধীন এই ভাবের নাম স্বাধীনতা। আমি আপনি, তুমি অপর। আমি তোমার অধীনতা স্বীকার করিলে তুমি আমাকে পরাধীন বলিবে। কখন বলিবে? যখন তোমাতে আমাতে পৃথক ভাব—স্বতন্ত্র জ্ঞান আছে। কিন্তু যখন আমাতে তোমাতে পৃথক ভাব, স্বতন্ত্র জ্ঞান নাই, তখন আমি অপরের অধীন এ ভাব কেমনে আসিবে? সে ত আপনার অধীনত্বে থাকা হইল। তখন ত আমি আপনার অধীন থাকিলাম? তখন ত আপনি আপনার অধীন মনে করিলাম? তখন ত পরের অধীন থাকিয়াও স্বাধীন হইলাম, কেন না তখন আত্ম পর প্রভেদ-জ্ঞান ত আর রহিল না? যখন প্রভেদ-জ্ঞান রহিল না তখন কাহার অধীন রহিলাম? তখন ত আপনারই অধীন রহিলাম?

ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে অপরের সঙ্গে মিশাইয়া গেলে যদি স্বাধীন হওয়া যায়, তাহা হইলে স্ত্রীজাতি ত স্বাধীনা—বঙ্গবামা ত স্বাধীনা, কেননা তাঁহার অস্তিত্ব পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা বলি স্বাধীনা নয়, যেহেতু স্ত্রীপুরুষ মিশ্রণে উভয়ের সমান পরিমাণ নাই। পরিণয়ে স্ত্রীর অস্তিত্ব পুরুষে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—স্ত্রীর সামাজিক অস্তিত্ব নাই। কেননা সকল সামাজিক অধিকার ও স্বত্ব পুরুষেরই—পুরুষ সত্ত্বে স্ত্রীর কোন অধিকার নাই। যদি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সমাজে সমান অধিকার থাকিয়া সমান পরিমাণে যোগ হইয়া একীভূত হইত, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম যে স্ত্রী স্বাধীনা।

বোধ হয় আর একটী উদাহরণের দ্বারা স্বাধীনতার ঐ ভাবটী বিবৃত হইলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। মনে করুন, বঙ্গবাসিগণ একটী ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করিলেন। সমস্ত বঙ্গবাসী সামান্য কৃষক হইতে জমীদার পর্য্যন্ত সকলেরই সভ্য মনোনীত করিবার অধিকার রহিল। প্রত্যেক জেলা হইতে এক বা তদধিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ব্বাচন করিবার অধিকার থাকায়, সকলে তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ সভ্য মনোনীত করিলেন। সমস্ত বঙ্গবাসীর মত ঐ সভাতে প্রকাশ করিবার অধিকার রহিল—সকল সভ্যের সমান অধিকার রহিল—সমস্ত অধিবাসী প্রতিনিধি প্রমুখাৎ আবেদন করিল। সভায় একটী ঔচিত্য অনৌচিত্য বিষয়ক ব্যবস্থার প্রস্তাবনা হইল। সমস্ত বঙ্গবাসী স্ব স্ব প্রতিনিধি দ্বারা বক্তব্য জানাইলেন—ব্যবস্থা ধার্য্য হইল। এস্থলে আমরা বলিব যে বঙ্গবাসীর ঐ ব্যবস্থা স্থাপনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কেননা তাহাদের মতামত লওয়া হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে বঙ্গবাসী আপনি আপনার অধীন রহিল—বঙ্গবাসী তখন স্বাধীন। বঙ্গবাসী কোটী লোক হইয়াও যেন এক ব্যক্তি হইল—বিভিন্ন হইয়াও এক হইল। সামাজিক যোগ দ্বারা একত্ব প্রাপ্ত হইল। যদি এমন হয় যে কোন জাতি বিশেষের মত লওয়া হয় নাই—তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার ও ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে ঐ ব্যবস্থা স্থাপনে ঐ জাতির স্বাধীনতা ছিল না। ব্রাহ্মণ জাতি যদি আপন ইচ্ছায় এমন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন যে শূদ্রের বেদাধিকার নাই, শূদ্র এক মাস মৃত্যু-অশৌচ বহন করিবে এবং ঐ ব্যবস্থা কালীন শূদ্রের কোন মত লওয়া হয় নাই, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে শূদ্রের স্বাধীনতা ছিল না—শূদ্র ব্রাহ্মণের ব্যবস্থাধীন। আর যদি শূদ্র তাহাতে মত দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাহার স্বাধীনতা ছিল। কেননা তাহার মত লওয়া হইয়াছে ও মত দেওয়ার অধিকার

ছিল। মত দিবার যখন অধিকার রহিল, তখন তিনি ঐ ব্যবস্থাতে মত দিলেও দিতে পারেন, না দিলেও দিতে পারেন—তখন শূদ্র স্বাধীন। ব্যবস্থাতে অধিকার থাকিলেই স্বাধীন, নতুবা নয়। মত দিলেন বা না দিলেন সে স্বতন্ত্র কথা। সমান অধিকারই স্বাধীনতার মূল। বর্ত্তমান সময়ে দেখুন মেথর, চামার, মুচি প্রভৃতি নীচ অস্পর্শীয় জাতি সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে সমান। ব্রাহ্মণের যে রাজনৈতিক অধিকার আছে, তাহাদেরও তাহাই আছে। ঐ নিকৃষ্ট জাতি ব্রাহ্মণের ন্যায় উচ্চ রাজকার্য্য পাইতে পারে, উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতে পারে। ফৌজদারি ও দাওয়ানি প্রভৃতি যে সকল আইন আছে তাহার চক্ষেও নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট জাতি সমান, এজন্য বলা যায় যে এ বিষয়ে তাহারা স্বাধীন।

স্বাধীনতারও অল্পাধিক্য আছে। যে প্রদেশে সাধারণ লোকের মতের প্রাবল্য, সে দেশের লোকের অধিকার অধিক ও স্বাধীনতা অধিক। যে দেশে লোকসাধারণের মতের প্রাবল্য অল্প, সে দেশে লোকের স্বাধীনতাও অল্প। তুর্কে লোকের মতামত অল্প খাটে—রাজারই মতের অধিক প্রাবল্য, এজন্য লোকের স্বাধীনতা অল্প। ইংলণ্ডে তাহা অপেক্ষা অধিক, এজন্য ইংলণ্ডবাসী অধিকতর স্বাধীন। আবার, ফ্রান্স ও আমেরিকাবাসীর মতের প্রাবল্য অধিকতর এজন্য তন্নিবাসী লোক ইংলণ্ডবাসী অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে। ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরও সেইরূপ। খৃষ্টিয়ানের মধ্যে কাথলিক অপেক্ষা প্রোটেষ্টাণ্টদিগের মতপ্রাবল্য হেতু স্বাধীনতা অধিকতর। এতদ্দেশে পুরাতন হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা অধুনাতন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম্মস্বাধীনতা অধিক। সকল বিষয় ও সকল বস্তুরই পরিমাণ আছে। ভাল মন্দ, তাহারও পরিমাণ আছে—কেহ অল্প ভাল, কেহ অধিক ভাল। সেই রূপ স্বাধীনতারও অল্পাধিক্য পরিমাণ আছে। কাহার বা এক বিষয়ে স্বাধীনতা অধিক, অন্য বিষয়ে অল্প। কাহার বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে, ধর্ম্ম বা সামাজিক স্বাধীনতা অতি অল্প, হয় ত কিছুই নাই। আবার কাহার কাহার কোন স্বাধীনতা নাই।

মানব যখন বন্য ও অসভ্য ছিল—পশুর ন্যায় বনে বিচরণ করিত তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত—সেচ্ছাচারী ছিল। ক্রমে সমাজবদ্ধ হইয়া সভ্য হইল। বন্য ও অসভ্য অবস্থায় যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র ছিল সমাজ-সমাবেত সভ্য অবস্থায় তাহা লোপ পাইল। মানব সামাজিক জীব হইল। সমাজ সংস্থিতির জন্য কতকগুলি নিয়ম আছে। তাহাকে ঐ নিয়মাধীন হইতে হইল। সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন না করিলে সমাজে থাকিতে পারা যায় না। সামাজিক নিয়ম এই যে, পরস্পরের সুখের জন্য—জীবন ও অর্থ নিরাপদ

রাখিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে মিল ও বাধ্যবাধকতা রাখা এবং সদ্ব্যবহার করা—পরস্পরের কোন ক্ষতি না করা। এই নিয়মটী আত্মরক্ষার জন্য, কেননা যদি তুমি অদ্য সুযোগ পাইয়া আমার ক্ষতি করিলে, কল্য আমি সুযোগ পাইলে তোমারও ক্ষতি সাধন করিব। ফলতঃ সামাজিক মানবের সামাজিক নিয়মের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। সামাজিক নিয়মও বিবিধ। কতকগুলি নিয়ম শুদ্ধ সমাজ রক্ষার্থে, অতএব অত্যাবশ্যক। ঐ নিয়ম সাধারণ নিয়ম, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে দৃষ্ট হয়। আর কতকগুলি নিয়ম অতি সামান্য নিয়ম, সেগুলি কেবল স্থানীয় নিয়ম মাত্র। সে গুলি কুসংস্কার প্রথিত, অতএব আবশ্যকীয় নয়। বস্তুতঃ সেগুলি প্রকৃত সামাজিক নিয়ম নয়। মানব যখন সামাজিক জীব, তখন তাহাকে সমাজ রক্ষার্থ নিয়মাধীন হইয়া অবশ্য চলিতে হইবে। এই নিয়মের প্রবর্ত্তক কে? মানবই ঐ নিয়ম স্থাপন করিয়াছে। মানব স্বকৃত নিয়মের অধীন থাকিবে, ইহাতে তার স্বাধীনতা গেল কই? স্বাধীনতা থাকিলেই যে তাহাতে কোন বন্ধন থাকিবে না, এমন কথা আমরা বলি না। বরং আমরা বলি যে স্বাধীনতা এক প্রকার বন্ধন। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে বন্ধনের ভিতর থাকা যদি স্বাধীনতা হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা ও পরাধীনতায় প্রভেদ কি? তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে আপনকৃত বন্ধনের ভিতর থাকার নাম স্বাধীনতা; এবং অপরকৃত বন্ধনের ভিতর থাকার নাম পরাধীনতা। আমি স্বয়ং একটী নিয়ম বা বিধি করিলাম এবং সমাজকুশলতার জন্য আমি ইচ্ছানুক্রমে সেই নিয়মের অধীন রহিলাম ইহাতে আমার স্বাধীনতা গেল কই? আমিত আমার অধীনত্বেই রহিলাম। তুমি নিয়ম করিলে কিন্তু আমার অভিমত না লইয়া আমাকে ঐ নিয়মের বশীভূত করিলে, তখন আমি স্বাধীন রহিলাম না, তখন আমি তোমার কৃত নিয়মাধীন হইলাম—তখন আমি পরাধীন। স্বাধীনতা হাতীও নয় ঘোড়াও নয়—স্বাধীনতা এক প্রকার অধীনতা। তবে সে অধীনতা নিজের অধীনতা—পরের নয়। স্বাধীন বলিলে এমন বুঝায় না যে, সে ব্যক্তি কাহার অধীন নয়, যাহা মনে করে, যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই করিতে পারে; সেটী যথেচ্ছাচারিতা মাত্র।

কেহ কেহ বলেন যে, আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিবার স্বত্ব মানবের আদৌ নাই, অতএব স্বাধীনতাও নাই; মানব যখন সামাজিক জীব, পরস্পরসাপেক্ষ, তখন আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে না; অতএব তাহার স্বাধীনতা থাকিল কই? ইহাতে মানবের দুইটী অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। প্রথমতঃ মানবের বন্য বা অসভ্য অবস্থা। দ্বিতীয়তঃ মানবের

সভ্য বা সামাজিক অবস্থা। বন্য অবস্থাতে মানব ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে, তাহার কার্য্যের কোন প্রতিবন্ধক নাই। বন্য অবস্থায় অপ্রতিহত রূপে ইচ্ছানুক্রমে কার্য্য করিতে পারার নাম স্বেচ্ছাচারিতা—স্বাধীনতা নয়। আবার, সভ্য সামাজিক অবস্থাতেও মানব ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু সমাজ নিবন্ধন তন্নিয়মাধীন হইয়া চলিতে হয়—সমাজ রূপ গণ্ডীর মধ্যে চলিতে হয়। এই গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করার নাম স্বাধীনতা। সমাজের সঙ্গে স্বাধীনতার অভেদ্য সম্বন্ধ। যেখানে সমাজ সেখানে স্বাধীনতা, যেখানে সমাজ নাই সেখানে স্বেচ্ছাচারিতা। স্বাধীনতার লক্ষণ যদি এই হয় তবে কি যুক্তিতে স্বাধীনতা-প্রতিবাদী বলেন যে মানবের স্বাধীনতা নাই? যদি যথেচ্ছাচারিতা ও পরাধীনতা বলিয়া কিছু থাকে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে স্বাধীনতাও আছে, নতুবা নাই। সামাজিক মানব পরস্পর-সাপেক্ষ বলিয়া বাস্তবিক কি তাহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবার আদৌ ক্ষমতা বা স্বত্ব নাই? যে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য মানব কখনও সম্পন্ন করিতে পারে না, মানবকে কি তৎকার্য্য সম্পাদনের ইচ্ছা করিতে হইবেই হইবে—আকাশের চন্দ্র স্পর্শ করিতে হইবে, না গণ্ডূষ দ্বারা সাগরের জল শোষণ করিতে হইবে? এতদ্ব্যতীত সমাজে থাকিয়া সামাজিক ব্যাপার সংসাধন করিবার ইচ্ছা করিতে বা তৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে কি সে বাস্তবিক আদৌ সক্ষম নয়?—ইচ্ছা করিবার বাস্তবিকই কি স্বত্ব পর্য্যন্ত তাহার নাই? কে এমন হীনবুদ্ধি আছে যে নাই বলিবে। যদি ইচ্ছা আছে এমন স্বীকার কর, তাহা হইলে স্বাধীনতা নাই কি যুক্তিতে বল?

পূর্ব্বোক্ত গবেষণায় প্রতীত হয় যে স্বাধীনতার দুই মূর্ত্তি—দুই ভাব। প্রথম তেজস্বী আত্মাধীন ভাব। দ্বিতীয় মনোহর সাম্যভাব। এক মূর্ত্তি প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় তীব্র ও জ্যোতির্ম্ময় আর এক মূর্ত্তি পূর্ণিমার চন্দ্রমার ন্যায় সুস্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল।

যথেচ্ছাচারিতা, স্বাধীনতা এবং পরাধীনতায় প্রভেদ কি? যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারার নাম যথেচ্ছাচারিতা। যথেচ্ছাচারিতা বা স্বেচ্ছাচারিতায় অধীনতার ভাব কিছুমাত্র নাই। যে আপনকৃত বা অপরকৃত নিয়ম বা বন্ধন যাহাই হউক কিছুরই অধীনতা স্বীকার না করে, সে যথেচ্ছাচারী। যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিব কিন্তু আপন কৃত বা অনুমোদিত যুক্তিসিদ্ধ শুভকর নিয়মের অধীন হইয়া চলিব, কাহার অনিষ্ট করিব না, এই ভাবের নাম স্বাধীনতা। অর্থাৎ যথেচ্ছাচারিতার উপর স্বকৃত নিয়ম বন্ধন দিলেই স্বাধীনতা পদবাচ্য। যাহা কিছু করিব তাহা অপরের ইচ্ছার অধীন হইয়া করিব—আপনার ইচ্ছায় কিছুই করিতে

পারিব না ঐ ভাবের নাম পরাধীনতা। যথেচ্ছাচারিতা অন্য-নিরপেক্ষ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য প্রয়াসী, অপরকে পৃথক জ্ঞান করে; স্বাধীনতা অন্য-সাপেক্ষ, আত্মপর স্বতন্ত্র জ্ঞান নাই। পরাধীনতায় আপনার আপনত্ব অপরে মিশিয়া গিয়া আপনার সত্তা লোপ পাইয়াছে। যথেচ্ছাচারিতায়, বিবেক নাই, যুক্তি নাই, জ্ঞান নাই; স্বাধীনতায় বিবেক, যুক্তি ও জ্ঞান আছে। যথেচ্ছারিতা শিক্ষা ও শাসনাধীন নয়; স্বাধীনতা শিক্ষা ও শাসনাধীন। যথেচ্ছাচারিতা সমাজবিরোধী—বন্য; স্বাধীনতা সমাজবন্ধু—সভ্য। যথেচ্ছাচারিতা উগ্র ও উদ্ধত; স্বাধীনতা নম্র ও কোমল। যথেচ্ছাচারিতা স্বার্থপর ও আত্মম্ভরী; স্বাধীনতা পরদুঃখে কাতর। যথেচ্ছাচারিতা অধার্ম্মিক; স্বাধীনতা ধর্ম্মপরায়ণ। যথেচ্ছাচারিতা অরাজকতা, স্বাধীনতা রাজকতা। যথেচ্ছাচারিতা বন্য—বনপ্রসূত, স্বাধীনতা সভ্য—সমাজপ্রসূত। যথেচ্ছাচারিতা বিবেক দ্বারা সীমাবদ্ধ হইলেই স্বাধীনতা রূপ ধারণ করে।

ইহাতে বুঝা যায় যে ঐ তিনটীর তিন স্বতন্ত্র ভাব, অতএব সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যথেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতা এক। যাঁহারা এ কথা বলেন তাঁহারা ভ্রান্ত। বোধ হয় পূর্ব্ব লিখিত বিবরণে তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন হইবে। স্বাধীনতায় অধীনতার ভাব আছে বলা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন যে যদিও স্বাধীনতায় অধীনতার ভাব অল্পমাত্রায় আছে বটে, কিন্তু মাত্রার অল্পাধিক্যে ভাবের বাত্যয় হয় না, অতএব স্বাধীনতা ও পরাধীনতা একই ভাব; স্বাধীনতা ক্ষুদ্র পরাধীনতা মাত্র যাঁহারা এ কথা বলেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। প্রভেদ পরিমাণ বা মাত্রার নয়, বস্তু বা গুণের প্রভেদ। কেননা আপন নিয়মের অধীনতা ও অপরের নিয়মের অধীনতা স্বতন্ত্র কথা।

প্রচণ্ড শীত ও প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যস্থল যেমন মনোহর বসন্ত, বর্ষা ও শীতের মধ্যস্থল যেমন সুরম্য হেমন্ত, যথেচ্ছাচারিতা ও পরাধীনতার মধ্যস্থল তেমনি স্বাধীনতা। বাল্য বার্দ্ধকের মধ্য সময় যেমন যৌবন, যথেচ্ছাচারিতা ও পরাধীনতার মধ্যস্থল তেমনি স্বাধীনতা। রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের যোগে যেমন পাটল বর্ণ হয়, যথেচ্ছাচারিতা ও পরাধীনতা যোগে তেমনি স্বাধীনতা। সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর সমবায়ে স্বাধীনতার জন্ম। একদিকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচার, ইচ্ছাস্বরূপ সমস্ত কার্য্য, কোনপ্রকার প্রতিরোধের লেশমাত্র নাই; অপরদিকে তদ্বিপরীত ভাব—সম্পূর্ণ অধীনতা, দাসত্ব, গোলামত্ব স্বীয় ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই। শুক্র শোণিত মিলিয়া যেমন জীবদেহ উৎপন্ন হয়, এই দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব মিলিয়া স্বাধীনতা হইল। ইহাতে যথেচ্ছাচারিতার ভাব মিশিয়া গিয়া শুদ্ধ ইচ্ছা মাত্র অবশিষ্ট রহিল। আবার পরাধীনতার ভাব লয় প্রাপ্ত হইয়া কেবল মাত্র অধীনতার ভাব রহিল। উভয়ের এই অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ ইচ্ছা ও অধীনতার পরিণয়ে স্বাধীনতার অভ্যুদয়। ইচ্ছা ও অধীনতা পরস্পরবিরোধী হইলেও গঙ্গা যমুনার ন্যায় এখানে মিলিল। স্বাধীনতা তুলাদণ্ডের ভার মধ্যস্থল স্বরূপ হইয়া সমাজের গুরু লঘু সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেছে।

২। এক্ষণে দেখা যাউক শিক্ষা কাহাকে বলে—শিক্ষা কি? জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন, নীতির উৎকর্ষসাধন, শরীর ধর্ম্মের উৎকর্ষসাধনই প্রকৃত

শিক্ষা। জ্ঞানবল, চরিত্রবল, শারীরিক বল সংসাধনই প্রকৃত শিক্ষা। এজন্য শিক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ মনের উন্নতি, বুদ্ধির উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি একপ্রকার শিক্ষা। দ্বিতীয়তঃ অন্তঃকরণের উন্নতি, রুচি ও অনুভূতির উন্নতি আর একপ্রকার শিক্ষা। তৃতীয়তঃ ইচ্ছা বা শরীর ধর্ম্মের উন্নতি অন্য প্রকার শিক্ষা। বস্তুতঃ বুদ্ধি, অনুভূতি ও শরীরের সমকালীন উন্নতি সাধন না করিলে প্রকৃত শিক্ষা হইয়াছে বলা যায় না। শুদ্ধ জ্ঞানের উন্নতি করিলে —শুদ্ধ মনের শিক্ষা দিলে সম্পূর্ণ শিক্ষা হইল না। অন্তঃকরণ, রুচি ও অনুভূতির শিক্ষাও আবশ্যক। তাহা না হইলে জ্ঞানী হইয়াও দুশ্চরিত্র হইবার সম্ভাবনা। আবার, জ্ঞান ও অনুভূতির উৎকর্ষ সাধন করিলেই প্রকৃত শিক্ষা হইল না। উহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে তাহা বৃথা হইল। এজন্য ইচ্ছাবল অর্থাৎ শারীরিক বল আবশ্যক —শরীরধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজনীয়। যিনি এই তিনের সমগ্র ও সমকালীন উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষা পাইয়াছেন বলিতে হইবে।

সূক্ষ্ম বিবেচনায় দেখা যায় যে শাসনই মানব মনের শিক্ষা। শিক্ষাতে যে শুদ্ধ উন্নতি বুঝায় এমন নয়, ইহাতে শাসনের ভাবও আছে। প্রত্যুত শাসন না থাকিলে উন্নতি হয় না। উন্নতি শাসনের ফল। মনের শাসনে ব্যবহারের পরিমিতাচার সম্পাদিত হয়—সদসদ জ্ঞান হয়—নীতি বোধ হয়। আবার, ঐ পরিমিতাচারে, ঐ সদসদ জ্ঞানে, শরীর ধর্ম্ম সম্পাদিত হয়। এই জন্য পণ্ডিতেরা অগ্রে মনের শিক্ষা ব্যবস্থা দেন, মনঃসংযমের উপদেশ দেন, মনকে জ্ঞানপূর্ণ করান, বিশুদ্ধ করান। মনঃসংযম হইলেই অতি সহজেই নীতির উৎকর্ষ ও শরীরধর্ম্ম প্রতিপালন হয়। মনের উন্নতি সকল উন্নতির মূল। মনকে উন্নত করিতে পারিলে, হৃদয়ের ও শরীরের উন্নতি স্বতঃই হয়।

মনের শাসন মনের শিক্ষা, হৃদয়ের শাসন হৃদয়ের শিক্ষা, এবং শরীরের শাসন শরীরের শিক্ষা। শাসন শিক্ষার মূল। তবে শাসন কি? নিয়মাধীন বা আয়ত্তাধীন করাকে শাসন বলা যায়। মনকে এবম্বিধ নিয়মের অনুগামী করিব সঙ্কল্প করিলে, মনকে তদাদিষ্ট নিয়মাধীন করিতে হয়। তাহা হইলে তাহার শাসন বা শিক্ষা হইল। অনুভূতিকে এবম্বিধ নিয়মের অধীন করিয়া তদাদিষ্ট প্রকরণের অধীন করিতে হয়। তাহা হইলে অনুভূতির শাসন বা শিক্ষা হইল। শরীরকে এবম্বিধ নিয়মের অধীন করিলে, তাহার শাসন বা শিক্ষা হইল। প্রত্যুত শিক্ষা বলিলে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন বা শাসনে থাকা বুঝায়। মনকে নিয়মাধীন বা শাসনাধীন করিলে তাহার শিক্ষা হয় এবং ঐ শিক্ষা হইতে কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে।

মনের প্রবৃত্তি বিভিন্ন প্রকার, এজন্য নিয়ম ও শাসনও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এই ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম বা শাসনগুলিকে শাস্ত্র বলি। বিজ্ঞান এ শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দেয়, দর্শন ঐ বৈজ্ঞানিক যুক্তির সামান্যতাপাত করে। বিজ্ঞান ও দর্শন মনকে উন্নত ও পরিশুদ্ধ করে—সংযত করে—প্রকৃত শিক্ষা হয়।

ইহাতে দেখা যায় যে শিক্ষাতে যথেচ্ছাচারিতার ভাব নাই। শিক্ষা করিতে হইলে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারা যায় না। কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বা শাসনের অধীন হইয়া থাকিতে হয়।

নিয়মাধীন না থাকিলে শিক্ষা হয় না। প্রাকৃতিক জীবন নিয়মাধীন নয়, এই প্রকৃতির উন্নতি সাধনই শিক্ষা। মানব যদি আপনার প্রকৃতিস্থ থাকে তাহা হইলে, তাহার অসভ্য বন্য অবস্থাই রহিয়া যায়। তাহার বন্য প্রকৃতিকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন করিলে জ্ঞান উপার্জ্জন হয়, শিক্ষা হয়, ও সভ্যতা জন্মে এজন্য প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি কখন যথেচ্ছাচারী হয় না। কেননা তিনি বিবেকের অধীন, নিয়মের অধীন হইয়া থাকাতে স্বেচ্ছাচারিতা লোপ পায়।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

যোগাঙ্গ—সন্ধ্যা।

১

গায়ত্রীতন্ত্রের পঞ্চম পটলে উক্ত হইয়াছে সন্ধ্যা তিন প্রকার। বৈদিকী ও তান্ত্রিকী, আর অন্তঃ। প্রথমোক্ত সন্ধ্যাদ্বয় বাহ্যসন্ধ্যা। বাহ্যসন্ধ্যাপেক্ষা অন্তঃসন্ধ্যা গরীয়সী। অন্তঃসন্ধ্যা না করিতে পারিলে বাহ্যসন্ধ্যা কেবল লোক দেখান বেগার ঠেলা মাত্র। অন্তঃসন্ধ্যা যে প্রকারে করিতে হয় তাহা এই।

শিবশক্তিসমাযোগা-
দন্তঃসন্ধ্যা যথাত্মনঃ।
অন্তঃসন্ধ্যা বিনা রাজন্
বাহ্যসন্ধ্যা বৃথা ভবেৎ॥
বৈদিকী তান্ত্রিকী সন্ধ্যা
বাহ্যসন্ধ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

পাঠকবৃন্দ আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতরূপে সন্ধ্যা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ক্ষণকাল নির্জ্জন স্থানে স্বস্তিকাসন করিয়া বসিয়া এমন চিন্তা করিবেন যে, বাহ্য কি আন্তরিক কোন বিষয়ে মনের গতি না জন্মে; নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় মনকে স্থির করিয়া রাখিতে পারিলে মূলাধারস্থা কুণ্ডলিনী সহস্রারস্থ পরম শিবের সহিত মিলিত হইয়া প্রশ্বাসের সহিত পুনরায় মূলাধারে আসিবেন। কুম্ভক না করিলেও কেবল শূন্য চিন্তাতে এরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। গাঢ় চিন্তাতে কুম্ভক সিদ্ধ হয়। ইহাই অন্তঃসন্ধ্যা। বৌদ্ধ যোগীরাই এই পথের পথিক। কিন্তু তাঁহারা কার্য্য করেন, ফল বোধ করেন না; কার্য্য করিলেই তাহার ফল আছে। এখানে কার্য্য মনঃস্থির, মনঃস্থিরের ফল জীব আর ব্রহ্মের একতা জ্ঞান। এই জ্ঞান জন্য যে সুখ তাহা সমাধিভঙ্গের পর আর থাকে না। বৌদ্ধ যোগীদিগের প্রবুদ্ধ হওয়াই উদ্দেশ্য। তাহারা এইরূপ চিন্তাতে প্রবুদ্ধ হয়। প্রবুদ্ধ হইলে দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, পরকায়প্রবেশ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের যাবতীয় ঘটনা স্মরণ ও যথেচ্ছা গমনাগমন করিবার ক্ষমতা হয়।

রাজওলয যোগের কতিপয় ক্রিয়ার কিম্বা পাতঞ্জলির যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা করিতে পারিলেই বৌদ্ধ হইতে পারা যায়। বৌদ্ধ যোগীরা অন্তর্জ্জগতের সর্ব্বোচ্চ আসন উপেক্ষা করিয়া বহির্জ্জগতীয় উচ্চাসনে উপবেশন করিয়া বহির্জ্জগতেই ভ্রমণ করেন। বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক যোগী সকল যোগসিদ্ধ হইলে অন্তর্ব্বহিরুভয় জগতের সর্ব্বোচ্চাসনে উপবেশন করতঃ অন্তর্ব্বহিরুভয় জগতের সাক্ষ্য প্রদান করিতে থাকেন। ইহাঁরা সমাধি অবস্থায় যেরূপ বাক্পথাতীত আনন্দ সম্ভোগ করেন তাহা অন্য কোন যোগীর লভ্য নহে। যাঁহারা অন্তঃসন্ধ্যা করিতে

বিশেষ ক্ষমতাপন্ন তাঁহারাই সেই আনন্দ সম্ভোগ করেন। যিনি এ সন্ধ্যা ত্রিসন্ধ্যা করেন তাঁহার পক্ষে বাহ্য সন্ধ্যা সজীব। যাঁহারা অন্তঃসন্ধ্যাবিমুখ, তাঁহাদিগের বাহ্য সন্ধ্যা নির্জীব শবতুল্য। সন্ধ্যাকে যাঁহারা অবজ্ঞা করিতে চান তাঁহারা যেন অন্তঃসন্ধ্যার অভ্যাস করেন। অভ্যাসাজ্জায়তে সিদ্ধিঃ। অনভ্যস্তের সকলই অসিদ্ধ। কেবল পাপ কার্য্য স্বতঃসিদ্ধ। কি গৃহী, কি উদাসীন, কি ব্রাহ্মণ, কি অব্রাহ্মণ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেরই এ সন্ধ্যায় অধিকার আছে। কেবল জড়বাদী নাস্তিক অবিশ্বাসীদিগের ইহাতে অধিকার নাই। শয়নে ভোজনে গমনে উপবেশনে সকল অবস্থাতে ও সর্ব্ব ভাবে ও সকল উপাসকে এ সন্ধ্যা করিবে। শৌচাশৌচ নিয়ম নাই। দেশ বিদেশ প্রতিবন্ধক নাই। সময় নিরূপণ ও কালাকাল ভেদ নাই। যিনি অন্তঃসন্ধ্যা অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি অন্তর্যাগে বিশেষ ক্ষমবান। কেবল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সংসার চিন্তা করতঃ চক্ষু দিয়া জল ফেলিলে এ সন্ধ্যা করা হয় না। তাহাতে সাংসারিক সন্ধ্যা ও যাগ করাই হয়। অন্তঃসন্ধ্যা আর অন্তর্যাগ ইহাদিগের সম্বন্ধে শশবিষাণতুল্য!

ইহ সংসারে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা ঈশ্বর প্রসঙ্গে যেমন তদ্গতমনা হন, তেমনি যথেচ্ছাচারেও গরীয়ান্। তাঁহারা প্রকৃতি দেবীর অতি প্রিয় সন্তান। বিধাতা পুরুষের সৃজনৈনপুণ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইতি অন্তঃসন্ধ্যা।

অতঃপর বাহ্য সন্ধ্যার বিষয় যথাশাস্ত্র ও যথাজ্ঞান লেখা যাইতেছে। অনেকে মনে করেন সন্ধ্যা কেবল ভোজনের প্রতিবন্ধক মাত্র। ইহাতে লৌকিক ও পারত্রিকের কোন শুভ সম্বন্ধ নাই। উহা অক্ষম নির্ব্বোধ মানবের যেন তেন প্রকারেণ দিন যাপনের উপায় মাত্র।

সুবোধ সক্ষম মানবেরা সন্ধ্যার বিষয় যেরূপ মনে করেন কালমাহাত্ম্যে তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে। সন্ধ্যার প্রকৃত অর্থ সম্যকরূপে চিন্তা করা। সং এই উপসর্গের অর্থ সম্যক্‌রূপে, আর ধ্যা ধাতুর অর্থ ধ্যান। এই ধ্যা ধাতুর উত্তর কার্দন্তিক ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া সেই ক্বিপের লোপ করিলে যে ধ্যা সেই ধ্যাই থাকিবে। ক্বিপ প্রত্যয়ের ফল এই হইল যে ঐ ধ্যানটী মাত্র বুঝাইল। ইহাতে সন্ধ্যার অর্থ কেবল ধ্যান করাকে বুঝায়। অন্তঃসন্ধ্যায় অন্তরস্থ পদার্থের ধ্যান। আর বাহ্য সন্ধ্যায় বাহ্য পদার্থ ধ্যান করাকে বুঝায়। বৈদিক সন্ধ্যায় অগ্র পশ্চাৎ সকল স্থানেই বাহ্য পদার্থের চিন্তা করা হয়। সামবেদিসন্ধ্যার প্রথমে জলেরই নিকটে মঙ্গল কামনা।১। তৎপর অনাদিষ্ট প্রায়শ্চিত্তার্থ সপ্ত ব্যাহৃতির অর্থাৎ সপ্ত লোকস্থ ভর্গ চিন্তা এবং সেই ভর্গের অধিপতির নিকটে প্রার্থনা।২। তৎপর আচমন। এই আচমনেও জলের নিকটে পাপমোচন কামনা ও সূর্য্যজ্যোতি চিন্তা করা।৩। তৎপর মার্জ্জন মন্ত্র। মার্জ্জনেও জলের প্রশংসা ও পাপক্ষয় কামনা।৪। তৎপর অঘমর্ষণ মন্ত্রের দ্বা দেহস্থ যাবতীয় পাপকে শরীর হইতে নির্গত করাইয়া তাহাকে শিলাতলে আঘাত করা ইহাও শুদ্ধ চিন্তার কার্য্য।৫। তৎপর সূর্য্যোপস্থান। ইহা কেবল সূর্য্য চিন্তা ও তাহার প্রশংসা করা।৬। ইতিসন্ধ্যা। তৎপর প্রণব পুটিত করিয়া গায়ত্রী জপ করা।৭। তৎপর বিসর্জ্জন করা।৮। তৎপর তর্পণাদি।৯।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

১০ম খণ্ড] বৈশাখ ১২৯১। এপ্রেল ১৮৮৪। [১ম সংখ্যা।

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি।

(কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত-বিরচিত।)

ভেবেছিনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি,—লোকে যাহা বলে,
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে;—
ভেবেছিনু, হায়! দেখি, ভ্রান্তিভাব ধরি!
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
অদয়ে, অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু; কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে?

---

*. বঙ্গভূমির প্রিয়তম সন্তান, বঙ্গীয় সাহিত্য কাননের পুংস্কোকিল কবিকুল-শিরোমণি মাইকেল মধুসূদনের সাংসারিক দীনতা বঙ্গসন্তানগণের অবিদিতপূর্ব্ব নহে। তথাপি কবির স্বহস্ত লিখিত এই হতাশ বাক্য পাঠ করিয়া আজ বঙ্গীয় সহৃদয় মণ্ডলী যে সন্তপ্ত ও মর্ম্মাহত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মাইকেল মধুসূদন সেই দুঃখভার লইয়া ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গসন্তানেরা ইচ্ছা করিলে, তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক অনাথ সন্তানের সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া, মধুসূদনের মুক্ত আত্মার প্রীতি সম্পাদন করিতে পারেন।—শ্রীকৈলাস চন্দ্র বসু।

হিন্দুসমাজ সংস্কার।

প্রথম প্রস্তাব।

'হিন্দু সমাজ'—এই শব্দ শুনিলে মনে নানা প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়। আত্মাভিমান, আনন্দ, শোক, দুঃখ ও বিষাদ যুগপৎ উপস্থিত হইয়া মনকে বিক্ষোভিত করে। যখন 'কি ছিলাম' এই ভাব মনে উদিত হয়, তখন আত্মাভিমান ও তজ্জনিত আনন্দোচ্ছ্বাসে মন আপ্লুত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই কি হইয়াছি যখন এই ভাব মনে উদিত হয়, তখনই প্রতিক্রিয়াবলে শোক, দুঃখ ও বিষাদ আসিয়া মনতটিনীর সে উচ্ছ্বাস শুষ্ক করিয়া ফেলে। কেন ভাবি, কেন কাঁদি জানি না। কারণ যাহার জন্য ভাবি—সে ত তার জন্য ভাবে না। তবে কেন নির্জ্জনে বসিয়া এ অশ্রুপাত? তবে কেন রজনীর অন্ধকারে শয্যা ছাড়িয়া করতলে কপোল রাখিয়া শুষ্ক ভাবনায় দেহ মন জর্জ্জরিত করি? আমি কে? এই প্রকাণ্ড হিন্দু সমাজের একটি পরমাণু মাত্র। আমি ভাবিয়া কি করিতে পারি? নগণ্য আমি—আমার কথাই বা অগণ্য হিন্দুসন্তান কেন শুনিবে? সব বুঝি, কিন্তু অবোধ মন, বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না—তাই আজ ভ্রাতৃবৃন্দ সকাশে হৃদয়ের ক্রন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া জানাইতে উদ্যত হইলাম।

কেন আমরা আজ এমন হইলাম? কেন আজ এই অসংখ্য ক্রোটী মানব কতিপয় মাত্র শ্বেত পুরুষের ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া রহিয়াছি? যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ একদিন অসংখ্য মানবকে সুশীতল ছায়াদানে স্নিগ্ধ করিত, আজ কেন সে গলিতপত্র ও শুষ্কদেহ? যে মহীরুহ দিগন্তপ্রসারী শাখাবাহু দ্বারা একদিন সমস্ত জগৎকে আলিঙ্গন করিত, আজ সেই মহীরুহ এরূপ বিশাখ ও শুষ্ক কেন? সে জগদ্ব্যাপী প্রেমভাব আজ আকুঞ্চিত কেন? কবে ইহার এ দশা ঘটিল? কে করিল? কোন্ পাপে ঘটিল?

অথবা জন্ম, পরিপাক ও মৃত্যু—জড় ও অজড় সকলেরই ধর্ম্ম। জন্মের পর পরিপাক, পরিপাকের পর মৃত্যু—আবার মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম, আবার পরিপাক, আবার মৃত্যু—জগতের চরম পরিস্ফুটনের জন্য এরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয়। হিন্দুসমাজের জন্ম, পরিপাক ও মৃত্যু হইয়া গিয়াছে—আবার সেই চিতাভস্মের মধ্য হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল দেখা যাইতেছে।

এ সময় স্থির থাকা যায় না। স্থির থাকাও উচিত নহে। আবার আমাদিগকে উঠিতে হইবে। আবার আমাদিগকে একটী প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত হইতে হইবে। আমরা কি ছিলাম, কি উপায়ে আমরা তত বড় হইয়াছিলাম,

কি কি কারণেই বা আমাদের পতন হইয়াছিল সেই গুলি তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিয়া আবার কি উপায়ে আমরা উঠিতে পারি তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে। এস ভাই! আমরা প্রত্যেকেই ভাবি—প্রত্যেকে ভাবিয়া পরস্পরের চিন্তা, পরস্পরকে জানাই এবং পরস্পর বিদ্বেষ শূন্য হইয়া পরস্পরের নিকট হইতে সাহায্য লই। আমি ক্ষুদ্র হইতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া আমার কথা শুনিবে না কেন? সত্য বলিবার অধিকার সকলেরই আছে। আমার কথায় সত্য না থাকে পরিত্যাগ করিও। কিন্তু পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে একবার শুন। আমরা রাজনৈতিক অধীনতার জন্য দুঃখ করিয়া থাকি, এবং অপহৃত স্বাধীনতা অপহারকের নিকট ভিক্ষা করিয়া চাহিয়া লইতে সর্ব্বদা উন্মুখ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ভিক্ষালব্ধ ধনে কে কবে ধনী হইয়াছে? আর অপহৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তির ক্রন্দনে অপহারকের হৃদয় কবে বিগলিত হইয়াছে? যাহারা আত্মাবলম্বন জানে না স্বাধীনতা পাইলেই বা তাহারা সে অমূল্য ধন রাখিবে কিরূপে? একজন অপহারক ছাড়িয়া দিলে যে আর একজন আসিয়া ধরিবে না কে বলিতে পারে? আমরা বৈদেশিকের নিকট এখানে ভিক্ষা চাহিয়া ক্ষান্ত নহি, আগ্রহ ভিক্ষা করিবার জন্য জাতীয় ভিক্ষার ঝুলি প্রস্তুত করিয়া বৈদেশিকের নিজ দেশে গিয়াও দ্বারে দ্বারে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে লজ্জিত নহি। কিন্তু ভিক্ষুকের আদর কুত্রাপি নাই। স্বদেশ বিদেশে ভিক্ষুক সর্ব্বত্র ঘৃণার পাত্র। God helps them who help themselves যাঁহারা আত্মাবলম্বী, ঈশ্বর কেবল তাঁহাদিগকেই সাহায্য করিয়া থাকেন। যিনি পরসাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া আপনার যত্নে আপনি বড় হইতে চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে বড় হইতে পারেন। Papa I am bigger than you—বাবা আমি তোমা অপেক্ষা মাথায় উঁচু—পিতৃ স্কন্ধে চড়িয়া বালক এই কথা বলিলেই যে সে বড় হইল তাহা নহে। ইংরাজ যদি আদর করিয়া আমায় রাজ সিংহাসনে বসান, আমি কখনই রাজ সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব না। যে বিনা শ্রমে, বিনা বুদ্ধিবলে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হয়, সে কখন সে সম্পত্তি বহুদিন রাখিতে পারে না। আমরা বহু যত্নে অর্জ্জিত ভারত সাম্রাজ্য রাখিতে পারিলাম না—কারণ আমরা বিনা শ্রমে ইহা হাতে পাইয়াছিলাম। যে অনন্ত সংঘর্ষের বলে পূর্ব্বপুরুষগণ এই দেবদুর্লভ সাম্রাজ্য অধিগত করিয়াছিলেন, সে সংঘর্ষকাল অতীত হইলে, আমরা নিদ্রালু হইয়া উঠিলাম। কতিপয়মাত্র ক্ষত্রিয়ের হস্তে এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া আমরা জাতিসাধারণ নিদ্রা যাইতে লাগিলাম। শ্রম বিভাগের জন্য যে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল—ক্রমে তাহাই আমা-

দিগের পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এত বড় সাম্রাজ্যরক্ষা অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় কতিপয়মাত্র ক্ষত্রিয়ে কয়দিন করিয়া উঠিতে পারে? জার্ম্মাণীরও এই কারণে অধঃপতন হইয়াছিল। জার্ম্মাণী সে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে জাতি-সাধারণ সাম্রাজ্য রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাই সে দিন ফ্র্যাঙ্কো প্রুসীয় সমরে বীরভূমি ফ্রান্সকেও পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পাণিপথ সমরের পূর্ব্বে যদি আমরা সে ভ্রম বুঝিতে পারিতাম, অথবা সে দিন পলাশীযুদ্ধের পূর্ব্বেও যদি জাতি সাধারণ নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের দুর্দ্দশা ঘটিত না। 'গতস্য শূচনা নাস্তি' —যাহা অতীত হইয়াছে তাহার জন্য আর দুঃখ করা বৃথা। এক্ষণে কিরূপে আমাদের ভবিষ্য সঞ্জীবনকার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে—আমরা সেই সম্বন্ধে কেবল দুই চারিটী কথা বলিব।

পরাধীন জাতির রাজনৈতিক অস্তিত্ব নাই। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন—অরণ্যে রোদনমাত্র। তাহার জন্য সমস্ত জাতীয় শক্তি বিনষ্ট করা উচিত নহে। রোদনের ফল একেবারে নাই—একথা আমরা বলি না। তবে যাহারা কেবল রোদনের উপর জাতীয় উন্নতি রাখিতে চাহে—তাহাদিগকে বাতুল বলি। রোদন জাতি-সাধারণ সংক্রামক হইলে বিশ্বজনীন সহানুভূতি উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু নিরন্তর ক্রন্দনে জাতীয় শক্তির ক্ষয় হয়। কুকুর আমরা ঘৃণা করি কেন? —কুকুর সকল বিষয়েই প্রভুর অনুগ্রহ ভিখারী বলিয়া। বৈদেশিকের অনুগ্রহ ভিখারী বলিয়া আমরাও জগতের ঘৃণার পাত্র। তবে কেন আর আবেদন করিয়া মরি। ইলবর্ট বিলে দেখা গিয়াছে যে আমাদের কপালগুণে সকলেই সমান। লঙ্কায় যে আসে সেই রাক্ষস। বাস্তবিকই শ্বেতপুরুষগণের সহিত আমাদের খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ। তাঁহারা যে আত্মস্বার্থ নষ্ট করিয়া আমাদের উন্নতি সাধন করিবেন—সে আশা বৃথা। বৃথা আশা করিয়া আশাভঙ্গ-জনিত মনস্তাপ আর কেন সহ্য করি? আমাদের কপাল যখন ভাঙ্গিয়াছে—তখন আবেদন করা, চীৎকার করা কিছুদিন বন্ধ করিলেই ভাল হয়।

আমরা যাহাতে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আসনে স্বাধীনভাবে বসিবার যোগ্য হই, আইস আমরা এক্ষণে তাহার চেষ্টা করি। সামাজিক অধঃপতনের ফল রাজনৈতিক অধঃপতন। কারণ বর্ত্তমান থাকিতে কার্য্যের নাশ হইবে কিরূপে? সামাজিক অধঃপতন পূর্ণমাত্রায় থাকিতে রাজনৈতিক অভ্যুদয় হইবে কিরূপে? অতএব আইস আমরা সামাজিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হই। সামাজিক উন্নতি হইলে রাজনৈতিক উন্নতি আপনিই আসিবে।

হিন্দু সমাজ একদিন প্রচণ্ড স্রোতস্বিনী ছিল। উন্নতির স্রোত ইহাতে প্রচণ্ডবেগে বহিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে সে স্রোত এখন একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আবার স্রোত বহাইতে হইবে। মরা নদীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া আবার তাহাকে প্রবল স্রোতস্বিনীতে পরিণত করিতে হইবে। স্রোত বন্ধ হওয়ায় যে সকল শৈবালদাম জন্মিয়াছে তাহা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। শৈবালদাম ও পঙ্করাশি উঠাইয়া ফেলিলেই নদী আবার সাগরাভিমুখিনী হইবে—আবার তটবর্ত্তী প্রদেশ সকলে জীবন ও সমৃদ্ধি বিস্তার করিবে। ইহা সম্পূর্ণরূপে নিজায়ত্ত। যাহা নিজায়ত্ত তাহা ফেলিয়া, যাহা পরায়ত্ত, তাহার জন্য চীৎকার করিয়া মরি কেন?

রাজনৈতিক উন্নতির ভিত্তিভূমি সমাজ সংস্কার। ভারতের অধঃপতনের মূল সামাজিক বৈষম্য ও স্ত্রীজাতির অবনতি। সামাজিক বৈষম্যে পঞ্চবিংশকোটী মানব পরস্পর-মমতাশূন্য। কি উপায়ে এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন মমতাশূন্য দূর-বিক্ষিপ্ত মানবপরমাণুপুঞ্জ আবার ঘনীভূত হইতে পারে, কিরূপে আবার স্ত্রীজাতি অন্দরের অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে—কিরূপে আবার তাহারা অপহৃত স্বত্ব সকল পুনরধিকার করিতে পারে—কিরূপে ভারতের নারীজাতি ও জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাজ্যোতিঃ বিকীরিত হইতে পারে—কিরূপে দৃঢ়বদ্ধ প্রাদেশিক ভাবসকল জাতীয় ভাবে পরিণত হইতে পারে—আমাদের এক্ষণে সেইসকল আন্দোলনেই সমস্ত জাতীয় শক্তি ব্যয়িত করা কর্ত্তব্য। হিন্দুসমাজ এই আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনে নিতান্ত উদাসীন। শিক্ষিত সমাজ যাহাতে আত্মোৎসর্গ আছে এরূপ কার্য্যে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন। বক্তৃতা করিতে বা আবেদন করিতে বিশেষ 'আত্মোৎসর্গ' নাই বলিয়া তাঁহারা সেই বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? এক্ষণে কার্য্য চাই! যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিব তাহা কার্য্যে পরিণত করা চাই। শুদ্ধ কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে জাতীয় উন্নতি হইবে না। আমাদিগকে অনেক সংস্কার সাধন করিতে হইবে। একটী একটী করিয়া ধরিলে কতদিনে সম্পন্ন হইবে জানি না। তথাপি একটী একটী করিয়া সাধন করিয়া উঠিতে পারিলেও ভবিষ্যতে সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার হইবে বলিয়া আশা হয়। আমরা ভারতের জাতীয় অবনতির মূলীভূত যাবতীয় সমাজদূষণের ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করিব। অদ্য কেবল বিধবাবিবাহের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। মহাত্মা বিদ্যা-সাগর মহাশয় বহুদিন হইল এই অত্যা-বশ্যকীয় সংস্কারের সূচনা করিয়াছেন। সূচনা হওয়ার পর দুই একটী করিয়া

মধ্যে মধ্যে বিধবাবিবাহ হইতেছে বটে—কিন্তু হিন্দু সমাজমধ্যে বিবাহ প্রবেশ করিয়াছে একথা বলিতে পারি না। কারণ যাহারা বিধবাবিবাহ করিতেছেন হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের কষ্টের সীমা নাই। তাঁহারা আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত। উৎপীড়িত ও অবহেলিত হইয়াও তাঁহারা কর্ত্তব্যের অনুরোধ অম্লানবদনে সমস্ত সহিতেছেন। যাঁহারা সুশিক্ষিত বলিয়া আত্মপরিচয় দেন—তাঁহারাও প্রকাশ্যরূপে ইহাঁদিদিগের সহিত সামাজিক ব্যবহারে মিশেন না। বিধবাবিবাহের রজনীতে ভোজমন্দিরে মধুলোলুপ ভ্রমরবৃন্দের ন্যায় সন্দেশলোলুপ অসংখ্য যুবাপুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পর দিন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ ২৫।২৬ বৎসর এই রূপই চলিতেছে—ইহার কোন পরিবর্ত্তন হইল না। হিন্দুসমাজ লুকাচুরিতে দক্ষ, লুকাচুরিতে হিন্দুসমাজের কোন আপত্তি নাই, লুকাচুরি করিয়া তুমি যাহা কর, হিন্দু সমাজের তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে করিলে হিন্দুসমাজ তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। তুমি মদ খাও, গরু খাও, উইলসনের হোটেলের খানা খাও লুকাইয়া যাহা ইচ্ছা কর—তোমার জাতি যাইবে না, কিন্তু তুমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রকাশ্যরূপে কোন অপ্রচলিত শাস্ত্রসম্মত কার্য্য কর—তুমি জাতিচ্যুত হইবে।

হিন্দুসমাজের ইহা অপেক্ষা অধিকতর কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ইহা এক্ষণে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। ইহা যে যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়েও কাহাকে কোন আপত্তি তুলিতে দেখি না। ইহার বিরুদ্ধে একমাত্র আপত্তি এই যে ইহা ব্যবহার-বিরুদ্ধ। হিন্দুসমাজে ব্যবহার-বিরুদ্ধ কত কাজ চলিয়া যাইতেছে কিন্তু বিধবাবিবাহ অদ্যাপি হিন্দু সমাজে চলিত হইতেছে না। ইহার কারণ কি? ইহার দুইটী গূঢ় কারণ আছে। একটী কারণ এই যে হিন্দুসমাজ স্ত্রী জাতিকে খাদ্যসামগ্রী স্বরূপ মনে করেন। অন্যের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট খাদ্য যেমন ঘৃণ্য, ইহাঁরা বিধবাগণকে সেই ভাবে দেখেন; কিন্তু ইহা বিজ্ঞানসম্মত নহে। সবিশেষ খুলিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ বালবিধবা সম্বন্ধে এ কথার উল্লেখই হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদিগের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে স্ত্রীলোকে পতিপরায়ণা হইবে না। সকলেই বর্ত্তমান পতির মৃত্যুর পর পত্যন্তর প্রাপ্তির আশায় তাঁহার প্রতি উদাসীন হইবে—এবং কখন কখন তাঁহার প্রাণ বিনাশেরও চেষ্টা করিবে। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত সংস্কার আর নাই। লোকে উপস্থিত অবহেলা করিয়া কখন অনুপস্থিতের

অশায় দিনযাপন করে না। ইহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যও ঘটে বটে কিন্তু তাহা নিয়ম নহে, ব্যভিচার। এই ভ্রান্ত সংস্কার যে শুদ্ধ অশিক্ষিত সমাজে বদ্ধমূল আছে এরূপ নহে—সুশিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যেও কোন কোন স্থলে এরূপ সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের কিছুতেই এ সংস্কার অপনীত হইবে না—আমাদিগের তাঁহাদিগের সহিত বিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে যাঁহারা বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করেন—আমরা তাঁহাদিগকে লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত করিতে চাহি। এই সমিতিকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। বিধবাবিবাহ প্রচারের জন্য স্বতঃ পরতঃ অবিরাম চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী থাকিতে চান—তাঁহাদিগের মন ফিরাইবার চেষ্টা করা সমিতির লক্ষ্য হইবে না। সমিতি কেবল বিবাহার্থিনী বিধবাগণের বিবাহ দিয়া দিবেন। এবং যাহারা বিধবাবিবাহ করিবেন, তাঁহাদিগের সহিত সামাজিক সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন না এরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইবেন। যাঁহারা এই সমিতির সভ্য হইতে চান তাঁহারা আপনাদিগের নাম ধাম লিখিয়া আর্য্যদর্শন সম্পাদকের নিকট ময়মনসিংহে পত্র লিখিবেন। সভ্য সংখ্যা অধিক হইলে সভার নিয়মাবলী প্রচারিত হইবে। সভ্যসংখ্যা পূর্ণ হইলে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভার সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। যিনি বিধবাবিবাহ প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—তিনি জীবিত থাকিতে সভাপতির আসন আর কেহ গ্রহণ করিতে পারেন না। সহযোগী সম্পাদক মণ্ডলীকে এ বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করি। এবং তাঁহাদিগের মতামত জানিবার জন্য আমরা ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আরও বক্তব্য রহিল, আমরা পরে বলিব। এই সমিতি যে শুদ্ধ বিধবা বিবাহ লইয়াই থাকিবেন তাহা নহে। একে একে সমস্ত সামাজিক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিবেন। ইহার লক্ষ্য পরে বিবৃত করা যাইবে। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি নলডাঙ্গাধিপতি রাজা প্রমথভূষণ দেব রায় বিধবাবিবাহ প্রচারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি যে শুদ্ধ অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেছেন এরূপ নহে। স্বয়ং বিধবাবিবাহকারীগণের সহিত সমসামাজিকতা করিতেছেন। সম্ভ্রান্ত শ্রেণী তাঁহার উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিলে বিধবাবিবাহ প্রচার হইতে কয়দিন লাগে? ৺ রাজা রাধাকান্ত দেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকূলতা না করিলে এতদিন বিধবাবিবাহ কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত গৃহে প্রচলিত হইয়া যাইত। যে রাজা রাধাকান্ত দেব বিধবাবিবাহ প্রচলিত না

হওয়ার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন—কালের অদ্ভুত গতিতে সেই গৃহেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইল। কালের স্রোত রোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য। সম্ভ্রান্তশ্রেণী এ কার্য্যে যোগ না দিলে ইহা প্রচলিত হইতে অনেক বিলম্ব হইবে। সেই জন্য আমরা সানুনয়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা রাজা প্রমথভূষণের ন্যায় এই কার্য্যে যোগ দিয়া আপনাদের পদের গৌরব বর্দ্ধন করুন। আমরা তাঁহাদিগের সহকারিতা বিরহিত হইয়া সহজে সিদ্ধকাম হইতে পারি না। কারণ সামাজিক শক্তি অনেক পরিমাণে তাঁহাদিগের হস্তে রহিয়াছে। অর্থবলে অনেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমাদের টোলের পণ্ডিতমণ্ডলীও অনেক পরিমাণে সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মুখাপেক্ষী। সম্ভ্রান্তশ্রেণী ইহাতে যোগ দিলে—পণ্ডিতমণ্ডলী আর প্রতিকূলতা করিবেন না। অনেক বিখ্যাতনামা পণ্ডিতের সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের কথা হইয়াছে—তাঁহারা কেবল বিদায় বন্ধ হওয়ার ভয়ে ইহাতে যোগ দিতে সাহস করেন নাই। সম্ভ্রান্তশ্রেণী যোগ দিলে তাঁহাদের আর সে আপত্তি থাকিবে না। লক্ষ্মী ও সরস্বতী মিলিত হইলে কোন্ কাজ অসিদ্ধ থাকে? ভারতের ভাগ্যে তাহা কি ঘটিবে না? কে বলিতে পারে ঘটিবে না?

আর্য্যবীর।

রাণা রাজসিংহ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এদিকে সোলাঙ্কিরাজ সম্রাট্‌দূতের অবমাননা করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি নিশ্চয় জানিতেছেন তাঁহার নিস্তার নাই। কিন্তু নিজের জন্য তাঁহার চিন্তা হইতেছে না। তাঁহার চিন্তা প্রভাবতীর জন্য। লাবণ্যলহরী প্রভাময়ী প্রভাবতীর রক্ষাসাধন করিতে পারিব না, বৃথা পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইব এই ভাবনায় তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। ক্ষত্রিয় মরিতে আশঙ্কা করেন না, যুদ্ধে মৃত্যু তাহাদের প্রার্থনীয়; কিন্তু প্রভাবতীর কলঙ্ক আশঙ্কা যখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তখন তাঁহার হৃদয় সহস্র বৃশ্চিক দংশনে জ্বলিয়া উঠিল। প্রভাবতীকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে পারিলে তাঁহার যুদ্ধে মৃত্যু সুখনির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু তেমন উপযুক্ত পাত্র কোথায়? একে একে সমস্ত রাজপুত ভূপতি তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। অম্বররাজ—ওঃ, জাতিচ্যুত মানসিংহ বংশে কন্যা সম্প্রদান করিয়া

স্বীয় বংশ কলঙ্কিত করিব? যোধাপুরপতি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু; সালুম্ব্রাভূপতি ক্ষুদ্রসামন্তমাত্র; চৌহানরাজ, সৌন্দর্য্য বিহীন, দেবদুর্লভা প্রভার উপযুক্ত নহে; রাঠোররাজ কঠোরপ্রকৃতি, মৃণাল সম্ভবা প্রভার মিলনে কুসুম কঙ্কবের সমাবেশ হইবে। রাজসিংহ? মণি কাঞ্চনযোগ। কিন্তু তিনি কি এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবেন? আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণী রাজসিংহে কন্যাদান করিবে ইহা অসম্বন্ধ প্রলাপ। কিন্তু তিনি ভিন্ন এ আহবে পরিত্রাতা কই? সম্রাট প্রতিযোগীতায় প্রভাবতীর পাণিগ্রহণে রাজসিংহ ভিন্ন আর কোন্ রাজপুত্র অগ্রসর হইতে পারে? তিনি যেরূপ উদারহৃদয় স্বদেশপ্রেমী রণদুর্ম্মদ তাহাতে উপস্থিত বিপদে তাঁহারই শরণ লওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া অবিলম্বে উদয়পুরে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতের নিকট উপস্থিত বৃত্তান্তের আনুপূর্ব্বিক বর্ণন ও তৎসঙ্গে প্রভাবতীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাবও প্রেরিত হইল।

এদিকে প্রভাবতীও সুস্থিরা নহেন। আরাঞ্জিবের পৈশাচিক প্রকৃতি প্রতিক্ষণেই তাঁহার মনে দুর্নিবার বিভীষিকা উৎপাদন করিতে লাগিল। তিনি নিজের জন্য মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করেন না। তাঁহার চিন্তা পিতার জন্য। সম্রাট প্রতিযোগীতায় সোলাঙ্কিরাজ পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইবেন এ চিন্তা স্বতই হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। বিলাসিতার কোমল ক্রোড়ে প্রতিপালিত পিতার দশা কি হইবে? হায় আমার জন্যই তাঁহার এই শোচনীয় পরিণাম ইত্যাদি চিন্তায় প্রভাবতীর হৃদয় বিদ্ধ হইয়া উঠিল। কোমল প্রাণে বেদনা লাগিল। তিনি যাতনায় অস্থির হইতে লাগিলেন। বীরবালার বৈদ্যুতিকবল অপসারিত হইয়া গেল।

তাঁহার হৃদয়গগন যাতনার প্রাবৃট্-নিবিড় জলধরে মসি মণ্ডিত হইয়া উঠিল। দিগন্তব্যাপী ক্রোধসমীরণ এতক্ষণ তাণ্ডব নৃত্যে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, অকস্মাৎ ধীরভাব পরিগ্রহ করিল। প্রকৃতি নীরব নিস্পন্দ। আর সে ভৈরব মূর্ত্তি নাই। তিমিরাম্বরা বারিদমণ্ডলে আর সেই চঞ্চলা চিকুর দাম ঝলসিয়া উঠে না; থাকিয়া থাকিয়া ভীমরণে আর বজ্রনাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। ঝটিকার নিবৃত্তি হইল বটে কিন্তু অবিশ্রান্ত ধারার বিশ্রাম হইল না। নীল গগন অভিন্ন নীল আঁখি অবিরল ধারায় বক্ষঃতল প্লাবিত করিতে লাগিল। নীরবনিস্পন্দনয়না প্রভাবতী বসিয়া আছেন, দেখিলে বোধ হয় প্রতিমাচ্যুত দেবী-মূর্ত্তি ভূতলে উপবিষ্ট। নিবিড়-কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম অযত্নে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিমা কাঠের ন্যায় অঙ্গলতা আবরিত করিয়া রাখিয়াছে, যেন মেঘে বিজলি খেলিতেছে; যে নয়নে এতক্ষণ অনলকণা উদ্গীর্ণ হইতেছিল তাহা অজস্রধারে সলিলরাশি বর্ষণ করিতেছে।

হায় কমনীয়তা কোমলতার জীবন্ত মূর্ত্তি নারীহৃদয় কি মহৎ ভাবের আদর্শ। এই হৃদয়ের প্রেম গাম্ভীর্য্য অগাধ অনন্ত। নারীর ন্যায় নিঃস্বার্থ হিতৈষিণী পরদুঃখ কাতরা জগতে দুর্লভা, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বুঝি বিধাতা জগতের যাবতীয় কোমল উপাদানে নির্জ্জনে নারীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

যখন দেখিতে পাই অনাথ রুগ্ন পথিক রাজপথে ধূলিশয্যায় শায়িত; বিদেশে বিঘোরে মুমূর্ষুর কাতর ক্রন্দন অলক্ষে নিঃশব্দে দিগন্তে বিলীন হইতেছে; এবং অসংখ্য পথিক এই শোচনীয় দৃশ্য শত হস্ত দূরে রাখিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতেছে, তখন প্রকৃতির কোমলা মূর্ত্তি দয়াময়ী নারী দেবী, সেই ধূল্যবলুণ্ঠিত মুমূর্ষু দেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন, অভিন্ন জননীস্নেহে রোগীর শুশ্রূষা চলিতে লাগিল।

বিষম বিদ্বেষবহ্নিবিজড়িত হইয়া দুই বিশাল জাতি সার্ব্বজনীন সমরে উন্মত্ত হইয়াছে, দয়া নাই মমতা নাই পরস্পরে সহানুভূতি নাই, শত্রুর শোণিত সন্দর্শনই হৃদয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। দেশ বৈরীর নির্যাতনে কত বীর হস্তপদ বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে, অমানুষ বীরপুরুষ সেই ঘোর আহবে শরীর অহুতি প্রদান করিতেছে। বিষম বিপদ রাশি সমাকীর্ণ রণক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন সৈনিকের ক্ষতমুখে শোণিতের ফোয়ারা ছুটিয়াছে; মুমূর্ষুর হৃদয় বিদারক চিৎকারে পাষাণ ভেদ হইতেছে; কে তাহার আসন্ন বিপদে, মৃত্যুমুখে সান্ত্বনা প্রদান করিবে? কে তাহার যন্ত্রনাময়ী প্রাণঘাতিনী পিপাসায় বারিবিন্দু দান করিবে? ঐ দেখ মায়ারূপিনী রমণী দেবী অনাথ সৈনিকের আনতমুখে বারিবিন্দু সিঞ্চন করিতেছেন, ঘৃণা নাই, অবহেলা নাই, সমরাস্ত্রের বজ্রগম্ভীর শ্রবণভৈরবনাদে দৃক্‌পাত নাই। রমণীর এই অলোকসামান্য গুণগ্রামে মোহিত হইয়াই সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক অগস্ত কোমত নারীর দেবীমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া নারীউপাসনার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ রমণী দেবী, মানবী নহে। মানবী নহেন বলিয়া প্রভাবতীর পিতার জন্য এত ভাবনা। উপস্থিত বিপদে পিতার নির্যাতন অপরিহার্য্য—এই চিন্তা যতই হৃদয়ে উদিত হইতেছে ততই নৈরাশ্য যাতনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে আশার বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল। নিবিড় জলদজালে হৃদয়গগন ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, আশার উদ্দীপ্ত আলোকে ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া গেল। অনন্ত মায়াবিনী আশা শনৈঃ শনৈঃ প্রভাবতীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জীব জীবন সজীব করিল, অচেতন শরীরে বৈদ্যুতিক বল ঢালিয়া দিল।

যদি এজীবনে আশার সঞ্চার না থাকিত তবে কত জীবন মুকুলে মুদিত হইত! কত ফুল্লারবিন্দ অকালে শুকাইয়া যাইত!

এই আশা কুহকে প্রলোভিত হইয়াই বিগতগৌরব রাজরাজেশ্বর ভিক্ষায় জীবন অতিবাহিত করিয়াও জাগ্রতস্বপ্নে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রনষ্টশ্রী করগত করিতেছে; ক্ষত্র বীর প্রফুল্ল যৌবনে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে; রাজপুত সীমন্তিনী অনন্ত রূপরাশি, লাবণ্যরাশি অনলমুখে প্রক্ষেপ করিতেছে; সংসারবাসনাবিচ্ছিন্ন পতি অসার পার্থিব সুখে বিসর্জ্জন দিয়া চরমে পরমগতি লাভলালসায় লালায়িত; কতবৎসর অতীত হইল ধ্যানস্তিমিতনেত্রে পর্ব্বতসানু আলোকিত করিতেছেন,মায়াময় সংসার জীবনের দুশ্ছেদ্য বন্ধন শিথিল করিতে করিতে অধ্যাত্ম জীবনে অগ্রসর হইতেছেন

কিন্তু আশার ইয়ত্তা নাই। প্রতিক্ষণেই প্রাণনাথের প্রণয় সংমিলন মনে উদিত হইয়া অদ্ভুত আনন্দ ঢালিয়া দিতেছে। স্মৃতিগত মোহনমূর্ত্তি প্রতি মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল অক্ষরে অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে।

আনন্দপুত্তলী শিশুকুমার শেষশয্যায় শায়িত, প্রাণ বায়ু চিরন্তরে অপগত; হায় আশার ইন্দ্রজালে অভাগিনী জননী তখনও আশ্বাসিত; কুহকিনী আশা প্রতি ক্ষণেই প্রাণকুমারের পুনর্জ্জীবন কল্পনা করিতেছে।

'রাজসিংহ' এই অমৃত মিশ্রিত নামাক্ষর যখন অস্ফুটস্বরে প্রভাবতীর রসনায় উচ্চারিত হইল, যখন সেই পুরুষপ্রবর তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইলেন তখন হৃদয় আশার সহস্র উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল "শুনিয়াছি রাজসিংহ প্রকৃত শৌর্য্য বীর্য্য সম্পন্ন। রাজসিংহ ভিন্ন রাজপুত্র কে আছে সম্রাটের কৃপাভিক্ষা না করে? কন্যা ভগ্নী প্রদান করিয়া বাদসাহের প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা না করে?" রাজসিংহপক্ষপাতিনী প্রভাবতীর প্রাণ মন তন্ময় হইল। রাজসিংহের অমানুষ গুণগ্রাম, যাহা ভট্টকবির গাথা গানে শ্রবণ করিয়াছেন,যে নামের যশোগানে দেশবিদেশ পরিপূরিত হইয়াছে, সে নাম স্বতঃই প্রীতিপ্রদ আশাবর্দ্ধক সন্দেহ নাই। সে নামের অপূর্ব্ব মহিমায় যুদ্ধশ্রান্ত ক্ষত্রবীরের নিস্তেজ দেহ সতেজ হইত, শিরায় শিরায় শোণিত ছুটিত, সহস্র মাতঙ্গ বলে বীর হৃদয় নাচিয়া উঠিত। যবন পীড়িত অত্যাচারিত হৃদয় সে নামে সান্ত্বনা পাইত।

সেই অনুপম নামে প্রভার হৃদয় বিদ্যুৎছটায় আলোকিত হইল। অবিলম্বে উপস্থিত বৃত্তান্তবিজ্ঞাপক লিপি উদয়পুরে প্রেরিত হইল। রাজসিংহ স্বল্পসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় নির্গত হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে প্রভাবতীর পত্র প্রাপ্তে চমকিত হইয়া উঠিলেন। সম্রাট্ হস্তে সতীর অবমাননা হইবে, এ চিন্তা রাজসিংহের অসহনীয় হইল। স্বল্পাক্ষর পত্রের মর্ম্ম মুহূর্ত্তে বুঝিয়া লইলেন। বুঝিলেন সিংহিনী

শৃগাল অনুরত হয় না, বিধর্ম্মী যবন অতুল সম্পদের আস্পদ হইলেও কীটের সমান গণনীয়। ধন্য তুমি প্রভাবতি! তুমি রমণীকুলের অগ্রগণ্য; তোমার ত্যাগ-স্বীকার ধন্য। না হইবে কেন? মাধবী-লতা সহকারেই বিজড়িত হয়। চন্দ্র কিরণে কুমুদিনীই প্রস্ফুটিত হয়। তুমি পৌর্ণমাসী কৌমুদী, রাজসিংহ পূর্ণ শশী। কাঞ্চনে রতনে অপূর্ব্ব সংযোগ।

প্রকৃতির গহন গম্ভীর নিস্তব্ধতায় সুষুপ্তির শান্তিহারিণী সুকুমার ক্রোড়ে রূপনগর বিন্যস্ত। উপরে অনন্ত আকাশে অনন্ত তারকারাশি, পার্শ্বে প্রত্যন্ত ভাগে পর্ব্বতবাহিনী পেশলা কুল কুল স্বরে খরস্রোতে বহিয়া যাইতেছে। সম্মুখে অভ্রভেদী দুর্ভেদ্য আরাবল্লী উন্নত শিরে ভীম দর্শন বিকাশ করিতেছে। নিস্তব্ধ নিশীথের এই ঘোর গম্ভীরতা রূপনগরের আকাশ পাতাল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে হৃদয় অনন্ত চাঞ্চল্যে চক্রবৎ বিঘূর্ণিত হইতেছিল; আশার উচ্চ সোপানে উত্থিত হইয়া যে দেহ লাবণ্যলীলায় লীলায়িত হইতেছিল; সে হৃদয়ে আর চাঞ্চল্য নাই, সে দেহ অচল অভিন্ন জড় পদার্থ। সে দেহ হতাশ প্রণয়ে, অসহ্য শোকে, নিরাশার বিড়ম্বনায়, যে হৃদয় শান্তিশূন্য ছিল, সুষুপ্তির অতুল করুণায় সুখে শান্তিলাভ করিতেছে। কত জীবন চিরতরে দুঃখ-তামসে সমাচ্ছন্ন ছিল, সুখের সূর্য্য আর উদয় হয় না, আশার বিদ্যুৎ আর খেলে না, এখন সে হৃদয়ে আশার অবধি নাই। কত পতিবিয়োগবিধুরা পতি সংমিলন লাভ করিতেছে;—কত শোকাতুরা জননী সন্তানের চন্দ্রানন দেখিয়া সুখী হইতেছে। সুষুপ্তি সাগরে অগণ্য কল্পনা ভাসিয়া বেড়াইতেছে; রাজা, প্রজা, ধনী, মানী, দরিদ্র, বাল, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই এই সুষুপ্তি সাগরে ডুবিয়াছে, কল্পনা তরঙ্গে ভাসিতেছে। সহসা আরাবল্লীর অভেদ্য অন্তর্দ্দেশ ভেদ করিয়া ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। আল্লাহো রবে পর্ব্বত ভূমি আন্দোলিত হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণেই বিদিত হইল প্রভাবতীর অপহরণ ও রূপনগর বিধ্বস্ত করণার্থ সম্রাটসৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে ভীমরবে রাজদুর্গ উদ্ঘাটিত হইল। নিবীড় নিশীথের এই অতর্কিত আক্রমণে রাজপুত সৈন্য সহসা ছিন্ন ভিন্ন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। আক্রমণ যতই কঠোর হউক, যতই অতর্কিত হউক, রাজপুত্র মরিতে ভয় করে না। ক্ষিপ্রহস্তে সুসজ্জিত হইয়া ত্বরিতগতি রণরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিল।

দিল্লী হইতে বিপুল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, রূপনগরের ধ্বংস অনিবার্য্য, এই অমূলক প্রবাদ অচিরে দুর্গমধ্যে প্রচারিত হইল। রাজপুত জয়াশায় জলাঞ্জলি দিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিলে হয়ত আরাঞ্জিবের দুই

সহস্র সেনা নিমেষে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত। কিন্তু নিবিড় নিস্তব্ধ নিশীথের গভীর অন্ধকারে,—আগন্তুক বাজীরাজির হ্রেষারবে, করিমুখের বৃংহিত ধ্বনিতে এবং তদুপরি প্রতিধ্বনির সুগম্ভীরনাদে অগণ্য সৈন্য অনুমিত হইতে লাগিল।

অন্ধকারের করাল কালিকা মূর্ত্তির লোল জিহ্বা, লহলহ করিতেছে, যেন রূপনগর গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। অদূরে ভীম গর্জ্জনে যবনের কামান বিকট হাস্যে বিদ্যুৎ বিকীর্ণ করিতেছে।

উগ্রমূর্ত্তি রাজপুত ক্ষিপ্রহস্তে সজ্জিত হইয়া অনল কীটের ন্যায় যুদ্ধানলে পড়িতেছে; ক্ষোভে রোষে মর্ম্মাহত রাজপুত্র এই অতর্কিত আক্রমণে আত্ম-বিস্মৃত। কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। অবশেষে আত্মবলিই এই ঘোর আহবে প্রভুপরায়ণতার প্রতিদান বিবেচিত হইল। একে একে বীরবৃন্দ প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া যবনসাগরে ঝম্প প্রদান করিতেছে; শত শত যবন নিহত করিয়া অবলীলায় নিজ দেহ বিসর্জ্জন দিতেছে। অস্তগত তারকার ন্যায়, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায়, দুর্গ প্রাকার দেখিতে দেখিতে রাজপুত শূন্য হইল। রাজপুত রক্তে ধরণী আপ্লুত হইয়া উঠিল। কুসুম স্তবকের ন্যায় সুসজ্জিত রাজপুতের কাঞ্চনকান্তি অবনী আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

কত ফুল্লারবিন্দ প্রফুল্ল যৌবনে পিতা মাতা ভ্রাতা কুসুম শোভনা দয়িতার কাতর প্রাণে বেদনা দিয়া, অকালে কাল নাটের উপসংহার করিয়াছে; আর সেই কমনীয় হৃদয়ে সহস্র কল্পনা জাগিবে না; অবিরামবাহিনী লালসা-নদী আর খর স্রোতে বহিবে না, দুরাকাঙ্ক্ষার তাড়িত বেগ আর আবেগ-ময় হইয়া উঠিবে না। অনাথ শিশুর এক মাত্র আশ্রয় স্থল, মাধবিকার সঙ্কার প্রবল আবর্ত্তনে পতিত। কোমল শোভনা বল্লরী যে ধ্রুবতারার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, আশ্বাসে জীবন ধারণ করিত; তৃষিতা চাতকিনী যে নিবিড় নীরদ নিরীক্ষণ করিয়া আশায় তৃষ্ণা নিবারণ করিত, সে তারকা অস্তগামী; সে নীরদমালা মিলাইয়া গিয়াছে।

রূপনগরের এই শোচনীয় সৈন্যক্ষয়ে উন্মত্ত মোগল, ঘোররবে দুর্গ প্রবেশ করিল। অস্তগত সূর্য্যের ন্যায়, প্রমুদিত কমলের ন্যায়, বীরবৃন্দ অচল অস্পন্দ। কে আর সেই যবনের উত্তাল তরঙ্গে আবর্ত্ত উপস্থিত করিবে?

রূপনগর বিপক্ষ হস্তে পতিত হইল। আর সে রাজপুতরত্ন প্রভাবতী? বিহঙ্গিনী পিঞ্জরাবদ্ধ। যবনদলপতি প্রভূত সম্মানে শিবিকাবদ্ধ প্রভাবতী সমভিব্যাহারে লইয়াছেন। অগ্রপশ্চাতে শাণিত কৃপাণে রক্ষীদল দলে দলে অগ্র-সর হইয়াছে। হায় সতীকুলললাম প্রভাবতী যবনের করায়ত্ত? পিঞ্জরে

বিহঙ্গিনী স্তিমিতনয়না, আনতবদনা; হৃদয়ে রাজসিংহের দেবমূর্ত্তি, এখনও সতীর মনে নিরাশার সঞ্চার হয় নাই। রাজসিংহময়ী প্রভাবতী অন্তরে বাহিরে রাজসিংহ নিরীক্ষণ করিতেছেন। ক্ষত্র কুলপতি রাজ রাজেশ্বর রাজসিংহ কখন স্থির থাকিবার পাত্র নহেন; অনাথা রমণীর কৃপাভিক্ষা রাজসিংহের নিকট কখন বিফল হইবে না, এই হৃদয় গত আশ্বাসে প্রভাবতী আশ্বস্তা।

এদিকে রাজসিংহ মৃগয়ায় নির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে প্রেরিত দূত প্রভাবতীর পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। প্রভাবতীর আসন্ন বিপদে রাজসিংহ অস্থির হইয়া উঠিলেন। আমি বিদ্যমানে রাজপুতসতী যবনের করে আত্মসমর্পণ করিবে? প্রফুল্ল কমল ভেকে উপভোগ করিবে? দেবভোগ্য অমৃত কুক্কুরভোগ্য হইবে? বলিতে বলিতে সেই সুকুমার কন্দর্পকান্তি রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রচণ্ড প্রদীপ্ত সূর্য্য সহস্র রশ্মি বিকাশ করিল।

অবিলম্বে ত্বরিত গতি তুরঙ্গম, তাড়িত বেগে ছুটিয়া চলিল। সমভিব্যাহারী স্বল্পসংখ্যক সহচর প্রভুর অনুবর্ত্তন করিল।

অদূরে ভীমদর্শন আরাবল্লী বিরাট দেহে বিরাজিত; মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিবিভ্রান্তিকর দীর্ঘ দেবদারু ভীষণ পিশাচ মূর্ত্তিতে ভীতি সঞ্চার করিতেছে; গিরিনির্ঝরিণীর বল সঞ্চালনে, প্রবল পবনের তীব্র স্বনে, আরাবল্লীর অন্তর্দেশ প্রকম্পিত। যবনগণ সন্ত্রস্ত মনে ত্বরিত পদে সেই বিপদসঙ্কুল ভয়ঙ্কর স্থল অতিক্রম করিতেছে এমন সময়ে এক প্রকাণ্ড পাষাণস্তূপ সৈন্যব্যূহে পতিত হইল। বহুসংখ্যক যবন এই অতর্কিত আঘাতে যবনলীলা সম্বরণ করিল। অবশিষ্ট সৈন্য প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পর্ব্বত বাহিরে আসিবার জন্য অগ্রপশ্চাতে ধাবিত হইল। সেই সংকটসমাকুল গিরিসঙ্কটে উভয়দল সবেগে আক্রান্ত হইয়া সমূলে বিধ্বস্ত হইল। অভাগিনী প্রভাবতীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহার হতাশ হৃদয় নিরাশার নিদারুণ আঘাতে শুষ্ক শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সহসা উল্লাসের স্নিগ্ধ সিঞ্চনে সজীব হইয়া উঠিল। যোগ্যে যোগ্য সমাযুক্ত হইল; কুমুদিনী চন্দ্রেই আসক্তা হয়, মাধবিকা সহকারেই বিজড়িতা হয়। প্রভাবতী রাজসিংহে সংযুক্তা হইলেন। রূপনগরকুমারীর উদ্ধারের কথা আরাঙ্গিবের কর্ণগোচর হইলে তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। অবিলম্বে রাজপুত দলনে বিপুল সমরের আয়োজন হইতে লাগিল। আবার এই সময় রাজসিংহ সম্রাটের ঘোর অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া এক কঠোর লিপি প্রেরণ করেন। ধূমায়মান বহ্নি পত্রিকা ইন্ধনে ভীমরবে গর্জ্জিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র সৈন্য সম্রাট পতাকামূলে একত্রিত হইতে লাগিল। এইসময় দক্ষিণে

জোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শিবজি মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মোগলসৈন্য বিদলিত করিতেছিলেন। আরাঙ্গিব প্রভূত পরিশ্রমেও শিবজির শাসনে সক্ষম হন নাই। মারহাট্টাপতি সদর্পে অত্যাচারী যবনের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বিস্তীর্ণ রাজ্যের একচ্ছত্রী প্রভু হইয়াছেন। আরাঙ্গিব শিবজির স্বাধীনতা হরণ রহিত করিয়া নিজ সম্মান রক্ষণে সমধিক মনোযোগী হইলেন। আপাততঃ দাক্ষিণাত্যের সামরিক ব্যাপার স্থগিত থাকিল। রাজপুত দমনে সর্ব্বতোমুখী শক্তি সংযোগ করিবার নিমিত্ত সমস্ত সৈন্য একত্র হইল। সম্রাট বাবরের সময় হইতে যে রাজপুত সম্পদে বিপদে সহকারিতা করিয়া আসিতেছে; যাহাদের অমিত ভুজবলে শত শত যুদ্ধে বিজয়লাভ হইয়াছে সেই চির বিশ্বস্ত রাজপুত আজি আরাঙ্গিবের চক্ষুঃশূল হইয়াছে; তাঁহার ক্রূর হৃদয় রাজপুতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে চায় না; তিনি তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই সময়ে জয়সিংহ এবং যশোবন্ত সিংহ সম্রাটসৈন্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই দুই কার্য্যদক্ষ রণবীরের সহকারিতায় আরাঙ্গিব নিজ রাজত্ব অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন। কূটবুদ্ধি সম্রাট কালকূট প্রয়োগে জয়সিংহের জীবন হরণ করিল। যশোবন্তের মৃত্যুর পর তদীয় শিশুকুমারের প্রাণ সংহারের ষড়যন্ত্র করিল। এইরূপে দুই কার্য্যদক্ষ প্রভুপরায়ণ সেনানীর দক্ষতার, প্রভুপরায়ণতার প্রতিদান প্রদত্ত হইল। যশোবন্তকুমার রাজসিংহের শরণাগত হইলেন। অচিরে সম্রাট বাহিনী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় রাজপুতনা যাত্রা করিল। তাহাদের অমানুষ অত্যাচার বর্ণন করে কাহার সাধ্য? শোণিতশোষক সিংহশার্দ্দূলের শোণিত লালসা তাহাদের অত্যাচার লালসার তুলনা হইতে পারে না। উদ্দাম প্রকৃতি মোগলসেনা রাজপুতানার অভূত অনিষ্টসাধন করিল। অবিরল ধারে পশুহত্যা, শিশুহত্যা, নারীহত্যা চলিতে লাগিল। শত ২ রমণী সতীত্ব হারা হইল, শত শত গৃহী সবংশে ধ্বংস হইল; গ্রাম অরণ্য হইয়া উঠিল, শোণিতে নদী বহিল। যবনের গন্তব্যপথ গৃহশূন্য, গাভীশূন্য জনশূন্য অরণ্য।

এ ঘোর অত্যাচারে তেজস্বী রাজপুত্র আর কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? আজি মিবার ভূমি অগণ্য রাজপুত্রে পরিপূর্ণ হইয়াছে; "রাজপুত আজি আত্মবলি দিয়া, হৃদয়ের রক্ত দিয়া যবন অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবে, গাভিহত্যা প্রাণী হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রতিজ্ঞা করিল মোগল শোণিতে শাণিত অসি অভিষিক্ত না করিয়া জীবিত দেহে গৃহে ফিরিবেনা। তাহারা এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মহারাণার শরণ লইল। রাজসিংহ স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত।

অনুগত শরণাগত রাজপুতের অনুকূল প্রার্থনা সাদরে গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। অসাধারণ উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া রাজসিংহ কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। রাজপুতের অদম্য উৎসাহে মোগলসেনা হতবীর্য্য ও পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। কত কত সেনাপতি বিষম গিরিসঙ্কটে পতিত হইয়া আত্মাহারা হইয়া সদলে নিহত হইল; আরাঞ্জিব স্বয়ং এইরূপে আক্রান্ত হইয়া সমূহ যাতনা ভোগ করিলেন। তাঁহার বিজয় বাসনা তিরোহিত হইয়া গেল। বুঝিলেন রাজসিংহ সামান্য বীর নহেন; তিনি অনেক শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছেন, কিন্তু এরূপ সর্ব্বজনীন একতার ঐক্যতায় যুদ্ধ করিতে কুত্রাপি দেখেন নাই। হিন্দুর মধ্যে এরূপ ঐক্য হইতে পারে আরাঞ্জিব জানিতেন না। তিনি রাজসিংহের অলৌকিক ক্ষমতায় চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন সমগ্র রাজস্থান রাজসিংহের করায়ত্ত। কি কুহকময়ী ইন্দ্রজাল শক্তিতে রাজসিংহ সাধারণের প্রীতিপ্রদ, অত্যাচারী কর্ম্মচারী যবন কি করিয়া অনুভব করিবে? যে পামর তুচ্ছ সাম্রাজ্য লালসায় পিতার মনে যাতনা দেয়, সহোদরের জীবন সংহার করে, পরের মন আকর্ষণ করিয়া মহারাণা কিরূপে দেব সম্মান লাভ করিলেন; কিরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একতা সম্পাদন করিয়া একপ্রাণ করিয়া তুলিলেন; তাহা সে কিরূপে বুঝিবে। আরাঞ্জিব! তুমি যদি প্রজ্বলিত দুরাকাঙ্ক্ষার দাস হইয়া নিষ্ঠুরতার একশেষ না করিতে, যদি কূট বুদ্ধির পরিচালনায় স্বীয় কলুষিত হৃদয়ের পরিচয় না দিতে, তাহা হইলে তুমিও এইরূপে রাজসিংহের দেবসংকাশ উচ্চ গুণের অধিকারী হইয়া অতুল্য সুখে সুখী হইতে পারিতে। তুমি রাজ রাজেশ্বর, তোমার তুলনায় রাজসিংহ অতি সামান্য। কিন্তু হৃদয়গত উচ্চতায় রাজসিংহ স্বর্গের দেবতা। তুমি নরকের কীট। রাজসিংহের অমানুষ কীর্ত্তি চিরকাল উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত থাকিবে। আর তুমি হেয় অশ্রদ্ধেয় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া অধম দলের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংসার।

বিশাল সংসার ক্ষেত্র, বিস্তৃত সুন্দর ঘোর গম্ভীর দরশন।
অদ্ভুত অনন্ত শূন্য, অনন্ত ঐশ্বর্য্য পূর্ণ
অনন্ত সবিতা, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্রমা পৃথ্বী পূর্ণ নিরঞ্জন!
দিবস, রজনী, ঊষা, প্রাতঃ, সন্ধ্যাকাল সিন্ধু বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে বহে অনুক্ষণ!

২

অনল, অনিল, জল, মৃত্তিকা, আকাশ, বিশ্ব বিকাশ কারণ।
সর্ব্বত্র সঙ্গতভ বে, ভাঙ্গিছে গঠিছে ভবে,
জড়, কি অজড়, ছোট বড়, সর্ব্ব ভূতে কি বা নিয়ম লিখন!
কি এক অদ্ভুত সূক্ষ্ম সর্ব্ব শুভপ্রদ শক্তি বাসনা বলেতে বিশ্ব কেমন চলিছে

৩

কেলি বিচিত্র এই অনন্ত নিখিল ঘোর চিন্তা পারাবারে।
কে পারে বা সন্তরিতে, দুর্গম সৈকত হ'তে,
দেখিয়া অপার সিন্ধু তরঙ্গ উচ্ছ্বাস ত্রাস জন্মায় অন্তরে!
অনন্ত বিশ্বেতে ক্ষুদ্র কঙ্কর সন্নিভ এই পৃথিবীর জ্ঞানী ভ্রমে সৈকতে সন্তরে।

৪

হে এ ক্ষুদ্র পৃথিবীর মানব সকল, পেয়ে বুদ্ধির পালক
অবোধ পতঙ্গ মত, স্পর্দ্ধায় উড়িছ কত?
কতক্ষণ উড়িবে বা? পড়িবে এখনি ছিন্ন হইয়া পালক
অনন্ত প্রকৃতিরাজ্যে অনু-অপি অনু হ'য়ে কিসের কারণে দম্ভে মারিছ মালক?

৫

সাগর, সরিৎ, বৃক্ষ ব্রততী কুসুম ফল শস্য সুশোভিনী
নানা পশু পক্ষী প্রাণী, নানা ধন রত্ন খনি,
নানা দেশ জনপদ জননী ধরণী চন্দ্রাননী,
অহরহঃ জীবন উচ্ছ্বাস কোলাহলময়ী মাতঃ ভ্রান্ত শিশু মোরা কিছুই না জানি।

৬

অনন্ত জগৎ চিন্তা দূরে থাক মাতঃ! তব মহিমা ভাবিতে।
কোটীর কল্প যুগ গত, জলের বুদ্বুদ মত,
শত শত জ্ঞানী ভে'সে উঠিল ডুবিয়া গেল কাল সাগরেতে।
কটী সত্য অদ্যাবধি অবিরোধী ভাবে ভবে হ'য়েছে ঘোষিত তাহা হইবে বুঝিতে।

৭

সত্য যা স্বতসিদ্ধ সময় আপনি তাহা করিবে প্রচার।
অসত্যে আবৃত হ'য়ে, ভ্রান্ত সত্য বুঝাইয়ে,
শয়তান, পণ্ডিত হ'ল, জল্লাদ রাজন, চোর হ'ল জমীদার।
বলে ছলে কৌশলে মৃত্তিকা অধিকার প্রথা রাজধর্ম্ম বলিয়া সংহিতা হ'ল তার।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়া।

কলিকাতার জাতিসাধারণ মেলা অষ্ট্রেলিয়াবাসীদিগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং উহাতে অষ্ট্রেলিয়ার যে পরিমাণে লাভের সম্ভাবনা, বোধ হয় আর কোন জাতির সেরূপ সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য বিস্তার করা এবং তাহার সহিত ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ স্থাপন করার উদ্দেশেই অষ্ট্রেলীয়গণ এই মেলার অনুষ্ঠান করেন। জুবর্ট সাহেব অষ্ট্রেলীয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলীয়দিগের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, কালে অষ্ট্রেলীয়দিগের সহিত ভারতবর্ষবাসীদিগের পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। সেই সংঘর্ষ ভারতের মঙ্গল বা অমঙ্গলের হেতু হইবে তাহা ভবিষ্যৎ-গর্ভে নিহিত। কিন্তু যে জাতি ও যে দেশের সহিত আমাদিগের এরূপ নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে সে দেশ ও সে জাতির বিবরণ জানিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। অতএব সংক্ষেপে আমরা ঐ দেশ ও ঐ জাতির বিবরণ প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিব।

অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎদ্বীপ। ইহা ইউরোপের তুল্য বৃহৎ। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার ইউরোপ হইতে কত প্রভেদ! ইউরোপে যেমন অনেক প্রধান প্রধান রাজ্য আছে তাহা থাকা দূরে থাকুক ইহাতে একটী মাত্রও রাজ্য নাই। জনকোলাহল পূর্ণ হইবার পরিবর্ত্তে অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ স্থলে মরুভূমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই সকল জঙ্গলে অত্যল্পসংখ্যক অৰ্দ্ধ উলঙ্গ অসভ্য জাতীয়েরা ভ্রমণ করিয়া থাকে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে বৃহৎদ্বীপটিতে একটী ও নগর ছিল না; এক্ষণে সমুদ্রের উপকূলের নিকট কতকগুলি বৃহৎ নগর আছে কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প মাত্র। ইংরাজ ঔপনিবেশিকেরা এই সকল বৃহৎ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং এই সকল নগরে তাঁহারা বাস করেন।

অষ্ট্রেলিয়া ইউরোপের তুল্য দেখিতে সুদৃশ্য নহে; কারণ ইহাতে সুদৃশ্য নদী-সংহতি নাই। সুদৃশ্য নদীসংহতি দ্বারা ভূমির শ্রীবৃদ্ধি হয়। অষ্ট্রেলিয়ার অধি-কাংশ নদী নদীনামের উপযুক্ত নহে; তাহারা অনেকটা জলপূর্ণ গর্ত্তের ন্যায় এবং গ্রীষ্মকালের কোন কোন সময়ে শুকাইয়া যায়। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়াতে একটী অতি সুন্দর, প্রশস্ত, দীর্ঘ ও গভীর নদী আছে, তাহার নাম মরে। ইহা ছয়শত ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। যদি অষ্ট্রেলিয়াতে মরে নদীর মত আরও কতকগুলি নদী থাকিত তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া বাস্তবিক একটি সুন্দর স্থান হইত।

সেখানে এত অল্প জলের কারণ প্রচুর বৃষ্টির অভাব। কখন কখন দুই বৎসর ধরিয়া সেখানে প্রচুর বারিবর্ষণ হয় না এবং তৃণ সমস্ত শুষ্ক, বৃক্ষসমূহ পিঙ্গলবর্ণ ও বায়ু ধূলিতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সেখানে বৃষ্টির এত অভাব কেন? তাহার কারণ আমি এই বিশ্বাস করি যে সেখানকার পর্ব্বত সমূহ উচ্চ নহে; কারণ উচ্চ পর্ব্বত সকল মেঘমালাকে একত্র সংঘর্ষণ করে। সেখানে ইয়োরোপের আল্প পর্ব্বতশ্রেণীর সমান উচ্চ একটীও পর্ব্বত শ্রেণী নাই। সেখানকার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বতটী উচ্চতায় আল্প পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্ছ্রায়ের অর্দ্ধেক মাত্র। *

জন্তু।—ইংলণ্ডে যে সকল জন্তু আছে তাহা অষ্ট্রেলিয়াতে নাই আবার অষ্ট্রেলিয়াতে যে সকল জন্তু আছে তাহা ইংলণ্ডে নাই। শ্বেত শশকও নাই, কৃষ্ণ শশকও নাই, নাইটিঙ্গেল পক্ষীও নাই, থ্রস পক্ষীও নাই। এক সময়ে সে খানে অশ্বও ছিল না, গাভীও ছিল না, এবং মেষও ছিল না; কিন্তু এক্ষণে সেখানে এসকল অনেক হইয়াছে। যখন ইংলণ্ড হইতে ঘোটক অষ্ট্রেলিয়ায় আনীত হইয়াছিল তখন অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা প্রথম ঘোটক দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল; কারণ তাহারা এইরূপ বৃহৎ জন্তু পূর্ব্বে কখন দেখে নাই।

অষ্ট্রেলিয়ায় যে সকল পশু দেখা যায় তন্মধ্যে কাঙ্গারু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কাঙ্গারুর সম্মুখের পদদ্বয় ক্ষুদ্র, পশ্চাতের পদদ্বয় দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ এবং ইহার পেটের নীচে একপ্রকার থলিয়া আছে তন্মধ্যে ইহার শাবকগণ আশ্রয় লইয়া থাকে। এই থলিয়া থাকা প্রযুক্ত ইহা প্রাণীতত্ত্বে "দ্বিগর্ভ" বলিয়া অভিহিত। কাঙ্গারু অতি শান্তপ্রকৃতি এবং সহজেই পোষ মানে। একটী কাঙ্গারু কোন উপনিবেশীর উদ্যানের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং মাঠের উপর ঘাস চরিয়া খাইতেছে এরূপ দৃশ্য প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কাঙ্গারু যদিও সহজে পোষ মানে, তথাপি ইহার বন্যাবস্থায় ইহাকে সহজে ধরা যায় না, কারণ কাঙ্গারু শূন্যে দীর্ঘ লম্ফ প্রদান করিয়া থাকে। এই পশু যদিও মেষ অপেক্ষা বৃহৎ নহে তথাপি ইহার এক একটী লম্ফ ঘোটকের লম্ফ অপেক্ষা অধিক উচ্চ। যখন কুকুরেরা ইহাকে শিকার করিবার নিমিত্ত ইহার পশ্চাদ্ধাবন করে তখন এই পশু যখনি পারে, জলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইয়া এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তৎক্ষণ কুকুরেরা ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া ক্ষণকালের মধ্যে ক্লান্ত ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং অনেক

* অষ্ট্রেলিয়ার পর্ব্বতসকল প্রায় ৭০০০ ফিট করিয়া উচ্চ।

জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া ডুবিয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়াতে আর একটা অন্যপ্রকার পশু আছে। তাহাকে অপোজম কহে। এই পশুরও ক্ষুদ্র শাবক দিগকে আশ্রয় দিবার জন্য একটী থলিয়া আছে। ইহা চরিয়া ঘাস খাইবার পরিবর্ত্তে বৃক্ষের পাতা খাইয়া থাকে। হরিণের ন্যায় ইহার মুখশ্রী শান্ত এবং বানরের ন্যায় ইহার লম্বা লাঙ্গুল আছে। ইহা কাঠ-বিড়ালের ন্যায় বৃক্ষোপরি লুকাইয়া থাকে। পেচকের মত এই পশু দিবাভাগে কখনই দৃষ্ট হয় না কিন্তু রাত্রিকালেই খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হয়। অপোজম যে গর্ত্তে লুকাইয়া থাকে সেই সকল গর্ত্ত অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে কৃষ্ণবর্ণ অষ্ট্রেলিয়াবাসিরা অত্যন্ত পটু; এবং তাহারা এই পশুদিগকে, ইহাদের লাঙ্গুল ধরিয়া বৃক্ষ কোটর হইতে এরূপ কৌশলে টানিয়া বাহিরে লইয়া আইসে যে ইহারা তাহাদিগকে কোন প্রকারে তীক্ষ্ণদন্তদ্বারা কামড়াইতে পারে না। অষ্ট্রেলিয়েরা ইহাদিগের চর্ম্ম-যোগে বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার বন্য কুকুরদিগকে ডিঙ্গো কহে। এই কুকুরেরা দেখিতে কুৎসিৎ। ইহারা রাত্রিকালে আমাদিগের বঙ্গদেশের কুকুরের ন্যায় এরূপ বিশ্রী কেঁদোসুরে শব্দ করিয়া থাকে যে সেই শব্দ শ্রবণমাত্র কৃষক ও রাখালেরা অত্যন্ত ভীত হয়। ইহারা এত সাহসী যে অতিবেগে প্রকাশ্য স্থানে আসিয়া বাছুর অথবা শূকরশাবক যাহা পায় লইয়া যায়; এবং যখন ইহারা বাছুর, বা শূকর শাবককে বনে টানিয়া লইয়া যায় তখন নিষ্ঠুর রূপে ইহারা সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের পা খাইয়া ফেলে, কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে মারে না।

কাঙ্গারু, অপোজম এবং ডিঙ্গো এই তিনটী অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রধান পশু।

পক্ষীদিগের মধ্যে এমেউ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা প্রায় অষ্ট্রীচ পক্ষীর ন্যায় উচ্চ এবং ইহার শরীরে সুন্দর ও নরম পালক আছে। এই পালক অষ্ট্রীচ পক্ষীর পালকের অপেক্ষা সুন্দর নহে। এমেউ পক্ষীতে একটী কৌতুকাবহ বিষয় এই যে, ইহার জিহ্বা নাই। অতএব তোমরা অনুমান করিতে পার যে এই পক্ষী গানও করিতে পারে না, বুলি বলিতেও পারে না; ইহা কেবল গলা হইতে শব্দ করে। কিন্তু যদিও ইহা চুপ করিয়া থাকে তাহা হইলেও অষ্ট্রেলিয়াতে এত প্রকার শুকপক্ষী ও কাকাতুয়া আছে যে তাহাদের চীৎকার শব্দে বায়ু পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের লোকেরা এই সকল পক্ষীকে বাণিজ্যের নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচনা করে; কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার লোকে এই সকল পক্ষীর পিষ্টক কিম্বা ঝোল প্রস্তুত করিয়া খায়। এমন কি অষ্ট্রেলিয়ায় শুকপক্ষীর পিষ্টক ও কাকাতুয়ার ঝোল সাধারণ খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত। যাহা হউক

অধিকাংশ শুক ও কাকাতুয়া কৃষ্ণবর্ণ লোকেরা ধরিয়া থাকে এবং তাহা সচরাচর ইংরাজদিগের নিকট বিক্রয় করে। ইংরাজেরা সেই সকল পক্ষীকে তাহাদিগের স্বদেশ ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেয়।

ইংলণ্ডে ও আমাদিগের দেশে যে প্রকার গায়ক পক্ষী আছে অষ্ট্রেলিয়ায় সে প্রকার গায়ক পক্ষী একটিও নাই। ইংলণ্ডের ন্যায় যদিও সেখানে রক্তবর্ণবক্ষ রবিনপক্ষী (Robin red-breast) আছে তথাপি এই পক্ষী ইংলণ্ডে যে প্রকার সুমিষ্টস্বরে গাইয়া থাকে এখানে সে প্রকার গান করে না। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়াতে অনেক প্রকার হাস্যকারী পক্ষী আছে। তাহাদিগের মধ্যে একটীকে ইংরাজেরা "হাস্যকারী জ্যাকাস" Jackass কহিয়া থাকে। সেই পক্ষী দিনের মধ্যে তিনবার করিয়া অত্যুচ্চৈস্বরে হাস্যধ্বনি করে। সে যখন প্রাতঃকালে হাস্যধ্বনি আরম্ভ করে তখন প্রথমবারে হঠাৎ একটি কর্কশ উচ্চ হাস্যধ্বনি শ্রুত হয় এবং দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার পর্য্যন্ত ঐ হাস্য পুনরাবৃত্ত হয়। অবশেষে হাস্যকারী পক্ষীদলস্থ সমুদয় পক্ষী একত্রে এরূপ চীৎকারধ্বনি করে যে বোধ হয় যেন তাহারাও হাসিতেছে এবং এইরূপ হাস্য কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। অনন্তর তাহারা সকলে পুনর্ব্বার চুপ করিয়া যায়। এই রূপ শব্দের দ্বারা অনেকের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে। দুই প্রহর বেলায় এই প্রকার শব্দ পুনর্ব্বার শুনিতে পাওয়া যায়; এবং বৈকাল বেলাতেও ঐ পক্ষীদিগের একত্রে সাধারণ হাস্য শুনা যায়। ছেলে পিলেরা যে প্রকার কোন নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টা বা সময়ে হাস্য করে না ঐ সকল পক্ষীরা সে প্রকার নহে; ইহারা দিনের মধ্যে সচরাচর তিনবার করিয়া হাস্য করে। হাস্যকারী জ্যাকাসটী ঘড়ীর ন্যায় কর্ম্মোপযোগী এবং এজন্য ইহাকে লোকে "অরণ্যবাসী মনুষ্যের ঘড়ী" কহিয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসী।—

অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য মনুষ্যদিগের কোন দেবতা বা রাজা কিছুই নাই। অষ্ট্রেলিয়ার কতকগুলি পৌত্তলিক দেশ প্রতিমাতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার অরণ্যময় প্রদেশ সমূহে একটীমাত্রও প্রতিমা নাই। এই সকল মনুষ্যেরা ঈশ্বরের উপাসনা, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেও জানেনা; ইহারা কেবল দিবারাত্র আহার, পান, শিকার ও নৃত্যে সময় অতিবাহিত করে।

অধিকাংশ লোক কোননা কোন প্রকার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে; কিন্তু এই সকল অসভ্য মনুষ্যেরা ঝটিকা ও প্রবল বাতাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কতক গুলি ডালপালা একত্রে বাঁধিয়া তাহার মধ্যে বাস করে এবং তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। এই সকল স্থানের মধ্যে একটীতে এরূপ পরিমাণ স্থান আছে যে

একজন লোক অনায়াসে তাহার ভিতর হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক শুইয়া নিদ্রা যাইতে পারে। এই সকল অসভ্য মনুষ্যেরা উত্তম কুটীর নির্ম্মাণ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে না; কারণ ইহারা ক্রমাগত একস্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও একস্থানে দীর্ঘকাল বসতি করে না। সুতরাং ইহারা অপেক্ষাকৃত উত্তম কুটীর নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বিবেচনা করে না। একজন দেশীয় এক শ্বেতকায় মনুষ্যের কুটীরের এক কোণে এরূপভাবে বসিয়াছিল যে তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন সে বিশেষ আরাম পূর্ব্বক উষ্ণত্ব উপভোগ করিতেছে। দেশীয়টী তাহার নিজের জন্য একটীও উত্তম কুটীর নির্ম্মাণ করে নাই বলিয়া শ্বেতকায় মনুষ্যটী তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। ক্ষণকাল কৃষ্ণকায় কিছুই বলিল না; কিন্তু অবশেষে সে বিজির বিজির করিয়া বলিতে লাগিল "শাদা মানুষের ইচ্ছা কাল দূর হয়। কাল মানুষের ইচ্ছা শাদা দূর হয়।" এই কথা শুনিয়া শ্বেতকায় কর্কশভাবে প্রত্যুত্তর দিল "তাহ'লে কালমানুষতো ভারি বোকা।" ইহা শুনিয়া কৃষ্ণকায় অত্যন্ত অপমান জ্ঞান করিল এবং গাত্রে কম্বল জড়াইয়া সেস্থান হইতে উঠিয়া কুটীরের বাহিরে বেড়াইতে লাগিল। দেখুন, মনুষ্যের হৃদয়ে আত্মসম্ভ্রম কত! একজন অসভ্য মনুষ্যও বিবেচনা করে যে তাহার নিজের জ্ঞান প্রচুর আছে এবং তাহাকে কেহ নির্ব্বোধ বলিলে তাহা সে সহ্য করিতে পারে না।

কখন কখন দেশীয়েরা এরূপ দৃঢ় ও বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে যে সেই গৃহ সমস্ত শীতকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, এবং তাহাতে সাত আট জন লোক অনায়াসে থাকিতে পারে। তাহারা ইহা মৌচাকের আকারে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

দেশীয়েরা যে সতত নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার কারণ এই যে, তাহারা তদ্দ্বারা খাদ্যের প্রত্যাশা করে। তাহারা যেখানে যায় তথাকার শীকড় উৎপাটন ও ক্ষুদ্র কীটসকল উত্তোলন এবং অপোজমদিগকে ধরিবার জন্য বৃক্ষকোটর সকল অনুসন্ধান করিয়া খাদ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়।

পৃথিবীর মধ্যে এদেশের স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টরূপে আচরিত। পুরুষেরা যখন খুসি তাহাদিগকে মস্তকে আঘাত করে, সুতরাং তাহাদিগের মস্তক কালশিরায় পরিপূর্ণ। কোন সময়ে একজন ভদ্রলোক একটী কৃষ্ণকায় স্ত্রীলোককে অত্যন্ত দুঃখের সহিত উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া যখন তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন তখন সেই স্ত্রীলোকটী বলিল যে তাহার স্বামীর তামাক খাইবার নল ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া সে (স্বামী) তাহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। ভদ্রলোকটী

সেই স্বামীর নিকটে গিয়া তাহাকে তাহার "জিনকে" * ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি বলিল যে যতক্ষণ না তাহার স্ত্রী তাহাকে একটী নূতন নল দিতে পারিবে ততক্ষণ সে তাহাকে ক্ষমা করিবে না। সেই স্থানে নল পাওয়া যাইত না বলিয়া ভদ্রলোকটী তাহাকে একটীও নল অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই। পরদিন প্রাতে দেখা গেল যে বেচারা জিনের নিষ্ঠুর স্বামী তাহাকে স্থূল যষ্টি দ্বারা আঘাত করাতে তাহার একখানা বাহু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

হতভাগিনী জিনেরা যে কেবল এই রূপে প্রহারিত হইয়া থাকে তাহা নহে; তাহারা অর্দ্ধাশনেও মরিয়া যায়; কারণ তাহারা মৎস্য ধরিতে বা শিকার করিতে অথবা তীর ছুড়িতে পারে না এবং তাহাদের স্বামীরাও তাহাদিগকে কিছুই খাইতে দেয় না; যে সকল শিকড় তাহারা উপড়াইয়া পায় এবং যে সকল কীট টিকটিকি ও সর্প তাহারা ভূমির উপর দেখিতে পায় তাহা ব্যতীত তাহাদের পাইবার সম্ভাবনা আর কিছু নাই। তাহাদের মুখের আকৃতি দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে তাহারা কিপ্রকার দুর্দ্দশাপন্ন; পুরুষেরা যখন স্বভাবতঃ বলবান ও দীর্ঘাকৃতি তখন স্ত্রীলোকদিগেরও অবশ্য বলবান ও দীর্ঘাকৃতি হওয়া স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু তাহা না হইয়া তাহারা সচরাচর কৃশ, ভগ্নশরীর ও কুৎসিত হইয়া থাকে।

জিন এত যে দুর্ব্বল তথাপি তাহাকে সমুদয় আসবাব বহন করিতে হয়। সে যে কেবল তাহার শিশুকে তাহার পৃষ্ঠোপরি বহন করিয়া থাকে তাহা নহে, পরন্তু খাদ্যের পুঁটুলি এবং তাহার স্বামীর বন্দুক ও নল পর্য্যন্তও বহন করিয়া থাকে। এই সময়ে পুরুষটী হস্তে বড়শা মাত্র ও বাহুতে চুবড়ি লইয়া সগর্ব্বে পদবিক্ষেপ করিতে থাকে; কারণ সে তাহার স্ত্রীকে বোঝাবহনকারী পশুর ন্যায় বিবেচনা করে। রাত্রিকালে স্ত্রীলোকটীকে তাহার নিজের জন্য একটী আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করিতে হয় কারণ স্বামী বিবেচনা করে যে তাহার নিজের জন্য একটী আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করিলেই যথেষ্ট হইল।

এই দেশীয় স্ত্রীলোককে যাবজ্জীবন এইরূপ দুর্ভাগ্যের বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে হয় এবং তাহার মৃত্যুর পর এই দেশীয়েরা তাহার শরীর সমাহিত করিবার কষ্ট লওয়া অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া বৃক্ষোপরি ধনুকের মত বাঁধিয়া রাখিয়া থাকে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই দেশীয়দিগের কোন ঈশ্বর নাই; তথাপি তাহাদের একটী শয়তান আছে; ইহাকে তাহারা য়াকু বা ডেবিল ডেবিল বলিয়া ডাকে। ইহাকে তাহারা সর্ব্বদা

* অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা আপন স্ত্রী বা অপর কোন স্ত্রীলোককে জিন কহে।

ভয় করিয়া থাকে কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে ইহা ছেলেপিলেদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে সতত পরিভ্রমণ করে। যখন কেহ মরে, তখন তাহারা বলে যে য়াকু তাহাকে লইয়া গিয়াছে। যে সকল সুখী হিন্দু তাহাদের মৃতব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলে যে "ঈশ্বর তাহাদিগকে লইয়াছেন" তাহাদিগের হইতে য়াকু সন্তানোপাসকেরা কত বিভিন্ন!

যে সকল লোক জগদীশ্বরকে না জানিয়া কেবল শয়তানকে জানে তাহারা অবশ্যই অত্যন্ত দুষ্ট স্বভাব হইবে। এই সকল অসভ্য লোকেরা তাহাদিগের স্বকীয় কর্ম্মের দ্বারা আপনাদিগকে ডেবিল-ডেবিলের সন্তান প্রমাণিত করে। শিশু সন্তানগণকে পালন করিবার কষ্ট যাহাতে না হয় এই নিমিত্ত তাহারা সন্তান সন্ততির অধিকাংশ মারিয়া ফেলে। তাহারা বৃদ্ধদিগকেও মারিয়া ফেলে এবং ইহাদিগকে উল্‌টাইয়া ফেলিবার ভাব যখন তাহাদিগের মনে উদয় হয় তখন তাহারা অত্যন্ত আমোদ পূর্ব্বক হাস্য করে। এই সকল অসভ্য লোকেরা তাহাদিগের বন্ধুবর্গের মস্তকের খুলি পানপাত্ররূপে ব্যবহার করে; তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এইরূপ কার্য্য দ্বারা বন্ধুদিগের প্রতি স্নেহ দেখান হয়। তাহারা মৃতব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা নিকট-সম্পর্ক কুটুম্বদিগকে তাহার মস্তকের খুলি লইতে অনুমতি করে। কেবল এইরূপ করিয়া ক্ষান্ত থাকে তাহা নহে, ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ মৃতব্যক্তির এক খণ্ড মাংস পর্য্যন্তও খাইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা তাহাদের শত্রুদিগেরই মাংস ভক্ষণ করে, এবং তাহাদিগকে যখনি মারিতে পারে তখনি তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া দেশীয়েরা নানা জাতিতে বিভক্ত এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরকে শত্রুভাবে অবলোকন করে। যদি এক জাতীয় একটী মনুষ্য অন্য জাতীয়ের ভূমিতে আসিয়া শিকার ইত্যাদি করিতে সাহস করে তাহা হইলে ইহারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিয়া তাহার শরীর ভক্ষণ করে।

ইহারা প্রিয় বন্ধুদিগের মৃত দেহের অতিশয় সমাদর করে; এরূপ দেহ কয়েক সপ্তাহ একটি উচ্চ মঞ্চোপরি স্থাপন করিয়া অবশেষে সমাহিত করে। মাতা তাহার সন্তান সন্ততির মৃত শরীর অতিশয় বহুমূল্য জ্ঞান করে। একজন ভ্রমণকারী একটি বৃদ্ধা স্ত্রীকে ক্ষুদ্র তৃণ নির্ম্মিত মাদুর পরিধান ও মাটী খুঁড়িবার নিমিত্ত হস্তে একটি যষ্টি ধারণপূর্ব্বক শিকড় অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিল। সেই বৃদ্ধা স্ত্রীর পৃষ্ঠে একটী ভারি বোঝা চাপান ছিল। ইহা কি? তাহার দশ বৎসর বয়স্ক একটী সন্তানের মৃত শরীর! এই বোঝা সে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া বিবেচনা করিয়াছিল যে এতদিন পর্য্যন্ত ইহাকে

তাহার নিকটে রাখাতে ইহার প্রতি স্নেহ দেখান হইয়াছে। হায়! সে অমর আত্মার বিষয় এবং কি প্রকারে সেই আত্মা পরমাত্মা সমীপে উপনীত হয় তাহা কিছুই জানিত না।

এই সকল মূর্খ অসভ্য জাতীয়দিগের নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ আছে। তন্মধ্যে নৃত্য সর্ব্ব প্রধান। প্রত্যেক পূর্ণিমাতে একটী বিশেষ নৃত্য হইয়া থাকে। ইহাকে করোবরি কহে। ইহাতে পুরুষেরা নৃত্য করে ও স্ত্রীলোকেরা তাল দেয়। করোবরি অপেক্ষা ভয়ানক দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না। করোবরি রাত্রিকালে প্রজ্বলিত অগ্নির আলোকে সম্পন্ন হয়। এই সময়ে তাহারা গাত্রের সর্ব্বস্থানে বৃহৎ বৃহৎ প্রলেপ, রক্তবর্ণ রেখা ও শ্বেত কর্দ্দম মাখিয়া সচরাচর অপেক্ষা অধিক ভয়ানক রূপ ধারণ করে। তাহারা নৃত্য কালে সকল প্রকার অঙ্গভঙ্গি ও অপরূপ শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া বোধ হয় যে এই নৃত্য পৃথিবীর উপরি উদ্ভাবিত হয় নাই, যেন নরকের মধ্যে হইয়াছিল।

বোধ হয় তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে বাদ্য ও চিত্রকরণ উভয় বিষয়েই এই সকল অসভ্য মনুষ্যদিগের টান আছে। নানা প্রকার আকৃতি পর্ব্বত প্রস্তরে খোদিত দেখা গিয়াছে এবং ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তাহাদিগের চিত্রকরণের প্রতি রুচি আছে। এই সকল আকৃতির মধ্যে কোনটা পশু সদৃশ, কোনটা বা মৎস্য সদৃশ এবং কোনটা মনুষ্য সদৃশ। যেরূপ অনুমান করা যাইতে পারে এগুলি তদপেক্ষা নিপুণতার সহিত সম্পাদিত। দেশীয়দিগের ন্যায় অসভ্য মনুষ্যেরা উত্তম রূপে গাইতে পারে না কিন্তু তাহাদের গীত বাক্যগুলি অতীব হাস্যজনক,

"খাও বেশী করে;
খাও খাও খাও।
খাও ফের আবার;
অনেক আছে খেতে
খাও আরও বেশী;
খাও খাও খাও।

যদি একটী শূকর গাইতে পারিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই গীতটী তাহার কল্পনার উপযোগী হইত। একবার মনে করিয়া দেখ, কি দুঃখের বিষয় যে এক জন মনুষ্য, যে পরমেশ্বরকে অনন্তকাল ধন্যবাদ দিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, সে কেবল তাহার আহার পানেতেই উচ্চ আমোদ জ্ঞান করিয়া থাকে এবং উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আনন্দ জানে না!

এই সকল লোকের মুখের আকৃতি কি প্রকার? ইহারা অত্যন্ত কদর্য্য, ইহাদের নাসিকা চেপ্টা এবং মুখের হাঁ প্রশস্ত; কিন্তু ইহাদের দন্তগুলি শ্বেতবর্ণ এবং বেশ লম্বা, চিক্কণ ও কোঁকড়ান। ইহারা ইহাদিগের জুলপিকে দন্ত, পালক এবং কুকুরের লেজের দ্বারা সুশোভিত করে এবং সমুদায় গাত্রে মৎস্য তৈল ও

চর্ব্বি মর্দ্দন করে। অতএব তুমি মনে করিতে পার যে ইহাদিগের নিকট যাওয়া কি অসুখ দায়ক।

উপনিবেশী।—এক সময়ে অষ্ট্রেলিয়াতে একটীও শ্বেতাঙ্গ মনুষ্য ছিল না, কেবল কৃষ্ণ মনুষ্যই ছিল। এক্ষণে সেখানে কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্বেত অধিক; এবং কালে যে সেখানে শ্বেত মনুষ্যই থাকিবে, একটীও কৃষ্ণ মনুষ্য থাকিবে না তাহা অবশ্যম্ভাবী। যে দিন হইতে সেখানে শ্বেত মনুষ্যেরা বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে সেদিন হইতে কৃষ্ণ মনুষ্যেরা অতি শীঘ্র মরিয়া যাইতেছে, কারণ কৃষ্ণকায়েরা পূর্ব্বে যে সকল স্থানে শিকার ইত্যাদি করিত সেই সকল স্থান শ্বেতকায়েরা তাহাদিগের নিকট কাড়িয়া লইয়া তাহাদের নিজ পালিত পশু, মেষ প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় যে সকল শ্বেত মনুষ্য আসিয়াছে তাহারা দুই প্রকার; প্রথম অপরাধী এবং দ্বিতীয় উপনিবেশী।

শ্বেত মনুষ্যদিগের মধ্যে যত নিকৃষ্টতম লোক আছে, উপরিউক্ত অপরাধীরা তাহাদিগেরই কতক গুলি;—ইহারা চোর; কারাগারে রক্ষিত হইবার পরিবর্ত্তে বহু বৎসর কঠিন পরিশ্রমের জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় প্রেরিত হয়। এত গুলি দুরাত্মা অষ্টেলিয়াতে প্রেরিত হইয়াছে, ইহা অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে অনন্ত দুঃখের বিষয়; কারণ এই নৃশংস রাক্ষসস্বভাব ইংলণ্ডীয় তস্করেরা দণ্ড কাল অতীত হইলে মুক্তিলাভ করিয়া নিরীহ অষ্ট্রেলিয়াবাসীদিগকে নানা প্রকারে জ্বালাতন ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। ইহাদের পাপিষ্ঠ সন্তানেরা পৈতৃক জঘন্যবৃত্তি অনুসরণ করতঃ ইংলণ্ডীয় চোরকুলকে অষ্টেলিয়গণের চির ভয়াবহ করিয়া রাখিয়াছে। যে সকল লোক নিজে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের নিমিত্ত স্বেচ্ছাতে আসিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিয়াছে তাহাদিগকে উপনিবেশী কহে।

অষ্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণ করিতে গেলে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে বলদেরা নানা সামগ্রীপূর্ণ শকট টানিয়া লইয়া যাইতেছে ও শ্বেতমনুষ্যেরা তাহার উপর বসিয়া রহিয়াছে। ইহা একটী পরিবার, তাহাদিগের নূতন গোলাবাড়ীতে যাইতেছে। শকটের মধ্যে শূকরের ছানা থাকে এবং তাহাদিগের কৃত ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ বেশ মজা করিয়া তোমরা শুনিতে পাইতে পার। ইহার মধ্যে চুবড়ির ভিতরে রুদ্ধ পালিত পক্ষী ও তৎ ব্যতীত নানাবৃক্ষের চারা ও অস্ত্র ও থাকে।

যখন সেই পরিবার তাহাদিগের মনোনীত বসতিস্থানে উপস্থিত হয় তাহারা প্রথমে না পায় বাড়ী, না পায় বাগান, না পায় ময়দান; কিছুই পায় না; পাইবার মধ্যে পায় একটী কদর্য্য বন। তৎক্ষণাৎ পিতা পুত্র ও মজুরেরা মাতা ও তাহার কন্যাদিগের নিদ্রা যাইবার জন্য একটী পটমণ্ডপ

সন্নিবেশিত করিয়া আপনারা তাহার বহির্ভাগে খোলা বাতাসে অগ্নির পার্শ্বে শয়ন করে। পরদিন প্রাতে পুরুষেরা কুটীর নির্ম্মাণার্থে বৃক্ষ সমূহ ছেদন করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করে ও এক সপ্তাহের মধ্যে ইহা সমাপ্ত করে;—এই কুটীর বাসের পক্ষে বৃহৎ নয় বটে কিন্তু সুনির্ম্মল বায়ু সেবনের পক্ষে ইহা যথেষ্ট উপযোগী; ইহার মেজেটী প্রশস্ত ও বল্মীকের কঠিন মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত। প্রাচীর ও জানালা ছিটের দ্বারা নির্ম্মিত। এইরূপে তাহারা কুটীর নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিয়া শূকর, মুর্গি ইত্যাদি পালিতপক্ষীর নিমিত্ত একটী গৃহ ও ভূমির মধ্যভাগে একটী গোগৃহ নির্ম্মাণ করে। অনন্তর তাহারা একটী উদ্যান প্রস্তুত করিয়া নানাবৃক্ষের চারা রোপণ করে এবং উদ্যানটী পিচ, দ্রাক্ষা ইত্যাদি নানাপ্রকার ফলপুষ্পের দ্বারা শোভিত হয়। তাহাদিগের কন্যাগণ সেই সময়ে মুর্গি ও পালিত পক্ষীদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও গাভীগণের দুগ্ধদোহনে নিযুক্ত থাকে এবং শীঘ্রই তাহারা প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ, মাখন, ডিম্ব ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে। পুরুষেরা পরিষ্কার ভূমিতে গম, আলু ইত্যাদির বীজ বপন করিতে আরম্ভ করে এবং এইরূপে সেই পরিবারের যাহা কিছু অভাব থাকে তাহা অল্পকালের মধ্যেই পূর্ণ হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ তাহারা আটটী বৃহৎ গৃহযুক্ত একটী প্রস্তরাগার নির্ম্মাণ করিতে সময় পায়। ইহা সম্পূর্ণ হইবার পর তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্বকার কাষ্ঠ নির্ম্মিত কুটীর গুলি মজুরদিগকে ছাড়িয়া দেয়। অষ্ট্রেলিয়ার বন্য প্রদেশ সকলকে ঝোপ (Bush) নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ঝোপে বাস করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীবন কাটাইতে হয়।

কতকগুলি উপনিবেশী ভূরি ভূরি মেষপালের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। বস্ত্র ও বাতি বানাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগের লোম ও চর্ব্বি বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। অষ্ট্রেলিয়াদেশে এক একজন রাখাল পর্ব্বত সমূহের মধ্যে থাকিয়া অতি নির্জ্জনভাবে জীবন অতিবাহিত করে। মেষপাল গুলিকে বন্য কুকুর হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে বিশেষ সাবধান থাকিতে হয়। ঐ সমস্ত মাংসাশী জন্তু আহারার্থ সর্ব্বদা দলে দলে ভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহারা কোন মেষপাল দেখিলে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্রে তাহাদিগের অনেক গুলিকে নিষ্ঠুর রূপে কামড়ায় এবং তৎপরে যতগুলিকে পারে মারিয়া ফেলে। সুখের বিষয় এই যে সেখানে নেকড়ে বাঘ, ভল্লুক, সিংহ ও ব্যাঘ্র ইত্যাদি কোন বৃহৎ বন্য পশু নাই; কারণ ইহাদিগের নিকট মেষপালের রক্ষা পাওয়া দূরে থাকুক স্বয়ং রাখালেরও রক্ষা পাওয়া দায়।

অষ্ট্রেলিয়ায় "ঝোপ পর্য্যটক" নামে

একদল মনুষ্য আছে। ইহারা বন্যপশু-দিগের তুল্য দুর্দান্ত। যে সকল অপরাধী দণ্ডের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়াছে ইহারা তাহারাই। ইহারা সচরাচর উপনিবেশীদিগের বাটীতে আসিয়া অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়া থাকে। আদিম নিবাসিরা এই সকল শ্বেত দুরাত্মাদিগের মত এত বিপদজনক নহে; তাহারা বাস্তবিক সাধারণতঃ অত্যন্ত নির্ব্বিরোধী; অগ্রে মন্দ ব্যবহারের দ্বারা উত্তেজিত না হইলে কাহারও অনিষ্ট করে না। তাহারা শস্য ছেদন ও মেষ গণের গাত্র ধৌত করিয়া আপনাদিগকে কর্ম্মোপযোগী করিতে সতত ইচ্ছুক এবং একখানি কম্বল কিম্বা একটী পুরাতন কোর্ত্তার মত অল্প স্বল্প পুরস্কার পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। যখন মেষের পালের কতকগুলি পথহারা হইয়া যায় তখন কৃষ্ণেরা তাহাদিগের অন্বেষণার্থে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে এবং যখন তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া পায় তখন তাহা-দিগকে এত আনন্দিত দেখা যায় যেন মেষগুলি তাহাদিগের নিজের। কৃষ্ণকায় স্ত্রীলোকেরা প্রক্ষালন গৃহে ও গোলাবাড়ীর উটনে কর্ম্মের সাহায্য করে; কিন্তু তাহাদিগের গাত্রে এত চর্ব্বি লেপন করা থাকে যে তাহারা রন্ধনশালার কোনমতে উপযুক্ত হইতে পারে না। এক জন কৃষ্ণকায়ের কার্য্য সমাধা পর্য্যন্ত তাহাকে উত্তমরূপে মধ্যাহ্নভোজন না দেওয়া জ্ঞানীর কর্ম্ম, যেহেতু সে সচরাচর এত খায় যে সে দিন আর সে কোন প্রকারেই কার্য্য করিতে পারে না।

এই সকল দরিদ্র কৃষ্ণকায়দিগের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত বিশ্বাসী ও স্নেহ-শীল। একজন উপনিবেশীর কুটীরের নিকট একটী কৃষ্ণকায় বাস করিত। তাহার প্রভু নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই সে প্রতিদিন প্রত্যূষে তথায় উপস্থিত হইত; পাছে প্রভু জাগরিত হন বলিয়া সে অতি ধীরে ধীরে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুইটী কাষ্ঠের একত্র সংঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি জ্বালাইয়া তাহার উপরে হাঁড়ি চাপাইয়া দিত। অনন্তর সে প্রভুর শয্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া এবং স্নেহপূর্ব্বক নিদ্রিত ব্যক্তির হস্তে হস্ত রাখিয়া, যতক্ষণ না তিনি চক্ষু উন্মীলন করিতেন ততক্ষণ তাঁহার কর্ণের নিকটে ফুস ফুস শব্দ করিত এবং চক্ষু উন্মীলন করিলে তাঁহাকে সে দয়ার্দ্র ও হাস্যবদনে প্রণাম করিত। এই সকল অবধানতার দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল যে সে শ্বেত পুরুষের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিল।

এই কৃষ্ণকায় যেমন স্নেহশীল তেমনি বিশ্বাসী ছিল। একদা সে একজন কৃষক কর্ত্তৃক দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিল। পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল; "এইপত্র আমার ভ্রাতার নিকট

লইয়া যাও; তিনি তোমাকে চারি আনা দিবেন। তুমি এই চারি আনা আমার নিমিত্ত নল ক্রয় করিবার জন্য ব্যয় করিবে।” কৃষ্ণ মনুষ্যটী তৎক্ষণাৎ সেই পত্র লইয়া কৃষকের ভ্রাতার বাটীতে গিয়াছিল। সে তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখিয়া তাঁহার হস্তে পত্র দিল। উক্ত ভ্রাতা পত্রখানি পাঠ করিয়া বাহককে চারি আনা না দিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর কৃষ্ণ মনুষ্যটী কি করিয়াছিল? সে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিল “আমি নল ব্যতিরেকে কি প্রভুর গৃহে ফিরিয়া যাইব? না। আমি কিছু অর্থ পাইতে চেষ্টা করিব।” অনন্তর সে তাহার পরিচিত কোন বাটীতে গিয়া চারি আনার জন্য কতকগুলি কাঠ কাটিতে প্রার্থনা করিয়াছিল; এবং সেই চারি আনা লইয়া নল ক্রয় করিয়াছিল। এই প্রাণী কি উত্তম ভৃত্য ছিল না? এই ভৃত্যের কার্য্যটী দৃষ্টির আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল না, ইহা হৃদয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল। কিন্তু এই মনুষ্যের তুল্য দেশীয় সেখানে আর অধিক ছিল না। ইহারা সাধারণতঃ কার্য্য করিয়া শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিতেন্দ্র—

সাধনা।

সাধনা মাত্রে অসাধুর নিকট যেমন জটিল এবং দুঃসাধ্য, আবার সাধুর নিকট তাহা তেমনই সরল এবং সুসাধ্য। যে যাহার অধিকার সীমা কখন স্পর্শ করে নাই এবং করিতেও অনিচ্ছুক, সে তাহার সাধনে অপরিমিত শ্রম, ক্লেশ এবং দুঃসাধ্য ভাব নিত্যই অবলোকন করিয়া থাকে। সুমনেও সাধনা দুঃসাধ্যের ন্যায় প্রতীয়মান না হইয়া থাকে এমন নহে, কিন্তু সে যতক্ষণ সাধনাকে দূর হইতে দৃষ্টি করা যায়; নিকট হইলে বা নিকট হইতে থাকিলে, আর তাহার সে দুঃসাধ্য ভাব তিষ্ঠিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে দুঃসাধ্য ভাবকে দূর আকাশে বিলীন হইতে হয়। সাধনানিচয়ের দুঃসাধ্য ভাব সাধারণতঃ ততক্ষণ, যতক্ষণ তাহার আয়ত্তীকরণে হস্ত প্রসারিত করা না যায়। বিশাল অরণ্য দূর হইতে দারুণ দুর্গমের ন্যায় অবলোকিত হইতে থাকে, বোধ হইতে থাকে যেন পশু পক্ষী পর্য্যন্ত কাহারও তাহাতে প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই; কিন্তু একবার নিকটে যাইতে পারিলে আর সেরূপ দেখায় না, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে সকলেরই প্রবেশপথ শত শত পুরোভাগে উদ্ঘাটিত হইয়া রহিয়াছে। মানব মিছা

আতঙ্কে অনেক কার্য্যের ধ্বংস করিয়া থাকে। যাহারা আতঙ্কে কার্য্য নষ্ট করে, প্রকৃতি তাহাদের সাধু হইলেও, ফলে তাহারা অসাধুর সঙ্গে সমান। যথায় ফল লইয়া কথা, তথায় সেই ফলের ব্যতিক্রম ঘটিলে, দুষ্ট অসাধু এবং সাহস-শূন্য ভগ্নপদ সাধু, এ উভয়ে প্রভেদ রহিল কি? সক্ষম অসাধু আর অক্ষম সাধু, প্রভেদ অতি অল্পই। যথার্থ সাধু আতঙ্কে ভগ্নপদ হয় না; ঘটনাচক্রে তাহাদের সাধনা সিদ্ধ না হইলেও চেষ্টার ত্রুটি থাকে না, অন্তত সংসারের ভাবী সিদ্ধির পথ তাহারা অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়া থাকে। এরূপ সাধু যাহারা, তাহাদেরই সিদ্ধিমন্ত্র সেই নিত্যশ্রুত অথচ নিত্য-বিস্মৃত মহামন্ত্র,—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" এ মহামন্ত্র সাধনার মূল সাধকের সুমনস ভাব; সুমনস ভাবের মূল সত্যে রতি; সত্যে রতির মূল স্রষ্টাসকাশে আত্মকর্ত্তব্য বোধ। এই সাধনা সম্বন্ধে, যে যে কথা ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি কথিত, জাতীয় জীবনের প্রতিও অবিকল তাহা বর্ত্তে।

মাতঃ ভারতলক্ষ্মি, সব শুনিলাম, সকলই বুঝিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি ঐ কঙ্কাল-মূর্ত্তি, আমি এই রুগ্ন সন্তান; তুমি ঐ রুক্ষকেশা ভিখারিণী, আমি এই অস্থিসার হাড়ের মালা; আমি ভগ্নপদ, ভগ্নহৃৎ, লোলচর্ম্ম, সমলদেহ, উদরান্ন যাহার আকাশে, আহা করিতে যাহার কেহ নাই, পদদলিত করিতে যাহার সবাই আছে—আমি কি করিয়া, কোন্ উৎসাহে, কোন্ সাহসে, দেবি! কোন্ সাহসে সাহসী হইয়া, সাধনামন্ত্রে দীক্ষিত হই? তোমার যে দিকে যাই, সেই দিকেই নিবিড় মরুকান্তার, যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই জীবনশূন্য বিকট-মূর্ত্তি কঙ্কালদৃশ্য; আকাশে কাল মেঘ; নিম্নে স্বচ্ছন্দ অন্ধকারপুঞ্জ দৃশ্যের দূর প্রান্ত অতিক্রম করিয়া ধাবিত; ও দিকে কাল সমুদ্রের তরঙ্গ আস্ফালন গম্ভীর গর্জ্জনে গ্রাস করিতে অদৃশ্যে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; আমি একাকী, সহায়শূন্য, সম্বলশূন্য; আমি এখন আপনা রাখি, না সাধনারত হই? পরিতাপবিলাপে দিক পরিপূরিত, হাহা-কার প্রতিধ্বনিতে প্রতিনাদিত। কিন্তু শুন, ঐ শুন ঐ অস্ফুট শব্দ কল্লোলের মধ্য হইতে ধীর নিনাদে কি ঐ স্ফুট শব্দ আসিতেছে:—নিশীথ শ্মশান, শনি-বার, অমাবশ্যা, আকাশে মেঘ বিদ্যুৎ, টিপ্ টিপ্ জলের ধারায় বায়ুতুফানের সন্ সন্ শব্দ; শবের দন্ত কড়মড়ি, কুকুরের খেউ খেউ, শেয়ালের ফেউ ফেউ, কঙ্কাল ঠক্ ঠক্ করিয়া প্রেতগণ বিকট নৃত্য করিতেছে; ডাকিনীর হুঙ্কার, যোগিনীর ঝঙ্কার, অট্টহাসিনী সমুণ্ড খর্পর চামুণ্ডামূর্ত্তি গ্রাসব্যগ্র লোল রসনায় বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে; এই স্থল, এই অকাল কাল, মহাসাধন শব সাধনের আর কোন সময়? ভয় পাইও না, শব যদি—শবাকারেই শবের উপরে

বসিও। "মাভৈঃ মাভৈঃ, কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।" ঐ শুন, ঐ শুন ঐ গগন কম্পিত করিয়া আবার কি দেববাক্য আসিতেছে,—"মাভৈঃ মাভৈঃ, কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা," এবমস্তু। যদি হঠাৎ বিনষ্ট বিপদে আনন্দবান হইতে চাও, তবে আবার বলি, বারেক এই ঘোর ঘূর্ণনে শবাসনে বইস। ভয় কি, তুমি জানিতেছ না তুমি সুরক্ষিত? তোমার এক দিকে, "মাভৈঃ মাভৈঃ—শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী, হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্ব্বতঃ শূলধারিণী;" অন্য দিকে "কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।" এ পথে তুমি একা নহ! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবনবান তোমার আগে, এই ভাবে, এ অবস্থায়,এ পথ বাহন করিয়া গিয়াছে;—এ পথে তুমি একা নহ! আরও কি 'আশা,' আরও কি 'উৎসাহ' খুঁজিতেছ? তোমার 'আশা' স্থলে 'সর্ব্বতঃ শূলধারিণী;' 'উৎসাহ' স্থলে বিগত মহাজনগণ। তুমি সৌভাগ্যবান যে, এ মহাসাধনাস্থলেও তুমি উপযুক্ত জ্ঞানে আমন্ত্রিত হইয়াছ। 'কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা,' এ মহামন্ত্র সাধকের নিকট স্বয়ং দেবতারাও বিনতশির হইয়া থাকেন; অন্য আপদের কথা কি কহিতেছ? লঙ্কাপতি রাবণ কুপথচারী হইলেও, এ মহামন্ত্রসাধনবলে স্বয়ং ইন্দ্রকে মালাকর, সূর্য্যকে ছত্রধর করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

দিগ্বিস্তৃত নিবিড় অন্ধকারে, অদৃশ্য ভাবে যে অনর্থসমুদ্র তোমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে,সাধনা ব্যতীত তথায় তোমার আত্মরক্ষার আর কি উপায় থাকিতে শুনিয়াছ? যে বিপন্ন অবস্থাকে স্বতন্ত্র জ্ঞানে আত্মরক্ষার জন্য ভীত হইতেছ, তুমি কি জান না যে তুমি নিজেই সেই বিপন্ন অবস্থা স্বয়ং! যে সাধনাকে বিপন্ন অবস্থার উপর গলগ্রহরূপ অবলোকন করিয়া, তাহাকে হেলন পূর্ব্বক তফাত হইতেছ, তুমি কি জান না যে তাহাই তোমার সে অবস্থা হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়? কিন্তু কি পরিতাপ! তুমি একমাত্র সেই সর্ব্বরক্ষক অর্থকে গলগ্রহরূপে উপেক্ষা করিয়া, অজ্ঞাতে ঘোর অনর্থসমুদ্রের দিকে তোমার কল্পিত অর্থের আশাভ্রমে ধাবমান হইতেছ; বুঝিতে পারিতেছ না যে যাহাকে পরিহার তোমার উদ্দেশ্য ও আবশ্যক, তুমি তাহারই করাল বদন অভিমুখে আপনা হইতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছ। পথ সহজগম্য, ইহাই তোমার এ পথের প্রলোভন; অধঃপাতের পথ চিরকালই সহজগম্য রূপে দৃষ্ট হয়। যে যে নর আপনার স্বনিহিত শক্তির প্রতি উপেক্ষা করিয়া, পরশক্তি সমক্ষে উদ্ধার, সৌভাগ্য বা শুভলালসা করিয়া থাকে; তাহাদিগকে বস্তুত এই অনর্থসমুদ্রে ঝাঁপ দিবার জন্য লালসাবান বলিয়া বলা যায়। ইহাদিগের নিকট আত্মশক্তিচালনা নিত্যই দুঃখসঙ্কুলরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আলস্য, অনাস্থা, এবং পরশক্তিতে

তোমার মুক্তি! আলস্য এবং অনাস্থা কবে কোথায় ভাগ্যের দেখা পাইয়াছে? পরশক্তি? বোধশূন্য নর! তুমি পরশক্তি মোহে নিতান্ত মোহপ্রাপ্ত হইতেছ; কিন্তু বারেক ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, তুমি নিজে কবে কতটা আত্মশুভ সংসাধনান্তে, পরশুভ সংসাধনে সমর্থ হইতে পারিয়াছ? আমি দেখিতেছি, পরশুভ দূরে যাউক, তোমার আত্মশুভই সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে; এবং তাহার পূরণ জন্য, হরি হরি! তাহার সম্পূর্ণ পূরণ জন্যই তুমি অন্যের নিকট পর্য্যন্ত লালায়িত হইয়া ফিরিতেছ। নির্ব্বোধ, তুমি নিশ্চয় জ্ঞান হারাইয়াছ, নতুবা ইহাও কি তোমার নিকট একেবারে অপরিজ্ঞাত যে, তুমি যাহার নিকট লালায়িত হইতেছ, সেও তোমার মত মানব? তোমার অভাব পূরণ করিবে বলিয়া সে পৃথক সৃষ্ট হয় নাই! তবে যে তুমি তাহাতে কিছু চটুলতা দেখিয়া থাক, সেও তোমার খরচে। তোমার সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই, তুমি মূর্খ সে চতুর; তুমি স্বনিহিত শক্তিতে অজ্ঞ, সে স্বনিহিত শক্তিতে প্রবুদ্ধ; তুমি আপন অর্থ সাধিতে পার না, সে তাহা পারে। তোমার কাণ ধরিয়াও সে যখন তাহার অর্থে সঙ্কুলান বোধ করিতেছে না; তখন তুমি তাহার পা ধরিয়া আপন অর্থ সঙ্কুলান করাইয়া লইবে! এ বুদ্ধি অপেক্ষা মানবমণ্ডলীতে মূর্খতার অতিসীমা আর কি হইতে পারে? সাধারণত পরের নিকট পরের আশা আর সংস্কৃত কবির জীর্ণ তরুর নিকট পথিকের আশ্রয় প্রত্যাশা, উভয়ই সমান।—"পথিকহৃদয়ঘর্ম্মস্যাপি বাঞ্ছাং করোতি।"

মূর্খ বাঞ্ছারাম, এমন স্থলে তোমার জমার আশা কোথা? তুমি খরচের-খরচে পরিণত! তবে যে পরের সহবাসে ভালর দিকে কিছু কিছু নিজের অবস্থার রূপান্তর দেখিতে পাইয়া থাক, তাহা ভাক্ত; তাহা সে পরের নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষা গুণ হইতে তত নহে যত সহবাস গুণ হইতে, এবং কিয়দংশ পরের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরেও বটে। এমন অনেক স্বার্থ আছে যে তাহা যাহার খরচে সংসংসাধিত হইবে, তাহাকে কিছু অবস্থান্তরযুক্ত না করিয়া লইলে চলে না; কিন্তু যে মূর্খবর্গ তাহাতে প্রতারিত হইয়া, ভ্রান্তি মরীচিকায় তাহাতে কেবল নিঃস্বার্থ উৎচিকীর্ষা বুদ্ধি অবলোকন পূর্ব্বক স্বার্থসাধকের হস্তে অবশিষ্ট আত্মসমর্পণ করে ও স্বীয় দুঃখমোচন ও উন্নতির নিমিত্ত ক্ষণে অক্ষণে প্রিয়বচন দ্বারা তাহার মুখাপেক্ষী হয়, তাহাদের তুল্য সা শূন্য হতভাগ্য অধঃপতিত জীব আর দ্বিতীয় কেহ হইতে পারে না। ইহারও উদাহরণের জন্য অধিক দূরে যাইতে হইবে না; বিধাতার লিপিবশে সমগ্র ভারতবাসী, সমগ্র ভারত স্বয়ং, আজি ইহার জীবন্ত উদাহরণরূপে দর্শিতব্য। আবার যে দিন দেখিবে,

ভারতসন্তানগণ পরের তুড়িতে উন্মাদিত, পরের বাঁকামুখে সংশায়িত, পরের তোষ্যার্থে প্রস্তরচিত্তে বা পরের দোলায় দুলিত হইতে ক্ষান্ত হইয়াছে; সে দিন হইতে আবার ভারতের ভাগ্য ফিরিয়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহ আশ্বাসিত হওয়ায় ক্ষতি নাই। এরূপ পর প্রতি অনাস্থাভাব কেবল দুই অবস্থায় সম্ভব হইয়া থাকে, এক অজ্ঞ অবস্থায়; অপর যখন শয়তান ও শয়তানীর বিরুদ্ধে, অভ্যন্তরে নিরুদ্ধ কালাগ্নিশিক্ষা প্রলয়বাত্যামথিতের ন্যায় ঘোর ঘূর্ণাবর্ত্তে হৃদয় বিলোড়ন করিয়া ফিরিতে থাকে।

প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত উদ্ধারপন্থা যাহা, তাহা সর্ব্বদাই ভিতর হইতে আইসে, বাহির হইতে আইসে না। যে কোন পৌরুষ আত্মশক্তি হইতে সম্পাদিত হইয়া থাকে, পরশক্তি দ্বারা হয় না। মোহভ্রান্ত ভারতসন্তান, যদি নিজের উন্নতি, নিজের অভ্যুত্থান চাও, তবে নিজ অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত কর; পরমুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি হইবে? বিধাতা তোমাকে পরপঞ্জর হইতে পরভাগোপজীবী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, বিধাতা তোমাকে স্বয়ংক্ষম স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নিজের অভ্যন্তরে যে সুপ্ত সিংহ শায়িত রহিয়াছে, কপালগুণে যাহার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত তুমি অনভিজ্ঞ, তাহাকে বারেক জাগরিত কর, তোমার মঙ্গল হইবে। সে সুপ্ত সিংহ একবার জাগরিত হইলে, কি যে করিতে পারে বা না পারে, তাহার উচ্চতম উদাহরণ দেখিতে চাও যদি, তবে বারেক জ্ঞানিপ্রবর কার্লাইলের চক্ষে ফরাসিবিপ্লবের শক্তিলীলায় চিত্ত সমাহিত কর।

নিঃস্বার্থ পরহিতকর পরও এক বা বহুল না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহাতে প্রথম মুস্কিল,—কে তেমন নিঃস্বার্থ পরহিত ব্যবসায়ী তাহা চিনিয়া উঠা দায়; দ্বিতীয়ত পাইলাম যেন তেমন ব্যক্তি, কিন্তু ফল? কতই প্রত্যাশা করিতে পার,—ফল অধিকাংশই ইচ্ছা বা বচনে পরিসমাপ্ত। সমুদ্রসিঞ্চনের যে জন্য প্রয়োজন, তথায় কেহ উপযাচক হইয়া একটা ঝিনুক দিলে, তাহাতে কি তোমার সমুদ্রসিঞ্চনের প্রয়োজন পূর্ণ হইতে পারে? তবে কিনা তেমন লোক দেখিতে ভাল, শুনিতেও ভাল।

পরশক্তি সর্ব্বদাই প্রত্যাশা এবং সন্দেহের আধার; আত্মশক্তি তেমনি সর্ব্বদাই তদুভয়ের নিরসক। সকল সম্পদ, সকল সৌভাগ্য, সকল উন্নতি, সকল অভ্যুত্থান, একমাত্র আত্মশক্তিচালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই আত্মশক্তি চালনার জন্যই তুমি এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছ। অপর যদি কেহ তোমার খরচে আত্মস্বার্থ সাধন করে, দোষ আমি স্বার্থসাধককে দিই না; দোষ দিই তোমাকে যে তুমি কেন তোমার নিজ স্বার্থে অনভিজ্ঞ, তুমিও কেন জমা না হইয়া খরচ হইতে যাও। সে তাহার

আপন কার্য্য সাধিতেছে; তুমি তাহা পারিতেছ না; তাহার দোষ কিসে? স্বার্থপথে তোমার উপর সহস্র কঠোরতা সে অবলম্বন করিলেও, তাহাকে আমি দোষ দিই না। তুমিও বিশ্বকার্য্য সম্পাদনার্থ প্রেরিত, তুমিও মানব হইয়া প্রেরিত, জুজু হইয়া প্রেরিত হও নাই; তোমাতেও স্বার্থের কিছু অভাব নাই। পাছে তুমি বিশ্বকার্য্য হইতে বিমনস্ হও, এজন্য ঈশ্বর বিশ্বকার্য্য সহ তোমার স্বার্থও সংমিলিত করিয়া দিয়াছেন, যদ্দ্বারা তোমার ন্যায়ানুগত সৌভাগ্য এবং সম্পদ, বস্তুপক্ষে বিশ্বকার্য্য সহ একতায় আসিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার অংশকলাস্বরূপে অবলোকিত হইয়া থাকে। এই সৌভাগ্য এবং সম্পদ জ্ঞানযোগ ও ধারণা অনুসারে, কেহবা মতিচ্ছন্ন হেতু অপহৃত অর্থে আরোপ করিয়া থাকে; আবার কেহবা ঈশ্বরের প্রীতিলাভরূপ স্বার্থ জগতহিতে জীবন বলিদান দিয়াও, তৃপ্তির সীমায় উপনীত হইতে পারে না। যে জগতে ক্লাইব, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জন্ম; পল, শঙ্করাচার্য্যও সেই জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে বলে, এ মহাপুরুষেরাও স্বার্থশূন্য ছিলেন না; সে কথা সত্য বটে আবার সত্যও নহে। তাঁহারাও স্বার্থশূন্য ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সে স্বার্থ দিব্য স্বার্থ; পার্থিব স্বার্থ লইয়া যথায় কথা, তথায় অবশ্যই বলিতে হইবে যে এ মহাপুরুষদিগের যে স্বার্থ তাহা 'নিঃস্বার্থ' পদবাচ্য হয়। মানবীয় কার্য্য যতদূর দিব্য স্বার্থের দিকে লীন, তাহা জগতে সেই পরিমাণে মহত্ত্বের আকর ও কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, কি স্বার্থশূন্যে কি স্বার্থযুক্তে; সম্পদ ও সৌভাগ্য তাহা কি দিব্য কি পার্থিব কি শয়তানী, যেরূপই হউক; ইহা কিন্তু নিশ্চয় যে তাহার যে কোনটীই যথাপরিমাণে উপার্জ্জন করিতে হইলে, যথাসম্ভব আত্মশক্তির চালনা আবশ্যক হয়। কিন্তু আমি দেখিতেছি, ভারতসন্তান অকর্ম্মশীলতায় এমনই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন যে, কোন দিকেই ইহাঁর জীবনীশক্তির কিছু মাত্র স্ফূর্ত্তি বা পরিচয় পাওয়া যায় না; সকল দিকেই নির্জ্জীব, নিস্পন্দ, জড়, পরমুখাপেক্ষী অসার রাশিরূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন। যে স্বার্থের জন্য জগত ক্ষিপ্ত, যে স্বার্থ সমস্ত চরাচরকে উন্মাদিত করিয়া ফিরিতেছে; ভারতসন্তান সে স্বার্থের মোহ উপলক্ষ করিয়াও কার্য্য প্রবৃত্ত হয়েন না,—কর্ত্তব্যবুদ্ধির কথাত অনেক দূরে! স্বার্থ এখন ইহাদের কুকুরবৃত্তিতে। ইহাদের কপাল গুণে, স্বার্থও ইহাদের প্রতি কৃপা বিতরণে দারুণ স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতসন্তান এখন কেবল বিশ্বঘাতী নহেন, আত্মঘাতীও!

বাঞ্ছারাম, তুমি ভাবিতেছ, প্রকৃতি যখন উত্তরোত্তর উন্নতগামিনী, তখন আমাদের আর বৃথা শ্রম করিয়া ক্লেশ

পাইবার প্রয়োজন কি? পরিণামে উন্নতি ত আছেই আছে। সত্য কথা, প্রকৃতি উত্তরগামিনী এবং পদার্থ তাবৎও যাহা দেখিতেছি সকলেই উত্তর গমন করিবে; কিন্তু উত্তরগমনও যে অনেক প্রকারে হইয়া থাকে, তাহা জান কি? পদার্থ কখন স্বয়ং পুনর্নির্ম্মিত অথবা পুনঃসংস্কার প্রাপ্ত হইয়া, নবজীবন প্রাপ্তে, স্বয়ং উত্তর গমন করিয়া থাকে; কখন বা অপরের নির্ম্মাণে উপকরণ স্বরূপে বিলীন হইয়া, উত্তর গমন করে। ফল, একে আত্মদীপ্তি; অপরে আত্মলোপ। প্রথম গমন আত্মবানের কার্য্য, দ্বিতীয় গমন অনাত্মবানের কার্য্য। তুমি অনাত্মবান ঢিল পাটিকেল নহ। তুমি আত্মবান হইয়া প্রকৃতির উপর দ্বিতীয় প্রকৃতি স্বরূপে যে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, তাহার সফলতা সাধন পক্ষে কি করিবে? প্রকৃতি হইতে তোমার সেই আত্মস্বাতন্ত্র রক্ষার জন্য কি করিতেছ? তবে তোমার আত্মলোপই কি পরম পুরুষার্থ? আত্মলোপ যদি পরম পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে তুমি যে প্রকৃতির উপর আত্মনির্ভর করিয়া রহিতেছ, তাহা ঠিক কাজই করিতেছ। কিন্তু তাহা নহে। তুমি কার্য্যরত হও বা না হও, ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য যাহা এবং যাহা সম্পাদন করিতে তুমি প্রেরিত, নিশ্চয় জানিও, তাহা তোমার জন্য আটক হইয়া পড়িয়া থাকিবে না; কিন্তু তোমার পুরস্কার—তোমার পরিণাম—তোমার শক্তি ব্যত্যয়ের ফল? অদৃষ্টবাদের উপরে ইহাকে ওঁছাটে অদৃষ্টবাদ, এবং এরূপ আত্মহীনতার যে শুভাশুভ তাহাকে অক্ষম শুভাশুভ বলা যায়।

মানব যদি আত্মবান হয় ও তাহার আত্মস্থান যখন শূন্যের অনুপাতে না নামে, তখন তাহার যাহা কিছু সক্ষম শুভাশুভ (বলা বাহুল্য যে সক্ষম শুভাশুভই এ জগতে একমাত্র কার্য্যকর এবং উপার্জ্জনীয়) তাহা একমাত্র আত্মশক্তিচালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই আত্মশক্তিচালনা হইতে সক্ষমতা ভাবের উৎপত্তি হয়। সক্ষমতা ভাবের অস্তিত্ব যথায়, তথায়ই কেবল মানবজীবনকে মানবজীবন বলা যায়; তদন্যতরে ঢিল পাটিকেল। অতএব মানবজীবন সার্থক ভাবে অতিবাহন করিতে হইলে, আমাদের প্রথম প্রয়োজন আত্মশক্তিচালনা।

আত্মশক্তিচালনা সুপথ বা বিপথ গমন, সক্ষম শুভ বা অশুভের উৎপাদন; এ উভয় কার্য্যেই পটু। কখন কখন বা তাহা সমুদ্র ছেঁচিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া, গোষ্পদ ছেঁচিয়া পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিয়া থাকে; অথবা এই দৃশ্যই এ জগতে প্রবল। আত্মশক্তিচালনা স্বয়ং অন্ধ। এ হেতু, ইহাকে সুপথে ও যথাযোগ্য ভাবে চালিত করিতে কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রয়োজন হয়। বলিতে গেলে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ইহার উত্তেজক এবং পরি-

চালক উভয়ই। কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাব হইলে আত্মশক্তিচালনা বিপথ গমন করিয়া থাকে; অথবা ক্ষিপ্তবং সুপথ ও বিপথে বিঘূর্ণিত হয়। কর্ত্তব্যবুদ্ধির উচ্চেতরাদি ভাব হইত, উন্নত বা সামান্য ব্যাপারে, সৎ বা অসৎ পথে, উহার নিয়োজনবিষয় নিরাকৃত হয়। ঈশ্বরের নিকট যে আপনার কর্ম্মকারকত্ব বোধ এবং তাঁহার প্রীত্যর্থে আমি কর্ম্ম করিতে বাধ্য এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাকে কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি ধর্ম্মের বিষয়ীভূত পদার্থ। ধর্ম্মই আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উৎপাদক, পরিপোষক এবং অবলম্বন, সকলই। ভারতসন্তান, ধর্ম্মেই ভারতের জীবন; এ জগতের আদি হইতে ভারত পুণ্যভূমি, কেবল ধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু। ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া ভারত উঠিয়াছে, জগৎ উজ্জ্বলিত করিয়াছে; আবার ধর্ম্মেরই খাতিরে এ জগতে তাহার যাহা কিছু অধঃপতন, তাহাও সংঘটিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ভারতের প্রাণবায়ু এবং নীতি তাহার চৈতন্য। সেই ধর্ম্ম ও সেই নীতিতে যদি প্রবুদ্ধ না হও, এবং তাহা হইতে ভারতকে যদি চ্যুত কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে অভ্যুত্থান দূরে যাউক, ভারত একদণ্ডও প্রাণে বাঁচিবে না। দেখ জগতের যাবতীয় প্রাচীন জাতি একে একে কোন্ কালে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে কিন্তু ভারত এখনও, নানা উৎপীড়ন ও নানা বিপৎপাত সত্ত্বেও, আজি পর্য্যন্ত সমান প্রাণে বাঁচিয়া রহিয়াছে; তাহার কারণ, ভারতের জীবন যাহা তাহা একমাত্র নিত্য পদার্থ ধর্ম্মমূলের উপরে স্থাপিত। ভারতের যখন সকল গিয়াছে, ভারতের যখন পেটে ভাত নাই পরণে কাপড় নাই, তখনও ভারত একমাত্র ধর্ম্মের তর্ক ও তাহার রূপ রূপান্তর আদি উপলক্ষ করিয়া, মনের সুখে দিবস অতিবাহিত করিয়াছে। সেই ভারতকে আবার সজীব, আবার অভ্যুত্থান করাইতে হইলে, কেবল এক মাত্র নিত্য ও সত্য ধর্ম্ম অবলম্বনীয়; ধর্ম্মকে অবলম্বন ব্যতীত কখন তাহা সংসাধিত হইবে না; মৃতদেহ লইয়া কবে কোন কার্য্য হইয়া থাকে?

কিন্তু এক কথা, ধর্ম্ম বলিলেই ভাবিও না যে, কেবল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা; মাথাকুটা ইত্যাদি স্তব স্তুতি; মিথ্যা কহিব না, চুরি করিব না, জিতেন্দ্রিয় হইব ইত্যাদি আত্মসংস্কার; এই সকল করিলে ধর্ম্মকার্য্য সমাধা হইল, এবং ধর্ম্মের ফল যাহা তাহা মোক্ষলাভ। আমি তোমাকে সত্য সত্য বলিতেছি, আত্মসংস্কারে কিছু বাহাদুরী নাই; বিধবার একাদশীবৎ করিলে ফল নাই, না করিলে পাপ আছে; প্রত্যুত তুমি যে আত্মসংস্কারের কারণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, ইহাই বরং আশ্চর্য্যের বিষয়। আত্মসংস্কারে তুমি যাহা হইবে, এবং হইয়া ভাবিতেছ যাহাতে চূড়ান্ত ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিলাম ও যাহাতে আমার মোক্ষ হইবে, তাহাইত তোমার স্বাভা-

বিকী মূর্ত্তি। তবে যে এতদিন তুমি সে মূর্ত্তিতে ছিলে না, তাহা কেবল স্বভাব হইতে এতদিন বিচ্যুত হইয়াছিলে এই মাত্র। এখন যে তুমি প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মসংস্কারের দ্বারা সেই আত্মস্বাভাবিকী মূর্ত্তিতে আবার ফিরিয়া আসিতেছ, তাহাতে তুমি কেবল আপনারই কার্য্য করিতেছ মাত্র। কিন্তু যিনি তোমাকে এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, যিনি তোমাকে এই প্রভূত কর্ম্মশক্তি প্রদান করিয়াছেন, যিনি তোমাকে তোমার সেই শক্তি সহ পোষণ করিতেছেন, তাঁহার জন্য, তাঁহার প্রীত্যর্থে, কি করিয়াছ? তোমার মোক্ষপ্রাপ্তি, তোমার পারলৌকিক শুভ ইত্যাদির জন্য সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, যে উপায় সকলের অনুসরণ করিতেছ, তুমি জানিতেছ না যে তাহাই তোমাকে তোমার মোক্ষ বা পারলৌকিক শুভ হইতে অনেক দূরে লইয়া ফেলিতেছে! ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি।

'মোক্ষ' 'পরলোক,' এ সকল লইয়া এত ব্যস্ত কি জন্য? কেন মিছা ভাবিয়া ভাবিয়া আত্মনষ্ট, সকল নষ্ট করিতেছ? তুমি যখন এই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলে, তখন ডাক বা টেলিগ্রাফের খবর অথবা গোমস্তা বা পাইক পাঠাইয়া বাড়ীভাড়া, আসবাব ভাড়া, আত্মীয় স্বজন ভাড়া, জনক জননী ভাড়া, আঁতুড় ভাড়া, কাঁথা ভাড়া, মায়ের স্তনদুগ্ধ ভাড়া, এ সকলের বন্দোবস্ত আগে ঠিক করিয়া, তবে কি তোমায় এই পৃথিবীতে আসিতে হইয়াছিল? কোন অনুষ্ঠানইত হয় নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ত তুমিও কাহাকে চিনিতে না এবং তোমাকেও কেহ চিনিত না; অথচ তুমি যখন নিঃসহায়, নিরুপায়, শক্তিসঞ্চালনমূঢ়, এ জগতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, তখন কথিত সকল আত্মীয় ও সকল দ্রব্যই মজুত এবং হাতে হাতে সমস্তই ত প্রাপ্ত হইয়াছিলে; তুমি একটু টুঁ করিলে শত লোক দৌড়িত; আবার শত লোক তোমার উপর এমনই মমতাযুক্ত কেনা গোলামবৎ যে, কোটীশ্বর কোটি মুদ্রা খরচ করিয়াও তেমন একটি পাইয়া উঠে না। মূঢ়! যে ঈশ্বর এখানে তোমার আসিবার কালীন তোমার জন্য এমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; পরলোকের ভারও কেন সেই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আপন যথাদিষ্ট কার্য্যে রত না হও? ইহলোকও যে ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজত্ব, পরলোকও সেই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজত্ব। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, নতুবা ঈশ্বরের প্রীতি প্রাপ্তির নিশ্চিত উপায় যাহা তাহা পরিত্যাগ করিয়া, অনিশ্চিতের জন্য এবং ভয়ে এরূপ ক্ষিপ্ত হইয়া ফিরিবে কেন? পরলোক পরের কথা; ইহলোক; যাহার সহিত আপাতত তোমার সম্বন্ধ, যে তোমাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া এত বড়টী করিয়াছে, যে

তোমার নানা সুখসচ্ছন্দতা সাধন করিতেছে, তাহার জন্য কি করিয়াছ? যে ইহলোকের প্রতি এরূপ অকৃতজ্ঞ, পরলোকে তাহার প্রতি বিশ্বাস? ইহলোক অধিকারে যে এমন অকৃতকর্ম্মা, পরলোক অধিকারে তাহাকে কে বিশ্বাস করিবে? ইহলোক ভিত্তি স্বরূপ, পরলোক তদুপরি স্থাপিত; সেই ভিত্তির দৃঢ়তা এবং পূর্ণতা সাধন পক্ষে কি করিয়াছ? তোমার স্রষ্টা তোমাকে যে সকল শক্তি প্রদান করিয়াছেন, অবশ্যই তিনি তোমার নিকট তদতিরিক্ত কোন কার্য্যের প্রত্যাশা রাখেন না; তাহার পর, তোমাকে যে সকল শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, দেখিতেছি যে তাহা সমস্তই ইহলৌকিক কার্য্যক্ষম শক্তি, ইহলোকের অতীত কার্য্যক্ষমতা তাহার এক বিন্দুও নাই; এমন স্থলে, ইহা কি নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে কেবল ইহলোক, কেবল ইহ সংসারই, তোমার একমাত্র কর্ম্মভূমি এবং কর্ম্মার্থে অবলম্বন?

আবর্জ্জনাশূন্য নির্ম্মল কর্ত্তব্যবুদ্ধি যাহা, তাহার উৎপত্তি এবং শিক্ষা এরূপে,—ঈশ্বর কোন পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি করেন না; সুতরাং তিনি আমাদিগকে যে সমস্ত শক্তি, কি শারীরিক কি মানসিক, যাহা দিয়াছেন, তৎসমস্তের নিশ্চিত উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা আছে। আমরা সেই সকল শক্তির চালক; অতএব আমরা যদি সেই সকল শক্তির সদ্ব্যবহার না করি, তাহা হইলে কথনই বলিতে পারি না, যে তদ্দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নষ্ট করিলাম না। তাঁহার উদ্দেশ্য পূরণ করিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা হইল, অতএব তাহার নাম পুণ্য; তাঁহার উদ্দেশ্য অন্যথা করিলে অবশ্যই তাঁহার অপ্রিয় সাধন করা হইল, অতএব তাহার নাম পাপ। আমরা পাপ পুণ্যের ফলভাগী জীব। এজন্য পাপ পরিহারে যাহাতে পুণ্য সঞ্চয় হয়, শক্তিসমূহের সেইরূপ সদ্ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। আমরা, কি ইহলোক কি পরলোক, উভয় লোকের শুভপ্রার্থী হইতে হইলে, উহাই তাহার একমাত্র পন্থা; তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। অন্য পন্থা আর আছে বলিয়া যাহারা বলে তাহারা হয় ভ্রান্ত, নয় নির্ব্বোধ, নয় ক্ষিপ্ত, নয় জুয়াচোর, ইহার একতর। বাঞ্ছারাম, দেখিতে পাইবে, এ কর্ত্তব্যবুদ্ধির মূলেও কতটা স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু স্বার্থ যথন এই অবস্থায়, এরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধির সহ জড়িত থাকে, তাহাকে দিব্য স্বার্থ বলে; তদন্যতরে স্বার্থ পার্থিব। পার্থিব অবস্থায় যে স্বার্থ সকল অনর্থের মূল; দিব্যাবস্থায় সেই স্বার্থই আবার সকল অর্থের মূল হইয়া থাকে। এই দিব্য স্বার্থকেই চলিত কথায় স্বার্থশূন্যতা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সাত্ত্বিকবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রে প্রায়শ এই এক মাত্র দিব্য স্বার্থে স্বার্থবান হইয়া থাকেন।

দিব্য স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বর প্রীতি-

লাভ। দিব স্বার্থবান ব্যক্তি মানবীয় সুখ্যাতি অখ্যাতির প্রত্যাশা রাখে না, যেহেতু সে মানবীয় নিয়োজনে কর্ম্মরত হয় নাই। মানব তাহাকে শত ধিক্কার দিলেও, এবং বস্তুত দিয়াই থাকে, তথাপি সে স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিবার পাত্র নহে। এ পথে এ লোকে 'যাহার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর' প্রায়ই এরূপ ঘটিয়া থাকে; তথাপি সময় ও সমাজ, সপক্ষ বা বিপক্ষ যাহাই হউক, তাহার পক্ষে দুই সমান, তাহাতে তাহার চেষ্টার রোধকারী কেহ এবং কিছু মাত্র হইতে পারে না। সমগ্র পৃথিবী তাহার মস্তকের উপর চাপিয়া পড়িলেও, সে তাহাতে ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহে। যেহেতু সময়, সমাজ, পৃথিবী, তাহাদের রোষ ও তোষ, সুখ্যাতি বা অখ্যাতি, এ সকলই ক্ষণিক, এই থাকিবে, এই থাকিবে না; কিন্তু সে যাহার প্রীত্যর্থে কার্য্য করিতেছে, এবং যাহার অনুগ্রহ বা নিগ্রহ তাহার একমাত্র অবলম্বন, সেই প্রীত্যাদি অনন্তস্থায়ী এবং অনন্ত-ব্যাপী; সুতরাং সে কি কখনও অনন্তকে রুষ্ট করিয়া অন্তকে তুষ্ট করিতে অগ্রসর হইতে পারে? যে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চেষ্টাবান, স্বয়ং ঈশ্বর করুণা রসে তাহার সহায়তা করিয়া থাকেন; নতুবা সে সমাজ হইতে বহু ক্লেশ, বহু দুঃখ, বহু উপহাস, কঠোর মৃত্যু যন্ত্রণাকে পর্য্যন্ত, কেমন করিয়া তুচ্ছে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়? যে একবার মাত্র কখনও এরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে, সেই বুঝিতে পারিবে যে, ইহার প্রভাবে অন্তঃশক্তি কিরূপ অলোকসামান্য বিকশিত এবং দুর্দ্দমনীয় হইয়া থাকে; বহু ক্লেশরাশির মধ্যেও কেমন একটী দিব্য সান্ত্বনা পদার্থ পরিদীপ্তিমান হয়, এবং কেমন তাহা অঘোর প্রতিকূল অন্ধকার মধ্যেও তাহাকে স্বচ্ছন্দে পরি-চালনা করিয়া লইয়া যায়। এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতাবর্দ্ধক যে সমস্ত মহা-নুভবের নাম শুনিতে পাইয়া থাক, তাহা-দের জীবন একে একে আলোচনা করিয়া দেখিও, দেখিতে পাইবে যে তাহা আমূলত ইহারই জীবন্ত অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং এই কর্ত্তব্যবুদ্ধিই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। যদি ইচ্ছা হয়, ইহাও দেখিতে পাইবে যে সাময়িক সমাজের নিকট তজ্জন্য তাহাদিগকে সময়ে সময়ে কতই ক্লেশ ও অপমান প্রভৃতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাহাদের কি হইয়াছিল? প্রতিকূলতা এখন লুপ্ত; তৎস্থলে তাহাদের কৃত কার্য্য যাহা তাহা দিগন্ত-ব্যাপ্ত, এবং অনন্ত কর্ম্মপ্রবাহে মহাধারারূপে তাহা এখন অনন্ত গৃহে গৃহীত। ফলত মূল যখন "মূলং কৃষ্ণ-ব্রহ্মচ ব্রাহ্মণাশ্চ", তখন অনুষ্ঠানে বন-বাস, বহুক্লেশ, বহুসংগ্রাম থাকিলেও, অন্তে সসপ্তদ্বীপা সাগরাম্বরা বসুমতীর আধিপত্য নিঃসন্দেহ প্রাপ্তব্য ফল। বাঞ্ছারাম, তথাপি এ পথে অগ্রসর হইতে

যাহারা ভয় পায়, তাহাদের ভয় ঠিক যে ব্যক্তি অমর তাহার জুজুবিছা দেখিয়া জীবন ভাতি উপস্থিত হইবার ন্যায়। হিন্দুসন্তান, তুমি বসিয়া রহিয়াছ কি জন্য? তুমিও কেন এই মূল ধরিয়া কার্য্যারম্ভ না কর? যদিও তোমার শক্তি ক্ষুদ্র হয়, বসুমতীর আধিপত্যের পরিবর্ত্তে না হয় একখানা গ্রামও ত অবশ্য লাভ করিতে পারিবে। যেখানে সকলই ওঠবন্দি হিসাবে ভুক্ত, সেখানে এ ক্ষণস্থায়ী ওঠবন্দি ঠাকুরালীর পরিবর্ত্তে যদ কিছু স্থায়ী সম্পত্তি করিতে পার, তাহা কি প্রার্থনীয় নহে? মনুপুত্রের তাহাই করা কর্ত্তব্য; নতুবা পিতৃনাম, পিতৃপুরুষের অপমান করা হয়।

পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্য আপাত-লভ্য সৌভাগ্য, সম্পদ বা স্বচ্ছন্দাদি লাভ। ইহাতে আপাতত ইন্দ্রপ্রস্থ পর্য্যন্ত অধিকারভুক্ত হইয়া, সুখ বৃদ্ধি করিল বটে; কিন্তু অন্তে কেবল অধিকার-চ্যুতি মাত্র নহে, সবংশ সহ সমস্ত লোপ। আমাদের সমাজ আপাতত যেরূপ সংগঠিত, তাহাতে সত্য মিথ্যা উভয়ের যুগপৎ একত্র সমাবেশ, অধিকন্তু মিথ্যার প্রাধান্য অধিক। এখানে নির্ব্বোধ মানব স্রোততরঙ্গে পড়িয়া সকল বিষয়েই আশু ফল, আশু প্রতিকারের অনুসন্ধান করিয়া থাকে; যথা নিয়ম ও যথাকালের বড় একটা অপেক্ষা রাখে না বা বুঝে না। সুতরাং ফল এখানে যুগান্তস্থায়ী হয় না; নিরন্তর এক ভাঙ্গিতেছে আর গড়িতেছে। মিথ্যাই এখানে আশীষত প্রায় সর্ব্বত্র সর্ব্বেসর্ব্বা মূলস্বরূপ হইয়া আছে,—'মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রে হমনীষী'। মিথ্যা ভ্রমের আধার, ভ্রম দৃষ্টিরোধক; দৃষ্টির যেখানে রোধ, মানব সেখানে ভবিষ্যৎ পথে অন্ধ; অন্ধ ব্যক্তি কেমন করিয়া ভবিষ্যদ্‌বাহী ফলের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে? আপাত-লভ্য ফল এবং তৎসাধনার উদ্দেশ্য, আগত সময়কে কোন রূপে থাবাথুবি দিয়া সন্তুষ্ট রাখা, সুতরাং সে সকল নিঃসন্দেহ কেবল উপস্থিত সময়ের জন্য। অতএব, অবিরত গতিশীল সময়, যেমন ত্বরিত গতিতে কালপথে অদৃশ্য হয়; তাহার প্রীতিজন্য অর্জ্জিত কথিত ফলাদি ও আত্মস্থানশূন্য করিয়া সেইরূপ ত্বরিত গতিতে, তপনতাপতপ্ত জলবিন্দুর ন্যায়, অবিলম্বে অনন্ত গৃহে হিসাবশূন্য হইয়া বিলোপ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে একরূপ গোঁজা মিলনে ফাঁকি বুঝান বলে। তুমি যেখানকার সেই খানেই থাকিলে, অথচ ফাঁকি দিয়া বুঝাইলে যে তুমিও চলিতেছ। আরও আশ্চর্য্য, তুমি ভাবিলে কাল তোমার ফাঁকিতে ভুলিয়া, পিছু দিকে না চাহিয়া চলিয়া গেল! ভ্রান্ত, কালকে ফাঁকি দেয় কাহার সাধ্য। কাল না দেখিয়া যায় নাই, তোমার ফাঁকিও তাহার অবিদিত নাই, তবে যে হাতে হাতে তোমার ফাঁকির প্রতিবাদ করিল না, তাহা কেবল তোমার নষ্টামির শাস্তি দারুণতর করিয়া তুলিবার জন্য।

কিন্তু যখন ধরা পড়িবে, তখন দেখিতে পাইবে যে তোমাকে কি ভীষণ বেগেই নাকে দড়ি দিয়া কাল আপন সমসূত্রে টানিয়া লইতেছে; তখন বুঝিতে পারিবে যে ফাঁকি দেওয়ার কি দুর্দ্দমনীয় প্রায়শ্চিত্ত।

সে যাহা হউক, আমাদিগের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির সূত্র অনেক দূরে, আধা পথে ফেলিয়া আসিয়াছি। আমাদিগের মানবীয় সংসারে যত গুলি সুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, বা যাহা কিছু মহত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া পরিচিত, সে সকলকে সংগ্রহ পূর্ব্বক একতার সূত্রে সংযোজন, তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন, এবং তত্ত্বাবধের সংসাধন, এ সমস্তই কর্ত্তব্যবুদ্ধির কার্য্য। সুকার্য্য এবং মহত্ত্ব সমুদায় নানা রত্ন ও মাণিক্য স্বরূপ; কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামকরূপে তাহাদিগের উদ্ধার, সংগ্রহ ও সংস্কৃত করিয়া, একতার সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ পূর্ব্বক, ভুবনানন্দদায়িকা মালিকার আকারে সজ্জিত করিয়া থাকে; তখন যে দিকে তাকাও, সেই দিকেই দিগঙ্গনাগণ মধুর হাসি হাসিয়া, প্রসন্ন মুখে তৎপ্রতি স্বীয় প্রসন্নতা ভাব জ্ঞাপন করে। কিন্তু যথায় সেরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাব, বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি যথায় বক্রুর বা ছন্ন, তথাকার দৃশ্য কি স্বতন্ত্র এবং শোচনীয়। তথায় মণিরত্ন নানা দিকে নানা কারণে যদিও ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইতে থাকে বটে; কিন্তু কখনও তাহারা স্থায়ী হইয়া বা গোটা বাঁধিয়া, একতায় আগতি পূর্ব্বক অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করে না। তাহাদিগকে সজ্জিত করিয়া ব্যবহারভুক্ত করা দূরে যাউক, তাহাদিগকে কেবল ধরিয়া রাখার জন্যও, যত ইচ্ছা চেষ্টা করা যাউক না কেন, ফণীর মণিবৎ কোথায় দিয়া যে তাহারা তিল তিল করিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়, তাহার নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। এ দৃশ্য, এ কৌতোদ্দীপক প্রহসনের অভিনয় দেখিবার জন্য, আমাদিগকে কোন দূর স্থানে যাইতে হইবে না; এ দৃশ্য আমাদের ঘরে, ভারতগৃহে, নিত্য নিত্য অভিনীত হইতেছে। যাবতীয় উৎসাহ, যাবতীয় উদ্যম, জাতীয় একতা, স্বদেশপ্রিয়তা, জাতীয় অভ্যুত্থান, নানা অনুষ্ঠান, নানা সংস্করণ, এ সকলের শব্দ এবং আড়ম্বরে ভারত নিত্য টলটলায়মান; কিন্তু কখন দেখিয়াছ কি তাহার কোনটা গোটা বাঁধিয়া বা গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া, কোন প্রকারের সুফল প্রসব করিতে পারিয়াছে? কুফলের অভাব নাই; অনুষ্ঠান সুফলপ্রসবীরূপে সম্পূর্ণ না হইলে, কুফল তাহা হইতে স্বতঃ-উৎপন্ন হওয়াই নিয়ম। তোমার সমস্ত আন্দোলন, সমস্ত সংস্করণ, সমস্ত কথা, সকলেই জলবুদ্বুদবৎ উঠিতেছে পড়িতেছে; মুহূর্ত্তে উদয়, মুহূর্ত্তে বিলয়; কেবলমাত্র বচনেই সকল অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। কথা যতক্ষণ সভাস্থলে, সভার বাহিরে আর তাহার এক বর্ণও কাহার মনে তিষ্ঠে

না। ইহার অর্থ এই,এ সকলের মূল দেশে কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাব; এ সকলের মূল কেবল মাত্র সাময়িক হুজুগ। কর্ত্তব্যবুদ্ধি যাহা তাহা প্রলয়ঘূর্ণাবর্ত্ত মধ্যে নিয়ম স্বরূপ। কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে বিষয় তাহার ধর্ম্ম ওরূপ নহে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি যথায় মূল, তথায় যাবতীয় অসংলগ্ন বিষয় সংলগ্নে আসিয়া পরিণত হয়; যাবতীয় অস্থায়ী বিষয় ক্ষণিকতা পরিত্যাগে স্থায়িত্ব পায়; তথায় অনুষ্ঠিত বিষয় কেবল সভাস্থলীয় বাক্যে পর্য্যবসিত হয় না, যতক্ষণ তাহা সংসাধিত না হয়, ততক্ষণ তাহা জীবনের ব্রত স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়; মানুষ তাহার জন্য পাগল হয়, তখন শয়নে স্বপনে কেবল এই একমাত্র ভাবনা,—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন।' কি অপূর্ব্ব মহামন্ত্র!

শক্তিসঞ্চালনে উদ্যম এবং কার্য্যপক্ষে কর্ত্তব্যবুদ্ধি, কেবল এই দুইটী থাকিলেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারা যায় ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহাতেও সাধনাসিদ্ধি হয় না। সাধনাসিদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে সূক্ষ্ম এবং সুদক্ষ করিবার জন্য, আরও কতকগুলি বিষয়ের একান্ত প্রয়োজন; তন্মধ্যে আত্মসংস্কার এবং শিক্ষা এই দুইটী প্রধান।

আত্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বথা গুরুতর; কারণ যথায় যেমন উৎস, তাহার নিঃসৃত দ্রব্য যে তেমনি স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। আমরা জানি, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সুফল লাভ করিবার পক্ষে আমাদের কোন সাধ্য নাই। আমরা যেমন শুদ্ধ বা অশুদ্ধ প্রকৃতি এবং যেমন বা যে পরিমাণে পবিত্র বা অপবিত্র হইব, আমাদের কৃত কর্ম্মও সেইরূপ আকার ধারণ করিবে। অতএব যাহাতে কোন রূপে আমাদিগকে শারীরিক ও মানসিক কলুষ না স্পর্শে, তৎপক্ষে আমাদিগের ত্বরান্বিত ও চেষ্টাবান হওয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। যদিও এ পৃথিবীতে অসৎ হইতে একেবারে পরিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তৎপক্ষে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা চালনার পক্ষে ত্রুটি না হয়। চেষ্টা করিলেও যখন এমন, তখন চেষ্টা না করিলে কত অধিক অসৎ স্পর্শের সম্ভাবনা! অতএব একমাত্র চেষ্টার সীমা, আমাদিগের আত্মসংস্কারের পরিমাণ হওয়া উচিত। আমাদের সাধ্য যতদূর, তাহা আমরা নিবিষ্ট মনে করিব, তদতিরিক্ত যাহা, তাহা দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। জ্ঞানকৃত পাপ পরিহার আমাদিগের সাধ্যের মধ্যে।

শারীরিক ও মানসিক কলুষ, এ দুয়ের মধ্যে মানসিক কলুষই গুরুতর; অথবা মানসিক কলুষই সর্ব্বস্ব, শারীরিক কলুষ কেবল তাহার ফল স্বরূপ বলিলে বলা যায়; কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি মন সর্ব্বদা শরীরের বশ নহে, শরীরই সর্ব্বদা মনের আজ্ঞাকারী হইয়া থাকে। এ জগতে যত প্রকার অনর্থোৎপত্তি হয়,

তাহা প্রধানত এই মানসিক কলুষ হইতে। মানসিক কলুষ সমূহের মধ্যে প্রধানতম কলুষ পার্থিব স্বার্থ; উহা রাজা স্বরূপ এবং নীচতা উহার মন্ত্রী, উহারা একযোগ হইয়া আর তাবৎকে পরিচালন করিয়া থাকে। অতএব যে মানসিক কলুষ সর্ব্ব অনর্থের মূল, তাহা কি লোকত কি ধর্ম্মত, সর্ব্ব প্রকারে যথাসাধ্য পরিহার্য্য। মানসিক অসৎ-বৃত্তি বা অসৎ-বুদ্ধি সকল, সতত সত্য কার্য্যের বিরোধী; যে পরিমাণে তাহারা মানসক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে কৃত কার্য্য-সকল ছন্ন বা অসৎ-সম্পাদিত ও অসৎ-পরিণামযুক্ত হয়। শক্তিসঞ্চালনে সহস্র উদ্যম এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রভূত ব্যুৎপত্তি থাকিলেও, যদি মানসিক কলুষ অপসারিত করিয়া মানসিক পবিত্রতা সংসাধন করা না যায়, তাহা হইলে, সে শক্তি-সঞ্চালন ও সে কর্ত্তব্যবুদ্ধি কার্য্যকরী হইয়া কোন সুফল প্রসব করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহারা মানসিক কলুষের দাসরূপে পরিণত হইবায়, তাহাদের যে প্রভূত কার্য্যক্ষমতা, তাহা বিকৃত দিকে চালিত হয় ও সম্ভব অপেক্ষা অপার গুণে বিকৃতির উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব আবার বলা বাহুল্য বা পুনরুক্তি স্বরূপ হইতেছে যে, আত্মপবিত্রতা ব্যতীত, শক্তিসঞ্চালন এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি সমস্তই বৃথা হইয়া যায়। এজন্য, আত্মসংস্কারের দ্বারা পবিত্রতা সাধন, কর্ত্তব্যবুদ্ধির আদি ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জানিও। নতুবা, ঈশ্বরের প্রীতি প্রাপ্তি যদি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই প্রীতি তোমার কৃত যে সকল কার্য্যের দ্বারা আকর্ষিত হইবার সম্ভব, সে কার্য্য কখনও তোমার দ্বারা সুসম্পাদিত হইতে পারিবে না।

এই আত্মসংস্কার এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে, একমাত্র বা প্রধানত স্বর্গের সোপান এবং ধর্ম্মের পথ বা স্বয়ং ধর্ম্ম-স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাসিত, এবং ভ্রমান্ধতায় তাহা কতই আড়ম্বর ও অতিনীতি যোগে পালিত হইয়া আসিয়াছে। উপায় যাহা, তাহা উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, ভারতীয়েরা অতিবুদ্ধিশালী প্রায় তাঁহাদের অনুষ্ঠিত তাবৎ বিষয়ে. এখানেও, সেই অতি-বুদ্ধিবশে, তাঁহাদের আত্মসংস্কার প্রণালীকে উহার এমন চরমসীমায় লইয়া উপস্থিত করিয়াছেন যে, অন্য সাধনার কথা দূরে যাউক, কেবল তাহার সাধনেই, সমস্ত জীবন অতিবাহিত বা সমস্ত জীবন নিপাত করিলেও, অবসর বা সীমা পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয় সংযম করিতে হইবে?—খাও জল এবং ঘাসের পাতা, যাহাতে শরীর শোষিত হইয়া, কেবল একটা ইন্দ্রিয় কেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই একেবারে এবং চিরকালের মত দমন হয়। নিঃস্বার্থ হইতে হইবে?—ছাড় সংসার, ধর সন্ন্যাস-মূর্ত্তি; মাঘের হিমে, আষাঢ়ের জলে, বৈশাখের অগ্নিতে, অযত্নক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া পড়িয়া থাকিতে শিখ। দ্বেষ হিংসা পরি-রহিত হইতে হইবে?—হও কাষ্ঠদণ্ডবৎ

উলঙ্গ, সর্ব্বত্যাগী, অযাচিত-ভিক্ষাজীবী। জীবন দিলেও, এ প্রকারের সিদ্ধিকে কুলাইয়া উঠা দুষ্কর! হিন্দুঠাকুরদের ঐ ঐ অতি-আচারের কার্য্যকারিতায় এত দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঐ ঐ আচার (আমরা বলি ঐ ঐ অতি-আচার) যদি কোন ব্যক্তিতে দৃষ্ট হওয়ার কিছু ক্রটি থাকে, তবে তাহার যে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বা থাকিতে পারে, ইহা তাহাদের ধারণায় একবারেই আইসে না। বুদ্ধিবৃত্তি হিন্দুরা অতিশয় প্রশস্ত এবং আড়ম্বর-আয়ত্তক পাইয়াছিলেন; সেই বুদ্ধির মোহে, ইহাঁদের যে কোন গুণ এবং সাধ্যবিষয় গুলিকে এমনই বহুবায়তন ও আড়ম্বর-যুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন যে, উপায়ের সন্নিকটে উদ্দেশ্য যাহা তাহা ঢাকা পড়িয়া, উপায়ই উদ্দেশ্যরূপে প্রতীয়মান হয়। সাধারণত, উপায় যত সংক্ষিপ্ত-আয়তন ও সুখগ্রাহ্য ও সরল হয় ততই ভাল; কিন্তু এখানে তাঁহার বিপরীত, এবং বলিয়াছি যে একথা খাঁটি হিন্দু-য়ানীর প্রায় যাবতীয় বিষয়েতে বলিতে পারা যায়: তাহার সাক্ষ্য—এই দেখ একটা ব্যাকরণ শাস্ত্র; উহা ভাষা শিক্ষার উপায় স্বরূপ, কিন্তু এখানে একবার ব্যাকরণ পর্ব্বের ঘটা দেখ, সহকারী না হইয়া স্বয়ং একটী বিজ্ঞান এবং কেবল তাহা নহে, দুঃসাধ্য মুখ্য বিজ্ঞানের পদবীতে উঠিয়া গিয়াছে। এরূপ বহ্বাড়ম্বরযুক্ত উপায় ঘটা বা অনুষ্ঠান সর্ব্বদা পরিহার্য্য।

বাঞ্ছারাম, তোমাকে সেরূপ আত্ম-সংস্কার করিতে বলিতেছি না; যাহা রয় সয় তাহাই ভাল। অথবা বিজাতীয়-গণের ন্যায় আত্মসংস্কার করিতেও তোমাকে অনুরোধ করিতেছি না; এক সময়ে তাহাদের আত্মসংস্কার মন্দ ছিল না, কিন্তু এখন তাহা সাধারণত অথবা সর্ব্বদা ঝোপ বুঝিয়া কোপ। চাণক্যের নীতিও অতি কুটিল অথবা সর্ব্বনাশকর নীতি; সে নীতিতে আত্মসংস্কার হয় না, আত্ম-অসংস্কার হয়; চাণক্য দ্বিতীয় মেকিয়াবেলী। অতঃপর তবে আত্ম-সংস্কার সাধক কোন্ নীতির বিষয় আমি তোমাকে পরিচয় দিয়া বুঝাইব? যে পদার্থ সত্যপ্রসূত এবং নিত্য এবং সর্ব্বসুন্দর, তাহা পরিচয়ের আবশ্যক রাখে না; তবে কোথায় বা কাহার দ্বারা তাহাতে আবর্জ্জনা স্পর্শ করিয়াছে বা করিতে পারে, তাহারই পরিচয় দিবার আবশ্যক হয়। আমারও চেষ্টা সেই পর্য্যন্ত। তবে মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলি, সত্যকে দৃঢ়রূপে অব-লম্বন করিবে, যথাসাধ্য সদ্বুদ্ধিশালী হইবে, কদর্য্য স্বার্থপূর্ণ এবং ভীরু ও নীচ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট হইও না; ইহার মধ্যেই আর সমস্ত আত্মসংস্কার নিহিত করা রহিল। শারীরিক কলুষ পরি-হারের আবশ্যকতা ও শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে আর অধিক কি বলিব,—সেই শরীরই সার্থকজন্মা, সেই শরীরেরই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট পরিণাম, যাহা সুকার্য্যসাধনে মায়া

ত্যাগে প্রদত্ত হয়; কে জানে লোকের হস্তে, কে জানে কালের হস্তে। ভারতে কি আবার তেমন দিন আসিবে?

কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে পবিত্রভাবে চালনা করিবার নিমিত্ত যেমন আত্মসংস্কারের প্রয়োজন, তেমনি কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রশস্ততা সাধন জন্য, শিক্ষার প্রয়োজন তদধিক। শিক্ষার উদ্দেশ্যটী শুনিতে এক কথা,—প্রশস্ততা সাধন করে; প্রশস্ততা পদার্থটী কি বিপুল ও অপূর্ব্ব! উহা এমনই অপারগুণময়ী যে একা উহার আলোকে তাবৎ আলোকিত হইয়া থাকে; এবং উহার আলোকে তাবৎ বিষয় এতই সুরূপান্তরিত হয় যে শেষে যেন সেই প্রশস্ততা, সুতরাং তদুৎপাদক শিক্ষাই, সমস্তের একমাত্র উদ্ভাবক ও নিয়ামক স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। আর্য্য-ঠাকুরদের মধ্যে প্রশস্ততার অভাব হেতু, তাঁহাদের তাবৎ কর্ম্ম কাণ্ড প্রায় অনর্থক হোম যজ্ঞাদিতে সমাহিত হইয়া আসিয়াছিল। যথায় সুগোল নধর ফলের সম্ভব, তথায় প্রশস্ততার অভাব হইলে, ফল কীটভুক্ত ম্লান কুব্জ ও করাটীয়া আকার ধারণ করিয়া থাকে এবং দেবভোগ্য না হইয়া কুকুরভোগ্য হয়।

জাতিমধ্যে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার আবশ্যকতা যে কতদূর, তাহা পূর্ব্বেও ভারতীয়দিগের বড় একটা ধারণা ছিল না; এবং এখনও যে বড় একটা ধারণা গঠিত বা বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা হয় নাই। পূর্ব্বকালের বিশ্বাস,—শিক্ষা যাহা তাহা কেবল অধ্যাপক ও পাটোয়ারী এই দুই জনের আবশ্যক হয়; এ শিক্ষার আবার ব্যবসায়ভেদে তারতম্য আছে, যথা, অধ্যাপকের শিক্ষিতব্য পুঁজি পাটা স্মৃতি সাহিত্য বা শ্রাদ্ধসভা-জয়ের জন্য দুইটা ন্যায়ের তর্ক; পাটোয়ারীর পুঁজি পাটা শুভঙ্কর। এ কালের বিশ্বাস,—শিক্ষা যাহা তাহা চাকুরী করিবার জন্য, এবং আজি কালি মামলা মোকদ্দমা চালান ও বক্তৃতা করিবার জন্যও বটে। ইঁহার মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ব্যাকরণ দুরস্ত করিয়া ইংরাজী লিখিতে বা কহিতে জানা; তদর্থে কেহ বা সংবাদপত্র লইয়া থাকেন, কেহবা নভেল পড়েন; এবং ইহার যে কোনটী হইতে আবার সময় কালে ব্যবহার ও (আস্তাকুড়ে ছিন্ন গোলাপের পাঁপড়ি ছড়ানর ন্যায়) প্রয়োগের জন্য, বাক্যাবলীও কণ্ঠস্থ করিয়া রাখার পক্ষে ত্রুটি করেন না। ইহাদের বিশ্বাস,—বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হয় না, মাতৃগর্ভ হইতেই তাহা সঙ্গে আসিয়া থাকে; সুতরাং এখন যাহা কিছু উপার্জ্জন বা শিক্ষার আবশ্যক তাহা কেবল ইংরাজী অভিধান ও ব্যাকরণের, যদ্দ্বারা গর্ভোপার্জ্জিত পাণ্ডিত্য ব্যাকরণশুদ্ধ ইংরাজীতে প্রকাশ করিতে পারা যায়। পাণ্ডিত্য বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, তাহাও ইহারা কখন কখন অনুভব করিয়া থাকে বটে; কিন্তু ইহাও অনু-

ভাবিত যে সে পাণ্ডিত্য অন্য কিছু নহে, তাহা কেবল, ইংরাজী শব্দ ও ব্যাকরণ শিক্ষা বাদে, বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি আর যে সকল অনাবশ্যকীয় বিষয় অর্থাৎ যাহা চাকুরীতে লাগে না এবং যাহা অধিকন্তুরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সকল কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা ও স্থানবিশেষে উদ্গারণ করা। ইহারা গ্রন্থাদি প্রণয়নও করিয়া থাকে অপর্য্যাপ্ত; প্রতি চটী চাপাটী—অপাঠ্য চটী চাপাটী হাতে ধরিয়া, আবার আজি কালি কেহ কেহ বা সংবাদপত্র লিখিয়াও, কেহ 'মহাকবি', কেহ 'প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার' এই সকল হইয়া থাকে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সকল দেশের লোক কার্লাইল, গেটে, রিজ্টার প্রভৃতি লেখককে লেখক বলিয়া থাকে; তাহারা আমাদের এ ছুঁচোর কীর্ত্তন দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলে, আমাদিগকে না জানি কি অসার বলিয়াই মনে করিত! সে যাহা হউক, সে কালে অধ্যাপক ও পাটোয়ারী এবং একালে চাকুরে, সাধারণত ইহারা ভিন্ন, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক বা অপরাপর ব্যক্তিদিগের শিক্ষার যে কিছু আবশ্যকতা আছে তাহা, এই দুই কালের এককালেও ধারণা ছিল না এবং নাই। এখানে মেয়ে লেখা পড়া শিখে না, চাকুরী করিতে পারিবে না বলিয়া; অপরাপর জাতিতে শিখে না, তদ্দ্বারা পিতৃব্যবসায়ে অপারগ হইবে বলিয়া। এ সকলের কথাত দূরের কথা; শিক্ষিতের পক্ষেও অনেক সময়ে অনেকের মুখে শুনিতে পাই,—'কেবল একরাশি কেতাব পড়িয়া কেতাবকীট হইলে কি হইবে? কাজের মানুষ হও কাজে আসিবে।' কাজ যে কোন উপায়ে স্বচ্ছন্দে উদরপূর্ত্তি! এখানে কতকগুলা বহি পড়াও উপহাসের বিষয়!

কিন্তু এ জগতে এমন অগণিত দেশ অনেক আছে, যথায় চাকরের চাকরগিরি করিতেও, লেখা পড়া প্রভৃতি নানা শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তথায় উন্নত শ্রেণীর শিক্ষার ত কথাই নাই; সমস্ত সম্ভবপর জাগতিক শিক্ষা করতলস্থ করিয়া, তবু তাহাদের তৃপ্তি দেখা নাই; তবু শিক্ষার আবশ্যকতার বিরাম নাই। এরূপ জাতি সকলের মধ্যে যে শিক্ষা, তাহার সহ আমাদের জাতীয় শিক্ষা তুলনা করিলে, কতই অন্তরতা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে চাকুরী চালানর অতিরিক্ত শিক্ষা, আসবাব বা উপহাসের বিষয়; অন্যত্র তাহা প্রয়োজন এবং অত্যাবশ্যক স্থলীয়। এহেতু, ফলেরও তারতম্য তথাবিধ। সেই সেই জাতিরা জগতের তাবৎ সম্পদ ও সৌভাগ্যকে করতলস্থ করিয়া, এবং কর্ম্মক্ষেত্রে অপার কর্ম্মরাশির সম্পাদন শেষ করিয়া, তথাপি তৃপ্তিবোধে ক্ষান্ত হইতেছে না; আর আমরা? ক্লেদনিহিত কীটরাশির ন্যায় ক্লেদেই জড়িত থাকিয়া তাহা

অসদ্ব্যবহার বা গরিমাদৃশ্য অপরিহার্য্য। সে যাহা হউক, আবার বলিতেছি, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইতর হইতে উচ্চ মানব পর্য্যন্ত, সকলেরই পক্ষে সমান। তবে প্রভেদ এই, যাহার যেমন কর্ম্মস্থলী, যাহার যেমন কর্ত্তব্য নিরূপিত, তাহার শিক্ষা সেইরূপ হওয়া উচিত।

শিক্ষানবিশের শক্তির পরিমাণ, রুচি ও মতি গতি অনুসারে শিক্ষার শ্রেণী, পর্য্যায়, লঘুত্ব বা গুরুত্ব আদি ভেদ হইয়া থাকে। যে মানবের শিক্ষাশক্তি যতদূর, যদি তাহার শিক্ষা ততদূর না হয়; তবে যে পরিমাণে শিক্ষার ত্রুটি সেই পরিমাণে তাহার কর্ম্মস্থলে সঙ্কীর্ণতা ও আনুষঙ্গিক আরও যে কোন দোষ স্পর্শিয়া থাকে। কর্ম্মও সেই পরিমাণে বন্ধুর ও অফলদায়ক হয়। সত্য বটে যে, শিক্ষা কেবল একমাত্র কেতাব পাঠে সমাহিত হইতে পারে না; কিন্তু ইহাও সত্য যে কাল ও পৃথিবীর সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ড যত বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে, ততই তাহা উত্তরোত্তর বহ্বাড়ম্বরসাধ্য হইয়া আসিতেছে; সুতরাং আনুষঙ্গিক শিক্ষাও তৎসঙ্গে বিস্তার প্রাপ্ত হইতে থাকায়, দেখিতে গেলে কেতাবই প্রধানতঃ তাহার উপাদান স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কেতাব ব্যতীত, অন্য নানাবিধ রকমেও, নানাবিধ প্রকারের শিক্ষা হইতে পারে; শিক্ষানবিশের প্রয়োজন ও শিক্ষাশক্তি অনুসারে সে সমস্ত, অন্য উপায় বা কেতাব বা উভয়ত যোগে সংসাধিত হয়। যে যে কার্য্যেই লিপ্ত থাকুক না কেন, তাহার পূর্ণতা ও সুসম্পাদনের জন্য, অনুরূপ সৎশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। ইউরোপভূমে দেখ, তথায় কূটরাজনৈতিক হইতে লাঙ্গলধারী কৃষক পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রেই সুশিক্ষার আবশ্যক। ইউরোপের সৌভাগ্যের প্রতিও সেই সঙ্গে বারেক তাকাইয়া দেখ!

যেমন মানসিক শিক্ষা, তেমনি শারীরিক শিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। দৈহিক-বল-শিক্ষা একান্ত আবশ্যক, কারণ মানসিক শিক্ষাজনিত উচ্চ আশা ভরসা ও উদ্যমের উহা পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক, অবলম্বন দণ্ড এবং ঠেকা স্বরূপ। কিন্তু ইহা কোন ভারতসন্তান বুঝেন না। স্কুলের অতিরিক্ত ঘরে পড়াইবার জন্য বহুব্যয়ে কেতাবী শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু তাহার দশমাংশ ব্যয়ে একজন বল-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে জানেন না, অথবা ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির ভিতরেই প্রবেশ করে না; কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, বালক যত ভূত, জুজু বা কাপড়েমুতো হয়, ততই সে তাহাদের মতে ভাল ছেলে! মানব অধঃপাতে গমন করিলে কত রকমেই তাহার বুদ্ধিবিকৃতি ঘটিয়া থাকে! বালকের বল-শিক্ষায় আর কিছু না হউক, অন্তত আত্মরক্ষাও ত হইতে পারিবে, এবং অন্ধকার রাত্রে গৃহিণীর অঞ্চল অবলম্বন ভিন্ন বা হর হইতেও ত সক্ষম হইবে। ইহাও নিতান্ত সামান্য

হইতে বদন ফিরাইতে মমতা বোধ করিতেছি; এবং শুধু মমতা বোধ করিতেছি না, কখন কখন বা পাছে কেহ মুখ ফিরাইয়া দেয় এ আশঙ্কায় মুহ্যমান হইতেছি। অভ্যাসবশে নারকীর নরকেও মমতা জন্মিয়া থাকে। কি দুরন্ত বৈষম্য!

শিক্ষায় মনুষ্যের এই কয়টী বিষয় সংসাধন করিয়া থাকে;—

১ম। কালের কোন্ বিশেষ বিভাগে এবং কর্ম্মক্ষেত্রের কোন্ বিশেষ দেশে অবস্থান করিতেছি, তাহাতে প্রবুদ্ধ করিয়া দেয়।

২য়। আমার কর্ম্মস্থলীর আয়তন কতদূর, আরব্ধ কর্ম্ম আমার পূর্ব্বে কতদূর সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, এবং আমার স্বসময়ে আমার শক্তিসাধ্য সম্পাদ্য অংশ কি পরিমাণে থাকিয়া আমার হস্ত প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং তাহার আশু ও দূর পরিণাম কোথায়, তাহা যথাসম্ভব বা যথা আবশ্যক দেখাইয়া দেয়।

৩য়। কর্ম্মস্থলে আমার সহকারী বা নিয়োজকবর্গ কে কেমন; কাহার উপরে কতদূর নির্ভর করিতে পারিব বা না পারি; কর্ম্মস্থলের প্রতিকূল বা অনুকূল বিষয় কি কি; এবং তাহাদের কাহাকে কি পরিমাণে পরিহার বা বিদূরণ বা কি পরিমাণে অবলম্বন করিতে পারিব, তাহার পরিচয় দিয়া দেয়। এতদতিরিক্তে আমূলত নিত্য সহচরী রূপে সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব বিষয়েতে পরিরক্ষণ ও সহায়তা করিয়া থাকে। যে শিক্ষা দেখিবে সে সকল কিছুই করে না, অথচ শিক্ষানবিশ শিক্ষার জন্য আজীবন অভ্যাস ও অধ্যয়নাদিতে অতিবাহিত করিয়াছে; তথায় নিশ্চয় জানিবে যে সে শিক্ষা শিক্ষা নহে,—তাহা ভাক্তশিক্ষা; সে শিক্ষানবিশ শিক্ষিত হয় নাই, সে জীবন্ত পুস্তকাধার হইয়াছে মাত্র।

যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং ফল এমন, এবং মানব মানবী মাত্রেই যখন এ জাগতিক কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত, তখন বাঞ্ছারাম, কেমন করিয়া বলা যায় যে, শিক্ষা সকল প্রাণীর জন্যই সমান প্রয়োজন নহে? এমন স্থলে, তবে তুমি কেনই বা ছোট লোক মাথায় উঠিল বলিয়া সাধারণ শিক্ষার প্রতি আতঙ্কে কম্পিত হইয়া উঠ; এবং কেনই বা স্ত্রীগণ চাকুরী করিতে যাইতে পারিবে না বলিয়া, তাহাদের শিক্ষার পক্ষে আবশ্যকতা দেখিতে পাও না; এবং নিজেই বা কেন উপন্যাস বা সংবাদপত্র পাঠের অতিরিক্তে যাইতে চাহ না? ছি, তুমি বড় ভ্রান্ত! তবে যদি শিক্ষা কেবল অনর্থক জোষ্ঠতাতত্ব; তবে যদি শিক্ষা কেবল বঙ্গীয় কাব্য নাটক উপন্যাসাদির পাঠ ও কার্পেট বুনানিতে পরিসমাপিত হয়, তাহা হইলে শিক্ষা যতদূর অন্তরে থাকে তাহাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু ইহাও বলি, সকল বিষয়েরই নূতন আরম্ভে, তাহাদের এরূপ ক্ষণিক ছদ্ম বা

লাভ নহে! বল-শিক্ষার ব্যয়ও কিছু অধিক নহে, কেতাবী শিক্ষার দশাংশের একাংশ মাত্র। এক জন বল-শিক্ষক পলোয়ানের কাছে, একগ্রাম বালক অনায়াসে দেহচালনা, এবং অপরাপর ও অস্ত্রাদির চালনাও শিক্ষা করিতে পারে, অথচ তাহার ব্যয় ৭ কি ৮ টাকার অধিক নহে; এমন স্থলে প্রতি বালকের শিক্ষাব্যয় দুই আনা কি চারি আনা করিয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু হইলে কি হইবে, ভারতসন্তানের ভাগ্যে এ যোগাযোগও ঘটিয়া উঠে না। শিক্ষায় বলের বৃদ্ধি হয়; কোট হ্যাট বা মদ অথবা মাংস আহারে হয় না। বল শিক্ষায় শরীর নীরোগী হয়।

বাঞ্ছারাম, এখানে সেখানে সকল জায়গাতেই যখন চৌদ্দপোয়া মানুষ, তখন সত্য সত্যই যে বলে কেহ সিংহ কেহ মূষিক এতটা প্রভেদ হইতে পারে না। অল্প ইতর বিশেষ অবশ্য নানা কারণ হেতু ঘটে বটে, কিন্তু মোটের উপর সকলেরই বল সমশ্রেণীর। সাধারণত সকল মানবীয় শরীরই সমশ্রেণীর বল ধারণে সক্ষম। কিন্তু বলিতে পার, তথাপি আমরা কেন সে বলের কোথাও অপরিমিত বিকাশ কোথাও বা একেবারে ন্যূনতা দেখিতে পাই? আর আর বিষয়ের ন্যায় বলও তাহার স্ফূর্ত্তিবিষয়ে মনের শাসনাধীন। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ বোধ হয় যে, যে ব্যক্তি সহজ অবস্থায় বল বিষয়ে অতি হেয়, উন্মাদ অবস্থায় তাহারই শরীরে আবার দশ মত্ত হস্তীর বল আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে; কোন দুষ্ট-সিংহ তখন এ দুষ্ট-মূষিককে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কোন ভীতিস্থলে, কোন বিপদস্থলে, অথবা তথাবিধ কোন বিশেষ স্থলে, যথায় মানব মরিয়া হইয়া উঠে, তথায়ও ঐরূপ উন্মাদবৎ বলের বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। সে বল কোথা হইতে আইসে?—শিরাধমনী বা ধাতু যাহারই হউক তাহার বিকার বা অবস্থা পরিবর্ত্তনে। কিন্তু সে অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ?—উন্মাদ অবস্থায়, বা ভীতি বা বিপদ ইত্যাদির অবস্থায়, মানবের অন্য-বিষয়ক জ্ঞানজনিত যে প্রতিবন্ধকতা তাহার লোপ হয়, অর্থাৎ যাহাকে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য অবস্থা বলে; সুতরাং তখন চিত্ত যে কোন বিষয়ে নিবিষ্ট হয়, তাহাই পূর্ণ মাত্রায় হইয়া থাকে। এই পূর্ণ মাত্রায় চিত্তনিবেশন বলচালনার প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে, তখন সেই পূর্ণ নিবেশনের ধর্ম্ম হেতু শরীরনিহিত তাবৎ বল সুপ্তাবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া ক্রিয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে থাকে; ইহা ভিন্ন বল যে সে সময়ে সহসা তৈয়ার হয় বা আর কোথা হইতে আইসে, তাহা নহে। সহজ অবস্থায় কিন্তু এরূপ ঘটনা হয় না; তাহার কারণ, সে সময়ে তদ্রূপ চিত্তনিবেশনের কারণ অভাব, এবং তখন মানসিক অপরাপর প্রতিকূল কুচিন্তা সকল জাগ্রত থাকায়,

তাহার প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে। সহজ অবস্থায়, এই প্রতিকূল কুচিন্তার ভাগ অকর্ম্মা, মূর্খ, ও আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিতে স্বভাবত কিছু অধিক; এ কারণে এ জগতে ইহারাই প্রধান ভীরু হয়। সুচিন্তা বলের উত্তেজক; যথায় যে প্রকারের সুচিন্তা, তথায় সেই প্রকারের বলের উদ্রেক করিয়া থাকে। সু এবং সহজ অবস্থায় কেবল একমাত্র সুচিন্তা সাহসের সোপান, সাহসে বলের বিকাশ। দৈহিক বল এরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও, তাহার যথোপযুক্ত চালনার নিমিত্ত উক্ত মত শিক্ষার আবশ্যক হয়। দেখ এখন, দৈহিক বল বিকাশও কতটা মানসিক অবস্থা ও সৎশিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকে; যে কোন সত্য বিষয় এইরূপেই পরস্পরের প্রতি নির্ভর করে, ও সামঞ্জস্য-সংমিলিত হইয়া কার্য্যকরী হয়। বাঞ্ছারাম, এখন দেখ আমাদের যে বল নাহি এ কথা সত্য নহে, সত্য এই কথা যে আমাদের বল-উদ্দীপক চিত্ত নাহি। চিত্তের উন্নতি বা অবনতি, স্বাধীন বা পরাধীন বুদ্ধি, ইত্যাদির ন্যূনাতিরেক অনুসারে বলের তারতম্য ঘটনা হয়। এমন স্থলে সৎকর্ম্মপ্রবৃত্তিই তৎ তৎ প্রতিকূলতা নিরসনের একমাত্র উপায় বলিয়া জানিবে। অতঃপর শিক্ষার কথা যাহা বলিতেছিলাম :—

এমন শুভজন্মা লোক এ জগতে অনেক আছে, যাহারা কোন কেতাবের উপায়ে বা যে কোন উপায়ে, অপর কর্ত্তৃক কোন শিক্ষাবিশেষ ধারাবাহিক রূপে প্রাপ্ত না হইলেও, শিক্ষার সাধারণ ফল যাহা, এবং তদতিরিক্তে আরও সহস্র গুণ ফল, স্বভাবত তাহাদের হস্তগত হইতে দেখা যায়; কিন্তু তেমন শুভজন্মা লোক কয় জন? কতক শিক্ষা আছে উড়োভাবে, দেখিয়া বা শুনিয়া, যেমন আমাদের জাতির অধিকাংশ;—এরূপ শিক্ষায় বড় একটা ফল ফলে না। দেশীয় সাধারণ লোক সকলের শিক্ষার আর একটী প্রধান উপাদান, শিক্ষিত উন্নত শ্রেণীর সংস্রব। যে কোন দেশের বা যে কোন কালের সমাজদৃশ্য বিলোড়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিম্ন শ্রেণীরা সর্ব্বদাই উন্নত শ্রেণীর অনুকারী; এবং উন্নত শ্রেণীর যখন যে রকম রুচি, মতি, গতি ও নীতি, ইহারাও তাহার অনুকরণ করিয়া সেইরূপ মতি গতি ও রুচি আপনার করিয়া লয়; এবং যথায় যথায় তাহাদের উন্নতবর্গের সহ সংস্রবে আসিতে হইবে, তথায় তথায় উন্নতের রুচি সহ সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত অনুরূপ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকে। উন্নত শ্রেণী যখন সুরুচির, নিম্নশ্রেণীও তখন সুরুচির; উন্নত শ্রেণী যখন উদারচেতা ও তেজস্বী; নিম্নশ্রেণীও তখন উদারচেতা ও তেজস্বী; উন্নত শ্রেণী যথায় জীবন উৎসর্গে উদ্যত, নিম্ন শ্রেণীও তথায় জীবন উৎসর্গে উদ্যত; আবার উন্নত

শ্রেণী যখন জুজু, নিম্ন শ্রেণীও তখন জুজু; উন্নত শ্রেণী যখন অকর্ম্মা, নিম্ন শ্রেণীও তখন অকর্ম্মা, মুনিবকে ঠকাইতে পারিলে আর ছাড়ে না। ইহারও প্রথমগুলির দৃষ্টান্ত ইউরোপ ও আমেরিকায়, দ্বিতীয়গুলির দৃষ্টান্ত অধঃপাতিত ভারতে জাজ্বল্যমান। ইহার পরেও বাঞ্ছারাম বাবু আক্ষেপ করিয়া থাকেন, 'ছোট লোকটা কাজ করে না কেবল ফাঁকি দেয়।' আরে বাপু, তুমি যে নিজে কিছু কর না ও নিজেকে যে নিজে ফাঁকি দাও, যাহা দেখিয়া ঐ ছোট লোকও কাজ না করিতে ও তোমাকে ফাঁকি দিতে শিখিয়াছে, তাহা একটী বারও মনে ভাব না! এখন দেখ, শিক্ষা বিষয়ে, উন্নত শ্রেণীর জবাবদিহি কি গুরুতর ও দুনা, তাহার শিক্ষার উপর কেবল তাহার নিজের সদসৎ নহে, সাধারণ জনবর্গের সদসৎ অপরিসীম ভাবে নির্ভর করিতেছে। ভারতসন্তান, এ জবাবদিহিতে একবার প্রবুদ্ধ হও; ইহা তোমার অর্দ্ধেক মঙ্গলের সোপান।

(ক্রমশঃ)

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উন্নতি রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা আজকাল যে ইংরাজ জাতির অধীনে আছি উহারাও এক সময়ে পরাধীন ছিল। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রোম উহাদিগের অধিপতি ছিলেন। আমরা অনধিক ১২৫ বৎসর মাত্র পরাধীন হইয়াছি,* (কতদিন আরও থাকিব তাহা যদিও জানি না), ইংরাজেরা ৪৭৫ বৎসর রোমকদিগের পদতলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। প্রায় ৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে জুলিয়স সিজার ফ্রান্স জয় করিতে যান; প্রতিবাসীদিগকে আক্রান্ত দেখিয়া সভয়ে ইংরেজেরা ফরাসীদিগের সহিত যোগ দেন। ফ্রান্স পরাভূত হইলে জুলিয়সের কোপানল ইংলণ্ডের উপর পতিত হয়। তিনি অবিলম্বে ইংরাজদিগকেও জয় করেন। ইহার কিছুদিন পরে রোমকেরা ইংলণ্ড অধিকার করেন। ইংরাজেরা পূর্ব্বে জন্তুদিগের ন্যায় অরণ্যে, গর্ত্তে ও বৃক্ষশীর্ষে বাস করিতেন; রোমকেরা উহাদিগকে সেই পশু জীবন হইতে নর জীবনে উন্নীত করেন। পরে তাঁহারা

* প্রথম অবস্থায় যাহাই হউক পরবর্ত্তী কালে মুসলমান রাজত্বকে আমাদিগের পরাধীনতা বলা ভুল মনে করি, কারণ তাঁহারা আমাদিগের স্বদেশীয় লোক ছিলেন। ভারতসন্তান বলিয়া তাঁহারাও গৌরব করিতেন। ভারতের হিতার্থে তাঁহারা আফগান স্বধর্ম্মীর সহিতও যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

হন্‌দিগের আক্রমণে স্বরাজ্য বিপন্ন হইলে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন, কাজে কাজেই ইংলণ্ড ইংরাজ হস্তে বিনাস্ত হয়। কিন্তু রোমকেরা প্রস্থান করিলে অন্য শত্রুর আক্রমণে অস্থির হইয়া ইংরাজেরা এক বার নহে, বারম্বার রোমকদিগের সাহায্য যাচ্‌ঞা করেন। রোমকেরা প্রকৃত পিতার ন্যায় নিজ অর্থ ও নিজ সৈন্য ক্ষয় করিয়া ইংরাজদিগের শাসন-বিধান করেন।

সেই ইংরাজ জাতি আজ পৃথিবীতে এরূপ পরাক্রান্ত ও অধিকারবান যে এখন ইহাদিগের রাজ্য হইতে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না। কেমন করিয়া সেই অর্দ্ধ-পশু, আত্মরক্ষণে অক্ষম জাতি জগতে এরূপ ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি লাভ করিল তাহা ইতিহাসে অকপটে লিখিত আছে, আমি তাহা বলিয়া পাঠকগণকে ক্লান্ত করিতে চাহি না, তাহা বিস্তৃতরূপে বিবৃত করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্যও নহে। তবে ইহা বলিতে পারি যে ইংরাজ অদৃষ্ট বলে ওরূপ হয় নাই, কোন মহাপুরুষের অনুগ্রহেও উন্নতি পায় নাই। ইংরাজ যাহা হইয়াছে ও পাইয়াছে তাহা নিজ ভুজবলে ও নিজ মস্তিষ্ক বলে। কৃষক, বণিক, নৈয়ায়িক, দার্শনিক সকলেই একমন্ত্রদীক্ষিতের ন্যায় জগতের উন্নতির জন্য শ্রম করিয়াছে। রাজা যখন ক্ষমতা বিস্তার করিতে করিতে প্রজাদিগের স্বাভাবিক স্বত্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, প্রজারা নীরবে তাঁহাকে তাহা করিতে দেয় নাই, যদি কথার প্রতিবাদে রাজা না নিবৃত্ত হইয়াছেন, বল দ্বারা তাঁহাকে ক্ষান্ত করিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। আবার যখন দেখিয়াছে ক্ষমতা-পিপাসা রাজাদিগের একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, সকলেই প্রজার স্বত্বের সংকোচ করিবার অভিলাষী, তখন সম্মিলিত বিক্রমে রাজার ক্ষমতা নিয়মিত করিয়াছে, তাহাতে যখন যথেষ্ট প্রতিকার বোধ হয় নাই তখন ভীম বলে রাজাকে মন্ত্রিসভা গ্রহণ করাইয়াছে, মন্ত্রিসভার মন্ত্রিদিগকে নিজেরা নির্ব্বাচন করিয়াছে। কিন্তু এই মন্ত্রিসভাকেও যখন রাজা অবজ্ঞা করিয়াছেন, তখন সে রাজাকে বলি দিয়াও ইহারা আপনাদিগের স্বত্ব-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ক্রমে ক্রমে রাজার ক্ষমতার এতই খর্ব্বতা সাধন করিয়াছে যে এক্ষণে যিনি আমাদিগের মহারাণী, ১৮৭৭ সালে লর্ড লিটন কর্ত্তৃক মহা সমারোহে যাঁহাকে সম্রাজ্ঞী উপাধি দেওয়া হইয়াছে, তিনি একজন পেন্সনারের ন্যায় মাসহরা পান মাত্র; ইংলণ্ডে তাঁহার নিজের একটু জমিদারী আছে, তাহার আয় সামান্য এবং তাহা বিঘা কয়েক মাত্র। কোন বৃহৎ রাজনৈতিক বিষয়েই তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। পার্লিয়ামেণ্টের প্রারম্ভ ও শেষ সময়ে তিনি যে বক্তৃতা পাঠ করেন তাহা প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে তখন তিনি কণ্ঠস্থ করেন এবং তোতাপাখীর ন্যায় তাহা সভাস্থলে পাঠ করিয়া কর্ত্তব্যের শেষ করেন। এক্ষণে

ইংরাজদিগের প্রকৃত অধিপতি ও প্রকৃত শাসনকর্ত্তা স্বয়ং ইংরাজেরা। কারণ যে পার্লিয়ামেণ্ট* তাহাদিগের প্রত্যক্ষ শাসনকর্ত্তা তাহা তাহাদিগের স্বেচ্ছা-মনোনীত প্রতিনিধি লোকেই পরিপূর্ণ। সেই প্রতিনিধিগণ আত্মমধ্য হইতে মন্ত্রী নির্ব্বাচন করেন, সেই মন্ত্রী কয়েক জন সহকারী লইয়া মন্ত্রিসভা সংগঠন করেন এই সভাই ইংরাজের নিয়ন্তা!

আমার কথায় হয়ত বোধ হইল যে ইংরাজ স্বল্প ক্লেশে বা সামান্য একটু দার্ঢ্যের বলে স্বরাজ্যের এই সুশাসন প্রণালী লাভ করিয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ইংরাজের উপর দিয়া অনেক তুফান গিয়াছে। এক একটী সুবিধা লাভ করিতে কখনও তাহাদিগকে ঘোরতর অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে, কখনও শত শত মহাপুরুষের অম্লানে আত্মবলি দিতে হইয়াছ, কখনও বা রাক্ষস হইয়া স্বদেশীয় দুঃশাসনদিগের বক্ষোরুধির পান করিতে হইয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে যখন নর্ম্মান জাতি কর্ত্তৃক ইহারা পরাভূত হয়, তখন ইহাদিগের কখনও জাতি হইতে পারিবার আশা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কারণ বিজয়ী নর্ম্মান ইংলণ্ড অধিকার করিয়াই সমস্ত জমিদারী হইতে বর্ত্তমান জমিদারদিগকে অপসারিত করিয়া তৎ সমুদয় স্থানে নর্ম্মান জাতীয় নিজের আত্মীয় স্বজনকে নিযুক্ত করে, এবং ইংরাজদিগকে গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদ সকল হইতে বঞ্চিত করে; আজকাল ইংরাজেরা আমাদিগকে নেটিভ বলিয়া যেমন অবজ্ঞা করেন, নর্ম্মানেরাও ইংরেজদিগকে সেইরূপ করিত। ইংরাজদিগের সহিত ঘৃণায় আহার ব্যবহার করিত না এবং ইংরাজ কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিতেও অশ্রদ্ধা করিত। এমন কি আরাঙ্গিবের ন্যায় সঙ্কীর্ণমনা ধর্ম্মান্ধ জনকয়েক মুসলমান সম্রাট বিজিত হিন্দুদিগের উপর যে সকল অত্যাচার ও অপব্যবহার করিয়াছিলেন গর্ব্বিত নর্ম্মানেরা পদাবনত ইংরাজ দিগের উপর তদপেক্ষা কিছুই কম করে নাই। অদূরদর্শী হিন্দুরা ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ, আফগান, ইংরাজ প্রভৃতি নানা জাতির নিকট অপমানিত হইয়াও চির-সমদুঃখী স্বদেশবাসী মুসলমানদিগকে সহোদর ভাবে ভাবিতে শেখেন নাই, কিন্তু ইংরাজেরা সহস্র উৎপীড়ন সত্বেও অচিরাৎ নর্ম্মান-দিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিলেন।

স্বদেশ-দুঃখ-সন্তপ্ত বীরবর ওয়ালেস্ যখন প্রতিজ্ঞা করেন, হয়, ইংরাজ-অরাতি-রক্তে তর্পণ করিয়া ক্লাইড সলিল সু-লোহিত করিব নয় এ বৃথা দেহ কুক্কুর দিয়া খাওয়াইব, তখন সমস্ত ইংরাজ জাতির বক্ষ কাঁপিয়া গিয়াছিল কিন্তু

---

* পার্লিয়ামেণ্টের আদি সংস্থাপক সাইমন ডি মণ্টফোর্ড নামক একজন ফরাসী। এজন্য ইংরাজেরা ফরাসিদিগের নিকট ঋণী।

ভয়ার্ত্ত হইয়াও ইংরাজেরা ওয়ালেসের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। আবালবৃদ্ধ সমবেত হইয়া ওয়ালেসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে এবং প্রত্যেক যুদ্ধে অপূর্ব্ব কৌশলী ওয়ালেসের নিকট পরাভূত হইয়া কত যে প্রিয়প্রাণ বলি দিয়াছে তাহার সীমা নাই। অবশেষে হারিয়া হারিয়া মরিয়া মরিয়া ইংরাজেরা বিজয়ী হইল; ফল্‌কর্ক যুদ্ধে ওয়ালেস্ পরাস্ত ও পরিশেষে ধৃত হইলেন, টাইবরণে ফাঁসী দ্বারা তাঁহার দেবজীবনের পরিসমাপ্তি হইল; কিন্তু তদীয় পবিত্র অশ্রু ও স্বর্গীয় শোণিত হইতে রবার্ট ব্রুস নামক এক অলৌকিক তেজঃপুঞ্জের আবির্ভাব হয়। তিনি "পৃথিবী ইংরাজ কিম্বা স্কট শূন্য করিব" এই সংকল্প করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; তাঁহার প্রচণ্ড বিক্রমে ইংরাজেরা শশব্যস্ত হইয়া পড়েন, ব্যাকুলতা বশতঃ কত মহাপুরুষ ব্রুসের যুদ্ধে আত্মসংহার করেন তাহা ইতিহাস লিখিতে ভুলে নাই। প্রায় এক চতুর্থ শতাব্দী এইরূপ দহিয়া দহিয়া অনুপম ধৈর্য্য ও চতুরতা ক্রমে ব্রুসের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হয়। ব্রুসকে সেই সময়ে ইংলণ্ড গ্রাস করিতে দিলে, ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ কি বর্ণে চিত্রিত হইত কে বলিতে পারে? ইংরাজেরা সেই জন্য তখন শত অপমান বিস্মৃত হইয়া ভিক্ষা করিয়া ব্রুসের নিকট হইতে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

আবার দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজত্ব সময়ে ক্যাটস্‌বি প্রমুখ ত্রয়োদশ জন ক্যাথলিকেরা বারুদ দ্বারা পার্লিয়ামেণ্ট-গৃহ উড়াইয়া দিবার সংকল্প করেন। ১৬০৫ শালের ৫ই নবেম্বরে পার্লিয়ামেণ্ট খুলিবার কথা থাকে। ক্যাথলিক ষড়যন্ত্রিদলে ঐ দিনেই সভ্যগণের সহিত উক্ত গৃহ উন্মূলিত করা স্থিরীকৃত হয়। ষড়যন্ত্রীরা মাউণ্টইগল্ নামক এক ব্যক্তিকে ঐ দিবসে সভায় যাইতে নিষেধ করেন। মাউণ্টইগল নিষেধপত্র পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হন; এক দিকে স্বধর্ম্মীদিগের সহায়তা ও অপর দিকে জাতিসাধারণের কল্যাণলালসায় তাঁহাকে দুলাইতে থাকে; তিনি কিয়ৎ কাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পরে স্থির করিলেন জাতিই তাঁহার প্রকৃত উপাস্যদেবতা, শ্রেণীর পক্ষভুক্ত হইয়া সাধারণের অমঙ্গল সাধন করা তাঁহার পিশাচবৃত্তি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অবিলম্বে পত্রের মর্ম্মার্থ জাতির নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন গৃহ উৎপাটনের সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ হইয়াছিল, মাউণ্টইগল্ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেই গাইফকস ইংলণ্ডের পৃথিবীকে কেন্দ্রভ্রষ্ট করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা ঘটিল না। গাই ফকস্ ধৃত হইলেন, একে একে সকল অপরাধীরাই হপ হাপ করিয়া সম্মুখীন হইলেন। জনবুল পরম পরিতোষে তাঁহাদিগের বক্ষোরুধির পান করিলেন।

স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি ক্রমে ইংরাজ জাতি শতাব্দী হইতে শতাব্দী

ধরিয়া যে পরিশ্রম করিয়াছে, সে অধ্যবসায় ও নির্ভীকতার কাহিনী প্রতিপাদন করিতে শত শত দেদীপ্যমান ঐতিহাসিক ঘটনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির উন্নতির পরিচয় দেওয়া বিশেষ রূপে নিষ্প্রয়োজন, কারণ ভারতের হিন্দু মুসলমানেরা স্বচক্ষে ইংরাজদিগের স্বজাতিপ্রেম ও দেশবাৎসল্যের ভূরি ভূরি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এবং আজ আমরা ইংরাজের যে বিরাট বপু দেখিতেছি ইহার অধিকাংশই তাহাদিগের চক্ষুসমীপে লব্ধ হইয়াছে। অতএব চলুন অন্য কোন জাতির ইতিবৃত্ত পাঠ করি।

পৃথিবীর যে কোন জাতি নিজ প্রকৃতিতে যতই মৌখিকতা প্রদর্শন করিয়া থাকুক না কেন, যতই সুদৃঢ় একতা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়া থাকুক না কেন, ফরাসী জাতিকে ঐ সকল গুণে পরাভব করে অথবা তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করে এরূপ জাতি অদ্যাপি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই। যদি ফরাসী নামক একটী জাতি ইউরোপের এক প্রান্তে জন্মগ্রহণ না করিত, তাহা হইলে কি বলিয়া ইউরোপ এসিয়াটিক, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রোদিগকে অসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন তাহা দেখিতে পাইতাম। ফরাসীদিগের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে ইউরোপ ও এসিয়ার কোন প্রভেদ ছিল না। মহাত্মা যীশুর নামের উল্লেখ করিয়া কেহ হয়ত বলিবেন যে ফরাসীদিগের পূর্ব্ব হইতেই ইউরোপ উন্নতি-সোপানে অধিরোহণ করিতেছিল, কিন্তু সে কথা কেবল অন্ধ যীশুভক্তি জৃম্ভিত ভিন্ন কিছুই নহে। যীশু যে একজন মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার হৃদয় সাধারণ মনুষ্যের অপেক্ষা যে উচ্চ ছিল তাহা আমি অস্বীকার করি না। তবে তিনি যে ইউরোপকে পার্থিব অধম অবস্থা হইতে উচ্চ অবস্থায় তুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, কেমন করিয়া অত্যাচারী রাজাকে দমন করিতে হয়, কেমন করিয়া স্বদেশের রাজনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হয় শিক্ষাদিয়াছিলেন একথা কখনই সত্য হইতে পারে না; সত্য হইলে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সমবেত ইউরোপের বলবীর্য্য একার নগরে বিধ্বস্ত হইত না। যীশু ও সকল শিক্ষা দিবার পক্ষে অত্যন্ত সাধুশীল ছিলেন, ধর্ম্মের বীরত্ব ভিন্ন অন্য প্রকারের বীরত্বে তিনি মনুষ্যকে দীক্ষিত করেন নাই। চলুন আমরা এক্ষণে উদ্দেশ্য বিষয়ে যাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ অতীত হইয়াছে, জার্ম্মেণি অষ্ট্রিয়া, রুসিয়া সকলেই নিজ নিজ রাজার অধীনে থাকিয়া নিঃশব্দে কালক্ষেপ করিতেছে, ইংলণ্ড অর্দ্ধোন্মাদ তৃতীয় জর্জকে মস্তকে করিয়া সুদূর আমেরিকাকে ষ্টাম্প আইন গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই সময়ে ফরাসী জাতি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। ইহার

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ফরাসীরা রাজাদিগের স্বেচ্ছাচার ও অমিতব্যয়ে বিরক্ত হইয়াছিল, জমিদার ও ধনীদিগের বিলাসিতায় তাহারা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে লুই আবার তাহাদিগকে অঙ্কুশাঘাত করিতে থাকেন। জমিদারেরা বাবুগিরির পরিমাণ আরও একটু বাড়াইয়া দেন। তাঁহারা প্রজাসাধারণের দুঃখে অনুমাত্রও দুঃখিত হইতেন না। প্রজারা উপবাস করিত, নিরাশ্রয়ে থাকিত, ভিক্ষা করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিত, বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধ-নগ্নবেশে কালযাপন করিত, তাহা দেখিয়া ধনীদিগের হৃদয়ে পিপীলিকা-দংশনের ন্যায় একবিন্দু আঘাতও লাগিত না। তাঁহারা মনে করিতেন আমাদিগের নিজ নিজ জমিদারী ও কোম্পানীর কাগজ খানি হইলেই হইল, আমাদিগের চেরেট ফিটং হাঁকাইবার উপায় হইলেই হইল, আমরা বৃহৎ তাকিয়ার পার্শ্বে বসিয়া কিংবা ইজিচেয়ারে শুইয়া অপর্য্যাপ্ত ঘৃত দুগ্ধ মাংসাদির দ্বারা হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারিলেই হইল। সংবাদপত্র গ্রহণ করিবার সভ্যতা তাঁহাদিগের ছিল, কিন্তু সে কেবল কোথায় ৫২ ফিট পরিধির একটা বটবৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, কোথায় একটী গাভী একটী পঞ্চপদ বৎস প্রসব করিয়াছে তাহাই জানিবার জন্য। বিস্কে উপসাগর অর্দ্ধফ্রান্স গ্রাস করিলে, টোলন নগর জনশূন্য হইয়া গেলে তাহাদিগের সে সংবাদ পড়িবার প্রয়োজন নাই। কাগজ সকল দরওয়ানদিগের নিকট আইসে, তাহারা দপ্তর খানায় দেয়, কেরাণীরা পড়িয়া কৌতুকাবহ বিষয় পাইলে বাবুদিগের কর্ণগোচর করেন।

মধ্যবর্ত্তী লোকেরাও যে তাঁহাদিগের ন্যায় মানুষ, তাহাদিগের যে তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষুধা পিপাসা সুখাকাঙ্ক্ষা আছে তাহা তাঁহারা ভ্রমেও ভাবিতেন না। সম্পত্তি হাতে পাইলে তাহারাও যে তাঁহাদিগের ন্যায় বাবু হইতে পারিত তাহা তাঁহারা বুঝিতেন না। এই দৃঢ় সংস্কার তাঁহাদিগের সমস্ত মস্তিষ্ক অধিকার করিয়াছিল যে, পালিত কুক্কুর যেমন তাঁহাদিগের বিলাসসামগ্রী, পিঞ্জরের পক্ষী যেমন তাঁহাদিগের সুখের জন্য, দরিদ্র মধ্যবর্ত্তী এবং শ্রমজীবিগণও সেইরূপ তাঁহাদিগের ভোগ্য পদার্থ। তাঁহারা বলিতেন "উহারা আমাদিগের জন্য শস্য উৎপাদন করিবে, আমাদিগের জন্য ব্যবসায় চালাইবে, কেবল এই জন্যই সৃষ্ট। আমাদিগের উচ্চ অট্টালিকায় যাহাতে বাস হয়, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যাহাতে শয়ন হয়, তাহা করা উহাদিগের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য কার্য্য। এ কর্ত্তব্যের লঙ্ঘন করিলে আমরা উহাদিগকে যে কোন প্রকারে দণ্ড দিতে পারি, এমনকি পশুপক্ষীর ন্যায় হত্যাও করিতে পারি। উহাদিগের কিসে উপার্জ্জন হয় কিসে না হয়, কিসে চলে কিসে না চলে তাহার সহিত আমাদিগের কোন সম্পর্ক

নাই, সে তাহাদিগের নিজের নিজের চিন্তনীয় বিষয়। যদি কিছু না করিতে পারে উপবাস করিবে, তাহার সহিত আমাদিগের সংস্রব নাই। আমাদিগের কোন আবশ্যক হইলে তাহা উহাদিগের পূরণীয়, কারণ উহারা আমাদিগের ভূমিতে বাস করে এবং আমাদিগের অর্থ ব্যবহার করে।”

দেশের সমস্ত লক্ষ্মীর-বর-পুত্রেরা এই-রূপ ভাবিতেছেন ও এই নিয়মে কার্য্য করিতেছেন। এ দিকে মধ্যবর্ত্তী ও নিম্ন-শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে অভাব-বহ্নি আস্তে আস্তে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। মধ্যবর্ত্তীদিগের সহিত কৃষক ও শ্রমজীবী-দিগের অনুমাত্রও সৌহার্দ্দ ছিল না। মধ্যবর্ত্তী বাবুরা কৃষক ও শ্রমজীবীদিগকে অসভ্য বলিয়া হৃদয়ের সহিত অশ্রদ্ধা করিতেন এবং তাহারা যে তাঁহাদিগের সুখের উপায় বিধানের জন্যই জীবনধারণ করে ইহা তাঁহাদিগের বদ্ধ সংস্কার ছিল। তাঁহারা দোকানদার, কেরাণী, বড়-লোকদিগের মোসাহেব—আত্মগৌরবে তাঁহারা জমীদারদিগের ধাঁচা পাইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ও জমিদারদিগের বিশেষ সহায়তা করি-তেন। গবর্ণমেণ্ট যদি ৫০০ টাকা আয়ের উপর টেক্স আদায়ের হুকুম দিতেন, মহা-পুরুষেরা ১০০ টাকা আয়ের উপরেও টেক্স লইতেন; গবর্ণমেণ্ট যাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিতেন ইহারা তাহাকে ডাকা-ইত বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেন। সূর্য্য কিরণ বরং সহ্য হয়, কিন্তু রৌদ্রোত্তপ্ত বালুকার উত্তাপ সহ্য হয় না, এজন্য তাহাদিগের অপব্যবহারে প্রজাবৃন্দ আরও জ্বালাতন হইতেছিল; কিন্তু আজকাল বাবুদিগের সে ভাব থাকিল না।

অভাবের ভীষণ বায়ু যখন আল্প-গিরির উপত্যকা হইতে আটলাণ্টিক বক্ষ পর্য্যন্ত সমভাবে বহিতে লাগিল, বিস্তীর্ণ ভূমধ্যসাগর হইতে রাইন নদী পর্য্যন্ত যখন ঘোর হাহাকার শব্দে পরি-পূর্ণ হইল তখন বাবুদিগের স্বভাবের উগ্রতা কমিয়া আসিল, নিম্নশ্রেণীদিগের উপর আর তখন তাঁহাদিগের তত অধো-দৃষ্টি রহিল না। তাঁহারা দেখিলেন রাজার অমিতব্যয়ে এবং জমিদার ও ধনীদিগের অপরিমেয় অর্থ-গৃধ্নুতায় দেশ শোষিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রজা-পীড়ন দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও উচ্চশ্রেণীর লোকদিগকে দেওয়াতে কোন উপকার নাই, কেবল অসুরের শরীরে বলবৃদ্ধি করা হইতেছে মাত্র। অসুরেরা তাঁহাদিগেরও যেরূপ হানিকর ইতর শ্রেণীদিগেরও সেই রূপ। এক্ষণে তাঁহারা যে অন্ন বস্ত্রের কষ্টে ক্লিষ্ট, ইতর শ্রেণীরাও সেই ক্লেশে ক্লিষ্ট। তাহারা নিজ কুটীর রক্ষণে অসমর্থ হইয়া বৃক্ষ-তলে অবস্থিতি করিতেছে; তাঁহারা বড় বড় ঘর রক্ষায় অক্ষম হইয়া বন্যদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে আশ্রয় লইতে-ছেন। ইতরেরা দুইবেলার পরিবর্ত্তে একবেলা খাইতেছে, তাঁহারা দুগ্ধান্নের

পরিবর্ত্তে শাকান্ন খাইতেছেন এবং সরু চাউল পরিত্যাগ করিয়া মোটা চাউল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছেন। তাহারা বস্ত্রের অভাবে কৌপীন পরিতেছে, তাঁহারা অর্থাভাবে নূতন বস্ত্র ক্রয় করিতে না পারিয়া ছিন্ন বস্ত্র পরিতেছেন। পথ চলিবার একমাত্র সহায় একটী ঘোড়া ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া কেহ আহারের সংস্থান করিতেছেন; কনিষ্ঠ সহোদর স্কুলে পড়িত, পুস্তকের দাম যুটিল না তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া গবর্ণমেণ্ট আপিসে নকল নবিসীতে কেহ প্রবেশ করাইতেছেন। অর্থাভাবে শিশু সন্তান দিগকে দুগ্ধ কিনিয়া দেওয়া হয় না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা ভাঙ্গিয়া তাহারা আপনা হইতেই চুপ করে, সুকুমার মূর্ত্তি শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া যায়, দেখিলে দীর্ঘ নিশ্বাসও থাকে না। আবার লক্ষ্মীস্বরূপা সহধর্ম্মিণী জ্বর বিকারে পীড়িত হইলেন, হাতে টাকা নাই, ভিজিটের টাকা কোন ক্রমে জুটিল না, অচিকিৎসায় প্রিয়তমার বিয়োগ হইল—লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে শোকে, তাঁহাদিগের হৃদয়ে তরঙ্গ উত্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের স্বরের প্রগল্‌ভতা কমিয়া আসিল। ঘরের ক্লেশের কথা তাঁহারা কাহাকেও বলিতেন না; উপবাস করিয়াও পান খাওয়া ছাড়িতেন না; ভাঙ্গিতেন তবু মচ্‌কাইতে না। দুঃখ চিন্তা নিরন্তর মনকে দগ্ধ করিত, কিন্তু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া হৃদয়ের বিষকে তাঁহারা অমৃত ভাবে ব্যক্ত করিতেন। এক্ষণ হইতে সে ভাব ত্যাগ করিলেন, সরল হইতে কৃতসংকল্প হইলেন, আপনার হৃদয়ের বহ্নি জনসাধারণের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য বেদ কোরাণ ও বাইবেল হস্তে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এ দিকে কৃষকেরা দুইবেলা আহারের ব্যয়শীল প্রথা পরিত্যাগ করিয়া এক বেলা আহার অভ্যাস করিতেছিল, অনেকেই সে অভ্যাসে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, কাহারও কাহারও একাহার এরূপ প্রকৃতিগত হইয়া উঠিল যে কখনও দুইবেলা খাওয়ার কথা তাহারা প্রায় বিস্মৃত হইয়া গেল, দুঃখের একরূপ শান্তি হইল বটে কিন্তু অন্য অবয়বে উহা ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিল। আহারের অল্পতায় ক্রমে ক্রমে শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল, এবং অজ্ঞাতসারে দুর্ব্বলতা আসিয়া দেহকে অধিকার করিল। যে আট ঘণ্টা লাঙ্গল বহিতে পারিত সে পাঁচ ঘণ্টা কাজ করিতেও এক্ষণ অক্ষম, যে দুই মণ বোঝা তুলিতে পারিত, তাহার ১॥ মণ তুলিবারও সামর্থ্য থাকিল না। শ্রমক্ষমতার হ্রাসের সহিত আয়ও আরও কমিয়া গেল, তখন একবেলা আহারও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, কাজে কাজেই তাহাও কমিয়া গেল; ক্রমে ক্রমে শরীর পরিশুষ্ক হইল। শিশু সন্তান মাতৃস্তনে দুগ্ধ পায় না, অনাহারে শুকাইয়া নিরপরাধী জীব

মৃত্যু মুখে নীত হইল। এই সকল ঘটনায় শ্রমজীবীদিগের সংসারমমতা একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। কঠোর রাজকীয় শাসন এবং জমিদারদিগের জেলে দিবার ভয় এই দুই একত্রিত হইয়াও আর তাহাদিগকে ভীত রাখিতে পারিল না। দৃঢ় দৃঢ় দুর্গ সকল তাহাদিগের চক্ষু-সমীপে বল্মীকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; শস্ত্রাদিসজ্জিত যমোপম সৈনিক পুরুষদিগকে তাহারা সামান্য মেষপালবৎ দেখিতে লাগিল। কিন্তু কি উপায়ে অত্যাচারীদিগের হস্ত হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, কি করিয়া স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন করা যায়, তাহা তাহারা তৎক্ষণাৎ স্থির করিতে পারিল না। ঘাটে, মাঠে, দিবসে, নিশীথে দলে দলে বসিয়া কিসে প্রতিকার হয় ভাবিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে নানা দুঃখদগ্ধ মধ্যবর্ত্তীরাও সংকোচ ছাড়িয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহারা প্রথমতঃ একটী গুরুতর ভ্রম করেন। কোন কোন জমিদারকে সমদুঃখী বিবেচনা করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকট গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার আর অসহ্য অতএব উহা পর্য্যুদস্ত করা উচিত এই বিষয় ব্যক্ত করেন, কপটী জমিদারেরা কিছু দিন আজকাল আজকাল করিয়া পরিশেষে এই উত্তর দেন যে. "আমরা উহার মধ্যে নাই, যাহাদিগের কিছুই হারাইবার নাই তাহারাই ও প্রকারের ভয়ঙ্কর কল্পনাকে মস্তকে স্থান দিতে পারে। আমাদিগের নিজের কোন দুঃখ দেখিতে পাই না; তোমাদিগের যত দুঃখ আছে বলিয়াছ তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি আমাদিগের পরামর্শ শুন তবে পরিশ্রম করিয়া ন্যায়ানুসারে যাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় তাহারই উপায় কর। এরূপ সর্ব্বদিগ্‌দর্শী, সতর্ক, ধনী, ভেদবুদ্ধিমান, সন্ধি-নিপুণ গবর্ণমেণ্টকে উন্মূলিত করা তোমাদিগের সাধ্য নহে, তোমরা শশক হইয়া কেশরীর পৃষ্ঠে উপবেসন করিতে চাহিতেছ, আবাল বৃদ্ধ বণিতা একেবারে বিনষ্ট হইবে; কদাচ এরূপ কাজ করিও না"।

এই সকল উপদেশ বাক্যে তাঁহারা জমিদারদিগের সহায়তার আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলেন, চিনিয়া রাখিলেন যে ইহারাও বিপক্ষদলভুক্ত সুতরাং হননীয়। উপদেশের একটী বর্ণকেও কর্ণে স্থান না দিয়া, যত শীঘ্র পারিলেন তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পৃথিবী সহায় শূন্য বোধ হইতে লাগিল। এমত সময়ে শ্রমজীবীদিগের সমিতির কথা তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইল; বিদ্যুৎবেগে তাহাদিগের নিকট গেলেন, উন্মত্ত কৃষক ও শ্রমজীবীদিগকে "ভাই আইস" বলিয়া বক্ষে লইলেন। এক ঈশ্বরের সন্তানদ্বয়ে অনেক দিনের পর পরিচয় হইল! আত্মার মিলন হইয়া গেল। ইন্দীবরনিন্দিত নেত্র-যুগলের জলের সহিত ধূলিধূসরিত চক্ষুদ্বয়ের

জল সম্মিলিত হইয়া প্রয়াগের সংগম ভূমির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। হৃদয়যুগল-বিগলিত অশ্রুধারা অবিরল পড়িতেছে। যে প্রত্যক্ষ ভ্রাতৃত্ব, স্বায়ম্ভুব মনুর সময় হইতে অকারণে অস্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে, আজ সেই ভ্রাতৃত্বের মধ্যে স্ব স্ব দোষ সকল ক্ষালিত করিবার জন্য গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের বিনিময় হইতে লাগিল। অন্ধ ফ্রান্স প্রকৃত হিতৈষীগণের নেত্রাসারে মার্জ্জিত ও ধৌত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিল; আজ ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট-লালাটে তদীয় ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল অক্ষরে বিলিখিত হইল।

কাঁদিতে কাঁদিতে সমদুঃখীদিগের রাত্রি পোহাইয়া গেল, পরদিন আবার সাক্ষাৎ হইল। কিসে সর্ব্ব-শোষক নির্ম্মম গবর্ণমেণ্ট ও তাহার সহচরগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে এই বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল। এক ব্যক্তি বলিলেন আইস আমরা সর্ব্ব-সাধারণে এক দিনে, এক সময়ে দুরাচার পক্ষপাতপূর্ণ গবর্ণমেণ্টের চাকুরি সকল পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে অবশ্যই লুইকে আয়ত্ত করিতে পারিব, আইস আমরা সকলকে এই কথা জানাই, সকলে একমতে কার্য্য করিলে অবশ্যই মঙ্গল হইবে। আর একজন কহিলেন "ইহা কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ডাক রেল তার সকলই রাজার এক প্রকার আয়ত্তাধীন, কতকগুলি উচ্চ জাতির বিভীষণ ঐ সকল বিভাগে কার্য্য করে; যথেষ্ট বেতন পায় বলিয়া তাহারা রাজার অত্যন্ত অনুগত, তাহারা নিশ্চয়ই আমাদিগের এ চেষ্টায় বাধা দিবে"। রুসো কহিলেন "ভ্রাতৃগণ! আমি যাহা বলি মনোযোগ করিয়া শুন। প্রথমতঃ কতকগুলি সত্য বিষয় জানিয়া অন্তঃকরণ দৃঢ়ীভূত করিয়া লও, তাহা হইলে অভিলাষ অনায়াসে পূর্ণ হইবে।

ইনি এ জাতি, উনি ও জাতি এইরূপ যে একটা কথা তোমরা শুনিতে পাও তাহা ভুল। আমরা সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, সকলেই এক জাতি, সকলেই ভাই ভাই এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের শিরা দিয়া যে শোণিত প্রবাহিত, মুসলমানের শিরা দিয়াও সেই শোণিত প্রবাহিত, উভয়েরই শরীরে এক আর্য্য-রক্ত। যে ভক্ষ্য ভক্ষণে চণ্ডালের ক্ষুধা দূর হয়, সেই ভক্ষ্য ভক্ষণে চর্ম্মকারেরও পরিতোষ জন্মে। পুত্র শোক পাইলে জমিদার যেমন করিয়া কাঁদে আমারও সেইরূপ কাঁদি; যখন মরি দেখ ভাই সকলেই মাটি হইয়া যাই, সে মাটিতে রঙের, শক্তির, ওজনের তারতম্য থাকে না; অতএব বিশ্বাস কর আমরা সব সমান। উচু নীচু ভাবা একপক্ষে ভীরুতার ফল অপর এক পক্ষে গর্ব্বের ফল। এই গুরুতর বিষয় এত দিন আমরা ভাবি নাই বলিয়াই এ ঘোর নরকে আসিয়া পড়িয়াছি। অতএব আর ভুল করিয়া কাহাকেও বড় বা ছোট মনে করিও না।

জন কতক বিলাসী আত্মাভিমানী লোকের সুখলালসা পরিতৃপ্ত করিতে যাইয়াই আমরা বিপন্ন। বেদ কোরাণ হাতে লইয়া প্রতিজ্ঞা কর হয় সাম্য নয়,মৃত্যু ইহার এক পাইতেই হইবে। রাজা আমরা চাহি না, কারণ রাজা প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় দেখে না; বাবুগিরি রাজাদিগের চরিত্রের সহিত গাঁথা। এক রাজাকে শাসন করিয়া ঠিক করিয়া দেও, তাহার উত্তরাধিকারী আবার দস্যু হইয়া উঠিবে। অতএব রাজার প্রয়োজন নাই; যত শীঘ্র পার এ গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ কর। অতঃপর একটা গবর্ণমেণ্ট ন'হিলে চলিবে না, সে গবর্ণমেণ্ট আমরাই হইব। আমরা ভিন্ন২ গ্রাম হইতে প্রতিনিধি বাছিয়া প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টে একটী করিয়া সমিতি সংস্থাপিত করিব, সেই সকল বিভাগীয় সমিতি হইতে পুনরায় প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া রাজ্যের শাসন-সমিতি সংগঠিত হইবে, সেই শাসন সমিতির অধিকাংশ সভ্যের মতই আমাদিগের মত হইবে, তাহা হইলে কখনও কোন অত্যাচার হইতে পারিবে না।

অনেকেই বলে জমিদারেরা আমাদিগের অধিকৃত ভূমি সকলের অধিপতি, ইহা কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে? ভূমি ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ, যে তাহা ভোগ করে তাহাতে তাহারই স্বত্ব, আমরা চাষ বাস করি সুতরাং ভূমি আমাদিগেরই, উহাতে সর্ব্বশ্রমবিরহিত জমিদারের কোন স্বত্ব হইতে পারে না। কর আদায় করিয়া গবর্ণমেণ্টকে দিবার ব্যপদেশে তাঁহারা আমাদিগকে যে প্রকার শোষণ করেন তাহা মনুষ্যে সহ্য করিতে পারে না। ঈশ্বরের কখনই ইহা অভিপ্রায় নহে যে কতকগুলি লোক বসিয়া বসিয়া বাবুগিরি করিবে,আর কতকগুলি লোক সমস্ত বৎসর কপাল ঘামাইয়া পরিশ্রম করিয়া উপবাসে থাকিবে। তিনি কখনই ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন যে জন কয়েক লোকের কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত পরম সুখে থাকিবে, আর আমরা লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিব। তিনি কখনই ইহা দেখিতে ইচ্ছা করেন না যে জন কয়েক লোক পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া, পমেটম ল্যাভেণ্ডারে মস্তক ভিজাইয়া,পূর্ণ গর্ব্বে বিচরণ করিবে, আর শত শত লোক তাহাদিগের শকটচক্রে ধ্বংস হইবে। জন কয়েকের জন্য দেশ ধ্বংস! উঃ! ভাবিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। এমন বাবুগিরিকে ধিক! খস খস তাকিয়া গুড়গুড়িকে ধিক্। আমরাই রাজ্যের লোক, উহারা কে? লুণ্ঠনকারী,তস্কর, কুপোষ্য। যাহা আমাদিগের দুঃখ তাহাই রাজ্যের দুঃখ, আমাদিগের সুখই রাজ্যের সুখ। মনুষ্য হইয়া যাহারা মনুষ্যের দুঃখে দুঃখিত হয় না, বেদনায় ব্যথিত হয় না, তাহারা পশু। যাহাতে আমাদিগের বর্ত্তমান দুঃখ দূরীকৃত হয় ও ভাবী সুখের আশা প্রসারিত হয়, তাহা এক বাক্যে এক

শক্তিতে কর। বর্ণের,ধর্ম্মের,ভাষার,পরিচ্ছদের পৃথকত্তা বিস্মৃত হও। আমরা সব সমদুঃখী সুতরাং সব একদেহ এক বুদ্ধি, একমত ও এক গতি। স্বাধীনতা আমাদিগের নিজ নিজ বাহু মধ্যে লুক্কায়িত আছে, বীর্য্যের সহিত সেই বাহু সঞ্চালিত করিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নির্গত হইবে। জীবন, ভাই সকল, তুচ্ছ পদার্থ; দেখ, পিতা পিতামহেরা কোথায় গিয়াছেন, সমস্ত বিশ্ব পরিভ্রমণ কর তাঁহাদিগের কোন চিহ্নও কোথাও পাইবে না; কিছু না করিলে আমরাও কালের অনন্ত দেহের সহিত সেই ভাবে বিলীন হইব, অতএব আইস ভাই, জীবনের সদ্ব্যবহার করি, প্রাণকে চির-স্মরণীয় করি। আমরা এ চেষ্টায় নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব, কারণ যদি যুদ্ধে নিহত হই এই সুখে মরিতে পারিব যে অত্যাচারীর সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়াছি। ললাট পটে সেই পরম করুণাময় জগদীশ্বরের নির্ম্মল নাম অঙ্কিত করিয়া লও, তাঁহার বজ্রনির্ঘোষিত আজ্ঞায় আজ তোমরা দৈত্যকুলের সংহার করিয়া জন সাধারণের মঙ্গলের দ্বার উদ্ঘাটিত কর। শার্দ্দূল বিক্রমে জন সাধারণে এক মুহূর্ত্তে উঠ।

(ক্রমশঃ)

শ্রী গণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওয়ালেস্।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ওয়ালেস্ তরুশাখা দিয়া একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে অবস্থিত হইয়া ইংরাজসেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ইংরাজসেনা ক্রফোর্ডের গোলাবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংরাজসেনাপতি বট্লার আসিয়াই প্রথমে ক্রফোর্ডের স্ত্রীর হস্ত ধারণ করিলেন, এবং বলিলেন 'স্কটেরা কোথায় লুকায়িত আছে যদি বলিয়া না দাও, এখনই তোমাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব'। ইংরাজ-সেনাপতির এই জঘন্য ব্যবহার দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া ওয়ালেস্ দুর্গমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন, এবং বলিলেন 'নরাধম! স্ত্রীলোকের গাত্রে হস্তক্ষেপ করা বীরের কার্য্য নহে; যদি সাহস থাকে আইস; আজ পৃথিবী হয় বট্লার-শূন্য নয় ওয়ালেস্-শূন্য হইবে'।

ওয়ালেসের তীব্র বচনে বট্লারের অন্তর্নিগূহিত বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এইরূপে যুদ্ধার্থে আহূত হইয়া বট্লার সসৈন্য ওয়ালেসের সম্মুখীন হইলেন। অগত্যা ওয়ালেসকে দারু-নির্ম্মিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে হইল।

ওয়ালেস্ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আজ বট্লারের সঙ্গে বীর্য্যপরীক্ষা করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—কিন্তু কাপুরুষ বট্লার তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহসী না হইয়া সসৈন্য অসতায় ওয়ালেসকে অভিমন্যুবধ করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প বিফল হইল। কতিপয় মাত্র স্কট্ অভিমানুষ বীরত্বের সহিত সেই দারু-দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দুর্গ ভেদ করিতে চেষ্টা করায় পঞ্চদশ ইংরাজ-সৈনিকপুরুষ নিহত হইলেন। তখন বট্লার আপন সৈন্যদলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিন দিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়া সহসা রণক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। রণচতুর ওয়ালেস্ তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিজের ক্ষুদ্র সেনাদলকেও তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। লণ্ডিলের অধীনে ছয় জন, উইলিয়মের অধীনেও সেই পরিমাণে সৈন্য রাখিয়া স্বয়ং পাঁচ জন মাত্র সৈন্য লইয়া দুর্গ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি দুর্গের যে দিক রক্ষা করিতেছিলেন, বট্লার স্বয়ং সসৈন্য সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎকাল ঘোরতর রণে উভয় সৈন্যই অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইতে লাগিল—কিন্তু মত্তমাতঙ্গের সহিত তরক্ষুদল কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারে? ইংরাজ-সেনা শত্রুর অদ্ভুত বীরত্বে ভয়চকিত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। এদিকে তারানাথ তারাগণ সহ গগনাসনে আসিয়া সমাসীন হইলেন। এক দিকে বট্লার সসৈন্য নিজ শিবিরমধ্যে পান ভোজনাদিতে রত হইলেন। অন্য দিকে স্কটেরা গিরিনির্ঝরিণীর নির্ম্মল বারিমাত্র পান করিয়া আপনাদিগের দারু-দুর্গে রজনী যাপন করিলেন।

প্রধান ইংরাজসেনাপতি আরল্ ইয়র্ক বট্লারকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি তাঁহার সাহায্যে শীঘ্রই গমন করিতেছেন—এবং তাঁহার যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি যেন নিজ দুর্গ হইতে বহির্গত না হন। কিন্তু বট্লার ওয়ালেসের অবরোধক হইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, যে সে উপদেশ মানিয়া চলিতে পারিলেন না। তিনি ওয়ালেসের সহিত নির্জ্জনে দেখা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার হস্ত ভিন্ন আর কাহারও হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে নিষেধ করিলেন,—"বলিলেন, আপনি আমার পিতা ও পিতামহকে বধ করিয়াছেন, এক্ষণে আমার এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিয়া সেই পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করুন্। আপনাকে আমি এখনই আত্মসমর্পণ করিতে বলিতেছি এরূপ নহে—আপনি যখন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক মনে করিবেন, তখন যেন আমা ভিন্ন আর কাহারও হস্তে আত্মসমর্পণ না করেন—আমার এই মাত্র অনুরোধ"। ওয়ালেস বট্লারের এই নিষ্ঠুর অভিপ্রায় শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যে সমস্ত ইংলণ্ড সমবেত হইয়া

আসিলেও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না।

ওয়ালেস্‌কে ‘মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন’ এই সঙ্কল্পে দীক্ষিত দেখিয়া বট্‌লার সমস্ত রজনী স্কট্‌ দুর্গ ঘিরিয়া রহিলেন। রজনী প্রভাত হইল—কিন্তু অন্ধকার দূর হইল না—নৈশ তিমিরের পরিবর্ত্তে কুজ্‌ঝটিকা-জনিত তিমিরে জগতীতল আচ্ছন্ন হইল। সেই সুযোগে স্কটিশ বীরবৃন্দ দারুদুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া ইংরাজ শিবিরের উপর আসিয়া পড়িলেন। ইংরাজেরা কিছুই দেখিতে পাইল না—অথচ অসংখ্য ইংরাজ নিহত হইল। সেনাপতি বট্‌লার ওয়ালেসের সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে শমনসদনে প্রেরিত হইলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে সমস্ত ইংরাজসেনা ভয়চকিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। স্কটেরা এই সুযোগে মেথভেন্‌ অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এখানে অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী সংযোজিত হওয়ায় তাঁহাদিগের আর কোন কষ্ট রহিল না। এইখানে ব্রিটেনাধিপতি আসিয়া সদলে তাঁহা-দিগের সহিত মিলিত হইলেন। সেখানে এক রজনী অতিবাহিত করিয়া পেট্রিয়ট-দল বার্ণেম অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করি-লেন। তথায় আসিয়া তাঁহারা প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত স্কোয়ার রুথভেনের সহিত মিলিত হইলেন। এই মিলিত সেনা তথা হইতে আথোল্‌ এবং আথোল্‌ হইতে লোরণে গমন করিল। পথি-মধ্যে তাঁহাদিগের কষ্টের আর সীমা রহিল না। পথের দুইধারের অধি-বাসিবৃন্দ দুর্ভিক্ষ রাহুগ্রস্ত হইয়া কঙ্কাল-সার হইয়া পড়িয়াছিল। নিরন্তর রণে কৃষি ব্যবসায়াদি সমস্ত বন্ধ। কোন-খানে খাদ্য সামগ্রীর সংগ্রহ নাই। ক্ষেত্রসকল শস্যশূন্য; দোকানপসার, হাটবাজার সমস্ত বন্ধ। দেশের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ওয়ালেসের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ তাঁহার অনুযাত্রিকবর্গের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার আর ধৈর্য্য রহিল না। অন-শনে তাঁহাদিগকে মৃতপ্রায় দেখিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, —‘ভ্রাতৃবৃন্দ! আমিই তোমাদিগের এই দুঃখের কারণ। অনুমতি কর আমি একবার আসি—যদি তোমাদিগের কষ্ট নিবারণ করিতে পারি ভালই, নতুবা তোমাদিগকে আর এরূপে আবদ্ধ রাখিব না’—এই বলিয়া তাঁহার প্রত্যা-গমন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তথায় অব-স্থিতি করিতে অনুরোধ করিয়া তিনি অন্তর্ধান হইলেন।

ওয়ালেস্‌ পর্ব্বতের আধিত্যকা প্রদেশ উলঙ্ঘন করিয়া একটী ক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের যাতনার সীমা ছিল না। তিনি ক্লান্ত হইয়া এক তরুমূলে বসিয়া কর-তলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন—মনে মনে আপনাকে

তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'পামর! তোমারই দোষে তোমার আনুযাত্রিকবর্গের আজ এত কষ্ট! স্কট্‌লণ্ডকে স্বাধীন করিবার চেষ্টায় তুমি এরূপ উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীরবৃন্দকে আহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছ! কিন্তু বৃথা আশা! বিধাতা তোমার অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য লেখেন নাই। বোধ হয় তোমা অপেক্ষা কোন যোগ্য ও অধিকতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ললাটে এ সৌভাগ্য লিখিত হইয়াছে। ভ্রাতৃবৃন্দ! আমারই জন্য তোমরা অনাহারে অনিদ্রায় স্থণ্ডিলশয্যায় অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছ। ঈশ্বরের নিকট আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাদিগের এ দুঃখ মোচন করুন। আমিই তোমাদিগের এ দুঃখের মূল, সুতরাং আমি ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি একাকী তোমাদের সকলের সমবেত দুঃখরাশি ভোগ করিব।' এইরূপ আত্মগ্লানিপূর্ণ চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলে শান্তিদায়িনী নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। সেই বীরদেহ অবসন্ন হইয়া তরুমূলে পতিত হইল!

পূর্ব্ব হইতে তিন দিন ধরিয়া তিন জন ইংরাজ ও দুই জন স্কট্ ওয়ালেসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছিল। ওয়ালেস্ সজাগ থাকিতে কেহ তাহাকে ধরিতে সাহস করে নাই। নীচমনা এড্‌ওয়ার্ড প্রকাশ্য-সমরে ওয়ালেস্‌কে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য অবশেষে এই নারকী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। পুরস্কারের আশা দিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই পাঁচ জন এড্‌ওয়ার্ড নিয়োজিত সেই গুপ্ত চর। এই পাঁচ জনের সঙ্গে একটী বালক ছিল, সে তাহাদিগের জন্য খাদ্যসামগ্রী যোজনা করিত। সেই পাঁচ জন অদূরে একটী ঝোপের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল। যেই তাহারা দেখিল ওয়ালেস্ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, অমনি বনমধ্য হইতে আসিয়া ওয়ালেস্‌কে ধরিল। সুপ্ত সিংহকে জাগরিত করিলে সে যেমন গর্জ্জিয়া উঠে, সেইরূপ ওয়ালেস্ জাগরিত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং এক লম্ফে সর্ব্বাপেক্ষা যে অধিকতর বলবান তাহার নিকট গিয়া পড়িলেন, এবং তাহাকে ধরিয়া তাহার মস্তক এরূপ বেগে তরুস্কন্ধে প্রক্ষিপ্ত করিলেন যে তাহার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর নিজ তরবারি লইয়া অবশিষ্ট চারিজনকে আক্রমণ করিলেন। এবং দুই জনকে নিমেষমধ্যে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট দুই জন প্রাণ লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু ওয়ালেস্ দ্রুতপদে গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া খড়্গাঘাতে দুই জনকেই নিহত করিলেন। একমাত্র সেই বালক জীবিত রহিল। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে

ওয়ালেসের চরণতলে গিয়া পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সে বলিল যে সে তাহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল, এবং তাহাদিগের আহার-সামগ্রীসংগ্রহ ভিন্ন আর কোনও কার্য্যে লিপ্ত থাকিত না। ওয়ালেস্ তাহার নিকট যে সকল খাদ্যসামগ্রী ছিল তৎসহ সেই বালককে আপনার সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং আনুযাত্রিক-বর্গের নিকট আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তাঁহারা ভীত ও বিস্মিত হইয়া এরূপ একাকী পরিভ্রমণের জন্য ওয়ালেস্‌কে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

সেই বালকের নিকট তাঁহারা সেই প্রদেশের অবস্থা অবগত হইয়া জানিলেন যে র‍্যানক নগরে না পৌঁছিলে কোন প্রকার খাদ্যসামগ্রী পাইবার আশা নাই। সুতরাং তাঁহারা সেই রাত্রিতেই নগরা-ভিমুখে যাত্রা করিয়া রাত্রি থাকিতে থাকিতেই তথায় পৌঁছিলেন। সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই সেই রজনীতেই ওয়ালেস্ নগরদুর্গ আক্রমণ করিলেন। ওয়ালেসের প্রচণ্ড পদাঘাতে দুর্গদ্বার নিরর্গল হইল, এবং সেই শব্দে দুর্গের অধিবাসীরা সকলে জাগিয়া উঠিলেন। দুর্গাধ্যক্ষ ও দুর্গের অন্যান্য অধিবাসিগণ সকলেই স্কট—প্রাণভয়ে মাত্র ইংরাজদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে সকলেই মহোল্লাসে ওয়ালেসের পতাকামূলে দাঁড়াইলেন।

দেশের লোকের মনের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য ওয়ালেস্ পরদিনই জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন স্থির করিলেন। অশ্বারোহিগণের জন্য পর্য্যাপ্ত সামরিক অশ্ব সংগ্রহ করা হইল। এই ক্ষুদ্র পেট্রিয়ট্ সেনা সুসজ্জিত হইয়া ডন্‌কেল্‌ড-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই তথাকার বিসপ্ সেণ্ট জনষ্টনে প্রস্থান করিলেন। ডন্‌কেল্‌ড দুর্গে যত ইংরাজ সৈন্য ছিল সমস্তই স্কট্ বীরবৃন্দের শাণিত খড়্গাঘাতে নিহত হইল। দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া স্কটেরা অনেক বহুমূল্য দ্রব্যজাত পাইলেন। পাঁচ দিন তথায় বিশ্রাম করিয়া স্কটেরা ওয়ালেসের পরামর্শানু-সারে রস্‌নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়ালেস্ এই আশায় সেইমুখে যাত্রা করিলেন, যে সেখানে বিসপ্ সিংক্লেয়ার প্রভৃতি অসংখ্য স্কট্ তাঁহাদিগের সহিত আসিয়া মিলিত হইতে পারিবেন। তাঁহারা যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন অমনি ইংরাজেরা চতুর্দ্দিক হইতে পলা-য়ন করিতে আরম্ভ করিল। কেহই তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। অগ্রগামিনী ওয়ালেস্-বাহিনীর সহিত ক্রমে অসংখ্য স্কট্ আসিয়া মিলিত হইল। ক্রমে ওয়ালে-সের সৈন্যসংখ্যা সপ্ত সহস্রে পরিণত হইল। সেই সৈন্য লইয়া ওয়ালেস্

এবার্ডিন্‌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজেরা সেই সংবাদ পাইয়া এবার্ডিন্‌কে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া চলিয়া গেল। রুথ্‌বেন, সিংক্লেয়ার, লিণ্ড সে, ব্রইড, আডাম্‌ ওয়ালেস্‌, ব্যারন্‌ রিকার্টন্‌, সীটন্‌, লডব্‌, লুণ্ডিনের রিচার্ড প্রভৃতি ওয়ালেসের সহচরবৃন্দ ক্রমে ক্রমে সকলেই আপন আপন অনুযাত্রিক-বর্গ সহ ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এবার্ডিন্‌ হইতে সেই স্কট সেনা সেণ্ট জনষ্টনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংরাজেরা যে দিকে পারিল পালায়ন করিতে লাগিল। ডংকেণ্ডের বিসপ্‌, সেণ্ট জনষ্টন্‌ হইতে লণ্ডনে পলায়ন করিলেন। তিনি এড্‌ওয়ার্ডের নিকট ইংরাজদিগের এই দুরবস্থাকাহিনী জানাইলেন। এড্‌ওয়ার্ড পরামর্শ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ সার আমের্‌ ডি ভ্যালেন্‌সকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

এড্‌ওয়ার্ড এবার হতাশ্বাস হইলেন। তিনি দেখিলেন বলে ওয়ালেস্‌কে পরাস্ত করা অসাধ্য। তিনি একবার পরাস্ত করিবেন, আবার ওয়ালেস পূর্ণ শক্তিতে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবেন। বলে পরাস্ত হইয়া এড্‌ওয়ার্ড এক্ষণে উৎকোচ দানে কার্য্য সম্পন্ন করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। ইংলণ্ডের ইহা মৌলিক ব্যবসায়। বিশ্বাসঘাতকতা উত্তেজিত করিয়া তাহার সুবিধা লওয়া ইংলণ্ডের একটী চিরাগত প্রথা। ওয়ালেসের অনুযাত্রিক-বর্গকে উৎকোচক্রীত করিয়া তাহাদিগদ্বারা নিদ্রিত অবস্থায় ওয়ালেস্‌কে অবরুদ্ধ করার নারকী চিন্তা এড্‌ওয়ার্ডের মনে উদিত হইল। তিনি বিশ্বাসঘাতক সার্‌ আমের্‌ ডি ভ্যালেন্‌সের উপর এই কার্য্য সাধনের ভার অর্পণ করিলেন। তিনি এই কার্য্য সাধনের জন্য মুক্ত হস্তে স্বর্ণরজত ব্যবহার করিবার ভার-প্রাপ্ত হইয়া স্কট্‌লণ্ডে প্রত্যাগত হইলেন। ভ্যালেন্‌স স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া, সার্‌ জন্‌ মণ্টীথ্‌কে এই কার্য্যের সাধক স্থির করিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। সার্‌ জন্‌ মণ্টীথ্‌ লেন্‌কসের অধিপতিত্ব ও তিন সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রার বিনিময়ে প্রিয়সহচর ওয়ালেসকে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। একটি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হইল। ভ্যালেন্‌স মণ্টীথ্‌-লিখিত সেই প্রতিজ্ঞাপত্র খানি লইয়া মহাহর্ষে এড্‌ওয়ার্ড-সমীপে গমন করিলেন। সেই প্রতিজ্ঞাপত্র দেখিয়া এড্‌ওয়ার্ডের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এদিকে ওয়ালেস্‌ সেণ্ট্‌ জনষ্টন্‌ দুর্গের অবরোধে নিযুক্ত ছিলেন। ইংরাজেরা সবিশেষ বীরত্বের সহিত সেই দুর্গরক্ষা করিতেছিলেন। একদিন প্রত্যুষে পাঁচ সহস্র ইংরাজ দক্ষিণ দুর্গদ্বার দিয়া স্কট্‌-ব্যূহ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। কিন্তু স্কটিশ বীরবৃন্দ নিমেষমধ্যে তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে ফিরিয়া যাইতে

বাধ্য করেন। স্কটেরা ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দুর্গমধ্যে লইয়া গেল। ডগুাস আক্রমণবেগে সহচরবৃন্দকে ফেলিয়া দুর্গাভ্যন্তরে গিয়া পড়িলেন। অমনি ইংরাজ সৈনিকেরা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সেনাপতি আরল্ ইয়র্কের নিকট লইয়া গেল। তিনি ওয়ালেস্‌কে বাধ্য করিবার নিমিত্ত ডগুাস্‌কে দূত দ্বারা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি আরল্ ইয়র্ক ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার এই সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ওয়ালেস্ এড্‌ওয়াডের বশ্যতা স্বীকার করিবেন। কিন্তু ওয়ালেস্ কিছুতেই লক্ষ্য-চ্যুত হইবার নহেন। তিনি এই সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে ইংরাজ সেনাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া পাঠাইলেন।

স্কট্‌বীরবৃন্দের বীরকাহিনী ক্রমে স্কট্‌লণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। আরল্ ফাইফ্, ও ফাইফের সেরিফ্ দুই জনে স্বদলে আসিয়া জাতীয় পতাকামূলে দাঁড়াইলেন। মিলিত স্কট্‌সেনা প্রচণ্ড বেগে স্কট্‌দুর্গ আক্রমণ করিল। প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া স্কটেরা দুর্গাভ্যন্তরে গিয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের শাণিত অসি প্রহারে নিমেষমধ্যে সহস্র ইংরাজ শমনসদনে প্রেরিত হইল। পরে ইংরাজমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ওয়ালেস্ পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া আরল ইয়র্কের জীবনরক্ষার জন্য তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। জপ এই দৌত্যকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি আরল ইয়র্কের জন্য একখানি শকট আনয়ন করিলেন। তাঁহাকে স্কটিশ সৈনিকের পরিচ্ছদ পরাইয়া শকটে আরোপিত করিলেন এবং উপযুক্ত পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন। স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণকেও মুক্তি প্রদান করা হইল। এই বিজয় শক্তি-তুলকে স্কট্‌গণের অনুকূলে ফিরাইল। ওয়ালেস্ এক্ষণে স্কট্‌গণকে জাতীয় পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইতে আহ্বান করিলেন।

এই ঘোষণা করিয়া ওয়ালেস্ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রবার্ট ব্রুসের ভ্রাতা এডওয়ার্ডব্রুস গত বৎসর আয়র্লণ্ডে ছিলেন। তিনি আয়র্লণ্ড হইতে কতিপয় সৈনিকপুরুষ লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহাদিগের সাহায্যে তিনি অসংখ্য ইংরাজকে রণে পরাজিত ও নিহত করেন, এবং হুইগ্‌টন্ দুর্গ অধিকার করেন। লক্‌মেবেন্ নগরে ওয়ালেস্ ও এড্‌ওয়ার্ড ব্রুস বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে ভক্তিভাবে আলিঙ্গন করিলেন। এড্‌ওয়ার্ড সেই স্থলেই জাতীয় অধিনায়কত্ব পদে বৃত হইলেন। ওয়ালেস্ আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন—যে যদি রবার্ট ব্রুস স্কট্‌লণ্ডের রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সেই সিংহাসন এডওয়ার্ড ব্রুসকে প্রদান করা যাইবে। ওয়ালেস এই প্রতিজ্ঞা করিয়া কমনকের কৃষ্ণগৃহাস্থিত নিজ গৈরিকাবাসে গমন করিলেন।

এদিকে ওয়ালেস্ ও এড্‌ওয়ার্ড ব্রুসের

সন্ধিসংবাদ ইংলণ্ডেশ্বর এডওয়ার্ডের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তিন বার স্কটলণ্ডের পরাজয় করিয়া তথায় নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া আসার পর তিন বারই স্কটলণ্ড আবার মাথা তুলিল দেখিয়া এডওয়ার্ড স্কটলণ্ড পুনরাক্রমণের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। তিনি দেখিলেন ওয়ালেস্ জীবিত থাকিতে তাঁহার স্কটলণ্ডে কোন আশা নাই। এইকারণে তিনি মণ্টীথকে ওয়ালেস্‌কে ধরিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন। মণ্টীথ এডওয়ার্ড কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া নিজ ভাগিনেয়কে ওয়ালেসের গৃহকার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। সেই যুবক ওয়ালেসকে ধরিয়া দিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া ভৃত্যভাবে রহিল। স্কটলণ্ডে শান্তি ও স্বাধীনতা সংস্থাপন করিবেন—এই চিন্তায় অভিভূত থাকায় ওয়ালেস্ সেই যুবকের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে নিজ সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

স্কটলণ্ড হইতে ইংরাজদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়া ওয়ালেস্ বিশ্বস্ত দূত জপ্‌কে পত্রসহ ইংলণ্ডে ব্রুসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। লিখিয়া পাঠাইলেন যে স্কটলণ্ডের সিংহাসন শূন্য পড়িয়া আছে, তিনি আসিয়া তাহাতে অধিরোহণ করুন—স্কটলণ্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা ইহাতে সুখী হইবে এবং প্রতিবাদী হইবার কেহ নাই। ব্রুস্ এই সংবাদে নিরতিশয় সুখী হইলেন এবং ওয়ালেসকে এই শুভ সংবাদ জন্য ধন্যবাদ দিয়া কিরূপে অজ্ঞাতভাবে ইংলণ্ড হইতে পলায়ন করিবেন তদ্বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন; এবং তাঁহাকে গ্লাসগো-মূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম রজনীতে তিনি গুপ্তভাবে তথায় গিয়া ওয়ালেসের সহিত মিলিত হইবেন লিখিয়া পাঠাইলেন। ওয়ালেস্‌কেও একাকী প্রচ্ছন্নভাবে তথায় আসিতে অনুরোধ করিলেন।

ওয়ালেস্ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি সেই নির্দ্দিষ্ট রজনীতে কার্লে এবং মণ্টীথ্ প্রেরিত সেই যুবক মাত্র সমভিব্যাহারে গ্লাসগো-মূরে গমন করিলেন। তিনি ব্রুসের আগমন প্রতীক্ষায় নগরের প্রান্তভাগে পাদচারে বেড়াইতে লাগিলেন। এ দিকে বিশ্বাসঘাতক মণ্টীথ্ ষাইট্‌জন সশস্ত্র পুরুষ সহ সেই রজনীতে গ্লাস্‌গোমূরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গ্লাসগো গির্জ্জার অদূরে কোন আবাসে লোকজন সহ গুপ্তভাবে রহিলেন। ওয়ালেস্‌ও বহুক্ষণ ব্রুসের অপেক্ষা করিয়া তাঁহার অনাগমে হতাশ হইয়া প্রিয়বন্ধু কার্লে সমভিব্যাহারে নিকটবর্ত্তী কোন পান্থনিবাসে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। রজনী দ্বিপ্রহরা—নিদ্রায়

অভিভূত হইয়া ওয়ালেস্ ও তদীয় বন্ধু কার্লে বিশ্রামার্থ গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। যুবক অনুচর বাহিরে পাহারা দিতে লাগিল। যখন তাঁহারা নিদ্রায় হতচেতন হইলেন, তখন সেই বিশ্বাসঘাতক যুবক ভৃত্য ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত্র করিল। পরে মণ্টীথকে গিয়া তাঁহাদিগের সেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ অবস্থা জানাইল। দুরাচার মণ্টীথ্ তৎক্ষণাৎ লোক জন সহ আসিয়া সেই বাটী ঘিরিয়া ফেলিল। এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রাভিভূত কার্লেকে দ্বারদেশে টানিয়া আনিয়া নিহত করিল। তাহার পর পাষণ্ডেরা নিদ্রিত বীরসিংহকে রশ্মি দ্বারা আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। ওয়ালেসের অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি এক লম্ফে দূরে গিয়া পড়িলেন এবং অন্ধকারে অস্ত্রশস্ত্র হাত্ড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছু পাইলেন না। তখন সম্মুখে যাহাকে পাইতে লাগিলেন তাহাকেই ধরিয়া আছাড় দিতে লাগিলেন। এই প্রচণ্ড আঘাতে অনেক ইংরাজ শমনসদনে প্রেরিত হইল। প্রমাদ গণিয়া মণ্টীথ্ কৌশল অবলম্বন করিলেন; বলিলেন ইংরাজেরা অসংখ্য সৈন্যসহ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—তাঁহাকে ইংরাজদিগের হস্ত হইতে কৌশলে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বন্দীভাবে যাইলে তাহারা কিছু বলিবে না; এইরূপে তিনি কৌশলে ইংরাজদিগের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তদীয় আবাসে রাখিয়া আসিবেন। মণ্টীথ এক সময়ে ওয়ালেসের প্রিয় সহচর ছিলেন। এমনই সহানুভূতিপূর্ণ বচনে তিনি এই কথাগুলি বলিলেন যে ওয়ালেস্ সন্দেহ করিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি বিশ্বাস রাখিবার জন্য মণ্টীথকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন। মণ্টীথ্ অম্লানবদনে ঈশ্বরসমীপে প্রতিজ্ঞা করিল যে কখনই ওয়ালেস্‌কে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে না। সরলহৃদয় ওয়ালেস্ এইরূপে মণ্টীথের কুহকে ভুলিয়া হস্তদ্বয় রশ্মি দ্বারা আবদ্ধ করিতে অনুমোদন করিলেন। আপনি ধরা না দিলে সে সিংহকে ধরিত এমন লোক কেহ ছিল না। বদ্ধহস্ত হওয়ার পর তিনি প্রিয়বন্ধু কার্লের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন বুঝিলেন যে তিনি বিশ্বাসঘাতক দস্যুর হস্তে পতিত হইয়াছেন। তখন বুঝিলেন যে তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু নিজের ভাবনা অপেক্ষা স্কট্‌লণ্ডের ভাবনায় তিনি অধিকতর অভিভূত হইলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে স্কট্‌লণ্ডের কি দশা হইবে এই ভাবিয়া তিনি নিরতিশয় কাতর হইলেন।

এদিকে ওয়ালেসের বন্ধুবান্ধবেরা ওয়ালেসের এ সমস্ত বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না। ওয়ালেস্ তাঁহাদিগের

হস্ত বহির্ভূত হইলে তাঁহারা সবিশেষ জানিতে পারিলেন। মন্টীথ্ এতদ্রুত ওয়ালেস্‌কে লইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রত্যূষে কার্লাইলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় আসিয়াই তাঁহাকে লর্ড ক্লিফোর্ড ও ভ্যালেন্স্‌সের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা ওয়ালেস্‌কে উক্ত নগরের কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সেই অবধি সেই কারাগার 'ওয়ালেস্ টাওয়ার' নামে খ্যাত হইয়াছে। কুক্ষণে ওয়ালেস্ একাকী ব্রুসের অভ্যর্থনায় নির্গত হইয়াছিলেন। কুক্ষণে তিনি বিশ্বাসঘাতক মন্টীথ্‌কে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন! হায় কি হইল! কে এখন স্কট্‌লণ্ড উদ্ধার করিবে?

আমার জীবনের ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সময়-প্রতীক্ষা।

সে রাত্রি যেমন নিশ্চিন্ত হৃদয়ে নিদ্রাসুখাস্বাদ করিয়াছিলাম তেমন অনেক দিন হয় নাই; সুতরাং প্রত্যূষেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখনও প্রকৃতি আপনার নৈশ ক্রীড়া ভুলিতে পারেন নাই। প্রদোষাগমনে কবরীদেশে যে তারকা কুসুমদাম বাঁধিয়াছিলেন তখনও তাহা বিরাজ করিতেছিল। কুসুমগুলি মাঝে মাঝে খসিয়া পড়িয়াছে, ও যে গুলি বিরাজ করিতেছে তাহারাও মলিন হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি সেই কুসুমদাম সেই কবরীতেই রহিয়াছে—সূক্ষ্ম তিমির বসন ভেদ করিয়া অনুজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে। রজনী অবসানে জগৎ নিস্তব্ধ, জীব জন্তু নিস্তব্ধ, কেবল আলোকব্যাকুল বিহঙ্গমগণ ঈষৎ আলোক দেখিতে পাইয়া অতীব করুণ স্বরে থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। আমি বলিয়াছি যে এই সময়ে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। তখন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলাম ঘরের ভিতর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। সে অন্ধকার আর ভাল লাগিল না। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া একটি জানালা খুলিয়া দিলাম, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ আলোক হইল না। মাতু তখনও নিদ্রায় বিহ্বল, কিন্তু অচিরে তাহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি উঠিয়াছি দেখিয়া সেও উঠিল, এবং চক্ষু মুছিতে মুছিতে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল 'এত

ভোরে কেন গো?' আমি কোন উত্তর দিলাম না। তাহাকে উত্থিত দেখিয়া আমার হৃদয়ে কেমন এক প্রকার আবেগের সঞ্চার হইল। ভাবিলাম, 'বিলম্বে প্রয়োজন কি, এখনই কেন বলিনা?' আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, কিন্তু বলিতে পারিলাম না; 'এত ভোরে না, আর একটু বেলা হউক।' সুতরাং আমি 'আর একটু বেলা' হইবার প্রতীক্ষায় রহিলাম, এবং মাতু আমার সহিত দুই একটি কথা কহিতে কহিতে অবাধে ঘরের ভিতর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

দেখিতে দেখিতে রজনীর অন্ধকারের অবশেষটুকু কাটিয়া গেল, এবং বালারুণরাগে মেদিনীর মুখ প্রফুল্ল হইল। কিন্তু তথাপি ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে আমার ইচ্ছা হইল না;—যাইবই বা কোথায়? আমি একাকী বসিয়া মনে মনে লঙ্কাভাগ করিতে লাগিলাম। 'এই বার দেখিব মাতু কেমন। দেখি কেমন করিয়া সে আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে। আমি যদি আজই যাইতে চাহি, সে কোন্ ছার যে আমার ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হইবে? কিন্তু যাইবার সময়ে বিনোদ ও ভুবনের জন্য বড় মন কেমন করিবে। ইচ্ছা হয় ইহাদের দুই জনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। তাহারা কি আমার সঙ্গে যাইবে? যাউক আর না যাউক আমি কিন্তু বলিয়া দেখিব। হয়ত ভুবন দিন কতকের জন্য যাইতে পারে। কিন্তু সে ত পরের কথা, আগে পোড়ারমুখীর শ্রাদ্ধ করা চাই।—আর একটু বেলা হইলে হয়।'

বসিয়া বসিয়া খুব বেলা হইল; চারি দিক্ রৌদ্রে জ্বলিতে লাগিল। এই সময়ে বিনোদ আমার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া আমার মনে বড় আহ্লাদ হইল। আমার বোধ হইল তাহাকে যেন তত ভাল কোন দিন বাসি নাই। সে আমার কাছে আসিয়া বসিল, এবং বেগে আমাকে একটি ধাক্কা মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'বলি, একলাটি বসিয়া কি করিতেছ বল দেখি?' আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, কিন্তু আমার মনে তাহাতে কেমন একটু কষ্ট হইতে লাগিল,যে কেমন করিয়া তাহাদের ফেলিয়া যাইব তাই ভাবিতেছি। বিনোদ চমকিয়া উঠিল—'কোথায় যাইবে?'

আমি—'বাড়ী যাইব না?'

বিনোদ—'দেখ, তুমি এক এক দিন বাড়ী যাইবার কথা তুলিয়া আমাদের ভয় দেখাও—না?'

আমি—'না সত্য বলিতেছি; আজ না হয় কাল।'

বিনোদ—'আমি তোমার কথা এক তিলও বিশ্বাস করি না।'

আমি—'দেখিলে বিশ্বাস করিবে ত? না, তাও না?'

বিনোদ—'তুমি পাগলের মত মিছা বকিতেছ কেন বল দেখি? তোমার কথা আমার ভাল লাগে না।'

আমি—'আচ্ছা আমি না হয় পাগলই হইলাম। এখন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি।—আমি যদি আজ, কি কাল, কি না হয় দু দিন পরেই, এখান থেকে চলিয়া যাই তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?'

বিনোদ—'আমি তোমার পাগলামি শুনিতে চাহি না।' এই বলিয়া সে পুনরায় আমাকে একটি ধাক্কা মারিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে আমার হাত ছাড়াইয়া হাসিতে হাসিতে পলায়ন করিল। ভাবিতে লাগিলাম—'ইহাদের মায়া কাটিয়া যাওয়া কি সুকঠিন হইবে!—মায়া কাটিয়া যাওয়া! কে কোথায় যাইবে? হরি! হরি!

বিনোদ আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু অধিকক্ষণ আমাকে একাকী থাকিতে হইল না; কারণ অনতিবিলম্বে ভুবন আসিয়া উপস্থিত হইল। ভুবনের স্বভাব কিরূপ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং অকস্মাৎ তাহাকে দেখিয়া আমি একটু বিস্মিত হইলাম। সে আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল, এবং আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিল—'বলিয়াছিলে?' আমি কোন উত্তর দিতে পারিলাম না; শুধু অপ্রস্তুত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ভুবন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—'চুপ করিয়া রহিলে যে?' কিন্তু এবারও কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। তখন ভুবন একটু মিষ্ট ভৎর্সনা-স্বরে বলিল—'আমি তখনই ত বলিয়াছিলাম যে তুমি পারিবে না। কেমন, আমার কথা ঠিক ত?'

আমি—'হ্যাঁ—তা—তা বটে, কিন্তু আমি ভুলি নাই; শুধু অবকাশ পাই নাই বলিয়া বলিতে পারি নাই।'

ভুবন—অবকাশ!—কি কাযে এত ব্যস্ত ছিলে?'

আমি—'না, তা বিশেষ কিছু না।'

ভুবন—'এ মন্দ কথা নয়। কোন কায নাই, অথচ অবকাশও নাই। তাহা হইলে অবকাশ হইয়া উঠা ত সুকঠিন।' ভুবন হাসিতে লাগিল; কিন্তু অচিরে সে ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল—'না, তুমি ভাল করিতেছ না। তোমাকে ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যদি বাঁচিতে চাও ত সময় নষ্ট করিও না। দেখ, পাখী জালে পড়িলে যত সময় যায় ততই বেশী করিয়া আপনার গায় আপনি জাল জড়াইতে থাকে। তুমি কি তাই ইচ্ছা কর?'

ভুবনের কথায় আমার মনে আবার আশঙ্কা হইল; এবং আমি আপনাকে আপনি ভৎর্সনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভুবন জিজ্ঞাসা করিল—'তবে এখন স্থির করিলে কি? এইখানেই কি থাকিবে?' তাহার কথায় আমার মনে বড় ক্লেশ হইল। আমি বলিলাম—'দিদি আমি বিলম্ব করিয়া

ভাল করি নাই মানিতেছি, কিন্তু তবু তোমার মুখে ওরূপ কথা শুনিলে বড় দুঃখ হয়। আজ কয় দিন ধরিয়া তোমার কাছে যে কাঁদিতেছি কাটিতেছি সে কি এখানে থাকিব বলিয়া? এখানে থাকিবার জন্য ইহার অপেক্ষা অনেক সহজ উপায় আছে তা কি তুমি জান না? আর প্রাণ যে এত ব্যাকুল হইয়াছে তা থাকিবার জন্য কি যাইবার জন্য তাও কি জান না?' ভুবন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অতীব করুণ-স্বরে বলিল—'শ্যামাঙ্গিনি, সব জানি বলিয়াই যে আপদ হইয়াছে। না জানিলে কি তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিতাম! তুমি যদি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পার, আমি কেন পারি না? আমার উপরে বিধাতার এ নিগ্রহ কেন! এক এক মুহূর্ত্ত যাইতেছে আর আমার বোধ হইতেছে তুমি এক এক দিন হারাইতেছ। আমার মস্তকে এ ভাব কোথা হইতে আসিয়া প্রবেশ করিল!'

ভুবন যখন এই কথাগুলি বলিতে লাগিল আমি এক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার সেই বিস্ফারিত চক্ষুদুটি আরক্তিম হইয়া যেন জলে ঢল ঢল করিতে লাগিল; এবং সেই প্রশান্ত গম্ভীর মুখখানি আরও গম্ভীর ভাবে উদ্ভাসিত হইল। আমার বোধ হইতে লাগিল যে আমি যাহার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছি সে যেন মানবী নহে। যেন কোন সুরসুন্দরী আমার নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নি পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যলোকে প্রেরিত হইয়াছেন। আমার হৃদয় এক অপূর্ব্ব বলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমার বোধ হইতে লাগিল যে পৃথিবী শুদ্ধও আমার বিপক্ষে হইলে আমার মরণ নাই। সেই নূতন শক্তি আমি হৃদয়ে লুকায়িত রাখিতে সক্ষম হইলাম না। আমি দৃঢ় মুষ্টিতে ভুবনের একটি হাত ধরিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক স্বরে বলিতে লাগিলাম—'দিদি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি তোমার উপদেশ অবহেলা করিয়াছি, মার্জ্জনা কর। কিন্তু এইবার তুমি দেখিবে যে, পাখী জালে পড়িলেও জাল কাটিয়া বাহির হইতে পারে। কে আমাকে ধরিয়া রাখিবে? একবার যে পাখী পিঁজারা ভাঙ্গিয়াছে তাহাকে আবার পিঁজারায় কয়েদ করিয়া রাখিবে কে? আমার বোধ হইতেছে আমার দেহে শত হস্তীর বল আসিয়াছে; সে বলের প্রতিবন্ধক হইবে কে?—দেখাইয়া দাও সে বলের প্রতিবন্ধক হইবার ক্ষমতা কাহার? চুপ্ করিয়া রহিলে কেন? তুমি ভাবিতেছ আমি অসহায়; আমি দুর্ব্বল। চিরদিন কি মানুষ দুর্ব্বল থাকে?—চিরদিন কি—' আমি এইরূপে পাগলের মত বকিতে লাগিলাম। অবনতমুখে স্থিরভাবে আমার কথাগুলি কিয়ৎকাল শুনিতে শুনিতে একটি দীর্ঘনিশ্বাসে ভুবনের হৃদয় স্ফীত হইল, ও সে আমাকে কিছু বলিবার

উপক্রম করিল। কিন্তু আমি তাহাকে কথা কহিবার অবসর না দিয়া বলিয়া উঠিলাম—‘দিদি আর তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না। তুমি যাহা যাহা বলিয়াছ আমার সমুদয় মনে আছে। তুমি দেখিবে যে তোমার পরামর্শের এক চুল তফাত হইবে না। তুমি এখন যাও।’

ভুবন—‘আচ্ছা, তবু একটি কথা বলি মন দিয়া শোন।’

আমি—না; আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। তুমি এখন যাও। আমি শীঘ্র গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতেছি। তুমি এখন যাও।’ এই বলিয়া আমি তাহাকে ঠেলিয়া দিলাম।

ভুবন—‘ব্রহ্মাণ্ডদেব; এ তোমার কি লীলা! দেব, এ যন্ত্রণা কেন!’ এই বলিতে বলিতে ভুবন নিষ্ক্রান্ত হইল।

আমি সৌৎসুক্যে মাতুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। —‘আজ দেখিব তাহার পেটে কত দুষ্টবুদ্ধি ধরে। যে চিরকাল আমার পদানত হইয়াছিল সে কিনা আজ আমার উপরে প্রভুত্ব করিবে! আকাশ হইতে চন্দ্র ভূতলে খসিয়া পড়িবে, আর জোনাকি সেই স্থান অধিকার করিবে! ঘৃণার কথা! ইচ্ছা হইতেছে এখনই তাহাকে এইখানে ধরিয়া আনাই, আনাইয়া জিজ্ঞাসা করি সে মনে ভাবিয়াছে কি। আমার আর বিলম্ব সহিতেছে না—এক তিলও বিলম্ব সহিতেছে না। একবার পোড়ার-মুখীর দেখা পাইলে হয়, তাহা হইলে তাহাকে উচিত মত শিক্ষা দিই। বিলম্ব আর ভাল লাগিতেছে না।’

জাল জড়াইল।

একবার এক জন আমাকে একটি কল দেখাইয়াছিলেন। কোন্ সামগ্রীতে কত উত্তাপ আছে তাহা সেই কলটির সাহায্যে জানিতে পারা যায়। অতি সামান্য উত্তাপ লাগিলে, এমন কি অঙ্গুলিদ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে, কলটির অভ্যন্তরস্থ পারদ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া দেখিতে দেখিতে উপরে উঠিতে থাকে; আর যেই উত্তাপ সরাইয়া লও অমনি ধিকি ধিকি নামিয়া কিয়ৎকালের মধ্যে পূর্ব্বের আয়তন ধারণ করে। সংসারে মানবজাতির মধ্যে এই রূপ তাপমান অনেক আছে। ইহারা খড়ের আগুন। একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ না লাগিতে লাগিতে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে; দেখিলে বোধ হয় যেন অচিরে সেই তেজ ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু মুহূর্ত্তেক পরে দেখ সে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, এবং রসহীন অসার তৃণ ধূমান্বিত হইতেছে কি না তাহাও সন্দেহ স্থল।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সৌৎসুক্যে আমি মাতুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তখনই যদি তাহার সহিত দেখা হইত তাহা হইলে কি ঘটিত

বলিতে পারা যায় না। হয়ত মনের সাধে তাহার উপরে গালি বর্ষণ করিতাম, এবং অবশেষে সংকল্পিত বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া বালকের মত তাহার অঞ্চল ধরিয়া রোদন করিতাম। কিন্তু মাতুর সহিত শীঘ্র দেখা হইল না—একবারে যে দেখা হইল না তাহা নহে, তবে এমন সুবিধায় তাহাকে পাইলাম না যে মনোগত বিষয়ের উত্থাপন করি। আমি ভুবনকে বলিয়াছিলাম যে শীঘ্র তাহার সহিত দেখা করিব, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মাতুর সহিত কোন কথা হইল না বলিয়া তাহার কাছে আর যাইলাম না। এইরূপে দিন কাটিয়া গিয়া রাত্রি আসিল ও খড়ের আগুন ক্রমশঃ নিবিতে লাগিল, কিন্তু তবু একবারে নির্ব্বাণ হইল না। এখন মাতু ও আমি দুইজনে এক জায়গায় মিলিয়াছি। আমাদের কাছে আর কেহ নাই, শুধু সে আর আমি। আমি ভাবিতে লাগিলাম 'এই ত উপযুক্ত সময়।' আমার বুকের ভিতরে দুপ্ দুপ্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল; মনে কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল। মাতু আমার সহিত কথা কহিতেছিল, কিন্তু বোধ হয় তাহার একটিও কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল না। আমি দুই তিন বার তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, এবং প্রতিবারেই আমাকে মনে মনে তাহার কাছে পরাভব মানিতে হইল। এই অবস্থায় নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নি আবার আপনা হইতে একটু জ্বলিয়া উঠিল। আমি নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম, এবং তন্মুহূর্ত্তেই মনোগতভাব ব্যক্ত করিতে দৃঢ় সংকল্প করিলাম। তখন আর ইতস্ততঃ না করিয়া মাতুকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম—'মাতু যাহা বলিয়াছিলাম তার কি হইল?'

মাতু—'কি বলিয়াছিলে?'

আমি—'কি বলিয়াছিলাম মনে নাই? বাড়ী যাইবার কি হইল?'

মাতু—'এই কথা? বাড়ী যাইব না ত কি।'

আমি—'না, ওরকমের কথা আমি শুনিতে চাই না। তুমি আমাকে ঠিক করিয়া বল যে কবে যাওয়া হইবে।'

মাতু—'বলি, বাড়ী কি পালাইতেছে? সে জন্য এত ব্যস্ত কেন বল দেখি?'

আমি—'তা জানিবার তোমার দরকার নাই। আমি যা জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার উত্তর দাও। আমি ঠিক করিয়া জানিতে চাই যে কবে বাড়ী যাওয়া হইবে।'

মাতু—'যদি বাড়ী যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইবে যে দুই চারি দিন দেরি করিতে পারিবে না, তবে আসিলে কেন বল দেখি? না আসিলেই ত ছিল ভাল।'

আমি—'ভাল মন্দ বিচার করিবার জন্য আমি তোমাকে সঙ্গে আনি নাই। আমি আসিয়াছিলাম নিজের ইচ্ছায়, এবং এখন যাইতে চাই নিজের ইচ্ছায়।'

মাতু—'তবে একটা কথা বলি, যদি রাগ না কর। আমিও আসিয়াছিলাম নিজের ইচ্ছায়; আমিই বা কেন নিজের ইচ্ছায় যাইতে পারিব না?—রাগ করিলে? তুমি ছেলে মানুষ তাই এখন এত ব্যস্ত হয়েছ। ভেবে দেখ দেখি কি মনস্থ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলে?'

মাতু তাহার সেই ভ্রূদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহার সেই অন্তর্ভেদী স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। আমার বোধ হইল যেন হৃদয়ের ভিতরে অকস্মাৎ এক প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া ভাবসাগর উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। সে সময়ের অবস্থা যথার্থ চিত্রাঙ্কিত করা দুঃসাধ্য—তাহা অবর্ণনীয়, অকথনীয়! অচিরে কিন্তু (জানি না কেমন করিয়া) হৃদয়ের সে উন্মত্ততা হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে সক্ষম হইলাম, এবং মাতুকে পূর্ব্ববৎ স্বরে পুনরায় বলিলাম—'মাতু আমি তোর কোন কথার উত্তর দিতে চাহি না। আমি যাহা বলিতেছি তাহা তুই শুনিবি কি না?'

মাতু—'মাতি কোন্ দিন কোন্ কথাটা অবহেলা করিয়াছে যে আজ সে কথা শুনিবে না? তুমি আমার উপরে রাগ করিয়াছ। সে আমার অদৃষ্টের দোষ। চিরকাল মন জোগাইয়া বেড়াইলাম কিন্তু একদিন মন পাইলাম না। আচ্ছা, আমি ত মন্দ আছিই, তুমিই কেন পষ্ট করিয়া বল না যে আমি অমুক দিন যাইব। তুমি দিন স্থির করিয়া দাও, আমি তাহার জোগাড় করি।'

আমি—'কেন সে কথা কি তোকে আমি বলিতে বাকি রাখিয়াছি? আজ হইলে আমি কাল চাহি না।'

মাতু—'এই দণ্ডেই?'

আমি—'আমার তাহাতে আপত্তি নাই। আমি প্রস্তুত রহিয়াছি।'

মাতু—'তবে তা; বিলম্ব করিতেছ কেন?' এই বলিয়া মাতু আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

আমি—'মাতু তোর ও হাসি আমার ভাল লাগে না—আমি সত্য বলিতেছি আমার আর ভাল লাগে না।'

মাতু রাগ করিল।—'তা আমি বুঝতে পেরেছি। পরমেশ্বর জানেন কি অপরাধে আমি তোমার কোপ দৃষ্টিতে পড়েছি! তোমার দোষ কি? কালের এই ধর্ম্ম। তুমি যাহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত সে তোমার হইতে চাহে না। তা বেশ; আমার অপরাধ হইয়াছে। আমাকে তুমি যদি দেখিতেই না পার আমি এখান থেকে চলিয়া যাইতেছি।'

এই বলিয়া মাতু উঠিবার উপক্রম করিল; কিন্তু আমি তাহার অঞ্চল ধরিয়া বসিয়া রহিলাম।—'তুই কি মনে করিয়াছিস্ আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবি? তা হইবে না।'

মাতু—'ফাঁকি তোমায় কি দিতেছি? আমি ত আর তোমার টাকা কড়ি কিছু হাত করিয়া রাখি নাই যে ফাঁকি দিয়া পলাইতেছি।'

আমি—'টাকা কড়ি? তা হলে আজ তোকে এত পীড়ন করতাম না। টাকা কড়ি ত ছার। আমি যাহা হারাইতে বসিয়াছি—' এই বলিতে বলিতে আমি নিরস্ত হইলাম। মাতু অবশ্য ভাবে নাই যে ব্যাপারটা এতদূর গিয়া গড়াইবে। সে নরম হইয়া পড়িল ও বলিল—'তুমি পাগলের মত কি বকিতেছ বল দেখি? কৈ আমাকে কি কখন এক কথার উপরে দুই কথা বলিতে হইয়াছে যে তুমি এই সামান্য বিষয় লইয়া এত গোল করিতেছ। ব্যাপার কি না বাড়ী যেতে হবে! তাই নিয়ে এত হাঙ্গাম! লোকে শুনিলে বলিবে কি? সত্য সত্য এ রাত্রিতে ত আর যাওয়া হতে পারে না'।

আমি—'তা আমি জানি; কিন্তু এ রাত্রিতে যাওয়া হতে না পারুক, কথা ত স্থির হতে পারে।'

মাতু—'তা পারবে না কেন। তাই কর। কবে তুমি যেতে চাও বল।'

আমি—'আমার ইচ্ছা আমি কালই যাই।'

মাতু—'কালই?'

মাতু একটু গোলে পড়িল। সে কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিল—'তাতে আমার আপত্তি কি? তবে কি না আমার ভারি লোকসান হইল। আমি তোমার এত গঞ্জনা সহিয়াও যা মনস্থ করিয়া রহিয়াছি সে কাযটি আর শেষ হইতেছে না।'

আমি—'তোর ও সব কথা আমি শুনিতে চাহিনা। আমি কাল যাইবই যাইব।'

মাতু—'তা যাও না। কিন্তু কালই যদি যাইতে হয় আমি সঙ্গে যাইতে পারিব না। আমি বরঞ্চ তোমার সঙ্গে একজন বিশ্বাসী লোক দেব সে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে—কেমন?'

মাতু আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি অবশ্য এরূপ বন্দোবস্তে সম্মত হইলাম না। তখন মাতু পুনরায় বলিল—'সকল দিকে গোল করিলে চলিবে কেন? যদি একান্ত কালই বাড়ী যাইবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, বেশ, আমি তাহার বন্দোবস্ত করে দিতেছি। তার পর দিন দুই পরে—দুদিন না হয় বড় জোর দিন তিনেক পরে—আমি গিয়া পৌঁছিব। আমি এতদিনের পর এখানে আসিয়াছি। গেলে আর আমি কি শীঘ্র আসিতে পারিব?'

আমি—'কেন, কি কাযে তুই এত ব্যস্ত?'

মাতু—'কথাটা কি শুনিবে? আমি একজনের কাছে গোটা কতক টাকা পাব। আজ চার পাঁচ বছর হল টাকা কয়েকটি ধার দিয়ে না পাই আসল—না পাই এক পয়সা সুদ। আর পাইবই যা

কেমন করে? আমি থাকি এক জায়গায়, সে থাকে অন্য জায়গায়; এতে কি আর আদায় হয়ে থাকে? এখন সে বলছে যে কিছু বাদ সাদ দিয়ে দিন দুয়ের মধ্যে সব চুকিয়ে দেবে। এখন তোমার বিবেচনায় যা ভাল হয় তাই কর। তোমাদের কি? দশবিশ টাকা গেলে ও যা থাক্‌লেও তা; কিন্তু আমরা গরিব মানুষ এক পয়সায় মরি বাঁচি। লক্ষ্মী যাদের উপরে সদয় তারা ভাবে সকলেই যেন তাদের মত। গরিবের দুঃখ গরিব না হলে বোঝে না।'

মাতু শেষ কথাগুলি এমন করুণস্বরে বলিল যে বিরাগ সত্ত্বেও তাহার জন্য আমার দুঃখ হইতে লাগিল। আমি অগত্যা তাহার কথায় সম্মত হইলাম—জালটি বেশ করিয়া জড়াইয়া আপনার হাত পা আপনি বাঁধিলাম। তখন স্থির হইল যে পূর্ব্বে না হউক অন্ততঃ চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে আমরা যাত্রা করিব, ইহার আর কোন অন্যথা হইবে না। মাতু সন্তুষ্ট হইল ও হাসিতে হাসিতে গ্রীবাভঙ্গি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন, এখন রাগ পড়িয়াছে?' আমি একটু হাসিয়া ফেলিলাম, এবং কোন উত্তর না দিয়া শয়ন করিতে উঠিলাম।

শ্যাম—

শতবর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ।

১

উদ্দেশ্য।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ যেরূপ ছিল, এখন আর তেমন নাই; আজ বাঙ্গালা নূতন বেশভূষা পরিয়াছে, দিন দিন বঙ্গদেশের শ্রীছাঁদ ফিরিয়া যাইতেছে। শতবর্ষ পূর্ব্বের লোক ফিরিয়া আসিলে বাঙ্গালাকে দেখিয়া আর আপনাদের দেশ বলিয়া চিনিতে পারিবেন না।

বাঙ্গালার যদি এত পরিবর্ত্তন হইতেছে, তবে এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দেশ ভাল হইতেছে না মন্দ হইতেছে? এবং আমরা নিজে ভাল হইতেছি না জন্মের মত অধঃপাতে যাইতেছি? এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে হইলে পূর্ব্বাপর অবস্থার তুলনা করা চাই। তুলনা না করিলে আমরা অবস্থার উৎকর্ষাপকর্ষ বুঝিতে পারিব না। ব্যবসায়ীরা আয় ব্যয়ের হিসাব লিখিয়া রাখেন, আয় ব্যয় দেখিয়া তাঁহারা বাণিজ্যের লাভালাভ নিশ্চিত করেন। ইতিহাস জাতীয় উন্নতি অবনতির সেই আয় ব্যয়ের হিসাব। শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ

ও বাঙ্গালীর সমাজ কেমন ছিল, আমরা নিজে আমাদের জমার ঘরে বাকি কাটিয়া, স্পষ্ট লাভালাভ বুঝিতে পারিব।

আমাদের পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে এখনকার সমাজের তুলনা করিতে হইলেই বিপদ। এক শত বৎসর আগে এই বাঙ্গালাদেশ ছিল; সেই গঙ্গা এই,—বর্ষাকাল আসিলে দু-কূল ডুবাইয়া কল কল শব্দে সাগরের দিকে আজও ছুটিয়া চলিতেছে। সেই খাল বিল পুষ্করিণী, সেই শস্যক্ষেত্র; অদ্যাপি তখনকার সকলিই আছে—নাই কেবল পূর্ব্বের ইতিহাস। ইতিহাস নাই বলিয়া আমরা শত বৎসর আগে কি ছিলাম এখনকার সঙ্গে তাহার তুলনা করিতে পারি না। অনেকে বলিবেন, পলাশীর যুদ্ধ রহিয়াছে, অন্ধকূপের দারুণ জলতৃষ্ণার যন্ত্রণাও আছে, এই সকল ত বঙ্গের পূর্ব্ব ইতিহাস। তাহাই দেখিয়া কেন বঙ্গের পূর্ব্বাবস্থা নিশ্চিত কর না? যাঁহারা এমন বিশ্বাস করেন সে সকল লোক অতিশয় ভ্রান্ত। পলাশীর যুদ্ধ বাঙ্গালায় ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালীর সম্পর্ক নাই; সে কেবল অন্য জাতির সাংসারিক সুখ-স্বপ্নের গল্প—তাহাতে ইংরাজদের অভ্যুত্থানের কথা। মুসলমান সম্রাটের প্রভুত্বের দিন ফুরাইল, সৌভাগ্যলক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে ইংরাজজাতিকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিলেন, এ সকল গল্পের ভিতর বাঙ্গালীর নাম প্রসঙ্গ অতি অল্পই আছে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের অদৃষ্ট নক্ষত্র আমাদের ভাবিভাগ্যফল আঁকিয়া দিল, ইংরাজজাতি বাঙ্গালায় বিজয়পতাকা পুতিয়া বসিলেন। এক শত বৎসরের অধিক হইল আমরা ইংরাজজাতির শাসনে থাকিয়া অনেক প্রকার সুখভোগ করিতেছি। কিন্তু কোন্ কোন্ বিষয়ে আমাদের দুঃখ ঘুচিয়া দিন দিন সুখ বাড়িতেছে, তুলনা ভিন্ন তাহা নিশ্চিত হইবে না। কিন্তু তুলনা একটীতে হয় না, দুইটীকে একত্র করিলে তবে তাহাদের তুলনা হয়। ১৭৫৭ সালকে ১৮৮৪ সালের কাছে বসাইতে হইবে তবে তাহাদের দোষ গুণ বুঝিতে পারিব। কোন্ দিন শান্তির কোলে শুইয়া আমাদের সুখের রাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি, কোন দিন ভয় ব্যাকুলতায় আমাদের দুঃখের নিশি জাগিয়া পোহাইয়াছে, তুলনা করিলে কঠিন সমস্যার মীমাংসা হইবে। কিন্তু বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস কৈ? নন্দকুমারের ফাঁসী প'ড়লে বাঙ্গালার ইতিহাস পড়া হয় না। নন্দকুমার বাঙ্গালী, কিন্তু নন্দকুমারকে লইয়া বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালীর সমাজ নহে। ক্লাইভের জালপত্র পড়িলেও আমরা বাঙ্গালা দেশের কিছুই জানিতে পারিব না। এক শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় কেহ একাধীশ্বর রাজা ছিলেন না, এই শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীরা কাহারও সিংহাসন কাড়িয়া লইতে যান নাই। শত বর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীর জীবন নিঃ-

শব্দে নীরবে ধীরে ধীরে বহিয়া গিয়াছে। অতএব প্রকৃত বাঙ্গালার ইতিহাস কেবল বাঙ্গালাদেশ, বঙ্গের শস্যাদি, বাণিজ্য, বাঙ্গালীর সমাজ, সামাজিক রীতি নীতি, আহার ব্যবহার, লোকলৌকতা, পথ ঘাট, ঘরদ্বার এবং বসনভূষণ ও সুখ ঐশ্বর্য্য লইয়া। বাঙ্গালীর চিত্তোন্নতি, আত্মমর্য্যাদা, জাতিবিপ্লব এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন, শতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী জীবনের এগুলি প্রধান পরিচ্ছেদ।

আমরা যত্ন করিয়া যে ইতিহাস লিখিতে যাইতেছি, আজি ইহার কেহই আদর করিবেন না। অষ্টপ্রহর যাহা দেখিতেছি, বাঙ্গালীর চক্ষে এখন তাহা নূতন লাগিবে না। কিন্তু আর এক শত বৎসর পরে এখনকার একটী একটী গল্প তৎকালের দুর্লভ বাক্য হইবে। ভাবিয়া দেখ, যে সময় ইংরাজেরা এ দেশে আসেন নাই, তখন সাধারণ বাঙ্গালীর অবস্থা কেমন ছিল। তখন ভদ্রলোকেরা কি খাইতেন, কি পরিতেন, কিরূপ ঘরে বাস করিতেন। বর্গীরা বাঙ্গালা দেশ লুঠ করিতে আসিলে বাঙ্গালীরা কি মেষের পালের মত ছুটিয়া পলাইতেন না অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মহারাষ্ট্রীয় শোণিতে বাঙ্গালার বুক ভাসাইয়া দিতেন? সে কালে ভদ্রলোকদের জীবিকার উপায় কি ছিল এবং ইতর লোকেরাই বা কি প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এ সকল গল্প শুনিতে এখন আমরা কত ভাল বাসি। কলিকাতা প্রভৃতি অনেক গুলি সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্ত্রী লোকেরা দিন দিন সভ্য হইতেছেন আর তাঁহারা পুষ্করিণী ও নদীর ঘাটে একবেলা ধরিয়া তেল হলুদ মাখেন না আর তাঁহারা রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া নত নাড়িতে নাড়িতে কন্দলের ধমকে পাড়া মাথায় করেন না। পূর্ব্বের মহিলাগণ মোমের পাটীর উপর সিন্দুর ছিটা দিয়া সাঁথা সাজাইতেন, ঘরে ঘরে আর এখন সে সব সাক্ষাৎ শীতলা দেবী দেখা যায় না। এ সকল তুচ্ছ কথা; কিন্তু তুচ্ছ হইলেও এখন আমরা এই সকল গল্পের কত আদর করিয়া থাকি। অদ্যাপি আমাদের সমাজে যে সমস্ত রীতি চলিয়া আসিতেছে, আর এক শত বৎসরের পর তাহার অনেক উঠিয়া যাইবে। কিন্তু কোনগুলি উঠিবে আর কোন গুলি থাকিবে; আর যে প্রকার ভাষায় এখন আমরা কথাবার্ত্তা কহিতেছি, তাহারই বা কেমন পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা আমরা এখন বলিতে পারি না। হয় ত এই ধুতিচাদর আর থাকিবে না, দর্জ্জির অদৃষ্টে দ্বাদশ বৃহস্পতির দশা ফলিবে—আমরা ধুতিচাদর ফেলিয়া ইজের কোট ধরিব, গৃহলক্ষ্মীদগকে গাউন পরিতে শিখাইব। বাঙ্গালীর জীবনের উপর দিয়া হয় ত এক নূতন স্রোত বহিয়া যাইবে, আমরা থালা কাঁসী ফেলিয়া প্লেটের গৌরব বাড়াইব। কিন্তু এখন যদি বাঙ্গালীকে

না আঁকিয়া রাখি, তবে একশত বৎসর পরে আমরা চতুর্ভুজ হইব কি এই দ্বিভুজ থাকিব তাহা কেহ জানিতে পারিবেন না। তাই যত্ন করিয়া আমাদের এখনকার সামাজিক ইতিহাস লিখিতেছি।

সেকালে বাঙ্গালাদেশ কেমন ছিল এবং সে সময়ে আমরাই বা কেমন ছিলাম, বৃদ্ধলোকদের মুখে এসকল গল্প যেমন শুনিয়াছি, আমাদের ইতিহাসে ঠিক সেইরূপ লিখিয়া রাখি। আমাদের বর্ত্তমানাবস্থা আমরা স্বচক্ষে যেমন দেখিতেছি, এ পুস্তকে তাহাই লিখিত হইবে এবং সম্প্রতি ভদ্রলোকেরা ঘরে বসিয়া সকলের সঙ্গে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন, ইতিহাসখানি আদ্যোপান্ত প্রায় সেই ভাষায় লিখিব। সুতরাং পাঠকেরা ছত্রে ছত্রে অনেক গ্রাম্য শব্দ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু শুনিতে কটু হইলেও ভাষার সে দোষ ত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। উত্তর কালে আমাদের ঘরাও চলিত বাঙ্গলা কথার নমুনা থাকিবে বলিয়া আমি এপ্রকার ভাষা পছন্দ করিয়াছি।

২

বাঙ্গালার পথ-ঘাট—পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা।

এখনকার ভূগোলে ও বঙ্গ-ইতিহাসে বাঙ্গালার সীমা আঁকিয়া রাখা হইয়াছে। কোটিযুগের বন্যাতেও সে সীমা ধুইয়া যাইবে না। কোন্ কোন্ নদ নদী বুকের উপর জলের স্রোতঃ লইয়া সাগরে গিয়া ঢালিয়া দিতেছে; কোথায় কোন্ গিরিমালা বঙ্গের উপর শরীর পাতিয়া পড়িয়া আছে, কোন্ কোন্ নগরে রাজপুরুষেরা ইন্দ্রপুরী নির্ম্মাণ করাইয়া সিংহাসনের শোভা বাড়াইতেন, বালকেরা ঘুমের ঘোরেও এসকল কথার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার পথ ঘাট, ঘর দ্বার, ভূমি পুষ্করিণী কেমন ছিল, সে কথা কোন বালকের মুখে শুনা যায় না।

বাঙ্গালায় চিরকাল যাহা একভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল যাহা একভাবেই চলিবে আমরা তেমন কথা ইতিহাসে লিখিয়া রাখিতে চাই না। কালের চক্রে পড়িয়া যাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আজি যাহা আছে দুই দিন পরে আর তেমন থাকিবে না, আমাদের ইতিহাসে তাহাই স্থান পাইবে। আমরা চন্দ্রমণ্ডলের হ্রাস বৃদ্ধি আঁকিয়া রাখিব, গঙ্গার জোয়ার ভাঁটার ছবি তুলিব—এ পুস্তকে ধ্রুব নক্ষত্রকে চিত্র করিব না। যাহার হ্রাস নাই, তাহার বৃদ্ধিও নাই; যাহার পতন নাই, তাহার অভ্যুত্থানও নাই,—নিশ্চল পদার্থ মানুষকে কিছুই শিখায় না।

আমরা যে সময় হইতে ইতিহাস আরম্ভ করিব, এক্ষণে সেই বাঙ্গালা আছে, কিন্তু তখনকার বাঙ্গালার যাহা

ছিল. এক্ষণে তাহার কিছুই নাই। সেই বাঙ্গালী আছে, কিন্তু তখনকার মত মনুষ্য নাই, সে সমাজও নাই। তত চোর ডাকাইত নাই, তেমন দুর্গম পথ ঘাট নাই। এখন দুইমাসের পথ দুই দিনে যাওয়া যায়। আর এখন প্রবাসে যাইতে দেখিলে সংসারসুখদুঃখের অর্দ্ধভাগিনী সীতার সিন্দুর মুছিয়া চক্ষুজলে মাটী ভিজাইতে বসেন না। এখন ছয়মাসের পথ ছয়দিনে গিয়া ঘুরিয়া আসিতে পার। যে দিকে যাইবে, প্রশস্ত পাকা রাস্তা হইয়াছে, রাস্তার দুইধারে নানা দেশীয় সৌখীন গাছ বসিয়াছে। কোনখানে পথিককে রৌদ্র লাগে না, বৃক্ষশ্রেণী পত্রপল্লব মেলিয়া মাথার উপর ছত্র ধরিয়া আছে। স্থানে স্থানে পুষ্করিণী, কোথাও বড় বড় দীর্ঘিকা। চারিদিকে বাঁধা ঘাট, কোন কোন পুষ্করিণীতে গজগিরি; ঘাটের পাশে বিলাতী ফুলের কেয়ারী দশদিক্ আলো করিয়া আছে। যে দিকে যাইবে সেই দিকেই মাকড়শার জালের মত লৌহরাস্তা ঘিরিয়া আছে, তাহার উপর কলের গাড়ী ছুটা ছুটি করিতেছে। আর ঠেঙ্গাড়িয়ারা লাঠী হাতে করিয়া ঝোপের আড়ালে, নদীর ধারে দাঁড়াইয়া থাকে না, এখন পথিকের বিপদের শঙ্কা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

কিন্তু শত বৎসর আগে এমন বাঙ্গালা ছিল না। তখন এক গ্রাম হইতে নিকটবর্ত্তী অন্যগ্রামে যাইতে হইলে পৃথিবী পর্য্যটনের ফল একবেলায় ফলিয়া যাইত। কোথাও সুগম পথ ছিল না; ভূমির আলী দিয়া, খালের ভিতর দিয়া, ঢিপীর উপর চড়িয়া যাতায়াত করিতে হইত। বর্ষাকালে নদীর কথা কি, গ্রামের ভিতরও স্রোতঃ বহিয়া যাইত। ছেলেরা ঝুপ ঝাপ করিয়া সমস্ত বেলা জলে ঝাঁপাইত, কাদা মাখিত, পাঁক ঘাঁটিত। প্রবীণেরা আড়া দিয়া, ঘনি পাতিয়া মাছ ধরিতেন। সে কালে বড় একটা জুতার চলন ছিল না। যাঁহারা জুতা পরিতেন, শীত গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা শরৎ নাই, চলিবার সময় জুতা তাঁহাদের হাতে চলিত। পাদুকা পরিধানের অভ্যাস ছিল না, তাই জুতা পায় দিয়া তাঁহারা পথ হাঁটিতে পারিতেন না। যাঁহাদের অভ্যাস ছিল, সে সকল লোক তখনকার লক্ষ্মীদেবীর বরপুত্র—মাটীতে তাঁহাদের পা পড়িত না, তাঁহারা পাল্কী সুখাসন ও তাঞ্জামে ফিরিতেন। বড় মানুষেরা যে পথে চলিতেন, সেখানে কতক কতক সুগম পথও নির্ম্মাণ করা হইত। অতএব সে সময়ের এত জলকাদায় কাহারও জুতা ভিজিবার আশঙ্কা ছিল না।

বর্ষা ফুরাইল; ক্ষেত্রের ধারে ধারে কাশ কুসুমের চামর ফুটিয়া দুলিতে লাগিল। জল ভরা নিবিড় মেঘ পরিষ্কার হইয়া গেল, নির্ম্মলাকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা লঘু মেঘের কোলে নানা প্রকার রঙ্ ফলিল। সূর্য্যকিরণ আবার প্রখর

হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনও গ্রামের জলকাদা শুকাইল না। যেখানে একটু খাল ডোবা পাইয়াছে, সেই খানেই জল ভরিয়া আছে। শীতের টান না পাইলে পল্লীগ্রামের জলকাদা ভাল করিয়া শুকাইত না।

এক শত বৎসরের উপর হইল আমরা ইংরাজদিগের পদপদ্ধতিতে পা দিয়া দিয়া চলিয়া আসিতেছি, মস্তক ঘামাইয়া ইংরাজদের দাগে দাগ বুলাইয়া সভ্যতা শিখিতেছি, কিন্তু এখনও সকল গ্রামের সংস্কার করিয়া উঠিতে পারি নাই। এক শত বৎসর আগে যেমন জল কাদা হইত, অনেক গ্রামে এখনও সেইরূপ হইয়া থাকে। এক শত গ্রামের মধ্যে নিরানব্বই খানির অবস্থা যথাপূর্ব্ব তথা পর, তাহাদের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। পল্লীগ্রামের অবস্থা ফিরিবার পথে অনেক বাধা আসিয়া পড়িয়াছে। সকলই অর্থের খেলা, অর্থব্যয় না করিতে পারিলে কোন বিষয়ের উন্নতি হয় না। কিন্তু বাস্তুভূমিতে বাস করা এ যুগের অর্থবান ব্যক্তিদের কোষ্ঠীতে লেখা নাই। বিষয় কর্ম্মের উপলক্ষে অনেকে বিদেশে গিয়া বিষ্ণুমায়ায় ঠেকিয়াছেন, সে মায়া কাটাইয়া পৈতৃক বাসে আসিতে চাহেন না। যাহারা অকর্ম্মা অপদার্থ, তাহারাই পৈতৃক ভিটায় পড়িয়া আছে। অকর্ম্মা অপদার্থ লোক হইতে কি হয়? সুতরাং পল্লীগ্রামের আর শ্রী নাই,—আছে জঙ্গল আর জ্বর; মানুষের মধ্যে কতকগুলি অমানুষ।

নিজের উন্নতি নিজের কাছে। পরের মুখ চাহিয়া থাকিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। দিনামারেরা নিজের যত্নে উচ্চ প্রাচীর গাঁথিয়া সাগরের বেগ ফিরাইয়া রাখিয়াছেন। বাঙ্গালীর বীরত্ব গোষ্পদের কাছে। লাখুরের জল বাঁধিয়া রাখিতে বাঙ্গালীরা মূর্ত্তিমন্ত। বর্ষাকালে অনেক নদ নদী বঙ্গদেশ ধুইয়া লইয়া যায়, কাহারও এমন শক্তি হয় না যে বাঁধ দিয়া জলস্রোতঃ বন্ধ করে। দশ বল সিংহ, দশজন মিলিয়া কাজ করিলে কিছুই আটকায় না। কিন্তু বাঙ্গালীর দশমন এক ঠাঁই হয় না, দশমন দশ দিকে ছুটিতে থাকে। প্রতি বৎসর বন্যায় গ্রাম ফসল গো মেষ সকলিই ভাসিয়া যায়, বাঙ্গালীর প্রাণ তাহা সহ্য করিতে পারে, কিন্তু আপনাদের স্বত্ব রক্ষার জন্য কায়িক পরিশ্রম সহ্য করিতে পারে না। ক্ষেত্রের কাজ সারিয়া অবকাশ পাইলেই সকলে মিলিয়া কিছু কিছু বাঁধ নির্ম্মাণ করিলে চলে, কিন্তু সাজার কাজ পাষাণ সমান ভারী, সহস্র লাভেও সাজার কাজে লোকের প্রবৃত্তি হয় না।

পূর্ব্বে যেমন বর্ষা হইত আর এখন তত হয় না। আমরাই বালককালের কথা মনে করিলে বর্ষার অনেক লাঘব বুঝিতে পারি। বর্ষাকাল আসিলে মাঠ বিল একাকার হইত, ধানের চারা জলের উপর অল্প অল্প জাগিতে থাকিত। গ্রামের পথ ঘাট ডুবিয়া যাইত, পুষ্করিণী উথলিয়া উঠিত। এখন শতবর্ষের ভরাট

পুকুরও জলে পরিপূর্ণ হয় না। সে জন্য গ্রামবাসিদের অতিশয় জলকষ্ট হইয়াছে।

বাঙ্গালার অনেক স্থানে স্নানের ও পানীয় জলের অতিশয় কষ্ট। জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যেখানে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানেই লোকের একটু সুখ ছিল; গ্রীষ্ম কালে গো বৎস ও মানুষে জল খাইতে পাইত। তদ্ভিন্ন সাধারণ গ্রামের লোকেরা জলাভাবে দারুণ কষ্টভোগ করিত। কোন কোন পল্লীতে এক একটী পুরাতন দীঘী আছে। তাহার অনেকগুলি এখন পঙ্কে পরিপূর্ণ। বার মাস প্রায় জল থাকে না। যখন জল থাকে, নিবিড় পদ্মবন গজাইয়া পত্রপুষ্পে জলাশয় ছাইয়া রাখে। কোথাও কোথাও জল পরিষ্কার থাকিলেও খাইতে সোদা লাগে, মানুষের ব্যবহারে আসে না। অভাবে তাহা পান করিলে পীড়া জন্মে। ঐ সকল পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প আছে। ধনবান্ লোকেরা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে বিদেশ যাইবার সময় এমন কুস্থানে আসিয়া পড়িলেন যে, তাহার দুই তিন ক্রোশের মধ্যে কোথাও জল মিলিল না। তৃষ্ণায় বুক ফাটিতেছে, লোক পাঠাইলেন, কত সন্ধান করাইলেন, কোথাও পুষ্করিণী নাই। গ্রামে কেবল ইতর লোকের বাস, তাহাদের জল অস্পৃশ্য, দুই তিন ক্রোশ হইতে জল আনাইলেন, তবে প্রাণ বাঁচিল। এই অধিক্ষেপে অনেক ধনী লোক স্থানে স্থানে এক একটী পুকুর কাটাইয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন। এখন মানুষ অনেক সভ্য হইয়াছে, সভ্য হইলেই মনের সক বাড়ে, তাই দেশী বিলাতী ফলের ফুলের বাগান হইতেছে। পুষ্করিণী না থাকিলে বাগানবাড়ীর শোভা হয় না, সে জন্য এখনকার ধনবান্ ব্যক্তিদের উদ্যানে পুষ্করিণী হইয়াছে, পুষ্করিণীর পাড়ে মকমলের মত দূর্ব্বাদল শয্যা বিছান। ঝাড় লণ্ঠন ও গৃহের ঙেচঙে দৃষ্টি খরিলে ধনী লোকেরা সবুজ তৃণের শোভা দেখিয়া চক্ষু জুড়ান, কঠিন পরিশ্রমে দরিদ্রদের কণ্ঠ ফাটিলে তাহারা জলপান করিয়া প্রাণ শীতল করে।

কিন্তু পুষ্করিণীর সক এখনও সকল গ্রামে যায় নাই। অনেক গ্রামে ধনী লোক আছেন, কিন্তু পুষ্করিণী নাই। গ্রীষ্ম আসিল, এক সূর্য্য দ্বাদশ হইয়া অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। পুরাতন জলাশয় শুষ্ক হইয়া আসিল, তখন কুল কামিনীরা কুম্ভ কাঁকে করিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। কলসী আর ডুবে না, দুই হাতে জল সেঁচিতে বসিলেন, পঙ্কিল জলে কুম্ভ পূরিয়া গৃহে আসিলেন। দুই চারি দিনে তাহাও শুকাইল, পাঁক ফাটিয়া চৌচীর হইল, গ্রামের মধ্যে কুত্রাপি আর জল নাই। যখন জল থাকে, সে কেবল জ্বর ও বিসূচিকার ঘর, তৃষ্ণার দায়ে লোক তাহাই

পান করে। যখন জল থাকে না, তখন রৌদ্রে পুড়িতে পুড়িতে সাত গ্রামের লোক এক ঠাঁই ছুটিতে থাকে, দুই তিন ক্রোশ হইতে কএক ঘড়া জল লইয়া গৃহে আসে।

কলিকাতার এত সুখসমৃদ্ধি, কিন্তু তেইশ চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে এখানেও অতিশয় জলকষ্ট ছিল। কূপের জল ঘোলা, বোদা ও লবণাক্ত, কাহার সাধ্য মুখে করে? লোকে তাহাতে থালা ঘটী বাটী মাজিত, আহারান্তে প্রাণ হাতে করিয়া দুই বেলা আঁচাইয়া লইত। যখন কল হয় নাই, কলিকাতায় পানীয় জল সাগরমন্থনের সুধার মত দুর্ল্লভ ছিল। ধনী লোকেরা বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে জালা পূরিয়া রাখিতেন। তাহাতে বার মাস চালাইতে হইত। একটা তপ্ত লৌহ জলে ছেঁকা দিয়া জালার মুখ কম্বলে বাঁধিয়া রাখিলে কোন প্রকার পোকা জন্মিত না। সাধারণ লোকের গৃহ সংকীর্ণ, বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার সুবিধা ছিল না, সুতরাং তাহারা গঙ্গার জল পান করিত। সে এক দিন গিয়াছে। উড়ে ভারীরা ভোরের বেলায় গঙ্গার ঘাটে কপাল জুড়িয়া অলকা কাটিত, জলের ভার কাঁধে লইয়া সমস্ত দিন পথে পথে ছুটা ছুটি করিত। তখন এক এক ভার জলের মূল্য এক আনা ছিল। আজি কালি কলের জল হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে দরিদ্র লোকের দুঃখ ঘুচে নাই। এক একটী সাধারণ পাইপে এককালে পঞ্চাশ ষাট জন লোক কুম্ভ হাতে দাঁড়াইয়া থাকে, জলের জন্য কত ঠেলা ঠেলি মারামারি হয়।

সহরের মায়া কাটাইয়া বন্য বৃক্ষ লতার শোভায় যে খানে ধনী লোকের মন টিকিয়াছে, সেই খানে পল্লীগ্রামগুলির কিছু কিছু শ্রী ফিরিতেছে; নূতন নূতন পথ ঘাটও হইতেছে। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন অদ্যাবধি কোথাও কোথাও পুরাতন পথের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভগ্ন শিবমন্দির, বৃদ্ধ বট অশ্বত্থের গাছ, ভরাট জলাশয় পথের ধারে ধারে পড়িয়া আছে। অনেক প্রাচীন হইয়াছে, ক্রমে একটু একটু করিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পথ কোথাও প্রশস্ত, তাহার দুই ধারে জঙ্গল গজাইয়াছে। কোনখানে সংকীর্ণ; কোথাও বসিয়া গিয়াছে, কোথাও গোচর হইয়াছে। কোথাও কৃষকের ক্ষেত্রের কাছে পড়িয়াছিল, সে কাটিয়া ভূমির পরিমাণ বাড়াইয়াছে। এ সকল মন্দির, বট অশ্বত্থের গাছ, দীঘী ও পথ অনেক দিনের কীর্ত্তি। পূর্ব্বে ধনী লোকেরা পথ বাঁধাইয়া তাহার দুই ধারে জলাশয়, বৃক্ষশ্রেণী এবং দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিতেন। আজও কত কালের সুকৃতির চিহ্ন রহিয়াছে। আর কেহ বড় একটা বট অশ্বত্থ নিম্ব বৃক্ষরোপণ করেন না; বাঙ্গালীর মন ক্রমেই ফিরিয়া যাইতেছে, এখন বিলাতী ঝাউ শিশু সেগুণে মন পড়িয়াছে। বৃক্ষের বরণ নাই, শঙ্খ

ঘণ্টা বাজাইয়া এখন বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার তেমন ঘটা দেখা যায় না। তখন গ্রীষ্ম পড়িলে সদর রাস্তার উপর বৃক্ষের ছায়ায় কত জলসত্র হইত। ইংরাজি পড়িয়া বাঙ্গালীরা সেব্রত উদ্যাপন করিয়াছেন।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

কণ্বমুনি ও প্রস্পেরো।

যদি কেহ কাব্যজগতে সূর্য্য ও চন্দ্র দেখিতে ইচ্ছা করেন, আমি অভিজ্ঞান শকুন্তলের কণ্বমুনি ও টেম্পেষ্টের (Tempest) প্রস্পেরোর (Prospero) নির্দ্দেশ করি। কালিদাসের কণ্বমুনি-চরিত্র—মনুষ্যহৃদয়ের মহত্ত্বের সৌন্দর্য্যময় চিত্র—কাব্যজগতে অতুলনীয়; যদি তুলনা সম্ভব হয় বোধকরি কেবলমাত্র মহাকবি সেক্ষপিয়রের প্রস্পেরোর সঙ্গে কিয়দংশ মাত্রে তুলনা সম্ভবে। উভয়েই বিশাল, মহান, জ্যোতির্ম্ময়। কিন্তু এক জনের জ্যোতিঃ বালার্ককিরণের ন্যায় উজ্জ্বল, তেজঃপূর্ণ, সহসা চাহিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়। আর একজনের আলোক শারদ-পূর্ণিমার সুধাংশুর ন্যায় কোমল, শীতল অথচ উজ্জ্বল। উভয়েরই অতুলসৌন্দর্য্যে, উজ্জ্বল আলোকে কাব্যজগৎ বিভাসিত। উভয়েই মনুষ্যজাতিকে অনন্তপ্রেম-শিক্ষা দিতেছে।

কালিদাস আমাদিগকে কণ্বমুনির সাক্ষাৎকারে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে অনেকগুলি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন, আমাদের হৃদয়কে সেই অতুল-গৌরবময় তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য যেন, প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। যেন আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় একেবারে এত সৌন্দর্য্য, এত মহত্ত্ব ধারণা করিতে পারিবে না। যেন সহসা আমাদের নয়ন এত আলোকরাশি সহিতে পারিবে না। তাই ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে এই জ্যোতির্ম্ময় চিত্রের অবতারণা করিলেন। যেমন অরুণোদয়ের পূর্ব্বে উষার মধুর হাস্যে বসুমতী প্রদীপ্ত হয়, মৃদু সমীরণ তপনের আবির্ভাব ঘোষণা করে, প্রফুল্ল-বদন উষাকুসুম ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ আমরা অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রথম অঙ্কে মহর্ষি কণ্বমুনিকে দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু তাঁহার পবিত্র আলোকে, তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতিতে সুখের আনন্দ, শান্তির নিকেতন তপোবন পুলকিত দেখিলাম। কণ্বমুনি বহুদূরে, তথাপি তাঁহার উজ্জ্বল আলোক আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিল! সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর দুষ্মন্ত কুলপতি কণ্বের একজন সামান্য শিষ্যের সন্দর্শনে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইলেন, তাঁহার বজ্রকঠিন, নিশিতনিপাত শর কার্ম্মুক-চ্যুত হইল! যাঁহার একজন সামান্য শিষ্যের এত তেজ, এত গৌরব, না জানি তিনি স্বয়ং কত উচ্চ, কত মহান্! যিনি

বীরদর্পে নিখিল ভুবনে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, ত্রিদিববাসী দেবগণ সমরপ্রাঙ্গণে যাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করেন, সেই বীর নরপতি আজি এই মহাযোগীর যোগবলশাসিত সাম্রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন! কাহাকেও বলিয়া দিতে হইল না, দূর হইতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, মহাযোগী রাজ্য বটে! যেন দেখিবামাত্রেই আপন ভুজবলশাসিত সাম্রাজ্যের সঙ্গে এই শান্তিপূর্ণ পাপকলুষশূন্য রাজ্যের প্রভেদ জ্ঞানে বিস্মিত, রোমাঞ্চিত হইয়া বলিলেন "দেখিতেছ না সারথে! সম্মুখে মহামুনির তপোবন!"

নীবারা শুক কোটরার্ভকমুখ

ভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ

প্রস্নিগ্ধা ক্ব চদিঙ্গুদীফলভিদঃ

সূচ্যন্ত প্রবালাঃ

বিশ্বাসোপসমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং

সহান্ত মৃগাঃ

স্তোয়াধার পথাশ্চ বল্কলশিখা

নিশ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ॥

সেই দূরবর্ত্তী সূর্য্যের মন্দীভূত প্রভা দুষ্মন্তের নয়ন বিমোহিত করিল! তিনি সসম্ভ্রমে রথ হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন "সারথে আমার রাজবেশ ও ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ কর, বিনীতবেশে তপোবনে প্রবেশ করি।" আজি কুরুকুলপ্রদীপ দুষ্মন্তের রাজগৌরব এই মহাযোগীর মহান্ প্রভাবে সম্পূর্ণ বিলীন!

নূতনের পর নূতন, সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে দুষ্মন্ত আশ্রমের মধ্যদেশে প্রবেশ করিলেন! কি দেখিলেন! বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! স্তম্ভিত, বিমোহিত হইয়া দেখিলেন স্বপ্নে যাহা কল্পনা করেন নাই, আপন অসীম রাজ্যমধ্যে যাহা কখনও দেখেন নাই, পবিত্রতার নিকেতন, সারল্যের জীবিত প্রতিমা, অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায়, অলূন কিশলয়ের ন্যায়, অনাস্বাদিতরস মধুর ন্যায়, অখণ্ড পুণ্যফলের ন্যায়, সুন্দর, সুকুমার পবিত্রতাময় রূপরাশি! কি প্রেমময় শান্তিময় রাজ্য! মহাকবি এখনও কণ্বমুনিকে রঙ্গভূমিতে আনেন নাই, কিন্তু আমরা তাঁহাকে না দেখিয়াই তাঁহার মহত্ত্বে, তাঁহার পবিত্রতাময় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলাম! এখনও তিনি দূরবর্ত্তী সোমতীর্থে অবস্থিত, তথাপি উষাকালে অনুদিত তপনের মধুর সুমন্দ আলোকের ন্যায়, তাঁহার তেজোরাশি আমাদের হৃদয় পুলকিত করিল। এরূপ মধুরতার দৃশ্য এরূপ সৌন্দর্য্য-ছবি আর কোথাও কি আছে? উত্তালতরঙ্গসমাকুল অসীম সাগরপার্শ্বে অই জনশূন্য ক্ষুদ্র দ্বীপে চাহিয়া দেখ, আর একটী এইরূপ সুন্দর চিত্র দেখিতে পাইবে! সে চিত্র অনেক অংশে অন্যরূপ হইলেও সৌন্দর্য্যে ইহা অপেক্ষা ন্যূন নহে!

সাগরসৈকতে বসিয়া একজন মহাপুরুষ সমুদ্রকে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে আদেশ করিলেন, অমনি ভীষণ-তরঙ্গ-সঙ্কালনে

জলধিহৃদয় আলোড়িত হইল, তরঙ্গকুল ঘোর রণে প্রবৃত্ত হইল! একখানি অসহায় তরণী জলমগ্নপ্রায়! আরোহিগণ প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহাদের সকরুণ হাহারব ঐ মহাপুরুষের পার্শ্ববর্ত্তিনী সরলা বালিকার কোমল হৃদয় স্পর্শ করিল। বালিকা কাতরপ্রাণে মহাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিল "পিতঃ! মিনতি করি সাগরকে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতে আদেশ করুন, ঐ আরোহিগণের উচ্চ চীৎকারে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইতেছে!" মহাপুরুষ হাস্য করিয়া বলিলেন বৎসে ভয় নাই, ক্ষান্ত হও, কাহারও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।"

"——Be collected
No more amazement, tell your piteous heart
There's no harm done"

সরলা বালিকা বুঝিতে পারিল না যে মহাপুরুষ কোন উচ্চ পবিত্র উদ্দেশ্য সাধন করিবার উদ্দেশে ক্ষণকালের জন্য অমানুষিক যোগবলে এ ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিলেন। আমরা প্রথম সন্দর্শনেই দেখিতে পাইলাম যে প্রস্পেরো কণ্বমুনির ন্যায় মহাশাস্ত্রদীক্ষিত মহাযোগে বলীয়ান, কণ্বের ন্যায় সংসারলালসা তৃণতুল্য অসার, প্রাকৃতিক শক্তি করতলগত, হৃদয়াভ্যস্ত, কণ্বের ন্যায় অনন্ত সুখের আশায় অনন্ত জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহায় বিমুগ্ধ। কিন্তু কণ্বমুনির ন্যায় উনি দীপ্তিমান তপনরশ্মিতে বিভাসিত নহেন। প্রস্পেরো নিদাঘ নিশীথের পূর্ণেন্দুর ন্যায় কোমলতাপূর্ণ রঙ্গশীল ও হাস্যময়! সহসা প্রস্পেরোকে দেখিয়া আমারা তাঁহার অতুল গরিমা, অসীম শক্তি ও অনুপম গাম্ভীর্য্য হৃদয়ে ধারণা করিতে না পারিয়া তাঁহার কৌতুকপ্রিয়, হাস্যশীল মূর্ত্তিতে মোহিত হই! গগনবিহারী কিন্নরকুমার এরিয়েল (Ariel) এবং অর্দ্ধেক মনুষ্য ও অর্দ্ধেক মৎস্যাকৃতি ক্যালিবান (Caliban) তাঁহার অবকাশ কালের সহচর! প্রস্পেরো রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া অবধি যেন নানা হাস্যকৌতুকে বিবিধ রঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন! মিরান্দাকে সান্ত্বনা করিয়া, তাহাকে ইন্দ্রজালপ্রভাবে সুষুপ্তির অঙ্কে শায়িত করিয়া, তিনি কিন্নরতনয় এরিয়েলকে শূন্যমার্গে আহ্বান করিয়া আজিকার কৌতুকাবহ তরণী নিমজ্জনবৃত্তান্ত বিবৃত করিতে আদেশ করিলেন! এরিয়েল সসম্ভ্রমে আজিকার আশ্চর্য্য ঘটনা সকল বিবৃত করিয়া বলিল "আমি তরণীর আরোহিগণের সঙ্গে নানা আশ্চর্য্য কৌতুক করিয়াছি, নানাবিধ বিপদের আশঙ্কায়, নানাবিধ নূতন ঘটনায় তাহাদিগকে ভীত, বিস্মিত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়াছি বটে, কিন্তু আপনার আদেশানুসারে কাহারও অণুমাত্র অনিষ্ট ঘটে নাই।"

"—Not a hair perished ;
On their sustaining garments not a blemish,
But fresher than before."

প্রস্পেরো হাস্য করিয়া কহিলেন "আজি তোকে আরও অনেক কৌতুক করিতে হইবে। যদি আজিকার কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিস আমি তোকে অনতি-বিলম্বে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিব?"

প্রস্পেরো কিন্নরকে কি আদেশ করিলেন?

"Go make thyself like a nymph of the sea
Be subject to no sight but thine and mine invisible
To every eyeball else. Go take this shape
And hither come in it: go, hence with diligence."

বিচিত্র মহাপুরুষের বিচিত্র আদেশ সম্পাদন করিবার জন্য কিন্নর গগনমার্গে প্রস্থান করিল। প্রস্পেরো তখন নিদ্রাভিভূতা বালিকাকে জাগাইয়া নূতন আমোদে প্রবৃত্ত হইলেন। সরলা, মুগ্ধা বালিকার সম্মুখে বিকট-মূর্ত্তি ক্যালি-বানকে (Caliban) আহ্বান করিয়া তাহার সঙ্গে কল্পিত ক্রোধে নানাবিধ রঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতেও বৃদ্ধের যেন পরিতৃপ্তি জন্মাইল না। বৃদ্ধ প্রস্পেরো যেন নূতন আমোদ নূতন কৌতুক না হইলে এক দণ্ড থাকিতে পারে না! অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি-বলে নেপল্‌সের সুন্দর যুবরাজ ফারডি-ন্যাণ্ডকে (Ferdinand) সারলাপ্রতিমা মুগ্ধা কুমারীর সম্মুখে একাকী উপস্থিত করিলেন। ফারডিন্যাণ্ড অননুভবনীয় দৈবশক্তিবলে, সাগরগর্ভে নিমজ্জিত তরণী হইতে, ভীষণবাত্যাসমাকুল তরঙ্গ-রাশির মধ্য হইতে অকস্মাৎ এই বিজন দ্বীপে, অপূর্ব্বমূর্ত্তি দেবীসমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিস্মিত ও জ্ঞানশূন্য। বালিকাও বিস্ময়সাগরে নিমগ্না! সেই সাগর-বেষ্টিত বিজন দ্বীপে সে বিকটমূর্ত্তি রাক্ষসীকুমার ক্যালিবান বই কখনও মনুষ্য দেখে নাই! সহসা সম্মুখে এক পরমসুন্দর রাজকুমারের দেবেন্দ্রনিন্দিত মূর্ত্তি আবির্ভূত! কি সুন্দর রহস্য। কি মনোরম কৌতুক! এ কৌতুক মহাপুরুষ প্রস্পেরোর উপযুক্ত বটে! যিনি এই মাত্র যোগবলে অসীম সাগরহৃদয়ে ভীম-পরাক্রম উর্ম্মিরাশির সফেণ আস্ফালনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি সরলা কুমারীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে সহসা প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হইলে কেমন দেখায়, তাহাই দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বালিকা চমকিত হইয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখ পিতঃ, কি সুন্দর দেবমূর্ত্তি!"

"—What is it? A spirit!
Lord how it looks about! Believe me Sir!
It carries a brave form. But it is a spirit!

এ আশ্চর্য্য কৌতুকে মনে মনে হাস্য করিয়া প্রস্পেরো কহিলেন "যাহা মনে করিয়াছিলাম ঠিক তাহাই হইতেছে।"

"It goes on, I see as my soul prompts it."

রঙ্গশীল বৃদ্ধ তখন যেন সেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ বালক বালিকার দুইটী ক্ষুদ্র হৃদয়

লইয়া ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বালিকার প্রভাতপ্রসূনের ন্যায় সুকুমার হৃদয় কত সুন্দর, যেন তাহা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, রাজকুমার ফার্ডিন্যাণ্ডের কোমল প্রাণ সে হৃদয়ের কতদূর উপযোগী যেন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কল্পিত রোষে বালকবালিকার সঙ্গে নানাবিধ রঙ্গ করিতে লাগিলেন। মমতার মোহন ছবি, পবিত্রতার জীবিত মূর্ত্তি, মিরান্দার স্ফুটনোন্মুখ প্রেমকলিকার যেন পূর্ণ আঘ্রাণ পাইবার জন্য প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে, ভ্রূকুটীকুটিল নয়নে ফারডিন্যাণ্ডকে নানা ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—

"—Follow me.
"Speak not you for him. He is a traitor come.
I will manacle thy neck and feet together,
Seawater shall be thy drink, thy food shall be
The fresh-brook muscles, withered roots, and husks."

যুবরাজ ফারডিন্যাণ্ডকে মিরান্দার সাক্ষাৎকারে কাষ্ঠভার বহন করিতে আদেশ করিয়া, নিজে অলক্ষিত থাকিয়া, প্রেমমুগ্ধ সরল যুবকের ও মমতাময়ী ব্যথিতপ্রাণা যুবতীর প্রাণের বিকাশ, প্রেমের স্ফূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। আজি এই মহাপুরুষ এ বালুকাময়, জনশূন্য সাগরসৈকতে যে শীতল পবিত্র প্রস্রবণের সৃষ্টি করিলেন, বিধাতার অসীম সৃষ্টিমধ্যে আর কোথাও এরূপ সুন্দর প্রস্রবণ আছে কি না জানি না। বিচিত্র নহে যে মহাপুরুষ নিজের সৃষ্ট সৌন্দর্য্যে নিজে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—

"——— My rejoicing
at nothing can be more."

প্রস্পেরোর কৌতুকাবহ জীবনের রঙ্গময় প্রীতিময় অভিনয় চলিতে লাগিল। তিনি কখনও সেই নির্জ্জন শব্দশূন্য সাগরসৈকত শূন্যবিহারী কিন্নরগণের ললিততানে প্রতিধ্বনিত করিয়া, কখনও বিচিত্র ইন্দ্রজালে নেপল্‌সরাজ ও তাঁহার সহচরগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া, কখনও অলৌকিক মানসিক শক্তি বলে বিশ্বাসঘাতক (Alonso) আলন্‌সো ও সিবাষ্টিয়ানের (Sebastian) পাপ অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া সেই বালুকাময় বিজন দ্বীপ রহস্যের উৎসে প্রীতি-প্রস্রবণে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। সরলা বালিকা মিরান্দা ও স্বভাবসুন্দর যুবক ফারডিনাণ্ডের কৌতুকাবহ পরীক্ষা শেষ করিয়া, অপূর্ব্ব ঘটকালীর পরিচয় দিয়া উভয়কে পরিণীত করিলেন। সেই প্রীতিময় পরিণয়ে ভাব, সেই সৌন্দর্য্যময় বরকন্যা, সমীরহৃদয় হইতে উদ্ভূত, সাগরোর্ম্মি হইতে উত্থিত, প্রেতলোক হইতে নিমন্ত্রিত কন্যাযাত্রী সমূহ পরিবৃত। সেই বিচিত্র-বাসরঘর জীবনয়নের অদৃশ্য অপ্সরীগণের কণ্ঠগীতিতে, চর্ম্মচক্ষুর অগোচর কিন্নরীগণের মনোমোহন নূপুরধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত! সেই প্রীতিপুলকিত

বিস্ময়বিমুগ্ধ নব দম্পতী অমরগণের আকাশবাণীতে, মধুরশব্দময় অমানুষিক আশীর্ব্বাদে স্তম্ভিত! আশ্চর্য্য বিবাহ-সভা! অপূর্ব্ব বাসরঘর! আমরা প্রথম সন্দর্শনে প্রস্পেরোকে এইরূপ রঙ্গপ্রিয় হাস্যশীল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেখিতে পাই। কিন্তু যখন ভাল করিয়া এ সৌন্দর্য্যরাশি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি, মনোনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখি, তখন এ মহচ্চরিত্রের মহৎ গাম্ভীর্য্যে মোহিত হই, প্রস্পেরোর আর এক প্রকার মহিমাপূর্ণ গৌরবময় রূপ অবলোকন করিয়া বিস্মিত হই। তাঁহার প্রতি কথায় অনুপম শান্তিরসের উচ্ছ্বাস, প্রতি অভিনয়ে উন্নত নীতিতত্ত্বের অবতারণা দেখিয়া চমকিত হই। ঐ যে নিদাঘ-নিশীথের পূর্ণশশী নিশার নিরাশ প্রাণে সুধা বর্ষণ করিতেছে, ফুল্লমুখী কুসুমদলের সঙ্গে রঙ্গ করিতেছে, মধুর হাস্যে মুগ্ধপ্রাণা চকোরীকে মাতাইয়া তুলিতেছে, ভাল করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে ঐ হাস্যময় চন্দ্রিমাবদনে কি অতুলনীয় গাম্ভীর্য্য! কি অনির্ব্বচনীয় প্রেমরাশি! তুলনা করিয়া বল, প্রস্পেরো ঠিক ঐরূপ গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্যে বিভাসিত কি না! আমরা এই মহাকাব্য অধ্যয়নকালে বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে মহাপুরুষ প্রস্পেরো মহামন্ত্র বলে যে সকল রঙ্গময়ী প্রবাহিনী সমূহের সৃষ্টি করিলেন, তাহারা অবশেষে একে একে মহাসমুদ্রে বিলীন হইল! সে মহাসমুদ্র অনন্ত অসীম বিশ্ববিকীর্ণ প্রেম!

এই দুর্লভ প্রেমতত্ত্ব কণ্ব ও প্রস্পেরো-চরিত্রের জীবন। কণ্বমুনি বিষয়-বাসনাশূন্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। তিনি সংসারাভিলাষ, ইন্দ্রিয়লালসা চরণতলে দলিত করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার হৃদয় অনন্ত প্রেমের সাগরে ভাসিতেছে। তাঁহার পুণ্যময় তপোবনে প্রবেশ করিয়াই সে প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে সে প্রেম সহস্র ধারায় প্রবাহিত। কুসুমলতা, মাধবী-বৃক্ষ, সহকারতরু হরিণশিশু যাঁহার প্রাণের প্রিয়, আদরের বস্তু, সজীব নির্জীব সকল পদার্থই যিনি প্রীতিপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করেন, অতি যত্নে প্রতিপালন করেন, আজি তাঁহার প্রিয়তমা পালিত-কন্যা পবিত্রতাময়ী শকুন্তলা সকলকে ছাড়িয়া সকলকে কাঁদাইয়া ভর্তৃভবনে যাইতেছে। কণ্বমুনি মুখে বলিতেছেন "আজি আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, কেননা শকুন্তলা চূতবৃক্ষকণ্ঠে নবমালিকার ন্যায় উপযুক্ত বরপাত্রে অর্পিত হইল", কিন্তু বাস্তবিক তিনি আজি বাষ্পাকুল লোচনে রুদ্ধকণ্ঠে মনে মনে বলিতেছেন—

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তা জড়ং দর্শনং।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদ্‌-বনৌকসঃ

পীড়্যন্তে গৃহিণঃ কথং ন তনয়া বিশ্লেষ দুঃখৈর্নবৈঃ”

মহাপ্রেমময় মহাযোগী আজি বিস্মিত-হৃদয়ে ভাবিতেছেন না জানি গৃহস্থ ব্যক্তিগণ তনয়াকে ভর্ত্তৃভবনে পাঠাইবার সময় কেমন করিয়া এ অসহ্য যাতনা সহ্য করে, ক্ষুব্ধচিত্তে চিন্তা করিতেছেন শকুন্তলাবিরহে এ শান্তিময় আশ্রমের দশা কি হইবে! শকুন্তলা তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে! কেবল এই একমাত্র ক্লেশে আজি তাঁহার হৃদয়-সাগর ক্ষুব্ধ নহে। তাঁহার ভাবনা সকলের জন্য! তিনি যেন ভাবিতেছেন আমার নিজের বিষাদ-অন্ধকার অসীম প্রেমের আলোকে বিলীন করিতে পারিব। কিন্তু আর সকলে পারিবে কি? তিনি কখনও শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের দিকে সন্দিগ্ধ নয়নে চাহিয়া বলেন “ভাবিলে কি হইবে শকুন্তলাকে যাইতেই হইবে। ‘বৎসৌ! ভগিন্যাঃ পন্থানমাদেশয়তাম্!’ কখনও অনুসূয়া প্রিয়ম্বদার দিকে ছল ছল নয়নে দেখিয়া বলেন “তোমরাই যদি কাঁদিবে তবে শকুন্তলাকে সান্ত্বনা কে করিবে?” “অনুসূয়ে প্রিয়ম্বদে! অলং রুদিত্বা ননু ভবতীভ্যামেব স্থিরা কর্ত্তব্যা শকুন্তলা।” কখনও যেন গৌতমীর শোক নিবারণ করিবার জন্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন “শকুন্তলা পতিগৃহে গিয়া কিরূপ আচরণ করিবে বলিয়া দাও।” “গৌতমী বা কিং মন্যতে”

কখনও শোকস্তব্ধ তপোবনশোভী তরুলতাগণের কাতরতায় সন্তপ্ত হইয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য বলেন “আশ্রমশোভী তরুগণ, যে স্নেহময়ী শকুন্তলা তোমাদিগকে প্রাণের সহিত আদর করে, যে তোমাদিগকে জলসেচন না করিয়া নিজে কখনও বারিবিন্দু পান করিত না, পাছে তোমরা ব্যথা পাও এই ভয়ে যে কখনও দেহ-মণ্ডনের জন্য তোমাদের একটীও পল্লব ছিন্ন করিত না, তোমরা কুসুমাভরণে শোভিত হইলে যাহার উৎসবের দিন উপস্থিত হইত, আজি সেই শকুন্তলা তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, তোমরা হৃষ্টচিত্তে আশীর্ব্বাদ কর।”

“ভো ভো সন্নিহিতবনদেবতাস্তপোবন-
তরবঃ!
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্ব-
সিক্তেষু
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা
পল্লবং
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভব-
ত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈর-
নুজ্ঞায়তাম্।”

কখনও শকুন্তলার পালিত প্রিয় হরিণশিশু তাহার বসনাগ্র আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া যেন মৃগশিশুর ব্যথায় কাতর হইয়া বলেন “হায় বৎসে! তুমি যে মৃগশিশুর মুখে একটি কুশাঙ্কুর বিঁধিলে আদর করিয়া তৈল নিষেক

করিতে, যাহাকে এত কাল কোমল তৃণ ভক্ষণ করাইয়া কত যত্নে মাতার ন্যায় লালন করিয়াছিলেন সে যে আজি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে চায় না।”

“যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোহণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকো জহাতি
সোহয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে।”

কি অনন্তসৌন্দর্য্যময় প্রেম! বুঝি এই খানে জগতের কবিকুলের শিরোমণি সেক্ষপিয়র ভারতীয় কবিকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন! যিনি আশৈশব সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত, সংসারের অপবিত্র ছায়া যাঁহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই, প্রকৃতি যাঁহার আজ্ঞাবহ, পদানত, আজি সেই মহাযোগীর হৃদয়ে প্রেমের উৎস সহস্র প্রবাহে উচ্ছ্বসিত! সেই প্রেমবলে আজি তিনি সংসারানভিজ্ঞ সন্ন্যাসী হইয়া, বহুদর্শী সংসারীর ন্যায় শকুন্তলাকে পতিগৃহে কিরূপে সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিতে সক্ষম হইতেছেন। সেই অসীম শক্তিতে আজি তিনি নির্জীব জড়পদার্থকে সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিতেছেন। সেই প্রেমের শক্তিতে আবার নিজে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রোরুদ্যমানা কাতরপ্রাণা তনয়ার দিকে সজল নয়নে চাহিয়া বলিতেছেন “শকুন্তলা! তুমি আমাকেও কি কাঁদাইবে। তুমি চলিয়া গেলে আমার আশ্রমপার্শ্বে যে তরুরাজি রোপণ করিয়াছ তাহাদিগকে দেখিয়া আমি কেমন করিয়া শোক সম্বরণ করিব।”

“বৎসে! মামেবং জড়ীকরোষি? শমমেষ্যতি মে শোকঃ কথং নু বৎসে! ত্বয়া রচিতপূর্ব্বং উটজদ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ।”

আবার অসীম প্রেমশক্তিতে অসীম সুখে বলিতেছেন।

জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।

এই প্রেমবলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি প্রস্পেরো অগণ্য দাসদাসী পরিবৃত, অশেষ সম্পদপূর্ণ রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া বালুকাময় জনশূন্য সমুদ্রতীর, একমাত্র কন্যাসঙ্গে কেবল মাত্র জ্ঞানভাণ্ডার গ্রন্থরাশি লইয়া, সুখের সদন দেব নিকেতন করিয়া তুলিয়াছেন, গগনবাসী কিন্নরগণকে, সাগরতরঙ্গবিহারী প্রেতগণকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছেন, বিশ্বাসঘাতক সিবাষ্টিয়ান (Sebastian) এণ্টোনিয়কে (Antonio) এই অসীম প্রেমের জীবিত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে বিস্ময়নীরে নিমগ্ন করিতেছেন। বিষয়বাসনালোলুপ কঠোরহৃদয় সংসারি! যদি তোমার মরুময় তাপিত জীবন সুখের সলিলপ্রবাহে শীতল করিতে চাও তবে এই মহাহৃদয় মহাযোগীদ্বয়ের নিকট, এই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যুগলের নিকট, এই কল্পনাজগতের চন্দ্রসূর্য্যের নিকট প্রেম শিক্ষা কর।

কণ্বমুনি ও প্রস্পেরো চরিত্রের এ মহৎ প্রেমতত্ত্ব আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় সহসা ধারণ করিতে পারে না। কণ্বমুনির নিদাঘ তপনের প্রখর প্রভায় দৃষ্টিহীন হইয়া তাঁহার অভ্যন্তরস্থ অমৃতময় প্রেম সহসা দেখিতে পাই না। প্রস্পেরোর কৌতুকময় শুধাংশুমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রকৃতিগত অসীম প্রেম সহসা আত্মগত করিতে সমর্থ হই না। সেই জন্যই ফারডিনাণ্ড আপন পরীক্ষা কালে প্রস্পেরোর প্রকৃতি বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন—

“— Oh! she is

Ten times more gentle than her father's crabbed
And he is composed of rashness."

সেই জন্যই রাজচক্রবর্ত্তী দুষ্মন্ত প্রথমে বলিয়াছিলেন—

"অহো! অসাধুদর্শী খলু ভগবান্ কণ্বঃ।
য ইমামশ্রমধর্ম্মে নিযুঙ্‌ক্তে।
ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপু
স্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষি ব্যবস্থতি।"

ক্রমশঃ।

পরিব্রাজক।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কৃষক-বালা*—এখানি পদ্যময়-আখ্যায়িকা। পশ্চিম ভারতে ভারত-বর্ষীয়দিগের প্রতি পোর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচার অবলম্বনে রচিত। "কৃষক নগরে" কয়েক ঘর কৃষক সুখ-স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে, কৃষক-বালা চারুশীলার সহিত যোগীশের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির, এমন সময়ে পোর্ত্তুগীজ-গণ এক হস্তে বাইবেল ও একহস্তে কৃপাণ লইয়া কৃষক নগরে উপস্থিত; অধি-বাসিগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় তাহারা নগর ছার খার করিল। অধিবাসিগণ কে কোথায় পলাইল ঠিক রহিল না। চারু যোগিনীবেশে যোগীশের সন্ধানে দেশে দেশে ফিরিতে লাগিল। এদিকে যোগীশ পাগল হইয়া নিষাদরূপ ধারণ করিয়া বনে বনে বিচরণ করে। চারি বৎসর পরে চারু যোগীশের দেখা পাইল—তখন যোগীশ মুমূর্ষু;—বিরহের পর সাক্ষাৎ-জনিত আবেগে যোগীশ তৎক্ষণাৎ গতাসু হইল; চারু চিতা রচনা করিয়া সহমরণে গেল। এই সরল আখ্যায়িকাটী অবলম্বন করিয়া কৃষক-বালা রচিত, ইহার স্থানে স্থানে কবিতাগুলি বেশ সুন্দর। নমুনা স্বরূপ দুই একটি উদ্ধৃত করিলাম—

"আমায় নিরখি চারু বাসিলেক লাজ,
হেসে না কহিল বাণী
নোমিয়া বদনখানি
মাটীর পুতুল হেন করিল বিরাজ।"

"নীরব শিখর সানু, নীরব অচল
নড়ে না একটি পাতা তরুবর শিরে
রজনীর গভীরতা ভাঙ্গিছে কেবল
যামে যামে যামঘোষ ফুকারি গভীরে।"

"দাও উলু যত বনবিহঙ্গিনি;
সুখে কুলু কুলু গাওলো তটিনি!

* কৃষকবালা। অভিনব গীতিকাব্য। ইংলণ্ড-গমন-প্রয়াসি ভিক্ষার্থি-বিরচিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা জিসি বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ।৹ আট আনা।

বরষ বিটপ, কুসুম আসার,
ছড়াও পবন, সুরভির ভার,
চাওলো হরিণি,
নাচলো শিখিনি,
জলদের কোলে খেললো দামিনি!
সুখসরে সবে দাওলো সাঁতার
সুখময় হোক নিখিল সংসার।”

এই পুস্তকখানির বিশেষ গুণপণা এই যে ইহা যুক্তাক্ষর-বিবর্জ্জিত, অথচ সরল ও সুললিত। যুক্তাক্ষর-বিবর্জ্জিত ৭৬ পৃষ্ঠার এক খানি ভাল কবিতাপুস্তক রচনা করা সামান্য ক্ষমতার বিষয় নহে। কবিতাটির রুচি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, অতএব ইহা বিদ্যালয়ে পাঠনারও বিশেষ উপযোগী। ফলতঃ পুস্তকখানি উচ্চ শ্রেণীর কাব্য না হইলেও আমরা ইহাকে উত্তম বলিয়া অসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি।

প্রদীপ।*—২৬টি ভিন্নভিন্ন বিষয়ক ২৬টি কবিতা এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত আছে। নবীন কবির কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট হয় নাই বটে কিন্তু নিতান্ত মন্দও নহে। স্থানে স্থানে কবিত্বের আভাস পাওয়া যায়। চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে অক্ষয় বাবু একজন সুলেখক হইবেন।

বেদিয়া বালিকা।†—এই উৎকৃষ্ট উপন্যাস খানি স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আমরা বিদ্যালয়সমূহে, বিশেষতঃ বালিকা-বিদ্যালয়সমূহে ইহার প্রচলন দেখিলে সুখী হইব।

পাক্ষিক সমালোচক।‡ প্রায় চারি মাস হইল এই পত্রিকা খানির প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। সাময়িক পত্র যত অধিক প্রকাশ হয় ততই ভাল, সুতরাং পাক্ষিক সমালোচকের আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। মাস সমালোচনা এবং সার সংগ্রহে প্রতি মাসের ঘটনা ও অন্যান্য সাময়িক পত্রের সারসংকলন থাকে, ইহাতে এক স্থানে অল্প সময়ে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। প্রথম কয়েক সংখ্যা অপেক্ষা বর্ত্তমান সংখ্যা গুলির লেখার ক্রমশঃ উৎকর্ষ দেখা যাইতেছে। আশা করি পাক্ষিক সমালোচক উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া বঙ্গসমাজে স্থায়ী স্থানলাভ করিবেন।

☞ স্থানাভাবে অনেকগুলি গ্রন্থের সমালোচন বাকী রহিল। সং

* প্রদীপ। [গীত কবিতাবলী] শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল প্রণীত। মুল্য ।৹ আনা।

† বেদিয়া বালিকা। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রী উমেশ চন্দ্র দত্ত সঙ্কলিত। মূল্য ৵৹।

‡ পাক্ষিক সমালোচক। সাহিত্য-সমাজ শিল্প বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস অর্থব্যবহার পুরাতত্ত্ব রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন। কলিকাতা ১১নং গবর্ণমেণ্ট প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত সাম্বৎসরিক ৪৲ চারিটাকা।

হিন্দুসমাজ সংস্কার।

বিধবা-বিবাহ।

তৃতীয় প্রস্তাব।

'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ'—যখন প্রায় সমস্ত শিক্ষিত সমাজ বিধবা-বিবাহের অনুকূলে ঘোরতর আন্দোলন তুলিয়াছেন, তখন কাহাকেও তাহার প্রতিকূলে আন্দোলন তুলিতে দেখিলে আমাদের মনে কালিদাসের এই যুক্তি স্বতঃই উদিত হয়। বিধাতা যখন সকলকেই ভিন্নরুচিসম্পন্ন করিয়াছেন; তখন যে সকলেরই রুচি সমান হইবে এরূপ আশা করা যায় না। সহযোগিনী সাধারণী প্রাপ্তিস্তম্ভে বিধবা-বিবাহকে স্পষ্ট মন্দ না বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে এই কয়েকটী আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। (১) বিধবা-বিবাহ যখন অনেক দিন হইতে অপ্রচলিত রহিয়াছে, তখন সহসা এই প্রথার উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। (২) পুরাকালে এই প্রথা ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। (৩) শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে ইহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয় না। (৪) দুই একটী মাত্র ঋষি এ বিষয়ে সম্মতি, যুক্তি ও বিধান দিয়া গিয়াছেন মাত্র। (৫) বৈধব্য পুরুষের দোষেই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং বিধবা-বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা পুরুষের দোষ সংশোধন করাই বৈধব্য নিবারণের প্রধান উপায়। (৬) ঈশ্বর-আরাধনা ব্যতীত দেবত্ব প্রাপ্তি হয় না। সেই ঈশ্বর-আরাধনার প্রধান সহায় বৈরাগ্য। সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বিধবার পক্ষে বৈরাগ্যমূলক ব্রহ্মচর্য্যের অতি কঠোর ব্রতমালা বিহিত করিয়া গিয়াছেন এবং সেই কারণেই আত্মসংযমকে বিধবাগণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৭) বিধবার বয়সের নির্ব্বাচন না করিয়া বিধবামাত্রকেই বিধাতার রাজ্যে স্বেচ্ছাচারে বাস করিতে সম্মতি দিলে, পরিণামে ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। (৮) পরিণতবয়স্ক বিধবাগণের বিবাহ দিলে ধর্ম্মবিভাগের কার্য্য চলিতে পারে না। (৯) আর ধান চালের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে লোকসংখ্যার আরও বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

আমরা এক একটী করিয়া এই পূর্ব্ব পক্ষ কয়েকটীর মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। (১) যাহা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সহসা পরিবর্ত্তিত হয় না—এ সিদ্ধান্তের ব্যভিচার আমরা গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে অসংখ্য দেখিয়াছি। আজ অর্দ্ধ শতাব্দী মাত্র হইল ভারতবর্ষে

ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ইহারই মধ্যে হিন্দুসমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সমস্ত হিন্দুসমাজ একেবারে ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে। পিতামহের আমলের সামাজিক অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা অনেক পরিমাণে বিভিন্ন। কোন্ পরিবর্ত্তনটী ভাল হইয়াছে বা কোন্ পরিবর্ত্তনটী মন্দ হইয়াছে তাহার বিচার এখানে করিব না। শুদ্ধ এই মাত্র দেখাইব যে সে হিন্দুসমাজ আর নাই। প্রত্যূষে উঠিয়া রজনীতে নিদ্রা যাওয়া পর্য্যন্ত একজন হিন্দু পূর্ব্বে যাহা করিতেন, তাহার এক-তৃতীয়াংশ করেন কি না সন্দেহ। যে সকল স্থিতিশীল নব্যসম্প্রদায়ের লোক এক্ষণে বিপরীত আন্দোলনের রোল তুলিয়াছেন, তাঁহারাও হিন্দুসমাজকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লইয়া যাইতে চাহেন না। যে সকল পরিবর্ত্তন তাঁহা-দিগের নিজের সুবিধা-জনক, সেই পরি-বর্ত্তনের স্রোতও তাঁহারা রোধ করিতে চাহেন না। কেবল যাহাতে স্বার্থের সংঘর্ষ আছে এরূপ পরিবর্ত্তনের গতি রোধ করিতে চাহেন। দুই একটী উদাহরণ দিলেই আমাদের উক্তি স্পষ্ট হইবে। নব্যসম্প্রদায় এতদিন জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। এই আন্দো-লনের ফলে উচ্চ শ্রেণীস্থ শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সামাজিক দূরত্ব কিছু কিছু কমিতেছে। অগ্রে যে কায়স্থাদি ব্রাহ্মণের বিছানায় বসিতে পাইতেন না, তাঁহারা নির্জ্জন ভোজনে ব্রাহ্মণগণের সহিত এক পংক্তিতেও ভোজন করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নিম্নতম শ্রেণীকে সে অধিকার দিতে প্রস্তুত নহেন। কায়স্থ ব্রাহ্মণকে নামাই-বার জন্য জাতিভেদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, এখন নিম্নশ্রেণী যখন তাঁহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অব-তীর্ণ হইয়াছেন, তখন তাঁহারা স্কোটন-বাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পিতৃ-পৈতামহিক দেবদেবীকে পদদলিত করিব, গুরু ব্রাহ্মণকে অপমানিত করিব, সামাজিক কর্ত্তৃত্ব চির-নেতা ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে নিজের হস্তে লইব, বাবুর্চ্চির হস্তে পচিত খানা খাইব, সাহেবী চালে চলিব—এ সমস্ত সময়ে আমি পরিবর্ত্তন-শীল। আর যখন আমাকে কোন স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে হইবে তখনই আমি স্থিতশীল। বিধবার বিবাহ সম্বন্ধেও এই কারণে উক্ত সম্প্রদায় স্থিতি-শীল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিধবা ভগিনী বা কন্যার বিবাহ দিতে গেলে আপাততঃ তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বিধবা কন্যা বা ভগিনী তাঁহার গৃহে অবৈতনিক পরিচারিকার কার্য্য করিয়া থাকেন। বৈতনিক পরিচারিকার দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে, তাঁহা-দিগদ্বারা সে সকল কার্য্যও সম্পন্ন হইয়া

থাকে। তাঁহাদিগের সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া ভিন্নও তাঁহাদিগের আর একটী গুরুতর অনিষ্ট এই হয় যে সমাজ তাঁহাদিগকে আপাততঃ পরিত্যাগ করিবে। আবার বিধবা-বিবাহ যুক্তি ও শাস্ত্র সম্মত বলিয়া স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ তাহার অনুষ্ঠান না করিলেও লোকে কপটী বলিয়া ঘৃণা করিবে সুতরাং ইহার প্রতিপক্ষ অবলম্বন করাই তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এই সকল কারণেই এই বিপরীত আন্দোলনের চেষ্টা। এই জন্যই এখন এ কথা উঠিতেছে—যে যাহা বহুদিন হইতে অপ্রচলিত রহিয়াছে, তাহাকে সহসা প্রচলিত করা যায় না। যাঁহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি মতামত সমস্ত বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাই এক্ষণে অপ্রচলিত বিধবা-বিবাহ সহসা প্রচলিত করা অসাধ্যসাধন বলিয়া খ্যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদি বিধবা-বিবাহ যুক্তি ও শাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, আর যদি আমরা কপটী না হই এবং একাগ্রচিত্তে এই প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে ইহা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে কয় দিন লাগে? ইহা প্রচলিত করিতে বিশেষ কোন আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। যেমন কুমারী কন্যা বা ভগিনী যোগ্যা হইলে পিতা বা ভ্রাতা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হন, সেই রূপ ব্যস্ততা যদি তাঁহারা অপরিণতবয়স্কা বিধবার বিবাহের জন্য দেখান, ও সৎপাত্র পাইলেই যদি তাহাদিগের বিবাহ দেন, তাহা হইলেই অতর্কিত ভাবে ইহা সমাজমধ্যে চলিয়া যাইবে। যদি সুশিক্ষিত সমাজ যে বিধবা বিবাহ দিল বা করিল, তাহার সহিত পূর্ব্ববৎ সমসামাজিকতা রাখেন, তাহা হইলে বিধবা-বিবাহ দিতে বা করিতে লোকের অপ্রতুল হইবে না। সুতরাং যাহা আপাততঃ প্রচলিত করা সুকঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা বিনা কষ্টে প্রচলিত হইয়া যাইবে।

২য় পূর্ব্ব পক্ষের মীমাংসায় আমরা অধিক বলিবার আবশ্যকতা দেখি না। যাঁহারা রামায়ণ মহাভারত আনুপূর্ব্বিক পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে বিধবা-বিবাহ তৎকালে প্রচলিত না থাকিলে বড় বড় লোকে বিধবা-বিবাহ করিতেন না বা বিবাহ করিবার উদ্যোগ করিতেন না। একটী আধটী দৃষ্টান্ত দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব বালীর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকিলে দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বরে সমস্ত নৃপতি ও দেবমণ্ডলী উপস্থিত হইতেন না। নলের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া দময়ন্তী নলের সন্ধান পাইবার আশায় ঘোষণা করিলেন যে নলরাজার মৃত্যু হওয়ায় তিনি আবার বিবাহ করিবেন। সেই স্বয়ম্বর-সভায় দেব, নর,

যক্ষ, কিন্নর সকলেই দময়ন্তীর পাণিগ্রহণ আশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যদি বিধবা-বিবাহ সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বত্র প্রচলিত না থাকিত তাহা হইলে দময়ন্তীকে বিধবা জানিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য এত বড় বড় লোকের সমাগম হইত না। তদ্ভিন্ন বিধবা-বিবাহের সার্ব্বজনিকতার জাজ্জল্যমান প্রমাণ শাস্ত্রের ব্যবস্থা। যদি বিধবা-বিবাহ সর্ব্ববাদিসম্মত না হইত, তাহা হইলে মনু পরাশর প্রভৃতি প্রধান প্রধান শাস্ত্রকারেরা কখন বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দিতেন না। যাঁহারা বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তায় সন্দিহান তাঁহারা যেন বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখেন।

৩য়। শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে তাহাতে ইহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয় না।—এই পূর্ব্ব পক্ষের মীমাংসায় এইমাত্র বক্তব্য যে কোন্ শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহকে সদোষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তবে প্রতিপক্ষের অভিপ্রায় যদি এই হয়—যে শাস্ত্রে সহমরণকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিকল্প বলিয়া তদক্ষম পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য, ও তদক্ষম পক্ষে বিবাহ, এই পর পর ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—তাহা হইলে তদুত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে সহমরণের নিরাকরণে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহ এই দুই বিকল্পমাত্র অধুনা বর্ত্তমান আছে। এই দুই বিকল্পের মধ্যে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেয়ঃকল্প। যিনি স্বামীকে এতদূর ভাল বাসিতেন যে স্বামীর মৃত্যুতেও জগৎ স্বামিময় দেখিয়া থাকেন, ধ্যানে জ্ঞানে, শয়নে স্বপনে যিনি মৃত স্বামী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, সেই পতিদেবতা বিধবা জগতের আরাধ্যা। কোন্ প্রাণে কে তাঁহাকে আবার বিবাহ করিতে বলিবে? বিধবা-বিবাহ-প্রবর্ত্তকগণের হৃদয় এ দেবীগণের জন্য কাঁদে না। কারণ ইহাঁরা দুঃখিনী নহেন—মর্ত্তে থাকিয়াও স্বর্গসুখের অধিকারিণী। কিন্তু কয়জনের অদৃষ্টে এই পতি আরাধনা ঘটিয়া থাকে? কয়জন বিধবা মৃত পতিকে জগন্ময় দেখেন—কয়জন তাঁহাকে দেবভাবে পূজা করেন? আমরা সর্ব্বপ্রকার ভাণ বা কপটাচারের বিদ্বেষী সুতরাং আমরা সতীত্বের ভাণ বা কপটাচার চাহি না। তাই বলিতেছি কয়জন এই আদর্শ সতী হইতে পারেন? লোকের নিকট প্রতিপত্তি পাইবার জন্য বা বাহাদুরি দেখাইবার জন্য অনেক বিধবা পতি সহ সহমরণে গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কয়জন বিধবা সেই পরলোকগত স্বামীকে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া চিতানলে দেহ ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন? বরং ইতিহাসে রুধিরাক্ষরে লিখিত আছে যে অধিকাংশ সতীকে বলপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা বা চাপিয়া ধরা হইত। সে নৃশংস কাণ্ড রাজশাসনে

উঠিয়া গিয়াছে; এক্ষণে যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা তদপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর। অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দেওয়া হইল। বৎসর না যাইতে সে বিধবা হইল। হিন্দুসমাজ সেই দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে ব্রহ্মচারিণী সাজাইবেন। তাহাকে আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী থাকিতে বলিবেন। হিন্দুসমাজ নীলোৎপলপত্র দ্বারা শাল্মলী বৃক্ষ ছেদন করিতে চেষ্টা করিবেন। অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চেষ্টা করিবেন। যে চির-কঠোর চির-কৌমারব্রত ভীষ্মাদির পক্ষেও কষ্টসাধ্য, অজ্ঞানা বালিকা দ্বারা সেই কঠোর ব্রতের সাধন করাইয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত সুতরাং এ চেষ্টার পরিণাম বিষময়। নরহত্যার স্রোতে ভারত ভাসিয়া যাইতেছে, অন্ধ হিন্দুসমাজ দেখিয়াও দেখিতেছে না! বর্ত্তমান সেন্‌সস্ দেখিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় না বিগলিত হয়! এই সেন্‌সসে জানা গিয়াছে যে আজকাল ভারতবর্ষে ২ কোটী ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬ শত ২৬ জন হিন্দু বিধবা রমণী আছে। ইহাদিগের মধ্যে ৭৮ হাজার বাল-বিধবার বয়স নয় বৎসরের মধ্যে; দুই লক্ষ সাত হাজার বাল-বিধবার বয়স নয় ও চৌদ্দের মধ্যে; এবং তিন লক্ষ ৮২ হাজার বাল-বিধবার বয়স চৌদ্দ ও উনিশের মধ্যে। ইহাতে দেখা যায় প্রায় ছয় লক্ষ বাল-বিধবার বয়স উনিশের কম। কোন্ পাষাণ-হৃদয় না বলিবেন যে এই ছয় লক্ষ বাল-বিধবার বিবাহ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য? কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি না বলিবেন যে ইহাদিগকে চিরবৈধব্য-যন্ত্রণায় দগ্ধ করা অপেক্ষা পতি সহ ভস্মসাৎ করা সহস্রগুণে অধিক দয়ার কার্য্য? এরূপ বিধবার বিবাহ দেওয়াকে যে সদোষ বলে, তাহার মত কঠিন-হৃদয় ব্যক্তি আর দেখা যায় না। শাস্ত্রকারেরা যে অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহকে প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে এই বাল-বিধবাগণকে লক্ষ্য করিয়াই। কিন্তু আমরা পাষণ্ড, তাই শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, দয়াবৃত্তিকে উন্মূলিত করিয়া, ন্যায়পরতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া, এরূপ সুকুমারমতি বালিকাগণকে অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকি। যাহা নিজে পারি না, তাহা এই বালিকাগণ দ্বারা সম্পন্ন করিয়া লইতে চাই।

৪র্থ পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে মনু ও পরাশর যে ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন যদি অন্যান্য ঋষিরা তাহা শিরোধার্য্য করিয়া না লইতেন তাহা হইলে তাঁহারা যুক্তি দ্বারা তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিয়া যাইতেন। কিন্তু কোন ঋষিই তাহা করেন নাই, সুতরাং ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে বিধবাবিবাহ তৎকালে সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল, সেই জন্যই ঋষিশ্রেষ্ঠ পরাশর ও মনু ইহার ব্যবস্থা দিয়া

গিয়াছেন, এবং অন্যান্য ঋষিরা বিনা প্রতিবাদে তাঁহাদিগের মত শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। বিশেষতঃ "কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ—কলিতে পরাশরের মতই প্রবল।" সুতরাং পরাশর যখন "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

এই শ্লোক দ্বারা বিধবার বিবাহব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তখন হিন্দু মাত্রেরই অপ্রতিবাদে সেই মত শিরোধার্য্য করিয়া লওয়া উচিত।

৫ম পূর্ব্ব পক্ষের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। বৈধব্য পুরুষের দোষে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং পুরুষের দোষ সংশোধন করিলেই বৈধব্য নিবারিত হইতে পারে। বিধবাবিবাহ অপেক্ষা বৈধব্য মোচনের ইহাই প্রধান উপায়। পুরুষের কোন দোষে বৈধব্য ঘটে তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। শারীরিক নিয়মলঙ্ঘনের ফলে পুরুষের অকাল মৃত্যু ঘটে, পুরুষের অকাল মৃত্যুই স্ত্রীজাতির বৈধব্যের মূল সুতরাং পুরুষ যদি শারীরিক নিয়ম সকল প্রতিপালন করেন তাহা হইলে বৈধব্য মূলতঃ বিদূরিত হইতে পারে;—পূর্ব্বপক্ষকারের যদি এই অর্থ হয়, তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে, যে বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা, দারিদ্র্য ও অন্যান্য কারণে অকাল মৃত্যু, পৃথিবী হইতে কখনই একেবারে তিরোহিত হইবে না। অকাল মৃত্যু শুদ্ধ যে পুরুষজাতিতে আবদ্ধ এরূপ নহে, নারীজাতিতেও অকাল মৃত্যু বিরাজমান। তবে শ্রমের অযথা বিভাগের জন্য চিরদিনই অকাল মৃত্যু পুরুষজাতিতে প্রবলতর থাকিবে। পুরুষকে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনবরত অর্থোপার্জ্জনে ঘুরিতে হয়, সুতরাং পুরুষের দীর্ঘায়ু হওয়া দুরূহ। যতদিন শ্রমবিভাগের এই অসম বিতরণ নিবারিত না হইবে, ততদিন পুরুষ জাতির এই অকাল মৃত্যুর প্রবলতা নিবারিত হইবার কোন আশা নাই। সুতরাং বিধবার সংখ্যা মোটামুটি এই রূপই থাকিবে। যদি কখন বিজ্ঞানের ভূয়সী আলোচনায় ও অন্যান্য কারণে অকাল মৃত্যু নিবারিত হয়, তখন বিধবাই থাকিবে না, সুতরাং বিধবাবিবাহ দিবার জন্যও কোন সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত হইবে না। কিন্তু এক্ষণে যে দুই কোটী দশ লক্ষ হিন্দুবিধবার অশ্রুজলে ভারতবক্ষ প্লাবিত হইতেছে, তাহাদিগের উপায় কি হইবে? এই দুই কোটী দশ লক্ষের মধ্যে প্রায় ৭ লক্ষ বালবিধবা আছে। কোন প্রাণে আমরা তাহাদিগের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া আত্মসুখে নিমগ্ন থাকিব? স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া কত দিন আর আমরা ইহাদিগকে চিরবৈধব্যানলে দগ্ধ করিব? পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বালবিধবা ভগিনী বা কন্যা কণ্টকশয্যায় ছটফট

করিতেছে, আর তৎপার্শ্ববর্ত্তী গৃহে ভ্রাতা বা পিতা পত্নী লইয়া রঙ্গরস করিতেছেন—এ মর্ম্মঘাতী পাপদৃশ্য আর আমাদিগকে কত দিন দেখিতে হইবে?

৬ষ্ঠ পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর অতি সহজ। বৈরাগ্য ঈশ্বর-আরাধনার অনুকূল। এই জনাই শাস্ত্রকারেরা বিধবার পক্ষে বৈরাগ্যমূলক ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রকৃত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে আমরা পূজা করিয়া থাকি। সক্ষম পক্ষে শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, কেহই তাহা অস্বীকার করিবে না। তবে সেই শাস্ত্রকারেরা অক্ষম পক্ষে বিধবার বিবাহেরও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যাহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যপালনে অক্ষম ও অনিচ্ছুক তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক তাহাতে নিয়োগ করিবার তোমার কি অধিকার আছে? যে ভারবাহক যে ভারবহনে অপারগ, তাহার মস্তকে সেই ভার অর্পণ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলার তোমার কি অধিকার আছে? ইহার বিষময় ফল তুমি কি প্রতিগৃহে প্রত্যক্ষ করিতেছ না? প্রতি গৃহ যে ভ্রূণহত্যামহাপাপে দগ্ধ হইতেছে তাহা কি তুমি দেখিয়াও দেখিবে না? প্রকারান্তরে সেই মহাপাপের সহায়তা করিয়া তুমি কি সেই মহাপাপের অংশভাগী হইতেছ না? তোমার স্ত্রীবিয়োগ হইলে, তুমি শত বার বিবাহ করিবে, আর তোমার বালিকা কন্যা বা ভগিনীর কপাল একবার ফাটিলে আর তাহা জুড়িয়া দিবে না—এ নীতিশাস্ত্র তোমরা কোথায় পাইলে? শাস্ত্রকারেরা যে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা একশ্রেণীনিষ্ঠ বা বলপ্রযুক্ত নহে। স্ত্রী বা পুরুষ যেই সক্ষম হইবে তাহারই পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠকল্প বলিয়া ঋষিরা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বয়ং আদর্শ ব্রহ্মচারী হইয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনে অনেকেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিত। অধিকাংশ বিধবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিত বলিয়াই, বিধবাবিবাহ ক্রমে অগৌরবের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। যখন সহমরণ প্রথা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন যে বিধবা সহমরণে না যাইত, তাহাকে সকলেই অসতী বলিয়া ঘৃণা করিত। এই জন্য ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক কিছুকাল বিধবামাত্রই সহমরণে যাইত। চিতা আরোহণ করিলে পর যখন অগ্নি প্রজ্বালিত হইত, তখন অর্দ্ধদগ্ধ অনেক বিধবা প্রাণভয়ে অভিভূত হইয়া লাফাইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু কঠোরহৃদয় আত্মীয় স্বজন ধরিয়া আনিয়া আবার তাহাদিগকে চিতায় আরোপিত করিয়া যতক্ষণ না পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইত ততক্ষণ বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখিত। সে নৃশংস প্রথা মহাত্মা রামমোহন রায়ের যত্নে বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যে প্রথা রহিয়াছে তাহা সহমরণ অপেক্ষাও

অধিকতর নৃশংস। যে পুড়িয়া মরিতে অনিচ্ছুক তাহাকে বলপূর্ব্বক পুড়াইয়া মারিয়া তাহার অনন্ত যাতনার অবসান করা হইত। কিন্তু এই নৃশংস প্রথা বালবিধবাগণকে প্রতিদিন দগ্ধ করিতেছে। বিন্দু বিন্দু করিয়া তাহাদিগের শোণিতপাত করিয়া ক্রমে তাহাদিগের জীবন অবসান করিতেছে। সহ্য করিতে পারিতেছে না, তথাপি তাহাদিগকে চির-বৈধব্যানলে দগ্ধ করা হইতেছে। শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আমরা জঘন্য দেশাচারের দাস হইয়া প্রতিদিন প্রতি গৃহে এই নৃশংস দৃশ্যের অবতারণা করিতেছি। ধিক্ আমাদের শিক্ষায়! শতধিক্ আমাদের জীবনে! আমরা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া ঘোরতর অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতেছি। শাস্ত্রকর্ত্তাগণের দোহাই দিয়া তাঁহাদিগের ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিতেছি। অসংখ্য প্রাণিবধের নিমিত্ত কারণ হইয়া ঘোরতর নারকী হইতেছি। প্রকৃতি আমাদের এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে যে আমরা আর এই পাপদৃশ্যে ব্যথিত হই না। আমাদের হৃদয়ের দয়াবৃত্তি একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমরা এরূপ নিষ্ঠুর হইয়া গিয়াছি যে এই শোচনীয় দৃশ্যে শুদ্ধ যে আপনারা ব্যথিত হইব না এরূপ নহে, যদি আর কেহ ব্যথিত হন, তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিব। আপনারা তাহাদিগের উদ্ধারের কোন পন্থা করিব না—তাহাতেই সন্তুষ্ট নহি—আর যদি কেহ সে পন্থা করিয়া দেয়, তাহাকে খাইয়া ফেলিতে উদ্যত হইব। এই নিষ্ঠুরতায় পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সকলেই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। মহীয়ান সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কি আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে? দেবোপম ঋষিবৃন্দ কি আমাদিগকে এই ঘাতকবৃত্তি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন? কখনই নহে!—শাস্ত্রের দোষ নাই—শাস্ত্রকর্ত্তাগণের দোষ নাই—আমাদের অদৃষ্টের দোষ। তাই আজ আমরা সেই দেবগণের বংশধর হইয়া শৌনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি!

সপ্তম ও অষ্টম পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর একই। যদি পুরুষের সন্তানাদি থাকিতে বিবাহ প্রতিষিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে স্ত্রীজাতির সন্তানাদি থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহের নিষেধ সাম্যনীতি ও ন্যায়পরতার বিরোধী। এরূপ স্থলে বিবাহ না করিলে ভাল হয় তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কিন্তু যেখানে অনিবার্য্য কারণে বিবাহ আবশ্যক হইয়া উঠে; সেখানে নিষেধ করার ফল প্রায় বিষময় হইয়া উঠে। এমন অনেক স্থলে ঘটে যে কোন বিধবা-রমণী দুই একটী শিশু সন্তান লইয়া বিধবা হইয়াছেন—অভিভাবক কেহ নাই—ধনসম্পত্তিও নাই, সুতরাং অনেক সময়ে গত্যন্তর না থাকায় তাহাকে হয়ত কাহারও নিকট আত্মবিক্রয় করিতে

হইল। এরূপ স্থলে বিবাহ কি শ্রেয়ঃ নহে? যিনি বিবাহ করিবেন, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া শিশু সন্তানগুলির ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে জগতের কি অধিকতর মঙ্গল হইল না? কাহারও নিকট দাস্যবৃত্তি করিয়া উদর পূরণ করা অপেক্ষা ইহা কি সহস্রগুণে অধিকতর গৌরবের বিষয় নহে? যুবতী পরিচারিকা বা পাচিকার পরগৃহে সচরাচর যেরূপ দুর্গতি ঘটিয়া থাকে, তাহা কাহার অবিদিত আছে? যে বিধবার যৌবনকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, বা যিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহাদের বিবাহের জন্য কেহই চেষ্টা করিতেছে না। যে অসংখ্য বালবিধবার অশ্রুজলে ভারতবক্ষ প্লাবিত হইতেছে, হৃদয়বান লোকে তাহাদিগের দুঃখ-মোচনের চেষ্টা করিতেছেন মাত্র! কিন্তু এরূপ বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে অতি অল্প লোকই নামিয়াছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টায় এরূপ সুবৃহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার নহে। এই জন্য সহৃদয়মাত্রকেই আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা দীর্ঘসূত্রিতার বশীভূত হইয়া যেন কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে আর কাল বিলম্ব না করেন।

নবম পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে অল্পই বক্তব্য আছে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার পরিমাণ ইউরোপ অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, সেন্‌সস্‌ দ্বারা এরূপ প্রমাণীকৃত হয় নাই। প্রত্যক্ষ আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে আমরা অধিকতর জ্ঞানবান ও অধিকতর শ্রমশীল হইলে বিবিধ প্রকারে জাতীয় ধন বৃদ্ধি করিতে পারি। আহারের অভাব হইলেই লোকের অধিকতর শ্রম করিতে, ও অধিকতর বুদ্ধির উদ্ভাবনা করিতে হইবে। সেন্‌সস্‌দ্বয়ের তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে হিন্দুজাতি অপেক্ষা মুষলমানজাতি সংখ্যায় অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে। মুষলমানের যেরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষ অচিরকাল মধ্যে মুষলমানে পূরিয়া যাইবে। একদিকে হিন্দুজাতি নিরন্তর আত্মধ্বংস করিতেছেন, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায় স্বরূপ বিবিধ সামাজিক নীতি পোষণ করিতেছেন, অন্যদিকে দূরদর্শী মহম্মদের ব্যবস্থাবলে মুষলমানেরা পতঙ্গপালের ন্যায় ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিতেছে। এরূপ চলিতে দিলে অল্প কাল মধ্যে হিন্দুস্থান মুষলমানস্থানে পরিণত হইবে। যাঁহারা হিন্দুজাতির ধ্বংসকামী নহেন, তাঁহারা বিধবা-বিবাহের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবেন না। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে, হিন্দুজাতি হিন্দুস্থানে আপনার আধিপত্য রাখিতে সক্ষম হইবে। আড়াই কোটী হিন্দু বিধবার সন্ততি হইলে, হিন্দুজাতির কতদূর সংখ্যাবল বাড়িতে পারে যাঁহারা একবার ইহা ভাবিবেন তাঁহারা হিন্দু বিধবা-বিবাহের কখন প্রতিপক্ষ হইবেন না।

ম্যাল্‌থসের মত চালাইবার সময় আমাদের এখনও আসে নাই। যাঁহারা একান্তই সে মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা যেন আপনারা লোকবৃদ্ধিকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন। আপনাদিগের মত অনাথিনী বিধবাগণের উপর দিয়া চালাইবার চেষ্টা করা নৃশংসতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মৃচ্ছকটিক ও তদুল্লিখিত আচার ব্যবহার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা কোন্ সময়ের কথা বলিতেছি, ইহা বলিবার অগ্রে গ্রন্থের কাল নির্ণয় করা আবশ্যক।

কাল নির্ণয়।—এই গ্রন্থ কোন সময়ে লিখিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রস্তাবনায় শূদ্রক নৃপতি এই গ্রন্থের কবি বলিয়া লিখিত আছে। (১)

বস্তুতঃ গ্রন্থকর্ত্তা শূদ্রক কি না তাহা আমরা পরে বিবেচনা করিব।

ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে, কলির তিন সহস্র দুই শত নব্বই বৎসর পরে শূদ্রক নৃপতি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। এখন কল্যব্দ ৪৯৮৫। সুতরাং এ গণনায় ১৬৯৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ সংবৎ ২৪৬ অব্দে (১৮৯ খৃষ্টাব্দে) শূদ্রক রাজা প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু ঐ পুরাণেই উল্লেখ আছে যে শূদ্রক নৃপতি নন্দ রাজা ও বিক্রমাদিত্যের বহু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত (২)।

---

(১) এতৎ কবিঃ কিল
দ্বিরদেন্দ্রগতিশ্চকোরনেত্রঃ
পরিপূর্ণেন্দুমুখঃ সুবিগ্রহশ্চ।
দ্বিজমুখ্যতমঃ কবির্ব্বভূব প্রথিতঃ
শূদ্রক ইত্যগাধ-সত্ত্বঃ॥
অপিচ
ঋগ্বেদং সামবেদগণিতমথ কলাং
বৈশিকীং হস্তিশিক্ষাং
জ্ঞাত্বা, শর্ব্বপ্রসাদাদ্ব্যপগততিমিরে
চক্ষুষী চোপলভ্য।
রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরম
সমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্ট্বা
লব্ধ্বা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং
শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবৃষ্টঃ॥
অপিচ
সমরব্যসনী প্রমাদশূন্যঃ ককুদং
বেদবিদাং তপোধনশ্চ।
পরবারণবাহুযুদ্ধলুব্ধঃ ক্ষিতিপালঃ
কিল শূদ্রকো বভূব॥

(২) ত্রিষু বর্ষসহস্রেষু কলের্যাতেষু পার্থিব।
ত্রিশতে চ দশ ন্যূনেহস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি॥
শূদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধসত্তমঃ।
নৃপান্ সর্ব্বান্ পাপরূপান্
বর্দ্ধিতান্ যো হনিষ্যতি॥
চর্ব্বিতায়াং সমারাধ্য লপ্স্যতে ভুভরাপহঃ।
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে॥
ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্
হনিষ্যতি
শুক্লতীর্থে সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তিং
যোঽভিলপ্স্যতে

এখন, দেখা যাইতেছে যে বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে সংবৎ গণনা হইয়া আসিতেছে; সুতরাং শূদ্রক রাজা যে বিক্রমাদিত্যের ২৪৬ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। উপরি-উক্ত দুই কথা সংলগ্ন হয় না।

সেকেন্দর (আলেকজাণ্ডার) খৃষ্ট জন্মের ৩৩১ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তৎকালে নন্দ রাজা মগধরাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র (পাটনা) নগরীতে রাজত্ব করিতেন। শূদ্রক রাজা তাঁহার পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভবিষ্য পুরাণে ৩২৯০ কল্যব্দে (১৮৯ খৃষ্টাব্দে) যে শূদ্রকের রাজত্বের উল্লেখ আছে তাহাও স্বীকার করা যায় না।

কুমারিকাখণ্ডের পূর্ব্বোক্ত বচনের আভাসে বিক্রমাদিত্য ও নন্দ রাজার পূর্ব্বে শূদ্রকের প্রাদুর্ভাব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু মৃচ্ছকটিকে চাণক্যের কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। (৩)

যে সময়ে মৃচ্ছকটিক রচিত হয়, তখন চাণক্যের উপাখ্যান যে অতি সুপ্রচারিত ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই চাণক্য নন্দ রাজার বিনাশ সাধন করেন। মৃচ্ছকটিকে চাণক্যের উল্লেখ থাকাতে, গ্রন্থকর্ত্তা যে চাণক্যের (সুতরাং নন্দ রাজার) পরবর্ত্তী তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ কুমারিকাখণ্ডের পূর্ব্বোক্ত বচনে কালনির্ণয়ের কোন সাহায্য হয় না। তবে এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে শূদ্রক নন্দ ও বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন।

মৃচ্ছকটিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা পাঠ করিলে তৎকালে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় থাকে না। গৌতম ৫৫৩ খৃঃ পূঃ মৃত হন, এবং নন্দ রাজা ৩৩১ খৃঃ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে শূদ্রক রাজা রাজত্ব করেন। ভবিষ্যপুরাণে শূদ্রক রাজার ২০ বৎসর পরে নন্দরাজার আবির্ভাব উল্লিখিত আছে। তাহা স্বীকার করিলে, খৃষ্টের পূর্ব্বে চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে শূদ্রক রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনায় উল্লেখ আছে যে শূদ্রক রাজা এক শত দশ দিন জীবিত ছিলেন। সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে ও চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শূদ্রকের প্রাদুর্ভাব নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত বোধ হয় না। তাহা হইলে, আমরা অন্যূন ২০০০ বৎসরের কথা লিখিতে বসিয়াছি।

বাস্তবিক শূদ্রক রাজা গ্রন্থকর্ত্তা কি না

ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যধিকেষুচ
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো
রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতি ॥
—কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থাধ্যায়।

(৩) শকারঃ।
অন্ধআলে পলাঅন্তী মল্লগন্ধেণ শূচিদা।
কেশবিন্দে পলাভিট্টা চাণক্যেনেব্ব দোবদী॥
—মৃচ্ছকটিক, প্রথমাঙ্ক।

তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। প্রস্তাবনাতে লিখিত আছে যে এই প্রকরণের কবি গজেন্দ্রগমন, চকোরনেত্র, পূর্ণেন্দুমুখ সুগঠিতকলেবর, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, অগাধবুদ্ধি শূদ্রক রাজা ছিলেন। "শূদ্রক রাজা সমরপ্রিয়, প্রমাদশূন্য, বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, তপস্যানিরত, হস্তীর সহিত বাহুযুদ্ধে লোলুপ ছিলেন। "ছিলেন" এ কথা কোনও কবির নিজ লেখনী হইতে বহির্গত হইতে পারে না এবং পূর্ব্বোক্তরূপ আপন গুণ আপন গ্রন্থে বর্ণনা করা নিতান্ত অসম্ভব ও অস্বাভাবিক।

আবার দেখিতে পাই "শূদ্রক, ঋগ্বেদ সামবেদ গণিত, নৃত্যগীতাদি কলা, হস্তি-শিক্ষা বিষয়ক শাস্ত্র, জ্ঞাত ছিলেন এবং মহাদেবের প্রসাদে তিমিরবিরহিত (৪) চক্ষুঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় পুত্রকে রাজ্যে স্থাপনা করিয়া, সাঙ্গ, অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া এবং এক শত দশ দিন আয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন।"

কবির নিজ গ্রন্থে নিজের মৃত্যু বর্ণনা করা নিতান্ত অসম্ভব।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" বলিয়াছেন যে এইরূপ নির্দ্দেশ করাতে "অনায়াসে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে,— মৃচ্ছকটিক শূদ্রক রাজার প্রণীত নহে, অথবা প্রস্তাবনাংশ শূদ্রকের মৃত্যুর পর অন্য লোক দ্বারা রচিত ও মৃচ্ছকটিকে যোজিত হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তাবনা ও নাটকের রচনার এরূপ সৌসাদৃশ্য যে এই দুই বিষয় বিভিন্ন লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত, এরূপ প্রতীতি হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ প্রস্তাবনা গ্রন্থকর্ত্তা ভিন্ন অন্য দ্বারা লিখিত হয় এরূপ ব্যবহার অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা নাটকের অবয়ব স্বরূপ, তাহা অন্য ব্যক্তি দ্বারা সঙ্কলিত হওয়া কোনও ক্রমে সম্ভব বোধ হয় না।"

আমরা এই কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না। শূদ্রক গ্রন্থের কবি বলিয়া যে চিরপ্রসিদ্ধি আছে, তাহা অবহেলা করিবার কোন কারণ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দুইটী অনুমান (অর্থাৎ মৃচ্ছকটিক শূদ্রক প্রণীত নহে, অথবা প্রস্তাবনা অন্য দ্বারা রচিত) করিয়াছেন এই দুই অনুমানের অতিরিক্ত আরও একটী অনুমানের স্থল আছে। আমাদের বিবেচনায় সেই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

প্রস্তবনায় গ্রন্থকর্ত্তার নাম ও পরিচয়াদি থাকে। মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনায় শূদ্রক নিজ পরিচয়ের জন্য যাহা রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র বা তাঁহার গুণপক্ষপাতী অপর কোন ব্যক্তি শূদ্রকের স্তুতিবাদপূর্ণ কথিত তিনটী শ্লোক রচনা করিয়া, শূদ্রকের সেই

(৪) তিমির—চক্ষের ছানি; অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার।

রচনার পরিবর্ত্তে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শূদ্রকের পুত্রও রাজা ছিলেন, তাঁহার ক্ষমতায় আধুনিক গ্রন্থে দৃষ্ট ঐ কয়েকটী রচিত শ্লোক প্রচলিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই অনুমান অযুক্তিযুক্ত বলিবার কারণ নাই। এই অনুমান করিলে, শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ধৃত উক্তি সম্বন্ধে আর প্রতিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের এইরূপ অনুমানের নিম্নলিখিত কারণ আছে।

(ক) বিশেষ অনুধাবন করিলে প্রস্তাবনার অন্য অংশ ও নাটকের রচনার সহিত পূর্ব্বোক্ত তিনটী শ্লোকের রচনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

(খ) আমাদের দেশের কবিগণ অত্যুক্তিপ্রিয়। সম্ভবতঃ অত্যুক্তি অনুরোধেই শূদ্রক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়া থাকিবে। কলিকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে পারে না। "বেদবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ" "প্রমাদশূন্য" "অগাধবুদ্ধি" শূদ্রক যে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশের বিরুদ্ধে কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। (৫)। শূদ্রকের অশ্বমেধ যজ্ঞ স্বীকার করিলে তাঁহাকে কলির পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত বলিতে হয়; কিন্তু এরূপ বলা সঙ্গত হয় না।

(গ) এইরূপ স্তুতিবাদপূর্ণ অন্যরচিত শ্লোক গ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষেপ করা "অদৃষ্টচর" "বা অভূতপূর্ব্ব" বলিয়া বোধ হয় না। গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব, শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিঃ ক্ষ্মাপতিঃ ॥৪॥

এই কবিতায় উমাপতিধর, শরণ, গোবর্দ্ধন ও ধোয়ী কবিগণের সহিত জয়দেবের তুলনা করা হইয়াছে ও জয়দেবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। জয়দেব স্বয়ং এরূপ প্রগল্‌ভ বাক্য রচনা দ্বারা গ্রন্থ দূষিত করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। পরন্তু

যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্ ॥

এই শ্লোকটীও পূর্ব্ব শ্লোকের ন্যায় কোন পক্ষপাতী পাঠকের রচনা বলিয়া অনুমান হয়। নতুবা নিজের রচনা অতি মধুর কোমল ইত্যাদি বলিয়া নিজে প্রশংসা করা ও অন্য কবিগণের দোষ

(৫) (ক) নরাশ্বমেধৌ মদ্যঞ্চ কলৌ বর্জ্জ্যা দ্বিজাতিভিঃ।—ব্রহ্মপুরাণ।

(খ) দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ।
—বৃহন্নারদীয়।

দেখাইয়া আপনাকে নিজে গুণগরিমায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করা অসম্ভব।

পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে বোধ হয় "দ্বিরদেন্দ্রগতিঃ" ইত্যাদি "ঋগ্বেদং" ইত্যাদি এ "সমরব্যসনী" ইত্যাদি তিনটী স্তুতিবাদকের রচনা, গ্রন্থকর্ত্তা শূদ্রকের মৃত্যুর পর, প্রস্তাবনায় যোজিত হইয়াছে। অবন্তিপুর্য্যাং ইত্যাদি (৬) অপর একটী শ্লোকও সম্ভবতঃ গ্রন্থকর্ত্তার রচিত নহে। এই শ্লোকটীও অপরাপর শ্লোকের রচনা হইতে স্পষ্টতঃ বিভিন্ন।

এই সকল কারণে আমাদিগের মতে শূদ্রক নৃপতি গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা উপেক্ষা করিবার কোন কারণ নাই।

কাদম্বরীতে উল্লেখ আছে শূদ্রক রাজার রাজধানী বিদিশানগরীতে ছিল। ঐ স্থান বেত্রবতী নদীর তীরে অবস্থিত।(৭) মহাকবি কালিদাস প্রণীত মেঘদূতে বেত্রবতী নদীর উপরিস্থিত বিদিশা নগরীর উল্লেখ আছে। তাহাতে বিদিশা দশার্ণা নামক জনপদের রাজধানী বলিয়া বর্ণিত আছে (৮)

বেত্রবতীর অধুনাতন নাম বেতোয়া? উহা বিন্ধ্যগিরির উত্তরভাগ হইতে উৎপন্ন। ৩৪০ মাইল উত্তরপূর্ব্ববাহিনী হইয়া মালবপ্রদেশের মধ্য দিয়া এবং এলাহাবাদের (প্রয়াগ) দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে প্রবাহিত হইয়া যমুনা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। (৯)

(৬) অবন্তিপুর্য্যাং দ্বিজসার্থবাহো
যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকাচ যস্য
বসন্তশোভেব বসন্তসেনা॥
তয়োরিদং সৎসুরতোৎসবাশ্রয়ং,
নয়প্রচারং, ব্যবহারদুষ্টতাং
খলস্বভাবং ভবিতব্যতা তথা
চকার সর্ব্বং কিল শূদ্রকো নৃপঃ॥

(৭) আসীদশেষনরপতিশিরঃসমভ্যর্চ্চিতশাসনঃ পাকশাসন ইবাপরঃ * * * রাজা শূদ্রকো নাম। * * * তস্য চ রাজ্ঞ * * * বেত্রবত্যা পরিগতা বিদিশাভিধানা নগরী রাজধান্যাসীৎ।

—কাদম্বরী, পূর্ব্বভাগ।

(৮) পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ
র্নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ॥২৪
তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্মি॥২৫

—মেঘদূত; পূর্ব্বমেঘ।

(৯) The Vetravati is modern Betwa. It rises on the north side of the *Vindhya* chains, and pursuing a north-easterly course of 340 miles, traverses the province of Malwa and the south-west corner of Allahabad and falls into the Jamuna, below Kalpee. In the early part of its course, it passes through Bhilsa or Vidisa.

—*Wilson's Meghduta.*

উইলসন সাহেব বলেন মালব প্রদেশান্তর্গত ভিল্সার পূর্ব্বতন নাম বিদিশা। ভিলসা তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ। সচরাচর সেখানকার তামাককে আমরা ভ্যালসা তামাক বলিয়া থাকি।(১০)

দশার্ণ নামে কোনস্থান আধুনিক ম্যাপে দৃষ্ট হয় না; মেজর উইলফোর্ড সাহেবের মতে ইহা বিন্ধ্যগিরির অপর দিকে স্থিত। (১১)

দ্বিতীয় প্রশ্ন, শূদ্রক নৃপতি মৃচ্ছকটিকে যে পালক রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ইনি কে, এবং কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত ?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতি কঠিন। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে সোমবংশসম্ভূত বৃহদ্রথের পুত্র পুরঞ্জয় রাজাকে, তাহার অমাত্য শুনক বধ করিয়া নিজপুত্র প্রদ্যোতকে মগধদেশের রাজা করিবেন। প্রদ্যোতের পুত্র পালক। (১২) এখন, এই লোক মৃচ্ছকটিকের উল্লিখিত পালক কিনা সন্দেহস্থল। শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা আছে যে পালক রাজার পর তাহার পুত্র বিশাখযূপ রাজা হইবেন। বিশাখযূপের পুত্র নন্দিবর্দ্ধন; এই পাঁচ রাজা একশত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিবেন। পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে মৃচ্ছকটিকে পালক রাজার পর আর্য্যক নামক এক গোপালপুত্র রাজা হইয়া ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পালক রাজার পরে আর্য্যকের রাজত্ব গ্রহণ দেখা যাইতেছে না। তবে, আর্য্যক কত কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা মৃচ্ছকটিকেও উল্লিখিত নাই। আর্য্যক স্বল্পকাল রাজত্ব করিবার পর যদি পালক রাজার পুত্র বিশাখযূপ রাজত্ব করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্যই যদি আর্য্যকের নাম শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ না থাকে, তবে মৃচ্ছকটিক ও শ্রীমদ্ভাগবতে কোনও রূপে সামঞ্জস্য রাখা যায়। কিন্তু এরূপ সামঞ্জস্য করা কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠকগণের বিবেচনাধীন।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে পালক মগধেশ্বর ছিলেন; মৃচ্ছকটিকে পালককে উজ্জয়িনীর রাজা বলিয়া

---

(১০) Vidisa is described as the Capital of the District of *Dasarna.* It appears to be the modern *Bhilsa* in the province of Malwa. It is still a place of some note and is well known for the superior quality of the tobacco raised in its vicinity.

(১১) Major Wilford's Lists from the Puranas.
Asiatic Researches, Vol. VIII.

(১২) যোঽন্ত্যঃ পুরঞ্জয়ো নাম ভবিষ্যো বারহদ্রথঃ।
তস্যামাত্যস্তু শুনকো হত্বা স্বামিনমাত্মজং
প্রদ্যোতসংজ্ঞকং রাজানং কর্ত্তা যৎপালকঃ সুতঃ।১
বিশাখ যূপস্তৎপুত্রো ভবিতা রাজকস্ততঃ
নন্দিবর্দ্ধনস্তৎপুত্রঃ পঞ্চপ্রদ্যোতনা ইমে
অষ্টত্রিংশোত্তরশতং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং নৃপাঃ॥

উল্লিখিত হইয়াছে। যদি পালক উজ্জয়িনী ও মগধ উভয় দেশেই রাজত্ব করিয়া থাকেন তবে শ্রীমদ্ভাগবতের ও মৃচ্ছকটিকের পালক একই ব্যক্তি বলা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে যে নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র শিশুপাল, ও তৎপরে তদ্বংশোদ্ভব কাকবর্ণ,ক্ষেমধর্ম্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ, বিধিসার, দর্ভক, অজয়, নন্দিবর্দ্ধন, মহানন্দী এই কয় জন রাজা ক্রমে ৩০৬ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে মহানন্দীর ঔরসে ও শূদ্রাণির গর্ভজাত নন্দ রাজা রাজত্ব করেন এবং তিনি ও তাহার আট পুত্র একশত বৎসর রাজত্ব করেন। একজন ব্রাহ্মণ (চাণক্য) নন্দ ও তাহার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার ও বারিসারের পুত্র অশোকবর্দ্ধন।(১৩) ইহার পর আরও কয়েকজন রাজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের ১৩৭ বৎসর রাজত্বের কথা উল্লিখিত আছে।

পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে ভবিষ্য পুরাণের যে বচন আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের বচনের ঐক্য নাই; তবে, ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষের সমস্ত স্থান এক রাজার করতলস্থ ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, সমকালে, ভিন্ন ভিন্ন রাজার রাজত্ব ছিল। হয়ত ভবিষ্য পুরাণে যে প্রদেশের রাজার কথা উল্লিখিত আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই প্রদেশের রাজার কথার উল্লেখ নাই এবং কেবল দিগ্বিজয়ী রাজার নামে একতা আছে।

বাস্তবিক্ পালক রাজা যে কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে যদি শ্রীমদ্ভাগবতের

(১৩) শিশুনাগস্ততো ভাব্যঃ
কাকবর্ণস্তু তৎসুতঃ।
ক্ষেমধর্ম্মা তস্য সুতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেমধর্ম্মজঃ
বিধিসারঃ সুতস্তস্যাজাতশত্রুর্ভবিষ্যতি
দর্ভকস্তৎসুতো ভাবী দর্ভকস্যাজয়ঃ স্মৃতঃ
নন্দিবর্দ্ধন অজেয়ো মহানন্দিস্তু তৎসুতঃ
শৈশুনাগাদশৈবেতে বষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ং
সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং
কুরুশ্রেষ্ঠা কলৌ নৃপাঃ ॥২
মহানন্দিসুতো রাজন্
শূদ্রো গর্ভোদ্ভবো বলী
মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ
ততো ভূপা ভবিষ্যন্তি
শূদ্রপ্রায়া অধার্ম্মিকাঃ ॥৩
স একপুত্রাং পৃথিবীমনুলঙ্ঘিতশাসনঃ
শাসিষ্যতি মহাপদ্মো দ্বিতীয় ইব ভার্গবঃ॥৪
তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ
সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং
সমাঃ ॥৫।
নবনন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি
তেষামভাবে জগতীং
মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ ॥৬
স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো
রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি
তৎসুতো বারিসারস্তু ততশ্চাশোকবর্দ্ধনঃ।
—শ্রীমদ্ভাগবত, ১২ স্কন্ধ ১ম অধ্যায়।

পালক রাজা ও মৃচ্ছকটিকের পালক রাজা একই পালক হন, তবে তিনি খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দশম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

শূদ্রক রাজা বোধ হয় শৈব ছিলেন, গ্রন্থারম্ভে নান্দীতে শিবের আরাধনা দেখিতে পাওয়া যায়(১৪) এবং প্রস্তাবনায় উল্লেখ আছে যে শূদ্রক মহাদেবের কৃপায় তিমিরবিরহিত চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মৃচ্ছকটিকের রচনা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই গ্রন্থের নায়িকা একজন বেশ্যার গর্ত্তসম্ভূতা রমণী। কিন্তু গ্রন্থকার অশ্লীল বা নীতিবিরুদ্ধ কোন বর্ণনায় গ্রন্থ দূষিত করেন নাই; গ্রন্থের যে স্থলে পাপের বর্ণনা আছে তাহা উজ্জলবর্ণে লোভনীয়রূপে চিত্রিত হয় নাই। দশকুমারচরিতেও বেশ্যার সহিত প্রণয় ইত্যাদি বর্ণিত আছে কিন্তু তাহা অশ্লীলতাময় এবং তাহার নীতিশিক্ষা কদর্য্য, তাহাতে পাপের দণ্ড নাই এবং পাপকে পাপ বলিয়া বর্ণিতও হয় নাই—তাহাতে পাপকে ঘৃণা করিবার কোন কারণ নাই বরং পাপীর প্রতি সহানুভূতি হয়। আধুনিক রহস্য (Mysteries) পুস্তকে পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার, বর্ণিত আছে; কিন্তু পাপকে এত উজ্জ্বল মনোহর ও লোভনীয় চিত্রে চিত্রিত করা হয় যে পাপীর পাপকার্য্যে পাঠকের ঘৃণা হওয়া দূরে থাকুক, উজ্জল চিত্রে মন মুগ্ধ হয়, পাপের দণ্ডের কথায় মনে দুঃখ বোধ হয়—কিন্তু পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে না। যাঁহারা মিষ্টিরিজের গল্পে পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার বর্ণিত আছে বলিয়া তাহার রচনা সমর্থন করেন, তাঁহাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে পাপের দণ্ড বিধান লিখিলেই যে গ্রন্থকারের কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষ হইল এমন নহে, পাপকে এমন ভাবে চিত্রিত করিতে হইবে যে পাপ বলিয়া তাহাতে ঘৃণা জন্মে।

সে যাহা হউক, মৃচ্ছকটিকে বেশ্যার প্রণয়, বেশ্যার গৃহের পারিপাট্য, তাহার সুখ সৌন্দর্য্য প্রভৃতির উৎকৃষ্ট বর্ণনা আছে, কিন্তু কোনও স্থলে পাপকে লোভনীয় চিত্রে চিত্রিত করা হয় নাই, বরং পাপের প্রতি অসাধারণ ঘৃণা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থে এ প্রকার রচনা সামান্য প্রশংসার কথা নহে। যখন পঞ্চমাঙ্কে বিদূষক গচ্ছিত ধনের পরিবর্ত্তে চারুদত্তপ্রদত্ত অমূল্য রত্নমালা বসন্তসেনাকে প্রত্যর্পণ করিতে গেলেন এবং বসন্তসেনা, হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন, তখন বিদূষক মনে মনে বলিয়াছিল "কন্দ ব্যতীত উৎপন্ন পদ্ম, অবঞ্চক বণিক, অচোর. সুবর্ণকার, কলহ-

(১৪) (ক) "শম্ভোর্ব্বঃ পাতু শূন্যেক্ষণঘটিত লয় ব্রহ্মলগ্নঃ সমাধিঃ।"
(খ) "পাতু বঃ নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠঃ শ্যামাম্বুদোপমঃ
গৌরীভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে॥"
(গ) "শর্ব্বপ্রসাদাদ্ব্যপগত তিমিরে চক্ষুষী চোপলভ্য"

বিরহিত গ্রামসমাগম, অলুব্ধা গণিকা—এ সমস্ত দুষ্কর।" কিন্তু বাস্তবিক গ্রন্থকার এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন; তিনি গণিকাকে নিস্পৃহা, একানুরক্তা, প্রেমময়ী, দানশীলা, লজ্জাময়ী, গুণগ্রাহী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন—বসন্তসেনার এ চিত্রে দোষরহিত। আবার, অন্য প্রসঙ্গে তিনি বেশ্যাবৃত্তির বহু দোষ কীর্ত্তন করিয়া বেশ্যার প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছেন। গ্রন্থকার সুবিধা পাইলেই সুরুচি ও সুনীতি পূর্ণ উপদেশ, উপযুক্ত স্থলে উপযুক্ত লোকের মুখ হইতে বলাইয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে এরূপ সুরুচিপূর্ণ কাব্যের সংখ্যা বিরল।

গ্রন্থকার যে একজন ব্যবহারবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। নবমাঙ্কে তিনি বিচারালয়ের যে চিত্র দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ব্যবহারজ্ঞান বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়। তিনি বিচারকদিগের যে গুণ থাকা আবশ্যক বলিয়া গিয়াছেন, সকল বিচারকেরই সে কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক। তিনি বলেন, বিচারক শাস্ত্রজ্ঞ, কপটানুসারণে কুশল, মধুরভাষী, ক্রোধশূন্য, মিত্র শত্রু স্বজনের উপর তুল্য ব্যবহারী হইবেন, বাদী প্রতিবাদীর চরিত্র দর্শন করিয়া আজ্ঞা দিবেন, অসমর্থকে পালন ও শঠের দণ্ডবিধান করিবেন, ধর্ম্মানুরক্ত হইবেন এবং সতত পরতত্ত্বনির্ণয়ে ব্যাপৃতমনাঃ ও উচিত অবস্থা আবিষ্কার দ্বারা রাজার ক্রোধ অপনয়ন করিবেন (১৫)। গ্রন্থকার যে লোকব্যবহারজ্ঞ ছিলেন তাহা নবমাঙ্কে স্থানে স্থানে অতি সুস্পষ্ট প্রকাশিত আছে।

গ্রন্থকার জ্যোতিষ আদি নানা শাস্ত্রে যে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহাও গ্রন্থে বিলক্ষণ প্রকাশিত আছে।

কবি এক জন সঙ্গীতে সুনিপুণ ব্যক্তি ছিলেন। চারুদত্তের মুখে রেভিল নামক গায়কের গানের যে প্রশংসা করাইয়াছেন, তাহা সঙ্গীতবিশারদ ভিন্ন লিখিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসন্ন—

(১৫) শাস্ত্রজ্ঞঃ কপটানুসারকুশলো বক্তা ন চ ক্রোধন
স্তুল্যো মিত্রপরস্বকেষু চরিতং দৃষ্ট্বৈব দত্তোত্তরঃ।
ক্লীবান্ পালয়িতা শঠান্ ব্যথয়িতা ধর্ম্ম্যো ন লোভান্বিতো
দ্বার্ভাবে পরতত্ত্ববদ্ধহৃদয়ো রাজ্ঞশ্চ কোপাপহঃ॥

মানব ও প্রকৃতি।*

মানব।

শূন্য মর্ত্ত্য পূর্ণ করি ভীষণ গম্ভীরে
উঠিছে কঠোর ধ্বনি—"দেহ প্রসারিয়া,"
না পারি বুঝিতে ইহা প্রপঞ্চ কাহার!
নহে মাত্র আজ—এই দারুণ শ্মশানে
কি প্রভাত, কি মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন যামিনী
যখনি প্রবেশি, শুনি এ ভীষণ ধ্বনি!
নিরখি চৌদিকে,—ঊর্দ্ধে স্থাপিলে নয়ন
ওই শূন্য অনন্তের বিরাট হৃদয়
ফাটিয়া অতল তার অন্তঃস্থল হ'তে
ঢালি বিভীষিকা বক্ষে উঠে এই রব—
"দেহ প্রসারিয়া"—এই শবদপ্রবাহে
ও নিবিড় মেঘপুঞ্জ তুলা রাশি মত
অনন্ত আকাশ বক্ষে হয় প্রসারিত!
ভাস্কর চন্দ্রমা গ্রহ উপগ্রহ যত
দ্রবিয়া কৌমুদীরূপে অকূলপ্রসারি
এক এক জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বে পরিণত!
অনন্ত এ শূন্য এই শবদ প্রবাহে
আপন পরিধি যেন করি প্রসারিত
দিক্ দিগন্তরে বেগে হয় প্রধাবিত!
কি যে তীব্র উদ্দীপনা মিশ্রিত এ রবে—
নাহি জানি! বোধ হয় পরশে ইহার
তড়িৎপ্রবাহে প্রাণ হয় প্রবাহিত!
কোথা হ'তে উঠে রব লক্ষ্য নাহি পাই—
কেবা কয়, কারে কয়, না পাই খুঁজিয়া!
"দেহ প্রসারিয়া" রবে পরিপূর্ণ ব্যোম
মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমি ভ্রমিয়া বেড়াই।
স্থাপিলে নয়ন ওই তরুকুল পানে
প্রসারি অসংখ্য বাহু চাহি মোর প্রতি
কহে যেন সমস্বরে—"দেহ প্রসারিয়া;"
ওই ক্ষুদ্র লতা তৃণ উহারাও যেন
সঞ্চালিয়া কর মোরে ইঙ্গিত করিয়া
কহিতেছে নিরন্তর "দেহ প্রসারিয়া"!
তটিনী তড়াগ সর যখনি নেহারি
হিল্লোলে হিল্লোলে যেন বাসনা তাহার
ছড়াইয়া নেত্রপথে, কহে অবিরত
"দেহ প্রসারিয়া"! এই নির্ব্বাক মেদিনী
অর্থহীন—ভাবহীন—মৃত্তিকাবিস্তার
উহাও—উহাও যেন সজীব ভাষায়
কহে মোরে নিরন্তর—"দেহ প্রসারিয়া,"
কি দিব প্রসারি আমি পারি না বুঝিতে।
কে তুমি, কোথায় তুমি, কোন্ অভিলাষে
"দেহ প্রসারিয়া" মোরে কহ নিরন্তর?
মানব—দানব—দেব যেবা তুমি হও
আইস সম্মুখে—মোরে দেহ দরশন।

প্রকৃতি।

মানব! প্রকৃতি আমি সম্মুখে তোমার,
হেরি তোমা প্রতিদিন কাতর বদনে
ভ্রমিতে একাকী এই ভীষণ শ্মশানে;
অন্তরের পীড়া তব উথলি আবেগে

---

* সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত অধিবেশনে ইহা দুইটি বালক কর্ত্তৃক আবৃত্ত হইয়াছিল।

নয়নে—বদনে—অঙ্গে পড়িছে ঝরিয়া,
সৌভাগ্যের লীলাক্ষেত্র ললাটে তোমার
ঘোর বিষাদের মেঘ পড়েছে আবরি;
নয়নযুগল দুই জ্ঞান-নির্ঝরিণী
রোধিয়াছে ভাবনার ভীষণ পাষাণ;
উৎসাহে—সাহসে স্ফীত উরস তোমার
বিদারিয়া বহিতেছে নিরাশার নদী;
বিষম পীড়ায় তুমি পীড়িত মানব
নিরখি তোমার ওই দারুণ যন্ত্রণা
ব্যথিত আমার এই অনন্ত হৃদয়।
তাই সে যন্ত্রণা তব ঘুচাবার তরে
কহি তোমা নিরন্তর "দেহ প্রসারিয়া"।

মানব।

তুমি সে প্রকৃতি—আর এই তব ভাষা!
বিধাতা কি আজ তবে নূতন করিয়া
সৃজিল হৃদয় তব অভাগার তরে!
তুমি সে প্রকৃতি—আর এ তব মমতা!
তিষ্ঠ ক্ষণকাল,—আগে হৃদিতল হ'তে
মুছে ফেলি স্মৃতি মম—অতীত আমার
দেই ডুবাইয়া ঘোর বিস্মৃতির নীরে,
তবে সে আমার এই নিদারুণ প্রাণ
প্রকৃতি ভাবিয়া তোমা হৃদে দিবে স্থান।
একবার—দুইবার—নহে তিনবার—
হয় না স্মরণ আজ কত শত দিন
শৈশবের অঙ্কুরিত প্রাণের মঞ্জরী
যৌবনের সুরভিত প্রস্ফুট পরাণ,
আর প্রৌঢ় জীবনের এই শুষ্ক প্রাণ—
প্রাণহীন—ম্লানবর্ণ—ছিন্ন ভিন্ন দল
অঞ্জলি পূরিয়া তব চরণের তলে
ঢালিতে ঢালিতে,কোথা—কোথায় বলিব

এই শূন্য ধরাতলে কোথা সেই স্থান
যথায় না ভ্রমিয়াছি কাঁদিতে কাঁদিতে!
ঊষা রূপে দিবে দেখা সুদূর পূরবে
রূপান্তরে ভাবান্তর হয় যদি কিছু
সেই আশা হৃদে ধরি সুদীর্ঘ যামিনী
অনিদ্র—অনন্য চিত্তে একাকী এ প্রাণ
করিয়াছে পূর্ব্বাসার দ্বারে অবস্থান;
ধরিলে মধুর বেশ—হাসিলে আপনি
অন্তরে যা ছিলে তাই—কেবলি পাষাণী!
সন্ধ্যারূপে দিবে দেখা সুদূর পশ্চিমে—
কোমল সে রূপে যদি রহে কোমলতা
ভাবিয়া সুদীর্ঘ দিবা একাকী এ প্রাণ
করিয়াছে পশ্চিমের প্রান্তে অবস্থান;
ধরিলে মধুর বেশ—হাসিলে আপনি
অন্তরে যা ছিলে তাই—কেবলি পাষাণী!
সাগরে, ভূধরে, শূন্যে, প্রান্তরে, কাননে,
বসন্তে, শরতে, শীতে, হেমন্তে, নিদাঘে,
প্রতিদিন প্রাণ তব মমতার আশে
কি দিবস, কি সায়াহ্ন, মধ্যাহ্ন যামিনী
করিয়াছে অবস্থান দণ্ডপল গণি,
যে তুমি সে তুমি—এই কুহকিনী রীতি,
কোমল হৃদয় কবে করেছ প্রকৃতি!
অকস্মাৎ আজ তব এহেন মমতা!
কেমনে ভুলিব তব চিরন্তন প্রথা!
একা আমি নই—এই বিশাল ভারতে
প্রাসাদে—কুটীরে—পথে যথায় তথায়
এই দুখে আর্য্যসুত কাঁদিয়া বেড়ায়,
আছে যদি আঁখি—তবে হেরিতেত পাও,
শ্রুতি যদি আছে—তবে করত শ্রবণ,
আর এ মমতা যদি—আছে তবে প্রাণ,
তথাপি—তথাপি তুমি সতত নির্ব্বাক!

কেমনে বুঝিব তব হৃদে পড়ে দাগ।
ওই অভ্রভেদী রাজপ্রাসাদ হইতে
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ে তোমার
বহিতেছে নিরন্তর অনল উত্তাপে,
ওই পর্ণকুটীরের অন্ধকূপ হ'তে
হাহারব প্লাবিয়াছে হৃদয় তোমার
আর চির-অভাগিনী ভারত রমণী!
অতল গভীর তার মর্ম্মস্থল হ'তে
ঝরিতেছে দুনয়নে অবিরল ধারা—
সেই অশ্রুপাতে তব অনন্ত হৃদয়
হইতেছে কলঙ্কিত দিবস রজনী
তথাপি যে তুমি সেই কেবলি পাষাণী।
আছে যদি বক্ষে তব এ কোমল স্থান
কেন না মিশায়ে লও এইকটি প্রাণ!

প্রকৃতি।

অবোধ মানব তুমি—নাহি তব মতি,
বুঝিতে না পার তুমি প্রকৃতির নীতি!
তোমার জাতির রীতি, একা তুমি নও,
শূন্য নেত্রে হের শুধু শিখিতে না চাও,
সে জ্ঞান থাকিত যদি ঘটে কি কখন
সেই আর্য্যাবর্ত্তে আজ দুর্দ্দশা এমন?
দেখেছিলে পুরাকালে জীবন্ত প্রমাণ
প্রবেশিল হিন্দুস্থানে যবে মুসলমান,
হেরিয়াছ কি প্রথায় উঠিল সে জাতি,
দেখিয়াছ কি প্রথায় পরে অবনতি—
চিলনওলায় হের—হের পানিপথে
হের ওই লক্ষ্ণৌয়ে—হের পলাশিতে
হলদিঘাটে পথে মাঠে নেহার মিবারে;
ভস্মরাশি আজো মম হৃদয়ে ধরিয়া
রাখিয়াছি তোমাদের শিক্ষালাভ তরে।
সেও হেরিয়াছ, আজো কর দরশন
ইংরাজ-ইলবার্টবিলে জীবন্ত প্রমাণ,
কি ফল দেখিয়া যদি শিখিতে না চাও!
কে ঘুচাবে দুঃখ যদি নিজে না ঘুচাও!
শিক্ষার অনন্ত-পত্র হৃদয় আমার
রেখেছি খুলিয়া হের সম্মুখে তোমার।
যত কর অধ্যয়ন তত পাবে জ্ঞান
সুখ দুঃখ মানবের আলস্যের ভাগ।
সাধিতে জানে যে জাতি,সিদ্ধিলাভ তার।
আকাঙ্ক্ষা—সাধন বিনা শুধু যন্ত্রণার!
শিক্ষা—দীক্ষা—ধন—জ্ঞান,যা কিছু আপন
দেহ প্রসারিয়া, যদি ঘুচাবে বেদন
আত্মপর যাও ভুলি, ত্যজ অভিমান,
প্রকৃতির মত কর প্রসারিত প্রাণ।

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্মোৎসর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা।

গষ্টেভস্ ভাসা।

শীর্ষোল্লিখিত মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। এক জন যদি অনবরত এক লক্ষ্য সাধনে জীবন

উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে তিনি সে সাধনায় নিশ্চয় সিদ্ধ হয়েন। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই।

এই মহাত্মা ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলম্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমারেরা সুইডেন অধিকার করে—অধিকার করিয়াই তাঁহার পিতা ইরিক ও অন্যান্য অশীতিসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অতি নৃশংসরূপে প্রাণবধ করে।

সেই সময় গষ্টেভস্ ডেন্‌মার্কের কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। ডেনিস্ রাজা তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা পর্য্যন্তও দিয়াছিলেন; কিন্তু ইরিক ব্যানার নামক কোন ব্যক্তি দয়াপরতন্ত্র হইয়া রাজার নিকট তাঁহার প্রাণভিক্ষা চাহিয়া রাজার আদেশমত তাঁহাকে ডেনমার্কের অন্তর্গত জট্‌লণ্ড প্রদেশের কালো নামক দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদিও গষ্টেভস্‌কে অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন, তথাপি এ অবরুদ্ধভাব তাঁহার অতিশয় অসহ্য হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ তাঁহার পিতার হত্যা ও তাঁহার স্বদেশীয়গণের উপর যে দুর্ব্বিষহ অত্যাচাররাশি অনুষ্ঠিত হইতেছিল তৎসংবাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন।

দুর্গাধ্যক্ষ স্নেহপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে মৃগয়া দ্বারা মধ্যে মধ্যে চিত্তবিনোদন করিতে দিতেন। একদিন গষ্টেভস্ মৃগয়াচ্ছলে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া অরণ্যের নিবিড় প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অশ্বকে সর্ব্বপ্রথমে অধীনতা মুক্ত করিলেন, পরে সমীপবর্ত্তী কৃষকের সঙ্গে নিজের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পদব্রজে বন্ধুর গিরিপথ বহিয়া নানা বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিজের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি একটী প্রাচীন দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এই দুর্গ তাঁহাদিগের পরিবারেরই অধিকারভুক্ত ছিল। সেখানে আসিয়া তিনি বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে সংবাদ দিলেন, এবং নিজের লক্ষ্য জানাইয়া তাঁহাদিগের অন্তরেও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হৃদয়ে হয় স্বদেশানুরাগের ভাব অঙ্কুরিত হয় নাই, অথবা তাঁহারা কৃতকার্য্যতার বিষয়ে হতাশ হইয়াছিলেন—যে কারণেই হউক তাঁহারা গষ্টেভসের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে অন্ততঃ অধীনতা-অসহিষ্ণু অদমিত-হৃদয় কৃষকশ্রেণীর নিকট অভীপ্সিত সাহায্য পাইবেন, কিন্তু সে আশায়ও নিরাশ হইলেন। তিনি তাহাদিগের অন্তরে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করায় উত্তর পাইলেন যে, "রাজার পরিবর্ত্তনে তাহাদিগের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সংসারে তাহাদিগের হারাইবার

অতি অল্প জিনিস আছে, যে অল্প আছে, রাজবিদ্রোহী হইয়া তাহা তাহারা হারাইতে চাহে না। ডেন্‌মার্কেশ্বরের অধীনে তাহাদিগের যে দুর্দ্দশা, দেশীয় রাজা হইলেও সেই দুর্দ্দশা থাকিবে। যেই রাজা হউন, হেরিং মৎস্য ও লবণ বই তাহাদিগের আর কোন বিলাস-সামগ্রীর আশা নাই, তাহারা যে কৃষক সেই কৃষকই থাকিবে, তবে কেন তাহারা অকারণে রাজবিদ্রোহী হইবে?"

অন্যতর অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির হৃদয় ইহাতে নিশ্চয় বিচলিত হইত। কিন্তু গষ্টেভসের হৃদয় বিচলিত হইবার নহে। অভীপ্সিত বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প মনের গতি ও নিম্নাভিমুখিনী প্রবল স্রোতস্বিনীর গতি রোধ করে কাহার সাধ্য?" *। তিনি একজন দেশস্থ ব্যক্তিকে পথদর্শক লইয়া উত্তরস্থিত ডেলকার্লিয়া প্রদেশের পার্ব্বতীয় অধিবাসিবৃন্দের ও খনির কারিগরগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহার বিশ্বাসঘাতক পথদর্শক তাঁহার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন করিল। কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় তিনি অগত্যা কিছুদিন তথাকার তাম্র-খনিতে কাজ করিতে গেলেন। কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদ তাঁহাকে রাজবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়া দিল। খনির কর্ম্মকারগণ সুতরাং তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিল। তিনি তাঁহাদিগের মুখে শুনিলেন যে সেই প্রদেশের দুর্দ্দমনীয় অধিবাসিবৃন্দ বৈদেশিক অধীনতায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে। আরও অবগত হইলেন যে তাহারা অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু ও উপযুক্ত নেতা পাইলে অভ্যুত্থানে কৃতসঙ্কল্প।

সেই প্রদেশে বৎসরে বৎসরে একটী মেলা ও তদুপলক্ষে মহোৎসব হইত। এবারও অসংখ্য কৃষক সেই মেলা দেখিতে আসিল। গষ্টেভস্ উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা তাহাদিগের হৃদয় অগ্নিময় করিয়া তুলিলেন। তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া সেই স্থানেই তাঁহাকে সেনাপতিপদে বরণ করিল। তিনি সেই অদমিততেজ কৃষকসৈন্য লইয়া অবিলম্বে সমীপবর্ত্তী একটী দুর্গ আক্রমণ করিলেন। দুর্গবাসীরা সেই প্রচণ্ডবেগ রোধ করিতে সমর্থ হইল না। মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গ গষ্টেভসের করতলস্থ হইল। গষ্টেভসের আদেশে সমস্ত দুর্গবাসী শাণিত তরবারির কবলস্থ হইল। যেমন অপরাধ—তেমনই দণ্ড। এই সংবাদ ক্রমে সুইডেনের সর্ব্বত্র যেমন প্রচারিত হইল, অমনি দলে দলে অধিবাসিবৃন্দ তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতি প্রদেশ ডেন্‌মার্কের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা পঞ্চ সহস্রে পরিণত হইল।

ডেন্‌মার্করাজ তাঁহার বিজয়ে এতদূর ভীত হইলেন, যে অচিরে তাঁহার গতি

---

* কঃ ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।
—কুমারসম্ভবম্।

রোধ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে যদি গষ্টেভস্ শস্ত্র অর্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার জননী ও ভগিনীকে শমনসদনে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু জাতীয় কার্য্যে উৎসর্গীকৃতসর্ব্বস্ব বীরের হৃদয় ইহাতেও বিচলিত হইল না। তিনি জাতীয় ব্রত উদ্যাপনার পূর্ব্বে কিছুতেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। ডেনমার্করাজ প্রতিজ্ঞামত গষ্টেভসের জননী ও ভগিনীর শিরশ্ছেদনের আদেশ প্রদান করিলেন। জননী ও ভগিনীর রুধিরে অনুপ্রাণিত হইয়া অধিকতর বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অতিমানুষ বীরত্বে সুইসেরা জয়ের পর জয় লাভ করিতে লাগিল। পরশুরাম যেমন একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পিতৃবধের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন, সেইরূপ গষ্টেভস্ মাতৃভূমির উপর যে কোন ডেন্‌কে পাইতে লাগিলেন, তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া ভগিনী ও জননীর শিরশ্ছেদনের প্রতিশোধ লইতে লাগিলেন।

ক্রমে সমস্ত সুইডেন্ ডেন্‌মার্কের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। নূতন নূতন সেনাদল আসিয়া গষ্টেভসের পতাকামূলে দাঁড়াইতে লাগিল। গষ্টেভস্ সেই মিলিত সেনা লইয়া সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হলমের অবরোধের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। এইবার তাঁহার উদ্যম প্রথম প্রতিহত হইল এবং তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী অচিরকালমধ্যেই আবার তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইলেন। তিনি দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় লুবেক হইতে অনেক সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। তিনি নববলপরীত সৈন্য লইয়া তৃতীয় বার অগ্রসর হইলেন। এবার নগর অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। দুরন্ত শীতকালে রহিমানীসমাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডিত ক্ষেত্রে দিবানিশি অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার সৈন্যসকল শত্রুগণের আত্মসমর্পণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

গষ্টেভস্ সসৈন্য অবহিতচিত্তে শত্রুগণের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় অদূরে জলধি-উপরে ডেনিস রণতরি সকল পালভরে আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই সকল রণতরির চতুর্দ্দিকস্থ জলরাশি বরফ স্তূপে পরিণত হইল। গষ্টেভস্ কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে অসিহস্তে বরফশিলাতলের উপর দিয়া প্রচণ্ডবেগে সেই ভীত ও চকিত ডেনিস্‌দিগের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তাহাদিগের কামানরাজি তাঁহাদিগের উপর ভীষণ অগ্নি উদ্গারণ করিয়া তাঁহাদিগের গতিরোধ করিল। সুইডিসেরা কতিপয় মাত্র জাহাজে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

গষ্টেভস্ ক্রমিক আক্রমণ দ্বারা অবশেষে নগরগ্রহণে সমর্থ হইলেন। সমস্ত ডেন্ তাড়িত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করিল।

গষ্টেভসের বীরত্বে ও স্বদেশানুরাগে শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া সমস্ত সুইডেনবাসী একটী মহতী জাতীয় সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় সকলে একবাক্যে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ গষ্টেভস্‌কে সুইডেনের রাজসিংহাসন দিতে চাহিলেন; কিন্তু গষ্টেভসের স্বদেশানুরাগ স্বার্থপরতাশূন্য ছিল, সুতরাং তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে সকলের আগ্রহাতিশয়ে অগত্যা সুইডেনের রাজপ্রতিনিধিপদ স্বীকার করিলেন। তিনি রাজার সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু রাজসিংহাসনশূন্য থাকায় রাজ্যে রাজসিংহাসন লইয়া ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। ডেনিসরাজের দলও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ছিল না। এই জন্য প্রজারা একবাক্যে তাঁহাকে ডেন্মার্কের সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে অনুরোধ করিল। রাজ্যের ভাবী মঙ্গল কামনায় এবার গষ্টেভস প্রজাবৃন্দের মনোরথ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তদনুসারে ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুইডেনের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

লক্ষ্যের অবিচলিততা থাকিলে কি কার্য্য সাধিত না হইতে পারে? যিনি একদিন ডেন্মার্কের কারাগারে অতি কষ্টে কাল যাপন করিতেছিলেন, আজ তিনি সুইডেনের রাজরাজেশ্বর! সমস্ত সুইডেনবাসীর জীবন-সর্ব্বস্ব! ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি ঘটিতে পারে? যিনি স্বাধীনতাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর মনে করেন, অধীনতায় রাজসিংহাসনও তাঁহার নিকট কণ্টকময় বোধ হইবে। জলের মীন যেমন স্থলে বাঁচে না, সেইরূপ স্বাধীনতাময়জীবিত তেজস্বী পুরুষ কখন অধীনতায় জীবন ধারণ করিতে পারেন না। এই জন্য তাঁহারা স্বাধীনতাহারা হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিয়া মৃত্যুকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেন। চিতোর সমরে তাই রাজপুতরণবীরগণ ও বীররমণীগণ অসিহস্তে রণস্থলে আসিয়া আত্মআহুতি দিয়াছিলেন। শত্রুর পদানত দাস হইয়া রাজ্যেশ্বর হওয়া অপেক্ষা স্বাধীন ভিখারীর জীবন সহস্রগুণে সুখময়। স্বাধীনতা বীরের প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী। তাই বীরসন্ন্যাসী প্রতাপ রাজসিংহাসন ছাড়িয়া ভিখারীর বেশে পর্ব্বতে অরণ্যে অনাহারে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তথাপি স্বাধীনতার বিনিময়ে যবনের নিকট রাজসিংহাসন ক্রয় করেন নাই। তাই বীরসন্ন্যাসী ওয়ালেস্ আত্মদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দেবী জন্মভূমির চরণে উৎসর্গ করিলেন, তথাপি বিশ্বাসঘাতক এড্‌ওয়ার্ডের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাঁহার

অধীনে স্কট্‌লণ্ডের সিংহাসন লইতে চাহিলেন না। থার্ম্মোপলি গিরিসঙ্কটে তাই লিয়োনিডাস্ ও তদীয় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ত্রিশত বীরবৃন্দ দাঁড়াইয়া একে একে জন্মভূমির চরণে আত্ম-বলি দিলেন, তথাপি আততায়ী জেরাক্‌সিসের নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করিলেন না। তাই ঋষি-প্রবর ম্যাট্‌সিনি আজীবন নির্ব্বাসনকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিলেন, তথাপি অষ্ট্রিয়ার অধীনতা স্বীকার করিলেন না। তাই বীরবর গ্যারিবল্ডী দেশ দেশান্তরে অনশনে জীবন কাটাইতে লাগিলেন, তথাপি বিজেত্রী অষ্ট্রিয়ার পদানত হইলেন না। তাই বীর হঙ্গেরীয়-গণ অনশনে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে স্বীকৃত হইল, তথাপি তুরস্কের অধীনতা স্বীকার করিল না। তাই স্বাধীনতাময়জীবিত হঙ্গেরীয় বীর কসুথ আজীবন নির্বাসনে অনশনে রহিলেন, তথাপি অষ্ট্রিয়ার অধীনতা স্বীকার করিলেন না। যে এই অমৃতরসের একবার আস্বাদন পাইয়াছে, সে কখন ইহা ছাড়িতে পারিবে না। সে রাজ্য ছাড়িবে, সম্পৎ ছাড়িবে, স্বর্গ ছাড়িবে, প্রাণ ছাড়িবে—তথাপি স্বাধীনতা ছাড়িতে পারিবে না। জন্মান্ধ যেমন দর্শনসুখে আজীবন বঞ্চিত; সুতরাং দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাবজনিত ক্লেশ তত অনুভব করে না, আমরা সেইরূপ কখন সে অমৃতরসের আস্বাদন করি নাই; সুতরাং তাহার অভাবে যে কি যাতনা, তাহা তত অনুভব করি না; স্বাধীনতা হারা হইয়া গষ্টেভসের যে কি যাতনা হইয়াছিল, এবং তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার মনে যে কি অপরিসীম আনন্দ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে পারি না; যাঁহার মনে এই ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছে, তিনিই জানেন, অধীনতার কি মর্ম্মন্তুদ যাতনা। স্বাধীনতায় কি সুখ, তাহা অনুভব করিবার শক্তি আমাদের আজও জন্মে নাই। কবে জন্মিবে তাহা সেই ত্রিকালজ্ঞ কালনিয়ন্তা ঈশ্বরই জানেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর মত।

বঙ্কিম বাবু "নব জীবনের" প্রথম সংখ্যায় "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" শীর্ষক যে প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই সমালোচনা করা আমাদের অভিপ্রায়। বঙ্কিম বাবু এই প্রস্তাবে ধর্ম্মের প্রয়োজন স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের প্রয়োজন স্থাপন করিয়াছেন তাহা এই:—

মনুষ্য স্বাভাবিকই সুখের প্রার্থী। এই সুখ প্রাপ্তির উপায় ধর্ম্ম; অথবা ধর্ম্মই সুখ।

অতএব, ধর্ম্ম যখন মনুষ্যের এমত

স্বাভাবিক পিপাসা পরিতৃপ্ত করে, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, ধর্ম্মের প্রয়োজন মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ।

বঙ্কিম বাবু বলেন, "প্রকৃত সুখের যে উপায় তাহারই নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মের আর সকল ব্যাখ্যা অশুদ্ধ।"

প্রকৃত সুখের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি বলেন "আমাদিগের সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য ও সমুচিত পরিতৃপ্তিই সুখ।" "এই বৃত্তিগুলির অনুশীলনই পরিতৃপ্তি।" "এই জন্য ধর্ম্ম ও সুখ—একই।"

এ সকল কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে অনুশীলনই ধর্ম্ম; যথা:—

ধর্ম্ম ও সুখ একই। বৃত্তির পরিতৃপ্তিই সুখ। অনুশীলনই পরিতৃপ্তি। সুতরাং অনুশীলনই ধর্ম্ম।

কিন্তু শিষ্য যখন জিজ্ঞাসা করিলেন— "অনুশীলন কি ধর্ম্ম?" গুরু উত্তর দিলেন "অনুশীলনই ধর্ম্ম নয়—অনুশীলন ধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ ধর্ম্মানুমত কার্য্য।" গুরুর এই উত্তরের সহিত পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের সঙ্গতি কি, আমরা বুঝিতে পারি নাই।

বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "আমাদিগের সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য, ও সমুচিত পরিতৃপ্তিই সুখ। তিনি কোন্ যুক্তিবলে বলিলেন উহাই সুখ? তিনি কি কখন সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য ও সমুচিত পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছেন যে, বলিবেন তাহাই সুখ? আচ্ছা, তাহাই যদি সুখ হয়, তবে প্রতি দিন প্রত্যেকে অনেকবার যে সুখ দুঃখ অনুভব করেন, সেই সুখ হইতে উল্লিখিত সুখের কি কিছু প্রভেদ আছে? যদি থাকে তবে প্রথমোক্ত সুখকে কি সুখ বলিব, না সুখ ভিন্ন আর কিছু বলিব? যদি না বলি, তবে শেষোক্ত সুখকে কি বলা যায়? আমরা প্রতিদিন যে মানসিক সুখের অবস্থা কিছু কালের জন্য অনুভব করি, ইহা যদি সুখ না হয়, তবে সুখ কি? বঙ্কিম বাবু নিজেই বলিয়াছেন মনুষ্যজীবন পিপাসাময়। এই পিপাসা হয় কোন শারীরিক, না হয় কোন মানসিক অভাব সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। এবং প্রতি অভাব সম্পূরণ হইলে মনের যে অবস্থা হয় তাহাকেই আমরা সুখ বলি। আমাদের "পিপাসা" অথবা অভাব যেমন নিয়ত ঘটিতেছে;—একের পর আর একটি;—এইরূপে মন নিয়তই একটি না একটি অভাব সম্পূরণে ব্যস্ত। যখনই একটি অভাব সম্পূর্ণ হইতেছে অমনি সুখানুভব হইতেছে। সুখ ও দুঃখ এইরূপ জীবনে অহরহঃ ঘটিতেছে। মানব মনের অবস্থা নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই প্রকার পরিবর্ত্তন হয় সুখের অবস্থা, না হয় দুঃখের অবস্থা। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, সুখ কেবল মনের আপেক্ষিক অবস্থামাত্র। এখন জিজ্ঞাস্য এই, এই সুখ ভিন্ন মনুষ্য প্রকৃতিতে কি অন্য কোন প্রকার সুখের অবস্থা সম্ভব হয়? যদি হয়, তবে তাহাকে কি সুখ বলিব? যদি বলি তবে এ সুখ

হইতে তাহার ভিন্নতা কি? অবশ্য অনেক সুখ, দুঃখের কারণ হয়, কিন্তু তেমনি অনেক দুঃখও সুখের কারণ হয়। অনেক সুখ যেমন দুঃখ আনিয়া দেয়, তেমনি অনেক দুঃখ ও সুখ আনিয়া দেয়। আমরা এ পর্য্যন্ত এমত কোন লোক দেখি নাই, যাঁহার সমুদায় বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য ও পরিতৃপ্তি ঘটিয়াছে; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, ভাই, তোমার সুখ কি প্রকার? লেখক যদি দেখিয়া থাকেন, তবে বলুন, সেই মহাত্মার সুখের সহিত আমাদের সুখের তারতম্য কি? যিনি সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য ও পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, বঙ্কিম বাবুর মতে তিনিই প্রকৃত সুখ পাইয়াছেন সুতরাং তিনিই প্রকৃত পক্ষে ধার্ম্মিক লোক। আমরা বলিতে পারি না, এরূপ লোক হওয়া সম্ভব কি না। কিন্তু যদি অসম্ভব হয়, তবে জগতে ত ধর্ম্ম বলিয়া প্রকৃত সুখের উপায় স্বরূপ কোন কিছু জন্মায় নাই এবং জন্মিতে পারে না। তবে বঙ্কিম বাবু ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কি রূপে দেন? ধর্ম্ম আবার কি পদার্থ? যদি বলেন মনুষ্যের জন্য একটি Ideal চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। যদি তাহাই হয়, তবে সেই চরমোৎকর্ষই সুখ, আর কিছু সুখ নয়, এ কথা কি বলা যাইতে পারে? যদি না বলা যায়, তবে উল্লিখিত চরমোৎকর্ষই যে সুখের উপায়, আর কিছু সুখের উপায় নয়, এমত কথাও বলা যাইতে পারে না। সুতরাং বঙ্কিমবাবু-বর্ণিত সুখের উপায় ভিন্ন, সুখের অন্য উপায়ও আছে। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলেন, বৃত্তির অনুশীলনই সুখ। সুখদুঃখ সম্বন্ধে মনুষ্যের সকল অবস্থাই সমান। সকল অবস্থাতেই তিনি সুখ, দুঃখের ভাগী। ভিন্ন অবস্থায় তাহার সুখ দুঃখ ভিন্ন প্রকারে উদয় হয়। বাস্তবিক, সুখ, দুঃখ মনের আপেক্ষিক অবস্থা মাত্র। সুতরাং বঙ্কিমবাবু-বর্ণিত চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত ব্যক্তিই যে কেবল সুখের অধিকারী, আর কেহই নন, এমত কথা বলা যায় না। অতএব বঙ্কিমবাবু-বর্ণিত ধর্ম্ম ভিন্নও সুখের উপায় আছে। আর যদি তদ্ভিন্ন সুখের উপায় না থাকে, তবে বলিব সুখ এবং ধর্ম্ম মিথ্যা শব্দ মাত্র। যেহেতু উভয়ই অসম্ভব। বঙ্কিম-বাবু যাহাকে প্রকৃত সুখ বলেন, মনুষ্য তাহা কখন পাইবে না, সুতরাং মনুষ্যের ভাগ্যে প্রকৃত সুখ নাই।

বঙ্কিমবাবু নিজে বলেন, মানব সুখের জন্য লালায়িত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই বঙ্কিমবাবু সুখের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, লোকে কি সেই সুখের জন্য লালায়িত? যদি না হয়, তবে তিনি যে যুক্তি দ্বারা ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেন, সে যুক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং ধর্ম্মের প্রয়োজন প্রতিপন্ন হয় না।

সুখই যদি ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, এবং

বঙ্কিমবাবুর মতে নীতির অনুশীলন যদি ধর্ম্মের অন্যতম উপাদান হয়, তবে পৃথিবীর জীবনক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,সকল সময় নীতি অবলম্বন করিলেই যে সুখে উপনীত হওয়া যায়, এ কথা মিথ্যা। জগৎ সংসারে দেখা যায়,অনেক দুর্বিনীত লোকই সুখভোগ করেন এবং অনেক সচ্চরিত্র লোক দুঃখ পান। সৎপথেই যে সুখ আছে, ইহ সংসারে এমত প্রতীত হয় না। তবে কিরূপে বলিব ধর্ম্মই একমাত্র সুখের উপায়, অধর্ম্ম সুখের উপায় নয়।

এ কথায় একটি আপত্তি এই যে, দুর্ব্বিনীতেরা যে মনে মনে অসুখী নহে, কে বলিল? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, আত্মগ্লানি অধিকাংশই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে দেখা যায় এবং নীতিজ্ঞানও সকল লোকের এবং সর্ব্বসমাজে সমান নহে। এক সমাজে যাহা পাপ বলিয়া উক্ত হয়,অন্য সমাজে তাহা পাপ বলিয়া উক্ত হয় না। গোহত্যা হিন্দুসমাজে মহাপাপ, মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজে তাহা পাপ নহে। আরও দেখা যায়, যে ব্যক্তি কোন অসৎ পথ অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা সুখে কাটায়, অভ্যাস বশতঃ তাহার সেই অসৎ পথে কিছুই আত্মগ্লানি উদয় হয় না। প্রত্যুত সে চিরজীবন সুখে কাল কাটাইয়া যায়। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, ইহ সংসারে অধর্ম্ম ও দুর্নীতি পথে সুখ নাই এমত নহে। বরং অনেকস্থলে অসৎ পথই সুখের প্রধান উপায় বলিয়া প্রতীত হয়। লোকের পাপ পুণ্যের জ্ঞান অধিকন্তু অভ্যাস ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। আর যদি একথা সত্য হয় যে মনুষ্যের বৃত্তিসকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং পরিতৃপ্তি অসম্ভব, তবে অবশ্য বলিতে হইতেছে শিক্ষা, সর্ব্বসমাজে এবং সর্ব্বলোকে কথন সমান হইতে পারে না। শিক্ষার তারতম্য ঘটিবেই ঘটিবে। সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি এবং সামঞ্জস্য ঘটিলে যে কিরূপ নিয়মকে প্রকৃত নীতি বলিব, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। আমাদিগকে চিরদিনই অসম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, অসম্পূর্ণ সামঞ্জস্য এবং অসম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লইয়াই চালাইতে হইবে। এই প্রকার অসম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি এবং সামঞ্জস্যে যে প্রকৃত নীতি পথ কখনই নিরূপিত হইতে পারে না,তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে মনুষ্যসমাজ নর নারী, রাজা, প্রজা, ধনী নির্ধন প্রভৃতি পরস্পর প্রতিকূল,বিসম্বাদী এবং বিসদৃশ উপকরণে গঠিত, এবং যেখানে এই দুই উপকরণ মধ্যে পরস্পর ভেদাভেদ, হিংসা দ্বেষ, ও শিক্ষার তারতম্য অবশ্যম্ভাবী, সেখানে প্রকৃত নীতি পথ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এক জাতির পক্ষে যাহা সুনীতি হইবে, অন্য জাতির পক্ষে তাহা হয় তো ঘোর অত্যাচার হইতে পারে। মনুষ্য সমাজে এই পার্থক্য এবং বৈরভাব নিরাকরণ হওয়া অসম্ভব। দুই জাতিই যে

সম-ভাবে আপনাদের বৃত্তি সমুদায়ের স্ফূর্ত্তি সাধন করিয়া সমঞ্জস-ভাবে পরস্পরের সুখের হন্তা না হইয়া সংসারে নীতি পথ অবধারণ করিয়া লইবে, ইহা একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং পৃথিবীতে যাহা নীতি বলিয়া প্রচারিত, তাহার অধিকাংশই অভ্যাস ও শিক্ষার ফল। নীতি ধর্ম্মের উপাদান, ধর্ম্ম সুখের উপাদান। সুতরাং অভ্যাস ও শিক্ষা সুখের উপায় হইয়া দাঁড়ায়। এই অভ্যাস এবং শিক্ষা যেমন সমাজে সমাজে বিভিন্ন প্রকার, প্রত্যেক ব্যক্তিতেও তদ্রূপ। সুতরাং সুখ ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে না। উহা অভ্যাস ও শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু বঙ্কিমবাবু প্রতিলোকের শিক্ষা ও অভ্যাসকে কি ধর্ম্ম বলিতে পারেন? অথচ দেখিতে পাই, প্রতিলোকের শিক্ষা ও অভ্যাসই তাহার সুখের উপায়।

বঙ্কিম বাবু যাহা ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখা করিয়াছেন, ইংরাজীতে তাহার নাম Education এজুকেশন। বঙ্কিম বাবুর রিলিজন, এজুকেশন মাত্র। ইংরাজীতে এই এজুকেশন শব্দ অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। বঙ্কিমবাবু যাহা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বলেন, সেই সমুদায় মনুষ্য বৃত্তির স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য ও পরিতৃপ্তি সাধন করাও এজুকেশনের উদ্দেশ্য। বাঙ্গালাতে ঠিক এজুকেশন-অর্থবোধক কোন শব্দ আছে কি না জানি না। যাহা হউক, তিনি যদি বলিতেন যে, যাহাকে ইংরাজীতে এজুকেশন বলে, ধর্ম্মও তাহাই, ধর্ম্ম বলিয়া আর কিছু পৃথক্ পদার্থ নাই, তাহা হইলে তাহার অর্থ আমরা আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিতাম। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম, বঙ্কিমবাবুর মতে পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই, এজুকেশনই সব। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি এ কথা স্বীকার করেন না? যদি না করেন, আমাদের ভ্রম দেখাইয়া দিন।

এজুকেশনই যদি ধর্ম্ম হয় এবং আমাদের বৃত্তিসকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং পরিতৃপ্তি সাধন করাই যদি এজুকেশন হয়, তবে এই ধর্ম্ম ও এজুকেশন কি বঙ্কিম বাবু সাধারণ সকল জাতিকে দেওয়া বিধেয় জ্ঞান করেন? পৃথিবীতে সকলেই ধর্ম্মের অধিকারী। সুতরাং সকলেই সমান এজুকেশন (শিক্ষা) পাইবার অধিকারী। কি রাজা কি প্রজা, কি নর কি নারী সকলেরই ধর্ম্মে অধিকার আছে, সকলেই সুখ চায়, সুতরাং সকলেই এজুকেশনের সমান অধিকারী। ইহাই সাম্যবাদ। নীচকে উচ্চ করা, ছোটকে বড় করা সাম্যবাদ। ধর্ম্ম এই সাম্যবাদের প্রয়াসী। ধর্ম্ম সকলকে উচ্চে উঠাইতে চায়। ধর্ম্ম শূদ্রকেও ব্রাহ্মণ করিতে চাহিবে, ব্রাহ্মণকে দেবতা করিতে চাহিবে। প্রজাকে রাজাপদে উন্নীত করিতে চাহিবে, নারীকে পুরুষের মত উন্নত করিবে। বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মমত যদি এরূপ উদার

হয়, তবে সে ভাবকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলিতে হইবে।

বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্মভাব আর এক কারণেও উদার। ধর্ম্ম যখন এজুকেশন মাত্র হইল, আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন এবং চরিতার্থতা সাধন করা যখন তাহার প্রয়োজন, তখন ধর্ম্ম শুদ্ধ ইহ লোকেরই জন্য আবশ্যক। ঈশ্বর এবং পরলোকের উপর বিশ্বাস না থাকিলেও আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন এবং চরিতার্থতার কোন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। সুখই যখন ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, তখন সে সুখ ইহ লোকেই লব্ধ হইতে পারে, পরকাল এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়াও সুখভাগী হওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিম বাবু নিজেই বলিয়াছেন, মিল নিরীশ্বর-বাদী ছিলেন এবং পরকালেও তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, অথচ মিল একজন সাধু সচ্চরিত্র লোক ছিলেন, তিনি যতদূর সাধ্য আপনার বৃত্তিসকলের অনুশীলন করিয়া ছিলেন। তাহাদের সামঞ্জস্য এবং পরিতৃপ্তিও সাধন করিয়াছিলেন। অতএব তিনি কিয়ৎ পরিমাণে ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তদ্রূপ ঋষিশ্রেষ্ঠ পরম ভক্তিভাজন, সকল ঋষিগণেরও পূজার্হ সাংখ্যকার কপিলও নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্মব্যাখ্যানুসারে তাঁহাকেও কিয়ৎ পরিমাণে ধার্ম্মিক লোক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বঙ্কিমবাবু বলেন, রিলিজনের (Religion) সহিত, নীতির কোন সম্পর্ক নাই, "নীতি আইন মাত্র"। রিলিজন না থাকিলেও নীতি থাকিতে পারে। "এরূপ ইয়ুরোপীয় বিস্তর কৃতবিদ্য ভাবুক, বিজ্ঞ এবং সচ্চরিত্র লোক আছেন, যাঁহারা Religionএর আবশ্যকতা মানেন না। এ দেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরূপ লোকের সংখ্যা বড় অধিক।" বাস্তবিক এ সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই। সর্ব্বসাধারণ জনগণ এরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, যেন তাহারা ঈশ্বর এবং পরকালের প্রতি একান্ত উদাসীন। ঈশ্বর এবং পরকালের বিশ্বাস কেবল মুখের কথা মাত্র। লোককে জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই বলিবেন আমরা ঈশ্বর এবং পরকাল সম্পূর্ণ মানি, কিন্তু কার্য্যকালে অল্প লোকেই সেই বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, এ সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের সহিত নিরীশ্বরবাদীর প্রভেদ কিছুই নাই। তাহারা কেবল মুখে ঈশ্বর এবং পরকাল মানেন মাত্র, কার্য্যে মানেন না। রিলিজনবাদীর সহিত নীতিমাত্রবাদীর এইজন্য প্রভেদ নাই বলিলে হয়। যাহা হউক, বঙ্কিমবাবু যখন ধর্ম্মকে সুখের উপায় স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন অবশ্য বলিতে হইবে তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যার সহিত ঈশ্বর এবং পরকালের সম্পর্ক না থাকিলেও ক্ষতি নাই। এরূপ নিরীশ্বর এবং পরকালনিরপেক্ষ ধর্ম্ম তিনি প্রথমে শিক্ষা দিয়া পরে কেন

ধর্ম্মের সহিত ঈশ্বর ও পরকাল জড়াইয়াছেন আমরা বুঝিতে পারি না। বঙ্কিম বাবুর ঈশ্বর এবং পরকাল কিরূপ, আমরা পরে তাহার বিচার করিব।

ধর্ম্মকে সুখের উপায় স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলে তাহা হিতবাদ মাত্র (Utilitarianism) হইয়া দাঁড়ায়। বঙ্কিমবাবুও তাঁহার প্রস্তাবের একস্থলে দেখাইয়াছেন যে এই হিতবাদ হিন্দুশাস্ত্রের উচ্চশিক্ষা। তিনি বলেন "যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার।" বঙ্কিমবাবুর মতে, অন্যের কথা দূরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য কেহই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন নাই। যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই গ্রন্থে ধর্ম্মের এইরূপ আভাস পাওয়া যায়।—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন:—"অনেকে শ্রুতিকে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণীগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রক দিগের হিংসা নিবারণার্থই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণীগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম।"

"ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পর বনপর্ব্ব হইতে ব্যাধোক্ত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক, তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্য প্রভাবে যথার্থ জ্ঞান ও হিত সাধন হয়। এস্থলে ধর্ম্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।"

ইহা সম্পূর্ণ হিতবাদ। বঙ্কিম বাবু বলেন "যে খানে এই ধর্ম্ম দেখি, অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্যত্র, কি ভাগবতে, সর্ব্বত্রই দেখি শ্রীকৃষ্ণই ইহার বক্তা। এইজন্য আমি হিন্দু শাস্ত্র নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম বলিতে ইচ্ছা করি।" এই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম, বঙ্কিম বাবুর মতে, ধর্ম্মের পূর্ণ অবয়ব। এই পূর্ণ অবয়বী ধর্ম্ম, এই অহিংসা ধর্ম্ম, এই হিতবাদ, শাক্যসিংহ প্রভৃতি ধর্ম্ম-গুরুগণও উপদেশ দিয়াছিলেন কি না, তাহার বিচার আমরা করিতে চাহি না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই হিতবাদ কি ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, না নীতির ব্যাখ্যা? ইহা যদি ধর্ম্মের ব্যাখ্যা হয়, তবে কি ধর্ম্ম নীতিমাত্রে পর্য্যবসিত হয় না? শ্রুতির ধর্ম্মতত্ত্ব অপেক্ষা এ ধর্ম্ম কি উৎকৃষ্টতর, না অধিক সম্পূর্ণ? হিতবাদ কি হিন্দুশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট উপদেশ?

যাহাই হউক, সুখ যদি ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তবে ধর্ম্মের সেই ব্যাখ্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য আছে। ধর্ম্ম সুখের উপায়, হিতবাদের ও লক্ষ্য সুখ। হিতবাদই ধর্ম্ম। সুখের জন্যই যখন ধর্ম্ম, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, সুখের কামনায় লোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। যাহা কামনা চরিতার্থ করে, তাহাই সকাম। সুতরাং ধর্ম্ম ও হিতবাদ উভয়ই সকাম। বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মব্যাখ্যা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি। ভগবদ্গীতায় যে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ আছে, বঙ্কিম বাবুর মতে যে উপদেশ শাক্যসিংহ, যীসস্, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, জৈন অবতার প্রভৃতি কোন ধর্ম্ম-গুরুই দিতে পারেন নাই, সেই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মকে অবশ্য সকাম বলিতে হইবে। যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—সাধারণের হিত ও শ্রেয়, যাহা প্রাণীগণের রক্ষার উপায় স্বরূপ, যাহা হিতার্থ এবং রক্ষার্থ আচরিত হয়, তাহা অবশ্য সকাম হইল। হিত, শ্রেয়ঃ এবং রক্ষা যদি সুখের নিমিত্ত হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম নিশ্চয় সকাম ধর্ম্ম।

ধর্ম্মকে এই রূপে সকাম করিয়া বঙ্কিম বাবু অন্যত্র বলিতেছেন।—"সকাম ধর্ম্ম, ধর্ম্মই নয়। আমি তোমাকে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছি যে, সুখের উপায়ই ধর্ম্ম। বস্তুত ধর্ম্মই সুখ।" "নিষ্কাম ধর্ম্মের এরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, ধর্ম্ম কামনা করিবে না। ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই কামনা করিবে না, ইহাই তাৎপর্য্য। ধর্ম্মার্থ ধর্ম্ম করিবে, কর্ম্মফলের জন্য কর্ম্ম করিবে না। নিষ্কাম ধর্ম্ম এত অল্প কথায় বুঝান যায় না। সে আর একদিনের কথা।"

এস্থলে বেশ বুঝা যায় যে বঙ্কিমবাবু সকাম ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলেন না। নিষ্কাম না হইলে, ধর্ম্মের এমত কি ক্ষতি হয় যে, তজ্জন্য তাহা আর ধর্ম্মপদে উক্ত হয় না। সকাম হইলে, ধর্ম্ম হয় না কেন? বঙ্কিমবাবু নিষ্কাম ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা দিলেন তাহা ত প্রকৃতপক্ষে সকাম হইয়া দাঁড়াইল। তিনি বলেন, ধর্ম্ম ও সুখ একই। ধর্ম্ম ও সুখ একই বলা যাহা, ধর্ম্ম, সুখের উপায় বলাও তাহা। নিষ্কাম ধর্ম্মে, ধর্ম্মই কামনা, কিন্তু বঙ্কিম-বাবু আবার বলেন, ধর্ম্মই সুখ। সুতরাং নিষ্কাম ধর্ম্ম, সুখের নিমিত্ত। অতএব নিষ্কাম, সকাম, একই কথা। যাহা হউক, বঙ্কিমবাবু বলেন, তিনি নিষ্কাম ধর্ম্ম পরে বুঝাইবেন। যাহা বলিয়াছেন তাহাতে প্রতীত হয় যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি একই কথা বলিয়াছেন (Reasoning in a Circle); তিনি কি তৎপরে ভাল করিয়া বুঝাইতে চান যে, আমি একই কথা বলি নাই। যাহা হউক, আমরা তজ্জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

কার্য্য এবং ধর্ম্ম নিষ্কাম কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমরা অল্প বুদ্ধিতে

বুঝিতে পারি না। যিনি পরকালের ফললাভ প্রত্যাশায় দয়া ধর্ম্মের আচরণ করেন, তিনিও যেমন আত্ম সুখের জন্য পরের দুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হন, আর যিনি সেরূপ ফল প্রত্যাশী না হইয়া কেবল নিজের দয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এবং পরের দুঃখ দেখিয়া নিজ কষ্টবোধ মোচন কবিবার জন্য সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিও সেইরূপ সুখের জন্য ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। কামনা ব্যতীত যে কার্য্য হইতে পারে বঙ্কিমবাবু কি একথা বলিতে চাহেন? আমরা ত জানি, কামনা বিরহিত যাহা, তাহাই নিষ্কাম। নিষ্কাম শব্দ যদি অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে তাহা সকাম হইয়া পড়িবে। বঙ্কিমবাবু যেন আমাদের এই সকল কথার বিচার করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম বুঝাইতে প্রবৃত্ত হন। তিনি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার সহিত নিষ্কাম ধর্ম্মের সঙ্গতিও আমরা বুঝিতে চাহি।

আমরা আরও জানিতে চাহি, ধর্ম্ম যদি নিষ্কাম হয়, তবে তাহা সেই নিষ্কাম ধর্ম্মরূপে সাধারণ লোকসমাজ মধ্যে চলিতে পারে কি না? বঙ্কিমবাবু কি দেখাইতে পারেন যে, পৃথিবীতে কোন ধর্ম্ম (Religion) এ পর্য্যন্ত নিষ্কাম হইয়া চলিয়া আসিতেছে। আমরা দেখিতে পাই, সকাম না হইলে কোন ধর্ম্মই চলিতে পারে না। যে হিন্দুধর্ম্ম সাধারণ সমাজমধ্যে প্রচলিত, তাহা সকাম,—পূর্ণ সকাম। তদ্রূপ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, মহম্মদীয় ধর্ম্ম। তদ্রূপ বৌদ্ধ, শিখ, বৈষ্ণব ও জৈন ধর্ম্ম। সাধারণ লোকে ধর্ম্মকে সকাম করিয়া তবে গ্রহণ করে। যাহা সকাম নহে, তাহা সকলের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারে না। সুতরাং তাহা জনসমাজে গৃহীত হয় না। জনসমাজ যাহা গ্রহণ করিবে, তাহা সকাম রূপে গ্রহণ করিবে, নহিলে গ্রহণ করিবে না। তুমি নিষ্কাম ধর্ম্ম উপদেশ দিলে কি হইবে, পৃথিবীতে তাহা প্রচলিত হইবে না। যাহা প্রচলিত হইবে না, তাহা কখন ধর্ম্ম (Religion) হইতে পারিবে না। নিষ্কাম ধর্ম্ম যখন ধর্ম্ম (Religion) রূপে পৃথিবীতে চলিতে পারে না, তখন তাহার উপদেশ দেওয়ার ফল কি? সেই নিষ্কাম তত্ত্ব কিরূপে তবে ধর্ম্মের গুণ হইতে পারে? যাহা সাধারণ জনসমাজ মধ্যে প্রচলিত থাকে, তাহাই যদি ধর্ম্ম (Religion) হয়, আর ধর্ম্ম সকাম না হইলে যদি তাহা সাধারণ জনসমাজে প্রচলিত না হয়, তবে ধর্ম্ম কখন নিষ্কাম হইবার সম্ভাবনা নাই। দুই একজন পণ্ডিতের মতমাত্র রিলিজন নহে। যাহা সাধারণ জনসমাজে প্রচলিত তাহাই রিলিজন। নিষ্কাম রিলিজন, দুই চারিজন পণ্ডিতের মত মাত্র। হিন্দুশাস্ত্রে নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা জনসমাজে কখন গৃহীত হয় নাই, হইবেও না। তাহা চিরদিন গ্রন্থমধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। হিন্দুরা যে ধর্ম্ম আচরণ করে,

তাহা পূর্ণ সকাম, পারলৌকিক ধর্ম্ম। আর পৃথিবীতে এমত কোন মনুষ্য-সমাজ নাই, যাহা নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। এসকল কথা যদি সত্য হয়, তবে নিষ্কাম হওয়া রিলিজনের লক্ষণ নহে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, সকাম ধর্ম্মই ধর্ম্ম; নিষ্কাম ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়।

জৈমিনি ধর্ম্মের যে লক্ষণ দিয়াছেন বঙ্কিমবাবু তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা কার্য্য-প্রবর্ত্তক তাহাই নোদনা এবং ধর্ম্ম "নোদনালক্ষণঃ।" নোদনা যদি ধর্ম্মের অন্যতম লক্ষণ হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যাহা সাধারণ জনসমাজকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়, তাহা সকাম। সুতরাং এ লক্ষণ অনুসারেও ধর্ম্ম সকাম। নোদনা লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্মের সহিত নিষ্কাম ধর্ম্মের সঙ্গতি বুঝিতে পারা যায় না। বঙ্কিমবাবু নিজে নিষ্কাম ধর্ম্মের যে আভাস দিয়াছেন বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, তাহা এক প্রকার সকাম ধর্ম্মের আভাস মাত্র। সুতরাং তিনি নিষ্কাম ধর্ম্মের ব্যাখ্যা না করিয়া যদি বলিতেন যে, সকাম ধর্ম্ম দ্বিবিধ, তাহা হইলে তাহার কথার অধিক সঙ্গতি থাকিত। তিনি যদি বলিতেন এক প্রকার সকাম ধর্ম্ম, কর্ম্মের ফলাফল চায়, অন্যপ্রকার সকাম ধর্ম্ম, আত্মপ্রসাদের আধার এবং সুখের আধার স্বরূপ ধর্ম্মকেই চায়। এইরূপে সকাম-ধর্ম্মের প্রকারভেদ করিয়া দিলেই, ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ বিবৃত হইত। নহিলে প্রকৃত পক্ষে যাহা সকাম, তাহাকে নিষ্কাম বলিলে অর্থবোধের বিপর্য্যয় ঘটে। এক্ষণে আমরা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্কিমবাবু সুখের উপায় স্বরূপ ধর্ম্মের এই কয়েকটি উপাদান স্থির করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিক্ষাও (Education অথবা Culture) যাহা বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্মও তাহা। এই এজুকেশন (শিক্ষা) দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। মানসিক শিক্ষা ত্রিবিধ—জ্ঞানবৃত্তির অনুশলীন, প্রবৃত্তির অনুশীলন, এবং নৈতিক অথবা কার্য্যবৃত্তি এবং ইচ্ছার শিক্ষা। এই কয়েক বিধ শিক্ষায় সমুদায় জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড নিঃশেষিত। জ্ঞানবৃত্তি ও প্রবৃত্তির অনুশীলন—জ্ঞানকাণ্ড, এবং নৈতিক ও শারীরিক অনুশীলন কর্ম্মকাণ্ড। সুশিক্ষিত ব্যক্তি এই চারি প্রকার অনুশীলনই করিয়া থাকেন। এই চারিবিধ শিক্ষা (Culture) না পাইলে কোন লোক সুশিক্ষিত হয় না। বঙ্কিমবাবু ধর্ম্মের ও এই চারিবিধ উপাদান স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন এই সমস্ত উপাদানের সমবায় ধর্ম্ম। সুতরাং তাহার মতে ধর্ম্মও যাহা, শিক্ষাও (Culture) তাহা। তিনি জ্ঞানের অনুশীলন সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন ঃ—

"পার্শ্ববর্ত্তী জড়প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি সেই অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির উপায়ও বটে, সীমাও বটে। অতএব বহির্জগতের এবং অন্তর্জগতের প্রকৃতি আমাদের

জানা চাই। যেখানে জানিতে না পারি, সেখানে একটা তত্ত্ব মনে মনে স্থির করিয়া লই—যথা, এই জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট এবং ঈশ্বর নিয়ত, এবং ইহলোকের ফল পরলোকে বা জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়। জগৎ সম্বন্ধে ঈদৃশ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায়। ইহাই ধর্ম্মের মূল।”

বঙ্কিম বাবু ধর্ম্মের মূল অথবা তত্ত্বজ্ঞান (Doctrinal Religion) এইরূপে বিবৃত করিয়া প্রবৃত্তি-অনুশীল সম্বন্ধে (Emotional Religion) এইরূপ লিখিতেছেনঃ—

“তত্ত্বজ্ঞানের অন্তর্গত যে সকল পদার্থ, তাহার মধ্যে উপাস্য পদার্থ পাই। এক্ষণে মিলের সেই বাক্য স্মরণ কর—‘Ideal Object of the Highest Excellence” ইহা তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে পাই। ইহাই উপাস্য। ইহা কোথাও ঈশ্বর, কোথাও দেব দেবী, কোথাও গাছ পাথর, কোথাও Humanity।” “ঈদৃশ পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের মানসিক অবস্থা—“Habitual and Permanent admiration” ইহাই উপাসনা।”

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, ঈশ্বর এবং পরকাল দার্শনিকগণের (Hypotheses) অভ্যুপগম মাত্র। যেখানে অন্তর্জগতের এবং বহির্জগতের প্রকৃতি জানিতে না পারা যায়, সেইখানে দার্শনিকগণ দুইটি বিষয় ধরিয়া লন—একটি ঈশ্বর আর একটি পরকাল। আমরা জিজ্ঞাসা করি সকল দার্শনিকগণই কি এই দুই তত্ত্ব ধরিয়া লইয়াছিলেন? সাংখ্যকার কপিল এবং মীমাংসাকার জৈমিনি কি এই প্রকার ঈশ্বরগড়া তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হইয়াছিলেন? বৃহস্পতি কি এই তত্ত্বজ্ঞানে আসিয়াছিলেন? এই দুইটি অভ্যুপগম কি বৈজ্ঞানিক এবং বিশুদ্ধ Hypotheses? বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কি এই দুইটি অভ্যুপগম তিষ্ঠিতে পারে? আমরা পদার্থের গুণ মাত্র জানিতে পারি, কিন্তু তাহার প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব কিছুই জানিতে পারি না। দর্শন এবং বিজ্ঞানে যাহা প্রকৃতিশক্তি (Force or Energy) বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের জ্ঞান তাহার কিছুই রহস্য ভেদ করিতে পারে না। এই প্রকৃতিশক্তি মনুষ্যের জ্ঞানাতীত। বঙ্কিমবাবু বলেন যাহা মনুষ্যের জ্ঞানাতীত তাহা বুঝিবার জন্য মনুষ্য দুইটি বিষয় স্থির করিয়া লইয়াছে—ঈশ্বর ও পরকাল। এই দুইটি বিষয় স্থির করিয়া লইয়া মনুষ্যের অজ্ঞতা কি দূরীকৃত হইয়াছে? না মনুষ্য পূর্ব্বে যেরূপ অনভিজ্ঞ ছিলেন, আজিও তদ্রূপই আছেন? বরং ঈশ্বর এবং পরকাল ধরিয়া লওয়াতে, মনুষ্য যাহা জানিতে পারিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও তাহার ঘোর গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয় এত বিস্তৃত, যে এস্থলে তাহার সমুদায় পর্য্যালোচনা করা যাইতে পারে না। আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে, জ্ঞানানুশীলনের চরম ফল প্রকৃতি-অতীত, অলৌকিক বিশ্বস্রষ্টা স্বরূপ ঈশ্বর পুরুষ এবং পরকাল রূপ অভ্যুপগমদ্বয়

অবশ্যম্ভাবী নহে। এরূপ ঈশ্বর এবং পরকাল দর্শনতত্ত্বে প্রমাণিত হয় না। কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত এরূপ ভ্রান্তিতে উপনীত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা অভ্যুপগমের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেন নাই বলিয়াই তদ্রূপ ভ্রান্ত হইয়াছেন। যাঁহারা তদ্রূপ পরীক্ষা করেন, তাঁহারা দেখিতে পান, সেরূপ অভ্যুপগম অগ্রাহ্য। সুতরাং স্থির হইতেছে, যে এই দুইটি অভ্যুপগম দর্শনতত্ত্বের এবং জ্ঞানানুশীলনের অবশ্যম্ভাবী ফল নহে এবং উহারা বিশুদ্ধও নহে। বিজ্ঞান (Soience) ও দর্শন (Philosophy) প্রকৃতি-অতীত কোন অলৌকিক শক্তির সত্ত্বা সপ্রমাণ করিতে পারে না। তাহারা প্রকৃতিমাত্রে আবদ্ধ। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন, প্রকৃতিই মানবজ্ঞানের সীমা। তবে যদি প্রকৃতি-শক্তিকে ঐশী শক্তি বলা যায়,—সাংখ্য-মতে যাহা অব্যক্ত এবং মূলপ্রকৃতি,—যে মূলপ্রকৃতির পরিণাম এই বাহ্যজগৎ, তাহাকেই যদি ঐশীশক্তি বলা যায়, তবে সেরূপ ঐশীশক্তিও আজি পর্যান্ত বৈজ্ঞানিক Hypotheses মাত্র হইয়া আছে। বঙ্কিমবাবু বোধ হয় এরূপ শক্তিকে ঈশ্বর বলেন নাই। যাহা হউক আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তাঁহার ঈশ্বর শব্দের অর্থ কি? তিনি কি প্রাকৃতিক শক্তিকে ঈশ্বর বলেন? সেরূপ ঈশ্বর কি ধর্ম্মের মূল? তাঁহার ঈশ্বর শব্দের অর্থ যদি প্রকৃতি-অতীত স্বতন্ত্র পুরুষ হয়, সেই স্বতন্ত্র পুরুষই বিশ্বস্রষ্টা এবং এই জগৎ সংসার সেই পুরুষ দ্বারা শাসিত হইতেছে; তাঁহার ঈশ্বর শব্দের অর্থ যদি এরূপ হয়, তবে আমরা দেখিতে পাই যে এরূপ পুরুষ, দর্শন ও বিজ্ঞান সপ্রমাণ করে না। সুতরাং জ্ঞানানুশীলনের চরম সিদ্ধান্তে যে ঈশ্বররূপ অভ্যুপগমে উপনীত হওয়া যায়, একথা আমরা স্বরূপ বিবেচনা করি না। এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্কিমবাবু যাঁহাকে ঈশ্বর এবং পরকাল বলেন, সেই ঈশ্বর এবং পরকালরূপ অভ্যুপগমদ্বয় কতদূর ধর্ম্মের মূলভিত্তি হইতে পারে।—

আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, দর্শন-তত্ত্বে ঈশ্বর এবং পরকাল কিরূপে গৃহীত হয়। এ কথা সত্য হইতে পারে যে, যে তত্ত্বদ্বয় দার্শনিকগণ ধরিয়া লইয়াছিলেন, সামান্য লোকে তাহাদিগকে প্রকৃত পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দার্শনিকগণের ঈশ্বর ও পরকাল অভ্যুপগম মাত্র, প্রাকৃত জনগণের ঈশ্বর জীবিত, সত্য এবং নিত্য পুরুষ; তাহাদিগের পরকাল ইহকাল হইতেও সত্য। ধর্ম্মের ঈশ্বর এবং পরকাল এইরূপ জীবিত ঈশ্বর এবং সত্য পরকাল। তাহা দার্শনিকগণের মত মাত্র নহে। পৃথিবীতে যে কতিপয় প্রধান ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সেই হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম্মের আলোচনায় দেখা যায় যে, ধর্ম্মোপাসকেরা ঈশ্বরকে এত সত্য জ্ঞান করে যে তাহাদিগের নিকট প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ সকলও এক-

দিন মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু এই ঈশ্বর কখন মিথ্যা হইতে পারে না। তাঁহারা দেব, দেবতা, এবং ঈশ্বরকে প্রকৃত জীবিত পুরুষজ্ঞানে তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করেন। তদ্রূপ পরকালও তাঁহাদিগের নিকট সত্য—এত সত্য যে তাঁহারা ইহকাল নষ্ট করিয়াও পরকালের সুখসঞ্চয় করিতে অহরহঃ যত্নবান। খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, বৈষ্ণব সকলেরই সম্বন্ধে একথা খাটে। সুতরাং প্রতীত হইতেছে, ধর্ম্মের যাহা মূল, তাহা দার্শনিক (Hypotheses) মত মাত্র নহে, তাহা জীবিত এবং সত্য ঈশ্বর ও পরকাল। দার্শনিক মত মাত্ররূপে ঈশ্বর ও পরকাল জনসমাজে গ্রাহ্য নহে। সুতরাং বঙ্কিমবাবু যাহা ঈশ্বর এবং পরকাল বলেন, ধর্ম্মের (Religion) মূলভিত্তি তাহা নহে। ধর্ম্মের যাহা মূল ভিত্তি, সেই ঈশ্বর ও পরকাল দার্শনিক মত হইতে অনুস্যূত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া শুদ্ধ দার্শনিক (Hypotheses) মতকে ধর্ম্মের মূল বলা সঙ্গত নহে। দার্শনিক মত ভ্রান্ত বলিয়া ও সপ্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম, মনুষ্যের আশার উপর স্থাপিত। যাহা মনুষ্যের প্রবল আশার পরিতোষ সাধন করে, তাহা অলীক পদার্থ নহে। তাহাকে দার্শনিকগণের মত মাত্র বলিলে মনুষ্যের সেই প্রবল আশায় আঘাত লাগে। যদি বল ঈশ্বর ও পরকাল দার্শনিকগণের মত মাত্র, তবে মনুষ্যের সমুদায় ধর্ম্মের মূলভিত্তি একেবারে ধসিয়া যায়।

ঈশ্বর এবং পরকাল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা বঙ্কিমবাবুর "উপাস্য পদার্থ" সম্বন্ধেও খাটে। ধর্ম্মের ঈশ্বর কেবল Ideal object নহে। তাহা মানবমস্তিষ্কের শুদ্ধ চিন্তার স্বরূপ নহে, মানব মনের সৃষ্টি নহে। তাহা প্রকৃত জীবিত পুরুষ,—যাঁহাকে মনুষ্য কায়মনোবাক্যে পূজা করেন; যে পূজা শুদ্ধ "Habitual and Permanent admiration" মাত্র নহে। সেই দেবপূজা স্তবস্তুতিতে নিঃশেষিত নহে। আরাধ্য দেবতাগণ উপাসকের প্রার্থনা পূর্ণ করেন, স্তবে এবং স্তুতিতে পরিতুষ্ট হন এবং ধ্যানে হৃদয়ে জীবিত মূর্ত্তিতে উদয় হন। ধর্ম্মের (Religion) উপাসনা বা পূজা এইরূপ প্রকৃত দেবতার পূজা। ধর্ম্মোপাসক দেবতার পরিতোষার্থ তাঁহার স্তব করেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ধ্যান করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বর লইবার জন্য প্রার্থনা করেন। "Ideal object" এর নিকট কে বর চাহে, কে তাহার পরিতোষ সাধনে যত্নবান হয়? লোকের Ideal বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, কিন্তু দেবতা ও ঈশ্বর বিভিন্ন প্রকার নহে। সেই ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বমঙ্গলময়, পরম কারুণিক দেবতা। তাহা নিত্য, সত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় জীবিত পুরুষ। এরূপ ঈশ্বর মানবের চিন্তা-সম্ভূত Ideal মাত্র নহে।

দর্শনতত্ত্বে এরূপ ঈশ্বর সম্ভব নহে। ধর্ম্মের (Religion) ঈশ্বর দর্শনতত্ত্বে পরীক্ষিত হইলে কখনই তিষ্ঠিতে পারে না,* সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানে যে "উপাস্য পদার্থ" লব্ধ হয়, যে Ideal লাভ করা যায়, তাহা ধর্ম্মের উপাস্য দেবতা নহে।

বঙ্কিম বাবুর আর একটি কথা এই:—ধর্ম্ম মাত্র ভ্রম এবং মিথ্যা-সংসৃষ্ট, এবং মিথ্যা মাত্রেই অনিষ্ট আছে। "এই জন্য সকল ধর্ম্মের সংস্কার আবশ্যক। যে ধর্ম্মই অবলম্বন কর, তাহার সংস্কার পূর্ব্বক, ভ্রান্তি ও মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তদন্তর্গত সত্যকে ভজনা করিবে।"

ইহা খাঁটি Eclecticism। নির্ব্বাচন করিয়া যদি ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে যত লোক, প্রায় ~~তত গুলি~~ ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। বঙ্কিমবাবু সংস্কার করিয়া ধর্ম্মকে কি অবলম্বন করিতে বলিতেছেন? সংস্কার করিলে ধর্ম্ম কিরূপে অবলম্বনীয় হইবে? সংস্কার করিলে আমরা ধর্ম্মের (Religion) দিকে যাইলাম, না ধর্ম্ম আমাদিগের দিকে আসিল? আমরা ধর্ম্মের হইলাম, না ধর্ম্ম আমাদের হইল? আর যদি এরূপ দাঁড়ায় যে নির্ব্বাচন করিতে করিতে ধর্ম্মের সকল মূলতত্ত্বই যায়, কেবল মাত্র কয়েকটী নীতি পড়িয়া থাকে, তবে আর আমরা ধর্ম্ম (Religon) কিরূপে অবলম্বন করিলাম। এরূপ নির্ব্বাচনে ধর্ম্মত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যিনি তত্ত্বজ্ঞানে পরীক্ষা করিয়া, ধর্ম্মের সকল ভ্রান্তি ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে যাইবেন, তিনি হয় ত, ধর্ম্মের যাহা জীবন ও প্রাণ, সেই ঈশ্বর ও পরকাল ছাটিয়া ফেলিবেন, ছাটিয়া শুধু নীতিতে আসিয়া দাঁড়াইবেন। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলেন ইয়ুরোপের অনেক পণ্ডিত এইরূপ করিয়াছেন এবং আমাদের কৃতবিদ্য-গণের মধ্যে অনেকেই তাহা করিতেছেন। ধর্ম্ম এরূপে কঙ্কালসার হইলে, তাহাকে আর ধর্ম্ম বলিয়া চিনিতে পারা যায় কই? আমরা যে সত্য বাছিয়া লইব, সেই সত্য নিরূপণের একমাত্র উপায় মনুষ্যের বুদ্ধি ও জ্ঞান। কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞান সকল লোকের সমান নহে। সুতরাং সত্য-নির্ণয় কখন এক রূপ হইতে পারে না। বিভিন্ন লোকে, বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুশীলনানুসারে সত্য বিভিন্ন হইয়া দাড়াইবে। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকার সত্যাসত্যের মীমাংসা কে করিবে? পণ্ডিতগণ পরস্পর সকলই বিসম্বাদী। এরূপ স্থলে সত্য ধর্ম্ম লাভের উপায় কি? যদি বল, মহাজনেরা যে পথে যান তাহাই উৎকৃষ্ট। তাহা হইলেও সেই পুরাতন বিবাদ আবার আসিল। মহাজন কাহাকে বলিব? সত্যাসত্য নির্ণয় করা যেরূপ দুঃসাধ্য মহাজন স্থির করা সেইরূপই

* Vide Mill's Three Essays on Religion হিন্দুদর্শনতত্ত্বেও ঈশ্বর নির্গুণ; দয়া ও জ্ঞান প্রভৃতি মনুষ্যের গুণ ঈশ্বরে আরোপিত হয় না।

দুঃসাধ্য। যদি সত্যাসত্য স্থির করিতে পারি; তবে মহাজনের আবশ্যকতা নাই। স্থির করিতে পারি না বলিয়াই ত মহাজনের আবশ্যকতা। মহাজন ধর্ম্মগুরু। ধর্ম্মগুরু যাহা স্থির করিয়া দিয়াছেন পৃথিবীতে তাহাই ধর্ম্মরূপে প্রচলিত হইয়াছে। নানাবিধ ধর্ম্ম প্রচলিত থাকাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে সাধারণ জনগণ, ভ্রান্তি ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া সত্য নির্ব্বাচন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তবে Eclecticism কাহার জন্য? দুই চারি জন পণ্ডিতের জন্য? দুই চারি জন পণ্ডিত Eclecticism লইয়া থাকিলে কি ফল? সকল দেশে এবং সকল সমাজেই ত এরূপ পণ্ডিত চিরকালই আছেন। পণ্ডিতগণের নির্ব্বাচিত ধর্ম্ম Eclecticism কি সকলই এক প্রকার? না যত পণ্ডিত, তত প্রকার ধর্ম্ম? প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ আপন আপন জ্ঞানালোকে সকল বিষয়েই নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া লন। তাঁহারা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহাকেও বিশুদ্ধ ও সংস্কার করিয়া লন। পণ্ডিতগণ কাহারও উপদেশ চান না। তাঁহারা পরের উপদেশ না পাইয়াও ধর্ম্মের দোষ পরিবর্জ্জন করিয়া গ্রহণ করেন। সুতরাং বঙ্কিমবাবু যে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মের দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া তাহার মিথ্যাভাগ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, এ কথা পণ্ডিতগণের পক্ষে অনাবশ্যক। আর সাধারণ জনগণ পক্ষে এ কথা বলা যে কেমন বৃথায়, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। সাধারণ জনগণ সেই উপদেশ অনুসারে চলিতে অসমর্থ। তাহারা মহাজনের পথাবলম্বী। ধর্ম্মসংস্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, এ কথা যদি সাধারণ জনগণ পক্ষে বিধেয় হয়, এবং সাধারণ জনগণ যদি এই উপদেশ অনুসারে আপন আপন ধর্ম্মপথ খুঁজিয়া লইতে বাসনা করেন, তবুও তাঁহারা এক এক-জন এক এক মহাজনের ধর্ম্মমত গ্রহণ ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিবেন না। আর বাস্তবিকই যদি তাঁহারা সত্য নির্ব্বাচন করিয়া ধর্ম্মপথ গ্রহণ করেন, তবে দেখা যাইবে সকলই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং বঙ্কিমবাবুর উপদেশ সাধারণ জনগণকে দেওয়া বৃথা এবং পণ্ডিতগণকে দেওয়া অনাবশ্যক।

অনাবশ্যক কি না, তাহা প্রতি ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। খৃষ্টান ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। খৃষ্টান ধর্ম্মে প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ বরাবর সেই ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য খৃষ্টান ধর্ম্মে আমরা অসংখ্য ধর্ম্ম সংস্কারক দেখিতে পাই। যীসস্ এবং পলের ধর্ম্ম কি ছিল, এখন বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। কাথলিক পোপগণ সেই ধর্ম্মকে কত প্রকারে প্রচার করিয়াছেন। লুথার কালবিন, লয়েলা, ওয়েসলি, প্রভৃতি

সমস্ত পণ্ডিতগণই সেই ধর্ম্মের দোষ পরিবর্জ্জন করিয়া তাহার সত্যভাগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সকলই আপন আপন নূতন পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। কেহ তাহাদের সেরূপ করিতে বলে নাই, অথচ তাহারা নিজে নিজেই ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া লইয়াছিলেন। জিসস, নিজেই ইহুদী ধর্ম্মের সত্যভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মেও অসংখ্য সংস্কারক। হিন্দুধর্ম্মও তজ্জন্য অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সুতরাং প্রতীত হইতেছে যে, পৃথিবীতে ধর্ম্ম-সংস্কার কার্য্য নূতন নহে, ইহা চির-কালই চলিয়া আসিয়াছে।

ধর্ম্মসংস্কার কার্য্য যখন চিরকালই চলিয়া আসিয়াছে, তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, তাহাও ধর্ম্মের ইতিহাসে লিখিত আছে। আজি বঙ্কিমবাবু ধর্ম্ম-সংস্কারের উপদেশ দিলে যে কিছু নূতন ফল ফলিবে, আমাদের এমত প্রতীতি হয় না। আজিও পণ্ডিতগণ বলিবেন যে তাহারা সকলই সত্য ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রত্যেকেরই সত্য ধর্ম্ম প্রচারার্থ সমাজে শান্তিভঙ্গ এবং ঘোর বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিবে। ধর্ম্ম সুখের উপায় না হইয়া সুখের পথে বিঘ্ন উপ-স্থিত করিবে। ধর্ম্মের নামে লোক পাগল হয়, লোক কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়। ধর্ম্মের নামে জনসমাজ ক্ষেপিয়া উঠে। পৃথিবীতে যত গণ্ডগোল, যত রক্তপাত, যত কাটাকাটি, মারামারি ঘটিয়াছে, তাহার অধিকাংশই ধর্ম্মসংস্কার জন্য। এই সমস্ত কথা ধর্ম্মের ইতিবৃত্তে সপ্রমাণ করে। বঙ্কিমবাবুর মতে ধর্ম্ম যদি সুখের উপায় হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, ধর্ম্মসংস্কারে সেই সুখের অশেষ বিঘ্ন ঘটে। অতএব ধর্ম্মসংস্কার দ্বারা যে সমাজে সুখের বৃদ্ধি হয়, এবং সত্য-ধর্ম্মে উপনীত হওয়া যায়, এ কথা ধর্ম্ম-ইতিবৃত্তে প্রকাশ করে না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী।

(কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত।)

জন্মান্ধ, নৃমণি, তুমি, এ বারতা পায়ে
দূতমুখে, অন্ধা হলো গান্ধারী কিঙ্করী
আজি হতে। পতি তুমি; কি সাধে ভুঞ্জিব,
সে সুখে, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর? আনিতেছে দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া হাতে বেড়ি সাতবার,
অঙ্কিব এ চক্ষু দুটী কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টিদ্বারে কপাট। ঘটিল
লিখিলা বিধি যা ভালে; আক্ষেপ না করি!
করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা,

যাইতে যথায় তুমি দূরহস্তিনাতে ?
দেবাদেশে নরবর, বরেছি তোমারে।
আর না হেরিবে কভু, দেব বিভাবসু,
তব বিভারাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে!
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি
চারুচন্দ্র!—তারাবৃন্দ তোমরা লো সবে!
আর না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমাসকলে, রশ্মি-বিম্ব যেন
অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে;
বাসকীর ফণারূপ পর্য্যঙ্কে সুন্দরী—
বসুন্ধরা, যান নিদ্রা নিশ্বাসি সৌরভে!

নীহারিকা।*

আমরা এই পুস্তক খানি অনেক দিন হইতে সমালোচন করিব মনে করিতেছি, কিন্তু সময়াভাবে পারি নাই। এখনও আমাদিগের অবকাশ অধিক নাই, সুতরাং সমালোচনের জন্য উপযুক্ত সময় ব্যয় করিতে অসমর্থ। তবে আমাদিগের বিবেচনায় এই পুস্তক খানির উপযুক্ত সমালোচনের চেষ্টা আজিও হয় নাই। আমরা যাহা লিখিতে যাইতেছি তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও, তাহাতে দুই একটী প্রয়োজনীয় কথা থাকিতে পারে।

প্রথমে, এই কবিতা পুস্তক খানির নামটীতে আমরা একটু কবিত্ব দেখিতে পাই। পুস্তকের নাম লতা নহে, ফুল নহে, কানন নহে, ফুলের মালা নহে, পুষ্পমঞ্জরী নহে, সঙ্গীত নহে। ধরাতলে যাহা যাহা আছে, তাহার মধ্যে কিছুতেই কবির মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিল না, প্রকাশ করিবার যোগ্য বিবেচিত হইল না। লতা দুইদিন পরে শুকাইয়া যায়—তাহার নবীন শ্যামল পত্ররাজি দুই দিন পরে ঝরিয়া যায়। প্রাতে, ফুলের মুখ হাস্যে ঢল ঢল করে, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল সুখশিশু বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দেখি, তাহা তপনতাপে শুষ্ক, মলিন, ক্লিষ্ট, দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহা দেখিলে আর সুখ বলিয়া বোধ হয় না, এখন যেন সেই গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈরাশ্যের চিহ্ন স্বরূপ বোধ হয়। এখন তাহারা যেন অস্থায়িত্বের কথা, পরিবর্ত্তনের কথা, মনে করিয়া দেয়। যাহা স্থায়ী, যাহা অনন্ত, যাহা অমর, তাহার সহিত নশ্বর ফুলের কেমন করিয়া তুলনা হইবে? সুতরাং কবি এবার তাঁহার উচ্চ, নির্ম্মল, অমর, ও অনন্ত ভাবগুলি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, সঙ্কেতের জন্য, উচ্চ ও অনন্ত আকাশের দিকে চাহিলেন। সেখানে যাহা অমর ও দীপ্তিময়, শুভ্র ও বিশাল, তাহারই সঙ্গে

---

* "বনলতা" রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত।

নিজের ভাবনিচয়ের সাদৃশ্য দেখিলেন। "নীহারিকা"—ছায়াপথের তারকারাজি—অযুত২ জগৎপুঞ্জ—যাহা নিশীথে নীল নির্ম্মেঘ আকাশে,জ্যোতির্ব্বেত্তা দূরবীক্ষণ-লগ্ননেত্রে নিরীক্ষণ করেন—যাহা "তারকিত"কবি রজনীর কুহকগগনে দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে, সুখে,ও অনন্তত্বে ডুবিয়া যান—যাহা দেখিতে দেখিতে ধার্ম্মিক জন পুলকিত শরীরে এই বিশ্বরচয়িতায় অপার মহিমা অনুভব করেন,—সেই "নীহারিকা"—সেই "Huge cloudy symbols of a high romance"—পুস্তকের নাম। ছায়াপথের শুভ্র নির্ম্মলতার সঙ্গে যে পবিত্রতার ভাব সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহা কোন ভাবুককেই বলিয়া দিতে হইবে না। সেই রোমীয় দুহিতা, যিনি কারারুদ্ধ বৃদ্ধ পিতাকে অনশনমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য, নিজের পবিত্র স্তন্য পান করাইয়াছিলেন—বাইরণ যখন সেই সাধ্বী রোমক তনয়ার মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করিলেন, তখন বলিলেন,

> "The starry fable of the milky way
> Has not thy story's purity ;"

পৃথ্বীতলে যাহা কিছু আছে, তাহার সহিত বাইরণ—সেই অপূর্ব্ব দুহিতা-কাহিনীর বিশুদ্ধতার তুলনা করিলেন না। "নীহারিকা" রচয়িত্রীও তাঁহার চিন্তাগুলি, বা মনুষ্য হৃদয়ের নির্ম্মল ভাবগুলি, ভূতলের কোন বস্তুরই সহিত তুলনা করিলেন না—কেননা তাহার কবিতা, সকল প্রকৃত কবিতাই, সকল উচ্চ কবিহৃদয়ের কাহিনীই,—"Starry fable of the milky way"—ছায়াপথের তারকিত কাহিনী সদৃশী—কত উচ্চ, কত নির্ম্মল, কত বিশাল—ঐ কবিত্ব-আকাশের জ্যোতিষ্কগুলি নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্ক অপেক্ষা কম মহৎ নহে, কম উজ্জ্বল নহে, কম বিস্তৃত নহে। এক একটী ভাব এক একটী তারকা, এক একটী জগৎ। নহে কি? জড় জগতের আয়তনে আমরা সহজেই স্তম্ভিত হই। একটী গ্রহ, একটী তারা, কত প্রকাণ্ড, অনেকেই সহজে অনুমান করিতে পারেন, কিন্তু একটী ভাল ভাব, একটী ভাল চিন্তা কত প্রকাণ্ড, কত মহান্, কয়জন অনুমান করিতে পারেন? মনুষ্যহৃদয়ের চিন্তা কি জলবুদ্বুদের ন্যায় অস্থায়ী? যেমন ঐ নীল নিস্তব্ধ আকাশে অগণ্য তারকারাজি অমরত্বের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে,মনুষ্যচিন্তা তেমনি সময়ের অনন্ত আকাশে বিরাজ করিতেছে। ঐ তারকাগুলি নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু চিন্তা বা ভাব, মনুষ্যের আত্মা, কখন নষ্ট হইবে না। যেমন দূরস্থ জগৎ দূরতা ব্যবধানহেতু আমরা ভাল দেখিতে পাই না, অস্পষ্ট বোধ হয়, তেমনি যেন আমাদিগের শরীর ব্যবধান থাকাতে আমরা আমাদিগের চিন্তাগুলি ভাল করিয়া দেখিতে পাই না। যেমন নক্ষত্রজাল, আকাশের বিন্দুবিন্দু-জ্যোতিঃপুঞ্জ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

অপ্রকাশিত অজানিত জগতের নিদর্শন মাত্র, তেমনি যেন বোধ হয় আমাদিগের চিন্তাগুলি এখনও অপ্রকাশিত, এখনও অজানিত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মানসিক জগতের নিদর্শন মাত্র। ইহলোকেই হউক, পরলোকেই হউক, একদিন তাহার প্রকাণ্ডত্ব, তাহার বিশালতা, পূর্ণ ও স্পষ্ট ভাবে অনুভব করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে মুগ্ধ হইব। একটী ভাল চিন্তার যে কত মূল্য, কত মহত্ত্ব তাহা আমরা ভাবি না। চিন্তার সহিত ভাল করিয়া পরিচয় করি না। রাস্তাতে যেমন লোক অনবরত চলিয়া যায়, তেমনি আমার হৃদয়ে চিন্তা বা ভাবের স্রোত চলিয়া যাইতেছে। তাহার মধ্যে প্রায় কোনটীরই সহিত ভাল করিয়া আলাপ করা হয় না। আমি একদিন একটী চিন্তাকে দেখিলাম, তাহার সহিত একবার চোখোচোখি হইল মাত্র। চিন্তা চলিয়া যাইল, আমি তাহাকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলাম না, আমি তাহার মুখে কোন সৌন্দর্য্য দেখিলাম না, তাহাকে হৃদণ্ড রাখিয়া আলাপ করিলাম না—সুতরাং চিন্তা চলিয়া গেল। কতকাল পরে একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি, হৃদয়ের দ্বারে সেই চিন্তাটী সহাস্যবদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এবার তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলাম। তখন, অমুস্তপ্ত শৈবলিনীর হৃদয়ে চন্দ্রশেখরের সৌন্দর্য্যের ন্যায়, আমার হৃদয়ে, সেই চিন্তার সৌন্দর্য্য বিকশিত হইতে লাগিল। তখন বোধ হইল, কি সৌন্দর্য্য ঐ দেবমুখে, কি গাম্ভীর্য্য, কেমন সুন্দর হাসি, কেমন মধুর আলাপ—দেখিতে দেখিতে শুনিতে, শুনিতে, রূপে ও ভাষায়, প্রাণ সুখে যে ভরিয়া যাইল, তাঁহার নূতন নূতন কথাতে সুখের নূতন নূতন তরঙ্গ হৃদয়ে উঠিতে লাগিল—অন্তঃকরণ বিস্ফারিত বিস্তৃত হইতে লাগিল। সেই চিন্তা যেন বিশ্ব ব্যাপিয়া ফেলিল। সে চিন্তাটী এখন আর আমার নিকট ক্ষুদ্র নহে—এখন তাহা একটী জগৎ—প্রকাণ্ড, বিশাল, দীপ্তিময়। এখন আমার ভিতরে সেই (চিন্তা) জগৎ, অথবা সেই (চিন্তা) জগতের ভিতরে আমি, তাহা বলিতে পারি না। কেবল এই বলিতে পারি, এক একটী চিন্তা, ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিলে এক একটী জগৎ, এক একটী তারকা, এবং চিন্তাপুঞ্জ, ছায়াপথ, নীহারিকা।

এখন নাম ছাড়িয়া বস্তুর বিচার করা যাউক। কিছুকাল হইল আমাদিগের দেশ একপ্রকার রুগ্ন কবিত্বের আর্ত্তনাদে পরিপূরিত হইয়াছিল। হেম বাবু "হতাশের আক্ষেপ" লিখিলেন, অমনি সহস্র লোক হতাশের আক্ষেপ লিখিতে লাগিলেন—নিরাশ প্রণয়ের উন্মত্ত বিলাপে, হতাশের হাহাকারে, দেশ পূরিয়া যাইল। পবনদেব প্রণয়ীর নৈরাশ্যের অশ্রু ও দীর্ঘনিশ্বাসের ভার বহনে যেন অসমর্থ হইয়া পড়িলেন।

"পুড়িলাম, মরিলাম,"—"বাবারে মারে," "গেলামরে ম'লামরে" "আত্মঘাতী হ'ব" "বিষ আন্, ছুরি আন্" "প্রাণ রাখ্‌বনা—কোন মতেই রাখ্‌বোনা"—"প্রাণ যে বেরোয় না"—এবম্বিধ কিম্ভূত কিমাকার কবিত্বের আর্ত্তনাদে কাণ ঝালাপালা হইয়া উঠিয়াছিল। কবিতাতে যে ক্রন্দন ব্যতীত আর কিছু আছে, তাহা অনেক নিরাশ দুঃখী কবিপেচক বোধ হয় অনুভব করিতে পারেন না। আমরা ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীতে কি কেবলই কান্না, ইহাতে কি গান নাই? পৃথিবীতে কি কেবলই অমাবস্যা রজনী, ইহাতে কি পূর্ণিমা নাই? পৃথিবী কি কেবলই ভীষণ কণ্টকময় অরণ্য, ইহাতে কি ফুল ফুটে না, পাখী গায় না, মরুত মলয় বহে না? পৃথিবী কি কেবল মরুভূমি, ইহাতে কি কিশলয়শোভিত তরুরাজি, নির্ম্মলসলিল নির্ঝর দেখা যায় না? যেমন এক দিকে দুঃখের কবিত্ব আছে, তেমনি অন্য দিকে সুখেরও কবিত্ব আছে, তাহা অনেকেই যেন অনুভব করিতে পারেন না। এই ব্রহ্মাণ্ডে, এই মনুষ্য জীবনে, যেমন এক দিকে পরাভব তেমনি অন্য দিকে বিজয়, যেমন এক দিকে পতন তেমনি অন্য দিকে উত্থান, যেমন এক দিকে অমঙ্গল তেমনি অন্য দিকে মঙ্গল, যেমন এক দিকে নরকের অগ্নি তেমনি অন্য দিকে স্বর্গের অমৃত আছে। কবিত্বের কার্য্য উভয়ই অনুভব করা, উভয়ই চিত্রিত করা।

আমাদিগের দেশে কবিত্বের যে কান্নার রোল উঠিয়াছে তাহার জন্য হয়ত কবি বাইরণ কতকটা দায়ী। কিন্তু একটা আক্ষেপের বিষয়, বাইরণে যে টুকু ভাল উচ্চ, উদার ও মহৎ, Childe Harold এর তেজ, শক্তি, স্বাধীনপ্রাণতা, Manfred এর কুহক মহিমার ও অভ্রভেদী উচ্চ কল্পনার কণামাত্রও বঙ্গীয় বাইরণদিগের মধ্যে দেখা যায় না।

আমাদিগের দেশে কবিত্বের যে কান্নার যুগের কথা বলিতেছিলাম, তাহার এখন অবসান হইয়াছে বোধ হয়। কবিত্বের নবযুগ, সুখের যুগ উপস্থিত। "নীহারিকা" এই যুগের একটী মহৎ সঙ্গীত। নীহারিকা রচয়িত্রী এই যুগের এক জন প্রধান ও প্রাভাতিক কবি। দীর্ঘ তামসী রজনী অবসানে প্রভাতে মধুর ললিত রাগিণী যেমন কাণে লাগে, পূর্ব্বগগনে সুখময়ী উষার কোমল কনক হাসা যেমন চোখে লাগে, "নীহারিকা"—ইহার প্রধান কয়েকটী কবিতা—আমাদিগের হৃদয়ে তেমনি লাগিল—নির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময়, তরঙ্গায়িত সুখপ্লাবন।

"নীহারিকা" কোন্ প্রকৃতির কবিতা তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়া এখন আমরা দুই একটী কবিতা দ্রুতবেগে সমালোচন করিব। আমাদিগের মতে এই পুস্তকের মধ্যে "জীবন্ত কাব্য" "সব বর্ত্তমান" "সাধ পুরিল না" এই তিনটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। এই প্রকৃতির কবিতার মধ্যে, আধুনিক সমগ্র বাঙ্গালা

সাহিত্যে, এতদপেক্ষা ভাল কবিতা আছে তাহা আমরা জানি না। বস্তুতঃ প্রেমের এমন উচ্চ ও বিশুদ্ধ বর্ণনা ভাষাতে বিরল। এতদ্বর্ণিত প্রেম এমনি অশরীরী, আধ্যাত্মিক ও প্রাণপূর্ণ, যে ইহা পড়িতে পড়িতে কখন কখন ঐশ স্তোত্র বলিয়া ভ্রম হয়। এই নিমিত্তই বোধ হয়, ইহার মধ্যে "জীবন্ত কাব্য" ও "সাধ পূরিল না" এই দুইটী কবিতা, কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া, ভক্তিভাজন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে, অতি সুন্দরভাবে বিভূস্তবে প্রযোজিত হইয়াছিল। এই কবিতাগুলিতে, ভালবাসার চিত্রে এত উচ্চ ভক্তি, এমন পূর্ণ আত্মোৎসর্গ, এমন নির্ম্মল ও বিশ্ববিজয়ী সুখ, দীপ্তি পাইতেছে, যে আমাদিগের কখন কখন বোধ হয়, সীমাবদ্ধ দুর্ব্বল ক্ষুদ্র মনুষ্য এই অসীম, ভক্তি-পরিপ্লাবিত, মহীয়সী ভালবাসা পাইবার উপযুক্ত পাত্র নহে, ইহার উপযুক্ত আধার কেবলমাত্র সেই অসীম অনন্ত ঈশ্বর—যিনি ভালবাসার আদি প্রস্রবণ। "সাধ পূরিল না" কবিতাতে, কবি অতৃপ্ত অন্তরে, দিবস রজনীতে, অরুণ কিরণে, একাকী নিশীথে নীল আকাশের দূরাগত সঙ্গীতের তানে—নীলিমা সাগরের অযুত তারকাদলে—নিদাঘগগনের নবীন জলদে—নবপল্লবিত কুসুমকোমলা বসন্ত প্রকৃতিতে—গভীর নিশার সুখ স্বপ্নে—সায়াহ্নে রক্তিম রবির সান্ধ্য শোভায়—সৌন্দর্য্যের ও ভালবাসার তরঙ্গ সংমিশ্রিত করিয়া, তাঁহার হৃদয়ের স্নেহের ছবি, প্রীতির প্রদীপ্ত মূর্ত্তি, পুলকিত তৃষিত আঁখিতে দেখিয়া দেখিয়াও, অসীম সুখলাভ করিয়াও, জীবনে অতৃপ্ত থাকিলেন। পরে, সুখকল্পনা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া জীবনের অপর পারে, মৃত্যুর অন্ধরাজ্যে, কবিত্বের আলোক বিস্তৃত করিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন—

"জাহ্নবী সৈকতে
দগ্ধ পরমাণু মম রহিবে যখন,
আমার শ্মশানভূমি, যদি কভু যাও তুমি,
তোমার চরণ-স্পর্শে পরমাণুচয়,
জীবন লভিয়া নব, আনন্দে কাঁপিয়া সব,
প্রতি পরমাণুকণা তোমার চরণ
চুম্বিবে অধীর হয়ে আবার তখন"

এমন সুন্দর কবিতা পড়া আমাদিগের ভাগ্যে অতি কমই ঘটে। এইটী পড়িয়া আমাদিগের মনে টেনিসনের পশ্চাল্লিখিত কবিত্বময় ছত্র কয়েকটি মনে পড়িল :—

She is coming, my own, my sweet ;
Were it ever so airy a tread,
My heart would hear her and beat,
Were it earth in an earthy bed ;
My dust would hear her and beat,
Had I lain for a century dead ;
Would start and tremble under her feet
And blossom in purple and red.

টেনিসনের এই কবিতাটী অপেক্ষা নীহারিকা-রচয়িত্রীর উপরের কবিতা কোন অংশে ন্যূন নহে, তাহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। ইহাতে আমরা অবশ্য এখন এমন কথা বলিতেছি

না যে নীহারিকা-রচয়িত্রী বাঙ্গালার টেনিসন। আমরা কেবল এই কথা বলিতে চাহি যে "সাধ পূরিল না" "জীবন্ত কাব্য" এবং "সব বর্ত্তমান" এই তিনটী কবিতা ইংরাজী বা বাঙ্গালা সাহিত্যে (ঐ প্রকৃতির কবিতার মধ্যে) কোন কবিতার নিম্নে নহে। আমাদিগের এই সাহসের কথা শুনিয়া যদি কেহ বিস্মিত হন, অথবা আমাদিগের বিচারশক্তিকে বিদ্রূপ করিতে উত্তেজিত হন, তাহা হইলে তিনি যেন ঐ কয়েকটী কবিতা পড়েন। শেলির "Sky-lark," ওয়ার্ডসওয়ার্থের "Cuckoo" শিবনাথ বাবুর "ফুল," যদিও ভিন্ন-প্রকৃতির কবিতা তথাচ "নীহারিকা-রচয়ত্রীর ঐ তিনটী কবিতার সহিত তাহাদিগের একপ্রকার সাদৃশ্য আছে—বিশ্বব্যাপী সুখে ও কবিত্ব প্লাবনে।

"জীবন্ত কাব্যে" কবি ভালবাসার জীবনকে কাব্য বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। কবিদিগের নিকট জগতে কাব্যই সকল বস্তুর অপেক্ষা অধিকতর মনোহর। কিন্তু বর্ত্তমান কবি বলিতে চান, তাঁহার জীবনকাব্যে, তাঁহার প্রেমভক্তিসুখময় প্রাণে, যে কবিত্ব আছে, তাহা কোন গ্রন্থকাব্যে, তাহা জগতে কুত্রাপি নাই। কবি বলিতেছেন,—

তুষার ভূষিত শির,
হিমাদ্রি অচল স্থির,
প্রভাত অরুণকর তরল কাঞ্চন
বর্ষে যবে, সেই শির করিয়া শোভন,
হিল্লোলে হিল্লোলে শোভা
কম্পিত সুবর্ণ বিভা,
অনন্ত সৌন্দর্য্যময় নয়নরঞ্জন—
দেখিয়াচি—দেখি না কবিত্ব এমন।

* * *

সায়াহ্নে রক্তিম রবি
গৌরব-মণ্ডিত ছবি—
নীলাম্বু শয্যায় ঢালি শিথিল জীবন,
অলসে মুদিত আঁখি বিশ্রাম কারণ,
গাম্ভীর্য্যজড়িত শোভা
প্রকৃতির চিত্ত লোভা,
স্থির নেত্রে কতবার করেছি দর্শন,
দেখি নাই তাহে কভু সৌন্দর্য্য এমন।

* * *

"বসন্তের বিহগ গান শুনিয়াছি"—"সহস্র হীরক খণ্ড গগনের গায় দেখিয়াছি কত নিশি"—প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের অনন্ত উচ্ছাস হেরিয়াছি—মুগ্ধ-প্রাণে সকল ভুলিয়া তাহাতে ডুবিয়াছি,

"কিন্তু রে শোভা এমন
করি নাই দরশন
একাধারে এই কাব্যে রয়েছে যেমন,
অপ্রতিম,—অপার্থিব,—এ কাব্যরতন।
অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি,
ভূলোক ত্রিদিব হাসি
পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, এ কাব্য ভিতরে
দীপিছে মধুর ভাবে কিবা শোভা ধরে।
নিত্য বসন্তের বাস
সঙ্গীতের চিরোচ্ছাস
শত শারদীয় শশী গৌরবকিরণ
অবিরাম প্রাণকাব্যে করে বরিষণ

* * *

ভাবি কতবার বসি নীরব নির্জ্জনে
কে আনিল এত শোভা সংসারভবনে।

ভালবাসার দেবশক্তিতে কেবল জীবন কাব্য হইল তাহা নহে, ঐ দেবশক্তিতে সমুদায় জগৎ অবশেষে কাব্যে পরিণত হইল। তাই কবি তখন বলিতেছেন,

আকাশ ধরণীতল
কাব্যময় সর্ব্বস্থল,
যেই দিকে নেত্র সুখে করি প্রসারণ—
চারি দিকে ভাসে যেন কাব্য অনুক্ষণ।

ভালবাসার এই এক প্রকার বিশ্বময়তা "জীবন্ত কাব্যের" অপেক্ষাও "সাধ পূরিল না" এই কবিতাটীতে অধিক

বিকশিত হইয়াছে। "জীবন্ত কাব্যে" সংসারে যাহা কিছু সুন্দর আছে দেখান হইল, তদপেক্ষা তুমি (প্রেমাধার) অধিকতর সুন্দর। "সাধ পূরিল না" কবিতাটীতে প্রদর্শিত হইল, বিশ্বজগৎই অধিকতর সুন্দর হইয়া গিয়াছে; তখন জগতের সুন্দর বস্তুতে আর তোমাতে প্রভেদ নাই। তখন তুমি আর জগৎ—সুন্দর তুমি, আর সুন্দর জগৎ—এক, তাই কবি বলিতেছেন,—

দিবস রজনী—
চিন্তায় মিশিয়া আছে তোমার মুরতি,
তুমি, প্রিয়, বিশ্বময়, সচঞ্চল নেত্রদ্বয়,
কিম্বা নীলাম্বর গায় কিবা ধরাতলে,
চাহিয়া চাহিয়া থাকি, দৃষ্টির সীমায় রাখি,
প্রতি পলকের সনে যাও মিশাইয়া।"

তাই—

"অরুণ কিরণে—
হাসিয়া ভাসিয়া যায় আনন তোমার
প্রতি রশ্মি কণাভরে আবার নূতন কোরে,
প্রদীপ্ত লোচনে হওরে আসিয়া,"

তাই—

"হৃদয় অন্তরে—
জড় প্রকৃতির সনে কবিত্ব জগতে,
আছ তুমি সর্ব্বস্থানে, অনুভবে দিব্য জ্ঞানে,
দেখি সদা তব মুখ, সুদূর সীমায়,
শূন্যে শূন্যে যাও ভাসি,চাহিয়া চাহিয়া হাসি
তৃষাকুল হৃদি মম, অনন্ত পিয়াস।
এ জীবনে হেরি হেরি পূরিবে না আশ"

"সাধ পূরিল না" এই সমগ্র কবিতাটীর যেন মর্ম্ম—"তুমি, প্রিয়, বিশ্বময়" কবি যেন প্রকারান্তরে বলিতেছেন, "ভালবাসার এই উচ্চ অবস্থাতে আসিয়া আমি এখন দেখিতেছি, হে প্রিয়, তুমি আমি এবং জগৎ এক, এখন First person, second person এবং third person এ প্রভেদ নাই—এখন দুইটী আত্মা এক হইয়াছে, এক হইয়া যেন পরমাত্মাতে বিলীন হইতেছে। এখন প্রেম অদ্বৈতবাদে উন্নীত। এখন বাস্তবিক জীবন স্বপ্ন, এখন স্বপ্ন বাস্তবিক জীবন,—বাস্তবিক জীবন স্বপ্নের ন্যায় আশ্চর্য্য, স্বপ্নের কল্পনা বাস্তবিক জীবনে পরিণত"।

যখন হৃদয় এইরূপে Beauty ও Harmony তে প্লাবিত হয়, তখন হৃদয় স্বতই জিজ্ঞাসা করে,

"কে আনিল এত শোভা সংসার ভবনে"

তখন শনৈঃ শনৈঃ অন্তরে এই প্রশ্ন প্রবেশ করে,—"হৃদয় আকাশে, এই যে সুখের নীহারিকা, এই যে সৌন্দর্য্যের জগৎরাজি প্রস্ফুটিত হইয়াছে,

Are not these, O soul, the Vision of Him who reigns?

* * *

Dreams are true while they last and do we not live in dreams?"

কবিতা সমালোচন করিতে করিতে অসাবধানে বড় গভীর তত্ত্বে আসিয়া পড়িয়াছি। আর না। কেবল এই বলি, উচ্চ ভালবাসার সহিত ধর্ম্মের বন্ধন আছে, প্রেমভক্তি ধর্ম্মের সোপান, প্রেমরজ্জুর নিম্ন সীমা মানবহৃদয়ে, উচ্চ সীমা ঈশ্বরচরণে। এই অর্থেই বোধ হয়,দান্তের "Divine Comedy"তে তাঁহার প্রণয়িনী বিত্রীচ (Beatrice) স্বর্গে তাঁহার নেত্রী।

অদ্য এখানে সমাপ্ত করিলাম। নীহারিকা সম্বন্ধে বিশেষতঃ তাহার যাহা দোষ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ বাবু ও রবীন্দ্র বাবুর কোন কোন কবিতা সম্বন্ধে আমরা অবসরমতে পরে আর কিছু বলিব।

শ্রীলোচননাথ চট্টোপাধ্যায়।